জয়পুরের মহারাজা মাধোসিং ও ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান
রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র [illegible]খোপাধ্যায়।

প্রবাসী

বৈশাখ, ১৩০৮। | ১ম সংখ্যা।

সূচনা

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের নাম লইয়া আমরা প্রবাসী” প্রকাশিত করিতেছি। বঙ্গদেশের বাহিরে রূপ মাসিকপত্র বাহির করিবার ইহাই প্রথম উদ্যম। দেশ হইতে দূরে থাকায় কি লেখা, কি ছবি, কি ছাপা, ল বিষয়েই আমাদিগকে অনেক বাধা ও বিঘ্ন অতিক্রম তে হইবে। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় যদি লেখক এবং কবর্গের সহানুভূতি ও সাহায্য পাই, তাহা হইলে চয়ই আমাদের চেষ্টা ফলবতী হইবে।

প্রারম্ভের আড়ম্বর অপেক্ষা ফল দ্বারাই কার্য্যের বিচার য়া ভাল। এই জন্য আমরা আপাততঃ আমাদের আশা উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নীরব রহিলাম।

আবাহন

১

এ বিদেশে, এ প্রবাসে, আমি গো প্রবাসী ;
প্রাণ কাঁদে, হতাশে, নিরাশে ! হে ভারতি,
এস, এস আজি। কল্পনা-কুসুম, সতি,
কৌতুকে স্বহস্তে লয়ে ; গালভরা হাসি
মুখে ; নয়ন-কিরণে সৌভাগ্য প্রকাশি ;
মোহন শ্রবণযুগে রক্তোৎপল দুল,
ঝলমল্ ঝলমল্ বাসন্তী দুকুল ;
এস, বিশ্ববিমোহিনি, লয়ে রূপরাশি।
এস মা, এস মা আজি, উষা যথা আসে,
আলোক-আবীর-রাশি ঢালি, হাসি, হাসি,
অরুণের শিরে !—আসি যথা পৌর্ণমাসী
খুলি দেয় জ্যোৎস্না-ফোয়ারা !—বিশ্ব ভাসে
আনন্দ-সলিলে ! লয়ে অপূর্ব্ব অমিয়া,
দেখা দে মা, দেখা দে মা, জুড়াইয়া হিয়া !

২

এস মা, কবির নেত্রে সহসা উদয়
অফুরন্ত ফুলবীথি হয় গো যেমতি,
কানন-দুর্গমে ! ভক্ত-সাধক-হৃদয়
করি উচ্ছ্বসিত, ইষ্ট-দেবতা-মূরতি
হয় যথা আবির্ভূত ! বন্ধ্যারে যেমতি
করি পুলকিত, করি শঙ্খধ্বনিময়
গৃহাঙ্গণ, আঁধারেতে জ্বালি শত জ্যোতি,
জননী-উৎসঙ্গে শোভে সুন্দর তনয় !
শিশু যবে, গৃহ ছাড়ি, পথ হারাইয়া,
হয়, আহা ! ভয়-ত্রস্ত, ক্রন্দন-আকুল,
মা তাহার শশব্যস্তে, এলাইয়া চুল,
উন্মাদিনী-প্রায়, লয় বাছারে তুলিয়া !
আমি কাঁদি এ প্রবাসে ; কোথা মা গো তুমি ?
লও মোরে ক্রোড়ে তুলি, নেত্রজল চুমি !

৩

বহুদিন পাই নাই শেফালীর বাস ;

বহুদিন হেরি নাই আনন্দ-উল্লাস
গোপিনীর, আচম্বিতে, মোহন মুরলী
শুনি, স্খলিত ললিত গতি, স্রস্ত-বাস
বিজন সে বনপথে!—যক্ষের আবাস
কোথা সে অলকাপুরী? যাদুকর-মন্ত্রে,
হে শিবানি, তোমার ও কল্পনার তন্ত্রে,
হে ভারতি, সৃজ আজি, নূতন অলকা!
তরুণ যৌবন বিনা অন্য কোনো যথা
নাহি বয়ঃসন্ধি; চিরবন্ধ-সখী-সখা,
জানে না প্রেমের কুঞ্জে বিরহের ব্যথা!
সৃজিয়া নূতন সৃষ্টি, চিত্ত লও হরি
এ ভক্তের; দয়া করি, উর যাদুকরি!

৪

উর মা, উর মা, আসি এ চিত্তমন্দিরে,
আদি কবি বাল্মীকির আশ্রম বিরলে
আসিয়া উরিলা যথা!—ক্রৌঞ্চবধূটিরে
ক্রোড়ে লয়ে, ভাসে কবি নয়নের জলে;
তুমি সেই ভাগ্যবানে অঙ্কে লয়ে ধীরে,
মুছাইয়া দিলে অশ্রু বসন-অঞ্চলে;
রঞ্জি দিলে নেত্র তার অপূর্ব্ব কজ্জলে;
হাসে কবি! নব প্রভা ভাতিল তিমিরে!
হে বরদে, বসি সেই ত্রিবেণী-সঙ্গমে,
(এক ধারে বহে তব সৌন্দর্য্যের ধারা,
আরো দুই ধারে মরি, নির্ঝরিণী-পারা,
দয়া, প্রীতি!) অয়ি বিশ্বরমে, নিরুপমে,
দিলে তারে কবিতার দীপ্ত স্পর্শমণি,
যাহে, এবে, হিরণ্ময়ী অখিল অবনি!

৫

কিম্বা এস বরাননি, সে মধুর রূপে,
রাজরাজেশ্বরীরূপে, বিমোহিনী সাজি,
(মায়াবিনি, এই বিশ্ব তব ভোজবাজী!)
ভক্ত উজ্জয়িনী-কবি, যে মাধুরী, চুপে,
পূজিত, পূজারি হয়ে! করিত বন্দনা,
হস্তে লয়ে উপমার ফুল্ল-ফুল-সাজি,
গুঞ্জরিত যাহে, কল-ভ্রমরের রাজী,
ললিত শব্দের দল! ধন্য উপাসনা!
কিম্বা এস, হে আরাধ্যে (করি আরাধনা),
রাসরাসেশ্বরীরূপে, প্রেমিকা রাধিকা!
(অয়ি ব্রজাঙ্গনা, তুমি অনন্ত প্রেমিকা!)
ভালে মাখি, যে পবিত্র প্রেম-রেণু-কণা,
বঙ্গের বৈষ্ণব-কবি-ছায়াপথ-মাঝে,
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্বল্ জ্বল্ রাজে!

৬

আশৈশব, বীণাপাণি, তব আরাধনা
করিয়াছি, সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে!
কত যে তুফান, ঝড়, দারুণ ঝঞ্ঝনা
বহিয়াছে মোর মাথে! পদ-কোকনদে
তব ও একান্ত ভক্তি, জ্ঞানদে, শুভদে,
অচলা রহিল মোর!—"বাতুল কল্পনা
বঙ্গের কবিতা!"—হেন উপহাস-হ্রদে
ঠেলিয়া, ঘরের শত্রু করিল লাঞ্ছনা!
ঘোর, ঘোর অত্যাচারে, নির্ম্মম নিয়তি,
করিয়ে উন্মাদগ্রস্ত, হরিল চেতনা!
শনৈশ্চর হাসি কহে, "পাবে অব্যাহতি,
ভুলে যাও দেবতার করিতে অর্চনা!"
অতিবুদ্ধি (কলি-পত্নী!) হাসি কহে "ফাকি!
সব ফাকি!—মিছা উচ্চে কেন ডাকাডাকি?"

৭

ঘুরি গেল মুণ্ড মম, ভণ্ডামিরে হেরি;
দুয়ারে অর্গল দিল আত্মীয়, স্বজন!
প্রেমের মুখস্ ফেলি, হিংসা-নিশাচরী
করিতে লাগিল হর্ষে তাণ্ডব-নর্ত্তন!
"পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম ধর্ম্ম, সুবিধার বিধি,"
হাসি কহে নাস্তিকতা, কুলঘ্ন, কুলটা!
"সব দুঃখ দূরে যাবে, কর পান যদি
এক্‌শাটা—মুখে দাও পেস্তা দুই মুঠা!"
এইরূপে, যবে দেবী, ঘৃণিত, দলিত,
বিতাড়িত, স্বামিশূন্য কুক্কুরের প্রায়,
ফিরিলাম দ্বারে দ্বারে উচ্ছিষ্টেও রত,
তুমি দিলে দেখা দেবি, দ্রব করুণায়,

সজল আয়ত আঁখি !—কহিলে, "এ ঘোর
পরীক্ষা হয়েছে সাঙ্গ ; আয় বাছা মোর !"

৮

তার পর, মহাদেবি, কাছে নিলে টানি ;
প্রতপ্ত কপালে পাণি দিলে বুলাইয়া !
কহিলে (অমৃতস্রাবী কি মধুর বাণী !)
"অরাজক নাহিক রে ! ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া,
এক-ছত্র সাম্রাজ্যের আমি রাজরাণী !
ঘোর প্রলয়ের মধ্যে আমিই শৃঙ্খলা,
ঘোর দুর্দৈবের মাঝে আমিই কমলা,
কলুষনাশিনী আমি, কল্যাণী, ঈশানী !
আশৈশব বাছা তুই, কায়মনঃপ্রাণে,
করিলি আমার পূজা—নিষ্কাম পূজার
আছে—আছে পুরস্কার বাছারে আমার !
পড়েছি একান্ত বাঁধা সে পূজার টানে !
লভিবি বিজয় তুই, শাস্তি-অবসানে।
কাছে আয়, গুরুমন্ত্র দিই তোর কাণে !"

৯

"আমি প্রেম—আমি প্রীতি—আমি ভালবাসা !
সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী কেবলি ভারতী
আমি নহি ! আমি মুক্তি, আমিই সদ্গতি !
আমি জ্ঞান, আমি ভক্তি, ধার্ম্মিকের আশা ;
অশোভন গণ্ডগোলে শৃঙ্খলা, নিয়ম,
আমিই ; মৃত্যুর মাঝে আমি মহাপ্রাণ ;
দুরন্ত লালসা-মাঝে আমিই সংযম ;
আমি পুণ্য, আমি শিব, আমিই কল্যাণ !
হায় মূঢ় ! উর্দ্ধে ওই অনন্ত আকাশে,
অন্তহীন সৌররাজ্য, রবি, শশী, তারা,
তুমি কি ভেবেছ ওরা উন্মাদের পারা
ঘুরিতেছে, লক্ষ্যহীন উদ্ভট উচ্ছ্বাসে ?
হা মূঢ় ! করিয়ে পাঠ ওমর্ খাইয়াম্,*
ভাবিতেছ, "মরণই জীবের বিরাম ?"

১০

সমুদ্রে অর্ণবযান গরুড়-গতিতে
চলিয়াছে ; বক্ষে তার শত নর নারী !
উঠিল তুফান ঘোর কেন আচম্বিতে ?
"রক্ষ ভগবান" বলি উঠিল চীৎকারি
যত নর নারী !—প্রলয়-ভেরীর রোল,
ভীম গণ্ডগোল ! শত ফণা আস্ফালিয়া,
শত পুচ্ছ আছাড়িয়া, রুষিয়া, গর্জ্জিয়া,
তরঙ্গ-ভুজঙ্গ-বৃন্দ করিছে কল্লোল !
কেবা শোনে কার কথা ? কোথা ভগবান ?
নরনারী সাথে ওই বারিধি-অতলে
ডুবিল ডুবিল তরী ! হইল উত্থান
জননীর শব ; তার বদ্ধ মুঠি-তলে,
শিশুর মাথার কেশ !—হেরি এই কাণ্ড,
তুমি কি ভাবিছ, মূঢ় ! বাষ্পের ব্রহ্মাণ্ড ?

১১

শস্য বুঝি সব ? শুধু ধূমপুঞ্জরাশি
এই বিশ্ব ? চেয়ে দেখ—আমারি উৎসঙ্গে,
সেই শত নর নারী হাসিতেছে রঙ্গে,
মরণে চরণে দলি, আনন্দে উল্লাসী !
অবিশ্বাসি ! আমি সবে, জগদ্ধাত্রী-মাতৃক,
এ অঙ্কে দিয়েছি স্থান ! কোটি পরলোক,
বৈকুণ্ঠ, কৈলাস কোটি, ভূলোক, দ্যুলোক,
বিশাল বিরাট মম মায়া-দেহে রাজে !
নরবলি-লেলিহান আমিই সংগ্রাম !
শতশবস্কন্ধবাহী আমি মহামারী !
ব্যাদানি বিকট মুখ, জনপদ, গ্রাম
গ্রাস করি, ভূমিকম্প-রূপে ! সারি, সারি,
কঙ্কালের সেনা-মাঝে, দুর্ভিক্ষ হইয়া,
নাচি আমি মুক্ত চুলে, তা ধিয়া, তা ধিয়া !

১২

কবন্ধের মত যেই ঘূর্ণী বায়ু ছোটে,
সাগরার মাঝে, তারো অন্ধ ক্ষিপ্ততায়
আমারি মূরতি, পুষ্পময়ী, শোভা পায়
শোভনা শৃঙ্খলা !—যে ধার্ম্মিক অকপটে
সত্য-পথে চলে, তারো ঘোর নির্য্যাতন
হয় যেই, সুতঃসহ সে যন্ত্রণা-মাঝে,

*সুপ্রসিদ্ধ নাস্তিক পারস্য কবি।

আমারি আনন হাসে (জোৎস্না যথা বাজে
স্বর্ণমন্দিরের চূড়ে !) । —সাধুর বদন,
হেরি সেই হাসি, ভাসে আনন্দ সলিলে !
(নিশির কুমুদি যথা শিশির-সম্পাতে !)—
—আমারি আদেশ-আজ্ঞা অবনি-অখিলে
ছুটিছে অপ্রতিহত :—অশনির পাতে,
উল্কার উৎপাতে, বাজে মাঙ্গলিক শঙ্খ !
শিশুরে কি ভোলে কভু জননীর অঙ্ক ?

১৩

ভুঞ্জিয়াছ নিজ কর্ম্মফল, অপরাধি !
করিলাম ক্ষমা তোমা দেখায়ে সুনীতি !—
তৃণ হ'তে নীচ হয়ে, ক্লেশ, আধি ব্যাধি
তরু সম সয়ে, ধর বৈষ্ণবের রীতি !
শত্রুমিত্রে সবাকারে প্রাণপণে প্রীতি
কর বৎস ! কি ভয়, কি ভয় ? এ অভয়া
দিতেছে অভয় !"—এত বলি, হে অজয়া,
দিলে মোরে মন্ত্র; ঘুচিল দাসের ভীতি !
সত্যই মা, বদ্ধ নিজ অপরাধ-পাশে !
অবুদ্ধি বানর যথা, খেলিতে, খেলিতে,
দড়িসহ বদ্ধহস্ত পারে না খুলিতে,
কাঁদিয়া মরেছি, ত্রাসে, নিজ-কর্ম্মফাঁশে !
বুঝেছি মা, পরার্থই আপন মঙ্গল,
কর্ম্মফল বিসর্জ্জনে আনন্দ অচল !

১৪

তদবধি বীণাপাণি, করি শিরোধার্য্য
বাক্য তব, মাগো তোর ও পদ স্মরিয়া,
যথাশক্তি কর্ম্মক্ষেত্রে সাধিতেছি কার্য্য !
তবু মা আশঙ্কা-ভরে দুরু দুরু হিয়া,
কাঁদে কভু; ডুবে যাই নিরাশা গহ্বরে;
চরণ চলে না যেন, নয়নের ভাতি
অনুজ্জ্বল ! দিবসেও হেরি যেন রাতি !
কোথা মা ? নয়ন-মণি, আয় মা সত্বরে !
আয় মা, আয় মা আজি, ম্যাডোনার বেশে,
অঙ্কারোহী তোর ওই শিশু খৃষ্টে ধরি,
নবীন জীবন লভি, নবোৎসাহে, হেসে,
শত্রুরেও গলে ধরি, বলি "হরি হরি" !
প্রবাস স্বদেশ হোক্; এক রাজ্যবাসী
দেবলোক, মর্ত্ত্যলোক, স্বদেশী, প্রবাসী !

১৫

সগুণে, নির্গুণে, আর আসলে, নকলে,
দ্বৈতাদ্বৈতে, ভেদাভেদে, মোর কাজ নাই !
যে মূর্ত্তিতে চাও, মাতঃ, এস মোর ঠাঁই ;
এসে শুধু, বস মম হৃদয়-কমলে !
যদি চাস্, আয় মাগো, যশোদার রূপে !
তোর ওই অঙ্কারোহী শিশু কৃষ্ণে ধরি,
আনন্দের বারিধি ও ভরি, চুপে চুপে
ভুলে যাই সব জ্বালা আপনা পাশরি !
সেই পাদ-নখ-চন্দ্র নিমিষার্দ্ধ পাই,
ইহলোক, পরলোক কিছুই না চাই !
প্রবাসী স্বদেশী হবে !—এক পরিবার
সব নর নারী !—বিশ্ব একই সংসার !
কোথা মা ভারতি ? লয়ে অপূর্ব্ব অমিয়া,
দেখা দে মা, দেখা দে মা, জুড়াইয়া হিয়া !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

প্রয়াগধামে কমলাকান্ত

মারে কৃষ্ণ রাখে কে ? রাখে কৃষ্ণ মারে কে ? শ্রী ভীষ্মদেব নাই, সে নসীরাম নাই প্রসন্ন গোয়ালিনী নাই, বঙ্গদর্শন নাই, বঙ্গদর্শনের সম্পাদক নাই। এক মাত্র আমি—শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা কালপঞ্চ (Punch) মহাত্মার এই সব বিচিত্র রঙ্গ দর্শন করিতে করিতে জগন্নাথ, অবন্তী, দ্বারকা সেতুবন্ধ রামেশ্বর, কাশী, কাঞ্চী, বৈদ্যনাথ, বৃন্দাবন, নৈমিষারণ্য, বদরিকাশ্রম কেদারনাথ, বিন্ধ্যবাসিনী চিত্রকূট—সমস্ত ধাম, সন্ন্যাসীর গেরুয়াবস্ত্রে, পর্য্যটন করিয়া, এক্ষণে, এই বুড়া বয়সে, বিপুল চুল পাকাইয়া, মাঘমাসের কল্পবাসের উপলক্ষে, প্রয়াগধামে আসিয়া, শ্রীভরদ্বাজ ঋষির পুণ্যাশ্রমের অনতিদূরবর্ত্তী, মহল্লা কর্ণেলগঞ্জে, থানার সম্মুখে, একটি ক্ষুদ্র বাড়িতে আড্ডা গাড়িয়াছি। এ নগরটি অতি মনোরম, হিন্দুতীর্থের হিসাবে মোক্ষপ্রদ। হরি হে, আর

কত ঘুরাইবে ? বাসনা করিয়াছি, এই সুপবিত্র স্থলে কমলাকান্তী জীবনের শেষাঙ্কের অভিনয় করিয়া, যথাকালে, ত্রিবেণীসঙ্গমে, তনুত্যাগ করিব। হে ভক্তের বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীমধুসূদন, এ গরীব ব্রাহ্মণের মনোরথ পূর্ণ করিও। একবার সেই সুন্দর গানটা গাই—

"কি ধন লইয়ে, বল, থাকিব হে আমি ?
সবে ধন অমূল্য রতন, আমার হৃদয়ের ধন তুমি !
ওহে তোমারে লইয়ে, সংসার ছাড়িয়ে
পর্ণকুটীরও ভাল,
যখন তুমি, হৃদয়নাথ, হৃদয় কর হে আলো।"

কিন্তু তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে। আমি আমিষ ত্যাগ করিয়াছি; মাছ, মাংস, হংসডিম্ব ত্যাগ করিয়াছি; প্রাণধারণার্থে, আতপ তণ্ডুল, নিরামিষ ভিক্ষান্নই সম্বল করিয়াছি; কমলাকান্তী রসিকতাও, বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যার ন্যায় (হরি হে, এ দীর্ঘ নিশ্বাস, তুমি ছাড়া আর কে বুঝিবে ?) অন্তর্হিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি, এখানেও, বঙ্গসাহিত্যসেবীর হস্ত হইতে আমার নিস্তার নাই। কস্মিন্‌কালে গল্প লিখি নাই, (অপরস্মাৎ কিং ভবিষ্যতি ?) তথাপি গল্প লিখিতে হইল।

আমি বলিলাম "চাটুয্যে মহাশয়, গল্প লিখিবার জন্য যথেষ্ট রস কস্ চাই। আমার যা ছিল, যৌবনান্তে কপূরের মত, উবিয়া গিয়াছে।"

সুচতুর সাহিত্যসেবী সহাস্যে বলিলেন, "না ঠাকুর, কমলাকান্তী রস কি উবিয়া যাইবার বস্তু ? মৃগনাভির রেণুকণার মত তাহা বহু শতাব্দী, বহুশতাব্দীর পরেও, উন্মুক্ত-গবাক্ষ-দ্বার-কক্ষে, বাতাসকে সুরভিত করিয়া রাখে। ঊনবিংশ শতাব্দী গিয়াছে; এ বিংশশতাব্দীর ফুলের তোড়ায়, কমলাকান্তী সাহিত্য-বনতুলসীর সদগন্ধ ভুর্ ভুর্ করিয়া ছুটিতেছে !" কি আপদ ! এ কোথাকার লোক গা ! ইহার সুমোহন বাক্যচ্ছটায় কমলাকান্তও ভুলিল ! শুনিতে পাই, যে "প্রবাসী" মাসিক পত্রের এই সম্পাদক মহাশয়টি নাছোড়বান্দা প্রকৃতির লোক। যে ভদ্রলোক কস্মিন্ কালেও বাঙ্গালা লেখে নাই, তাহার কাছ হইতেও, মৃদুহাস্য হাসিয়া, পাঁচটা মিষ্ট কথা কহিয়া, লেখা আদায় করেন ! আমি অনুনয়, অনুযোগ, অনুরোধ, বিস্তর করিলাম। বলিলাম "আমি গল্প লিখিলে কমলাকান্তের মস্তিষ্করোগ এখনও সারে নাই, বলিয়া অনেকেই মধ্যমনারায়ণ তৈলের ব্যবস্থা করিবে।"

বৃথা ! বৃথা ! রামানন্দী আবদার অচল, অটল ! তাহারই ফলস্বরূপ, কমলাকান্তের "আদর্শকবি"র সৃষ্টি হইয়াছে।

আমি যে বাসায় আছি, তাহার প্রাঙ্গণে একটি আমড়া গাছ আছে। আমার মনে মনে বিলক্ষণ আশার সঞ্চার হইয়াছে যে এই তরুটিতে দাড়িম্ব ফলিবে আর আম পাড়িয়া খাইব। নচেৎ কমলাকান্তরূপ শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডে—টক্ হউক্, মিষ্ট হউক্—এ *Romance-রূপ অদ্ভুত ফলের উৎপত্তি কি প্রকারে হইল ? কাল-মাহাত্ম্য ! "A change came o'er the spirit of my dream."† কমলাকান্ত একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। Do I wake or sleep ?‡

শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা।

আদর্শ কবি

প্রথম পরিচ্ছেদ

সে বহুকালের কথা। তখন এ বিস্তীর্ণ স্বর্ণশস্যপ্রসবিনী ভারতভূমি যবন-পঙ্গপালে সমাচ্ছন্ন হয় নাই। অতিসমৃদ্ধ মথুরানগরীতে চন্দনদাস নামে এক শ্রেষ্ঠী আপনার ভার্য্যা ও এক মাত্র পুত্র হেমচন্দ্রের সহিত বাস করিত। চন্দনদাস প্রভূতধনশালী না হউক, তাহার বাণিজ্য-ব্যবসায়ে যথেষ্ট প্রাপ্তি ছিল; সংসারে কোন প্রকারের অভাব ছিল না। পরন্তু এই প্রকারে ধনপুত্রলক্ষ্মীলাভসত্ত্বেও চন্দনদাসের এক গুরুতর মনোবেদনার কারণ ছিল। চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক হেমচন্দ্র পিতার বাণিজ্যব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে তিলার্দ্ধ মন দিত না। গুর্জ্জর প্রদেশ কিম্বা সুদূর কর্ণাট হইতে বলীবর্দ্দসংযুক্ত বাণিজ্যশকট গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে, বালক হেমচন্দ্র একদৃষ্টে বলীবর্দ্দের লীলা ক্রীড়া গ্রীবাভঙ্গী নিরীক্ষণ করিত, কিন্তু কি কি দ্রব্য আসিল, কোন দ্রব্য কোন পণ্যসংস্থানশালায় রক্ষিত হইবে, তদুদ্দেশে যত্ন করা দূরে থাকুক, তাহার প্রতি কটাক্ষপাত পর্য্যন্ত করিত না।

---

* উপন্যাস।

† আমার স্বপ্নে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইল।

‡ আমি জাগ্রত কি নিদ্রিত ?

এ ছাড়া, হেমচন্দ্র বনিককুলকলঙ্ক ছিল। উপবীতধারী ব্রাহ্মণের ন্যায়, বালক হেমচন্দ্র সরস্বতীর সেবা করিত। যেথানে সামবেদ উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিতের মনোহর ঝঙ্কারে উচ্চারিত হইত, সেথানে মগ্ন, অবাক্, স্তম্ভিত হইয়া, দাঁড়াইয়া থাকিত। রাজসভায়, যথন রাজা নূতন শ্লোক, নূতন কবিতা, নূতন কাব্যরচনাকারী ও আবৃত্তিকারী সমবেত বিপ্রমণ্ডলীকে পারিতোষিক বিতরণ করিতেন, সে সময়ে, চন্দ্রমণ্ডলসন্নিহিত নক্ষত্রের ন্যায়, সহাস্য-বদনে কৌতুক দেখিত; জন্মাষ্টমী, দোলপূর্ণিমা, রাধাষ্টমী উপলক্ষে, যথন মথুরার পাণ্ডারা রাত্রি জাগিয়া গান গাইত তথন তাহাদিগকে উৎকোচ প্রদান করিয়া, বালক হেমচন্দ্র তাহাদিগের দ্বারায় স্বরচিত সঙ্গীত গাওয়াইত, ও সেই ঐকতানিক সঙ্গীত-সাগরে দেহ-মন-আত্মা ভাসাইয়া, মূর্ত্তিমান সঙ্গীত হইয়া, অতুল্য আনন্দ উপভোগ করিত।

একমাত্র পুত্র বলিয়া হেমচন্দ্র পিতার বিরাগভাজন হয় নাই ; কিন্তু সে বুঝিতে পারিত, তাহার ঈদৃশ আচরণে পিতার চিত্ত মর্ম্মাহত। শ্রেষ্ঠীঘরে, রাজসভায়, রাজোদ্যানে, কোন বণিকপুত্রকন্যার বিবাহোৎসবে, কোন নিমন্ত্রণ স্থলে, কোন আনন্দ-পর্ব্বের উপলক্ষে, যথন তাহার সমবয়স্ক প্রৌঢ় বণিকেরা স্মেরমুখ হইয়া চন্দনদাসকে বলিত, "আর নয়, শাসন করা উচিত তোমার পুত্র মথুরার বণিক-সম্প্রদায়ের নাম ডুবাইতে বসিয়াছে," তথন লজ্জা-খেদ-আশঙ্কা জর্জ্জরিত চন্দনদাস, গৃহে প্রত্যাগত হইয়া ভার্য্যাকে বলিত, "আর নয়, গৃহিণি ইহার প্রতীকার করা আবশ্যক!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রতিকার কে করিবে ? হায়, মর্ত্ত্যে কি এ ব্যাধির ঔষধ বা চিকিৎসা আছে ! যখন কারণ-বারিধির উপকূলে বসিয়া, হিরণ্যগর্ভ বিরাটপুরুষ, অসংখ্য অসংখ্য জীবপুঞ্জকে সৃজন করিয়া চন্দ্রলোকে, বুধলোকে, শনৈশ্চরে, মর্ত্ত্যলোকে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কবির আত্মা পৃথিবীতে আসিতে অতিশয় অসম্মতি ও বিরক্তি প্রকাশ করিল। এক কথায়, সে বাঁকিয়া বসিল আর নারাজ হইয়া বলিল, "আর সব কর, ঠাকুর কিন্তু মনুষ্যলোকে আমাকে পাঠাইও না। সেথানে দুঃখ আছে, দরিদ্রতা আছে, শোক আছে ব্যথা আছে, বিরক্তি আছে, নিন্দা আছে, গ্লানি আছে কটাক্ষ আছে, ক্রোধ আছে, বিদ্রূপ আছে ঘৃণা আছে, সে স্থানে আমি যাইব না।"

বিধাতা তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "যাও বৎস। তোমার সহিত এক অদ্ভুত অসাধারণ সামগ্রী দিতেছি। ইহা সর্ব্বগ্লানিনিবারক। ইহার নাম 'জিদ'। ইহার বলে তুমি ঘৃণা, ভ্রূকুটি, শোক, মোহ, দুঃখ, দারিদ্র্য, সকল ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবে, ও চিরপ্রফুল্ল, সদানন্দ থাকিবে, মৃত্যুও তোমাকে বিভীষিকা দেখাইতে পারিবে না।"

কবি তখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "হাঁ ঠাকুর যাইব।"

বালক কবি হেমচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠিদম্পতি অনেক সমঝাইলেন, অনেক বুঝাইলেন। "কবিতা, দোঁহা গান শ্লোক রচনা করা বিপ্রোচিত কার্য্য। উহা বণিকপুত্রের অবিধেয় ও অনধিকার চর্চ্চা। উহাতে লক্ষ্মী ছাড়ে ও শনৈশ্চরের অশুভ দৃষ্টি হয়।"

বৃথা ! বৃথা ! বরং চন্দ্রগ্রহকে বলিতে পার "দেব তুমি মেদিনী-চক্র-পরিভ্রমণ পরিত্যাগ কর।" সুধাকর তোমার বচনে কর্ণপাত করিলেও করিতে পারেন ; কিন্তু কবিকে কবিতা ও কল্পনার রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টা করিও না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন অগ্নি দাউ, দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, পিতামাতার অনুরোধে ও উপদেশে কবিতার প্রতি হেমচন্দ্রের অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সে কখন নন্দগ্রামে গিয়া, কখন গিরিগোবর্দ্ধনে, কখন গোকুলে, কখন পরিহিত-নীল-মেখলা মথুরার রাজোদ্যানে বসিয়া, গাথা, কবিতা, শ্লোক, ছন্দ, সঙ্গীত রচনা করিত। কবি-প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে তাহা আঘাত প্রাপ্ত হইলে পুরুভুজের ন্যায় সমধিক শ্রীসম্পন্ন হয়।

আমার এক বন্ধু টেনিসনের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "Tennyson was no poet. He was a fraud upon the people"—"টেনিসন কবি ছিলেন না। সাধারণ জনসমাজের উপর তাঁহার কবি-আখ্যা প্রতারণার জালস্বরূপ ছিল।" অবশ্য তোমরা তাঁহার "The poet"*

---

* কবি।

নামক ক্ষুদ্র কবিতাটি পাঠ করিয়াছ! টেনিসন যে উচ্চদরের কবি ছিলেন না, তাহা ইহা হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে কবিতাটি অধিকাংশস্থলেই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে। যথা মূলে আছে—

"The poet in a golden clime was born,
With golden stars above,
Dowered with the hate of hate, the scorn of scorn,
The love of love." *

ইহার শেষে আরও দুটি ছত্র বসান উচিত ছিল। যথা

Armoured with the lunacy of lunacy,
And mateless contumacy. †

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"যমুনার তটে কত বেজেছে বাঁশরী!
শুনি মুরলীর ধ্বনি, গোপিনী প্রমাদ গণি,
কতবার ব্রজবনে উঠেছে শিহরি!
স্মরি রাধা প্রিয়ধনে কত যে কেঁদেছে মনে,
দুঃখাগ্নি জ্বলেছে তার হৃদয় ভিতরি!
কতবার সখীসনে মোহনীয়া আশা-বনে
বহায়েছে চন্দ্রাননী চিন্তার লহরী!"

একদিন, শ্রাবণমাসের সায়ংকালে, গোবিন্দবর্ণচোর নব জলধরপুঞ্জের শোভায় আকৃষ্ট হইয়া, উপরিলিখিত স্বরচিত কবিতা-পংক্তি আবৃত্তি করিতে করিতে, মথুরার পিয়াল-কদম্ব-জম্বু-ক্ষীরদ্রুম-সুশোভিত, কালিন্দী-পাদ-পদ্ম-সুরভিত বনদেবতা-অধিষ্ঠিত তরুকুঞ্জে বসিয়া, বালক হেমচন্দ্র, আনন্দে বিভোর হইয়া, অলকার সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিল;—লীলাময়ী, ক্রীড়াময়ী দেবাঙ্গনাদিগের কঙ্কণাঘাতে দরদর ধারায় বিগলিত পারিজাত-দ্রুমের অমৃতময়ী ক্ষীরধারা পান করিতেছিল ও ভাবিতেছিল, "এই অপূর্ব্ব বিশ্ব অপূর্ব্ব সুখের আধারভূমি ও তাহার একমাত্র অধীশ্বর হেমচন্দ্র।" সহসা তাহার স্বপ্ন, কল্পনা অপসারিত হইল! সে অবাক্ স্তম্ভিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌরভের আঘ্রাণ পাইল। যেন উষার রূপে মুগ্ধ হইয়া সহসা অসংখ্য গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়া মেদিনীকে ক্ষিপ্তপ্রায় করিয়া তুলিল; যেন নবদুর্গার আগমনে নগরের সমস্ত শেফালী-বৃক্ষ, পরামর্শ করিয়া, এক সঙ্গে ফুটিয়া উঠিল; যেন বসন্তে বসন্ত-লক্ষ্মীর শুভ উৎসব-উপলক্ষে কুসুমিত আম্রকুঞ্জ অসংখ্য অসংখ্য ফুলের তোড়া সাজাইয়া রাখিল! তখন বর্ষার জলসিক্ত জম্বুফলগুলি আরও স্নিগ্ধ শ্যামল শোভা ধারণ করিল; এক রাশ ময়ূর ময়ূরী অপূর্ব্ব বর্হরাশি বিস্তার করিয়া হেমচন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বকুল পুষ্পের সুবাস ফুটন্ত কদম্বের সৌরভের সহিত মিশ্রিত হইয়া গর্ভিণী ধরিত্রীর দোহদ-আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে লাগিল! যমুনার সদা-নৃত্যশীল তরঙ্গমালা আরও রঙ্গভঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিল।

ধীর পাদবিক্ষেপে হেমচন্দ্রের সম্মুখে এক অপরূপ অদৃষ্ট-পূর্ব্ব দেবী মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। বালক হেমচন্দ্র ভয় পাইল না; কিন্তু মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, স্বপ্নোত্থিতের ন্যায়, চিত্রিতের ন্যায়, নিষ্পন্দনেত্রে সেই ত্রিলোকনয়নানন্দ দেবী-মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তোমরা কি কখন কোন দেব-নারীর, কোন আরাধ্যা দেবতার অলোকসামান্য লাবণ্য মনে কল্পনা করিয়া অবাক্ স্তম্ভিত হইয়াছ? যে রূপ দেখিলে রসনা হইতে বাক্য স্ফুরিত হয় না, যে রূপ দেখিলে সর্ব্ব ইন্দ্রিয় চক্ষুরিন্দ্রিয়ে লয় ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়, যে রূপ দেখিলে অকস্মাৎ অভূতপূর্ব্ব শান্তি ও আত্মপ্রসাদ আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে; যে রূপ দেখিলে অতি বড় পাষণ্ডের মনেও ভক্তি-রসের সঞ্চার হয়; যে রূপ দেখিলে পা জড়াইয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে ও বলিতে ইচ্ছা করে "মা, এত দিনে এ অধম পুত্রের মনুষ্যজীবন সার্থক হইল!" এ সেই দেবী-মূর্ত্তি!

দেবীর সাজসজ্জা কিছুই ছিল না। গলায় অরবিন্দের মালা, এক হস্তে একটি নীল পদ্ম ও অন্য হস্তে একটি সুন্দর বীণা। কিন্তু তবুও সে অনিন্দ্য মুখশ্রীর উপমা নাই। তাঁহারই প্রসাদে কোন কবি গাহিয়াছেন—

* সোনার দেশে কবির জন্ম হইয়াছিল। সেখানে আকাশে সোনার নক্ষত্র ফোটে। কবি নিজ ভাগ্যে যৌতুকস্বরূপ কি পাইয়াছিল জান? —ঘৃণার প্রতি ঘৃণা, অবজ্ঞার প্রতি অবজ্ঞা ও প্রীতির প্রতি প্রীতি, মহাপ্রীতি!

† কবির বর্ম্ম কি ছিল?—চূড়ান্ত বাতুলতা ও তুলনারহিত এক-গুঁয়ামি।

" একি নয়নের ভুল! হইয়ে আকুল,
এলোচুলে, পরি এক আটপৌরে সাড়ি
থাক যবে, দুই কানে দুটি ক্ষুদ্র দুল,
দুই হাতে চারি গাছি চুড়ি বেলোয়ারি!
একি গো আঁখির দোষ! হেন বোধ হয়,
বারাণসী চেলী তব সুবেশে আলোকে,
ঝকমকে সিঁথি, কাঞ্চী, কঙ্কণ, বলয়,
জ্বলন্ত জোনাকী পাঁতি ফুটন্ত অশোকে!"

তাঁহার স্নিগ্ধ মুখকান্তি দেখিলে হঠাৎ চিত্তের বাতায়ন ও গবাক্ষ ও গুপ্তদ্বার খুলিয়া যায়! হৃদয়ের গূঢ়তম, অন্তরতম অন্ধকার প্রদেশ -- যাহা কখন প্রদীপের মুখ দেখে নাই -- সেখানেও, এক খণ্ড সুশীতল জ্যোৎস্না আসিয়া শেফালী কুসুমের মত হাসিতে থাকে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দেবী সহাস্যবদনে বালক হেমচন্দ্রের সম্মুখে অগ্রসর হইয়া, পরম স্নেহে তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন ও বলিলেন --

"বৎস, হেমচন্দ্র! আমি কবিতা ও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আমি তোমার ভক্তি ও অনুরাগে প্রীত হইয়াছি। তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব।"

বালক কবি নির্ভীকচিত্তে বলিল, "মাতঃ, আমি কিছুই চাই না। তুমি নিত্য আমাকে এই রূপে দর্শন দিয়া আমার নয়ন-মন-জীবন চরিতার্থ করিও।"

দেবী সহাস্যবদনে বলিলেন, "বৎস, এ বড় কঠিন কথা। কিন্তু আমার কাছে যদি তুমি এক প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি নিত্য আসিয়া দর্শন দিতে ক্লেশ অনুভব করিব না।" হেমচন্দ্র বলিল, "দেবী, আজ্ঞা করুন, দেবীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

দেবী বলিলেন, "বৎস, বল, তুমি কায়মনঃপ্রাণে ভক্তিভাবে আমাকে নিত্য আহ্বান করিবে।"

বালক বলিল, "নিত্য আহ্বান করিব।" দেবী বলিলেন, "না; বল, নিত্য কায়মনঃপ্রাণে ভক্তিভাবে আহ্বান করিব।" বালক বলিল, "নিত্য ভক্তিভাবে আহ্বান করিব।"

দেবী বলিলেন, "না; বল, নিত্য কায়মনঃপ্রাণে ভক্তিভাবে আহ্বান করিব।" বালক বলিল, "দেবি, নিত্য কায়মনঃপ্রাণে ভক্তিভাবে আহ্বান করিব।"

দেবী সহাস্যবদনে বলিলেন, "তথাস্তু। আমি নিত্য আসিয়া দর্শন দিব।" এই বলিয়া দেবী সেই ঝিল্লির মুখরিত সন্ধ্যার জলদনিবিড় অন্ধকারে অন্তর্হিত হইলেন।

সহসা হেমচন্দ্র শুনিতে পাইল, যেন শত শত বী[ণা] মধুরঝঙ্কার স্বরে বাজিয়া উঠিল। হেমচন্দ্র আনন্দে অধী[র] হইল; তাহার হৃদয় অননুভূতপূর্ব্ব আহ্লাদে নাচি[য়া] উঠিল।

সে নৃত্য দেখিয়া, আহ্লাদিনী প্রকৃতি নৃত্যশীল হই[য়া] উঠিল। বর্ষার কোকিল কুহু কুহু শব্দে নাচিয়া উঠিল কদম্বের শাখা, কক্ষে শিশুপুষ্প লইয়া নাচিয়া উঠিল সন্ধ্যার অন্ধকার-অবরোধে-লুক্কায়িত-কাঞ্চনদেহা অবগা[হন]কারিণী মথুরা-যুবতীর মৃণ্ময়ী কলসী ভাসাইয়া দিয়া, গা[ন] করিতে করিতে, যমুনা-তরঙ্গ নাচিয়া উঠিল। পাগ[ল] নৈশ বায় বিজাতীয় ভাষায় গাহিয়া উঠিল—

"O the music, the wild music,
The wild music of waves" *

(ক্রমশঃ)
শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা।

অজণ্টা-গুহা-চিত্রাবলী

বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যগণের মতে জীবন দুঃখময়। দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে সংসারত্যা[গ] এবং চিরনিষ্ক্রিয়তার প্রয়োজন। নির্জ্জনে জনকোলাহল হইতে দূরে বাস বৌদ্ধধর্ম্মানুমোদিত পবিত্র জীবনের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। শুধু বৌদ্ধধর্ম্ম কেন, যে কোন ধর্ম্মে সংসা[র] বিরাগ সন্ন্যাস, বা কৃচ্ছ্রসাধনের বিধি আছে, তদনুমোদি[ত] সাধুজীবন যাপন করিতে হইলেই লোকালয় হইতে দূরে যাওয়া আবশ্যক। এইরূপে যাহারা জীবনযাপ[ন] করিতেন, তাঁহারা প্রথমতঃ অরণ্যে তরুতলে বাস করিতেন। তৎপরে স্বভাবজাত গিরিগুহা তাঁহাদের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠে। ভারতবর্ষের অন্তর্বর্ত্তী ও সীমাস্থিত

* অহো সেই বিচিত্র সঙ্গীত! - সেই সুবিচিত্র উন্মাদ সঙ্গীত!— তরঙ্গবৃন্দের সেই উদ্দাম সঙ্গীত!

পর্ব্বতমালার গুহাবলী সাধু তপস্বিগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল। কালক্রমে কোথাও বা স্বভাবজাত গুহাগুলি কৃত্রিম উপায়ে অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন ও অধিকতর বাসোপযোগী করা হইয়াছিল, কোথাও বা সমগ্র গুহাগুলিই মানুষ কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছিল। এই সকল আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম গুহা অধিকাংশ স্থলে স্থপতি, ভাস্কর ও চিত্রকরগণ দ্বারা নানা প্রকারে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। এইরূপ গুহা ভারতবর্ষের নানা স্থানে দৃষ্ট হয়। কিন্তু সকল দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে অজণ্টা-গুহাবলীকেই জগতে অতুলনীয় বলিয়া প্রশংসা করিতে হয়। এখানেই গুহাখননবিদ্যা উৎকর্ষের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল।

গুহানির্ম্মাণের স্থান নির্ব্বাচনে বৌদ্ধগণ অনেকগুলি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিতেন। সহজে কাটিয়া খনন করা যায় এরূপ প্রস্তর নির্ব্বাচন ত তাঁহারা করিতেনই, অধিকন্তু অধিগম্যতা; যাহা হইতে সকল ঋতুতে জল পাওয়া যায়, এরূপ কোনও জলাশয়ের সান্নিধ্য, বাণিজ্যবর্ত্মের সামীপ্য, প্রভৃতির দিকেও লক্ষ্য রাখিতেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল জীবনধারণের সুবিধাই দেখিতেন না। তাঁহাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যানুভবশক্তিও প্রবল ছিল।

ভারতবর্ষের অধিকাংশ বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু গুহার সমীপবর্ত্তী প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। কিন্তু স্বভাবের শোভা ও নিভৃততায় অজণ্টার সহিত আর কোনও গুহার তুলনা হয় না। স্বাভাবিক শোভার সহিত বৌদ্ধগণের ধর্ম্মজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। যাঁহারা ধ্যানপরায়ণ হইয়া উন্নতজীবন-লাভপ্রয়াসী হইতেন, তাঁহাদের নিকট, জলপ্রবাহের উচ্চ বা মৃদুধ্বনি ক্রীড়াশীল সমীরণের করস্পর্শে বৃক্ষপত্রের সর সর শব্দ, আকাশপথে মেঘের যথেচ্ছ সঞ্চরণ, তরুলতাগুল্মের রহস্যময় জন্ম ও বৃদ্ধি, এবং অরণ্যচারী জীববৃন্দের বিচিত্র জীবন, শাক্যসিংহকর্ত্তৃক বিবৃত মহাধর্ম্মের স্তবগীতিস্বরূপ প্রতীত হইত। প্রস্তর কাটিয়া যে মন্দির বা গৃহ প্রস্তুত হয় তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী আবাস। কিন্তু বোধ হয় বৌদ্ধগণ যে কেবল স্থায়িত্বের জন্যই গুহানির্ম্মাণ করিতেন, তাহা নয়; বুদ্ধ এবং তাঁহার শিষ্যগণ দেশভ্রমণকালে স্বাভাবিক গুহাতে বাস করিতেন বলিয়াও, বোধ হয়, বৌদ্ধগণ গুহানির্ম্মাণে এরূপ আগ্রহ ও উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। এই প্রকার চৈত্য, বিহার ও সঙ্ঘারামের সুবিধা বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। ভিক্ষুগণের পক্ষে বর্ষাকালে দেশভ্রমণ নিষিদ্ধ ছিল। তাঁহারা প্রথমে, বর্ষাযাপন জন্য, কিম্বা গ্রীষ্মকালে শীতলস্থানে আশ্রয়লাভার্থ, এইসকল গুহা ব্যবহার করিতেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। অজণ্টাগুহাবলী পূর্ব্বে মানুষের বাসের সম্যক্ উপযোগী ছিল। তাহাদের ছাদ দিয়া জল পড়িত না। বর্ষার সময় বন্যা হইলে বন্যার জলও গুহার অনেক নীচে থাকে। এখনও দারুণ গ্রীষ্মের সময়, যখন নিকটবর্ত্তী ফর্দ্দাপুর গ্রামে ছায়ায় ১০৮ ডিগ্রি উত্তাপ হয়, তখনও গুহাগুলির অভ্যন্তর অতিশয় আরামদায়ক ও শীতল থাকে।

অজণ্টাগ্রাম গুহাগুলি হইতে ৪ মাইল দূরে। ফর্দ্দাপুর গুহাগুলি হইতে ৩॥০ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান্ পেনিনসুলার রেলওয়ে লাইনের পাচোরা ষ্টেষন হইতে ৩০ মাইল দূরে শেষোক্ত গ্রাম অবস্থিত। এই ত্রিশ মাইল কাঁচা রাস্তার উপর গরুর গাড়ী করিয়া যাইতে হয়।

উর্দ্ধ্ব হইতে দেখিলে অজণ্টাগুহাবলীর [১ম চিত্র] দৃশ্য কিরূপ দেখায় আমরা তাহার একটি চিত্র দিলাম। গুহাগুলি একটি গভীর সঙ্কীর্ণ গিরিদ্রোণীতে প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান শৈলগাত্রে খোদিত। উহার আকার কতকটা ঘোড়ার নালের মত। শৈলের পাদদেশ ধৌত করিয়া একটি নদী আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা সামান্য একটি চিত্র দিলাম; কিন্তু কোনও চিত্র আমাদের মনে এই গিরিদ্রোণীর আরণ্য শোভার সম্যক্ ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারে না, বিশেষতঃ যখন বর্ষাকালে সর্ব্বত্র বৃক্ষলতাগুল্ম সতেজ ও পত্রপুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠে। গুহাবলীর অদূরে একটি জলপ্রপাত আছে। উহা একটি হইতে আর একটিতে লাফ দিয়া দিয়া সাতটি নৈসর্গিক প্রস্তর সোপান ও প্রত্যেকের নিম্নস্থ জলাশয় অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত; এইজন্য উহার নাম সাতকুণ্ড। সর্ব্বনিম্ন কুণ্ডটিতে সম্বৎসর জল থাকে। সম্ভবতঃ গুহাবাসী যতিগণ এখান হইতেই জল লইয়া যাইতেন।

বর্ত্তমানকালে সাধারণ লোকে গুহাগুলির প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। কেবল মকরসংক্রান্তির সময় এখানে যখন

প্রথম চিত্র— অজন্টার দৃশ্য।

মেলা হয়, তখন লোকে সাতকুণ্ডে স্নান করিয়া আমোদ আহ্লাদ করে, নানা প্রকার খেলনা ও অন্যান্য সামান্য দ্রব্য ক্রয় করে। মেলা উপলক্ষে বন্দুক বা ফটকা আওয়াজ করিলে পার্ব্বত্য মধুমক্ষিকাগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সমাগত মনুষ্যগণকে আক্রমণ করে। তখন সকলে ভয়ে প্রাণ লইয়া পলাইবার পথ পায় না। কখনও কখনও কোন জটাধারী ভস্মমাখা, গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী ঘুঙুর লাগান লাঠি হাতে করিয়া আসিয়া এই সকল গুহাতে কিছুদিন বাস করেন, এবং গুহাগাত্রে অঙ্কিত সিন্দূরবর্ণ ত্রিশূল চিহ্ন ও রন্ধনের ধূম দ্বারা গুহার চিত্রগুলি নষ্ট করেন।

গুহা কথাটি শুনিয়া অনেকে হয়ত ভাবিবেন যে উহার কক্ষগুলি সঙ্কীর্ণ। বাস্তবিক কিন্তু তাহা নয়। এক একটি গুহা এক একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকার সমান বৃহদায়তন। অজণ্টায় সর্ব্বশুদ্ধ ২৯টী গুহা আছে। তাহাদের সকলগুলির আয়তন বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে চতুর্থ গুহাটীর গভীরতা অর্থাৎ দ্বারদেশ হইতে পর্ব্বতাভ্যন্তরে শেষ দেওয়াল পর্য্যন্ত বিস্তৃতি প্রায় ১০০ হাত। ইহার মধ্যে দুই একটা দ্বিতল গুহাও আছে। গুহাগুলির দেওয়াল, স্তম্ভ, দ্বারদেশ, ও ছাদ নানাবিধ খোদিত ও চিত্রিত মূর্ত্তি, দৃশ্য, লতাপাতা ও ফুলে সুশোভিত। অনেক গুহার গাত্রে খোদিত লিপিও দেখা যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতাব্দীর মধ্যে এই গুহাগুলি নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। কোন কোন গুহাতে কৃত্রিম আলোক ব্যতীত চিত্রগুলি দেখা যায় না। সুতরাং সেগুলি নিশ্চয়ই কৃত্রিম আলোকের সাহায্যেই চিত্রিত হইয়া থাকিবে। ভারতবর্ষীয় গ্রীষ্মে, যথেষ্ট বায়ুচলাচলবিহীন স্থানে এইরূপ অবস্থায় কার্য্য করা যে কিরূপ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচায়ক তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়। বোধ হয় এখানে পূজাদি প্রদীপালোকের সাহায্যে নির্ব্বাহিত হইত। ঊনত্রিংশ গুহায় দীপাধার ঝুলাইবার জন্য কয়েকটি শক্ত লোহার কড়া আছে। পূর্ব্বে গুহাগুলির দ্বার ও জানালায় কপাট ছিল। আমরা এই প্রবন্ধে কেবল চিত্রগুলিরই সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দিব। খোদিত ছবির কথা বলিব না। বর্ত্তমানে এই ছবিগুলির অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে। কোনটীই সম্পূর্ণ নাই। কোথাও চূণ খসিয়া পড়িয়াছে, কোথাও রং ফিকা হইয়া গিয়াছে, কোথাও বা মানুষের হাত যতদূর পৌঁছে, ততদূর পর্য্যন্ত কত নরাধম চাঁচিয়া দাগ কাটিয়া দিয়াছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া ইহাতে পার্ব্বত্য কপোত, মধুমক্ষিকা ও চর্ম্মচটিকাদি বাস করায় এবং পাথরের ফাটল দিয়া জল পড়ায়, ছবিগুলি প্রায় নষ্ট ও লুপ্তশ্রী হইয়া গিয়াছে। তথাপি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অজণ্টা গুহাচিত্রাবলী অপেক্ষা অনেক আধুনিক ছবি শতবিধ যত্নসত্ত্বেও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, অথচ এগুলি এখনও সম্পূর্ণরূপে লয় পায় নাই। কতকগুলি ছবি গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নানা বর্ণে বৃহদাকারে ক্যাম্বিসের উপর নকল করা হয়। তাহারই কতকগুলির নকল নানা বর্ণে এবং কয়েক শত কেবল কৃষ্ণবর্ণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের ছবিগুলি এই লুপ্তপূর্ব্বশ্রী গুহাচিত্রগুলির তৃতীয় নকলের কাল কালীতে মুদ্রিত নকল। তাহাতে আবার আমাদের দেশে মুদ্রাঙ্কনবিদ্যা এখনও উৎকর্ষ লাভ করে নাই। সুতরাং আমাদের ছবিগুলি হইতে দর্শকগণ মূলের সামান্য আভাসমাত্র পাইবেন। অনেক য়ুরোপীয় শিল্পী এই চিত্রগুলির প্রশংসা করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের স্যর জামসেদজী জীজীভাই শিল্পবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ গ্রিফিথস সাহেবের মতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"After years of careful study on the spot, I may be forgiven if I seem inclined to esteem the Ajanta pictures too highly as Art. In spite of its obvious limitations I find the work so accomplished in execution, so consistent in convention, so vivacious and varied in design and full of such evident delight in beautiful form and colour that I cannot help ranking it with some of that early Art which the world has agreed to praise in Italy." "………these old Buddhist artists, who thoroughly understood the principles of decorative art in its highest and noblest sense."

অজণ্টার গিরিদ্রোণীতে অগণ্যযুগ ব্যাপিয়া যে স্বভাবজ সুদৃঢ় শৈলপ্রাকার দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলে, তবে এই বৌদ্ধ গুহানির্ম্মাতাদিগের অসাধারণ পরিশ্রম, শিল্পনৈপুণ্য, অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় ভাবিলেও আমাদের মনে

বৌদ্ধদিগের মৃদু ও শান্ত কর্ম্মবিমুখতার কথা মনে হয়। কিন্তু অন্ততঃ অজণ্টা গুহাবলীতে আমরা বৌদ্ধগণের ভিন্ন প্রকার গুণের পরিচয় পাই। এখানে তাঁহারা যেন বাধাবিঘ্নকে অবজ্ঞাবিমিশ্র আস্পদ্ধার সহিত যুদ্ধে আহ্বান করিয়া পরাজিত করিয়াছিলেন। বৃহৎ ও মহৎ সংকল্পের সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে যে মানসিক সাহসের প্রয়োজন, তাঁহারা এখানে তাহারও পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু চিত্রগুলির সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া দিলেও আমরা তৎসমুদয় হইতে অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারি। এই চিত্রগুলির সাহায্যে আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমবিকাশের আলোচনা করিতে পারি। অনেকগুলিতেই বুদ্ধ মানবারাধ্য দেবতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, কিন্তু এমন অনেক ছবিও আছে যাহাতে তাঁহাকে আর দশ জন মানুষের মধ্যে এক জন হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে দেখা যায়। তাঁহার জন্ম, শৈশবলীলা, বিদ্যাশিক্ষা, গৃহত্যাগ, মার* কর্ত্তৃক পরীক্ষা, নানাস্থানে নানাভাবে ধর্ম্মপ্রচার, নির্ব্বাণলাভ, প্রভৃতি তাঁহার জীবনের নানা ঘটনা ও কার্য্য চিত্রগুলিতে পরিদৃষ্ট হয়। এই চিত্রগুলি কোথাও বা বুদ্ধের প্রচলিত জীবনচরিতে বর্ণিত বৃত্তান্তের সমর্থন করে, কোথাও বা বৃত্তান্তের দুর্ব্বোধ অংশ সকল সুবোধ করিয়া তুলে, আবার কোথাও বা প্রচলিত জীবনচরিতে অপ্রাপ্য ঘটনা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। বৌদ্ধমতে জীবাত্মা নানা জন্মে নানা জীবদেহ ধারণ করে। বুদ্ধদেব নিজেও তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যে যে রূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং সেই সেই জন্মে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তৎসমুদয় জাতক নামধেয় গল্পগুলিতে বিবৃত আছে। অজণ্টাগুহার অনেক চিত্র এই সকল জাতকসম্বন্ধীয়। কিন্তু চিত্রগুলি হইতে শিক্ষণীয় বিষয়ের এইখানেই পরিসমাপ্তি নহে।

রাজগণের জন্ম সিংহাসনারোহণ ও মৃত্যুর তারিখ, যুদ্ধবিগ্রহের বৃত্তান্ত, ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের উত্থান ও পতন এই সকল ইতিহাসের অস্থিপঞ্জর বা কঙ্কালমাত্র। ইতিহাসকে রক্তমাংসসমন্বিত ও সজীব করিয়া তুলিতে হইলে অন্য অনেক উপাদানের প্রয়োজন। এই সকল উপাদান এরূপ হওয়া চাই, যে তাহার সাহায্যে আমরা অতীতকে কল্পনার সাহায্যে মানসনেত্রের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারি। পুরাকালে নরনারী কি খাইত, কি পরিত, কেমন করিয়া বেশভূষা করিত, প্রেমালাপ করিত, ঝগড়া করিত, রন্ধন করিত, ক্রয় বিক্রয় করিত শিকার করিত, আমোদ

২য় চিত্র।

আহ্লাদ করিত, গান ও নৃত্য করিত, [২য় চিত্র] কি কি জিনিষ প্রস্তুত করিতে জানিত, নানাবিধ শিল্পে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহাদের সামাজিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার ব্যবহার কিরূপ ছিল, যুদ্ধবিগ্রহ ও বাণিজ্যকার্য্য কিরূপে সংসাধিত হইত, অস্ত্রশস্ত্র, গৃহসজ্জা কিরূপ ছিল, বিদেশের সহিত কতদূর এবং কি প্রকার সম্বন্ধ ও আদান প্রদান ছিল, প্রভৃতি বিষয় জানিতে পারিলে তবে আমাদের পুরাকালের জ্ঞান সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। অজণ্টাগুহাচিত্রাবলীর সাহায্যে আমরা এইরূপ অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারি। যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-
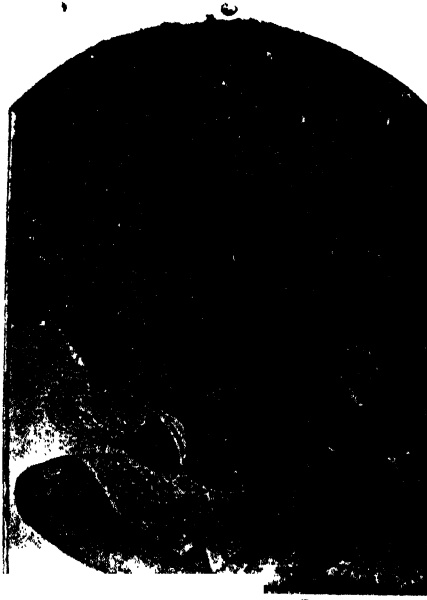
৩য় চিত্র।

ধারণা ছিল তাহাও আমরা অজণ্টাচিত্রাবলী হইতে জানিতে পারি। আরও যে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, আমরা ক্রমে ক্রমে তাহার কিয়দংশের উল্লেখ করিব।

যে সকল চিত্রে জনসংহতি বুদ্ধের আরাধনা ও উপাসনা

৪র্থ চিত্র।

করিতেছে, তৎসমুদয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই সজীব প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব আছে, প্রত্যেকের মুখভাব, অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতিতে বিশেষত্ব আছে অন্য যে সকল চিত্রে বহুলোকের সমাবেশ আছে, তাহাতেও প্রত্যেকের কিছু না কিছু স্বতন্ত্র কার্য্য দেখান হইয়াছে; কেবল কতকগুলা কাঠের পুতুলের মত মানুষ সাজাইয়া দেওয়া হয় নাই। গ্রিফিথ্‌স্‌ সাহেবের মত আমরা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। ফর্গুসন সাহেব বলেন যে অজণ্টাচিত্রগুলি আধুনিক ইউরোপীয় চিত্রের সমতুল্য নহে কিন্তু সেগুলি যে যুগে চিত্রিত হইয়াছিল, তাৎকালিক ইউরোপীয় চিত্র অপেক্ষা নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট। গ্রিফিথ্‌স্‌ বলেন—

"The Ajanta workmanship is admirable; long subtle curves are drawn with great precision in a line of unvarying thickness with one sweep of the brush, both on the vertical surface of walls and on the more difficult plane of the ceiling, showing consummate skill and manual dexterity"

৫ম চিত্র।

ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে অজণ্টাচিত্রগুলির কতকগুলি বিশেষত্ব (peculiarity) আছে। আমাদের দেশে পুরাকাল হইতে আকর্ণবিস্তৃত অর্থাৎ পটোলচেরা

৬৮ চিত্র

অজন্টাচিত্রগুলি অশ্লীল। বস্তুতঃ চিত্রগুলিতে অশ্লীলতার কোন গন্ধ নাই। হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরুষমাত্রেরই মালকোঁচা মারিয়া ধুতি পরা নারীগণের পরিচ্ছদও অধিকাংশ স্থলে তাহাই কেহ কেহ সাড়ী-পরিহিতা। ধুতি ও সাড়ী প্রায়ই ডুরিয়া। স্ত্রী পুরুষ যাহারা কাছা দিয়া কাপড় পরিয়াছে, তাহাদের ধুতি উরুর নীচে নামে নাই। রাজা প্রজা সকলেরই এই বেশ। মহারাষ্ট্রদেশে এখনও স্ত্রীলোকেরা কাছা দিয়া কাপড় পরে। কেশ বিন্যাসের রীতি যে কত প্রকার ও কি বিচিত্র, বর্ণনা করা যায় না। আমাদের দেশে ফিরিঙ্গী খোঁপা চলিয়াছে। যাঁহারা প্রাচীন জিনিষ ভাল বাসেন তাঁহারা একবার অজন্টা খোঁপা চালাইবার চেষ্টা করুন না। জঙ্গলী মেয়েদের চিত্রে চুলে নানাপ্রকার ফিতা ও ময়ূরপালক দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই চিত্রগুলিতে বুদ্ধদেবের জীবনের অধিকাংশ ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। বুদ্ধের সমুদয় ছবিতে কানের নিম্নভাগ লম্বা দেখা যায়। কেহ বলেন বুদ্ধের কান স্বভাবতঃ কতকটা এই প্রকার ছিল। কেহ কেহ বলেন তৎকালে কানের ঐ অংশে ভারী অলঙ্কার পরিবার রীতি থাকায় কাণ ঐরূপ হইয়া যাইত। এই রীতি এখনও আছে। অজন্টার একটি চিত্রে একজন পুরুষ দুই কাণে দুইটী ইন্দুরাকৃতি গহনা পরিয়াছে দেখা যায়।

জঙ্গলী লোকদের মুখাবয়ব, অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদ অজন্টায় সুচিত্রিত হইয়াছে। এই সকলের সহিত বর্ত্তমান গোণ্ড ও ভীলদিগের চেহারা ও পরিচ্ছদাদির অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। সাসানীয় বা প্রাচীন পারসিকদিগের যে সকল চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে শিল্পিদিগের মানবচরিত্র জ্ঞান বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। গৃহী ও শ্রমণদিগের চেহারা ও পরিচ্ছদের পার্থক্য চিত্রগুলি দেখিয়া বেশ বুঝা যায়। সৈন্য ও ব্যাধগণের মুখ খর্ব্বাকৃতি ও কর্কশ, উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের মুখ দীর্ঘতর, ডিম্বাকৃতি ও অধিকতর কোমল। গৌর, শ্যাম, নানাবর্ণের নরনারী অঙ্কিত হইয়াছে।

নাগদিগের আকৃতি মানুষেরই মত। প্রভেদ এই যে তাহা-

বা টানা চোখের বড় আদর। বাস্তবিকই যে আয়তলোচনা-দিগের চক্ষু কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় তাহা নয়। কিন্তু অজন্টাগুহাচিত্রাবলীতে চিত্রকরগণ অনেক স্থলে ললনা-দিগের চক্ষু বড়ই দীর্ঘ করিয়াছেন। টানা চোখের মত আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে পীনপয়োধর ও গুরু নিতম্বেরও প্রশংসা আছে। কিন্তু তাই বলিয়া কিছুতেই স্বভাবকে অতিক্রম করা উচিত নয়। অজন্টাগুহার ছবিগুলিতে নারীগণের স্তন ও নিতম্ব স্বাভাবিক অপেক্ষা পীনতর ও পৃথুতর করিয়া আঁকা হইয়াছে। কিন্তু নরনারীদেহচিত্রণে অপরাপর বিষয়ে এই প্রাচীন চিত্রকরগণ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অঙ্গুলিভঙ্গি যে কত প্রকারের আছে, বলা যায় না। মিনতি, রোষপ্রদর্শন, আদর, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভঙ্গী। কিন্তু এই প্রাচীন শিল্পিগণ ভাল করিয়া পা আঁকিতে পারেন নাই। নারীগণকে প্রায়ই বিবসনা বা অদ্ধনগ্না আঁকা হইয়াছে, কিম্বা এরূপ বস্ত্র পরান হইয়াছে, যাহাতে দেহের গঠন বুঝিতে পারা যায়। দাসীদের পরিহিত বস্ত্র চিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু রাণী ও সম্রান্ত মহিলাগণ অতিশয় সূক্ষ্মবস্ত্র পরিতেন বলিয়া তাহা অনেক চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না। নগ্না রমণীমূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে

দের ঘাড় হইতে সাধারণতঃ ৫টা কি ৭টা সাপ উঠিয়া মাথার উপর ফণা ধরিয়া আছে। কোন কোন নাগের মাথার উপর কেবল একটি ফণা আছে (৩য় চিত্র)। নাগিনীদের মাথায় কেবল একটা ফণা। স্থলে নাগনাগিনী-দের চিত্র এইরূপ আঁকা হইয়াছে। জলে কিন্তু তাহাদের সাপের মত লেজ দেখা যায় (৬ষ্ঠ চিত্র)। এক এক জনের মুখের ভাব বড়ই সুন্দর। কেহ বা করযোড়ে উপাসনা করিতেছে (৫ম চিত্র), কেহবা প্রেমাস্পদের পদতলে বসিয়া যেন কি গভীর বিষাদমিশ্রিত অনির্বাচিত কথা সুন্দর অঙ্গভঙ্গি-সহকারে ঈষৎ উর্দ্ধনেত্রে নিবেদন করিতেছে (৭ম চিত্র) ইত্যাদি। রাক্ষস রাক্ষসীর ছবিও অনেক আছে। তাহারা শূন্যমার্গে বিচরণ করিতে সমর্থ। মুখে বরাহের মত দুদিকে দুটা বড় বড় দাঁত (৪র্থ চিত্র)। গন্ধর্ব্ব কিন্নরের ছবিও অনেক আছে। গন্ধর্ব্বগণের মুখ মানুষের মত, হাত মানুষের মত, কিন্তু শরী-রের নিম্নদেশ পাখীর মত (৮ম চিত্র)। কিন্নরগণ মনুষ্যা-কৃতি, কিন্তু মুখ ঘোড়ার মত।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে বৌদ্ধদিগের মতে জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন জন্মে নানা জীবের দেহ অবলম্বন করে। এইজন্য বৌদ্ধ শিল্পিগণ ইতর প্রাণীদের ছবি সহানুভূতির সহিত আঁকিয়াছেন। তাহাদের অঙ্গভঙ্গি ও মুখের ভাবে এমন একটি সজীবতা, একটি বিশেষত্ব আছে যে মনে হয় যেন শিল্পী তাহাদের অন্তরের কথা জানিয়া ফেলিয়াছেন। অজণ্টার হাতীর ছবিগুলি বড়ই চমৎকার। বৌদ্ধধর্ম্মে হাতীর আদর হইবার বিশেষ কারণ আছে। কথিত আছে, মায়াদেবী যখন অন্তঃসত্ত্বা হন তখন তিনি স্বপ্ন দেখেন যে এক শ্বেতকায় হস্তী তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে। অজণ্টার হাতীর ছবিগুলিতে পিঠে হাওদা দেখা যায় না; কেবল এক একটা চারপাই ও গদি আছে। তবে নানা প্রকার অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। হাতীর পরই মহিষের ছবির

৯ম চিত্র।

সংখ্যা অধিক। ঘোড়ার ছবিও বিস্তর। ঘোড়ার ঘাড়ের লোম খাট করিয়া ছাঁটা। কোন কোন ছবিতে লেজের লোমও পরিপাটীরূপে কাটা। ঘোড়ার সাজ নানারূপ দৃষ্ট হয়। কিন্তু রেকাব দেখিতে পাওয়া যায় না। ঘোড়ার পায়ে মল, ঘুঙুর ও অন্যান্য অলঙ্কার দৃষ্ট হয়। সেকালে ঘোড়ার গাড়ি ছিল, কিন্তু তাহাতে স্প্রিং ছিল না।

৮ম চিত্র।

যায়। তাহাও বড় কম। একটি চি
দেখা যায় যে কয়েকজন পাহাড়িয়া
ভালুককে আক্রমণ করিয়াছে। এ
ভালুক থাবা দিয়া চোক ঢাকাইয়া ঘুম
তেছে। অপরটা একজন শিকারী
নিষ্ঠুর আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়াছে
অনেক জীবতত্ত্ববিদ্ বলেন ভালুক কখন
এরূপ করিয়া মানুষকে আক্রমণ
না। ইহা কিন্তু সন্দেহস্থল। উট
ছবি মোটে একবার দেখা যায়
অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে হাঁস, ময়
চীল, শকুনি, কাক, হাড়গিলা, পায়র
শুক ও পেঁচা দেখা যায়। সাপুড়িয়া
সাপ ধরা ও সাপ খেলানর ছবিও আছে। এই ছবিগুলিতে
বৃষ ও গাভীর কাণ দৈর্ঘ্যের দিকে আমূল চেরা দেখা যায়
বোধ হয় তৎকালে এরূপ কান চিরিয়া দিবার রীতি ছিল

নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্রের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়
যেমন ঢাল, তরবারি, বর্শা, বর্ছি, পরশু, বজ্র, তূণীর
চক্র, গদা, ধনু, ভল্ল, ইত্যাদি। নেপালী খুকরির মত অনে
তলোয়ারের নুব্জদিকটা ধারাল। ঋজু তরবারও দে

নানাপ্রকার হরিণের ছবিও দেখা যায়। তন্মধ্যে কতক-
গুলি বড়ই সুন্দর [৯ম চিত্র]। বন্য হরিণের ছবিত আছেই।
অধিকন্তু কোন কোন ছবিতে দেখা যায় যে গাড়ীর উপর
হরিণ বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। এগুলিকে মাঠে লইয়া
গিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তাহার পর পশ্চাৎ পশ্চাৎ
শিকারী কুকুর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। সেকালে রাজা
প্রজা সকলেই মৃগয়াপ্রিয় ছিল। শিকারী
কুকুর লইয়া যাইতেছে, এরূপ ছবি অনেক
দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন, তখনকার লোকে
হাতীর লড়াই, ভেড়ার লড়াই ও মুরগীর
লড়াই ভাল বাসিত। অজন্টাগুহায় বানরের
ছবিগুলি বড় চমৎকার। বানরের আচ-
রণে যে স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তা, যে
পরিহাস মাখান আছে, অজন্টার শিল্পিগণ
তাহা রেখা ও বর্ণ সম্পাতে বেশ পরিস্ফুট
করিয়া তুলিয়াছেন। মহিষজাতকের ছবিটি
বড় সুন্দর। বন্যজন্তুদের মধ্যে সিংহই এই
চিত্রকরদের প্রিয় ছিল। বাঘের ছবি প্রায়
দেখা যায় না। বোধ হয় পূর্ব্বে পশ্চিম
ভারতে বাঘ অপেক্ষা সিংহই বেশী দেখা
যাইত। এখন সিংহ কেবল গুজরাটে দেখা

৯ম চিত্র।

যায়। হাতী চালাইবার অঙ্কুশ বর্ত্তমান কালেরই মত। পতাকা
যুদ্ধের জাঁকজমকের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। ছাতাগুলি সম্ভবতঃ

পাশের ছিল। পাখা তিন রকমের; এই তিন রকমই এখনও প্রচলিত। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তূরী ও বেহালা দেখা যায় না, ও শঙ্খ, বংশী, বীণা, একতারা, খোল, করতাল, মন্দিরা ও খঞ্জনী দৃষ্ট হয়।

পরিচ্ছদের বিষয় পূর্ব্বে কিছু লেখা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের গায়ে সকল ছবিতেই উত্তরীয় দেখা যায়। উহা বামস্কন্ধের উপর দিয়া পরিহিত। দক্ষিণ স্কন্ধ অনাবৃত। ভারতবর্ষীয় রাজা, রাণী, সভাসদ, ভিক্ষু সৈনিক দাসী উপাসক, সকলকেই ধুতিপরিহিত দেখা যায়। ধুতির পাড় বড়ই বিচিত্র। একটি চিত্রে রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর দরবারে পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর দূতগণের আগমন চিত্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পুলকেশী খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রদেশে রাজত্ব করেন। পুলকেশী দরবারে বসিয়া আছেন; কিন্তু কেবল মালকোঁচা মারিয়া ধুতি পরিয়া আছেন। তাহাও হাঁটু পর্য্যন্ত নামে নাই। গায়ে কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। অথচ তাঁহার সিংহাসনের পৃষ্ঠদেশের ঊর্দ্ধভাগ মণিমালাখচিত। গাইস্থা দৃশ্যেও রাজারা কেবল ধুতিপরিহিত দৃষ্ট হন। কিন্তু ভৃত্যেরা জ্যাকেট পরিয়া আছে। মেয়েদের গায়ে বডিস্ অর্থাৎ চোলী দেখা যায়। চোলীর উপর নানাপ্রকার ছবি। সুতরাং বলিতে হইবে, তখন নানাপ্রকারের বিচিত্র ছিটের কাপড় প্রস্তুত হইত। কোন কোন স্ত্রীলোক বডিসের পরিবর্ত্তে কেবল একটা ফিতা দ্বারা স্তনদ্বয় আটকাইয়া রাখিয়াছে। তাহাতে স্তনদ্বয় ঢাকা পড়ে নাই। যাহারা পাখা করিতে বা চামর ঢুলাইতে নিযুক্ত, তাহাদের অনেকেরই এই বেশ। বডিস্ বলিতে কেহ ইংরাজী বডিস্ না বুঝেন। চোলী কথাটিও হয়ত অনেকে বুঝিবেন না। ইহার পিঠে অতি সামান্য কাপড় থাকে, কখন কখন থাকেই না। কাঁধও অল্পই ঢাকা পড়ে। কোন কোন চিত্রে কটিদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত আস্তীনযুক্ত জ্যাকেট পরিহিতা নারীমূর্ত্তি দেখা যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহারা বিদেশিনী দাসী। মাহুতদের ও চাকরদের জ্যাকেট আজকালকার চাকরদের পরিহিত হাতকাটা জ্যাকেটের মত। চাদরেরও ব্যবহার দেখা যায়। নবম ও দশম সংখ্যক গুহাই প্রাচীনতম। এই দুইটী গুহা ব্যতীত অন্য কোনটীতে পাগড়ী দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজা ও অভিজাতবর্গের মস্তকে রত্নাদিখচিত মুকুটবং নানা প্রকার শিরোভূষণ দেখা যায়। নারীগণের মস্তকেও বিবিধ ফুল ও গহনা দেখিতে পাওয়া যায়।

১০ম চিত্র।

শ্রমণ অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এবং সৈন্যেরা প্রায় নগ্নশির। বিদেশী পুরুষ, সৈনিক ও ভিস্তীদের মাথায় নানা রকম টুপী দেখা যায়। তাহার মধ্যে কোন কোনটা এখনও চলিত আছে। যেমন ১০ম চিত্রে উপরের বামকোণের ছবিটি। পারসীকদের দরজির সেলাই করা পোষাক ও টুপী দেখা যায়। তাহার কোন কোনটি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ১০ম চিত্রের তৃতীয় ছবিটি। সেকালে বোধ হয় অলঙ্কারের বড়ই ছড়াছড়ি ছিল। নরনারীর দেহের ভূষণের ত কথাই নাই; গৃহদ্বারে, সামিয়ানার থামে, গৃহে, সিংহাসনে, মুক্তার মালা, মাণিক্যের হারের অন্ত নাই। মুকুটগুলি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে পূর্ণ। তাহার মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম তারের কাজ আছে। গহনার মধ্যে নথ কোন ছবিতেই নাই। পায়ের আঙ্গুলেও কোন গহনা নাই। কিন্তু দুল ও ইয়ারিং, নানাবিধ হার, চীক, কণ্ঠমালা, সাতনর, বাজু,

তাবিজ, বালা, কঙ্কণ, চুড়ি, মল ও অঙ্গুরী স্ত্রীপুরুষ উভয়ের গায়েই দেখা যায়। তাহাও যে কত রকমের তাহার বর্ণনা করা যায় না। আজকাল যেমন ফিতা দিয়া চীক গাথিয়া উহা গলায় বাঁধে, এবং ফিতার দুটা দিক ঘাড়ের দিকে কতকটা ঝুলিয়া থাকে, পুরাকালেও ঠিক সেইরূপ ছিল বোধ হয়। গহনাগুলি সবই খুব ভারি ভারি ও সেকেলে গোছের।

গৃহসজ্জার মধ্যে চারপাই (খট্টা, তক্তপোষ বা পালঙ্কের মত), তাকিয়া ও বালিশ, পা রাখিবার চৌকী, বেত ও বাঁশের গোল গোল মড়া, ও পরদা দৃষ্ট হয়। গৃহকার্য্যে ও নানাবিধ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপে ব্যবহার্য্য মৃৎপাত্র সকল পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। ফুল তুলিবার সাজি সেকালেও ছিল। এখন যেমন অনেক গৃহস্থের বাড়ীতে ও গোয়ালিনীর মাথায় হাঁড়ীর উপর হাঁড়ী, ভাড়ের উপর ভাড় দেখা যায়, সেকালেও তদ্রূপ ছিল। ইন্দুর বিড়ালের এবং শিশুদের উপদ্রবে আমরা আজিও অনেক জিনিস শিকায় তুলিয়া রাখি। প্রাচীন কালেও শিকার ব্যবহার ছিল। পিকদান তখনও ছিল। আমরা এখন ধুনা দিবার জন্য বৃহৎ কলিকার মত ধুনাচী ব্যবহার করি। পূর্ব্বে একপ্রকার দোদুল্যমান ধুনাচী ব্যবহৃত হইত।

পুলকেশীর দরবার-গৃহের মেজেয় ফুল ছড়ান। তৎকালে ধনীর গৃহে বোধ হয় এইরূপ ফুল বিছাইবার রীতি ছিল।

পুরাকালে ভারতবাসীরা যে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, অজণ্টাগুহাচিত্রাবলীর বহুসংখ্যক জাহাজের ছবিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই প্রাচীন শিল্পিগণ বৃক্ষ-লতা-ফল-পুষ্প অঙ্কনেও পারদর্শী ছিলেন। কলা, সুপারি, খেজুর, অশোক, পলাশ,

বট, অশ্বথ, আম, আতা, দাড়িম, লাউ, নীল, শ্বেত, ও রক্ত পদ্ম, [১২শ চিত্র] প্রভৃতির ছবি গুহার মধ্যে পাওয়া যায়। উদ্ভিদ্‌গুলির চিত্র যথাযথ। কল্মার অনুদ্ভিন্ন কচি পাতা, ঝড়ে ছিন্ন পাতা, নানাবৃক্ষের নূতন পাতা, ও পতনোন্মুখ পুরাতন পাতা, এ সকলের আকৃতি ও বর্ণ স্বভাবানুযায়ী। এই সকল উদ্ভিদ-চিত্রের সৌন্দর্য্যরসানুভবই আমাদের একমাত্র লাভ নহে। ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক সন্দেহ ভঞ্জনের উপায়ও নিহিত আছে। কেহকেহ বলেন যে আতা ভারতবর্ষের ফল নহে। খৃষ্টীয় ষোড়শশতাব্দীতে পোর্তুগীজ্‌গণ কর্ত্তৃক ওয়েষ্ট ইণ্ডীজ্‌ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল। পোর্তুগীজ্‌গণ যে আনিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা যে তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষে ছিল, অজণ্টাগুহার ছবি তাহার অন্যতম প্রমাণ। কনিংহাম সাহেব ভারহুৎ এবং মথুরায় ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রস্তরে খোদিত আতার ছবি পাইয়াছেন।

প্রাচীন ভারতে যে চিত্রবিদ্যা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। এস্থলে ত সমুদয়ের উল্লেখ করিবার স্থান নাই। ৭১১ খৃষ্টাব্দে যখন মহম্মদ কাসিম সিন্ধুদেশ জয় করিতেছিলেন, তখনও কয়েকজন হিন্দু চিত্রকর তাঁহার ও তাঁহার কয়েকজন কর্ম্মচারীর ছবি আঁকিবার অনুমতি চাহিতে আসিয়াছিল।

একটী চিত্রে নর্ত্তকীর নাচের ছবি আছে। নর্ত্তকীর অঙ্গভঙ্গী বর্ত্তমানকালের নর্ত্তকীদিগেরই মত। তাহার সহচরী বাদিকাদিগের ভাবভঙ্গীও খুব আধুনিক বলিয়া মনে হয়। একটি চিত্রে এক জন রাজার অভিষেক চিত্রিত হইয়াছে। চিত্রের এক অংশে রাজা অভিষেকশালায় উপবিষ্ট হইয়া এক রমণীর করদ্বয়ধৃত মাঙ্গল্যদ্রব্যনিচয় স্পর্শ করিতেছেন। দুই পার্শ্বে অভিষেক্তৃদ্বয় দাঁড়াইয়া সুন্দর চিত্রিত ঘট হইতে রাজার মস্তকে জল ঢালিতেছেন। রাজার দক্ষিণ দিকে পুরোহিত দাঁড়াইয়া মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। পুরোহিতের নিকট এক জন ভৃত্য চামর লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনেক ছবিতে চামরধারী ও চামরধারিণীর প্রাচুর্য্য দেখা যায়। পাখা করিবার লোকও আছে। সেকালে এখন অপেক্ষা মাছির উপদ্রব বেশী ছিল কি? অভিষেকচিত্রের আর এক অংশে একটি বামন স্ত্রীলোক থালা

মাথায় করিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে। একটি স্ত্রীলোক ফুল আনিতেছে। অপর এক সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত্রা নারী থালা হইতে কি লইতেছেন বা স্পর্শ করিতেছেন। ইনি হয়ত রাণী। কারণ অতিশয় সূক্ষ্মবস্ত্র পরিতেন বলিয়া সম্ভ্রান্তা পুরমহিলারা অনেক স্থলে এইভাবে চিত্রিত হইয়াছেন। একজন পুরুষ আজ কাল রাখালেরা যেমন লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়ায়, তেমনি করিয়া দাঁড়াইয়া কৌতূহলের সহিত এই সব দেখিতেছে। অনেক চিত্রেই স্ত্রী ও পুরুষ বামন দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালে রাজভবনে ও ধনীর গৃহে বোধ হয় বামন দাস দাসী রাখিবার রীতি ছিল। অভিষেক-দৃশ্যের তৃতীয় অংশে চারিজন ভিক্ষু হাত বাড়াইয়া ভিক্ষা চাহিতেছে। এই অংশে প্রাসাদের বাহিরের দৃশ্যও কিছু দেখা যায়। তাহাতে কলা ও খেজুরগাছ আঁকা আছে। চিত্রের চতুর্থ অংশের ব্যাখ্যা করা কঠিন। এই অংশে একজন স্ত্রীলোক অপর একটি স্ত্রীলোকের সহিত বারকোষে করিয়া চারিটি শিশুমুণ্ড একজন সন্ন্যাসীকে দেখাইতেছে [১১শ ছবি]। সন্ন্যাসী মালা হাতে করিয়া কর্ত্তিত শিশুমস্তকগুলির প্রতি তাকাইয়া যেন অভিষেক ব্যাপারের

আনুষঙ্গিক কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছেন। আরও দুজন লোক হাত যোড় করিয়া সাধুকে মিনতি করিতেছে। এই চারিটি শিশুর কাটামুণ্ডের অর্থ কি? কেহ কেহ অনুমান করেন যে অভিষেকের সময় পুরাকালে রাজসূয় যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে হইত, এবং এই যজ্ঞে কখনও কখনও পশুবলির পরিবর্ত্তে নরবলি দেওয়া হইত। যাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রে কৃতবিদ্য, তাঁহারা হয়ত চিত্রের এই অংশটির রহস্যোদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন এই চিত্রটিতে নরনারীর ঠোঁট অত্যন্ত শাদা উঠিয়াছে তাহার কারণ, মূল চিত্রের ঠোঁটের লাল রং ফিকা হইয়া গিয়াছে।

১৩শ চিত্র

শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে মারকর্ত্তৃক নানা প্রকারে প্রলুব্ধ ও পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কোন প্রলোভন বা ভয়ে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই।

ছবিটির চারিদিকে কেহ বা বুদ্ধকে ভয় দেখাইতেছে, কেহ বা লোভ দেখাইতেছে, কেহ বা তাঁহার ভোগলালসার উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতেছে। দানব ও রাক্ষসদের মূর্ত্তি ভীষণ ও নানাবিধ। কাহারও মুখ বরাহের মত, কাহারও মুখ হইতে সর্প বাহির হইতেছে, কাহারও মুখ বা মকর হাঙ্গরের মত। কিন্তু বৃথা প্রলোভন, বৃথা ভয় প্রদর্শন! বুদ্ধদেব প্রশান্তভাবে বসিয়া আছেন। বুঝি তাই দেখিয়াই ছবির বামপার্শ্বে মার স্বয়ং পরাজিত হইয়া চলিয়া যাইতেছে [১৩শ চিত্র]।

কত দৃশ্যেরই বর্ণনা করিব। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক অনেক ঘটনার ছবি অজণ্টাগুহাতে পাওয়া যায়। যেমন বিজয়সিংহের লঙ্কাজয়,—ইঁহারই নামে লঙ্কা সিংহল নামে অভিহিত হয়—এবং রাজা শিবি ও শ্যেন-কপোতের উপাখ্যান। একটি দৃশ্যে একজন নকীব বা বন্দী উচ্চৈঃস্বরে রাজার আগে আগে তাঁহার উপাধি ও পদবী আদি ঘোষণা করিয়া যাইতেছে। আজ কাল যেমন রাজমিস্ত্রীরা মই দিয়া চূণ সুরকীর হাঁড়ি তোলে, তৎকালেও যে মিস্ত্রীরা তদ্রূপ করিত, একটী ছবিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পুরাকালের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার অনেক প্রমাণও ছবিগুলিতে পাওয়া যায়। একটি দৃশ্যে দেখা যায় রাজা ও রাণী একত্রে বসিয়া কয়েক জন পুরুষের নিকট নজর বা উপহার লইতেছেন। আর একটিতে দেখা যায় বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেছেন, অনেক রাজামাত্য ও অভিজাতবর্গ সস্ত্রীক প্রকাশ্য স্থানে বসিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। তৎকালে অবরোধ প্রথা ছিল কি না, তাহার প্রমাণ ইহা হইতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব সম্বন্ধীয় একটী চিত্রে দেখা যায় যে একজন পারসী বা সাসানীয় পরিচ্ছদধারী মনুষ্য বুদ্ধদেবের আরাধনা করিতেছে। ইহা হইতে পুরাকালে ভারতবর্ষের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তারের কতক পরিচয় পাওয়া যায়। অপর একটী দৃশ্যে দেখা যায়, রাজা ও রাণী একত্র বসিয়া আছেন। রাজা মদ্য পান করিতেছেন। সেকালের ফুলবাবুর ছবি বড় মজার। তাঁহার ধুতি খানি মালকোঁছা মারিয়া পরা। তাহাও হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। কোমরে রত্নখচিত কটিবন্ধ, হাতে দুই গাছি করিয়া মাদা সাপ্টা বালা, মস্তকে মণিমাণিক্যখচিত শিরোভূষণ, কাণে ক্ষুদ্র গোলাকার এক প্রকার ভারী গহনা, তাহা হইতে তিনটি ফুলের মত গহনা ঝুলিতেছে, গলায় মণি মালা, বাহুতে দুগাছি অনন্তের মত এক প্রকার অলঙ্কার, কিন্তু তাহা হইতে একটা থোপা ঝুলিতেছে, উপবীতের মত করিয়া পরিহিত একটী ভূষণ স্কন্ধদেশ হইতে বিলম্বিত কিন্তু তাহা কেবল স্বর্ণময় নয়, তাহা রত্নখচিত। কাছা শেষ পর্য্যন্ত গুঁজিয়া দেওয়া হয় নাই। তাহার বিচিত্র প্রান্তভাগ মৃত্তিকা পর্য্যন্ত বিলম্বিত। ধুতিখানি চুরিয়া; কিন্তু চোরা গুলি কাপড়ের প্রস্থের দিকে, দৈর্ঘ্যের দিকে নহে। এই বেশে বাবু মহাশয় একটি হাত উরুর উপর দিয়া অপর হাতে একটি ফুল লইয়া ঈষৎ বঙ্কিমভাবে দাড়াইয়া আছেন। বুদ্ধদেবের পরীক্ষার চিত্রের অধোদেশের দক্ষিণ দিকে যে সুসজ্জিত এক পুরুষ দণ্ডায়মান আছে, ফুলবাবুর বেশের সহিত তাহার বেশের অনেক সাদৃশ্য আছে। কোন কোন ছবিতে পারস্যদেশীয় নরনারীর ছবি আছে। তাহাদের পুরুষদের পায়ে ডোরাদার (striped) ফুল মোজা, পরিধানে দরজির সেলাই করা পোষাক। মোটের উপর বোধ হয় পুরাকালে ভারতবর্ষে, অন্ততঃ মহারাষ্ট্র অঞ্চলে, আর্য্যদিগের মধ্যে পরিচ্ছদের পারিপাট্য ও বাহুল্য অপেক্ষা ভূষণেরই বাহুল্য ছিল। অথচ ছবিগুলি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে তৎকালে ধন, বিলাসিতা, বেশভূষা, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ও সূক্ষ্ম শিল্পজাত দ্রব্যের অভাব ছিল না। নানাবিধ ছিটের অস্তিত্বের উল্লেখ পূর্ব্বেই করিয়াছি। খুব মিহি মসলিনও ছিল।

জীবজন্তু নরনারীর ছবি ব্যতীত কেবল সাজাইবার জন্য স্বাভাবিক ও কল্পনাপ্রসূত লতা-পাতা-ফুলে গুহার নানাস্থান সুচিত্রিত হইয়াছে। এইপ্রকার চিত্র মোগল রাজত্বকালে আগরা, ফতেপুর সিক্রি, প্রভৃতি স্থানের বিখ্যাত হর্ম্ম্যসকল ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যত্র দুর্লভ। অথচ এ সকল ১৭০০ হইতে ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় চিত্রকরগণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছিল।

সংসারের পরিবর্ত্তনশীলতার কথা বলিতে হইলেই লোকে বলে সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ কোত্তরকোশলা। কিন্তু কেবল রাজা ও রাজপুরীর নশ্বরতাই কি আমাদের হৃদয়ে বিষাদের

সঞ্চার করে? অতীতের লিখিত ইতিহাসে প্রজা অপেক্ষা রাজার কথাই বেশী। কিন্তু এই গুহাচিত্রগুলি রাজার কথা যেমন বলে, প্রজার কথাও তেমনি বলে। ধনীর কথা, নাগরিকের কথা, সুগভোর কথা, প্রাসাদবাসীর কথা যেমন বলে, দরিদ্রের কথা, জানপদবর্গের কথা, অসভ্য জঙ্গলী লোকের কথা, পর্ণকুটিরবাসীর কথাও তেমনি বলে। সেকালের লোকেও আমাদেরই মত রূপের পশ্চাতে, ভোগসুখের পশ্চাতে, বাহ্যাড়ম্বরের পশ্চাতে, ধাবিত হইত; সেকালেও গার্হস্থ্য সুখ ছিল, শোক ছিল, শিশুর শৈশবলীলা ছিল, পুরমহিলার প্রসাধন ছিল, গৃহকর্ম্ম ছিল; কোথায় গিয়াছে সে সব! রাজার ও রাজপুরীর নশ্বরতা আমাদের হৃদয়ে বিষাদ আনিয়া দেয় বটে; কিন্তু যাহারা আমাদেরই দশজনের মত ছিল, তাহাদের নশ্বরতা আমাদিগকে আত্মীয়ের মৃত্যুর মত ব্যথিত করে। কিন্তু ইহাতে আমাদের উপকারও আছে। সংসারের নশ্বরতা আমাদের চিরজন্মভূমির কথা মনে পড়াইয়া দেয়। কোথায় সে জন্মভূমি, কোথায় সে মাতৃপিতৃভবন?

একবার সেকালের শুদ্ধান্তঃপুরে প্রবেশ করি। দেখিতেছি কোনও রূপযৌবনসম্পন্না গৃহলক্ষ্মী অপূর্ব্ববেশে দোলনায় বসিয়া দুলিতেছেন। দোল খাইবার সময় ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ যেরূপ ভাবে অবস্থিত থাকে, চিত্রেও অবিকল তাহাই আছে। গৃহের ভিতর গিয়া দেখি, কোনও সম্ভ্রান্তা পুরমহিলা প্রসাধনে নিযুক্ত। এক হাতে ডিম্বাকৃতি (oval) দর্পণ, অন্য হাতে প্রসাধন দ্রব্য। প্রসাধন দ্রব্য লইয়া এক জন দাসী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, অপর একজন চামর ঢুলাইতেছে। গৃহস্বামিনীর সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার; নিতম্বে মেখলা, তাহার তিনটি স্তর; উরু বেষ্টন করিয়া একপ্রকার অলঙ্কার। বসন এরূপ সূক্ষ্ম যে তাহা লক্ষ্যই হয় না, কেবল তাহার পাড় ও অঞ্চল হইতে তাহার অস্তিত্ব বুঝা যায়। সর্ব্বাঙ্গের গঠন ও রং ফুটিয়া বাহির হইতেছে। একটি দাসীর বাঁকা সিঁতা দেখিতেছি। ফ্যাষন ত্রিকালব্যাপী! একালে ভদ্র গৃহস্থ হিন্দুবাড়ীতে কেবল পায়ে আলতা দেয়, মুসলমানেরা ও তাহাদের অনুকরণকারীরা হাতের পাতায় ও নখাগ্রে মেহেদির রং দেয়. সেকালে হাতে পায়ে ও ও মুখে, সর্ব্বত্র রং দিবার প্রথা ছিল। কথিত আছে এক ভ্রষ্টা ভিক্ষুণী গায়ের রং দেখাইবার জন্য সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধা করায় বুদ্ধদেব ভিক্ষুণীদিগের সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান বন্ধ করি দেন। ঔরঙ্গজীবের এক কন্যার গায়ের রং পরিচ্ছদে ভিতর দিয়া দেখা যাওয়ায় বাদশাহ তাঁহাকে তিরস্কা করেন। তাহাতে বাদশাহজাদী উত্তর করেন, "আ ৭টি পোষাক পরিয়া রহিয়াছি।" তবে, সূক্ষ্ম বস্ত্র প রধা রোগটা একালের নবীনাদের একচেটিয়া নয়! কিন্তু যাই শুধু ধনবতীর প্রসাধন দেখিলেই চলিবে না। এক নারী ছেলে কোলে করিয়া রহিয়াছেন। ঠিক্ আজকালিকা মত। তাঁহার গায়ে জামা আছে। অন্য এক গৃহে গিয় দেখি ছেলেরা লাটিম ঘুরাইতেছে। আর এক বাড়ীতে গিয়া দেখি নারীগণ কুলোয় করিয়া চাল বাছিতেছেন। আ এক স্থানে দেখি, মা পশ্চাৎ হইতে ছেলের দুই পার্শ্ব দিয় হাত চালাইয়া তাহার দুটি হাত যোড় করিয়া ধরিয়া আছেন মায়ের মুখের ভাবে কি অপূর্ব্ব মিনতি, মাতৃস্নেহ ও সন্তানের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার অনির্ব্বচনীয় সম্মিলন! মা বুঝি ছেলের হাত দিয়া বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা দিতেছেন। এদিকে আবার এ কি লীলা! কয়েকটী বালক লাঠির উপর ঘোড়ায় চড়িয়াছে। এরা আমাদেরই বাড়ীর খোকাদের ভাই ছিল। শৈশবসুলভ কবিকল্পনা-বলে শুষ্ক নির্জীব কাষ্ঠখণ্ডকে সজীব অশ্বে পরিণত করিত। তবে, সেই সেকালের লোকেরা সত্য সত্যই আমাদের আত্মীয় ছিল। তাহাদের শিশুগুলিও আমাদের নয়নের মণি খোকাখুকীদের মত বাবা ও দাদার লাঠির সাহায্যে বিনাব্যয়ে অশ্বারোহণের সখ মিটাইত। অতীতে ও বর্ত্তমানে মানব প্রকৃতির একত্বের কি সুমিষ্ট প্রমাণ। সম্পাদক

প্রবাসী।

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া!
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া!
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,

কোথা দিয়ে সেথা প্রবেশিতে পাই
সন্ধান লব বুঝিয়া !
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়;
তারে অমি ফিরি খুঁজিয়া !

রহিয়া রহিয়া নব বসন্তে
ফুল-সুগন্ধ গগনে
কেঁদে ফিরে হিয়া মিলন-বিহীন
মিলনের শুভ লগনে !
আপনার যারা আছে চারিভিতে
পারিনি তাদের আপনা করিতে,
তারা নিশি দিসি জাগাইছে চিতে
বিরহ-বেদনা সঘনে !
পাশে আছে যারা তাদেরি হারায়ে
ফিরে প্রাণ সারা গগনে !

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে –
সে আমারে ডাকে এমন করিয়া
কেন যে, কব তা' কেমনে !
মনে হয় যেন সে ধুলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে !
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে !

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে !
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে !
যে ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কি আর মনে তাহা আনি;
চিরদিবসের ভুলে-যাওয়া বাণী
কোন্ কথা মনে আনে সে !
অনাদি উষার বন্ধু আমার
তাকায় আমার পানে সে !

এ সাত-মহলা ভবনে আমার,
চির জনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঠাতে গিঠাতে !
তবু হায় ভুলে যাই বারে বারে
দূরে এসে ঘর চাই বাঁধিবারে,
আপনার বাঁধা ঘরেতে কি পারে
ঘরের বাসনা মিটাতে ?
প্রবাসীর বেশে কেন ফিরি হায়
চির জনমের ভিটাতে ?

যদি চিনি, যদি জানিবারে পাই,
ধুলারেও মানি আপনা !
ছোট বড় হীন সবার মাঝারে
করি চিত্তের স্থাপনা !
হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব সাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা !
যেথা যাবে সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা ।

বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে
প্রতি কণা মোরে টানিছে !
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শত কোটি কর হানিছে !
ওরে মাটি, তুই আমারে কি চাস ?
মোর তরে জল দু'হাত বাড়াস্ ?
নিঃশ্বাসে বুকে পশিয়া বাতাস
চির আহ্বান আনিছে !
পর ভাবি যারে তারা বারে বারে
সবাই আমরে টানিছে !

আছে আছে প্রেম ধূলায় ধূলায়,
আনন্দ আছে নিখিলে !
মিথ্যায় ঘেরে, ছোট কণাটিরে
তুচ্ছ করিয়া দেখিলে !

জগতের যত অণু রেণু সব
আপনার মাঝে অচল নীরব
বহিছে একটি চির গৌরব,—
এ কথা না যদি শিখিলে,
জীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে
প্রবাসী ফিরিবে নিখিলে!

ধূলা সাথে আমি ধূলা হয়ে রব
সে গৌরবের চরণে!
ফুল মাঝে আমি হব ফুলদল
তাঁর পূজারতি বরণে!
যেথা যাই আর যেথায় চাহি রে
তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে,
প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে
জনমে জনমে মরণে!
যাহা হই আমি তাই হয়ে রব
সে গৌরবের চরণে!

ধন্য রে আমি অনন্তকাল
ধন্য আমার ধরণী!
ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর
তারকা হিরণ-বরণী!
যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে,
নাহি জানি ত্রাণ কেন বলে কারে!
আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে
বিপুল ভুবন-তরণী!
যা হয়েছি আমি হয়েছি ধন্য,
ধন্য এ মোর ধরণী!

৩রা ফাল্গুন
১৩০৭

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জীববিদ্যা

অনেকে মনে করেন, দুটা গাছের নাম, পাঁচটা জন্তুর স্বভাব জানিলেই জীববিদ্যায় পণ্ডিত হইতে পারা যায়। অন্যদিকে কেহ কেহ মনে করেন, অন্যান্য বিদ্যা শিখিলে খাওয়াপরার যোগাড় হইতে পারে, কলকারখানা করিবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে, কিন্তু জীববিদ্যা আমাদের কোন কাজে লাগে না। বলা বাহুল্য, জীববিদ্যার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে উক্ত দুইপ্রকার ধারণাই ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়।

এক কথায় বলিতে গেলে, বিজ্ঞান একটি; দশটি নয়। বিজ্ঞান একটি বিশাল বৃক্ষ; দশটি নামে পরিচিত বিজ্ঞান সেই একই বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা, মূল, কাণ্ড, পত্র, পুষ্প, ইত্যাদি। যেমন কোন বৃক্ষের কেবল পত্র, কেবল পুষ্প, কেবল মূল, কেবল ফল ইত্যাদি দেখিলে বৃক্ষটি প্রকৃতরূপে জানা যায় না, তেমনই কোন একটি বিজ্ঞান জানিলে বিজ্ঞানের প্রকৃত রসাস্বাদন ঘটে না। কিন্তু এক এক বিজ্ঞানই এক এক অকূল সমুদ্র, তাহার পার দেখার ত কথাই নাই, কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতেই জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হয়। অথচ বিজ্ঞান-আলোচনার ফল পাইতে গেলে সকলেরই অন্ততঃ অল্পবিস্তর আলোচনা আবশ্যক।

বিজ্ঞানসমূহের ভালরূপ বিভাজন এ পর্যান্ত দেখি নাই। বোধ হয়, সম্ভবপর নহে। তবে কোন্‌টি প্রথমে, কোন্‌টি পরে শিক্ষণীয়, তাহা কতকটা বলিতে পারা যায়। এইরূপ ভাগ করিয়া না লইলে শিক্ষা-সৌকর্য্য হয় না। তাই ভাগের চেষ্টা। অবশ্য বিজ্ঞান শব্দে আধুনিক প্রচলিত অর্থ বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ বিজ্ঞান তিনি প্রথমে আরম্ভ করিবেন। ইহার উত্তর এক, রসায়ন প্রথমে শিক্ষা করা আবশ্যক। তার পর কি? ইহারও উত্তর এক, শক্তিবিদ্যা (চলিত নাম পদার্থবিদ্যা)। রসায়ন ও শক্তিবিদ্যার অন্ততঃ স্থূল জ্ঞান না থাকিলে অপরাপর বিজ্ঞানে হাত দেওয়া বৃথা। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের বিশ্ববিদ্যাপরীক্ষকগণ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এফ্ এ পরীক্ষার নিমিত্ত কিছুকাল কেবল রসায়ন বিদ্যা, আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, কিছুকাল কেবল শক্তিবিদ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন!

যাহা হউক, এখন এই অসমীক্ষ্যকারিতার পরিহার হইয়াছে। এখন এফ্ এ পরীক্ষার নিমিত্ত রসায়ন ও শক্তিবিদ্যার স্থূল জ্ঞান আবশ্যক হইয়াছে। পূর্ব্ব কয়েক বৎসরের পাঠ্য-ব্যবস্থার আলোচনা করিলে মনে হয়, বিশ্ব-

বিদ্যাপরীক্ষক মহাশয়দিগের যেন মাথা ছিল না, কিংবা মাথা ছিল, তাহার আদেশে কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়ার সামঞ্জস্য ছিল না। কখনও কেবল রসায়ন, কখনও কেবল শক্তিবিদ্যা; আবার কখনও শক্তিবিদ্যার প্রাধান্য, রসায়নের উপেক্ষা। এখনও ঐ দুই বিদ্যার গুরুত্ব সমান বোধ হয় নাই। যাহাই হউক, এই এক ঘটনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কোন্‌টা প্রথমে, কোনটা পরে, তাহা নিশ্চয় করা তত সহজ নহে। এই জন্যই রসায়ন ও শক্তিবিদ্যা একত্র শিক্ষা করিলেই ভাল।

এই দুই যে আদি, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। উহারা বিজ্ঞানবৃক্ষের মূল, অন্যান্য বিজ্ঞান-শাখার সঞ্জীবনরস সংগ্রহ করে। অধিকন্তু, উহারাই অন্যান্য বিজ্ঞানের জীবন, একথাও বলা যাইতে পারে। এই দুই বিজ্ঞান শিখিয়া আর কিছু না শিখিলেও বরং চলে, কিন্তু উহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অপর কিছুই শিখিতে পারা যায় না। এক এক বিজ্ঞানশাখার নানাবিধ প্রশাখা আছে। কোন কোন প্রশাখা মাত্র শিখিতে গেলে রসায়ন বা শক্তিবিদ্যার প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু প্রশাখাত বৃক্ষ নয়, কিংবা বৃক্ষের শাখাও নয়।

জীববিদ্যার প্রধান প্রধান অঙ্গগুলি দেখিলেই উক্ত বিষয়ের যাথার্থ্য বুঝা যাইবে। কোন জীব—কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ—লইলে দেখা যায় যে, তাহার একটা না একটা রূপ আছে। রূপের আধারস্বরূপ তাহার দেহ। দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উপাঙ্গ অনেক। এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্যান্য কোন কোন জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তুল্য, অপর কোন কোন জীবের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য প্রায় নাই, বা একেবারেই নাই। এমন কি, একই জীব লক্ষ লক্ষ আছে, অথচ তাহাদের সকলের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক মাপের, এক পরিমাণের নয়। এই সকল বিষয় শিক্ষা করিলে বাহ্যদেহ সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। এ নিমিত্ত রসায়ন ও শক্তিবিদ্যা আবশ্যক হয় না।

কিন্তু সেই জীব ব্যবচ্ছেদ করিলে তাহার রূপ অন্য প্রকার দেখা যায়। বস্তুতঃ বাহ্যরূপের সহিত আভ্যন্তর রূপের কোন সাদৃশ্যই লক্ষ্য হয় না। এই আভ্যন্তর রূপ খালি চোখে দেখিয়াই তৃপ্ত হইতে পারা যায় না। অণুবীক্ষণ দ্বারা আভ্যন্তর ভাগের প্রত্যেক অঙ্গ উপাঙ্গ দেখা আবশ্যক। কেবল দেখা নহে, প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক সূক্ষ্ম অংশের ক্রিয়া, রসায়ন, তাপ আলোক তড়িতাদি তেজে তাহাদের বিকার জানা আবশ্যক। এই খানে এক দিকে শক্তিবিদ্যা, অন্যদিকে রসায়নবিদ্যা প্রথম আবশ্যক হয়। জীবদেহে তেজের ক্রিয়া পরিদর্শন করা বিলক্ষণ দুরূহ। জীবদেহের রসায়ন ততোধিক দুরূহ।

বাহ্য ও আভ্যন্তর দেহ আলোচনা করিতে করিতে উহার উৎপত্তি চিন্তা করিতে হয়; সেই জীবের উৎপত্তি কোথায়, এবং কি ক্রমেই বা সেই সূক্ষ্ম উৎপত্তি হইতে তাহার বর্ত্তমান দেহের উৎপত্তি হইয়াছে। জন্মের পর জীবের শৈশবাবস্থা, তাহা হইতে তাহার যৌবন, প্রৌঢ়, ও বৃদ্ধাবস্থা ক্রমশঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। একের পরিণতিতে অন্যের উদ্ভব। এই পরিণতি-পরম্পরা জীববিদ্যার একটি শিক্ষার ব্যাপার।

কিন্তু সেই জীবের বাহ্যদেহ অন্য অনেক জীবের দেহের তুল্য। সর্ব্বাংশে অবশ্য তুল্য নহে; কেন না এরূপ হইলে তৎসমুদয় একই জীব হইত। কোন অংশে সেই জীব অপর কতকগুলির, কোন অংশে আবার অন্য কতকগুলির তুল্য। সকল স্থলে অঙ্গবিশেষের সাম্য বা বৈষম্য সহজে লক্ষিত হয় না। সেই অঙ্গের আভ্যন্তর গঠন ও উৎপত্তিক্রম আলোচনা করা আবশ্যক হয়। এইরূপে, সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য বিচার করিয়া সেই জীবের বংশ, জাতি, গণ প্রভৃতি স্থির করিতে হয়। এই শ্রেণীবিভাজন দ্বারা একদিকে সেই জীবের কুটুম্ববর্গ যেমন অবগত হইতে পারা যায়, তেমনই অন্যদিকে তাহার নিজের সম্বন্ধেও জ্ঞান স্পষ্ট হয়।

জীবন আছে বলিয়াই জীব। জীবের জীবনক্রিয়া এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। যে জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জাতি বন্ধ বিচার করা গেল, সে জীবের স্থিতি-সম্পাদন অবশ্য জ্ঞাতব্য। কি ক্রমে উহার বৃদ্ধি, পুষ্টি; কি ক্রমে উহার বংশস্থিতি; জগতের অন্যান্য পদার্থসমূহ দ্বারা উহার কি ইষ্টানিষ্ট সাধিত হয় এবং কি ক্রমেই বা উহা আত্মরক্ষায় সমর্থ, ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক। উহার জীবনক্রিয়া বুঝিতে গেলে রসায়ন ও শক্তিবিদ্যার সাহায্য পদে পদে আবশ্যক হয়।

কিন্তু এখনও উহার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান হইল না। পৃথিবীর সর্বত্র উহা বাস করে, না, কিম্বা পূর্ব্বকালে উহার বর্ত্তমান আকার ছিল না। এক্ষণে ভূগোলের কোন্ কোন্ প্রদেশে উহার বাস, উহার জ্ঞাতি কুটুম্বেরাই বা কোথায় বাস করিতেছে, ইত্যাদি বিষয় আলোচনার নিমিত্ত ভূগোল-বিবরণ জানা আবশ্যক। সেইরূপ কোন্ অতীত কালে উহার প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল, ভূ স্তরের কোন্ পুরাতন স্তরে উহার অস্তিত্বের নিদর্শন আছে, সেই অতীত কালে পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা কি প্রকার ছিল, ইত্যাদি বিষয় অবগত হইতে ভূ-বিদ্যার জ্ঞান আবশ্যক।

এত তত্ত্বসংগ্রহেও কিন্তু "কাজের" কথা আসে নাই। সেই জীবের দ্বারা আমাদের কিছু "কাজ" হইতেছে কি? যদি উদ্ভিদ্ হয়, তাহা হইলে হয়ত তাহাতে আমাদের খাদ্য, ঔষধ, বস্ত্র প্রভৃতির উপায় হইতেছে। তাহার মূল, কাণ্ড, প্রকাণ্ড, পত্র, পুষ্প, ফল, বীজ, আমাদের কোন না কোন কাজে আসিতেছে। যদি প্রাণী হয়, তাহা হইলেও তাহা আমাদের পক্ষে বৃথা নহে। হয়ত তাহার চর্ম্ম, মাংস, অস্থি, শৃঙ্গ, মেদ আমরা কাজে লাগাইতেছি, হয়ত তাহার স্বভাব সবিশেষ জানা নাই বলিয়া তাহাকে কাজে লাগাইতে পারা যায় নাই। বস্তুতঃ জীব কেন, পৃথিবীর কোন্ বস্তুটি কাজে লাগাইতে পারা যায় না? অবশ্য অজ্ঞ অসভ্যেরা যে বস্তু যেমন কাজে লাগায়, বিশেষজ্ঞ সভ্যেরা তাহাকে তেমন কাজে কিংবা তদপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাজে লাগাইয়া থাকে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে যে, আমাদের প্রাণরক্ষার উপায়স্বরূপ কৃষিবিদ্যা ও পশুপালন-বিদ্যা জীববিদ্যার প্রশাখা মাত্র। ছাগাদি পশু, কপোতাদি পক্ষী, রোহিতাদি মৎস্য, রেশমকীটাদি পতঙ্গ প্রভৃতি কত প্রকার প্রাণীর বিষয় আমাদিগকে চিন্তা করিতে হয়। আমাদের যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্যই মৃত্তিকাজ উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ। সুতরাং স্বর্ণ রৌপ্য প্রস্তরাদির বিষয় অবগত হওয়া যেমন আবশ্যক, উদ্ভিদ ও প্রাণীদিগের বিষয় শিক্ষা করাও তেমনই আবশ্যক।

কিন্তু মানুষের মন ইহাতেও তৃপ্ত নহে। জগতের প্রত্যেক ব্যাপারের উপায় ও উপেয় অন্বেষণ করে। একটি দুটি দশটি লক্ষটি কোটি কোটি প্রকার জীবে পৃথিবী ব্যাপ্ত। এত প্রকার জীব কি ক্রমে হইয়াছে? অবশ্য আকাশ হইতে দুপদাপ করিয়া কোন অতীত কালে পড়িবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে কি এই পৃথিবীর মাটি হইতেই সকল প্রকার জীবের সৃষ্টি? কে জানে। ভিন্ন ভিন্ন মানব সমাজের পুরাণে এক এক কথা বলে। কিন্তু জীববিদ্যা, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানসমূহ সে সকল কথা পৌরাণিকী বলিয়া তাহাতে কর্ণপাত করিতেও সময় দেয় না। কত লোকে কত কথা বলে; তা বলিয়া কি সকল কথাই বিচার করিয়া থাকি? যাহা হউক, অতীত কালের জীবরাজ্য পর্য্যটন করিতে গেলেই একদিকে যেমন ভূবিদ্যা, অন্যদিকে তেমনই জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য লইতে হয়।

জীববিদ্যা বলিলে কি বুঝি, তাহার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত উত্তর পাওয়া গেল। দেখা গেল, উহার সহিত প্রায় সকল মূল বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অধিক কি, যে মানুষরূপ প্রাণী আমরা নিজে এবং যে মানুষ জীবের ভাবনায় আমরা জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত আকুল, সেই জীবের আধি ব্যাধি, উন্নতি অবনতি, মানসিক ক্রিয়াসমষ্টির আলোচনারূপ আয়ুর্ব্বেদ, মনোবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সেই জীববিদ্যার শাখা প্রশাখা প্রপ্রশাখা মাত্র। নিজেদের বিষয় অবশ্য আমরা খুব জানিতে চাই। তাই স্বাস্থ্যরক্ষা রোগচিকিৎসা-বিদ্যা হইতে আমাদের যাবতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ ব্যাপার লইয়া এক একটা বিজ্ঞানের অবতারণা করিয়াছি।

জীববিদ্যা অতিশয় বৃহৎ, অতিশয় দুরূহ। অতিশয় বৃহৎ বলিয়া উহা উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যারূপ দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। অতিশয় দুরূহ বলিয়া জর্ম্মানিদেশের অধ্যবসায়ী, সহিষ্ণু ও জ্ঞানপিপাসু অধ্যাপক-মণ্ডলীর মধ্যেই এই বিদ্যার উন্নতি হইয়াছে। বস্তুতঃ জীববিদ্যার অধিষ্ঠান জর্ম্মানি দেশে। ইংলণ্ড এই বিদ্যা আলোচনা করে না, এমন নহে। কিন্তু যদি মৌলিক গ্রন্থ দেখিয়া বিদ্যার অধিষ্ঠানভূমি স্থির করিতে হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডকে, ফ্রান্সকে, রুসিয়াকে, সকলকেই জর্ম্মানির শিষ্য বলিতে হইবে। জীববিদ্যার কোন না কোন শাখায় দারবিন, হক্সলী, মিভার্ট, লাংকেষ্টার, বালেস প্রভৃতির নাম আছে। কিন্তু যখনই প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা বিষয়ক মৌলিক বৃহৎ গ্রন্থ অন্বেষণ করি, তখনই ইংলণ্ডের পরাভব এবং

জর্ম্মানভাষা হইতে ইংরাজীতে অনূদিত গ্রন্থ দেখিতে হয়।

আর আমাদের দেশে? এদেশে কলেজের বাহিরে কোন্ বিজ্ঞানের চর্চ্চা আছে? পূর্ব্বকালে আধুনিক পাশ্চাত্য জড় বিদ্যার কোনও বিদ্যাই এদেশে ছিল না, এখনও নাই। কিন্তু কার্য্যকালে জীববিদ্যার অভাব বোধ করিতে হয়। আমাদের বৈদ্যক ঔষধে বহুবিধ উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়। এক একটা তৈলের নিমিত্ত গন্ধমাদন অন্বেষণ করিতে হয়। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বৃক্ষলতাদির নাম করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তাহাদিগকে বিনিশ্চয় করিবার উপায় বলিয়া যান নাই। গোপাল, সন্ন্যাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া গাছ চিনিয়া লইবার উপদেশ আছে। কিন্তু যোজনান্তে ভাষা পরিবর্ত্তনের সহিত বৃক্ষলতাদির নামেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। বোধ করি পূর্ব্বকালেও নামের প্রভেদ ছিল। তথাপি আবশ্যক বৃক্ষাদির লক্ষণ দিবার প্রয়োজন শাস্ত্রকারগণ ভাবেন নাই। ফলে দেখা যায়, এক একটা গাছ ঠিক করিয়া লইতে বিষম গোলযোগে পড়িতে হয়।

দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধ হইবে। আমার কোন প্রবাসী বন্ধু কলিকাতার কোন কবিরাজ মহাশয়ের নিকট একটি ঔষধের ব্যবস্থা আনিয়াছিলেন। সেই ঔষধ শ্বেত বেড়েলার পাতার রস দিয়া সেবন করিবার আদেশ ছিল। এখানে কোন ঔষধপত্র-বিক্রেতা শ্বেত বেড়েলা নাম শুনিয়া একটি ছোট গাছ দিল। এক কবিরাজ মহাশয়ও সেই গাছ দেখাইয়া দিলেন। বন্ধুর সঙ্গে শ্বেত বেড়েলার দুই একটি শুষ্ক পাতা ছিল। তাহার সহিত এই গাছের পাতার অনৈক্য দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হয়। আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে দেখিলাম, তাহা শ্বেত বেড়েলা কেন, কোন বেড়েলাই নহে। এই প্রকার ভ্রমের কারণ অনুসন্ধানে বুঝিলাম, ভূমিআমলকির চলিত ওড়িয়া নাম বাড়ী আঁওলা (আম্‌লা); তাহা হইতে বাঙ্গলা বড়েলা ওড়িয়ার বাড়ী আঁওলায় পরিণত হইয়াছে। বাঙ্গলা বেড়েলার ওড়িয়া নাম বজ্রমূলী।

দেশভেদে একই গাছের এইরূপ বিভিন্ন নাম আছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এক এক দ্রব্যের নানাবিধ দোষগুণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দ্রব্যবিনিশ্চয় সম্বন্ধে বড় একটা উপদেশ করেন নাই। সেদিন কোন কবিরাজ মহাশয়ের অনুরোধে শঙ্খদ্রাবক প্রস্তুত করিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যে কয়েকটি দ্রব্য আনিয়া দিলেন, তাহাদের যোগে কিরূপে দ্রাবক অম্ল প্রস্তুত হইতে পারিবে, তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। ফলে তাহাই দেখিলাম। অম্ল উৎপন্ন না হইয়া একটি মিশ্র ক্ষার হইল। কিন্তু শঙ্খ দ্রব করিতে পারে বলিয়া নাম শঙ্খদ্রাবক। অতএব বুঝা গেল দ্রব্যবিনিশ্চয়ে কবিরাজ মহাশয় ভ্রম করিয়াছিলেন। আমাদের শরীরের প্রতিক্রিয়া দেখিয়া ঔষধের শুদ্ধি অশুদ্ধি বিবেচনা করা সমীচীন নহে। প্রসিদ্ধ মকরধ্বজ স্বর্ণ-পারদ গন্ধক যোগে প্রস্তুত হইবার উপদেশ। কিন্তু কোন বিচক্ষণ বৃদ্ধ কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন, ৮ মাসা স্বর্ণ দিয়া মকরধ্বজ চাপাইলে ২ মাসাও তাহাতে লাগে কি না সন্দেহ। বস্তুতঃ মকরধ্বজে স্বর্ণ থাকিবেই কি না, থাকিলে কি অনুপাতে থাকিবে, তাহা নির্দ্দেশ না করিলে হিঙ্গুলও মকরধ্বজ নামে বিক্রীত হইতে পারিবে।

কালিদাস প্রভৃতি আমাদের প্রাচীন কবিগণ উপমার নিমিত্ত পৃথিবীর কত না বস্তুই দেখিয়াছিলেন। কিন্তু দুই দশটি বৃক্ষলতা ও প্রাণী লইয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট ছিলেন। বৃক্ষলতার উল্লেখ বরং দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রাণি-ঘটিত উপমার বা বর্ণনার অত্যন্তাভাব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃতসাহিত্যানুরাগী কেহ এই সকল উপমা দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিলে আমাদের প্রাচীনদিগের জীবরাজ্য পরিদর্শন অবগত হইতে পারা যায়। কোন কোন পুরাণে গাছ-পালা জীবজন্তুর নাম আছে। মনুসংহিতা ও কোন কোন পুরাণে উদ্ভিদ ও কোন কোন প্রাণীর এক একটা স্থূল বিভাগ আছে। বায়ুপুরাণে হস্তী প্রভৃতি কয়েকটি প্রাণীর উৎপত্তিও আছে, কিন্তু অন্যত্র কেবল নামেই শেষ। অবশ্য অশ্ব ও হস্তী চিকিৎসা গ্রন্থ আছে। কিন্তু এ সকলেও জন্তুদিগের বিশেষ বিশেষ স্বভাব জানিতে পারা যায় না।

বস্তুতঃ চারিদিকে ঘরে বাহিরে যে সকল আগাছা কীটপতঙ্গ দেখিতে পাই, তাহাদের সংস্কৃত নাম নাই, চলিত নামও নাই। এক রকম পোকা, এক রকম গাছ, বলিয়াই জীববিদ্যার পরিচয় শেষ হয়। পল্লীগ্রামের লোকেরা বরং অপেক্ষাকৃত অনেক গাছপালা কীটপতঙ্গের নাম জানে, নগরবাসীরা এ বিষয়ে আরও অজ্ঞ।

অবশ্য পূর্ব্বকালে এদেশে এবিদ্যা ছিল না। তেমনই একালের কোন বিদ্যাই ছিল না। কিন্তু এখন যেমন ইতিহাস, কবিতা, নাটক, উপন্যাস রচনার খরবেগ দেখিতে পাই, অন্যান্য বিষয়ের তেমন নাই। বঙ্গ-বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলিয়া দুই একটি বিজ্ঞানের প্রথম পুস্তক লিখিত হইয়াছে, কিন্তু জীববিদ্যা উপেক্ষিত ছিল বলিয়া সে বিষয়ে শিশুপাঠ্য পুস্তকও দেখিতে পাই না।

প্রাণিবিদ্যা এক্ষণে প্রায় দুইভাগ করা হইয়াছে। একটি মূল, অপরটি শাখা। এই শাখার নাম প্রাণিবৃত্তান্ত। পূর্ব্বকালে য়ুরোপে প্রাণিবৃত্তান্ত ছিল; কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উহাই প্রাণিবিদ্যা নামে শিক্ষা করা হইত। এক্ষণে প্রাণি-বিদ্যারই প্রাধান্য এবং প্রাণিবৃত্তান্তের আদর ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে। প্রাণিবৃত্তান্তের নিমিত্ত প্রাণিসমূহের স্বভাব ধর্ম্ম অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে হয়। সাবধানে পরিদর্শন করিতে পারিলে এ বিষয়ের জ্ঞান হয়। হংস নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করে, এ প্রকার পরিদর্শনে ফল নাই। তেলা পোকা কুমরে পোকার সংসর্গে কুমরে পোকায় পরিণত হয়, ইহা পরিদর্শনের অভাবের ফল। জীববিদ্যা শিক্ষা দ্বারা যদি বিশেষ কিছু ফল হয়, তাহা সূক্ষ্ম দৃষ্টির বিকাশ। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যার সমস্ত বিষয় ভুলিয়া গেলেও শিক্ষার ফলটা থাকিয়া যায়। এই ফলের সহিত জীবরাজ্যের একটা সম্পর্ক জ্ঞান থাকে, যাবতীয় জীবের প্রতি একটা সহানুভূতি জন্মে। এই শিক্ষার ফলের নিমিত্ত ইংলণ্ডে আচার্য্য হক্সলী আমরণ সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন।

প্রাণিবিদ্যা শিখিতে গেলে অন্ততঃ কতকগুলি প্রাণিদেহ ব্যবচ্ছেদ করা আবশ্যক। এ দেশ মাংসাশীর দেশ নহে; কাটাকাটি রক্তারক্তি দেখিতে লোকে ভালবাসে না। এমন লোক আছে যাহারা দুই একবার রক্তপাত দেখিলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। ফলে যে দেশে অহিংসা পরমোধর্ম্ম, সে দেশে প্রাণিবিদ্যার প্রতি আকর্ষণ অল্পই থাকিবে।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিখিতে এ বিঘ্ন নাই। কৃষিপ্রধান দেশে উহার সম্যক্ প্রয়োজনও আছে। অবশ্য পুথিগত বিদ্যা বিদ্যাই নয়। প্রত্যক্ষভাবে স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া উদ্ভিদ্‌-তত্ত্ব সংগ্রহ করা আবশ্যক। কিছুকাল পূর্ব্বে কোন সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, একস্থানে হরিতকী বৃক্ষে জাম ফল ফলিয়াছিল। সংবাদদাতা উক্ত জামফল স্বয় প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারি না। কি ইহা নিশ্চিত বলিতে পারি তিনি ফলটা ব্যবচ্ছেদ করে নাই, বাহ্য আকারে ভুলিয়াছিলেন। ধানের গাছে তক্ত হয়, এ বিদ্রূপের মূলে অনেক সত্য আছে।

এ সকল বিদ্যা শিখিবার বিশেষ বিঘ্ন ঘরের কোণে আমাদের বসিয়া থাকার অভ্যাস। পরমেশ্বর চক্ষু দিয়া ছেন দেখিবার নিমিত্ত; আমরা ঘরের কোণে বসিয়া দিবালোকে ও দীপের আলোকে লেখা দেখিয়াই চক্ষু সার্থকতা করি। দুঃখের বিষয় সেখানে গাছপালা জন্মে না, পিপড়ে ও মশা ভিন্ন অন্য জন্তু বেড়াইতে আসে না আমাদের অপেক্ষা সাহেবেরা এ বিষয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছুটী পাইলেই, কাজের বিরাম ঘটিলেই, ভ্রমণে, বিহারে, বন ভোজনে, মৃগয়ায় বহির্গত হয়। এইরূপে শরীরটা ভাল থাকে, জীবনটা সুখে যায়, আর শিখিবার জানিবার ইচ্ছা না থাকিলেও অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারা যায়। বস্তুতঃ প্রকৃতির সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় সাহেব ও ফিরিঙ্গী যুবাদের যত আছে, আমরা বুড়া হইতে বসিয়াও আমাদের তত ঘটে নাই। ইহারই ফলে তাহারা ব্যবসায়ী ধনশালী; আমরা নিষ্কর্ম্মা নিঃস্ব। তাহাদের আত্মনির্ভর আছে, আমরা পরমুখাপেক্ষী। ভাবিয়া দেখিলে বাহ্যপ্রকৃতির সহিত যে জাতির যত সম্পর্ক, ধনাগমের পথ সে জাতির তত মুক্ত। আর, বাহ্যপ্রকৃতির তিনভাগের দুই ভাগ জীবরাজ্য অধিকার করিয়া আছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

ক্ষীরাৎকুম্ভ।

বাপ্পার অধস্তন যে সকল সূর্য্যবংশীয় নৃপতি চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজপুতকুল উজ্জ্বল এবং হিন্দুনামের গৌরবরক্ষা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাণাকুম্ভের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। চিতোরের জয়স্তম্ভ (যাহা 'ক্ষীরাৎকুম্ভ' "ক্ষীরোদথাম্বা" "জয়ৎলাট" ও" বড়াকীর্ত্তম্," প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়) রাণা কুম্ভের কীর্ত্তি। ঐ

জয়স্তম্ভ যে কেবল রাজপুত বীর্য্য এবং রাজবারার গৌরব এমন নহে, ইহার সহিত হিন্দুহৃদয়ের উচ্চতা এবং আর্য্য-সভ্যতার অনেক তথ্য বিজড়িত আছে। চিতোরের চিরশত্রু আলাউদ্দিন ১৩০৩ খ্রীঃঅব্দে এবং সুলতান বাহাদুর শাহ ১৪৩৩ অব্দে চিতোরের উচ্ছেদ সাধন করে। যাহা অবশিষ্ট ছিল, ১৫৬৮ অব্দে সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক তাহা সমাপ্ত হয়। এই শেষ লুণ্ঠনের পর ইহার আর জীর্ণসংস্কার হয় নাই। মিবারের রাজধানীও চিতোর হইতে উদয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

১৪১৯ খ্রীঃঅব্দে কুম্ভ চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাণা কুম্ভ বিবিধ সদ্‌গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় প্রজারঞ্জক, স্বদেশবৎসল, পণ্ডিত এবং বহুদর্শী নরপতি জগতে বিরল। ইনি সার্দ্ধশতাব্দিকাল বিমল যশের সহিত রাজ্যপালন এবং এই দীর্ঘকালের মধ্যে স্বদেশের অনেক মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন। রাজ্যলোলুপ অর্ব্বাচীন তনয় 'উদা'র গুপ্তাঘাতে 'অকালে কালগ্রাসে পতিত না হইলে আরও কত কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেন। এই বহুদর্শী নরপতি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াই দেখিলেন, রাজ্যের প্রায় চতুর্দ্দিকেই মুসলমান রাজ্য অথবা তাঁহাদের সামন্তসমূহ। মিবার যেন শত্রুসমুদ্রবক্ষে ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় ভাসিতেছে! রাণা ইহার ভবিষ্যৎ মানসনেত্রে দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন, সিন্ধুনদের পশ্চিমকূল হইতে মধ্যে মধ্যে যে কৃষ্ণ মেঘমালা ভারতের শুভ্র গগনে কলঙ্কের রেখাপাত করিয়াছে, অচিরে তাহা ঘনীভূত হইয়া চতুর্দ্দিক ছাইয়া ফেলিবে এবং মিবারসিংহাসনের যশোভাতি নিবিড় অন্ধকারে ডুবাইয়া দিবে। পূর্ব্ব হইতে আত্মরক্ষার আয়োজন চাই। সুতরাং তিনি মিবারের স্থানে স্থানে সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন এবং কয়েকটি প্রাচীন দুর্গের জীর্ণ-সংস্কার করাইলেন। মাড়বার এবং মিবারের অধিকার লইয়া অন্তর্বিদ্রোহ দূর করিবার মানসে রাণা ঐ দুই রাজ্যের সীমারেখা সংস্থাপন করিলেন এবং সর্ব্বতোভাবে শত্রুর আক্রমণ হইতে মিবারকে দুর্ভেদ্য করিয়া রাখিলেন। মিবার সংরক্ষণের জন্য যে চতুরশীতি দুর্গ স্থানে স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে বত্রিশটি দুর্গ রাণা কুম্ভের নির্ম্মিত। প্রমার দুর্গ তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। ইহার অভ্যন্তরে যে কয়েকটি মন্দির দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে একটিতে রাণা কুম্ভ এবং তাঁহার পিতা মুকুলজীর প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। রাজপুতগণ তথায় যাইয়া ভক্তিপূত হৃদয়ে সেই পাষাণ-প্রতিমা দুটির আজিও পূজা করিয়া থাকে। প্রজাবৎসলতা এবং রাজভক্তির ইহা অপেক্ষা প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

কুম্ভের সিংহাসনারোহণের পূর্ব্ব হইতে মালব এবং গুজ্জর সহানুভূতি-সূত্রে বদ্ধ হইয়া শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল, এবং মিবারের ঐশ্বর্য্যসমৃদ্ধি দর্শনে ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতেছিল। এক্ষণে কুম্ভের শাসনকালে ইহার গৌরবগরিমা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না। কুম্ভের স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা * প্রচলিত হওয়ায় মালব-রাজের ঈর্ষানলে ইন্ধন সংযুক্ত হইল। মালব-রাজ মহম্মদ খিলিজি গুজ্জর-রাজ সমভিব্যাহারে বিশাল বাহিনী লইয়া ১৪৪০ খ্রীঃঅব্দে চিতোর আক্রমণ করিলেন। মহারাণা কুম্ভ এক লক্ষ অশ্ব ও পদাতিক এবং চতুর্দ্দশশত রণমাতঙ্গ লইয়া মালব ও মিবারের সন্ধিস্থলে শত্রুর গতিরোধ করিলেন। চিতোরপতি বীরবিক্রমে শত্রুদল মথিত করিয়া খিলিজিরাজ মহম্মদকে বন্দী করিয়া আনিলেন। ভট্টগ্রন্থে লিখিত আছে,

---

*প্রত্নতত্ত্ববিৎ প্রিন্সেপ সাহেব একটি মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। জেনারেল কানিংহাম তাহার পূর্ণ পাঠোদ্ধার করিয়া দেন। ঐ মুদ্রার এক পৃষ্ঠে **কমক** (অর্থাৎ কুম্ভক) এবং + এইরূপ চিহ্ন আছে। অপর পৃষ্ঠে **যকলিঙ্গ** (একলিঙ্গ) দেবের মন্দির অঙ্কিত আছে। রাণাগণ সকলেই মহাদেব একলিঙ্গের দেওয়ান বলিয়া পরিচয় দেন। ফেরিস্তা তাঁহার ইতিহাসের একস্থানে লিখিয়াছেন—

و هم دران ایام سلطان محمود خلجي متوجه ولایت جیتور
گردید راناکونبها از طرق مدار او مواسا پیش آمده پارهٔ زر و
نقره مسکوک پیشکش فرستاد و چون آن سکه راناکونبها داشت
باعث ازدیاد غضب محمودي گردیده پیشکش را پس فرستاد

অর্থাৎ "সুলতান মামুদ খিলিজি জয়পুর অভিমুখে যাত্রা করিলে রাণা কুম্ভ আতিথ্য এবং সখ্যতার নিদর্শন-স্বরূপ স্বনামাঙ্কিত রৌপ্য এবং সুবর্ণ মুদ্রা উপহার প্রদান করেন। কিন্তু রাণার নাম অঙ্কিত দেখিয়া মামুদের আর ক্রোধের পরিসীমা ছিল না। সুতরাং তাঁহার উপহার প্রত্যর্পিত হইয়াছিল"।

—*The Chronicles of the Pathan Kings of Delhi.* By Edward Thomas. Page 357. Ed. 1871. London.

মহম্মদ চিতোরের দুর্গে ৬ মাস কাল বন্দী ছিলেন। কিন্তু মুসলমান ঐতিহাসিক আবুল ফজল মালবরাজের অবরুদ্ধ থাকিবার কাল নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি কুম্ভের মাহাত্ম্য এবং ঔদার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, রাণা মহম্মদকে কেবল যে মুক্তির বিনিময়ে কোনরূপ নিষ্ক্রয় গ্রহণ না করিয়া নিষ্কৃতি দান করিলেন এমন নহে, মালবরাজকে বিবিধ উপঢৌকন দিয়া সম্মানসহকারে স্বরাজ্যে প্রেরণ করিলেন এবং জয়লব্ধ রাজমুকুট ও অন্যান্য দ্রব্য স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ চিতোরের রাজধানীতে রক্ষা করিলেন। এই সকল দ্রব্য বহুকাল রক্ষিত হইয়াছিল। পরে রাণা সঙ্গের পুত্র উক্ত রাজমুকুট বাবরকে উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। একথা বাবর তাঁহার আত্মকাহিনীতে * উল্লেখ করিয়াছেন। এই হিন্দু মুসলমানের যুদ্ধে রাণা কুম্ভের জয়লাভ চিরস্মরণীয় করিবার জন্যই জয়স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা। বিজয়ী মিবারপতি একজন বিধর্ম্মী শত্রুর প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন জগতের ইতিহাসে তাহা অতীব বিরল। এই ঔদার্য্যগুণেই যবনরাজ মুগ্ধহৃদয়ে তাঁহার বন্ধুতাপাশে চিরবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার ফলে, যখন দিল্লীশ্বর হিসার নামক স্থানে স্বীয় ধ্বজদণ্ড প্রোথিত করিলেন, তখন রাণার পক্ষ হইতে মালবরাজ মিবার ও নিজরাজ্যের সৈন্য লইয়া ঝুনঝুনুর সমরক্ষেত্রে দিল্লীশ্বরকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এখানে বিজয়ীর ভ্রূকুটিভঙ্গে অথবা বন্দীর লৌহশৃঙ্খলভয়ে যাহা না হইত, হৃদয়ের বিনিময়ে তাহা সাধিত হইল।

মালবরাজকে পরাজিত করিবার একাদশ বর্ষ পরে, অর্থাৎ ১৪৫১ খ্রীঃঅব্দে চিতোরের জয়স্তম্ভের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়া দশবৎসরে সম্পূর্ণ হয়। ইহাতে ৯০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। চিতোরের পর্ব্বত-শিখরে
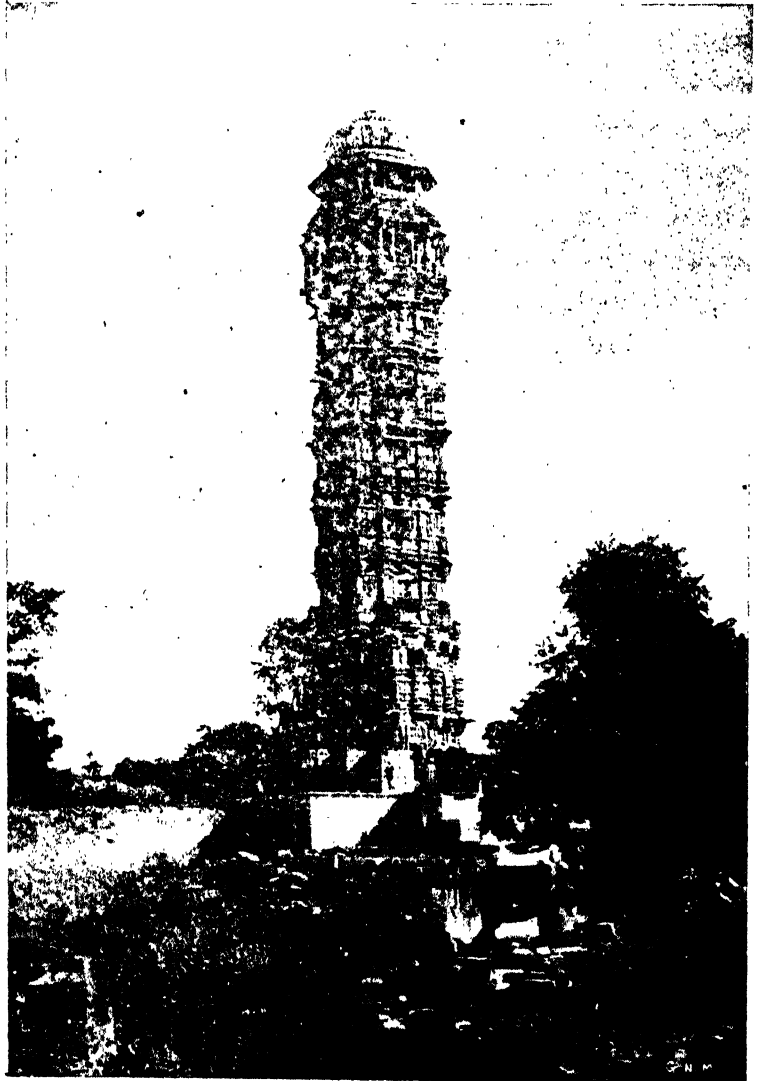
চিতোরের জয়স্তম্ভ।

যথা হইতে নগরের চতুর্দ্দিক বেশ দৃষ্টিগোচর হয়, এরূপ উন্নত ভূমিতে, ৪২ ফুট প্রশস্ত বেদীর উপর, ১৩০ ফুট উচ্চ আমূল প্রস্তরময় এই সমচতুষ্কোণ স্তম্ভ উত্থিত হইয়াছে। স্তম্ভমূলের এক একটি পার্শ্ব ৩৫ ফুট প্রশস্ত। ইহা নয়টি

* Erskin's *Memoirs of Baber*, Page 385.

তলবিশিষ্ট। বাহির হইতে তলগুলি বেশ দৃষ্টিগোচর হয়। কারণ প্রত্যেক তলের দ্বার, গবাক্ষ প্রস্তরবিশিষ্ট এবং চতুর্দ্দিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভবিশিষ্ট অলিন্দবদ্ধ ও নানা প্রকার কারুকার্য্যখচিত। স্তম্ভটি আমূল হরিদ্রাবর্ণের মূল্যবান্ মসৃণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে স্ফটিক (quartz) ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার প্রস্তর এরূপ কঠিন যে স্তম্ভগাত্রে খোদিত মূর্ত্তিগুলি আজি প্রায় সার্দ্ধ চারিশত বর্ষের জলবায়ুর প্রকোপেও কিছুমাত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় নাই।

যে বেদীর উপর স্তম্ভ দণ্ডায়মান, তাহাতে আরোহণ করিতে প্রথমে ১৪টি সোপান অতিক্রম করিতে হয়; তৎপরে বেদী হইতে ৬টী সোপান উঠিলে প্রথম তলের দ্বারদেশ পাওয়া যায়। ইহার ঠিক সম্মুখে ৪টী অভিনব প্রণালীর সোপান। সেগুলি অতিক্রম করিলে তবে প্রকৃত প্রথম-তলে প্রবেশলাভ হয়। প্রথমতলের তিনটী কোণ বেষ্টন করিলে উর্দ্ধে উঠিবার সোপানাবলী পাওয়া যায়। তাহার ১১টীর উপর দ্বিতীয় তল। মধ্যস্থলে একটী চতুষ্কোণ কক্ষ। সোপানশ্রেণী তাহার পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিয়াছে। এইরূপ তিনদিক বেষ্টন করিয়া ১৪টী সোপান উঠিয়া এবং তিনটী নামিয়া তৃতীয় তলে প্রবেশ করিতে হয়। এস্থান হইতে পূর্ব্বনিয়মে ১৪টী ধাপ উঠিলে চতুর্থ তলে এবং তথা হইতে ১৪টী ধাপ উঠিয়া আর ৩টী ধাপ নামিয়া পঞ্চম তলে যাইতে হয়। পঞ্চম তলে মধ্যগৃহ ব্যতীত ইহার সংলগ্ন আর একটী ক্ষুদ্র গৃহ আছে। পঞ্চম তল হইতে স্তম্ভ সংকীর্ণ ভাব ধারণ করিয়াছে, সুতরাং কক্ষের ভিতর দিয়া সোপান নির্ম্মাণের আর স্থান নাই। এখান হইতে বহির্দ্দিক দিয়া চতুষ্কোণ গৃহ বেষ্টন করিয়া ১৫টী সোপান দ্বারা ষষ্ঠতলে, তথা হইতে ১৬টী দ্বারা সপ্তম তলে এবং আর ১৪টী সোপান অতিক্রম করিয়া অষ্টম তলে প্রবেশ করিতে হয়। এস্থান হইতে আর সোপান-শ্রেণী নাই। শুনা যায় উপরের সোপানগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। নবমতলে উঠিবার জন্য একখানি কাঠের সিঁড়ি সংলগ্ন আছে। সর্ব্বশুদ্ধ ১২৭টী সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া তার পর এই মই দিয়া সর্ব্বোচ্চে অর্থাৎ নবমতলে পৌঁছিতে পারা যায়। এই নবমতল সার্দ্ধ সপ্তদশ ফুট প্রশস্ত অষ্টকোণ হল। ইহার উপর বহুসংখ্যক স্তম্ভশ্রেণী বিরাজিত, তদুপরি গম্বুজ। গম্বুজের শিখর পর্ব্বতশিখর হইতে ১৩০ ফুট উচ্চ। সুতরাং চিতোরের সমতল-ভূমি হইতে জয়স্তম্ভের এই গগনভেদী উচ্চতা কিরূপ বিরাট, মনে করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। স্তম্ভের নবমতল হইতে চিতোরের বহুদূর পর্য্যন্ত, এমন কি মালবের সমতল ভূমি পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়। নগরমধ্যস্থ দুর্গ, প্রাসাদ, দেবালয় এবং তোরণদ্বার প্রভৃতি অতীব সুন্দর দেখায়। গম্বুজ ছাড়িয়া দিলে অবশিষ্টাংশ জৈন-স্থাপত্য-রীতির অনুযায়ী বলিয়া বোধ হয়। কারণ ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল জৈন স্তম্ভগুলির অনুরূপ। গম্বুজটী হিন্দু-স্থাপত্য-প্রণালীতে গঠিত; ইহার ভাস্কর-কার্য্যও আধুনিক। এই উভয় প্রকার শিল্পের সমাবেশ কীর্ত্তিস্তম্ভের এক অভিনব শ্রী সম্পাদন করিয়াছে। পুরাতন গম্বুজ ভাঙ্গিয়া গেলে মহারাণা স্বরূপসিংহ নূতন গম্বুজ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৮৩৯ খ্রীঃঅব্দে স্বনামখ্যাত ফর্গুসন সাহেব এই স্তম্ভের নক্সা লইতে গিয়া ইহার আদি গম্বুজ স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। স্তম্ভের ভিতরে আলোক প্রবেশের জন্য প্রত্যেক তলে লোহজালের গবাক্ষ আছে। দ্বার দিয়াও আলোক প্রবেশ করে। কিন্তু যথেষ্ট আলোকের অভাবে ভিতরের অধিকাংশ কারুকার্য্য দর্শন এবং খোদিত লিপি পাঠ করা যায় না। স্তম্ভের ভিতরের গাত্রে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত এবং তন্নিম্নে তাঁহাদিগের নাম ও বিভূতি বর্ণিত আছে। বাহিরে প্রতি তলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভশ্রেণী, কোলঙ্গা, ছাইচ, প্রস্তরখোদিত পাষাণমূর্ত্তি এবং বিবিধ কারুকার্য্য এরূপ প্রচুর পরিমাণে অলঙ্কৃত হইয়াছে যে দৃষ্টিমাত্রেই দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করে। স্তম্ভের যত উপরে উঠা যায়, ততই বৈচিত্রময় শিল্পকার্য্য দেখিয়া ভারতীয় ভাস্কর এবং শিল্পিগণের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। যদিও স্তম্ভগাত্রে তিলমাত্র স্থান শূন্য পড়িয়া নাই, তথাপি এই কারুকার্য্যের বাহুল্য দর্শকের অতৃপ্তিকর হয় না। নবমতলে গম্বুজগাত্রে রাসমণ্ডল অঙ্কিত আছে। "রাধা কানাইয়া"কে ঘিরিয়া ব্রজবালিকা-গণ নানারঙ্গে নৃত্য করিতেছে। প্রত্যেকের হস্তে এক একটী বাদ্যযন্ত্র। রাসমণ্ডলের নিম্নে অতীব মনোরম কারুকার্য্যখচিত সমলঙ্কৃত ঝালরযুক্ত প্রস্তর মোড়ক গুলিতে পার্চমেণ্টকাগজের ন্যায় যেন প্রস্তরপত্র গুটান আছে।

এই সর্ব্বোচ্চ কক্ষের চতুর্দ্দিকে মর্ম্মরপ্রস্তরফলকে চিতোরের রাণা-বংশ-তালিকা এবং তাঁহাদের প্রধান প্রধান কীর্ত্তি-কলাপ প্রকটিত ছিল। কিন্তু চিতোরের ধর্ম্মান্ধ মুসলমান বিজেতাদিগের দৌরাত্ম্যে সেগুলি উৎপাটিত, স্থানে স্থানে বিকৃত ও অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুই খানি সুদীর্ঘ শ্লোকাঙ্কিত পাষাণ-লিপি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। স্তম্ভমূলে এরূপ আর একখানি খোদিত প্রস্তরলিপি আছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রথম দুইখানির ১৮৮৫ খ্রীঃঅব্দে এবং শেষোক্তের ১৮৮৭ অব্দে বেশ স্পষ্ট প্রতিকৃতি গৃহীত হয়। কিন্তু তাহার স্থানে স্থানে কতকগুলি অক্ষর মুছিয়া গিয়াছে। মহাত্মা টড একখানিরই উল্লেখ করিয়াছেন। জনৈক ফরাসি ভ্রমণকারী তাঁহার ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সেইখানির কথাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।* কিন্তু গবর্ণমেণ্টের স্থাপত্যবিভাগের কর্ম্মচারী গ্যারিক সাহেব (যিনি উক্ত তিনখানি পাষাণলিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন) বলেন, "স্তম্ভগাত্রে এমন অনেক শিলালিপি আছে, যাহা ইতিপূর্ব্বে ভিতরের অন্ধকারের জন্য কেহ অনুসন্ধান করেন নাই। সেগুলি আমি সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু আমার উক্ত আবিষ্কারের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বিস্ময়কর এবং বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে তৃতীয় এবং অষ্টমতলে আরবী ভাষায় শিলালেখন দেখিতে পাইলাম! যদ্যপি উহা সাধারণ হিন্দী লিপির ন্যায় প্রস্তরগাত্রে খোদিত হইত, তাহা হইলে উহাতে অভিনবত্ব কিম্বা গুরুত্ব আরোপ করিতাম না, কিন্তু আমি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি সেগুলি স্তম্ভনির্ম্মাণের সমসাময়িক ও ভিত্তিভূমি হইতে একই ভাস্করের হস্তদ্বারা খোদিত। সেগুলি স্তম্ভনির্ম্মাণের পর কখনই সংযোজিত হয় নাই। প্রস্তরস্তম্ভগাত্র হইতে অক্ষরগুলি কাটিয়া তুলা হইয়াছে এবং তাহা কান্তিকুম্ভের মৌলিক নক্সার অন্তর্ভুক্ত ও পূর্ণ স্তম্ভের অংশবিশেষ। তৃতীয় তলের প্রস্তারোপরি (Entablatures) 'আল্লা' এই নাম নয় বার এবং অষ্টম তলের প্রস্তারোপরি আটবার লিখিত হইয়াছে"! গ্যারিক মহোদয় আরও বলেন—

'The word 'Allah' is tantamount to the Musalman *Kalmeh* and indeed is often considered an efficient abridgment of the whole creed............This discovery opens up a problem of which the only solution which presents to me is that the barrier dividing the Hindus and Mahomedans three centuries ago was far less impassable than it is at the present day ....We know that Akbar the Great had decided leanings towards Hinduism and it is not impossible that the opposite process may occasionally have taken effect in the Hindu conscience."*

তাঁহার এই অনুমান সত্য হইতে পারে। এবং যিনি বিধর্ম্মী শত্রুকে আলিঙ্গনদানে আপনার করিয়া লইতে পারেন, তিনি যবন বন্ধুর খাতিরেও ঐ শব্দটী স্তম্ভগাত্রে লিখিবার আদেশদান করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। অথবা প্রবলপ্রতাপ মুসলমান সম্রাট আকবরের হিন্দুধর্ম্মপ্রবণতার কথা ভাবিলে অত্যুদার রাণা যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া দেবদেবীর মূর্ত্তির নিকট প্রণবের পার্শ্বে মুসলমানের কল্‌মাজ্ঞাপক "আল্লা" শব্দের স্থান নির্দ্দেশ করিবেন, এ অনুমান সত্য হইতে পারে। কিন্তু এ অনুমান অপেক্ষা আর একটী কারণ আমাদের মনে স্বতঃই উদয় হয় যে যে ভবিষ্যদ্দৃষ্টি রাণাকে মিবার সংরক্ষণার্থে দুর্গাদি নির্ম্মাণে প্রণোদিত করিয়াছিল, সেই বহুদর্শন-প্রভাবে তিনি হয়ত স্তম্ভনির্ম্মাণের প্রারম্ভেই ভাবিয়াছিলেন যে হিন্দুর দেবমন্দির-এবং কীর্ত্তিস্তম্ভচূর্ণকারী যবনের হস্ত হইতে তাঁহার জয়স্তম্ভ রক্ষার ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। তিনি বেশ জানিয়াছিলেন যাহাতে আল্লার নাম খোদিত আছে, মুসলমান তাহা কখনই নষ্ট করিবে না। মুসলমানের কল্‌মা হিন্দুর কীর্ত্তিস্তম্ভে এই কারণেই স্থান পাইয়াছিল কি না, কে বলিতে পারে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে উত্তরকালে নবমতল হইতে শিলালিপি উৎপাটিত হইলেও অষ্টম তলে কি তন্নিম্নে ধ্বংসকারীর কঠোর হস্তের কোন চিহ্ন নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মুসলমানদিগের অত্যাচারে রাণাগণের বংশতালিকা- এবং কীর্ত্তিকাহিনীসম্বলিত শিলালিপি সকল বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহা হইলেও জয়স্তম্ভ-প্রতিষ্ঠাতার নাম এবং স্থাপনার তারিখ বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

India and its Native Princes, Pages 192-196 – Louis Rousselet.

Report of a Tour in the Panjab and Rajputana, 1883-84. Page 117.

রাজবারার প্রধান ইতিহাসবেত্তা টড্ মহোদয় বলেন,—ক্ষীরাংকুম্ভের সহিত তুলনীয় ভারতে যদি কিছু থাকে তবে সে দিল্লীর কুতব মিনার। যদিও মিনার ক্ষীরাংকুম্ভ হইতেও উচ্চতায় শ্রেষ্ঠ, তথাপি জয়স্তম্ভের ভাস্কর্য্য এবং শিল্পসৌন্দর্য্যের নিকট অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব। ফরাসী ভ্রমণকারী মুঃ রোসেলে তাঁহার এই মতের পোষকতা করিয়াছেন, কিন্তু মিঃ গ্যারিক ইহার অত্যধিক কারুকার্য্য, অযথা সোপানবাহুল্য, যথেষ্ট আলোকপ্রবেশোপযোগী পথের অভাব এবং নির্ম্মাণকৌশলের ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন, ক্ষীরাংকুম্ভের কারুকার্য্য সম্বন্ধে টড মহোদয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদিও স্বীকার্য্য, তথাপি ইহা দিল্লীর সমুন্নত স্মৃতিস্তম্ভের সম্মুখে মুহূর্ত্তের জন্যও দাঁড়াইতে পারে না।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

শর্করা-বিজ্ঞান।

প্রথম অধ্যায়।

ইক্ষুর জাতিভেদ।

ইক্ষুর চাষ ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। যব-দ্বীপ, মরীচি-দ্বীপ, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ, কুইন্স্ল্যাণ্ড, নিউ-সাউথ-ওয়েল্স্, ষ্ট্রেট্স্ সেটেল্মেণ্ট, বার্বেডো, ট্রিনিদাড্, ব্রিটিশ গায়েনা, ইত্যাদি দেশদেশান্তরে ইক্ষুর চাষ এক্ষণে বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষই এই চাষের আদিম কেন্দ্রস্থল। যে সমুদায় শ্রেষ্ঠজাতীয় ইক্ষু এক্ষণে 'মোরিশাস্,' 'ওটাহিটি,' 'বুর্বণ,' রাঙ্গোএ', 'কুইন্স্ল্যাণ্ড,' 'ক্রিয়োল্,' 'জ্যামেকা,' 'টোম্না' এবং 'হোয়াইট্ ট্রান্স্পেরেণ্ট,' (অর্থাৎ 'শ্বেত-স্বচ্ছ') নামে বিখ্যাত, সে সমুদায়ের উৎপত্তি ভারতবর্ষের ইক্ষু হইতেই হইয়াছে। চীনদেশেও অতি প্রাচীনকাল হইতে ইক্ষুর চাষ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার রক্স্বরা চীনা ইক্ষু (Saccharum Sinensis) ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য দেশের ইক্ষু (S. Officinarum) হইতে বিভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। চীনা ইক্ষু আমাদের দেশের ইক্ষু হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহাতে উই লাগে না এবং শৃগালেও ইহা নষ্ট করে না। এ দেশীয় ইক্ষু হইতে যত রস ও গুড় হয়, চীনা ইক্ষু হইতে তদপেক্ষা অধিক রস ও গুড় হয়। ভাগলপুর, মুঙ্গের ও সারন অঞ্চলে 'চিনি' বা 'চিনিয়া' নামক যে ইক্ষু পাওয়া যায়, উহা চীনদেশীয় ইক্ষু হইতে উৎপন্ন নহে। এই ইক্ষু অতি সুমিষ্ট বা চিনিপূর্ণ, নাম দুইটি দ্বারা এইমাত্র বুঝিতে হইবে। অন্যান্য দেশে যখন যন্ত্র ও কৃষিচাতুর্য্য দ্বারা ইক্ষুদণ্ডের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তখন আমাদের দেশেই যে কেবল উন্নতির উপায় নাই অথবা উন্নতির চরম হইয়াছে, এমন কথা কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। কি কি উপায়ে ইক্ষু-চাষের এবং চিনি প্রস্তুতের উন্নতি সাধিত হইতে পারে, ইহাই বর্ণন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

২। ইক্ষু ভিন্ন আরও অন্যান্য উদ্ভিজ্জ দ্রব্য হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ইক্ষুদণ্ড হইতে যে পরিমাণ চিনি পাওয়া যায়, কি বীটমূল, কি খর্জ্জুররস, কি অন্যান্য রস, কি কুলোয়া (Bassia butyracea) কোন দ্রব্য হইতেই এত অধিক পরিমাণ চিনি পাওয়া যায় না। তবে কৃষিচাতুর্য্য দ্বারা আজকাল বীটমূল হইতে প্রায় ইক্ষুদণ্ডের সমপরিমাণ শর্করা বাহির হইতেছে। বীটমূলের 'ফলন' একার প্রতি তের টন্, ইক্ষুর 'ফলন' বিশ টনেরও উর্দ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে আট টন্ বীটমূল হইতে এক টন্ শর্করা উৎপন্ন হইতেছে। শ্রেষ্ঠজাতীয় ইক্ষুদণ্ড হইতেও এইরূপই ফল পাওয়া যায়।

৩। সকল জাতি ইক্ষু হইতে সমান পরিমাণ শর্করা বাহির হয় না। জাতি নির্ব্বাচন করিতে হইলে কেবল যে দণ্ডের স্থূলতা বা ত্বকের কোমলতা দেখিতে হইবে এরূপ নহে। বস্তুতঃ বিস্তৃতভাবে কার্য্য করিতে গেলে কোমলত্বক্ ইক্ষু না লাগাইয়া কঠিনত্বক্ ইক্ষু লাগানই ভাল। কোন্ জাতির 'ফলন' কত, এবং কোন্ জাতি হইতে কি পরিমাণ শর্করা পাওয়া যায়, ইহা জানা আবশ্যক। আবার কোন জাতীয় ইক্ষু নিম্নভূমিতে ভাল হয়, কোন জাতীয় ইক্ষু উচ্চ, প্রস্তরময় বা লোহিতবর্ণের মৃত্তিকায় ভাল জন্মে; কোন জাতীয় ইক্ষু বা জলা জমিতে ভাল জন্মে। জমির তারতম্য অনুসারেও জাতি নির্ব্বাচন আবশ্যক। আবার কোন জাতীয় ইক্ষু যত্ন করিলে বিশেষ লাভজনক হয়, কোন জাতীয় ইক্ষু অযত্নেও একরকম মন্দ হয় না। যাঁহার

ব্যয় ও যত্ন করিবার ক্ষমতা আছে, তিনি 'শ্যামসাড়া,' 'পাটনাই কুসুর,' বা যে কয় জাতীয় বিদেশীয় ইক্ষুর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই সকল শ্রেষ্ঠজাতীয় ইক্ষুর চাষ করুন। যাঁহার ব্যয় বা যত্ন করিবার তাদৃশ সুবিধা নাই, তিনি 'খড়ি,' 'পুরি', 'কাজলি' বা 'কাটার' জাতীয় ইক্ষুর চাষ করুন। যাঁহার জমিতে জল দাঁড়ায়, তাঁহার কর্ত্তব্য 'কুলুয়া' বা 'কুলেরা' জাতীয় ইক্ষুর চাষ করা। চট্টগ্রামে 'পাটনাই কুসুর' নামক যে ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে, উহা অতি উৎকৃষ্ট এবং বিদেশীয় শ্রেষ্ঠজাতীয় ইক্ষুর প্রায় সমতুল্য। যে কয়েকজাতীয় ইক্ষুর নাম দেওয়া গেল, তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশে, 'বোম্বাই,' 'ভুল,' চিনি' 'বিলাতী' 'কুঁড়ি,' 'ভুরি,' পুনা,' 'মঙ্গো,' 'ধলী,' 'শ্বেতী,' 'মোটা,' 'নোড়ী,' 'মুগী,' 'ভাগুমুগী,' 'বনিসা' 'সাহেবান,' 'মান্দারিয়া' 'রাউণ্ডা,' 'টিক,' 'পাউণ্ডী,' 'বনসাহী,' 'মনেরিয়া,' বেওড়া' 'শকরচিনিয়া,' 'গণ্ডেরী,' 'খাগড়া,' 'রোটী,' 'ধলসুন্দর,' 'উড়ি,' প্রভৃতি কয়েক জাতীয় ইক্ষু জন্মে। এই সকলের মধ্যে বস্তুতঃ জাতিভেদ করিতে গেলে সাতটি মাত্র জাতি স্থির করিতে পারা যায়।

(১) বরাকরের নিকট যে 'খড়ি'-ইক্ষু জন্মে উহা উড়িষ্যার 'পুরী'-ইক্ষুর ন্যায় দৃঢ় ও সূক্ষ্মদণ্ডবিশিষ্ট বটে. কিন্তু খড়ি-ইক্ষু গোড়া হইতে কাটিয়া লইলে, বৎসর বৎসর পুনঃ পুনঃ উহার গাছ বাহির হয়। চারি পাচ বৎসর ধরিয়া একই গোড়া হইতে খড়ি-ইক্ষু জন্মাইয়া লাভবান হওয়া যায়। চারি পাঁচ বৎসর পরে 'ফলন' দ্রুত হ্রাস হইয়া আইসে।

(২) উড়ষ্যা অঞ্চলের 'পুরী' ইক্ষু রাজসাহী প্রভৃতি জেলার 'কাজলী' ইক্ষু অপেক্ষা সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু মৃত্তিকা ও স্থান ভেদে এই সামান্য প্রভেদ হইয়া থাকিতে পারে। 'কাটারী'ও 'রাঢ়ী' ও 'কাজলীর' রূপান্তর মাত্র বলা যাইতে পারে। সামান্য ব্যয়ে সামান্য যত্নে এই ইক্ষু জন্মিয়া থাকে বলিয়া এই ইক্ষুই চাষীদের মধ্যে সর্ব্বত্র প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) 'কুলুয়া' বা 'কুলেরা' বোম্বাই প্রদেশের 'তৃণ-ইক্ষু' (Bombay grass-cane) ও 'খড়-ইক্ষুর' (Bombay straw-cane) ন্যায় জলা জমিতে উত্তম জন্মে। আসাম প্রদেশের লোহিত ত্বক্ ইক্ষুও জলা জমিতে উত্তম জন্মে। এই সকল ইক্ষু হইতে শর্করার পরিমাণ কম হইলেও, মোট ফলন ইহাদের হইতে কম পাওয়া যায় না। প্রতি কাঠায় এক মন গুড় ফরিদপুর প্রভৃতি জেলার লোক 'জলী আক' হইতে লাভ করিয়া থাকে। কাজলী, কি খড়ি, কি শ্যাম-সাড়ার ফলনও ইহা অপেক্ষা বিশেষ অধিক হয় না।

(৪) 'লাল-বোম্বাই' আকের রসও কিছু রঙ্গীন হয়, এবং শ্যামসাড়ার গুড় অপেক্ষা বোম্বাইএর গুড় কিছু লাল এবং মোটা দানাযুক্ত হয়। এই সকল কারণে এবং ত্বকের বর্ণ প্রযুক্ত বোম্বাই ইক্ষু এক বিশেষ জাতীয় ইক্ষু বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। বোম্বাই আকের আবরণ লোহিত ও শ্বেত উভয় বর্ণেরই হয়। কোন ক্ষেত্রের বোম্বাই আক প্রায় লাল, কোন ক্ষেত্রের বা প্রায় সাদা।

(৫) 'শ্যামসাড়া' ও 'ধলসুন্দর' সাহারানপুরের ইক্ষুর ন্যায় শ্রেষ্ঠ, সুমিষ্ট, সহজ-চর্ব্ব্য ও রসপূর্ণ। ইহার গুড়ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(৬) চট্টগ্রামের 'পাটনাই কুসুরের' দণ্ড এত দীর্ঘ ও স্থূল এবং উহার গাইটগুলি এত অন্তর অন্তর যে ইহাকে আর এক শ্রেণীর বলিয়া গ্রাহ্য করাই কর্ত্তব্য। দোষের মধ্যে এই জাতীয় ইক্ষুতে যে পরিমাণ 'ধসাধরা' রোগ দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যজাতীয় ইক্ষুতে সে পরিমাণ রোগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

(৭) বঙ্গদেশের উত্তর ও পশ্চিম ভাগের কয়েক জেলায় যে 'উড়ি আক' জন্মে, উহাও এক পৃথক্‌শ্রেণীর বলিয়া গ্রাহ্য করা কর্ত্তব্য। কেননা এই ইক্ষু সহজে বীজবান হয় এবং বীজ হইতে এই ইক্ষুর চাষ করার নিয়মও প্রচলিত আছে।

৩। এই সমস্ত ইক্ষু কোমলতা অনুসারে চর্ব্ব্য ও অচর্ব্ব্য এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কঠোর দণ্ডযুক্ত ইক্ষু সমুদয় গুড় প্রস্তুতেরই উপযোগী। কোমল, সরল ও সুখচর্ব্ব্য ইক্ষু বড় বড় সহরের মধ্যে বিক্রয় করিতে পারিলে বিশেষ লাভ হয়। কিন্তু এই সকল ইক্ষু হইতে যেরূপ সুন্দর গুড় হয়, অচর্ব্ব্য ইক্ষু সকল হইতে সেরূপ গুড় হয় না। পশ্চিমাঞ্চলের লোকে চর্ব্ব্য ইক্ষুকে 'পাউণ্ডা' ও অচর্ব্ব্য ইক্ষুকে 'ইখ,' কহিয়া থাকে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের

প্রধান ইক্ষুর নাম 'মান্দ্রাজী পাউণ্ডা'। ইহা শ্যামসাড়ারই অনুরূপ। বোম্বাই,' 'শ্যামসাড়া,' 'সাহারনপুর' 'ধলসুন্দর' প্রভৃতি 'পাউণ্ডা' বা চর্ব্ব্যজাতীর অন্তর্গত; উড়ি, কাজলি, পুরী, কাটারি, খড়ি, কুলেরা, ইত্যাদ, ইখ বা অচর্ব্ব্য জাতির অন্তর্গত। চর্ব্ব্যজাতীয় ইক্ষুতে স্বভাবতঃই অধিক পোকা লাগে বলিয়া ইহার চাষ করিয়া চাষীরা নিশ্চয়ই অধিক লাভবান্ হইবে, একথা বলা যায় না।

৪। শিবপুর পরীক্ষাক্ষেত্রে যে কয়েক জাতীয় ইক্ষুর চাষ হইয়াছে, তাহা হইতে উহাদের 'ফলন' সম্বন্ধে কিরূপ তারতম্য আছে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

ইক্ষুর নাম।	একার প্রতি কত সের গুড় উৎপন্ন হয়।		
	১৮৯৫-৯৬ সাল।	১৮৯৬-৯৭ সাল।	১৮৯৭-৯৮ সাল।
শ্যামসাড়া	২,২১০	১,২৬০	১,০১০
লাল বোম্বাই ...	১,৭০০	১,২৩০	১,৫০০
পুনা	২,১৪০	১,৪৩০	১,৪৬০
ধল-সুন্দর	১,৯৩০	১,২৭০	১,৬৬০
খড়ি	২,০০০	১,৩৫০	১,৮৫০
পুরী	১,৮৬০	১,৩৮০	১,১৬০
কাজ্‌লী	১,৫৩০	১,১৮০	৯৯০
মঙ্গো (বিহারাঞ্চলের ইক্ষু	১,৭৪০	১,৮২০	১,৩৭০
মালোহি (আসামাঞ্চলের ইক্ষু)	১,৯১০	১,৫৯০	৯৯০
বাঘি (ঐ)	১,৩৬০	১,৫৮০	১,২৯০
বাঘদি (ঐ)	১ ৩৯০	১,২২০	১,১৩০

তিন বৎসরের গড় করিয়া দেখিলে বিঘা প্রতি এইরূপ ফলন দাড়ায়।

শ্যামসাড়া	১২ ৬৬	মন
লাল বোম্বাই	১২·২৫	"
পুনা	১৩ ৭৫	"
ধলসুন্দর	১৩ ৩৩	"
খড়ি	১৭	"
পুরী	১২	"
কাজ্‌লী	১০ ৩৩	"
মঙ্গো	১৩ ৬৬...	মণ
মালোহি	১২ ৩৩...	"
বাঘি	১১ ৬৬·	"
বাঘদিয়া	১০ ৩৩...	"

৫। শিবপুর পরীক্ষাক্ষেত্রে মোটের উপর আকের 'ফলন' কিছু ভাল হয় না। চুরী ও অযত্ন ইহার অন্যতম কারণ হইতে পারে; কিন্তু পাঁচ বৎসর কাল ধরিয়া দেখিতেছি, আক্ ও গুড় চুরি সত্ত্বেও খড়িজাতীয় ইক্ষু হইতে খরচ খরচা বাদ গবর্ণমেণ্টের কিছু লাভ থাকে এবং সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে গেলে ইহাই চাষীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ ইক্ষু। ইহাতে জলসেচনের আবশ্যক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার ত্বক নিতান্ত কঠোর বলিয়া ইহাতে বড় একটা কীটের বা শৃগালের উৎপাত হয় না। 'ধসাধরা' রোগ ইহাতে প্রায় হয় না। ইহার গোড়ায় জল বাধিলেও ইহা মরে না, অথচ ইহা জলের ন্যূনতা বশতঃ শুষ্ক হইয়া যায় না; অর্থাৎ শ্যামসাড়া, বোম্বাই প্রভৃতি শ্রেষ্ঠজাতীয় আকের গোড়ায় জল লাগিলে যেরূপ ক্ষতি হয়, এবং পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে জল পৌষ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত না দিলে যেরূপ ক্ষতি হয়, খড়ি আকের সেরূপ ক্ষতি হয় না। গাছগুলি একবার জন্মিয়া গেলে পাঁচ বৎসর ধরিয়া একই গোড়া হইতে গাছ বাহির হয় বলিয়া বৎসর বৎসর বীজ লাগাইবার খরচ বাঁচিয়া যায়। ফলন অন্যান্য ইক্ষু অপেক্ষা খড়ি ইক্ষুর অধিক হয় বলিয়াই মনে হয়। অপেক্ষাকৃত অযত্নে যে ইহার ফলন অধিক হয় তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। বরাকরের আক অথচ শিবপুরের ও বর্দ্ধমানের জমিতে উত্তম জন্মিতেছে এবং গোড়ায় একহাত জল যদি ১৫ দিবস ধরিয়া লাগিয়া থাকে তথাপি ইহা মরে না; ইহাতে মনে হয়, ইহা বঙ্গদেশে, সকল জেলাতেই জন্মান যাইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট, খড়ি আকের চাস যেন জেলায় জেলায় প্রচলিত হয়, তদ্বিষয়ে যে যত্ন করিতেছেন, ইহা অতিশয় প্রশংসার কথা। তবে খড়ি আকের গুড় শ্যামসাড়া আকের গুড়ের ন্যায় তাদৃশ সুস্বাদ নহে, এবং একই নিয়মে গুড় প্রস্তুত করিয়া দেখিয়াছি, খড়ি আকের গুড়ে শ্যাম-সাড়া গুড় অপেক্ষা কিছু মাতের ভাগ অধিক হয়। তবে ইহাতে সাধারণ ব্যবহারের জন্য কিছু আসে যায় না।

৬। চীনা আক, এবং বিদেশীয় যে কয়েক জাতীয় আক প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি, এই সকল আকেরও পরীক্ষা হওয়া উচিত। বস্তুতঃ বিহারের নীলকরগণ মিলিয়া পরীক্ষা আরম্ভই করিয়াছেন, এবং ভরসা হয় তাঁহাদের দ্বারা এদেশে শ্রেষ্ঠজাতীয় ইক্ষুসমস্ত ক্রমশঃ প্রচলিত হইয়া পড়িবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইক্ষুর জমি

কোন্ জমি ইক্ষুর পক্ষে প্রকৃষ্ট, কোন্ জমি নিকৃষ্ট, একথার উত্তর সহজে দেওয়া যায় না। এক জাতীয় ইক্ষু যখন জলা জমিতে ভাল জন্মে, অন্য প্রকার ইক্ষু রোটী, কাটরী, পুরী, খড়ি প্রভৃতি যখন 'রেঢো, বা কঠিন বালুকাময়, প্রস্তরময়, লোহিতবর্ণের উচ্চ ও নীরস জমিতে ভাল জন্মে, এবং শ্রেষ্ঠজাতীয় ইক্ষুর পক্ষে যখন দোয়াঁশ মাটি, যাহাতে কদ্দমের ভাগ অধিক, অথচ যেখানে জল দাঁড়ায় না কিন্তু জলাধারের নিকটবর্ত্তী, এরূপ মাটি ভাল, তখন কিরূপে বলা যায় ঠিক অমুক মাটিই ইক্ষুর পক্ষে ভাল? আবার দেখিতে পাই, বঙ্গদেশের সকল প্রকার মাটিতেই ইক্ষু উত্তম জন্মিতেছে,—কোথাও এক প্রকার, কোথাও বা অন্য প্রকার,—কিন্তু যখনসকল প্রকার মাটিতেই ইক্ষু ভালরূপ জন্মিতেছে; তখন এই কথাই স্বীকার্য্য, যেরূপ জমিতে আর পাঁচ রকম ফসল হয়, সেইরূপ জমি ইক্ষুরও পক্ষে উপযুক্ত তবে জমি যত উর্ব্বরা হয়, ততই ভাল, অর্থাৎ অন্যান্য পাঁচ রকম গাছ যেখানে সতেজ জন্মিতেছে দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেই স্থানেই ইক্ষুও সতেজে জন্মিবে অনুমান করা সঙ্গত। বঙ্গদেশের পূর্ব্বাংশের মৃত্তিকা 'নূতন পলি' পশ্চিমের কিছুদূর ও উত্তরের জমি 'পুরাতন পলি'; ছোট নাগপুর প্রদেশের জমি 'প্রাচীন ও প্রস্তরময়,' এবং কটক হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত একটা 'রেঢো' জমির দাঁড়া চলিয়া গিয়াছে। এই পাঁচ প্রকার জমিতেই ইক্ষু উত্তম জন্মিতে দেখা যায়; তবে শ্রেষ্ঠজাতীয় ইক্ষু পুরাতন ও নূতন পলির (old and new alluvia) সঙ্গমস্থলেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। একারণ মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হুগলী, বর্দ্ধমান ও নদীয়ার স্থানে স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ইক্ষুর জমি দেখিতে পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, ও বীরভূম জেলায় স্থানে স্থানে এক প্রকার চিক্কণ বালুকাময় লোহিতবর্ণের মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায় উহা ইক্ষুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই সকল জমি নদীর ধারে হইলে আরও ভাল হয়। বঙ্গদেশের যে যে জেলায় অধিক পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হইয়াথাকে, সেই সেই জেলা সম্বন্ধে একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল॥

ক্রমিক স্থান	জেলা	কত জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়	আবাদীজমীর শতকরা কত পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হয়।	জমির অবস্থা
১ম	রঙ্গপুর ...	১৬,৫০০ একার	৪.৯৫	পুরাতন ও নূতন পলি
২য়	দ্বারভাঙ্গা	৭২,৯০০ "	৩.০৭	পুরাতন পলি
৩য়	পাবনা ...	৬৬,০০০ "	৪.১৬	নূতন পলি
৪র্থ	ভাগলপুর ...	৬৭,৭০০ "	২.৩০	পুরাতন ও নূতন পলি
৫ম	মানভূম ...	৫৩,০০০ "	৬.৫৭	রেঢো ও প্রস্তরময়
৬ষ্ঠ	সারন ...	৫২,০০০ "	২.৮৭	পুরাতন পলি
৭ম	ফরিদপুর ...	৪০,০০০ "	২.৮৩	নূতন পলি
৮ম	মৈমনসিং ...	৩,৯০০ "	১.০৯	নূতন পলি
৯ম	হাজারিবাগ ...	৩২,১০০ "	১.৪৯	প্রস্তরময় ও প্রাচীন
১০ম	সাহাবাদ ...	২৯,৪০০ "	১.৬২	পুরাতন পলি
১১শ	ঢাকা ...	২৭,৮০০ "	২.১১	নূতন পলি

১২শ	গয়া	২৭,০০০ ,,	১২৪	পুরাতন পলি ও প্রস্তরময়
১৩শ	দিনাজপুর ...	২৭,০০০ ,,	১·৫৬	পুরাতন ও নূতন পলি
১৪শ	মোজাফ্‌ফরপুর ...	২৪,০০০ ,,	১·০৬	পুরাতন পলি
১৫শ	বৰ্দ্ধমান	২১,৮০০ ,,	১·৫৯	নূতন ও পুরাতন পলি
১৬শ	বাখরগঞ্জ ...	২০,৫০০ ,,	১·৪২	নূতন পলি

৮। সমগ্র বঙ্গদেশে ৮৬০,২০০ একার জমি এবং সমগ্র ব্রিটিশ ভারতবর্ষে ২,৮০০,০০০ একার জমি, ইক্ষুর চাষে নিয়োজিত এইরূপ গণনা করা হইয়াছে।

৯। রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া জমি নির্ব্বাচন করা যদি সম্ভবপর হয়, তাহাহইলে একটি সঙ্কেত জানিয়া রাখা ভাল। যে জমিতে অস্থিসারের (ফস্ফরসের) অংশ অধিক সেই জমি ইক্ষুর জন্য নির্ব্বাচন করা ভাল। শতকরা ১ ভাগ অস্থিসার জমিতে আছে, রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা যদি ইহা স্থির হয়, তাহাহইলেই বুঝিতে হইবে অস্থিসার সম্বন্ধে জমি বিশেষ উর্ব্বরা। শতকরা ·০৫ হইতে ·১ ভাগ পর্য্যন্ত অস্থিসার থাকিলেও ইক্ষুর চাষ চলিতে পারে। অস্থিসার ইক্ষু চাষের জন্য কত উপকারক, ইহা ভারতবর্ষ হইতে মরীচি দ্বীপে হাড়ের ও হাড়ের গুঁড়ার রপ্তানি দ্বারাই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। অস্থিসার জমিতে যদি কম থাকে, অর্থাৎ রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা যদি শতকরা ·০৫ অপেক্ষাও কম আছে দেখা যায়, তাহা হইলে জমিতে সার প্রয়োগ দ্বারা জমির এই অভাব দূর-করা কর্ত্তব্য। ইক্ষু চাষের জন্য যে সকল সার এ দেশে ব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ খোল, গোবর, নীল-সিটি, ইত্যাদি, ঐ সকলে অল্পবিস্তর পরিমাণে, অর্থাৎ, শতকরা ·৫ হইতে ·৬ পর্য্যন্ত, অস্থি-সার থাকে; কিন্তু যে পরিমাণ সার ব্যবহার করা যায়, উহা জমির পরিমাণের সহিত কিছুই নহে, অর্থাৎ একবিঘা জমির এক ইঞ্চি পরিমাণ যদি চাঁচিয়া লইয়া ওজন করা যায়, তাহাহইলে উহার ওজন প্রায় ১,০০০ মন হইল দেখা যাইবে! এমন স্থলে ৫, ৭ বা ২০ মণ সার ব্যবহার করিবার দ্বারা এক ফুট্ জমির অস্থিসারের পরিমাণ বৃদ্ধি অতি সামান্যই হইয়া থাকে। একারণ অতি সামান্য পরিমাণে অস্থিসার বৃদ্ধি করিতে গেলেও ৫।৭ মণ অস্থিসারময় কোন দ্রব্য সাররূপে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। হাড়েতে শতকরা ২০ ভাগেরও অধিক অস্থিসার আছে। কিন্তু হাড় বা হাড়ের গুঁড়া স্পর্শ করাতে অনেকের বাধা আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। হাড় গোভাগাড়ে ও ক্ষেতে পড়িয়া থাকে, সেও ভাল, তথাপি সংগৃহীত হইয়া যে বিদেশে চলিয়া যায় সে ভাল নহে। এপেটাইট্ নামক এক প্রকার প্রস্তরের মধ্যে হাড়ের দ্বিগুণ অস্থিসার আছে। এই প্রস্তর ভুরি পরিমাণে হাজারিবাগের অভ্রখনিতে পাওয়া যাইতেছে। এপেটাইটের গুঁড়া বিঘা প্রতি ৫।৭ মণ করিয়া ছিটাইয়া দিতে পারিলে অস্থিসার সম্বন্ধে জমির উর্ব্বরতা বিশেষ বর্দ্ধিত হয়। তবে যে জমিতে শতকরা ·০৫ ভাগের অধিক অস্থিসার আছে, সে জমিতে হাড়ের গুঁড়া বা এপেটাইটের গুঁড়া ছিটাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। পাঁচ বৎসর অন্তর একবার করিয়া এপেটাইট্ ছিটাইয়া অন্যান্য সার যেমন ব্যবহার করা নিয়ম আছে, সেইরূপ করাই ভাল। কলিকাতার ইউইং কোম্পানী (Messrs Ewing & Co.) এপেটাইট প্রস্তর দুই টাকা মণ দরে এবং গুঁড়া এপেটাইট তিন টাকা মণদরে বিক্রয় করেন।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ

জয়পুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী রাও বাহাদুর কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জেলা চব্বিশপরগনার অন্তঃপাতী রাহুতা নামক একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা দারিদ্র্য বশতঃ তাঁহাকে উচ্চশিক্ষা দিতে পারেন নাই। তিনি প্রথমে জনাই স্কুলে তৃতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন, এবং পরে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে উন্নীত হন। তিনি হৃদয়মনের সমুদয় শক্তি দিয়া শিক্ষকের কর্ত্তব্য পালন করিতেন। শিক্ষকতা করিবার সময় তিনি অবসরকাল ইংরাজী ও সংস্কৃত নানা গ্রন্থ অধ্যয়নে যাপন করিতেন। এইরূপে তিনি এই দুই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। জনাই স্কুল হইতে তিনি জয়পুর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের

পদ পাইয়া তথায় গমন করেন। এইকার্য্যে তাঁহার দক্ষতা দেখিয়া জয়পুরের তদানীন্তন মহারাজা স্কুলটিকে কলেজে পরিণত করেন এবং তাঁহাকে কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই কার্য্যেও তিনি খ্যাতি-লাভ করেন। ১৮৭৭খ্রী,অব্দে মহারাজা রামসিং তাঁহাকে দরবারের অন্যতম সভ্য নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে তিনি রাজস্ববিষয়ক নানা কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান মহারাজা যখন নাবালক ছিলেন, তখন রাজ্যশাসন করিবার জন্য একটি রাজপ্রতিনিধি সভা নিযুক্ত হয়। কান্তিচন্দ্র এই সভার প্রধান সভ্য ছিলেন। মহারাজা সাবালক হইয়া যখন রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন, তখন কান্তিবাবু প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। বিশ বৎসরের অধিক কাল তিনি এই উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি রাজস্ব এবং শাসন সম্বন্ধীয় নানা-কার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া বাঙ্গালীর রাজ্যশাসন ক্ষমতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এবং স্বীয় প্রভু উভয় পক্ষেরই নিকট তাঁহার সমান খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল। প্রৌঢাবস্থা পর্য্যন্ত শিক্ষকতা করিয়া তৎপরে রাজকার্য্য পরিচালনে এরূপ দক্ষতা প্রদর্শন সচরাচর দেখা যায় না। ইহা হইতেই তাঁহার বহুতামুখী প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি পদমর্য্যাদায় শীর্ষস্থানীয় ছিলেন।

***

এবৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় ৬১৩ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৫০ জন বাঙ্গালী। তন্মধ্যে একটি বালিকারও নাম আছে। সর্ব্ব শুদ্ধ ৫৯ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮ জন বাঙ্গালী। দুইজন বাঙ্গালী ছাত্র গুণানুসারে তৃতীয় ও অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে প্রবেশিকা পরীক্ষার যে শাখায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়া যায়, তাহার নাম স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় ২০৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩২ জন বাঙ্গালী। প্রথম বিভাগে ৩১ জন পাস হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৬ জন বাঙ্গালী। বাঙ্গালীদের মধ্যে গুণানুসারে কেহই দ্বাদশ অপেক্ষা উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। এখান-কার ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষা কলিকাতার এফ্ এর মত এই পরীক্ষায় এবার ২৪৪ জন ছাত্র পাস হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩০ জন বাঙ্গালী। এই ত্রিশের মধ্যে একটি ছাত্রীও আছেন প্রথম বিভাগে মোটে ৪ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে ২ জন বাঙ্গালী। তাহারা গুণানুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণের সংখ্যা ১৭৬। বাঙ্গালী ২৪ জন। তাহার মধ্যে একটি ছাত্রী আছেন। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ৬ জনের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী নাই। তিন জন বি এস্ সি পাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একজন বাঙ্গালী। ৬ জন প্রথম ডি এস্ সি পাস করিয়াছেন। বাঙ্গালী একজনও নাই। দুই জন দ্বিতীয় ডি. এস্ সি. পাস করিয়াছেন। দুই জনই হিন্দুস্থানী। একজন তৃতীয় ডি এস সি পাস করিয়া ডি এস্ সি উপাধি পাইয়াছেন। ইনি মুসলমান। ইহাঁর পূর্ব্বে আর এক জন এলাহাবাদের ডি এস্ সি উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি হিন্দুস্থানী। এখন গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি পাইয়া কেম্ব্রিজে উচ্চ গণিতের অনুশীলন ও গবেষণায় প্রবৃত্ত আছেন। মুসলমান ডি এস্ সি টি গণিতে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ইহা বড় সুখের বিষয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। যাঁহারা গণিতের ইতিহাস জানেন, তাঁহারা জানেন উক্ত বিদ্যার প্রাচীন ইতিহাসে মুসলমানগণ যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তাহা তুচ্ছ নয়। এবার এম এ পরীক্ষায় ২১ জন পাস হইয়াছেন। তাহার মধ্যে বাঙ্গালী তিন জন। কেহই প্রথম বিভাগে পাস হন নাই। এল্ এল্ বি. অর্থাৎ বি. এল্ পরীক্ষায় ৮ জন পাশ হইয়াছেন, তন্মধ্যে ৩ জন বাঙ্গালী। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা অবধি এই বৎসর এই প্রথম একজন এল্ এল্ ডি অর্থাৎ ডি এল্ উপাধি পাইলেন। ইহাঁর নাম শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি একজন প্রতিভাশালী ছাত্র। কলিকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ ও এম এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন এবং প্রেমচাঁদরায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়াছেন। ইনি কিছুকাল হুগলী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। এখন এলাহাবাদ হাই-কোর্টে ওকালতি করিতেছেন। ইনি সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে ইংরাজীতে একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন। পাশ্চাত্য দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ক কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন ও সম্পা-

দন করিয়াছেন। তাঁহার কোন কোন পুস্তক অধ্যাপক মোক্ষমূলর, ফ্রেজার প্রভৃতির প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ইহাঁর চরিত্রে বিনয় ও পাণ্ডিত্যের দুর্লভ সম্মিলন পরিলক্ষিত হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্রথম কুইন-এম্প্রেস্ পদক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ পাইয়াছেন। ইনি এখন বেরেলীকলেজে অধ্যাপকতা করিতেছেন। হিন্দুস্থানীর অনুপাতে এদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব কম। কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালীদের অধিকাংশেরই জীবিকা লেখাপড়া জানার উপর নির্ভর করে। এই জন্য তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার অধিকতর বিস্তার প্রার্থনীয়। প্রবাসী বাঙ্গালীর সন্তানগণ চরিত্র ও শ্রমশীলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না রাখিলে যে অচিরেই সাতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত হইবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

***

এ বৎসর শিক্ষার উন্নতিকল্পে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইটি দানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখানকার প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় একহাজার টাকা দান করিয়াছেন। উহার সুদ হইতে বি. এস্ সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে প্রতিবৎসর ৩৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। লক্ষ্ণৌ-নিবাসী মহাজন লালা সাঁওলদাসের বিধবাপত্নী শ্রীমতী ভগবানদেয়ী মাসিক মোট ৫০ টাকা পরিমিত কতকগুলি বৃত্তি স্থাপনার্থ বিশ্ববিদ্যালয়কে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ দিয়াছেন।

***

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরাজীতে অনুবাদ করিবার জন্য যে বাঙ্গলা দেওয়া হয়, তাহা হইতে প্রায় প্রতিবৎসর কিঞ্চিৎ আমোদ পাওয়া যায়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গলারও কিছু নমুনা দিতেছি।

"নোল্স নামক এক জাহাজের কাপ্তেন জাহাজ লণ্ডন হইতে আমেরিকায় লইয়া যাইতেছিলেন। এক স্থানে নঙ্গর করিলেন। জাহাজে অনেক যাত্রী (পথিক) ছিল। রাত্রিকাল ঘোর অন্ধকার। জাহাজে অনেকগুলি আলোক (লালটেন) *জ্বলিতেছিল, যাহাতে যে সকল জাহাজ যাতায়াত করিতেছিল, ঐ জাহাজের অবস্থিতি জানিতে পারে। ইতি মধ্যে স্পেনদেশীয় এক জাহাজের ধাক্কা ঐ জাহাজে লাগিল। এবং জাহাজে ছিদ্র হইয়া গেল। এই অবস্থা দেখিয়া কাপ্তেন সাহেব আদেশ করিলেন যে পম্প † (জল তুলিবার যন্ত্র বিশেষ) দ্বারা জল ছেঁচিয়া ফেলা হউক এবং বিপত্তিসূচক বুগলধ্বনি করা হউক। কাপ্তেন সাহেব তৎক্ষণাৎ সকল লোক জাহাজ হইতে নামাইয়া দিলেন। স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে সর্ব্বাগ্রে নৌকায় উঠিতে আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং ভরা বন্দুক লইয়া পথে দাঁড়াইলেন, যেন অগ্রে কোন পুরুষ না যাইতে পায়। নৌকা সকল আরোহীদ্বারা পরিপূরিত হইল। এদিকে জাহাজে জল ভরিয়া উঠিল। নিজ প্রাণ রক্ষা করা অপেক্ষা, অন্যের প্রাণ রক্ষা করা জাহাজের কাপ্তেনের ধর্ম্ম, এই ভাবিয়া কাপ্তেন সাহেব নিজে নৌকায় না উঠিয়া শেষ পর্য্যন্ত অন্য সকলকে নৌকায় উঠাইতে ব্যাপৃত রহিলেন। জাহাজ নিমগ্ন হইবার উপক্রম হইল। এবং কাপ্তেন সাহেবও জাহাজের সঙ্গে সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন। এইরূপে তিনি আপনার স্বীয় এবং পঁচাশী জনের জীবন রক্ষা করিয়া অনন্তকাল পর্য্যন্ত স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজার উত্থাপন করিয়া চলিয়া গেলেন।

* হিন্দুস্থানী ভৃত্যেরা লণ্ঠনকে "লালটেন" বলে।—সম্পাদক

† প্রবন্ধকর্ত্তা বোধহয় "দম্‌কল" কথাটি জানিতেন না।—সম্পাদক।

***

'জীব বিদ্যা" শীর্ষক প্রবন্ধে যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—

"বস্তুতঃ চারিদিকে ঘরে বাহিরে যে সকল আগাছা কীটপতঙ্গ দেখিতে পাই, তাহাদের সংস্কৃত নাম নাই, চলিত নামও নাই। এক রকম পোকা, এক রকম গাছ —বলিয়াই জীববিদ্যার পরিচয় শেষ হয়। পল্লীগ্রামের লোকেরা বরং অপেক্ষাকৃত অনেক গাছপালা কীটপতঙ্গের নাম জানে, নগরবাসীরা এবিষয়ে আরও অজ্ঞ।"

অতি সত্যকথা। আগাছা কীট পতঙ্গের নাম ত নাইই, অথবা জানিনা কত উচ্চতর জীবেরও নাম আমরা জানিনা, কিম্বা হয়ত দেশী নামকরণ এ পর্য্যন্ত হয় নাই। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভারতহিতৈষী হিউম্ সাহেব প্রণীত একখানি সুন্দর পুস্তক আছে, তাহার নাম 'Game birds of India, Burma and Ceylon," অর্থাৎ ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও লঙ্কাদ্বীপের শিকারের পাখী। এই পুস্তক আদ্যোপান্ত খুঁজিয়া দেখিলাম, তিনি উক্ত তিন দেশে প্রাপ্ত ৩২টি পাখীর কোনও দেশীয় নাম পান নাই। পাখীগুলি এই—

The great bustard, the close-barred sand-grouse, the pin-tailed sand grouse, the crestless m[illegible] Bhutan hill partridge, the Malayan wood partridge, the mountain quail, the little crake, Elves's crake, the brown and ashy crake, the whitey-brown crake, the Malayan banded crake, the banded crake, the Andamanese banded crake, the Andamanese banded rail, the Indian water rail, the hooper, Bewick's swan, the bean goose, the pink-footed goose, the white-fronted or laughing goose, the dwarf goose the clucking or Baikal teal, the crested or bronze-capped teal, the marbled teal, the oceanic teal, the scaup, the golden-eye or garrot, the red-breasted merganser, the snipe billed godwit, Armstrong's yellowshanks, the bar-tailed godwit.

***

তাতার প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য কিরূপে আরম্ভ করা যাইতে পারে, কোন্ স্থানে উহা স্থাপিত হওয়া

উচিত, কত টাকার কমে কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে না. অধ্যাপক নিয়োগ কিরূপে করিতে হইবে, উহাতে শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ আশাভরসা কিরূপ হওয়া সম্ভব, ইত্যাদি বিষয়ে রিপোর্ট করিবার জন্য প্রস্তাবক মহাশয় আর্গনের আবিষ্কর্ত্তা অধ্যাপক রামজেকে বিলাত হইতে আনাইয়াছিলেন। তাঁহার রিপোর্টের মর্ম্ম সংবাদপত্র-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। আমরা রিপোর্টের কেবল একটি অংশ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে চাই। অধ্যাপক রামজে বলিয়াছেন, এলাহাবাদ ও লাহোরে কলিকাতা অপেক্ষা উচ্চতর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার অর্থ কি? অর্থ এই। কলিকাতায় যদি কেহ রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় বি এ. কিম্বা পদার্থবিদ্যায় এম্ এ উপাধি পাইতে চান তাহা হইলে তাঁহাকে কেবল পুঁথিগত বিদ্যার পরীক্ষা দিতে হয়, কার্য্যতঃ তিনি কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন কি না, তদ্দ্বারা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন কি না, তাহার কোনই পরীক্ষা লওয়া হয় না। যাঁহারা সম্মান (Honours) পাইতে চান, তাঁহাদিগকে পদার্থবিদ্যায় এরূপ পরীক্ষা দিতে হয় না। কেবল রসায়নে দিতে হয়। কিন্তু এলাহাবাদ ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁহারা পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে বি এ এম্ এ প্রভৃতি পরীক্ষা দেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই কি পদার্থবিদ্যা, কি রসায়ন, উভয়েই হাতেকলমে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র ব্যবহার ও তৎসাহায্যে তত্ত্বনিরূপণের ক্ষমতার পরিচয় দিতে হয়। পঞ্জাবের এণ্ট্রান্স হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পরীক্ষাতেই এই নিয়ম। পরীক্ষার নিয়ম হিসাবে কলিকাতা পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। কলিকাতার পরীক্ষা প্রণালীর সংস্কার প্রার্থনীয়।

***

কোনও কাগজের প্রথম সংখ্যা মনের মত করা বড় কঠিন। আশা করি কেহ আমাদের প্রথম সংখ্যা দেখিয়াই আমাদের কাগজের দোষ গুণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করিবেন না। আমরা ক্রমে ক্রমে নানাবিধ জ্ঞানগর্ভ ও চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও বিবিধ প্রসঙ্গ প্রকাশিত করিব।

প্রবাসী বাঙ্গালী।

["প্রবাসী"র জন্য গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে।]

২।১ সাউথ্ রোড্, এলাহাবাদ, হইতে শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত।

শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ

প্রবাসী

প্রথম ভাগ। জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮। ২য় সংখ্যা

নূতন অতিথি।

[১লা বৈশাখ লিখিত]

স্বপ্ন মোহে আঁখি মেলি' দেখিনু চাহিয়া
ক্ষীণ জ্যোৎস্না মোরই গৃহে মূরছি' পড়িয়া
পূর্ব্ব বাতায়ন পথে ; ভ্রান্ত সমীরণ
মর্ম্মরিয়া তরুপত্র চকিত-চরণ
সন্ত্রস্ত আর্ত্তের মত প্রবেশিল ঘরে ;
একটী বিহগ কোথা ডাকিল সুস্বরে ;—
মনে হ'ল এই গান, সমীর-পরশ,
এই শ্রান্ত চন্দ্রালোক স্বপন-বিবশ
বিরচিয়া দিল কা'র অনন্ত শয়ন
অতল অকূল শূন্যে ; শত পুরাতন
সুখ দুঃখ স্মৃতি সহ জাগিল মানসে,
কি সঞ্চয় করিলাম আরেক বরষে ?—
চমকি' হেরিনু শুধু নূতন অতিথি
দাঁড়ায়ে ঊষার সাথে, মুখে ভাসে প্রীতি।

সন্ন্যাসী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেশ জুড়িয়া হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল ! হাবড়া হইতে পেশাওয়র পর্য্যন্ত যে রাজপথ চলিয়া গিয়াছে তাহার দুই ধারে বিশাল অশ্বত্থের সারি। শ্রান্ত পথিক সেই ছায়ায় বিশ্রাম করে। এক দিন প্রাতে সহসা দেখা গেল প্রায় বিশ ক্রোশ জুড়িয়া পথের দুই ধারে অশ্বত্থ গাছে একটা করিয়া কর্দ্দমের ছাপ, তাহার উপর সিন্দুর-চিহ্ন।

কতকগুলা বালক গরু চরাইতে গিয়া প্রথম দেখিল। তাহারা গিয়া গ্রামে বলিল। সংবাদ পাইয়া চৌকিদার দেখিতে গেল। কর্দ্দমপিণ্ড ও সিন্দুরবিন্দু অনেক ক্ষণ ঠাহরিয়া দেখিল। কোথায় চিহ্ন আরম্ভ হইয়াছে বলা যায় না, কোথায় শেষ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় না। চৌকিদার বরাবর থানায় গিয়া রিপোর্ট করিল। থানাদার রোজনামচায় যথাবিধি দাখিল করিয়া তহকিকাতে গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন, ব্যাপার গুরুতর বটে ! একে অশ্বত্থ গাছ, তাহাতে কাদা, তাহার উপর আবার সিন্দুর ! ভারতব্যাপী রাজপথে বোধ হয় সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত দিয়াছে। থানাদার খাঁ সাহেব কাঁচাপাকা দাড়িতে গবেষণা-পূর্ণ হস্তসঞ্চালন করিতে করিতে ফিরিলেন !

ডেপুটীর নিকট রিপোর্ট পঁহুছিল। তিনি জেলার হাকিম মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে জানাইলেন। তাঁহা হইতে কমিশনর, তাহার পর প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট, ভারত গবর্নেণ্ট, ও ইংলণ্ডে ভারত সচিব জানিলেন। শাসনের বন্দোবস্ত এমনি চমৎকার! রাখাল বালকেরা কিন্তু কোন পুরস্কার পাইল না।

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে সেই যে চাপাতী রুটী বিলি হইয়াছিল, সেই সময় একবার গবর্মেণ্ট অতর্কিত ছিলেন। কিন্তু আর সেরূপ শৈথিল্যের কোন রূপ সম্ভাবনা ছিল না।

তেন। এরূপ একটা গভীর চক্রান্ত যে তাঁহাদের চক্ষে পড়িবে না ইহা অসম্ভব।

এই কর্দ্দম ও সিন্দূর কিসের সঙ্কেত — সেই সম্বন্ধে অসংখ্য পত্র সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সিন্দূর-চিহ্ন অনেকে অনুমান করিতে লাগিল ইংরাজ-সংখ্যা। সিন্দূর-চিহ্ন গণনায় বার লক্ষ হইল। কিন্তু যাহারা চিহ্ন করিয়াছিল তাহারা ত গণিয়া করে নাই, আর কত লোকে করিয়াছিল তাহাই বা কে জানে? ইংরাজদিগকে মারিয়া কর্দ্দমে পুতিয়া রাখিবে হয়ত ইহাই সঙ্কেত। আবার কেহ অনুমান করিল যে কর্দ্দম এই ভারতভূমিস্বরূপ, সিন্দূর-চিহ্ন রাজতিলক।

তাহার পর কথা উঠিল, ইহা কাহার কাজ? গ্রামবাসী নানাস্থানের লোক এই কর্ম্মে যোগদান করিয়া থাকিবে, কিন্তু ইহার ভিতর সন্ন্যাসীদিগের হাত নিশ্চয় আছে। পুলিসের প্রতি হুকুম হইল, সাধু সন্ন্যাসী ফকীরের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ভিতরে ভিতরে চারিদিকে অনুসন্ধান হইতে লাগিল। কাহারা এই কর্ম্মে লিপ্ত আছে, ইহা বিদ্রোহের সূত্রপাত কিনা, এই সকল বিষয়ে নানাবিধ তদন্ত হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গাজিপুরের একটা গলি দিয়া এক দিবস প্রাতঃকালে একজন সন্ন্যাসী চলিয়া যাইতেছিল। তাহার বয়স অল্প, মূর্ত্তি মনোহর, মাথায় জটা। মনের নিশ্চিন্ততায় সে মৃদু মৃদু গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল।

তাহার পশ্চাতে সহর-কোতওয়াল অশ্বারোহণে আগমন করিতেছিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "আরে ও বাবাজি! একটা কথা শোন।"

সন্ন্যাসী দাঁড়াইল। কোতওয়াল সাহেবের স্বর কিছু কঠোর, তাহাতে আদেশের ভাব অত্যন্ত প্রবল। অশ্বারোহীর নিকট হইতে পথযাত্রীর পলায়নও দুষ্কর।

সন্ন্যাসীর নিকটে আসিয়া কোতওয়াল তাহাকে একবার আপাদমস্তক দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন, "কি বাবাজি! তিলক কাটিবার যে বড় ঘটা।"

সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিল, "তোমার মত জরিদার পাগড়ী আর ঘোড়া পাইব কোথা?"

কোতওয়ালের ভ্রূ কুঞ্চিত হইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাওয়া হইতেছে?"

"ভিক্ষা করিতে যাইতেছি, আর কোথায় যাইব?"

"ভিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আর কিছু হয় না?"

"আর কি হইবে? গৃহস্থ এক মুঠা চাল দেয়, ঘুস টুস কেহ দেয় না।"

তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কোতওয়াল কহিলেন, "তোমার ত বড় সাহস হে! আমি কে, জান?"

"তাহা আর জানি না! সাধু সন্ন্যাসী অসাধু, আপনাকে কে না চেনে! দুষ্টের পালনকর্ত্তা, শিষ্টের শাসনকর্ত্তা আপনি, আপনাকে চিনিব না!"

"তোমাকে বড় বেতমিজ দেখিতেছি। একটু শিক্ষা না পাইলে তোমার জবান দোরস্ত হইবে না। আইস আমার সঙ্গে।"

সন্ন্যাসী বলিল, "কোথায় যাইব?"

"হাজতে।"

"সেখানে কি উপবাসী থাকিতে হয়?"

"না, উপবাসী থাকিবার নিয়ম নাই।"

"কত দিন থাকিতে হইবে?"

"পাঁচ সাত দিন।"

"আর কিছু বেশী দিন হয় না?"

কোতওয়াল অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

"মাস দুই কি হাজতে থাকা যায় না?"

"তুমি অধিক দিন থাকিতে চাহিতেছ কেন?"

"তাহা হইলে সে কয় দিন আর আহারের ভাবনা ভাবিতে হয় না। ভিক্ষা আর তেমন পাওয়া যায় না, আর এত মেহনতও আর কোন কর্ম্মে করিতে হয় না।"

হাজতে পাঠাইবার আগে কোতওয়াল সন্ন্যাসীকে আপনার গৃহে লইয়া গেলেন। সন্ন্যাসীর কাছে কোন কথা পাওয়া যায় কি না একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবার ইচ্ছা ছিল।

বৈঠকখানা হইতে কোতওয়ালের সঙ্কেতে অন্য লোক উঠিয়া গেল। কোতওয়াল তখন সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "দেখ, আমার কাছে বেশী চালাকি করিও না। তোমার মত ঢের ঢের বাবাজী দেখিয়াছি।"

"দেখিবারই ত কথা। আমরা সকলের কাছে ভিক্ষা করি, কিন্তু তুমি আমাদের নিকট ভিক্ষা পাইলেও ছাড় না। তবে আমরা যাহা পাই তাহা স্বেচ্ছায় প্রদত্ত, তোমরা বলপূর্ব্বক গ্রহণ কর।"

কোতওয়াল কহিলেন, "দেখ, মুখ সামলাইয়া কথা বলিও। নহিলে বেইজ্জত হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিল, "যাহাদের ইজ্জত আছে তাহাদেরই বেইজ্জত হইবার ভয়। আমরা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করি, আমাদের আবার ইজ্জত বেইজ্জত কি?"

"পিঠে যদি দু চার ঘা চাবুক পড়ে?"

"সে কথা আলাদা। চাবুক পড়িলে লাগে, কিন্তু তাহাতেই বা অপমান কি?"

তখন আর কোতওয়াল অন্য কথা পাড়িলেন না। সন্ন্যাসীকে দুই জন কনষ্টেবলের যোপদ্দ করিয়া দিলেন। রাত্রিকালে সন্ন্যাসীকে আবার ডাকাইলেন। সে সময় সে স্থানে আর কেহ ছিল না।

কোতওয়াল কহিলেন, "কেমন, এখন কথার উত্তর দিবে?"

সন্ন্যাসী বলিল, "কখন কোন কথার উত্তর দিতে আমি অস্বীকার করিয়াছি?"

"এখন যাহা জিজ্ঞাসা করিব তাহার উত্তর বুঝিয়া সুঝিয়া দিও। তোমার বাড়ী কোথায়?"

"এই আমার বাড়ী।"

"ফের তামাসা?"

"তামাসা নয়। যখন যেখানে থাকি সেই আমার বাড়ী, আর আমার বাড়ী নাই।"

"এখন নাই বটে, কিন্তু এককালে ত ছিল।"

"সে কালের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, সে কথা এখন জিজ্ঞাসা করা বৃথা।"

"যদি তুমি কোন অপরাধ করিয়া থাক, যদি তুমি চুরীই করিয়া থাক!"

"তাহার শাস্তি আছে।"

"শাস্তি হইবার পূর্ব্বে তুমি কে, কি বৃত্তান্ত, সকল কথা জানিতে হইবে।"

"সে জন্য তোমরা আছ। সেই জন্য তোমরা সরকারের কাছে বেতন ও লোকের কাছে ঘুষ খাও।"

"আমরা ইচ্ছা করিলে তোমার সকল সন্ধান জানিতে পারি।"

"তবে আমায় কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ?"

"আমাদের পরিশ্রম লাঘবের জন্য।"

"তোমাদের সে উপকার আমি করিব না।"

কোতওয়াল বলিলেন, "তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। এই যে গাছে কাদা আর সিন্দুর দিয়াছিল সে কথা তুমি জান?"

"জানি।"

"চিহ্ন দেখিয়াছ?"

"দেখিয়াছি।"

"কাহারা চিহ্ন করিয়াছিল?"

"বোধ হয় নানা গ্রামের লোক, আরও অপর লোক,—ঠিক বলিতে পারি না।"

"সন্ন্যাসীরা তাহাতে ছিল,—তুমি ছিলে?"

"আমি ছিলাম না, অপর সন্ন্যাসী থাকিলেও থাকিতে পারে।"

"চিহ্নের উদ্দেশ্য কি?"

"বোধ হয় অনাবৃষ্টির জন্য লোকে কোন মানত কিম্বা যাগ করিয়াছে।"

"এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।"

"আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমার অনুমান বলিলাম। বিশ্বাস কর না কর, সে তোমার ইচ্ছা।"

"সরকার মনে করেন যে একটা বিদ্রোহের সূত্রপাত হইতেছে, তাহারই এই চিহ্ন। যাহারা ইহার ভিতরে আছে সকলেই ধরা পড়িবে। তুমি যাহা জান স্পষ্ট করিয়া বল, নহিলে তোমায় কবুল করাইব।"

"যাহা জানি তাহা বলিয়াছি। যাহা জানি না তাহা কেমন করিয়া বলিব? আর বিদ্রোহের সূত্রপাত করিয়া কি হইবে? একবার সেই দিল্লীর ক্লীবগুলা কুক্কুরের মত মরিল। এখন ইংরাজ গেলে কি তোমরা রাজা হইবে? তাহার অপেক্ষা দেশের পক্ষে অমঙ্গল আর কি হইতে পারে? দেশী রাজ্যের তুলনায় ইংরাজের রাজ্য ত রামরাজ্য। তোমাকে কোন কথা বলিয়াই বা কি হইবে?"

"বলাইবার উপায় আছে।"

"মারিয়া না কি ?"

"বিচিত্র কি !"

সহসা সন্ন্যাসীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। জ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "তুমি বল কি কোতওয়াল সাহেব! এ সময় তোমার আশঙ্কা অধিক না আমার অধিক ?"

কোতওয়াল বলিলেন, "কি, আমার আশঙ্কা ?"

"যত ক্ষণ তুমি লোক ডাকিবে ততক্ষণ যদি আমি তোমার গলা টিপিয়া মারিয়া রাখি !"

এতক্ষণ পরে কোতওয়াল সন্ন্যাসীকে ভাল করিয়া দেখিলেন। তাহার বলিষ্ঠ গঠন, রজ্জুর ন্যায় মাংসপেশী দেখিয়া তাঁহার ভয় হইল। তিনি লোক ডাকিতে উদ্যত হইলেন। তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসী তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিল।

কোতওয়াল সাহেব উৎকোচ-পুষ্ট প্রকাণ্ড উদর, ও মাংস-বহুল হস্তপদাদি লইয়া সেই বলবান যুবক সন্ন্যাসীর সহিত পারিয়া উঠিবেন কেন ? মাজ্জার-কবলিত মূষিকের ন্যায় তিনি নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী তাহাকে ফেলিয়া, হস্ত পদাদি বাঁধিয়া, মুখে কাপড় গুজিয়া দিয়া, ঘরের বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কোতওয়াল সাহেবের বন্ধনমুক্ত হইতে হইতে সন্ন্যাসী কাশীর অভিমুখে অনেক দূর চলিয়া গেল। কাশীতে সন্ন্যাসী বিস্তর, তাহার ভিতর হইতে খুঁজিয়া এক জনকে বাহির করা অত্যন্ত কঠিন। সন্ন্যাসী কাশীতে গিয়া দুই একবার সিক্রোলে গিয়া দুই চারিটা বাড়ীর সন্ধান লইয়া আসিল।

বেনারসের মাজিষ্ট্রেট অবিবাহিত, একা একখানি বাংলায় থাকেন। বাড়ীর চারিদিকে অনেকটা জমি। সাহেব রাত্রিকালে আহারাদি করিয়া, বারাণ্ডায় আরাম-চৌকিতে শয়ন করিয়া চুরুট টানিতেছিলেন, এমন সময় সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া সাহেব চমকিয়া উঠিলেন, একটু ভয়ও হইল। এমন সময় এরূপ একটা লোক সহসা সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে কিছু আশঙ্কা হইবারই কথা। সে সময় সন্ন্যাসী-দিগকে লইয়া অনেক স্থানে টানাটানি হইতেছে, তাহাতে গেরুয়াপরা জাতিটাই খারাপ, কাহাকেও বড় একটা ভয় করে না। সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সন্ন্যাসী বলিল, "সাহেব, কোন ভয় নাই, আমি আপনাকে গোটাকতক কথা বলিতে আসিয়াছি।"

ভয় শব্দটা শুনিলেই ইংরাজ জাতির পিঠের দাঁড়া শক্ত হইয়া উঠে। সাহেব আর উঠিলেন না, চেয়ারে ঠেসান দিয়া আগের মত চুরুট টানিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তোমার কিছু বলিবার থাকে অন্য সময়, অন্য স্থানে সাক্ষাৎ করিতে পার। আমরা ফকীরকে ভিক্ষা দিই না।"

সন্ন্যাসী অল্প হাসিল, বলিল, "সাহেব, ভিক্ষা দেওয়া অভ্যাস থাকিলে কি তোমরা পরের রাজ্য অধিকার করিতে পারিতে ? ইংরাজের গৃহে ভিখারী সন্ন্যাসী কবে যায় ? আমি ভিক্ষা করিতে আসি নাই, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি যে তোমরা অকারণে সাধু সন্ন্যাসীকে তাড়া করিতেছ কেন ?"

"তাহারা অত্যন্ত দুষ্ট লোক, সকল রকম উৎপাত উপদ্রবে তাহারা লিপ্ত থাকে।"

"ঐটা তোমাদের ভ্রম। এই যে গাছে কর্দ্দমচিহ্ন দেখিয়া তোমরা এত গোল করিতেছ, সন্ন্যাসীদিগের সহিত উহার কি সম্বন্ধ ? আর উহাতে আশঙ্কারই বা কি কারণ আছে ? লোকে নিজেদের বিশ্বাসমত চিহ্ন দিয়াছে, তোমাদের প্রতি কিছু লক্ষ্য নাই।"

"এত লোকে মিলিত হইয়া যখন এরূপ করিয়াছে, ও ইহার সম্বন্ধে কিছু জানা যাইতেছে না, তখন ইহার ভিতর নিশ্চিত কিছু গূঢ় অভিসন্ধি আছে।"

"সাহেব, তোমরা এত জান, এ কথা কি এখনও জানিতে পার নাই যে যখন কোন প্রকৃত অভিসন্ধি থাকিবে তাহার পূর্ব্বে তোমরা কিছুই জানিতে পারিবে না ? তোমরা নিজেরাই নিজের শত্রু, নহিলে এ দেশে তোমাদের আর শত্রু নাই। ভিখারী সন্ন্যাসীরা কিছুতেই লিপ্ত নহে, তাহারা তোমাদের কোনরূপ অমঙ্গল কামনা করে না। দেশের লোক সকল বিষয়ে উদাসীন, যে যেরূপে পারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। তোমরা তাহাদের প্রতি অত্যাচার কর না তাহারাও তোমাদের অশুভ প্রার্থনা করে না। এ দেশের প্রজা রাজার জাতিনির্ব্বিশেষে সর্ব্বদা রাজবৎসল, কখনও রাজদ্রোহী নহে। যে বিদ্রোহ স্মরণ করিয়া তোমরা সর্ব্বদা

শঙ্কিত সে প্রজার বিদ্রোহ নহে, তোমাদেরই সিপাহীর বিদ্রোহ। দিল্লীর স্মৃতিগৌরব বিদ্রোহের একটা অবলম্বন ছিল; তাহাও এখন লুপ্ত হইয়াছে। সাহেব, প্রজা যদি তোমাদের শত্রু হইত তাহা হইলে সিপাহী সৈন্য লইয়া তোমরা কি করিতে? যে জাতি সমুদ্রতরঙ্গে আপনার সন্তান বিসর্জ্জন করিতে পারে, জগন্নাথের রথচক্রতলে আপনার দেহ নিক্ষেপ করে, মৃত্যুকে যাহারা তৃণজ্ঞান করে, তাহাদিগকে ভীরু বিবেচনা করিও না। রাজসৌভাগ্যে তোমরা ভাগ্যবান, সেই জন্য প্রজা তোমাদিগের শরণাপন্ন। অনর্থক তাহাদিগকে পীড়ন করিও না।"

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া সাহেব চিন্তা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী যেমন আসিয়াছিল সেইরূপ নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গোরক্ষপুর জেলায় বামনগরের রাজা হনুমানসিংহ বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন। কতকটা বার দিয়া বসিবার মত, কিন্তু এখন আসল কিছুই ছিল না, কেবল নকলটুকু ছিল। পারিষদবর্গের চাটুবাদ মাত্র ছিল, ক্ষমতা আর কিছুই ছিল না। পারিষদগণে বেষ্টিত হইলে রাজা আপনাকে সম্রাটের তুল্য বিবেচনা করিতেন, কিন্তু রাজদ্বারে একবার তলব হইলেই সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইত।

রাজদরবারে এ সময় একটা ঘোরতর আন্দোলন হইতেছিল। একজন পারিষদ বলিতেছিল, "সে দিন লাট সাহেবের দরবারে আপনার আসন শ্যামনগরের রাজার পরে নির্দ্দিষ্ট হইল কেন? তিনি মহারাজের অপেক্ষা কিসে বড়?"

আর একজন বলিল, "বটেইত! শ্যামনগর কয় পুরুষে রাজা! মহারাজের খানদান আর তাহাদের খানদান সমান হইল?"

তৃতীয় পারিষদ বলিল, "ইহার চেয়ে আর অপমান কি হইতে পারে? মহারাজের গাড়ী দাঁড়াইয়া রহিল, আর শ্যামনগরের গাড়ী আগে চলিয়া গেল!"

রাজা বলিলেন, "তোমরাই দশ জন বিচার করিয়া দেখ! ইহার ত একটা প্রতিকার হওয়া উচিত!"

প্রথম নম্বর পারিষদ বলিল, "ছোট লাট কিম্বা বড় লাটসাহেবকে এ কথা জানান উচিত। তাঁহারা কি এমনি অবিচার করিবেন?"

দ্বিতীয় বলিল, "আমি সে দিন এলাহাবাদে গিয়া প্রধান বারিষ্টার টমাস্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, ইহার জন্য একটা উত্তম আরজি লেখা উচিত।"

প্রথম ও তৃতীয় সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "তাহাই ত উচিত।"

দ্বিতীয় বলিল, "তবে কিছু খরচ হইবে।"

প্রথম ও তৃতীয়, "তা ত হইবেই।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত খরচ হইবে?"

"সাহেব বলিলেন, দশ হাজার টাকা লাগিবে। টাকাটা বেশী বটে, কিন্তু সাহেবকে টাকা দিলে ফল আছে। কেবল ত আরজি লেখা নয়, সাহেবে সাহেবে জাতি ভাই, কোন না মহারাজের হইয়া দুইটা কথা বলিবে! আর এ মানসম্ভ্রমের কথা, মানরক্ষার জন্য যদি টাকা না খরচ হইবে ত কিসে হইবে?"

কথা কহিতে কহিতে, রাজার অলক্ষ্যে, অপর পারিষদদিগের সহিত তাহার ইঙ্গিত হইয়া গিয়াছিল। তাহারা একবাক্যে বলিল, "মানের কাছে টাকা! আজ শ্যামনগর বড় হইয়া গেল, কাল একটা জমিদার বড় হইয়া যাইবে, তখন মহারাজের মান থাকিবে কোথায়?"

"সে কথাও ত বটে!" বলিয়া মহারাজ পারিষদদিগের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন।

এমন সময় সেই সন্ন্যাসী সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া, "জয়!" বলিয়া দাঁড়াইল।

গৈরিকবসনপরিহিত, জটাধারী, বিভূতিমণ্ডিত সন্ন্যাসীকে সহসা দেখিয়া রাজা যুক্তকরে ললাট স্পর্শ করিলেন, কিন্তু পারিষদেরা কোলাহল করিয়া উঠিল, "তুমি এখানে কিরূপে আসিলে? ভিক্ষা রাজদ্বারে পাইবে, তুমি দ্বাররক্ষকদিগকে এড়াইয়া হুজুরে কেমন করিয়া আসিলে?"

সন্ন্যাসী কহিল, "আমি ভিক্ষুক হইলেও এসময় ভিক্ষার জন্য আসি নাই, রাজদর্শনে আসিয়াছি মাত্র।"

"দেশের ভিক্ষুক ভণ্ড সকলকে দর্শন দিতে বসিলে মহারাজকে আর কোন কর্ম্ম করিতে হয় না।"

"রাজদর্শনে অনর্থিত, ভিক্ষুক, ভণ্ড, চাটুবাদী পারিষদ সকলেরই সমান অধিকার।"

পারিষদেরা রাগিয়া সন্ন্যাসীকে কতক গুলা দুর্ব্বাক্য বলিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল, এক জন ইংরাজ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। পারিষদদিগের ক্রোধ সলিলসিক্ত অগ্নির ন্যায় তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সন্ন্যাসীকে বিদায় করিয়া দিবার অবকাশ পর্য্যন্ত রহিল না। রাজা ও পারিষদবর্গ ভূতলে শয্যায় উপবিষ্ট ছিলেন, ইংরাজের জন্য তৎক্ষণাৎ চেয়ার আসিল। রাজা ও আর সকলেই পাদুকাশূন্য পদে ছিলেন, পাদুকা গৃহের বাহিরে ছিল। ইংরাজ জুতাসুদ্ধ শুভ্র চাদরের উপর উঠিল। চেয়ারে উপবেশন করিবার পূর্ব্বে হাত বাড়াইয়া দিয়া, ঈষৎ মস্তক হেলাইয়া বলিল, "How do Maharaja,—খুশ হ্যায়?"

রাজা ইংরাজের করস্পর্শ করিয়া, আনন্দে, সম্ভ্রমে ও হয়ত ভয়ে ভাল করিয়া কথাই কহিতে পারেন না, দুই চার বার "মেহেরবানি," "মেহেরবানি" করিয়া ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। ইংরাজ উচ্চাসনে পায়ের উপর পা দিয়া বসিল।

ইংরাজ গোটা দুই চার কথা জিজ্ঞাসা করিল। রাজা ও পারিষদবর্গ কোন মতে উত্তর দিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল।

তাহার পর ইংরাজ আসল কথা পাড়িল। আসল কথাটা আর কিছু নয়, ইংরাজ কিছু ভিক্ষা চায়। তবে তাহার ভিক্ষা চাহিবার ধরণ আলাদা। ভিক্ষা চাহিয়াই যেন রাজাকে অনুগৃহীত করিতেছে। তাহার কথা শুনিয়া রাজা ও পারিষদগণ চুপি চুপি পরামর্শ করিলেন। তাহার পর এক জন পারিষদ উঠিয়া গিয়া এক খানা ৫০৲ টাকার নোট আনিয়া সাহেবের হাতে দিল। সাহেব উঠিয়া, ধন্যবাদ দিয়া, রাজার করমর্দ্দন করিয়া চলিয়া গেল।

ইংরাজ যাইবামাত্র রাজা তাহার উদ্দেশে অবজ্ঞাসূচক মুখভঙ্গী করিলেন। পারিষদেরা টিট্‌কারী দিয়া হাসিয়া উঠিল।

রাজা কহিলেন, "খুব বড় সাহেব আসিয়াছিল বটে!"

পারিষদেরা কহিল, "লাট সাহেব স্বয়ং!"

রাজা কহিলেন, "আসিয়াছে ত ভিক্ষা করিতে, তবু

পারিষদেরা কহিল, "বেটা যেন মহারাজের সেলামী তোপ বাড়াইয়া দিতে আসিয়াছে!"

সন্ন্যাসী কহিল, "এ সকল ভিক্ষুককে রাজদ্বারে ভিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয় না কেন?"

সন্ন্যাসী যে সেই স্থানে আছে রাজা ও পারিষদেরা তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পারিষদেরা বলিল, "কি বাবাজি, তুমি আবার কি বলিতেছ?"

সন্ন্যাসী মুক্তকণ্ঠে বলিল, "বলিতেছি এই, যে যেমন রাজা তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। যে ভিখারী সামান্য ভিক্ষা পাইয়া, দুই হাত তুলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করে, তাহাকে এক মুঠা অন্ন দিতেও তোমাদের ঘৃণা বোধ হয়; দ্বাররক্ষকগণ তাহার গলে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তাহাকে বহিস্কৃত করিয়া দেয়; আর যে ভিখারী পঞ্চাশ মুদ্রা পাইয়াও রাজাকে তৃণজ্ঞান করে, তাহাকে সমাদর করিয়া রাজার অপেক্ষা উচ্চ আসনে উপবেশন করাও। ধিক্ এমন রাজত্বে আর এমন রাজাকে! এমন রাজাকে দর্শন করিলে পুণ্য হওয়া দূরে থাকুক, পাপ হয়।"

সন্ন্যাসীর রাগ দেখিলে ভয় হয় না এমন রাজা ইংরাজি না শিখিলে হয় না। রাজা কহিলেন, "রাগ কেন, ঠাকুর! তোমারও যাহা ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিতে পার।"

পারিষদেরা কহিল, "আপনি রাগ করেন কেন, মহারাজ আপনার প্রার্থনাও পূর্ণ করিবেন।"

সন্ন্যাসী কহিল, "যে রাজা আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন তাহার সিংহাসন মর্ত্ত্যে নাই। আর আমার ভিক্ষা এক মুষ্টি অন্নের জন্য, রাজদ্বারে সে জন্য উপস্থিত হইতে হয় না। সামান্য গৃহস্থ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে যাহা দান করে তাহাই আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত, রাজার ভিক্ষা চাহি না। রাজদর্শন করিতে আসিয়াছিলাম, চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিয়াছে। বুঝিয়াছি ঐ ভিক্ষুক ইংরাজই প্রকৃত রাজা, তোমার মত রাজা তক্ষক মাত্র।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেল। গমনকালে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পথে যাইতে সন্ন্যাসী দেখিল, দুই জন কনষ্টেবল এক জন পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোককে পথে আট্‌কাইয়া তাহাদের উপর

খুব তম্বী করিতেছে। স্ত্রীলোকটী যুবতী ও সুন্দরী। সে ভয় পাইয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। এক জন কনষ্টেবল তাহার হাত ধরিয়াছে, আর একজন পুরুষের হাত ধরিয়াছে। পুরুষ বলিতেছে, "আমার স্ত্রীর হাত তোমরা কেন ধরিয়াছ? সরকারের রাজ্যে কি পথ চলাও অপরাধ না কি?"

যে কনষ্টেবল পুরুষকে ধরিয়াছিল সে তাহাকে রুলের গোটা দুই গুঁতা দিল। বলিল, "চুপ রও, হারামজাদা! এ অওরত তোমার স্ত্রী কি না, কে জানে? ইহার গায়ে গহনা রহিয়াছে, তুমি ইহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতেছ কি না, তাহার কে সাক্ষী আছে?"

রুলের গুঁতা খাইয়া সে ব্যক্তির যেটুকু ভরসা ছিল তাহাও গেল। বলিল, "আমার বিবাহিতা স্ত্রী কি না আমাদের গ্রামে গেলেই জানিতে পারিবে। পথে ধরিয়া আমাদের উপর এরূপ অত্যাচার করিতেছ কেন?"

"আগে ত থানায় চল," বলিয়া কনষ্টেবল তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। স্ত্রীলোকটীকে যে কনষ্টেবল ধরিয়াছিল সে পিছনে রহিল। তাহার পর সে যুবতীকে টানিয়া লইয়া যাইবার ছলে এরূপ ভাবে তাহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল যে রমণী অপমানভয়ে হাত টানিয়া লইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ তাহাদের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া কনষ্টেবলকে বলিল, "বদমায়েশ, স্ত্রীলোকের অঙ্গে হস্ত দিতেছিস্! তুই উহাকে স্পর্শই বা করিবি কেন?"

কনষ্টেবল তাহার সঙ্গীকে ডাকিল, "এই সাধু কয়েদী ছাড়াইতে চায়!"

দ্বিতীয় কনষ্টেবল তাহার কয়েদীকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। বলিল, "এ সাধু ত চোরের মত বোধ হইতেছে।"

প্রথম কনষ্টেবল বলিল, "ইহার চেহারা দেখিলেই ইহাকে বদমায়েশ বলিয়া চিনিতে পারা যায়। ইহাকে আদালতে কি জেলে কোথাও দেখিয়াছি। এখন ছাই মাখিয়া, গেরুয়া পরিয়া, সাধু সাজিয়াছে। চল, বেটাকে থানায় লইয়া চল।"

সন্ন্যাসী হাসিতেছিল। বলিল, "তোমরা দুই জনে ত দুই কয়েদী গ্রেপ্তার করিয়াছ, আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে কে?"

কনষ্টেবলদ্বয় বলিল, "তোমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইব।"

সন্ন্যাসী হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "বাঁধিবে আইস।"

এমন সময় অশ্বের পদশব্দ শোনা গেল। কনষ্টেবল দুই জন পুরুষ ও স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী দেখিল, অশ্বারোহী ইংরাজ; রঙ্গ দেখিবার জন্য সে একটা গাছের আড়ালে গেল।

কনষ্টেবল ও পথিক দুইটিকে দেখিয়া ইংরাজ অশ্ব সংযত করিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেয়া হুয়া?"

অমনি পথিক যুক্তকরে সাহেবের সম্মুখে গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বলিল, "খোদাবন্দ! আমরা কিছুই জানি না, আমার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আমি আমাদের গ্রাম হইতে আর এক গ্রামে যাইতেছিলাম। আমাদের কোন অপরাধ নাই। এই স্থানে এই দুই জন পুলিসের সিপাহী আমাদিগকে ধরিয়া অত্যন্ত লাঞ্ছনা করিয়াছে; আমাকে মারিয়াছে ও আমার স্ত্রীকে বেইজ্জত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আমাদিগকে বলিতেছে, ৫০ টাকা দাও, নহিলে তোমাদের ছাড়িব না। ৫০ টাকা আমরা কোথায় পাইব। হুজুর! আপনি আমাদের বাপ মা, দোহাই আপনার, আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

ইংরাজ কনষ্টেবলদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "ইহাদিগকে কেন ধরিয়াছ?"

"ধরি নাই হুজুর, ইহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

"ইহাদের প্রতি অত্যাচার না করিলে ইহারা কাঁদিবে কেন?" স্ত্রীলোকটী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া রোদন করিতেছিল।

"হুজুর, ইহারা বড় হুঁশিয়ার, হুজুরকে দেখিয়া মিছামিছি কাঁদিতেছে।"

"ইহাদিগকে ভয় দেখাইয়া টাকা চাহিয়াছিলে?"

"খোদাবন্দ, আমরা কি এমন কর্ম্ম করিতে পারি? আমরা সরকারের নিমক খাই, বেআইনী কাজ কখন করিতে পারি?"

"বেইমান, নিমকহারাম, তোমরা না পার এমন কি কাজ আছে?" বলিয়াই ইংরাজ কনষ্টেবল দুইজনকে কয়েক ঘা কশাঘাত করিল। তাহার পর বলিল, "দূর হও আমার সম্মুখ হইতে: সরকারের যত বদনাম তোমাদের দ্বারাই হয়।"

কনষ্টেবলরা চলিয়া গেল। ইংরাজও ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া বেগে অশ্বচালনা করিয়া প্রস্থান করিল। সন্ন্যাসী পথে আসিয়া হাসিতে লাগিল, ও পুলিশ-সিপাহীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "আমাকে কই বাঁধিয়া লইয়া গেলে না? সব কয়েদী ফেলিয়া পলাও কেন?"

তৎপরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া পথিককে বলিল, "তুমি যে টাকার কথা বলিলে, আমি ত কই সিপাহীদিগকে টাকা চাহিতে শুনি নাই!"

পথিক বলিল, "আরে মহারাজ, তুমি ত সব জান! হাকিমকে কিছু বাড়াইয়া না বলিলে তাহাদের মন গলিবে কেন?"

সন্ন্যাসী আপন মনে বলিল, "যিনি হাকিমের হাকিম, তাঁহাকেও কিছু বাড়াইয়া বলিতে হয় না কি?"

সন্ন্যাসী আগে চলিল। পথে যাইতে যাইতে মৃদু মৃদু গাহিতে লাগিল,

সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাই!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী লোকালয় ছাড়িয়া অন্য পথে চলিল। কয়েক দিবস অবিশ্রান্ত গমন করিয়া অবশেষে পর্ব্বততলে উপনীত হইল। পর্ব্বতারোহণ করিতে এক বেলা গেল। পরদিবস সূর্য্যোদয়ের সময় গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইল।

দেবদারু-ভূর্জ্জবৃক্ষমণ্ডিত শিখরশ্রেণীকে শান্তি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, একটি শিখরের অন্তরালে লোকালয় রহিয়াছে, কিন্তু কেবল সন্ন্যাসীপল্লী। রমণী নাই, শিশু নাই, সংসারের কোন বন্ধন নাই। পর্ব্বত ঝরণা ঝর ঝর করিয়া কুটীরশ্রেণীর নিকট দিয়া নীচে বহিয়া যাইতেছে। সন্ন্যাসীরা কেহ স্নান করিতেছে, কেহ পূজা করিতেছে, কেহ ধ্যানমগ্ন, কেহ ভিক্ষাকমণ্ডলু হস্তে লইয়া গ্রামের অভিমুখে যাইতেছে।

নবাগত সেই তরুণ সন্ন্যাসীকে তাহার সমবয়স্ক কয়েক জন সন্ন্যাসী "নমো নমঃ" বলিয়া সম্ভাষণ করিল। তৎপরে এক জন জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখিলে? কিছু কার্য্য হইল?"

শুষ্ক, শূন্য মুখে সন্ন্যাসী কহিল, "আমি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম যে দেশের শত্রু তাহাকে শাস্তি দিব, প্রাণ লইতে বা দিতে কিছু মাত্র সঙ্কোচ করিব না। এই উদ্দেশে দেশে দেশে ঘুরিয়াছিলাম, দেখিলাম দেশের লোকই দেশের শত্রু, অপর শত্রু নাই। এ শত্রু কত মারিব, কত লোককে শাস্তি দিব? আমার ব্রত ভঙ্গ হইয়াছে, আমি জটা মুণ্ডন করিয়া, সন্ন্যাসীর ভেক পরিত্যাগ করিয়া, আশ্রমান্তরে যাইব।"

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বিংশশতাব্দীর কেলুয়া।

কে আমি? তোমরা বুঝি ভাবিয়াছ আমি
বৌমাষ্টারের কিম্বা গোপাল উড়ের
যাত্রাদলে, সাজি রঙ্গে কেলুয়া, ভুলুয়া,
হাসাই দর্শকবৃন্দে মুখভঙ্গি করি?
আমার সে অঙ্গভঙ্গি হেরি, হর্ষে সারা
হয় সারালোক? শোক ও বিষাদ ত্যজি
শোনে মোর বিচিত্র সঙ্গীত? রসরঙ্গে
ভরা, হেরি নৃত্য মম, হাসির ফোয়ারা
চৌদিকে ছুটিয়া উঠে! যথা কাতুকুতু
দিলে, হাসে লোক! কিম্বা যেমতি দৈবাৎ
হটাৎ পড়িয়া গেলে বর্ষার পিচ্ছিলে
জোয়ান ঠাকুরদাদা, নাতি ও নাতিনী
একরাশ, হেসে উঠে হাত তালি দিয়া,
কে কাহার গায়ে পড়ে বুড়ার নাকালে?
কিম্বা যথা, হাসে যত ছাত্রবৃন্দ, যবে
কেমিষ্ট্রির প্রোফেসর নিপুণ কৌশলে
সৃজিয়া লাফিং গ্যাস্, করেন কৌতুকে
কক্ষটিরে বৃন্দাবনী রসরঙ্গে ভরা?
না গো না, এ সব নয়। এ বুড়া বয়সে
করেছিনু আমি বিয়া (আঁধারে আলেয়া)!
প্রাণ যায়, আঁখি ঝলসিয়া! ক্ষুদ্র, তবু
বধূ মম অতি উগ্র, যেন রে সমগ্র
লঙ্কা মরিচের ঝাল চাল-ভাজা সহ!
একদিন আমি, সেজে গুজে গিয়াছিনু
আনন্দে শ্বশুরগৃহে সুখের আশ্বিনে।

শালাদের কাণমলা, শালিদের আস্য
উচ্চহাস্য কি মজার! মল্লিনাথী ভাষ্য
কালিদাসী কবিতার যেন! রঙ্গচক্রে
পড়ি, কি কুক্ষণে খাইলাম এক রাশ
সিদ্ধি, বুদ্ধি শুদ্ধি ভুলি! কি অশুভক্ষণে
সেই শুভরাত্রে,—বিজয়াদশমীদিনে,

[From a photo by the Indian Press.]

হইল অশুভ রাত্রি সুখের আশ্বিনে!
শ্যালকেরা মোর, আমার মর্য্যাদা-হানি
করি, (কে না জানে পেনৃশও, সবজজ্,
আমি, ইংরাজি নবিশ?) আমার নেশার
উচ্চ মাত্রা হেরি, থিয়েটর ঘর হ'তে
আনি, ক্লাউনের সাজসজ্জা (ছিঃ! কি লজ্জা!)
চুপে চুপে রঙ্গে দিল মোরে সাজাইয়া
(বিংশ শতাব্দীর দূর পদশব্দ শুনি,
অদ্ভুত টেলিফোঁ দিয়া তিন মাস আগে।),
বিংশশতাব্দীর হায় অপূর্ব্ব কেলুয়া!

* * * *

ভোর রাত্রি, তখনও ছুটে নাই নেশা—
ছোট শালি মম (শালিটার মোটেই গো

[Photo by the Indian Press.]

দয়া মায়া নাই!) বলিল, "হে জলধর,
ভস্মবর্ণ শাদা গোঁফে কলপ মাখিয়া,
কেন এলে যুবা সাজি, বেহায়া, নির্লজ্জ?
হে হোঁদোলকুৎকুতে, তুমি লও নস্য,
মোরা করি হাস্য!"—এত বলি উচ্চরোলে
খিল্ খিল্ করি, নাসিকার রন্ধ্রে মম
দিল গুঁজি এক রাশ নস্য!—উচ্চ হাস্যে
শালি-অরবিন্দ-বৃন্দ পড়িল ঢলিয়া
এ উহার অঙ্গে!—হে পাঠক, হে পাঠিকা,
তোমরা হেস না অত! আমার দুর্দ্দশা,
নাকাল, হইল বড়, ভয়ে জড় সড়,
হাঁচি হাঁচি, কাশিতে কাশিতে (সে হাঁচি কি

থামাইতে পারি? সে বৃদ্ধের কাশি, রুদ্ধ
করে, কার সাধ্য ?) হাসিতে, হাসিতে হায়
কেমনে থামাই বল সিদ্ধির সে হাসি ?
হাঁচি হাঁচি, কাশি কাশি, হাসি মহাহাসি,
কাঁদি কান্না, ছুটিতে ছুটিতে, উঠি পড়ি,
ছাড়িয়া কটরা-রোড, একেবারে গিয়া
সৌথ্-রোডে পড়িলাম, হাঁপাইয়া ছুটে।
বারাণ্ডায় সাজাইয়া অদ্ভুত ক্যামেরা
মনানন্দে ছিল তথা গোয়ার গোবিন্দ
বাঙ্গাল বাঁকুড়াবাসী চট্ট রামানন্দ !
আর ছিল বসি তথা কাঙ্গাল বাঙ্গাল,
ভুট্টাপ্রিয় খোট্টা কবি শঠেন্দ্র দেবেন্দ্র !
অপূর্ব্ব মাণিকযোড়, কাছে মোরে ডাকি
সোহাগে ও যত্নে, মোর ছবি নিল তুলি !
(বড়ই বেয়াড়া হায় সাহিত্যের তুলি !)
পাশে ছিল দাঁড়াইয়া বালকৃষ্ণসম
ক্ষুদ্র শিশু, সেও মম মূরতি নেহারি
হাসিবে কি ? কাঁদিবে কি ? বুঝিতে না পারি,
মৌনী কোন ঋষিসম অবাক অচল!
আমি এবে চিরতরে রহিনু চিত্রিত,
অদ্ভুত, আজ গুবি, ন ভূতং ন ভবিষ্যতি,
"বিংশ শতাব্দীর আহা অপূর্ব্ব কেলুয়া "!

বাঙ্গালী।

যাহারা বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জাবোধ করে; তাহারা বলে,—বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিলেই বাঙ্গালী হয় না। যাহাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বাঙ্গালী বলিয়া পরিচিত হইতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকে; তাহারা বলে,—বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিলেই বাঙ্গালী হয় না। তবে কাহাকে বাঙ্গালী বলিব?

যাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে বাঙ্গালা দেশে বংশানুক্রমে বাস করিয়া আসিতেছে,—কদাপি বাঙ্গালার চতুঃসীমার বাহিরে পদার্পণ করে নাই, কেবল তাহারাই কি বাঙ্গালী? সে হিসাবে গারো কুকী এবং সাঁওতালেরাই খাঁটি বাঙ্গালী; বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি সভ্যজাতি বিদেশাগত উপনিবেশনিবাসী মাত্র!

জন্মস্থান এবং মাতৃভাষা লইয়া বিচার করিতে হইলে বঙ্গদেশপ্রসূত বঙ্গভাষাভাষী ব্যক্তিমাত্রকেই এখন বাঙ্গালী বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে। কাহার পূর্ব্ব পুরুষ কোন্ অজ্ঞাত পুরাকালে বঙ্গদেশে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন, সে কথা এখন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু জন্মস্থান নির্ণয় করিবার পূর্ব্বে কোন্ ভূভাগকে বাঙ্গালা নামে অভিহিত করিব, তদ্বিষয়ে নানা তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে। যেখানে বাঙ্গালা ভাষাই সচরাচর কথোপকথনের ভাষা, তাহাকে বাঙ্গালাদেশ বলিতে হইলে,—আসাম, উৎকল, বিহার ও ছোটনাগপুর পরিত্যাগ করিয়া, রাজসাহী, বর্দ্ধমান, ঢাকা ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের কয়েকটি জেলা লইয়াই বাঙ্গালা দেশের সীমা-নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এই সকল জেলার জন-সাধারণের সচরাচর কথোপকথনের ভাষা বাঙ্গালা;—এখানে যে অল্পসংখ্যক ভিন্ন-ভাষা-ভাষী অন্য লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা তীর্থের কাক, দুইদিনের প্রবাসী, দেশের ভূমির সহিত তাহাদের কোনরূপ স্থায়ী সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় নাই। ইহারা অদ্যাপি শারীরিক শ্রম বা শিল্পকৌশল বিনিময়ে জীবিকার্জ্জন করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। বাঙ্গালার এই চারিটি বিভাগকে যথাক্রমে উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। উত্তর বাঙ্গালার উত্তরে পার্ব্বত্য জনপদে ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন জাতি; সুতরাং উত্তর বাঙ্গালার উত্তরাংশ খাঁটি বাঙ্গালা নহে। পশ্চিম বাঙ্গালার পশ্চিমে বিহার ও ছোটনাগপুর, দক্ষিণে উৎকল; সুতরাং পশ্চিম বাঙ্গালার পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ খাঁটি বাঙ্গালা নহে। পূর্ব্ব বাঙ্গালার উত্তরে আসাম, পূর্ব্বে ব্রহ্ম রাজ্য; সুতরাং পূর্ব্ববাঙ্গালারও উত্তর এবং পূর্ব্বাঞ্চল খাঁটি বাঙ্গালা নহে। কেবল দক্ষিণ বঙ্গই এই হিসাবে খাঁটি বাঙ্গালা। খাঁটি বাঙ্গালা হউক, কিন্তু দক্ষিণ বঙ্গ আধুনিক জনপদ;—পুরাকালে ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সমুদ্র-নিহিত ছিল। উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব্ব বাঙ্গালা যখন শৌর্য্যে বীর্য্যে সাহিত্যে শিল্পে সদাচারে ও সভ্যতায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত, দক্ষিণ

বাঙ্গালা তখনও গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের স্রোতবিধৌত বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গতাড়িত নবোদ্গত বালুকাতট ভিন্ন আর কিছু নহে! সেই বালুকাতটগুলি কালক্রমে মানব-নিবাসের উপযোগী হইয়া প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপোপদ্বীপ ও পরে সুবিস্তৃত সমতল রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। ভূগর্ভ খনন করিবার সময়ে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়; পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিবার সময়েও ইহার কিছু কিছু পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস প্রথমে দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা উচিত; দক্ষিণ বঙ্গের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কাল লইয়া ইতিহাসের কালবিভাগ করা যাইতে পারে। দক্ষিণ বঙ্গ অভ্যুদিত হইবার পূর্ব্বকালে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, সেদেশে কাহারা বাস করিত, তাহাদের দ্বারা বাঙ্গালা দেশে কোন্ কোন্ কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল,—সে কত দিনের কথা এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এই তিনটি প্রাচ্য জনপদের নাম পরিচিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। তন্মধ্যে বঙ্গ বলিতে কেবল পূর্ব্ব বাঙ্গালাকেই বুঝাইত; পশ্চিম বাঙ্গালা কলিঙ্গের ও উত্তর বাঙ্গালা মিথিলা বা ত্রিহুতের অভিভুক্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়।

অঙ্গ রাজ্যের পূর্ব্বে কলিঙ্গ রাজ্যের এক দেশে বনখণ্ডের অভ্যন্তরে আরণ্য গজের প্রাদুর্ভাব ছিল; পশ্চিম বঙ্গের লোকে সেই আরণ্যগজ সুশিক্ষিত করিয়া রণক্ষেত্রে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের গ্রন্থে ইঁহারাই গঙ্গারাঢ়ীয় নামে পরিচিত। তৎকালে উত্তর বঙ্গ মিথিলা বা ত্রিহুতের অন্তর্গত থাকিয়া কৃষি শিল্প ও সাহিত্য সেবায় নিযুক্ত ছিল, পূর্ব্ববঙ্গ এক প্রান্তে আসাম ও অপর প্রান্তে ব্রহ্মরাজ্যের অধিবাসিবর্গের সহিত নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া আত্মরক্ষা করিত। পুরাকালের পশ্চিম ও পূর্ব্ব বাঙ্গালায় শৌর্য্য বীর্য্য এবং উত্তর বাঙ্গালায় শিল্প ও সাহিত্যোন্নতির এই অনুমান নিতান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয় না। শিল্প ও সাহিত্যের ক্রমোন্নতির জন্য যে শান্তি ও বিশ্রাম-সুখের প্রয়োজন, পূর্ব্ব বা পশ্চিম বাঙ্গালায় তাহা তখনও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। কিন্তু পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালা অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া জলপথে নানা দিগ্দেশে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তদুপলক্ষে সমুদ্রপথে প্রশান্ত-মহাসাগরমধ্যস্থ দ্বীপপুঞ্জে ও চীনরাজ্যে যে ভারতীয় সভ্যতা সুবিস্তৃত হয়, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার লোকেরাই তাহার প্রধান নিদান। তাহাদের বীরবাহু স্বদেশরক্ষার্থ নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া স্বদেশের পণ্যভাণ্ডার বিদেশে বহন করিয়া বিদেশের রত্নরাশি স্বদেশে আনয়ন করিত। ইহার ফলে ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চল নানা দূরদেশেও সুপরিচিত হইয়াছিল।

তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের সহিত পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গালার যেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল, পূর্ব্ব বাঙ্গালার সেরূপ সংস্রব লাভের সুযোগ ছিল না। পূর্ব্ব বাঙ্গালা আর্য্যাবর্ত্তের সুসভ্য আর্য্যনিবাস হইতে বহুদূরে বিচ্ছিন্নভাবে বিন্যস্ত বলিয়া, তথায় যাহা কিছু সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, তাহা একরূপ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাবেই বিকশিত হইয়াছিল। বোধ হয় এই সকল কারণে তৎকালে বঙ্গ বলিতে কেবল পূর্ব্ব বঙ্গকেই বুঝাইত; পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গ বঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইত না। পূর্ব্ববঙ্গের প্রতাপ জলে স্থলে পরিব্যাপ্ত হইবার পর হইতেই কালক্রমে উত্তর ও পশ্চিম বাঙ্গালাও বঙ্গমধ্যে পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

বঙ্গ বহুদিনের সভ্য জনপদ। এখানকার ভাষা, এখানকার লিখনপ্রণালী, এখানকার গৃহনির্ম্মাণকৌশল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে পৃথক। উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালা ভাষা যখন সংস্কৃত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া ভিন্নরূপধারণ করিতেছিল, পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় তখনও সংস্কৃতের ছায়া সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত হইত, অদ্যাপি তাহার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। লিখনপ্রণালী পুরাতন পালি বা দেবনাগরী বা মৈথিলী আকার পরিত্যাগ করিয়া যে ধীরে ধীরে স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাও পূর্ব্ববাঙ্গালা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্ববঙ্গের গৃহনির্ম্মাণকৌশল ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কেন—উত্তর ও পশ্চিম বাঙ্গালার গৃহনির্ম্মাণকৌশল হইতেও বিভিন্ন; বরং এতদ্বিষয়ে উত্তর ও পশ্চিম বাঙ্গালা প্রায় একরূপ, কেবল পূর্ব্ববাঙ্গালাই পৃথক্। পূর্ব্ববাঙ্গালার শিল্পোন্নতিও

পৃথক্ পথে ধাবিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। যাহারা নিয়ত মাতৃভূমির সহিত সংলগ্ন থাকিয়া তাহার আদর্শের অনুকরণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারা ভিন্ন দেশে বাস করিবার সময়েও সে দেশের নূতন দ্রব্যাদির ফললাভ করিতে পারে না। যাহারা জন্মভূমি হইতে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তাহারা বাধ্য হইয়া নূতন দেশের নূতন দ্রব্যাদি আত্মকার্য্যে নিয়োগ করিবার জন্য বুদ্ধিকৌশলে নবশিল্পের অবতারণা করিয়া থাকে। শিল্পালোচনা করিলে পূর্ব্ববঙ্গেরও যে একদা এইরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিবে না। পশ্চিম ও উত্তর বাঙ্গালা কৃষিজাত দ্রব্যে সুসম্পন্ন বলিয়া তাহার বিনিময়ে ধনোপার্জ্জন করিবার জন্যই ধাবিত হইত। পশ্চিম বঙ্গের রাঢ়বণিগ্‌বর্গ আমলকি হরিতকির ছড়াছড়ি করিতেন; তাহারই বিনিময়ে বিদেশ হইতে ধনাহরণ করিতেন। উত্তর বঙ্গের লোকেও কৃষিজাত দ্রব্যের আদান প্রদান দ্বারা ধনোপার্জ্জনে ব্যস্ত ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের কৃষিদ্রব্য অধিক হইলেও, কৃষিজাত রূঢ়দ্রব্য শিল্প-কৌশলে রূপান্তরিত হইয়া ধনোপার্জ্জনের সহায়তা করিত। যাহারা ধরিত্রীকে যেরূপ অবস্থায় পাইয়াছিল সেইরূপ অবস্থায় রাখিয়া যায়, তাহারা অলস ও মূর্খ। যাহারা ধরিত্রী হইতে ধনাহরণকালে কৃষির সঙ্গে শিল্পের সংযোগ করিয়া লয়, তাহারা কর্ম্মঠ ও সুপণ্ডিত। এই হিসাবে পূর্ব্ববঙ্গ কর্ম্মঠ ও সুপণ্ডিত বলিয়া সম্মানের পাত্র। অতি পুরাকালে স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই বাঙ্গালীর ভ্রমণনৈপুণ্য বৰ্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। এখনকার বাঙ্গালী ষ্টীমারে চড়িয়াও পদ্মাপার হইতে আশঙ্কা বোধ করে, তখনকার বাঙ্গালী ভেলায় সমুদ্র পার হইত—তৎকালপ্রচলিত অর্ণব-যানে আরোহণ করিয়া সাহস, সহিষ্ণুতা ও বাহুবলমাত্র সম্বল করিয়া দ্বীপোপদ্বীপে বিচরণ করিত। তখন গৃহে অন্ন-সংস্থানের অভাব ছিল না, তথাপি বাঙ্গালী গৃহকোণে জীবন-পাত না করিয়া নানা দিগ্দেশে বিচরণ করিত কেন? স্বদেশে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য উপ-ভোগ করিবার সুবিধা থাকিতেও তরঙ্গসঙ্কুল সাগরযাত্রায় অনশন অর্দ্ধাশন বা উপবাসক্লেশ সহ্য করিবার জন্য লালায়িত হইত কেন?

যাহারা সমুদ্রতীরে বাস করে, তাহারা কৌতূহল ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াই প্রথমে সমুদ্রবেলায় বিচরণ করে; পরে কূলে কূলে পরিভ্রমণ ও ক্রমশঃ সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পোতাদি নির্ম্মাণ করিতে থাকে; অবশেষে সমুদ্রই তাহাদের শৌর্য্য বীর্য্য ও ধনাগমের নিদান হইয়া পড়ে—স্থলপথ অপেক্ষা জলপথেই অধিক অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। নিত্য নূতন দেশে পদার্পণ, নিত্য অপরিজ্ঞাত-পূর্ব্ব শোভাসন্দর্শন, নিত্য নবোৎসাহে ধনাহরণ, এবং নিত্য নবকীর্ত্তি সংস্থাপনের লোভে সমুদ্রকূলনিবাসী মানবসমাজ সমুদ্রভ্রমণে সুদক্ষ হইয়া উঠে। পৃথিবীর সমুদ্রকূলনিবাসী সমস্ত জনপদেই ইহার পরিচয় প্রকাশিত রহিয়াছে; বাঙ্গালার সমুদ্রকূলেও ইহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল;—এখনও তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

দক্ষিণ বাঙ্গালা সমুদ্রনিহিত থাকিবার সময়ে মুরশিদাবাদের নিকটবর্ত্তী রাঙ্গামাটী নামক স্থানে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়; তৎকালে সমুদ্র রাঙ্গামাটার পদধৌত করিত এবং সিংহলের অর্ণবপোত বাণিজ্যোপলক্ষে রাঙ্গামাটী পর্য্যন্ত যাতায়াত করিত। এই স্থানে একটি জলযুদ্ধ সংঘটিত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিলুপ্ত কাহিনীর পুনরুদ্ধার সাধিত হইলে এইরূপ আরও কত পুরাতন বন্দরের পরিচয় প্রকাশিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

অন্যান্য দেশের ন্যায় বঙ্গদেশের সভ্যতা আধুনিক নহে; ইহার শৌর্য্য বীর্য্যের কথা, ইহার শিল্পগৌরবের কথা, ইহার শিল্পশালাসঞ্জাত বিচিত্র পণ্যদ্রব্যের পরিচয় প্রাচীন গ্রীক ও রোমক রাজ্যেও সুপরিজ্ঞাত ছিল। তৎকালে বাঙ্গালার পশ্চিম ও উত্তরাংশের পুরাতন জনপদের স্থানে স্থানে যে সকল বৌদ্ধ কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার নিদর্শনের অভাব নাই; চৈনিক ভ্রমণকারিগণও তাহা দর্শন করিবার জন্য এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তখনও পূর্ব্বোপসাগরের বাণিজ্যপোত বাঙ্গালীর শাসন ও পরি-চালন কৌশলের অধীন ছিল। যাহারা তৎকালে বাঙ্গালা-দেশে বাস করিত, তাহাদের ভাষা ও সাহিত্য কিরূপ ছিল তাহার নিদর্শন বিলুপ্ত হইলেও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। বাঙ্গালাদেশে তাহার নিদর্শন দুর্লভ, কিন্তু সমুদ্রবেষ্টিত যবদ্বীপ বালিদ্বীপ প্রভৃতি পুরাতন জনপদে তাহা অদ্যাপি দেদীপ্যমান।

ভারতবর্ষের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সভ্য জনপদ। আর্য্যাবর্ত্ত যখন শিক্ষা দীক্ষা ও সভ্যতায় সমুন্নত, দাক্ষিণাত্য তখন তপোবন-সমাচ্ছন্ন অজ্ঞানতার ঘনান্ধকারে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন। তাহার পর ক্রমে দাক্ষিণাত্যেও আর্য্যোপনিবাস সংস্থাপিত হইয়া দুই একটি করিয়া গ্রাম নগর সংস্থাপিত হইতে আরম্ভ করে। দাক্ষিণাত্য এইরূপে আর্য্যনিবাসে পরিণত হইবার পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্ব বাঙ্গালা পর্য্যন্ত পূর্ব্বে ও কলিঙ্গ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-দক্ষিণে আর্য্যপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎকালে বঙ্গোপকূলে তিনটি সম্পন্ন জনপদ বিদেশে কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল; সংক্ষেপে উড়িষ্যা হইতে আরাকানের উপকূল পর্য্যন্ত কলিঙ্গের অধিকার ছিল। এই কলিঙ্গ জনপদের অধিবাসিবর্গই প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে আর্য্য সভ্যতা, আর্য্যভাষা, আর্য্য সাহিত্য ও আর্য্যপ্রতাপ সুবিস্তৃত করে। যব দ্বীপ ও বালিদ্বীপের হিন্দু অধিবাসিবর্গের বিশ্বাস, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এই কলিঙ্গরাজ্য হইতেই দ্বীপে দ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সে সকল আর্য্যোপনিবেশের ভাষা ও লিখনপ্রণালীর পরিচয় অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই। সে ভাষার নাম ছিল কবি ভাষা, লিখনপ্রণালীতে সংস্কৃতের অনুরূপ ক খ গ ঘ ঙ ইত্যাদি সুপরিচিত বর্ণ বিন্যস্ত! কবিভাষার শব্দাবলী বিকৃত উচ্চারণে যৎকিঞ্চিৎ বিকৃত হইলেও বাঙ্গালীর পক্ষে একেবারে দুর্ব্বোধ্য নহে। কবিভাষানিবদ্ধ সাহিত্য ও ভারতবর্ষের সুপরিচিত রামায়ণাদি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই সাহিত্যে ও লিখনপ্রণালীতে সংস্কৃতের সম্পূর্ণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য ও লিখনপ্রণালীতেও সেই প্রভাব বর্ত্তমান। সুতরাং সেকালের বাঙ্গালা দেশেও যে সংস্কৃতের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল, তাহাই সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। আর্য্যাবর্ত্তের সংস্কৃত হিন্দীতে ও এদেশের সংস্কৃত কালক্রমে বাঙ্গালায় রূপান্তরিত হইয়াছে। লিখনপ্রণালীও সংস্কৃতের অক্ষরমালার আদর্শেই গঠিত, কেবল স্থান ও কালের পার্থক্যে ক্রমশঃ পৃথক হইয়া পড়িতেছে।

বিহার ও উৎকলের ন্যায় বাঙ্গালাদেশে পালি অক্ষরের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায় না; পালবংশীয় বৌদ্ধ নরপালবর্গের শাসনলিপিতেও মৈথিলী অক্ষরের প্রাদুর্ভাব; তাহাই বাঙ্গালার পুরাতন লিপিপ্রণালী ছিল বলিয়া বোধ হয়। সেই লিপিপ্রণালীলিখিত যে সকল অতি পুরাতন তাম্র বা প্রস্তরফলক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সংস্কৃত ভাষায় রচিত; সচরাচর কথোপকথনের ভাষা সংস্কৃত হইতে কতদূর স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা না জানিলেও, ধর্ম্ম ও রাজকার্য্যে ব্যবহৃত ভাষা যে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছিল, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। মধ্য ভারতে পালি ভাষাই সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছিল, পূর্ব্ব ভারতে তখনও সংস্কৃতের প্রভাব বর্ত্তমান ছিল।

বৌদ্ধাবিভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার যৎসামান্য সাধারণ আভাস ভিন্ন বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হইবার আশা নাই। বৌদ্ধাবিভাবের পরবর্ত্তী যুগে বাঙ্গালার অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়ে মগধ রাজ্য গৌরবের উচ্চচূড়া স্পর্শ করিয়াছিল; মগধেশ্বরের নাম ও কীর্ত্তিকাহিনী পৃথিবীর বহুদূরদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এসিয়াখণ্ডের নানা স্থানে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্মনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দক্ষিণ বঙ্গ এই যুগে সমতট নামে পরিচিত, লোকনিবাসে পরিণত ও কৃষিকার্য্যের উপযোগী হইয়াছিল; পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গ এই সময়ে সমুদ্র পথে বাণিজ্য ব্যবসায়ে ধনোপার্জ্জনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল; উত্তর বঙ্গ এই সময়ে বহু বৌদ্ধকীর্ত্তিতে সুসজ্জিত হইয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধপ্রভাব বর্দ্ধিত হইবার সময়ে উত্তর বঙ্গের পূর্ব্বোত্তরাংশে কামরূপের পুরাতন জনপদ ভিন্ন বাঙ্গালার সকল স্থানই বৌদ্ধাচারে দীক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এইরূপে সৌরাষ্ট্র ও মগধের ন্যায় পুরাতন ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

ভাষা ও সাহিত্য, ধর্ম্ম ও লোকাচার বৌদ্ধপ্রভাবসময়ে সকল স্থানেই যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল; বাঙ্গালাদেশেও তাহার পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে বাঙ্গালা দেশের সহিত ভারতবর্ষের অন্যান্য জনপদের কলহবিবাদের অনেক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সময়ে বাঙ্গালা কখন মগধের, কখন কলিঙ্গের, কখন অঙ্গের, কখন বা বঙ্গের

অধীন হইয়াছে; আবার বাঙ্গালীরা কখন বাহুবলে অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মিথিলা গুজ্জর ও কাশ্মীর পর্য্যন্তও রাজনৈতিক প্রবলপ্রতাপ বিস্তৃত করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই সংঘর্ষ উপলক্ষে বাঙ্গালাদেশে প্রতিনিয়ত নানা দেশের নানা জাতির লোক প্রবেশ করিয়াছে। কেহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে, কেহ বা সপরিবারে বাঙ্গালায় বাসস্থান স্থাপন করিয়াছে, কেহ আবার বাঙ্গালীর সহিত বৈবাহিকসূত্রে মিলিত হইয়া বাঙ্গালীর দলপুষ্টি করিয়াছে। আজ যাহারা বাঙ্গালী নামে পরিচিত, তাহারা এইরূপে কতবার নবাগত অতিথিগণকে আপনাদিগের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে, তাহার তথ্যানুসন্ধান করা এখন অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

কালক্রমে মোসলমানেরা আসিয়া বাঙ্গালীর দলপুষ্টি করিয়াছেন। এখন হিন্দু এবং মোসলমানেরাই বাঙ্গালার প্রধান অধিবাসী। যাহারা একদা হিন্দু বলিয়া পরিচিত ছিল, তন্মধ্যে বহুলোকে ইসলামের ধর্ম্ম গ্রহণ করায় মোসলমানের সংখ্যা অল্পদিনের মধ্যেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এখন বাঙ্গালার সুখদুঃখের সহিত যাহাদের চিরসংশ্রব, তাহারা মিশ্রজাতি—কেহ হিন্দু, কেহ মোসলমান, কেহ বা খৃষ্টীয়ান; কিন্তু সকলেই বাঙ্গালী।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বকালের বাঙ্গালার ইতিহাসে কেবল হিন্দুর কথা, তৎপরবর্ত্তী কাল হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর কিয়দংশ পর্য্যন্ত হিন্দু ও মোসলমানের কথা, এবং তাহার পর হইতে হিন্দু মোসলমান ও খৃষ্টীয়ানের কথা। এই ত্রিবিধ যুগেই বাঙ্গালীর অগৌরবের অনেক পরিচয় বাহির করিতে পারা যায়। সেরূপ অগৌরবের কথা কোন্ জাতির ইতিহাসেই বা একেবারে নাই? কিন্তু এই ত্রিবিধ যুগেই বাঙ্গালীর অনেক গৌরবের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। বিদেশীয় ইতিহাসলেখকগণ কেবল অগৌরবের কথাই নানা ছন্দোবন্ধে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; বাঙ্গালী লেখকগণ অনুসন্ধান করিলে তাহার মূলে সত্যের সঙ্গে অনেক মিথ্যাও মিশ্রিত দেখিতে পাইবেন।

বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই; সুতরাং বাঙ্গালীর কীর্ত্তিকাহিনী সাধারণে সুপরিচিত নহে। বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালী নানা দেশে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহারা প্রবাসী তাহারা ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন আচার ব্যবহারে জড়িত হইয়াও আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া কত ভাবে আত্মপ্রতিভার পরিচয় প্রদান করিতেছে, এতদিনের পর তাহার কাহিনী সঙ্কলিত হইবার উপায় হইল। প্রবাসী বাঙ্গালী মাতৃভাষার পুষ্টিসাধনের জন্য মাসিকপত্রিকা প্রচার করিতেছেন, ইহা বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে নিরতিশয় আশা ও আনন্দের সমাচার। বাঙ্গালীর অতীত যাহাই হউক, ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। সে ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যসোপান গঠন করিবার ভার কেবল স্বদেশবাসী বাঙ্গালীর উপরেই ন্যস্ত নহে; প্রবাসী বাঙ্গালীকেও তাহার জন্য শ্রম স্বীকার করিতে হইবে। প্রবাসী এতদিন অর্থোপার্জ্জনে ব্যস্ত ছিলেন, এখন স্বদেশ ও স্বজাতির কথা স্মরণপথে পতিত হইয়াছে। ভগবান এই নবজাত সাধু সংকল্পের সহায় হউন।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

শর্করা বিজ্ঞান।

তৃতীয় অধ্যায়।

বীজ হইতে ইক্ষু উৎপাদন।

ইংরাজ, ওলন্দাজ, আমেরিকান, প্রভৃতি জাতীয় কৃষকগণ নানা উপায়ে ইক্ষুর উন্নতিসাধন করিয়াছেন। উন্নতির উপায় প্রধানতঃ চারিটি।

১ম—বীজ হইতে গাছ জন্মাইয়া, এই গাছের মধ্য হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট দণ্ড বাছিয়া লইয়া উহার কলম ব্যবহার করা যাইতে পারে।

২য়—আমাদের দেশে যেমন গাছের ডগাটি মাত্র প্রায় কলম বা বীজরূপে ব্যবহৃত হয়, অন্যত্র সে নিয়ম প্রচলিত নাই। ইক্ষুদণ্ডের সুমিষ্ট অংশ বীজরূপে ব্যবহার করিলে, ঐ বীজ হইতে যে গাছ জন্মে, উহার দণ্ড অপেক্ষাকৃত অধিক সুমিষ্ট ও স্থূল হয়। তবে নিতান্ত গোড়ার দিকের আক হইতে ভাল বীজ হয় না। আগার দিকের তিন ফুট আক্ বীজের জন্য ব্যবহার করা উচিত।

৩য়—পোলারিস্কোপ্ যন্ত্র দ্বারা কোন্ ইক্ষুদণ্ডের রসে কি পরিমাণ শর্করা আছে ইহা নির্ণয় করিয়া লইয়া, উপযুক্ত দণ্ড নির্দ্ধারিত করিয়া বীজ রূপে ব্যবহার করা উচিত।

৪র্থ—সুপক্ক, অবিকৃত, সুঠাম দণ্ড বীজরূপে ব্যবহৃত করিয়া, সুনিয়মে কৃষিকার্য্য করা কর্ত্তব্য।

১১। এই অধ্যায়ে কেবল বীজ হইতে কিরূপে ইক্ষুর গাছ জন্মান যাইতে পারে, তাহাই বিবৃত হইবে। ইক্ষুক্ষেত্রে কখন কখন দেখা যায় দুই একটা গাছে 'শোঁটা' বাহির হইয়া উহাতে বীজ ধরিয়া রহিয়াছে। কোন জাতীয় ইক্ষুর বীজশীর্ষ অধিক পরিমাণ হইয়া থাকে, কোন জাতির অল্প পরিমাণ হইয়া থাকে এবং সাধারণতঃ ইক্ষুগাছে বীজশীর্ষ আদৌ জন্মে না। যে জাতীয় ইক্ষুর বীজশীর্ষ সহজেই নির্গত হয়, এবং যাহা বীজ হইতেই জন্মাইবার নিয়ম, তাহাকে 'উড়ি আক্' কহে। যে যে জাতীয় ইক্ষুর বীজশীর্ষ দেখা যায় না, সে সে জাতীয় ইক্ষুও অধিক অন্তর অন্তর লাগাইলে উহাতে দুই একটা বীজশীর্ষ নির্গত হয়। আমাদের দেশে যেমন দেড় হাত অন্তর ইক্ষু লাগাইবার নিয়ম আছে, অন্যান্য দেশে এতাদৃশ নিকট নিকট ইক্ষুশ্রেণী লাগাইবার নিয়ম নাই। মরীচি দ্বীপে ৪॥০ ফুট অন্তর এবং ষ্ট্রেট-সেট্‌ল্‌মেন্ট্ ও ফিজি দ্বীপে ছয় ফুট অন্তর শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ইক্ষুর কলম লাগান নিয়ম। ইহাতে গাছগুলি অধিক রৌদ্র ও বায়ু পাইয়া স্বাভাবিক নিয়মে বর্দ্ধিত হইয়া, বীজবান্ হইতে সক্ষম হয়। তবে কোন কোন জাতীয় ইক্ষুর বীজের উৎপাদিকা শক্তি অধিক, কোন কোন জাতীয় ইক্ষুর বীজের উৎপাদিকা শক্তি নিতান্ত হীন। আবার বীজ সংগ্রহ করিতে পারিলেই যে উহা হইতে গাছ বাহির হইবে, এরূপ কোন কথা নাই।

১২। বীজশীর্ষ বাহির হইলে উহা হইতে বীজ সংগ্রহ করিবার জন্য কয়েকটী নিয়ম স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ইক্ষুর বীজ পাকিলেই সহজে বায়ুযোগে উড়িয়া যায়। বীজ গুলি পাকিয়াছে অথচ উড়িয়া যায় নাই, এরূপ অবস্থায় বীজ সংগ্রহ করিতে হইলে কিছু সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। বীজশীর্ষের নিম্নস্থ পত্রটী যখন শুকাইতে আরম্ভ করে, তখনই বুঝিতে হইবে বীজ পাকিয়াছে, আর অধিক পাকিবার আবশ্যক নাই। বীজশীর্ষটী কাটিয়া লইয়া উহার সূক্ষ্ম প্রশাখাগুলি বীজসহ বপন করিতে হয়। যে মৃত্তিকাতে বীজ বপন করা যাইবে, উহা প্রধানতঃ বালুকাময় হওয়া আবশ্যক, অথচ কিছু কর্দ্দমের ভাগ থাকাও চাই। এইরূপ মৃত্তিকার সহিত পুরাতন পচা গোময় মিশ্রিত করিয়া অনতিগভীর বাক্সের মধ্যে এই মৃত্তিকা দিয়া উহার উপর বীজের সূক্ষ্ম প্রশাখাগুলি শায়িত ভাবে রাখিতে হইবে। মৃত্তিকা দ্বারা বীজ ঢাকিলে চলিবে না। বাক্স অনাবৃত স্থানেই রাখিতে হইবে। রৌদ্রাতপ নিবারণের আবশ্যকতা নাই। বীজ বপন কাল হইতে অনবরত মৃত্তিকা যেন সিক্তাবস্থায় থাকে এই মাত্র দেখা আবশ্যক। শৈত্য রাখিতে হইলে স্থানবিশেষে ও সময়বিশেষে প্রত্যহ জল ছিটান আবশ্যক হইতে পারে, এবং স্থানবিশেষে ও সময়বিশেষে সকালে ও বৈকালে দুই বেলাই জলসেচন আবশ্যক হইতে পারে। জলসেচন দ্বারা বীজ গুলি পাছে 'ওলট্ পালট্' হইয়া যায়, একারণ সূক্ষ্মধারাবিশিষ্ট ঝাঁজ্‌রি বা পিচ্‌কারি দ্বারা জলসেচন আবশ্যক। বীজ সংগ্রহের সময় হইতে দেড় মাসের মধ্যে বীজ বপন আবশ্যক। যদি বীজ বপন করিবার পরে এক সপ্তাহের মধ্যে বীজ গুলি অঙ্কুরিত না হয়, তাহা হইলে অনুমান করিতে হইবে, বীজ গুলির অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি লোপ পাইয়াছে। বীজ অঙ্কুরিত হইলে ইক্ষুর চারাগুলি অতি সূক্ষ্ম তৃণের ন্যায় বাহির হইয়া থাকে। চারাগুলি ছয় অঙ্গুলি আন্দাজ উচ্চ হইলে বড় বড় গামলায় ঐগুলি উঠাইয়া উঠাইয়া লাগাইয়া দিতে হয়। এই সকল গামলাতেও পূর্ব্বোক্তরূপে মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া লইয়া, ভরিয়া, পরে চারা লাগান নিয়ম। এই গামলাগুলিও রৌদ্রে থাকিবে এবং ইহার মৃত্তিকাও বরাবর সিক্তাবস্থায় রাখিতে হইবে। পরে যখন গমলার গাছগুলি প্রায় এক হাত উচ্চ হইয়া উঠিবে, তখন আবার ঐগুলিকে উঠাইয়া মাঠে যেমন ইক্ষু লাগাইবার নিয়ম আছে, সেইরূপ লাগাইতে হয়। যেরূপ সার দিবার, নিড়াইবার ও জল দিবার নিয়ম আছে, বীজ হইতে উৎপন্ন গাছেও ঠিক সেইরূপে সার দেওয়া, জল সেচন ও নিড়ান কার্য্য চলিবে।

১৩। বীজ হইতে গাছ প্রস্তুত করিতে পারিলেই যে গাছের উন্নতি হইবে এমন কোন কথা নাই। যেমন আঁটির আমগাছে সুমিষ্ট ফলও ধরিতে পারে, অম্লরসের ফলও ধরিতে পারে, বীজের ইক্ষু হইতে সেইরূপ সুমিষ্ট স্থূলকায় ইক্ষুদণ্ডও জন্মিতে পারে, অথবা সূক্ষ্ম ও বিস্বাদ ইক্ষুদণ্ডও জন্মিতে পারে। বীজের ইক্ষু আঁটির আম্রের ন্যায় বিভিন্ন প্রকারের হয়, অর্থাৎ ভাল, মন্দ অনেক প্রকারের গাছ

একই প্রকারের গাছের বা একই গাছের বীজ হইতে জন্মে। পরে ভাল গাছ বাছিয়া লইয়া উহার দণ্ড বীজরূপে ব্যবহার করিলে ভাল একটা জাতি দাঁড়াইয়া যায়। সাধারণ ইক্ষু চাষের জন্য বীজ ব্যবহার চলিতে পারে না। ভাল ভাল জাতি স্থাপিত করিতে হইলেই বীজ ব্যবহার আবশ্যক। স্থূলদণ্ড দেখিয়া গাছ পক্কাবস্থায় নির্ব্বাচন করিয়া পরে উহার রসে শর্করার পরিমাণ কত ইহা পোলারিস্কোপ দ্বারা স্থির করিয়া লইয়া, ঐ গাছের অবশিষ্ট দণ্ড বীজরূপে ব্যবহৃত করিয়া শ্রেষ্ঠ জাতি স্থাপিত করিতে হয়। হাজারের মধ্যে হয়ত দশটা গাছ শ্রেষ্ঠ জাতির প্রসূতি হইবার যোগ্য বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। অবশিষ্ট গাছগুলি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট, এবং এগুলি রাখিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

১৪। উচ্চ এবং লোহিত বালুকাময় জমিতে এক জাতীয় গাছ হইতে ফল ভাল হইল বলিয়া, নিম্ন কৃষ্ণবর্ণ ও কর্দ্দমময় জমিতে সেই জাতীয় গাছ হইতে ভাল ফল পাওয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই। ভিন্ন ভিন্ন মৃত্তিকায় ফল ভাল মন্দ হইতে পারে, অবার এমন কোন জাতি দাড়াইয়া যাইতে পারে যাহা সকল প্রকার মৃত্তিকাতেই সুফল প্রদান করিবে। বীজ হইতে উৎপন্ন গাছের অবস্থার কথা কিছু বলা যায় না, পরীক্ষা ভিন্ন কখনই ঠিক বলা যায় না, এ জাতি এ জমিতে ভাল হইবে কি না হইবে। শ্রেষ্ঠ জাতি প্রস্থাপনের পরে উহার কলম নানা শ্রেণীর মৃত্তিকায়, ও নানা দেশে ও নানা অবস্থায়, উৎপন্ন করিয়া স্থির করিতে হইবে, কোন্ কোন্ মৃত্তিকার পক্ষে বা অবস্থার পক্ষে এই জাতীয় ইক্ষু বিশেষ উপযোগী। বুরবন্ জাতীয় ইক্ষু অতি শ্রেষ্ঠ, কিন্তু লোহিত বালুকাময় উচ্চ স্থানের জন্যই ইহা উপযোগী, নিম্ন কর্দ্দমময় ভূমিতে ইহার 'ফলন' বিঘাপ্রতি কেবল মাত্র ৪ মণ গুড়। এই গুড়ে সার ভাগ [অর্থাৎ খাটি শর্করা] শতকরা ৮৪ ভাগ মাত্র। বার্বেডো দ্বীপে বীজ হইতে উৎপন্ন একটী নূতন জাতীয় ইক্ষু (যাহার নাম আপাততঃ "বি—১৪৭"), লোহিত বালুকাময় উচ্চ জমিরও উপযোগী, আবার কর্দ্দমময় নিম্ন জমিরও উপযোগী। উচ্চ লোহিত বর্ণের জমি অপেক্ষা নিম্ন কৃষ্ণবর্ণের জমিতে এই ইক্ষুর 'ফলন' অধিক হয়। উচ্চ লোহিতবর্ণের জমিতেও গড়ে বিঘাপ্রতি ২৭।২৮ মণ গুড় এই ইক্ষুর ফলন। 'বি ১৪৭' সম্ভবতঃ বঙ্গদেশে প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ উপকার দর্শিবে। কিন্তু এদেশেও বীজ হইতে ইক্ষু উৎপন্ন করিয়া শ্রেষ্ঠ জাতি স্থাপন করিবার পৃথক্ বন্দোবস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। বিদেশ হইতে বীজ সংগ্রহ করিয়া এ দেশে ছয় সপ্তাহের মধ্যে বীজ রোপণের বন্দোবস্ত করিয়া উঠাও দুরূহ, একারণ, 'পাটনাই কুম্বর,' 'শ্যাম সাড়া' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতীয় এদেশীয় ইক্ষুর বীজ উৎপাদনের প্রয়াস পাওয়া এবং সেই বীজ হইতে চারা বাহির করিয়া উপযুক্ত বীজদণ্ড নির্ব্বাচিত করিয়া নূতন জাতি প্রস্থাপিত করা, এদেশেই হওয়া কর্ত্তব্য। নানা পরীক্ষার মধ্যে এই পরীক্ষা করিতে গেলে অযত্ন হওয়া সম্ভব। ইহার জন্য ইক্ষু পরীক্ষার পৃথক বন্দোবস্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। তবে গবর্নমেণ্টই এদেশে এ সকল বন্দোবস্ত করিবেন এবং এদেশের ধনী ব্যক্তিগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন ইহা সঙ্গত নহে। অবশ্য নীলকর সাহেবেরা এ বিষয়ে যত্ন করিতেছেন এবং তাঁহাদের যত্নে এই পরীক্ষা স্থাপিত হওয়াও সম্ভব, কিন্তু এদেশীয় লোকেদের উদাসীন হইয়া থাকাও ঠিক নহে। সাহেবদের দ্বারা যদি কোন চাষের কার্য্য সুচারুরূপে না চলে তাহা হইলে যে এদেশীয় চাষীদের দ্বারাও ঐ চাষের কার্য্য চলিবে না, এ কে বলিতে পারে? চাষীদের উন্নতিকল্পে জমিদারবর্গের দ্বারা আয়োজন হওয়াই বিহিত। বিদেশ হইতে শ্রেষ্ঠজাতীয় ইক্ষুর কলম সংগ্রহ করিয়া এদেশে আনিয়া ফেলা, গবর্নমেণ্টের সাহায্য ভিন্ন ঘটা সম্ভব নহে। কুইন্‌স্‌ল্যাণ্ডে বাণ্ডোএ বা রোস্ বাম্ব (গোলাপ বাঁশ) নামক যে ইক্ষু জন্মে, উহার ত্বক নিতান্ত কঠিন বলিয়া চাষীরা ঐ জাতীয় ইক্ষু পছন্দ করে। কীট, ব্যাধি বা অন্য কোন উৎপাত এই ইক্ষুতে প্রায় ঘটে না। অথচ ইহা হইতে শর্করার ফলন অত্যন্ত অধিক হয়। টান্না (Tanna) জাতীয় ইক্ষু দৈর্ঘ্যে ও স্থূলতায় অতি শ্রেষ্ঠ। ওটাহিটী চর্ব্ব্যজাতীয় ইক্ষুর অগ্রগণ্য। বীজ হইতেই প্রথমে এই সকল শ্রেষ্ঠ-জাতীয় ইক্ষু প্রস্থাপিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

টিকুলি কাটা ও হাপর-জাত করা।

কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্র, বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত, ইক্ষু কাটা, গুড় প্রস্তুত করা ও কলম লাগান চলিতে পারে। নিম্ন বঙ্গদেশে

ফাল্গুন মাসে কলম লাগাইলে গাছের যেরূপ তেজ হয়, অন্য মাসে কলম লাগাইলে সেরূপ তেজ হয় না; তবে খরচ অধিক করিয়া অগ্রহায়ণ মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে জল দিয়া যাইতে পারিলে, ফাল্গুন মাসে কলম লাগাইয়া যেরূপ ফল পাওয়া যায়, কার্ত্তিক মাসে কলম লাগাইলেও সেইরূপ ফল পাওয়া যায়। শীতের সময় গাছগুলির বৃদ্ধি সুচারুরূপে না হওয়াতে গাঁইটগুলি নিকট নিকট হয়। ফাল্গুন মাসের পরে আবার গাঁইটগুলি অন্তর অন্তর হওয়াতে দণ্ডগুলির উপরিভাগ নিয়মিত রূপেই বর্দ্ধিত হয়। ব্যয় সংকুলন ও নিয়মিত বৃদ্ধি লাভ করিতে হইলে ফাল্গুন মাসেই কলম লাগান শ্রেয়ঃ। তবে ঐ একই সময়ে গুড় প্রস্তুত কার্য্য করিতে হইলে, কুলি মজুর পাওয়ার পক্ষে অসুবিধা হইয়া পড়ে। এক মাসে যে কার্য্য হইতে পারে সে কার্য্য ৩।৪ মাস ধরিয়া করিতে পারিলে বিস্তৃতভাবে কার্য্য চালাইবার পক্ষে সুবিধা হয়। পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে আক কাটা ও গুড় প্রস্তুত হইতে থাকিবে, এবং ফাল্গুন চৈত্র মাসে কলম লাগান চলিতে থাকিবে, এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে পারিলে চারিমাস ধরিয়া আবশ্যকমত কয়েকজন শ্রমজীবী নিযুক্ত রাখিয়া কার্য্য করান যাইতে পারে। পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন তিন মাস ধরিয়াই ভাল ভাল দণ্ড বাছিয়া ঐ গুলির অগ্রভাগ হইতে অর্দ্ধহাত পরিমাণ করিয়া কলম কাটিয়া কাটিয়া একটা গর্ত্তের মধ্যে সঞ্চিত রাখিয়া, পরে গুড় প্রস্তুত কার্য্য শেষ করিয়া কলম লাগান আরম্ভ করা যাইতে পারে। ক্ষেত্রে জল সেচন করিয়া কলম ও চারা বাঁচাইয়া রাখা অপেক্ষা, একটী গর্ত্তের মধ্যে কলম গুলি জল দিয়া অঙ্কুরিত করাইয়া লইয়া পরে ক্ষেত্রে লাগাইলে অল্প ব্যয়ে কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। কলম গর্ত্তের মধ্যে দুই মাস ধরিয়া রাখিয়া অঙ্কুরিত করিয়া লইতে হইলে সুনিয়মে কার্য্য করা বিধেয়। অর্দ্ধ হাত পরিমাণ কলমগুলিতে যেন তিনটী করিয়া অঙ্কুর বা 'চোক্' থাকে। চক্ষুগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া যে অঙ্কুর বাহির হয়, উহা ইক্ষুখণ্ডে সঞ্চিত রস টানিয়া লইয়া পরিপুষ্ট হয়। এ কারণ গাঁইটগুলির যে পার্শ্বে অঙ্কুর থাকে, সেই পার্শ্বে ইক্ষুখণ্ড যাহাতে অধিক পরিমাণে থাকে, কলম কাটিবার সময় এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। গাঁইটের অপর পার্শ্বের ইক্ষুখণ্ড ('পাব') তৎপরবর্ত্তী অঙ্কুরকে পরিপুষ্ট করে। কলম কাটিবার সময় আগার দিকের পাব্ দীর্ঘ করিয়া এবং গোড়ার দিকের পাব্ খর্ব্ব করিয়া কাটা উচিত। গোড়ার দিকের পাবটী দীর্ঘ রাখাতে কোন লাভ নাই। কেন না ঐ দিকের প্রথম অঙ্কুর গাঁইটের গোড়ার দিক হইতে রস না টানিয়া আগার দিক্ হইতে রস টানিয়া পোষিত হয়। ইক্ষুর কলমের অঙ্কুর সম্বন্ধে আর একটী বিষয় জানা আবশ্যক। যদি চারি পাঁচ হাত পরিমাণ দীর্ঘ একখানি ইক্ষুখণ্ড মৃত্তিকা মধ্যে শায়িত ভাবে রাখিয়া নিয়মিত জল সেচন করিয়া উহা হইতে অঙ্কুর বাহির করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, আগার দিকের অঙ্কুরটী প্রথমে বাহির হইবে, পরে তৎপরবর্ত্তী অঙ্কুরটী বাহির হইবে, এইরূপ ক্রমান্বয়ে সকলের গোড়ার দিকের অঙ্কুরটী সর্ব্বশেষে বাহির হইবে। চারি পাঁচ হাত লম্বা ইক্ষুদণ্ড ৬।৭ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া যদি মৃত্তিকা মধ্যে রাখিয়া উহার অঙ্কুর বাহির করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, প্রত্যেক খণ্ডের আগার দিকের চক্ষুটী প্রথমে প্রস্ফুটিত হইয়া উহা হইতে একই সময়ে গাছ বাহির হইতেছে এবং গোড়ার দিকের চক্ষুটী বা চক্ষু দুইটি ক্রমান্বয়ে পরে পরে বাহির হইতেছে। আগার দিকের চক্ষুগুলি যে অধিক সতেজ এবং গোড়ার দিকের চক্ষুগুলি যে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ ইহা দ্বারা এরূপ প্রমাণিত হইতেছে না। প্রত্যেক 'চোক্' এক একটী 'পাব' সহ ছোট ছোট টিক্‌লি রূপে যদি পৃথক পৃথক বসান যায় তাহা হইলে সকল টিক্‌লি হইতেই একই সময়ে সমান তেজে গাছ বাহির হইবে। যদি প্রত্যেক 'চোক্' বাছিয়া লওয়া যায়, এবং চোকের সম্মুখ দিকের 'পাব্' দীর্ঘ করিয়া কাটিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে কলমে তিনটী চোক্ না রাখিয়া একটী চোক্ রাখিলেই চলিতে পারে। কিন্তু দ্রুত কার্য্য করিতে হইলে, প্রত্যেক চোকটী বাছিয়া লওয়া এবং সতর্কতার সহিত গাঁইটের গোড়ার দিকের 'পাব্' খর্ব্ব করিয়া এবং আগার বা সম্মুখের দিকের 'পাব্' দীর্ঘ করিয়া কাটা, ঘটিয়া উঠিতে না পারে। আবার একই মাত্র অঙ্কুরের উপর নির্ভর করিতে গেলে নানা কারণে ক্ষেত্রের স্থানে স্থানে গাছ না জন্মিতেও পারে। উই আছেন, ইঁদুর আছেন, শশক আছেন, অঙ্কুর কাটা পোকা আছেন; এ সমস্তের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া যদি দুই তিনটী অঙ্কুরের মধ্যে শেষে একটী করিয়া গাছ দাঁড়ায় তাহা

হইলেই যথেষ্ট, এইরূপ ভাবে কলম লাগান উচিত। ইহারই কারণ, তিনটী আন্দাজ চোক্ থাকিয়া যায়, এরূপ ভাবে খণ্ডখণ্ড করিয়া কলম বা টিক্লি কাটা ভাল। যদি অখাদ্য ডগার দিকটা নষ্ট না করিয়া বীজরূপে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে যেন ডগাগুলি ছাড়াইয়া (অর্থাৎ পত্র বিচ্যুত করিয়া) সর্ব্বোপরিস্থ ভাগটী বাদ দিয়া চারিটী চক্ষু আন্দাজ অবশিষ্ট থাকে এরূপে দীর্ঘ করিয়া (অর্থাৎ, একফুট আন্দাজ দীর্ঘ করিয়া) কলম কাটা হয়। খাদ্যাংশ হইতেই বীজ রাখা হউক আর অখাদ্যাংশ হইতেই বীজ রাখা হউক, বীজের কলম গুলি ৫ ফুট লম্বা, ৫ ফুট চওড়া ও ৩ ফুট গভীর একটী গর্ত্তের মধ্যে সাজাইয়া সাজাইয়া রাখিতে হইবে। মোটা আক, বিঘা প্রতি ৩ কাহন ও শরু আক বিঘা প্রতি ৫ কাহন বীজ হইতে প্রস্তত করিতে পারা যায়। যেরূপ গর্ত্তের কথা বলা হইল এরূপ গর্ত্তে ৩।৪ বিঘা জমির কলম সঞ্চিত করিয়া রাখা যাইতে পারে। গর্ত্তের নিম্নে এক স্তর ভিজা খড় বিছাইয়া উহার উপর ছাই ছিটাইয়া দিতে হয়; পরে এক থাক কলম বিছাইয়া দিয়া, উহার উপর ভিজা ছাই ছিটাইয়া, আবার খড় বিছাইয়া আর এক থাক কলম সাজাইয়া, ক্রমশঃ এইরূপে স্তরে স্তরে টিক্লি বা ডগা গুলি বিছাইয়া যাইতে হইবে। গর্ত্ত পূর্ণ হইলে আরও কিছু ক্ষার ও খড় উপরে বিছাইয়া মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত বা হাপর বুজাইয়া দিতে হইবে। মৃত্তিকা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিলে টিক্লি ও ডগাগুলি ৮।১০ দিবসের মধ্যেই অঙ্কুরিত হইয়া যায়। যদি শীঘ্র অঙ্কুর বাহির করিবার আবশ্যক না থাকে তাহা হইলে মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত না করিয়া, টিক্লি বা ডগাগুলি হাপরের মধ্যে রাখিয়া উহার উপর খড় চাপা দিয়া, ঐ খড়ের উপর মধ্যে মধ্যে জল ছিটাইয়া দিতে হইবে। ইক্ষুদণ্ড হইতে অঙ্কুর বাহির করিবার আরও সরল উপায়, বীজের উপযুক্ত গাছ বাছিয়া লইয়া ঐ গুলির মাথা ছাটিয়া দিয়া জমিতেই ঐ গুলি রাখিয়া দেওয়া। সর্ব্বোপরিস্থ অঙ্কুর অর্থাৎ শীর্ষাঙ্কুর (punctum vegitationem) বাদ দেওয়াতে পার্শ্বস্থ অঙ্কুরগুলি সত্বর প্রস্ফুটিত হইতে থাকিবে। পরে প্রস্ফুটিত-অঙ্কুর সহ টিক্লি কাটিয়া জমিতে লাগাইলে অতি শীঘ্র গাছ বাহির হইয়া পড়ে।

১৬। ফাল্গুন মাস পড়িয়া গেলে হাপরের মধ্যে কলম [illegible] রোপন আবশ্যক করে না, একেবারে কলমগুলি গাছ হইতে কাটিয়া কাটিয়া সদ্যঃ জমিতে লাগান চলিতে পারে। কিন্তু এ সময় জমি নিতান্ত নীরস। একারণ 'ভিলি' বা 'জুলি' গুলির মধ্যে জল দিয়া পরে প্রস্ফুটিত অঙ্কুরবিশিষ্ট কলম বসাইতে পারিলে ভাল ফল পাওয়া যায়। কলম শায়িত ভাবে বসাইয়া দিয়া উহার উপর তিন ইঞ্চি পরিমাণ মাটি চাপাইয়া দেওয়া আবশ্যক। হাপরের মধ্যে অঙ্কুর বাহির করিয়া লইয়া যদি টিক্লি বা ডগাগুলি জমিতে লাগাইতে হয় তাহা হইলেও এই নিয়মে ভিলির মধ্যে জল দিয়া কলম বসাইয়া পরে মাটি চাপা দিয়া যাইতে হয়। যদি অগ্রহায়ণ মাসে অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসে কলম লাগান হয়, তাহা হইলে শায়িত ভাবে ঐগুলি না লাগাইয়া হেলাইয়া কিছু অংশ বাহির করিয়া কলম লাগান ভাল। অত্যধিক সিক্ততা প্রযুক্ত অগ্রহায়ণ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে কলম এককালীন মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত থাকিলে পচিয়া যাওয়া সম্ভব। বায়ু নিতান্ত শুষ্ক থাকিবার কারণ মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে কলমের অগ্রভাগ বাহির হইয়া থাকিলে উহা শুষ্ক হইয়া যায়, এবং চোক গুলি অঙ্কুরিত হইবার পূর্ব্বেই সমস্ত কলম শুষ্ক হইয়া যাওয়া সম্ভব। একারণ এই তিন মাসে হাপরজাত করিয়া কলম রাখা এবং শায়িত ভাবে সিক্ত জমির উপর কলম লাগান আবশ্যক। মৃত্তিকা ও বায়ুর অবস্থা সিক্ত থাকিলে কলম হেলাইয়া কিছু বাহির করিয়া রাখিয়া প্রোথিত করাই ভাল। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে কলম লাগান আবশ্যক হইলে কিছু অধিক বাহির করিয়া রাখাই ভাল, নতুবা বর্ষার জল লাগিয়া কলম পচিয়া যাইতে পারে। অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে কলম লাগান আবশ্যক হইলে অন্ততঃ ৬ ইঞ্চি পরিমাণ মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত না থাকিলে ক্রমশঃ অগ্রভাগ শুষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত কলম শুষ্ক হইয়া যায়। মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রে কলম লাগানই ভাল, এবং এ সময়ে শায়িত ভাবে সিক্ত জমির উপর কলম লাগাইয়া সম্পূর্ণ ভাবে তিন ইঞ্চি মৃত্তিকার নিম্নে কলমগুলি প্রোথিত করিলে গাছগুলি সতেজে বহির্গত হয়। মাঘ মাসে টিক্লি কাটা আবশ্যক হইলে ঐ সময়ে শীতাধিক্য বশতঃ টিক্লি জমিতে না বসাইয়া হাপরের মধ্যে গরমে রাখাই ভাল; পরে ফাল্গুন মাসে কলম গুলি হাপর হইতে উঠাইয়া জমিতে লাগান উচিত। ফাল্গুন চৈত্রে কলে

লাগাইতে, হইলে উহাদের চাপরে রাখা আবশ্যক নাই, কিন্তু গাছের মাথাগুলি মাঘ মাসেই ছাটিয়া রাখিলে অনায়াসে অঙ্কুরিত 'চোক'বিশিষ্ট কলম এককালে জমিতে বসান যাইতে পারে। এইরূপে বায়ুর ও মৃত্তিকার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বুঝিয়া অগ্রহায়ণ হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ভিন্ন ভাবে ইক্ষুর কলম লাগান যাইতে পারে, তবে পুনরায় বলা আবশ্যক ফাল্গুন মাসে কলম লাগাইবার যদি সুবিধা হয় তবে অন্য মাসে লাগান বিধেয় নহে। বীজ রোপণের উপযুক্ত সময় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, তবে যদি বীজ-শীর্ষ মাঘ বা ফাল্গুন মাসে বাহির হয়, তবে বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি অপেক্ষা করিতে গেলে বীজের অঙ্কুর উৎপাদিকা-শক্তি হীন হইয়া যায়। একারণ ফাল্গুন ও চৈত্র মাসে বীজ রোপণ করা আবশ্যক হইতে পারে। মৃত্তিকা অনবরত সিক্ত রাখিতে পারিলে ফাল্গুন চৈত্র মাসে বীজ রোপণে কিছু ক্ষতি হয় না। কিন্তু এই সময়ে বীজ রোপণ করিলে তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত নিয়মে বীজের বাক্সের ও চারার গামলার মাটি সর্ব্বদা সিক্ত অবস্থায় রাখিতে হইবে, একথা যেন স্মরণ থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়।

ইক্ষু-চাষের উপযোগী বিশেষ কৃষি-যন্ত্র।

ইক্ষুর আবাদের প্রণালী নানাবিধ। মরীচি দ্বীপে ... বা ৫ ফুট অন্তর এক ফুট গভীর খানা খুঁড়িয়া, ঐ খানায় ৩ ইঞ্চি আল্‌গা মৃত্তিকা ফেলিয়া দিয়া, উহার উপর কলম বসাইয়া, আর ৩ ইঞ্চি আল্‌গা মৃত্তিকা উহার উপর ফেলিয়া দিয়া, পরে জল দিয়া নিড়ান করিয়া, গাছ বাহির হইলে সার দিয়া, দুইবার গাছের গোড়ায় ৩ ইঞ্চি করিয়া মাটি চাপাইয়া দিয়া, জমি সমতল করিয়া দিবার নিয়ম আছে। মরীচি দ্বীপে আর এক নিয়মেও ইক্ষুর আবাদ হয়। ৪।৫ ফুট অন্তর একটী করিয়া নিরবচ্ছিন্ন খানা না খুঁড়িয়া একটা করিয়া গর্ত্ত খনন করিয়া ঐ গর্ত্তগুলির মধ্যে ও কলম লাগানর নিয়ম আছে। খানা ও গর্ত্ত উভয়ই কোদালি দ্বারা খোঁড়া হইয়া থাকে। এরূপ কোদালীর চাষে খরচ অধিক পড়ে। বলদের দ্বারা যে কার্য্য করাইয়া লওয়া যাইতে পারে সে কার্য্য মানুষের দ্বারা করাইতে হইলেই খরচ অধিক পড়িয়া যায়। তবে গর্ত্ত বা খানার মধ্যে কলমগুলি থাকিলে অধিক জল দিবার আবশ্যক করে না, এবং গাছ গুলির ঠিক্ চতুষ্পার্শ্বে আগাছা না জন্মিবার কারণ, খানার বা গর্ত্তের গাছ কিছু অধিক তেজ করে। মরীচি দ্বীপের প্রণালী অবলম্বন দ্বারা আর একটী সুবিধা হয়। গাছের গোড়ার অধিক মৃত্তিকা চাপিয়া থাকার কারণ, গাছগুলি বায়ুবলে সহজে মৃত্তিকাশায়ী হইয়া যায় না। মোটের উপর মরীচি-দ্বীপের প্রণালী অপেক্ষা দেশীয় প্রণালীই ভাল, অর্থাৎ জমিতে অনবরত চাষ দিয়া ভিলি কাটিয়া, ভিলিতে জল দিয়া, কলম লাগান। কিন্তু ভিলি বা জুলি কাটিতেও কোদালির ব্যবহার কিছু আবশ্যক নাই। দ্বিপক্ষ লাঙ্গল (Double mould-board plough) ভিলি কাটিবার জন্য অতি সুন্দর যন্ত্র (১ম চিত্র) এবং গাছের গোড়ায় মাটি দিবার জন্য এবং গাছের
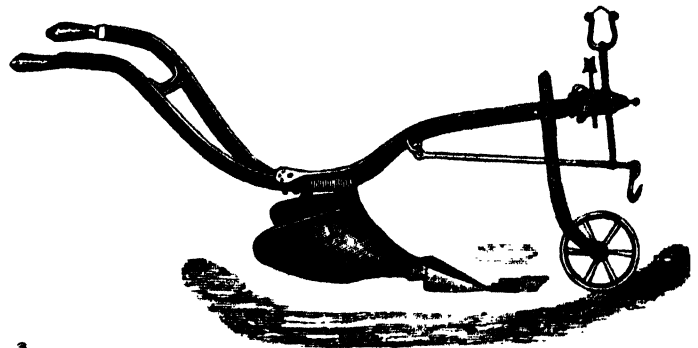
১ম চিত্র। দ্বিপক্ষ লাঙ্গল।

মধ্যের জমি নিড়াইবার ও উস্কাইবার জন্য হাণ্টার হো (২য় চিত্র) অতি সুন্দর যন্ত্র। এই দুইটী যন্ত্রের মূল্য ক্রমান্বয়ে ১৫, ও ৫০, টাকা বটে, কিন্তু এই দুই যন্ত্রের দ্বারা ইক্ষুর আবাদের ব্যয় অনেক লাঘব হইয়া পড়ে। কোদালির
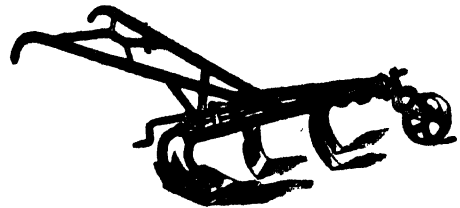
২য় চিত্র। 'হাণ্টার হো'।

দ্বারা ভিলি কাটিতে বিঘা প্রতি ১৷৷০ টাকারও অধিক ব্যয় হয়; কিন্তু দ্বিপক্ষ লাঙ্গল দ্বারা ভিলি করিতে বিঘা প্রতি ৶০ আনাও ব্যয় হয় না। গাছের গোড়ায় কোদালি দ্বারা মাটি উঠাইয়া দেওয়াতেও বিঘা প্রতি ১৷৷০ টাকার কম ব্যয় হয় না, কিন্তু হাণ্টার হো ব্যবহার দ্বারা এই কার্য্য ৶০ আনা ব্যয়ে সমাধা হয়। খুপি দ্বারা নিড়ান করিতে বিঘা প্রতি ২ টাকা খরচ পড়িয়া যায়, হাণ্টার্ হো চালাইয়া দিলে এই কার্য্য ৶০ আনা ব্যয়ে সমাধা হইয়া যায়। এ কারণ মরীচি-দ্বীপের প্রণালী অনুকরণ না করিয়া বরং দ্বি পক্ষ লাঙ্গল ও হাণ্টার্ হো ব্যবহার দ্বারা দেশীয় প্রণালীরই উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে। জমি নিড়ান ও উস্কান কার্য্য আর এক প্রকার বিলাতি (৩য় চিত্র) যন্ত্র দ্বারা অতি সুন্দর হইয়া
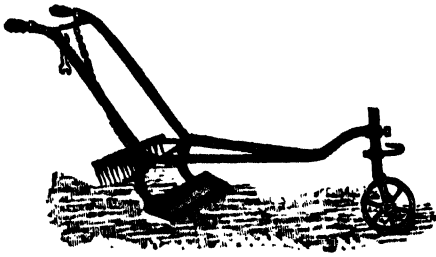
৩য় চিত্র। বিদে খুপি।

থাকে। ইহা খুর্পি ও বিদের কার্য্য যুগপৎ করিয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম 'বিদে-খুর্পি' দেওয়া গেল। ফ্রান্স্ দেশের আঙ্গুর-লতার শ্রেণীর মধ্য দিয়া এই যন্ত্র চালাইবার নিয়ম আছে। এক যোড়া বলদ দ্বারা হাণ্টার-হো এবং বিদে-খুর্পি উভয় যন্ত্রই চালাইতে পারা যায়।

১৮। গাছগুলি যখন এক হাতেরও উচ্চ হইয়া পড়িবে, তখন উহাদের মধ্য দিয়া বলদ সংযুক্ত হাণ্টার হো অথবা বিদে-খুর্পি চালান কিছু দুষ্কর হইয়া পড়ে। দুইবার মাটি চাপাইবার ও দুইবার নিড়াইবার বা মাটি উস্কাইবার পরে, যখন এই দুই যন্ত্র চালান অসুবিধা হইবে, তখনও প্রত্যেক জলসেচনের পরে এক সপ্তাহের মধ্যে একবার করিয়া মাটি উস্কাইতে পারিলে গাছের তেজ বিশেষ বৰ্দ্ধিত হইবে। মাটি উস্কান দ্বারা অনেকটা সার-প্রয়োগের কার্য্য হয়। বায়ু মৃত্তিকা মধ্যে ও শিকড়ের চারিদিকে সহজে খেলিতে পাইলে, মৃত্তিকার মধ্যে ও বায়ুর মধ্যে নিহিত উদ্ভিদ্-খাদ্য সহজে শিকড় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গাছকে সতেজ করে। নিড়ানি বা খুপি বা দাউলি দ্বারা মাটি উস্কাইতে গেলে অনেক খরচ পড়ে। একারণ চক্র-সংযুক্ত হাতে চালাইবার 'হো' (৪র্থ চিত্র) ব্যবহার করা উচিত। ইহা মানুষে

৪র্থ চিত্র। হাতে চালান 'হো'।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঠেলিয়া লইয়া চলিয়া যাইতে পারে। এক জন মানুষ অনায়াসে দুই বিঘা আকের জমি হাতে চালান 'হো' দ্বারা নিড়াইতে বা উস্কাইতে পারে। আগাছা উৎপাটন করা হোর একমাত্র কার্য্য নহে। মাটি উস্কানই ইহার প্রধান কার্য্য। ১০।১২ টাকা ব্যয়ে এই যন্ত্র এদেশে অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে। সম্মুখে ইহার একটী চাকা, তাহার পশ্চাতে একটা ছোট বিদে, আর উপরিভাগে দুইটী হাতল। এদেশে ইহার অনুকরণে 'হো' প্রস্তুত না হইতে পারে, এ যন্ত্রে এমন কিছুই গঠন-চাতুর্য্য নাই। (ক্রমশঃ)

হিন্দু, গ্রীক ও রোমান।

বিধাতার কৌশলময় হস্তে রচিত হইয়া মাতা বসুন্ধরা যখন শ্যামায়মানা, ফলপুষ্পশোভিতা, ধনরত্ন-পরিপূর্ণা, মনোজ্ঞা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, তখন সৃষ্টির কনিষ্ঠ শিশু মানব ভূমিষ্ঠ হইল। কিন্তু ইহা কতদিনের কথা, কেহ বলিতে পারে না।

মানবের আদি লীলাভূমি কোথায়? এক এক জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র এ প্রশ্নের এক এক প্রকার উত্তর দিয়াছে। বর্ত্তমান কালের সূক্ষ্ম গবেষণা ও উন্নত বিচার-প্রণালী সে সকল উত্তর সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। অথচ তৎপরিবর্ত্তে এই দুরূহ সমস্যা এমন কোনও মীমাংসায় উপনীত হয় নাই, যাহা সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে পণ্ডিতসমাজে গৃহীত হইয়াছে। তথাপি জটিল তর্কব্যূহের বাহিরে

থাকিয়া এক প্রকার অসংশয়িত রূপে বলা যাইতে পারে, জগতের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতা, শিল্প ও বাণিজ্য, কলা ও সাহিত্য, যে সমুদয় জাতি হইতে জন্ম ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে, তাহাদের আদি জননী এশিয়া ভূমি।

প্রাচীন কালে যে সকল বীর্য্যৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন জাতি ইতিহাসে শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, এবং অধুনা যাঁহারা সাগরমেখলা ধরিত্রীকে কর্ষণ, পালন ও শাসন করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই তুরানীয়, সেমেটিক বা আর্য্যবংশসম্ভূত। অপর বংশীয় কোনও জাতি আজ পর্য্যন্ত বর্ব্বর অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে নাই। কেবল আজটেক ও পেরুবীয়েরা অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা জগৎকে কোন অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া যায় নাই।

স্মরণাতীত কালে তুরানীয়বংশীয় লোকেরা উত্তর ও মধ্য এশিয়ায় যাযাবর জীবন যাপন করিত। সেই সুদূর সময়ের কোনও প্রকৃত তথ্য নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া দুঃসাধ্য। পুরাতত্ত্বের অস্ফুট আলোক যখন কালের নিবিড় অন্ধকার ঈষৎ ভেদ করিতে সমর্থ হইল, তখন তুরানীয়েরা টাইগ্রিস ও ইয়ুফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছে, এবং তাহারা জ্যোতিষের প্রাথমিক সূত্র ও গার্হস্থ্য জীবনের প্রয়োজনীয় শিল্প সকল আবিষ্কার করিয়াছে। খৃষ্টীয় সালের ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তুরানীয় কালডিয়া সুসভ্য জীবনের প্রথম স্তর প্রস্তুত করে। কালডিয়া দীর্ঘকাল আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিতে না পারিলেও সেমেটিক ও আর্য্যজাতির জ্যেষ্ঠসহোদর ও পথপ্রদর্শকরূপে যে গৌরব লাভ করিয়াছে, তাহা চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

তুরানীয়েরা বড় স্থিতিশীল ছিল। তাহারা যে সকল প্রয়োজনীয় সত্য আবিষ্কার করিয়া সভ্যজাতিমাত্রকেই চির ঋণী করিয়াছে, নিজেরা তাহার বিকাশ ও স্ফূর্ত্তি সাধন করিতে পারে নাই। ইহাদের চরিত্রের এই গুরুতর ত্রুটি আট সহস্র বৎসরেও দূর হয় নাই। তুর্কী ও চীনদিগের একান্ত পুরাতনপ্রিয়তা ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

এই স্থিতিশীলতা ও সঙ্কীর্ণতার ফলে তুরানীয়েরা সর্ব্বত্র সেমেটিক জাতিদ্বারা পরাজিত ও তাড়িত হইতে লাগিল। মানবজাতির মধ্যে সেমেটিকবংশীয়েরা প্রথমে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে উপনীত হয়। ইহুদী, খৃষ্টীয় ও মুসলমান এই তিন একেশ্বরবাদী ধর্ম্ম এই জাতির মধ্যে অভ্যুদিত হইয়াছে। মানবের শিরোভূষণ মহর্ষি ঈশা এবং বিশ্বাসিশ্রেষ্ঠ মহম্মদ এই জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়া ইহাদের ধরাতলে আগমন সার্থক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাণিজ্য ও অর্থব্যবহারেও সেমেটিকদিগের তীক্ষ্ণ প্রতিভা দৃষ্ট হয়। ফিনীশিয় ও ইহুদীদিগের নামোচ্চারণ মাত্রেই এই সত্য প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবে।

কিন্তু সেমেটিকগণ মস্তিষ্কের পরিচালনায় কনিষ্ঠ সহোদর আর্য্যগণের নিকট চিরকাল পরাজয় স্বীকার করিয়াছে। জীবনসংগ্রামে আর্য্য জাতির প্রথমাগমনাবধি সেমেটিকদিগের সহিত সংঘর্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, এবং প্রতিস্থলেই তিল তিল করিয়া সেমেটিক জাতি হীনবল, বিনষ্ট বা নির্ব্বাসিত হইয়াছে। এশিয়া, ইয়ুরোপ, বা আফ্রিকা, কোথায়ও এই নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এই কৌতূহলোদ্দীপক ও বহুবিস্তৃত বিষয় অত্যকার প্রবন্ধের অঙ্গীভূত নহে। বারান্তরে সুযোগানুরূপ ইহার অবতারণা করিবার ইচ্ছা রহিল।

আর্য্যবংশীয়দিগের মধ্যে হিন্দু, পারসীক, গ্রীক ও রোমান প্রাচীনকালে জগদ্ব্যাপিনী প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তন্মধ্যে পারসীকদিগের প্রভাব মুসলমানবিজয়ে প্রনষ্টপ্রায় হওয়াতে আপাততঃ তাঁহাদিগকে গণনার বাহিরে রাখিয়া অপর তিন জাতির বিশেষ শক্তি ও বিধিনির্দ্দিষ্ট কার্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

এই তিন জাতির মধ্যে হিন্দুগণ প্রাচীনতম। গ্রীকগণ যখন প্রথম ইতিহাসে প্রবেশ লাভ করেন, তখন ভারতের বৈদিকযুগ অতিক্রান্ত হইয়া বীরযুগ বা কুরুপাণ্ডবদিগের সময় আরম্ভ হইয়াছে। গ্রীক সাহিত্যের আদি গ্রন্থ ইলিয়ড রচনার বহুপূর্ব্বে ঋগ্বেদ, উপনিষদ ও সাংখ্যদর্শন রচিত হয়। ইলিয়ড-বর্ণিত গ্রীকগণ সভ্যতার প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন; হিন্দুগণ তখন প্রকৃতি-পূজা পরিত্যাগ করিয়া গভীর আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত। বস্তুতঃ উভয় জাতির জীবনবিকাশে অন্ততঃ এক সহস্র বৎসরের ব্যবধান অনায়াসেই স্বীকার করা যাইতে পারে।

হিন্দু প্রাধান্যসময়ে ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের মধ্যে

রাষ্ট্রীয় যোগ (federation) ছিল না। কচিৎ কোনও নৃপতি স্বীয় পরাক্রমে প্রতিবেশী রাজন্যবর্গকে জয় করিয়া রাজচক্রবর্ত্তী, মণ্ডলেশ্বর, প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতেন; কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য। হিন্দুগণ কখনও রোমানদিগের ন্যায় দীর্ঘকালস্থায়ী, বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করেন নাই। তাঁহাদের রাজনৈতিক জীবন ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ ছিল। এজন্য এদেশে বহুব্যাপিনী রাষ্ট্রীয় নীতি বিকশিত হইবার অবসর পায় নাই।

তৎপর সেকালে ধর্ম্মাধিকরণ নিতান্ত একদেশদর্শী ছিল। একই অপরাধে বর্ণভেদে দণ্ডভেদের ব্যবস্থা থাকাতে সাধারণ প্রজামণ্ডলী দিন দিন নিব্বীর্য্য হইয়া পড়ে। জাতীয় জীবনের একটী স্বতঃসিদ্ধ সত্য এই যে সাধারণ প্রজাগণ নিরুদ্যম ও অধঃপতিত হইলে তাহাদিগের প্রভুরাও দুর্গতির সোপানে অবতরণ করিতে আরম্ভ করে। অপ্রতিহত ক্ষমতাপরিচালনার ফল কেবল অধীন জনের পক্ষেই বিষময় নয়, যিনি সেরূপ ক্ষমতার অধিকারী, তাঁহার বিনাশও নিশ্চিত ও নিকটবর্ত্তী। সুপ্রসিদ্ধ টীয়র বলেন এই কারণেই নেপোলিয়নের পতন হইয়াছিল। হিন্দু রাজাদিগের ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল, তাহার নিয়ামকস্বরূপ কোনও রাষ্ট্রীয় বিধান (constitutional measures) ছিল না। ফলে তাঁহাদেরও অপকার হইয়াছে, প্রজাবর্গের মধ্যেও রাজনৈতিক জীবন (political life) স্ফূর্ত্তিলাভ করে নাই।

বাগ্মীবিদ্যা (oratory) এবং ইতিহাস রাজনৈতিক জীবনের অনুসরণ করে। সুতরাং বলিবার অপেক্ষা করে না যে এদেশে এই দুইটীরই পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়। আমাদের আর্য্যভট্ট ও বরাহমিহির, ব্যাস ও শঙ্কর, কালিদাস ও ভবভূতি আছেন; কিন্তু ডিমস্থেনিস বা সিসিরো, থুসিডিডিস বা লিভি, হিরডটস বা টাসিটস কোথায়?

মনোমোহিনী সৌন্দর্য্যরচনা লোকোত্তর প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব। যে পরাধীন, পদদলিত, অশ্রদ্ধেয়, তাহার পক্ষে সেরূপ প্রতিভা লাভের আশা, আর অন্ধের চন্দ্রদর্শনের আকাঙ্ক্ষা সমান। ব্রাহ্মণগণ যত দিন স্বাধীন ছিলেন, যেদিকে আপনাদিগের অপরাজেয় প্রতিভা নিয়োগ করিয়াছেন, বিজয়লক্ষ্মী সাদরে বরমাল্য প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের অমল মানসিকশক্তির গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন কি? তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ব্যাকরণের যে সকল জটীল প্রশ্ন তাঁহারা পল্লবিতরূপে আলোচনা পূর্ব্বক মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন, ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট অল্পদিন পূর্ব্বেও সেগুলি প্রহেলিকাময় বলিয়া বোধ হইত। গ্রীক দর্শনের বহু পূর্ব্বে এদেশে ষড়্দর্শন বিরচিত হয়, একথা বলিলে এখন আর অর্ব্বাচীন, অতিসাহসিক প্রভৃতি সুমিষ্ট আখ্যায় অভিনন্দিত হইবার আশঙ্কা নাই। আর বোধ হয়, নিতান্ত স্বজাতিপ্রেমিক না হইয়াও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, ভারতীয় আর্য্যগণ কাব্যে যে সৌন্দর্য্য অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা হোমর, বর্জ্জিল ও সেক্ষপীরের অমর আলেখ্যের পার্শ্বে সসম্মানে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু সৌন্দর্য্য যেমন কাব্য ও সঙ্গীত রূপে শব্দসাহায্যে আত্মার তৃপ্তি সাধন করে, তেমনি চিত্র-স্থপতি-ভাস্করবিদ্যার স্ফুরণে নয়নাভিরাম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মানবের অপূর্ব্ব রচনা-কৌশলের পরিচয় প্রদান করে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, জাতি-ভেদের সৃষ্টি হওয়া অবধি চিত্র-স্থপতি-ভাস্করকার্য্য ঘৃণিত সঙ্কর-বর্ণ-সকলের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল; সুতরাং অবজ্ঞাত ব্যবসায়ের যত দূর উন্নতি সম্ভব, ঐ সকল বিদ্যার তদতিরিক্ত কিছুই হইতে পারিল না। ফিডিয়স্, জিউকিসস্ বা পর-হসিয়স স্বাধীন, জ্ঞাননিরত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বংশেই জন্ম-গ্রহণ করিতে পারিত; অজ্ঞান, বেদবিহীন, নিপীড়িত অম্বষ্ঠ-বৈদেহ মাগধের মধ্যে সে সম্ভাবনা কিছুমাত্র ছিল না।

প্রাচীনকালে আর্য্যজাতি জ্যোতিষ গণিত প্রভৃতি যে সকল শাস্ত্রে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, ভারতবর্ষে সে সমুদয়ের প্রাথমিক চর্চ্চা আরম্ভ হয়। কিন্তু হিন্দুগণ এই সকল প্রয়োজনীয় জ্ঞানের মূলসূত্র গুলি উদ্ভাবন করিয়াই উহাদের বৃদ্ধি ও পরিপোষণের ভার গ্রীকদিগের হস্তে ন্যস্ত করেন। গণিতের গভীর সত্যোদ্ধার পক্ষে তাঁহাদের প্রতিভা অনুপ-যোগিনী ছিল না; কিন্তু তাঁহারা দৃষ্ট অপেক্ষা অদৃষ্টেরই অধিক সমাদর করিতেন। এই অস্থির, চিরপ্রবহমান জগৎ-প্রান্তের অন্তরালে কোনও স্থির, অবিনশ্বর ভূমি আছে কিনা, এই মহা প্রশ্ন তাঁহাদের চিত্তকে এত দূর আলোড়িত করিয়াছিল, যে নিবিষ্টচিত্তে শ্রীসম্পদদায়িনী অপরাবিদ্যা-নুশীলনের অবসর তাঁহাদের মোটেই হয় নাই।

বস্তুতঃ হিন্দুজাতির ধর্ম্মপ্রাণতা জগতে এক দুর্লভ বস্তু।

আর্য্যবংশীয় অপরাপর জাতি ঐহিক সুখসম্পদে হিন্দুদিগকে অতিক্রম করিয়াছে; এক্ষণে আসমুদ্রক্ষিতীশ্বর আর্য্য ইয়ুরোপীয়েরা ঐশ্বর্য্য-মদান্ধ হইয়া সর্ব্বত্র তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু এই বহুজন-সমন্বিত জাতি-সকলের মধ্যে একজনকেও মুক্তির কোমল,জীবনপ্রদ সংবাদ লইয়া আসিতে দেখিলাম না। পূতসলিলা ভাগীরথী কত মৃত্যুঞ্জয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের পুণ্যকীর্ত্তি দর্শন করিয়াছে; কিন্তু আটিকায় বা টাইবারতীরে আজ পর্য্যন্ত কেহ ভক্তিতত্ত্বের সুমধুর ব্যাখ্যা শ্রবণ করে নাই। শাক্যসিংহ বা চৈতন্যদেব এখনও একাকী, গ্রীস অথবা রোমে, তাঁহাদের চরণরেণু স্পর্শ করিতে পারে, এমন কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিনা, সন্দেহ।

গ্রীক ও রোমানদিগের কাব্য, ইতিহাস, দর্শন আছে; কিন্তু বেদ, উপনিষদ, গীতা কোথায়? ইলিয়ড গ্রীকদিগের বেদ; কিন্তু হিন্দুজাতি কি শুধু রামায়ণ লইয়া তুষ্ট থাকিতে পারিত? আমাদের যদি উপনিষদ না থাকিত, গীতা না থাকিত, ভাগবত না থাকিত, আমরা আপনাদিগকে কত দরিদ্র মনে করিতাম। যে উপনিষদকে শপেনহৌর-প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ জগতে অতুলনীয় বলিয়াছেন, তাহার অভাব কল্পনাও করিতে পারি না। সেই প্রগাঢ় ব্রহ্মবিজ্ঞান, যাহা ঈশার ব্রহ্মবিজ্ঞানকেও ছায়ায় ফেলিয়াছে, সেই গভীর অধ্যাত্মতত্ত্বব্যাখ্যা, যাহা ঈশ্বরকে হস্তস্থিত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ করাইয়া দিতেছে, সেই অনন্তাভিগামিনী তৃষ্ণা, যাহার প্রভাবে মৈত্রেয়ী স্বামীকে বলিতেছেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্"—ঋষি গাইতেছেন, "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি"—এমন আর আছে কি? বুঝি জগতের সমুদয় কাব্য বিনিময় করিলেও উপনিষদের মূল্য হয় না।

একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। গ্রীসের সর্ব্বপ্রধান পুরুষ, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস বৃদ্ধবয়সে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। শত্রুগণ বলিতেছে, সর্ব্ব-জন-পূজিত দেবতাসমূহে তাঁহার ভক্তি নাই; তিনি এক নূতন দেবতার সৃষ্টি করিয়া যুবকদিগকে কুপথগামী করিতেছেন। বিচারকদিগকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড হইতে ত্রাণ পাইবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি কাহারও প্রসন্নতা উপার্জ্জন করিবার জন্য অণুমাত্রও ব্যাকুল নহেন। চিরজীবন জ্ঞানের আলোচনা করিয়া তিনি হৃদয়কে সুদৃঢ় বর্ম্মে বাঁধিয়াছেন। তাঁহার নিকট জ্ঞান বিশ্বাসের নামান্তর মাত্র। যে নির্দ্দোষ সে ইহপরলোকে কাহাকে ভয় করিবে? জ্ঞানীর নিকট মৃত্যুর বিভীষিকাই বা কোথায়? তিনি অপরাজিতচিত্তে দণ্ড শ্রবণ করিয়া বিচারকদিগকে বলিতে লাগিলেন—"আমার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত-প্রায় হইয়াছে; মৃত্যু সদয় হইয়া কবে আমাকে গ্রহণ করিবে, আমি তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। মৃত্যু কি? মৃত্যুতে কি জীবনধারা চিরদিনের জন্য প্রতিরুদ্ধ হইবে? যদি তাহাই হয়, তবে, এস, হে মহাকাল, আমি তোমায় বক্ষে ধারণ করি! এস, চিরবাঞ্ছিত, আমি তোমাকে পাইয়া ইহজীবনের সকল দুঃখক্লেশের অবসান করি, তোমার সুশীতল স্পর্শে আমার সমুদয় জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইবে, নির্ম্মম মানুষের বিচারহীন কঠোর ব্যবহারে আর আমায় কাঁদিতে হইবে না। অথবা মরণের পরপারে এক আনন্দময় লোকে আত্মা আবার নূতন জীবন লাভ করিবে? তবে ইহা অপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? যে লোকে মানুষ মানুষকে বঞ্চন করে না, ধর্ম্মাধীন হইলে প্রাণ দিতে হয় না, যে লোকে আকিলিস, ইয়ুলিসিস, হোমর, অর্ফিয়স নিত্য উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন, সেই অমৃতধামে দেবাত্মা মহাপুরুষদিগের পীযূষপূরিত সঙ্গলাভের জন্য, এমন কি আছে, যাহা না দিতে পারি? প্রাণ তো তুচ্ছ কথা।"

জ্ঞানবৃদ্ধ সক্রেটিস জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াও পরলোক সম্বন্ধে সন্দিহান। সক্রেটিস ধার্ম্মিক, কিন্তু বহুদেববাদী; দেহের অবসান হইলে আত্মা থাকিবে কি না, এ প্রশ্ন তাঁহার নিকট এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে। আর দেখুন, ভারতের ঋষি কেমন সরল অথচ অবিকম্পিত কণ্ঠে বলিতেছেন—

> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
> আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
> তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি
> নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

> জানিয়াছি আমি এই পুরুষ মহান্,
> আদিত্যবরণ, দূর অন্ধকার পারে;
> না রহে মরণ, যদি হয় তাঁর জ্ঞান,
> নাহি আর অন্য পন্থা [illegible]

নচিকেতা বালক; কিন্তু মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া গুরু-গম্ভীর স্বরে বলিতেছেন —

স্বর্গে লোকে ন ভয়ঙ্কিঞ্চনাস্তি
ন তত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি।
উভে তীর্ত্বাঽশনয়া পিপাসে
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে।

নাহি স্বর্গলোকে কিছু মাত্র ভয়,
জরা মৃত্যু তথা কখনো না রয়;
ক্ষুধা তৃষ্ণা জিনি', শোকাতীত জন,
স্বর্গলোকে সদা করেন রমণ।

ফল কথা এই, ধর্ম্মবিষয়ে গ্রীকদিগের ন্যূনতা স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহারা স্বয়ং নির্ম্মল, কুসংস্কারবিহীন একেশ্বরবাদ কখনও লাভকরেন নাই। এজন্য খৃষ্টধর্ম্মগ্রহণে তাঁহাদের অধিক বিলম্ব হয় নাই; কিন্তু তখন তাঁহারা পতিত, পরাধীন, পরভোগোপজীবী।

গ্রীস আয়তনে অতি ক্ষুদ্র; ইহারই মধ্যে কতকগুলি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই সকল সামান্য রাজ্য অনেক সময়ে পরস্পর অকারণ যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকিত। এজন্য ইহাদের ভাগ্যে বিস্তৃত সাম্রাজ্যলাভ কখনও ঘটিয়া উঠে নাই। একবার মাত্র এথেনীয়েরা সমৃদ্ধিশালী রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের হঠকারিতায় সিরাকিউজের নৌযুদ্ধে এথেন্সের প্রতাপ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। সেকেন্দর শাহার দিগ্বিজয় ও সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠা গ্রীসের গৌরব কি অধঃপতন ঘোষণা করিতেছে, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে এখনও মতভেদ আছে। আমরা ডিমস্থেনিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে গ্রীসের স্বাধীনতা-ধ্বংসকারিরূপে চিহ্নিত করিতেছি। অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই, ক্ষুদ্রায়তন—গ্রীস অর্থাৎ এথেন্স, স্পার্টা ও থীব্‌স্—দোর্দ্দণ্ড রাজশক্তির অভাববশতঃ সাক্ষাৎ ভাবে বৈদেশিক জাতি সমূহের ভাগ্যচক্র পরাবর্ত্তিত করিতে পারে নাই।

সাক্ষাৎভাবে পারে নাই সত্য, কিন্তু পরোক্ষভাবে গ্রীসের প্রভাব ইয়ুরোপীয়দিগের উপর এখনও কার্য্য করিতেছে।

'গ্রীস' এই নাম উচ্চারণ করিলেই অন্তরে একটী সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন, সুললিত সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি প্রতিভাসিত হইয়া উঠে। সে কেমন দেশ, যাহার সকলি সুন্দর, মনোমোহন, প্রাণোন্মাদকারী? ঐ যে লোকগুলি—কেমন সুগৌর, সুগঠন, প্রকৃতির বরপুত্র; 'ব্যূঢোরস্কোঃবৃষস্কন্ধঃ-শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ' কাব্যে পড়িয়াছি বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে এমন লাবণ্যচ্ছটা আর কোনও দেশে কেহ দেখিয়াছে কি? বিধাতা উহাদিগকে কি এক উপাদানে গড়িয়াছিলেন, উহারা যাহাতে হাত দিত, তাহাতেই সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিত। মনে হয়, মানবকে সৌন্দর্য্যরচনাকৌশল শিক্ষা দিবার জন্যই গ্রীকেরা ধরাতলে আগমন করিয়াছিল।

ছদ্মবেশধারী হর, যোগনিরতা পার্ব্বতীর ঐকান্তিকতা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং"; গ্রীকগণ এই তত্ত্বটী আমাদের অপেক্ষাও ভাল বুঝিয়াছিলেন। *সুস্থদেহে সুস্থমন* (mens sana in corpore sano) তাঁহাদের মূল মন্ত্র ছিল। দেহের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁহাদের এরূপ প্রখর দৃষ্টি ছিল যে একসময়ে গ্রীসে পঙ্গু, কদাকার, অকর্ম্মণ্য শিশুদিগকে নির্দ্দয়ভাবে হত্যা করা হইত। কালে এই ঘৃণিত প্রথা উঠিয়া গেল; কিন্তু সে দেশে বরাবর শিক্ষার এমন ব্যবস্থা দেখা যায় যাহাতে সহজে শরীর ও আত্মার সমঞ্জসীভূত বিকাশ হইতে পারে।

গ্রীকগণ বলিতেছেন, সর্ব্বপ্রকার কদর্য্যতা পরিহার কর, চিন্তা, বাক্যে, কার্য্যে কুৎসিৎকে বর্জ্জন কর। যদি সুন্দর হইতে না পারিলে, তোমার বাঁচিয়া থাকা বৃথা।

গ্রীক সাহিত্যের বিষয় আলোচনা করিলে কি দেখিতে পাই? কি গদ্যে, কি পদ্যে কোথাও উচ্ছৃঙ্খলতা নাই; সমস্ত শৃঙ্খলিত, নিয়মিত, মার্জ্জিত, প্রণালীবদ্ধ। বিষয়ভেদে রচনাচাতুর্য্যের প্রভেদ অবশ্যই হইবে; কিন্তু তথাপি কাদম্বরী বা দশকুমারের সহিত জেনফন বা হিরডটসের তুলনা করিলে মনে হইবে, বহুমূল্যপরিচ্ছদপরিহিত, অঙ্গরাগশোভিত, রুগ্ন অভিনেতা, ও সবল, সুগঠন পার্ব্বত্য যুবকের মধ্যে যে প্রভেদ, সংস্কৃত ও গ্রীক গদ্যের প্রভেদ প্রায় সেইরূপ। অথবা একই ক্ষেত্রে বিচার করি। শঙ্কর বেদান্ত প্রভৃতির ভাষ্য লিখিয়া অক্ষয় যশঃ উপার্জ্জন করিয়াছেন; প্লেটোও সক্রেটিসের উপদেশ অবলম্বন করিয়া এক নূতন দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের ভাষা কত বিভিন্ন! শঙ্করের ভাষা "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ" এই বাক্যের সার্থ-

কতা প্রতিপন্ন করিতেছে। তিনি বিষয়গৌরবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, কিন্তু মনোহারী হইবার জন্য কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই। আর প্লেটো যেমন অপূর্ব্ব দর্শন রচনা করিয়াছেন, তেমনি ভাষাটীকে আবেগময়ী, মর্ম্মস্পর্শিনী, লালিত্যপূর্ণা, মনোবিজ্ঞানে অতুলনীয়া করিয়া তুলিয়াছেন। কত শতাব্দী অতীত হইল প্লেটো স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কবিত্বময়ী ভাষায় আর সুখপাঠ্য দর্শনশাস্ত্র রচিত হইল না।

দর্শনের কথা যখন উঠিল, তখন এ বিষয়ে সংক্ষেপে আর দুই একটী কথা বলা উচিত। গ্রীক দর্শনকে ইউরোপীয় মনোবিজ্ঞানের জনকরূপে নির্দ্দেশ করিলে অসঙ্গত হয় না। বেকনের সময় পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য দেশসমূহে অরিষ্টটলের একাধিপত্য ছিল; এখনও ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী প্লেটো ও অরিষ্টটলকে ভক্তির সহিত অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তাঁহারা গ্রীক দর্শনের এত দূর পক্ষপাতী, যে অনেকে ভারতবর্ষে মৌলিক দর্শনের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা প্রশ্ন করেন, গ্রীকদিগের নিকট হইতে ধার না করিয়া আপনারা স্বয়ং কিছু উদ্ভাবন করিয়াছে, এমন জাতিও কি এ সংসারে আছে? আমরা ইঁহাদিগের অন্ধতা দেখিয়া আমোদ বোধ করি; কিন্তু আমাদিগকেও স্বীকার করিতে হয়, গ্রীক জ্ঞান ও সভ্যতার প্রভাব বড় আশ্চর্য্য ছিল। গ্রীক ভাষায় নূতন বাইবেলের রচনা ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত।

এক জন কবি বলিতেছেন—

"——পরাজিত গ্রীস,
বর্ব্বর বিজেতাগণে করিয়াছে জয়,
কাড়িয়া লয়েছে শিল্প,সাহিত্য, বিজ্ঞান।"

বস্তুতঃ আর কোনও জাতি গ্রীকদিগের ন্যায় পরাজিত, পরাধীন হইয়াও জেতাকে এমন করিয়া জয় করিতে পারে নাই। গ্রীসের সংস্পর্শে আসিয়া রোমানেরা নবজীবন লাভ করিল। পরাজিত জাতির সভ্যতা, সাহিত্য, ধর্ম্মবিজ্ঞান, আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া তাহারা নূতন বেশে নূতন উদ্দেশ্যসাধনের মানসে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিল। গ্রীস হইতে রোমে, রোম হইতে সমগ্র ইউরোপে উন্নত জ্ঞান, মহান্ আদর্শ, অভিনব চিন্তাপ্রণালী পরিব্যাপ্ত হইল। এই সে দিনও পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কীরা কনষ্টাণ্টিনোপল জয় করিলে যখন দলে দলে গ্রীকগণ ইটালীতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল, তখন তাহাদের আগমনে ইউরোপে জ্ঞানের পুনর্জ্জন্ম হইল; ইটালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড বাগ্‌দেবীর বীণাঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া উঠিল। পতিত, মৃতকল্প মানুষের স্পর্শেই যদি এমন হয়, তবে জীবন্ত জাতিটা না জানি কেমন শক্তিশালী ছিল!

গ্রীক প্রকৃতি বড় বৈচিত্র্যময়ী (versatile)। তাহা না হইলে কি তাহারা হিন্দুদিগের নিকট জ্যোতিষ শিখিয়া আবার উত্তরকালে ভারতে গুরুরূপে উপস্থিত হইতে পারিত? তাহা না হইলে কি তাহারা রোমে যাইয়া বিজেতা রোমকদিগকে আস্তে আস্তে উপজীবিকার ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিতে পারিত? বড় ক্ষোভে বিদ্রূপবজ্রধর যুবেনল অন্তর্ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতেছেন—

"এই কি সে রোম? – এ তো গ্রীক নগরী!
যে দিকে ফিরাই আঁখি, গ্রীক বই নাহি দেখি,
এ বিষম জ্বালা, বল, কিসে পাসরি?
ব্যাকরণ, অলঙ্কার, আছে কণ্ঠে চমৎকার—
বুভুক্ষু গ্রীকের কিছু অবিদিত নাই;
অধ্যাপক, চিত্রকর, ঋষি, বৈদ্য, কলাধর,
দৈবজ্ঞ, নর্ত্তক, নট, সকলি গোসাঁই।"

মনস্বিতায় কোনও জাতিই গ্রীকদিগকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। কাব্যে হোমর, বিয়োগান্ত নাটকে এস্কাইলস, বিদ্রূপাত্মক নাট্যে অরিষ্টফেনিস, ইতিহাসে থুসিডিডিস, বাগ্মিতায় ডিমস্থেনিস, দর্শনে প্লেটো ও অরিষ্টটল, মৌলিকতায় সক্রেটিস, কোন্ জাতি না ইঁহাদিগকে পাইলে শ্লাঘা অনুভব করিত?

তথাপি এমত বলিতে পারি না যে ইঁহাদিগের শুভ্র জয়শ্রী অম্লান হইলেও তৎপার্শ্বে পরবর্ত্তী অপর সকলের গৌরবপ্রভাই ছায়াময়ী বোধ হইতেছে। তবে, এক বিষয়ে গ্রীকগণ এখনও তুলনারহিত। চিত্রতুলিকার সাহায্যে, অথবা ধাতু-প্রস্তর-সহযোগে তাঁহারা যে সৌন্দর্য্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, কোনও সুনিপুণ শিল্পী আজ পর্য্যন্ত তাহার কমনীয়তা বৃদ্ধি করিতে পারে নাই। [illegible]

জিয়সের সুবর্ণময়ী মূর্ত্তি, জিউকিসসের চিত্রাবলী, পূর্ব্বাপর সমান বিস্ময়োৎপাদন করিয়া আসিতেছে।

রোমকগণ হিন্দুদিগের উদ্ভাবনী শক্তি ও পরমার্থপরতা, এবং গ্রীকদিগের সৌন্দর্য্যবোধ ও ভাববৈচিত্র্য প্রাপ্ত হয় নাই। তাহারা গম্ভীরপ্রকৃতি, আয়ম্ভরী, কিঞ্চিৎ স্থূলবুদ্ধি ছিল। কার্য্যকরী শক্তি প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াও এই জাতি মৌলিকতাতে এত দরিদ্র ছিল যে, বলিতে সঙ্কোচ কি, রোম আজ পর্য্যন্ত কালগর্ভে নিহিত থাকিলেও আর্য্যগণের ধর্ম্ম, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইত না।

কথিত আছে, রমূলস রোমের প্রতিষ্ঠা করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ হইতে যত দুশ্চরিত্র, দুষ্কর্ম্মান্বিত লোকদিগকে অধিবাসী হইবার জন্য আহ্বান করেন। একথা সত্য কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু দেখিতে পাই, রোমকগণ আধ্যাত্মিকতায় চিরকাল হীন। বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের তো কথাই নাই, কুসংস্কার-বর্জ্জিত, নীতিপরায়ণ জীবনও তাহাদিগের মধ্যে বিরল। ঐহিক সুখসম্পদ রোমকদিগের চরম লক্ষ্য ছিল। তাহাদিগের পারলৌকিক দৃষ্টি এত স্থূল ছিল যে রোমের কত বিখ্যাত পুরুষ অকাতরে আত্মহত্যা করিয়াছেন। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের চিন্তা রোমানদিগের মনে স্থানই পাইত না; পাইলে তাহা, হয় দর্শন, নতুবা ধর্ম্মগ্রন্থের আকারে প্রকাশ পাইত। রোমের দর্শন তো নাইই; সমগ্র রোমক সাহিত্যে ধর্ম্মজীবন গঠনের অনুকূল একখানি পুস্তকও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

গ্রীকদিগের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে রোমক সাহিত্য অতি দীন, প্রাণহীন ছিল। গ্রীক সাহিত্য ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া রোমক সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইল; তদবধি রোমানগণ দ্রুতগতিতে জ্ঞান ও সভ্যতার পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। লিভি, সিসিরো, স্যালাষ্ট প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থলেখক, লুক্রেশিয়স্, বর্জ্জিল, হরেস্, প্রভৃতি কবি, প্লটাস ও টেরেন্সের ন্যায় নাট্যকার, প্রাণপ্রদ গ্রীক প্রভাবের ফল। বর্জ্জিল ও সিসিরো সাহিত্যজগতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রোমকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। কিন্তু ঈনিড হোমরের অনুকরণে পূর্ণ; আর সিসিরো বাগ্মিতায় অনতিক্রম্য হইলেও তাঁহার দর্শনগ্রন্থ গ্রীক দর্শনের অনুবাদ মাত্র। এক বাক্কাব্য ভিন্ন অন্যত্র রোমকগণ এক বিন্দু মৌলিকতা দেখাইতে পারে নাই।

গণিত ও বিজ্ঞানের অনেক সত্য ভারতবর্ষ ও গ্রীসে আবিষ্কৃত হইয়াছে; রোম কোন্ তত্ত্ব উদ্ধার করিয়া আর্য্যজাতিকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছে? অথবা সৌন্দর্য্যের কোন্ নূতন মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া ভাবুকের চিত্তহরণ করিয়াছে?

তবে রোম কি মানবজাতিকে কিছুই দিয়া যায় নাই? রোম যাহা দিয়াছে, তাহার মূল্য নাই।

অরিষ্টটল বলিয়াছেন, "মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক জীব।" ঠিক কথা; মানুষের যেমন ধর্ম্ম ও সৌন্দর্য্যবোধ চাই, তেমনি সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতিও চাই। মানব আপনাতে আপনি তুষ্ট থাকিলে, তাহার কার্য্যকরী শক্তির বিকাশ হয় না। হিন্দু ও গ্রীক জীবনে দূরব্যাপিনী রাষ্ট্রনীতির অভাব ছিল; রোমানগণ সেই অভাব পূর্ণ করিয়াছেন।

রোমকগণ যে দেশ জয় করিয়াছেন, তথায় আপনাদিগের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া অল্প দিনের মধ্যে তদ্দেশবাসীদিগকে সুসভ্য করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদিগের শাসননীতির এমনি এক আশ্চর্য্য প্রভাব ছিল যে, পরাজিত জাতিরা রোমের ভাষা, পরিচ্ছদ, আচার, ব্যবহার গ্রহণ করিয়া একটী নূতন রোমক-জাতি-রূপে পরিণত হইত। স্প্যানিশ, ফরাশিশ ও ইটালীয় ভাষা ল্যাটীন ভাষার অপত্য; তদ্ভিন্ন ইংরেজী, জর্ম্মন প্রভৃতি ভাষায় তাহার প্রসার অতি বিস্তৃত। প্রাচীনকালের আর কোনও জাতি রোমক সাম্রাজ্যের ন্যায় প্রতাপশালী বহুকালস্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারে নাই; অসভ্য পরাজিত জাতিদিগকে উন্নত করিবার প্রকৃষ্ট প্রণালীও রোমানদিগের ন্যায় আর কেহ জানিত না। এখনও কেহ জানে না, একথা বলিলে, আশা করি, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার নাম করিয়াই, প্রমাণপ্রয়োগের গুরুভার হইতে নিষ্কৃতি পাইব।

ঈনিডের ষষ্ঠ সর্গে ভবিষ্যদ্দর্শী এঙ্কাইসিস পুত্র ঈনিয়সকে বলিতেছেন—

কেহ বা গড়িবে, বৎস, জীবন্ত প্রতিমা,
সুবর্ণরজতময়ী, দিব্য, নিরুপমা;
মন্ত্রবলে শিলাখণ্ডে করি প্রাণদান,
রচিবে মানুষী মূর্ত্তি দেবতাসমান।

ভাগ্যসম্পদ কেহ লভিবে বিপুল,
বিচিত্রা, মোহিনী, রম্যা, জগতে অতুল।
অথবা আকাশপথে গ্রহগণ সনে,
বিহরিবে নিশাকালে পুলকিতমনে;
গতিবল, উদয়াস্ত করিয়া নির্ণয়,
দেখাইবে ধরাতলে প্রতিভার জয়।
কিন্তু, তুমি, হে রোমান, রাখিও স্মরণে:
কিরূপে শাসিতে হয় পরাজিত জনে;
এই তব শিল্প, কলা—নাহি অন্য কর্ম্ম,
শান্তির প্রতিষ্ঠা, জেনো শ্রেষ্ঠ রাজধর্ম্ম:
যতনে অধীনবর্গে পালিও সতত,
গর্ব্বিত মস্তক যুদ্ধে করো, পদানত।

(মূল লাটীনের অনুবাদ)।

রাজকবি বর্জ্জিলের এই গর্ব্বোক্তি বিফল হয় নাই। রোম যতদিন স্বাধীন ছিল, অধিকৃত দেশসমূহে জ্ঞান ও সভ্যতা আনয়ন করিয়া ঘন বর্ব্বরতার মধ্যে শান্ত, সুসভ্য জীবনের স্নিগ্ধচ্ছটা ফুটাইয়া তুলিত। পরে যখন নানা পৈশাচিক ভুক্তিতে শক্তিহীন হইয়া রোম প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গথ, ভ্যাণ্ডাল, জর্ম্মন প্রভৃতি অসভ্যজাতিকর্ত্তৃক পরাজিত ও উৎপীড়িত হইতে আরম্ভ করিল, যখন একটীর পর একটী করিয়া রোমক প্রদেশগুলি বর্ব্বর, নৃশংস জাতিদিগের করায়ত্ত হইল, তখনও ইহার সাহিত্য, ব্যবস্থাপ্রণালী ও সামাজিক বিধি বিজেতাদিগকে সুশিক্ষা দিয়া সভ্যতার পদবীতে উন্নীত করিতে লাগিল। যে জাতি এমন করিয়া জেতা ও জিত উভয়রূপে বর্ত্তমান ইয়ুরোপীয় জাতিসমূহকে গঠন করিয়াছে, তাহার রাষ্ট্রীয় প্রতিভা যে অনন্যসাধারণ ছিল, ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। ফলতঃ রোমানগণ ইয়ুরোপে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, আজপর্য্যন্ত তাহার কার্য্য চলিয়াছে। ইয়ুরোপীয় ধর্ম্ম, সমাজ, ব্যবস্থাশাস্ত্র ও সাহিত্য রোমের নিকট কতদূর ঋণী, তাহা বুঝাইবার জন্য অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। কে না জানে, রোমক সাম্রাজ্যই খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের পথ সুগম করিয়াছিল, এবং এক সময়ে রোমের ধর্ম্মাচার্য্য খৃষ্টীয় নৃপতিবর্গের উপর সর্ব্বময় প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন? অনেক দিন হয় নাই, রোমানদিগের ভাষা ইয়ুরোপের ব্যাবহারিক ভাষা (lingua franca) ছিল। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ এই ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন; ভজনালয়ে এই ভাষায় পরমেশ্বরের আরাধনা হইত; বিভিন্ন রাজ্যসমূহের মধ্যে এই ভাষায় চিঠিপত্র চলিত। এখনও প্রতি বিদ্যালয়ে যত্নের সহিত লাটীন অধীত হয়; এখনও অক্‌স্‌ফর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যক্ষকে বার্ষিক সভায় লাটীনে বক্তৃতা করিতে হয়। ক্রমে লাটীনের আধিপত্য খর্ব্ব হইতে পারে; কিন্তু ইয়ুরোপীয় সমাজ ও ধর্ম্মাধিকরণের স্তরে স্তরে রোমকদিগের প্রভাব অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। বৃক্ষের পক্ষে মৃত্তিকা অতিক্রম করা যেমন কঠিন, ইয়ুরোপের পক্ষে রোমের শিক্ষা ও সংস্কার অতিক্রম করাও তাহার অপেক্ষা কম কঠিন নহে।

হিন্দুগণ জগতের অন্তরালবর্ত্তী, অথবা অন্তরালবর্ত্তী বলি কেন, জগতের আস্থস্তমধ্যব্যাপি চৈতন্যময় দেবতার অনুসন্ধান করিতে করিতে গভীর আধ্যাত্মিক সত্য সকল দর্শন করিয়া মানবকে ইন্দ্রিয়াতীত অপার্থিব সম্পদের মুক্তিপ্রদ সমাচার প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, যথা যাও, যে দিকে চাও, দেখ, এই 'সত্যং'—জলে, স্থলে; ওষধিতে, বনস্পতিতে; পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে; ইহকালে, পরকালে এই 'সত্যং'; ইহাকে জানো; ইহাকে প্রাপ্ত হও—

ইহচেদবেদীদথসত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।

জানো যদি ব্রহ্মে, জীব, এই ধরাধামে,
জনম সফল হবে; না জানিলে তাঁরে
মহান্ বিনাশ শুধু তব পরিণামে।
সর্ব্বভূতে পরব্রহ্মে সতত নেহারে
যে সুধীর, দেহ অন্তে ত্যজি ইহলোক
অমরজীবন লভি ভুলে দুঃখ শোক।

গ্রীকগণ এই মধুরিমাময়, লোচনানন্দকর বিশ্বমধ্যে সৌন্দর্য্যানুসরণে আত্মহারা হইয়া, রুচির সৌন্দর্য্যরচনাকৌশল আবিষ্কার করিয়া, মানবহৃদয়ের অভ্যন্তরবর্ত্তী রূপপিপাসাকে পরিতৃপ্ত, এবং তৎসঙ্গে পরমসুন্দর ভগবানের নিত্যলীলা প্রকটিত করিয়াছেন।

রোমানগণ ঋষি ও কবির আত্মপরায়ণতা অতিক্রম করিয়া, পুণ্যকর্ম্মা ভগীরথের ন্যায় পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে জ্ঞান-সভ্যতার মৃতসঞ্জীবনী ধারা আনয়ন করিয়াছেন। ভগবান্ সদা ক্রিয়াশীল, কাম্যবস্তুবিধানকারী, সর্ব্বমঙ্গলালয়—শিবং; তাঁহার শিবমূর্ত্তি-রোমক ইতিহাসের পত্রে পত্রে, বর্ণে, বর্ণে, বড় উজ্জ্বল, বড় মনোহর।

যদি বলি, মানব মন, জ্ঞান, হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তি লইয়া গঠিত; তবে ধ্যানপরায়ণ হিন্দু জ্ঞান, সৌন্দর্য্য-পিপাসু গ্রীক হৃদয়, এবং নিপুণ কর্ম্মবীর রোমান ইচ্ছাশক্তিরূপে তাহার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ দেখাইয়া গিয়াছেন। অথবা এই তিন জাতির ক্রমিক অভ্যুদয় সত্য সুন্দর শিব পরমেশ্বরের স্বরূপমহিমা প্রদর্শন করিয়া জগতে এক মহা অভিব্যক্তিবাদের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

৩০এ এপ্রিল, ১৯০১। শ্রীরজনীকান্ত গুহ।

প্রয়াগে কমলাকান্ত

আমি নিবিষ্টচিত্তে "প্রবাসী" মাসিক পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য "আদর্শ কবি"র ছয়টি পরিচ্ছেদ পেন্‌সিলের লেখা হইতে উদ্ধার করিয়া, "জে" মার্কা নিব্ দিয়া উজ্জ্বল নিবিড়কৃষ্ণ কালীর বর্ণে সুসজ্জিত করিতেছি, এমন সময়ে বন্ধুবর রামানন্দ বাবুর সুপরিচিত কণ্ঠ কৌতুকরঞ্জিত উচ্চ ধ্বনিতে আমার ক্ষুদ্র কক্ষটিকে পরিপূর্ণ করিয়া আমার তন্ময়তা দূর করিয়া দিল। "একি ঠাকুর? তোমার বৈঠকখানায় একি ব্যাপার? গরু কোত্থেকে এল?" আমি ত একেবারে অবাক্, স্তম্ভিত! আমি চক্ষু কচলাইতে লাগিলাম। আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? না এ যে সত্য সত্যই গরু।* তাহার পাশে দড়ি হাতে লইয়া গোয়ালিনী ও একটি পঞ্চবর্ষীয় বালক! আমার বৈঠকখানায় কতকগুলি ছবি আছে। একটি ছবিতে এইরূপ একটি দৃশ্য আছে। মা যশোদা একটি সুরূপা সুরভি-কন্যার পার্শ্বে বসিয়া দুগ্ধ দোহন করিতেছেন ও বালক শ্রীকৃষ্ণ মায়ের অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছেন। আমার চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিল। আমার বোধ হইল যেন ক্যানভ্যাস্ হইতে মূর্ত্তিগুলি নামিয়া সজীব হইয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। একদিন ব্যাকুল প্রাণে মাকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলাম—

"যদি চাস্ আর মাগো যশোদার রূপে!
তোর ওই অঙ্কারোহী শিশু কৃষ্ণে ধরি,
আনন্দের বীরখণ্ডি ভণি, চুপে, চুপে,
ভুলে যাই সব জ্বালা আপনা পাশরি!"

মা কি তাই ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া সশরীরে দর্শন দিলেন? তার পর আত্মসম্বরণ করিয়া রামানন্দ বাবুকে বলিলাম—"ভায়া, আমার বোধ হয়, এ কাহারও practical joke। আমার পূর্ব্বকাহিনীর parody করিয়া আমার বৈঠকখানায় প্রসন্ন গোয়ালিনীর ও তাহার গরুর অবতারণা করিয়াছে। আর কমলাকান্তী বুদ্ধিটি গোবুদ্ধির সমতুল্য বলিয়া হাতে কলমে দৃষ্টান্ত দিবার জন্য এ গরুটিকে পাঠাইয়া দিয়া থাকিবে। মহাকবি সেক্ষপিয়রের সে লাইনটি কি হে? যাহার তাৎপর্য্য, যদি কৃত্রিম ভেদাভেদ দূর করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবীই আত্মীয় বলিয়া প্রতিভাত হয়।" চাটুয্যে মশায় বলিলেন—"One touch of Nature makes the whole world kin".

আমি ঈষৎকোপে হিন্দুস্থানী গোয়ালিনীটিকে বলিলাম "উপর কেঁও আয়ি? নীচে যাও"। গোয়ালিনী অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"বহুৎ পানি বরষতা হয়—হমারা গায় ও লড়্কা ভিগ্‌তা থা"। এ ন্যায়যুক্তির উপর তো আর কথা নাই; আমি চাহিয়া দেখিলাম, সত্য সত্যই মেঘ ডাকিতেছে ও বৃষ্টি পড়িতেছে। চারিদিকে "জলে জলময়"।

এ রহস্যজনক ব্যাপারটি দেখিয়া কমলাকান্তী জীবনের একটি ভূতপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। আমি হাসিতে লাগিলাম - হাসিতে হাসিতে দম আটকাইয়া যায় আর কি - সে হাসি কিছুতেই আর থামে না। চাটুয্যে মশায় সহাস্যে বলিলেন "ঠাকুর, তোমার ভীমরথী হইয়াছে। তুমি লিখিয়াছিলে বঙ্গদর্শন নাই। এই দেখ, আমার হাতে নূতন বঙ্গদর্শন—নবীন বেশে, নবীন উদ্যমে গৌরবান্বিত। আমি বলিলাম—"ভায়া—বাঃ এ তো বেশ—এ যে অতি সুন্দর!" কিন্তু তবু আমার হাস্যের স্রোত

---

* কমলাকান্ত শর্ম্মার দ্বিতল কক্ষে গরুর আবির্ভাব আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু গরুটি পূর্ব্বজন্মে প্রসন্ন গোয়ালিনীর ছিল কিনা এবং জাতিস্মর কি না বলিতে পারিনা।—সম্পাদক।

রুদ্ধ হইল না। চাটুয্যে মশায় সহাস্তে বলিলেন---"ঠাকুর, এ বুড়া বয়সে, এত হাসি কিসের?" আমি সহাস্তে বলিলাম—"সে বহুকালের কথা। আমিও একবার একটি সুসজ্জিত কক্ষে দুষ্টামি করিয়া একটি গরু পুরিয়া দিয়াছিলাম"। রামানন্দ বাবু সহাস্তে বলিলেন—"বলিতে আজ্ঞা হউক"।

আমি বলিলাম—"সে বহুকালের কথা। এ কমলাকান্তী জীবনে অনেক কৌতুকাবহ রহস্যময় ঘটনা ঘটিয়াছে। তখন সবে ঈ আই রেলওয়ে দিল্লি পর্য্যন্ত খুলিয়াছে। আমার তখন বয়ঃক্রম ১৯ কিম্বা ২০। আমি কাণপুর ষ্টেশনে রেলওয়ে বুকিং ক্লার্ক ছিলাম। একদা একটি ভদ্রলোক একটি গরু লইয়া আসিল। গরুটিকে দিল্লিতে পাঠান হইবে। আমি যথাবিধি মাশুল আদি লইয়া গরুটিকে ট্রেনে উঠাইয়া দিলাম। পাঁচ ছয় ঘণ্টার ভিতর তারের উপর তার কাণপুরের ষ্টেশন মাষ্টারের নামে উপস্থিত হইল। একটি তারের মর্ম্ম এইরূপ---"তোমার বুকিং ক্লার্কটি নিশ্চয় পাগল - সে first class compartmentএ একটি গরুকে বুক্ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে"। আর একটি তারের মর্ম্ম এইরূপ—"ঐ কম্পারটমেণ্টে একটি বিবি নিদ্রিতা ছিল। সে রাত্রিকালে, জাগিয়া উঠিয়া, এই অদ্ভুত বিভীষিকার আবির্ভাব দেখিয়া, আকু বাঁকু করিয়া হিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছে।"—আর একটি তারের মর্ম্ম এইরূপ "গরুটি ফাষ্টক্লাস কম্পারটমেণ্টটিকে গোময়ে পরিপূর্ণ করিয়াছে। আরসী সারসী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে"। সাহেব ষ্টেশন মাষ্টার আমাকে বহু তিরস্কার করিলেন ও বলিলেন "তুমি stark mad"।

আমি হস্ত যোড় করিয়া অনুযোগের সুরে বলিলাম—"Sir, I mad! My fourteen forefathers are sane. I am rigid Hindu, sincere Hindu. I mad! Mother cow is our goddess She is *mâ Bhagabaty*. How can I book her in ordinary compartment? I booked her in first class, out of respect to Bhagbaty. I mad?"*

*"মহাশয়, আমি পাগল? আমার চৌদ্দ পুরুষ সুস্থমস্তিষ্ক। আমি গোঁড়া হিন্দু, সরলবিশ্বাসী হিন্দু। আমি পাগল? গাভীমাতা আমাদের দেবতা। তিনি মা ভগবতী। তাঁকে আমি কেমন ক'রে সাধারণ কামরায় চালান দি? ভগবতীর প্রতি ভক্তি দেখাবার জন্য আমি তাঁকে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে চালান দিয়াছিলাম।"

সাহেব হাসিয়া আমার মাহিনা চুকাইয়া দিলেন ও আমাকে ডিসমিস করিলেন। সেই আমার প্রথম ও শেষ রেলওয়ে-চাকরি। সাহেবের ক্রোধের আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল। ইহার পূর্ব্বে আমি একটি quadruped কে (চতুষ্পদ জন্তুকে) এইরূপে অন্য ষ্টেশনে বুক্ করি। চতুষ্পদ জন্তুটি যথাস্থানে যথা সময়ে পঁহুছিল। কিন্তু quadrupedকে কেহই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না। খোঁজ—খোঁজ! শেষে বাহির হইল আমার প্রেরিত একটি খট্টাঙ্গ। সেবার আমার দুইটি টাকা মাত্র অর্থদণ্ড হয়।

আদর্শ কবি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তাহার পর বালক কবি এইরূপে নিত্য ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে, কায়মনঃপ্রাণে, দেবীর পূজা করিত ও তিনিও নিত্য দর্শন দিতেন। যখন কোন দিন মধ্যাহ্নে গোবর্দ্ধনগিরিশিখরে আরোহণ করিয়া বালক হেমচন্দ্র পুষ্পময় ময়ূরময় বিচিত্রলাবণ্যময় গিরিনীপের মূলদেশে বসিয়া গান ধরিয়াছে সেই

> দুই কাণে দুটি কদমের ফুল গো,
> নাহি সাজসজ্জা তবুও অতুল গো।

আর অদূরে রাখাল বালকেরা বাঁশরী ক্রোড়ে রাখিয়া, সেই সঙ্গীত, অবাক উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে, তখন সহসা গিরিকদম্ববৃক্ষের স্কন্ধদেশ বিদীর্ণ হইয়া যাইত, আর আনন্দবাষ্পাকুললোচনে হেমচন্দ্র দেখিতে পাইত, সেই বিদীর্ণতরুর অভ্যন্তরে তরুর দেহ হইতে অভিন্নদেহা চৈতন্যময়ী অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি---কদম্বসুন্দরীমূর্ত্তি সেই দেবী মূর্ত্তি। দেবীর দুইকর্ণে দুইটি প্রস্ফুটিত কদম্ব, সুন্দর অলকচূর্ণ শিখীপুচ্ছে সজ্জিত, আর মরি মরি কি অপূর্ব্ব বস্ত্র! নবীন, কোমল কদম্বকিসলয়ে বিরচিত! আর দেবীর ললাটে অৰ্দ্ধ্চন্দ্রাকারে বিন্যস্ত কদম্বপুষ্পের শ্বেত পরাগরেণু। লাবণ্য যেন উথলিয়া পড়িতেছে! দেবীর মুখ হইতে বর্ষাজলসিক্ত সুরভি কদম্বপুষ্পের সৌরভ নিঃসৃত হইতেছে। ঘ্রাণসমাকুল অলিকুল মধুর গুঞ্জরণে শ্রীমুখে বসিতে চাহিতেছে, কদম্বসুন্দরী স্মিত-

মুখে হস্তস্থিত কদম্বপুষ্পের দ্বারায় তাহাদিগকে নিবারণ করিতেছেন!

সেই অভূতপূর্ব্ব অদৃষ্টপূর্ব্ব চৈতন্যময়ী উদ্ভিদ-দেবতাকে দেখিয়া রাখাল বালকেরা বাঁশী, ধেনু ও লগুড় ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া যাইত। হেমচন্দ্র হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবতার আবির্ভাবে আনন্দ-গদ্গদ-কণ্ঠে গান ধরিত—

এসেছ মা? পুষ্পময়ি, এস মা, এস মা,
কুসুমভূষণা আর কুসুমবসনা,
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, ঝরিতেছে সুধাবিন্দু,
আঁধার গেল, আলো এল, মরি কি প্রতিমা!
কে আছে তোমার মত? একাধারে রূপ এত
কার আছে? কার এত লাবণ্যসুষম?
ওগো নিরুপমা!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এক দিন ফাল্গুন মাসে মথুরায় হোলি-উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ভগ্নী ভগ্নীর মুখে আবির মাখাইয়া দিতেছে, সখী সখীর বক্ষে আবীরপূর্ণ কুঙ্কুম দিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, নর নারী যুবা বৃদ্ধ আবীরের পিচকারী লইয়া নরনারী যুবাবৃদ্ধকে লোহিতরাগরঞ্জিত করিতেছে, ভক্তেরা ভক্তিরসপূর্ণ "ভজন" গাইতেছে, যুবক যুবতীরা রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক হাস্যকৌতুকপূর্ণ সঙ্গীত গুলি সমবেত স্বরে উচ্চ কণ্ঠে গান করিতেছে, বৃদ্ধা গোয়ালিনীর চমরীপুচ্ছলাঞ্ছনকারী শ্বেত কেশকলাপ প্রতিমুহূর্ত্তে পদ্মরাগমণিপ্রভা ধারণ করিতেছে; যুবতী গোপাঙ্গনা রণরঙ্গিণী সাজিয়া, কলহাস্যে আভিরপল্লিগুলিকে মাতাইয়া, "জয় নন্দদুলাল" বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবরগুলিকে "সং" সাজাইয়া দিতেছে। সেই হর্ষকোলাহলময় উৎসবের দিনে, বালক হেমচন্দ্র নগরের অনেকগুলি সমবয়স্ক বালকদিগকে একত্র করিয়া, স্বরচিত গীতগুলি তাল মান লয়ে গাইতে গাইতে সারাদিন নগর প্রদক্ষিণ করিল। কবিরা স্বভাবতঃ সাম্যভাবাপন্ন হইয়া থাকে, আর বালকদিগেরও সাম্যবাদ প্রকৃতিসিদ্ধ, সুতরাং বালকমণ্ডলীরমধ্যে হেমচন্দ্রের বিলক্ষণ পশার ও প্রতিপত্তি ছিল। সায়ংকালে গাইতে গাইতে বালকের দল রাজদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গাইতে লাগিল—

"আজ ব্রজ মে হোরি মচায়,
সারা ভূমিমে ব্রিজধাম—রাজা মেরা কুঁয়র কানহিয়া!" ইত্যাদি।

সেই অমৃতময় গীত রাজ অন্তঃপুরে রাজমহিষীর কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। রাণীর গান শুনিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইল। দাসীরা বালক হেমচন্দ্রকে ও তাহার দলস্থ আরও দুটি বালককে অন্তঃপুরে মহিষীর নিকটে লইয়া গেল। সেখানে সখী-জন-পরিবেষ্টিতা দাসী-জন-সেবিতা রাণীজি বালক হেমচন্দ্রকে "এটা গাও, ওটা গাও" বলিয়া অনেক "ফরমাশ" করিলেন। হেমচন্দ্র গাইল—

"হোরি মচাই শ্যাম, ব্রিজ মে হোরি মচাই!
ইধর সে আ গ্যয়ী রাধিকা, উধর সে কুঁয়র কানহাই!" ইত্যাদি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাজ্ঞী যার পর নাই তুষ্ট হইলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে সখীরা হেমচন্দ্রের গলায় পুষ্পমালা পরাইয়া দিল, পরিচারিকারা স্বর্ণথালে "হোলির প্রসাদ" আনিয়া তাহার হস্তে দিল।

'তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টঃ!' * সেই মুহূর্ত্তেই রাণীর সন্তোষের কথা রাজার কর্ণগোচর হইল। তখন রাজার আজ্ঞায় বালক কবি সাদরে রাজসভায় আনীত হইল; আর সে স্থানে সন্ধ্যাকালে দীপক-ঝালর-হীরা-মুক্তা-খচিত আলোকমালাবিভূষিত উচ্চবংশীয়ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যপ্রমুখ সভার মধ্যে বালক হেমচন্দ্র গাইল—

"শ্যাম হো,
কহোঁ দুখ কাসে পুকারি?
আয়ে বসন্ত, ফাগুন হসে রঙ সে,
হমারি দশা নেহারি!
কহোঁ দুখ কাসে পুকারি!" ইত্যাদি।

গীত শুনিয়া সকলেই রোমাঞ্চিত কলেবর ও মুগ্ধ হইল। স্বয়ং রাজা তাহাকে "বাচ্চা কবি" বলিয়া মধুর আদর ও অভ্যর্থনা করিলেন ও তাহার গলায় নিজহস্তে মুক্তার মালা পরাইয়া দিলেন। সেই দিন রাজদরবারে হেমচন্দ্রের প্রভূত ভবিষ্য প্রতিপত্তির ভিত্তি স্থাপিত হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রে যশশ্চন্দনে চর্চিতকলেবর হেমচন্দ্র রাজসভা হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া সত্বর গৃহাভিমুখে ফিরিল না। আহ্লাদে ও আত্মপ্রসাদে বিহ্বলচিত্ত হইয়া মথুরার সুবিখ্যাত

অশোককুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়া পুষ্পিত অশোককুঞ্জের প্রাণ-মনোহারিণী শোভা দেখিতে লাগিল। সেই দোলপূর্ণিমার রাত্রে নির্জ্জনে বসিয়া অশোকেরাও গায়ে আবীর মাখিয়া হোলি খেলিতেছিল। চারিদিকে খদ্যোত, চারিধারে লালে লাল অশোক, চতুর্দ্দিকে লালে লাল জ্যোৎস্না। সেই অশোক কুঞ্জে সরল-শুভ্র লাবণ্যময়ী দেবকন্যা জ্যোৎস্না নিঃশঙ্কচিত্তে প্রবেশ করিয়াছিল—হোলির রসরঙ্গে ভোর হইয়া দুষ্ট অশোকেরা জ্যোৎস্নার শুভ্র বসনে এক রাশ আবীর ঢালিয়া দিল! চারিদিকে খদ্যোৎ আর চারিদিকে জ্যোৎস্না। যেন বনলক্ষ্মীকে হাসাইবার জন্য বসন্তদেব ফাল্গুনমাসেই দেওয়ালির দীপোৎসব আরম্ভ করিয়াছেন। সেই সুখোৎসব দেখিয়া, বালক হেমচন্দ্রের নেত্র উৎফুল্ল হইল ও তাহার মুখ হইতে স্বতঃ নিঃসারিত হইল

"হে অশোক! কোন্ রাঙা চরণ-চুম্বনে
মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া হলি লালে লাল?
কোন্ দোলপূর্ণিমায়, নব বৃন্দাবনে,
সহর্ষে মাখিলি ফাগ প্রকৃতিদুলাল?
কোন চিরসধবার ব্রত উদ্‌যাপনে,
পাইলি বাসন্তী সাড়ি সিন্দূরবরণ?
কোন্ বিবাহের রাত্রে বাসরভবনে
একরাশি থুঁড়াহাসি করিলি চয়ন?"

বালক হেমচন্দ্র বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে ডাকিল—"কোথায় মা, কোথায় মা—আজ সমস্ত দিন তোমার পুত্রকে দেখা দাও নাই—মন ব্যাকুল হইয়াছে। আইস মা, আইস"।

তখন—

"অশোকনির্ভৎসিতপদ্মরাগং
আকৃষ্টহেমদ্যুতিকর্ণিকারং
মুক্তাকলাপীকৃত সিন্ধুবারং
বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তী"

অদৃষ্টপূর্ব্ব, অভূতপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি—অপরূপ অশোক-সুন্দরী-মূর্ত্তি—মৃদুল পাদবিক্ষেপে অশোককুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই উদ্দাম-হর্ষ-গর্ব্বে গর্ব্বিত অশোককুঞ্জের তরুতনুর শিরায় শিরায় যে বিপুল কোলাহল উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা দেবীর অশোকমূর্ত্তিদর্শনে "নির্ব্বাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্" সহসা প্রশান্ত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

আ মরি মরি! ত্রিজগতে কি এমন রূপ আছে গা! সেই ভুবনমোহিনী অশোকসুন্দরী মূর্ত্তির দিকে বালক হেমচন্দ্র ভক্তজনোচিত হর্ষে বিহ্বল হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় নির্নিমেষ-লোচনে চাহিয়া রহিল! কে যেন বালকের শুভ্র পবিত্র প্রাণের তুলসী-মূলে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়া দিল! আ মরি মরি! অশোকসুন্দরীর সেই রক্তকমল-বিগঞ্জন পদ্মরাগপ্রভালাঞ্ছন লোহিত বসন! স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা নন্দনকাননের অতি পেলব অতি সুকুমার অশোকপুষ্পগুচ্ছ আহরণ করিয়া এ অপরূপ বৈজয়ন্তী চেলী বুনিয়াছে। আর বসনের প্রান্তভাগে কৌমুদীময় খদ্যোতময় বিচিত্র-লাবণ্যময় কনক-অঞ্চল ঝলমল্ করিতেছে।

নন্দনকাননের সহস্র সহস্র গাঢ়নীলপক্ষধারী হরিচন্দন-তরুবিহারী ভ্রমরপুঞ্জ দলবদ্ধ হইয়া, সারি গাঁথিয়া, দেবীর পাদস্পর্শী কেশকলাপ হইয়া কেমন নিস্পন্দ কেমন নিশ্চল ভাবে রহিয়াছে! বুঝি নিবিড় আনন্দে উহারা আপনাদের ভ্রমর-সত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছে! আর ওই অশোকপুষ্পের সিঁথি! আ মরি মরি!—ত্রিজগতে কি এমন শোভা আছে গা! দেবাঙ্গনারা পরামর্শ করিয়া, ঐ সিঁথির স্থানে স্থানে খদ্যোত-মণি বসাইয়া দিয়াছে! কোন্ দেব-শিল্পী ঐ অশোক-পুষ্পের সিন্দূর প্রস্তুত করিয়াছে? বলিহারি তাহার কৌশল! কবির উৎপ্রেক্ষা সফল করিয়াছে—

সিন্দূরবিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি-ললাটে আহা-তারা রত্ন যথা!

অশোকেরা আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিল না। তাহারা খসিয়া খসিয়া নৃত্য করিতে করিতে অশোকসুন্দরীর পাদ-পদ্মে আসিয়া শরণাগত হইল।

"পূজিবার তরে ফুল ঝরে পড়ে পায়,
হৃদি ফল পরশে পাপীতে,
মুগ্ধমুখে কুরঙ্গিনী মুগ্ধমুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে,
স্পর্শে পদ, রাগ-ভরা, অশোক শোভিল ধরা,
এলোকেশে কে এল রূপসী?
কোন্ বনফুল, কোন্ গগনের শশী?"

একাদশ পরিচ্ছেদ

অধিক টানিলে দড়ি ছিঁড়িয়া যায়; অধিক নিংড়াইলে লেবু তিক্ত হয়। এ সব অতি পুরাতন প্রবচন; কিন্তু সত্য কথা অতি পুরাতন হইলেও মর্য্যাদাহীন হয় না। অতএব এইবেলা আমি সাবধান হই। আমি বুঝিতে পারিতেছি যে অতি সহিষ্ণু পাঠক মহাশয় বিরক্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন ও বলিতেছেন—"কি আপদ! কোথায় বা অদ্ভুত Romance, কোথায় বা real something! এ যে কেবল কবিতার ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়সমীর বহিতে আরম্ভ হইল।"

আমার বিবেচনায় এস্থলে একটা খাঁটি ফলারের গল্প বর্ণন করা লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষে অসুবিধাজনক হইবে না। একদিন—পুরে আমরা কোন শ্রাদ্ধবাড়িতে কতিপয় বন্ধু অতিপরিতোষের সহিত স-মণ্ডা লুচি আহার করিলাম। তাহার পর বৈকালে সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত ব— বাবুর বাটিতে নিমন্ত্রণ হইল। আমরা আপত্তি করিলাম না। ভাবিলাম—"ক্ষতি কি? শ্রাদ্ধ বাড়িতে লুচি আহার হইয়াছে। রাত্রে ভাত পোলাও খাইয়া মুখ বদলান যাইবে"।

রাত্রে যথাসময়ে আমরা আহারার্থে আসনে বসিলাম। সহসা পাতে আসিয়া লুচি পড়িল; তরকারি পড়িল। আমরা সানন্দে তাহা নিঃশেষ করিলাম। ভাবিলাম ইহা উপক্রমণিকামাত্র, আধুনিক সুসভ্য খাদ্যরীতির অনুমোদিত মঙ্গলাচরণ বিশেষ। নিশ্চিত অবিলম্বে সৌরভনিঃসারী ধূমোদ্গারী নয়নাভিরাম "পোলাও" আসিয়া উপস্থিত হইবে। দ্রুতপাদবিক্ষেপে ব্রাহ্মণ ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। আবার লুচি—আবার তরকারি। ফিরিয়া গিয়া, আবার দৌড়াইয়া আসিল। আবার লুচি—আবার তরকারি! আমাদের দেখিয়াই ত চক্ষু স্থির। তখন নিরাশ হইয়া, "পোলাও"য়ের আশা ত্যাগ করিলাম; নিতান্ত বিসন্নবদনে লুচি ও তরকারি গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম।

এইরূপে বিড়ম্বিত ও অপমানিত হইয়া আমাদের কৃপাপাত্র উদরের চারি ভাগের সার্দ্ধ তিন ভাগ লুচি ও তরকারিতে পরিপূর্ণ হইল। আবার পদশব্দ। দুপ্ দুপ্ করিয়া ব্রাহ্মণ ঠাকুর আসিতেছে। আমরা ভাবিলাম, এইবার মিষ্টান্ন, পরমান্ন, অম্ল, দধি আসিতেছে। এ ভোজন প্রহসনের শেষ গর্ভাঙ্ক।

সম্মুখসমরে পড়ি ক্ষুধাদর্পহারী
তপ্ত লুচি, চলি যবে গেলা এ উদরে
অকালে, কহ গো দেবি অমৃতবর্ষিণি
রসনে (রন্ধনশালে অধিষ্ঠাত্রি দেবি,
সুভক্ত উদরিকের চিরবাঞ্ছা, আহা!)
কোন্ বীরবরে মরি কাংস্যপাত্রে বরি
পাঠাইলা রণে পুনঃ বঙ্গকুলনিধি
তাড়াতাড়ি?

ব্রাহ্মণ ঠাকুর আসিল। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! চারিধারে পলাণ্ডুর সৌরভ, এলাচবঙ্গের গৌরব!—সধূম তপ্ত তপ্ত পোলাও পাতে পড়িতে লাগিল। কিন্তু তখন উদরের clerk রাগ করিয়া কাজে ইস্তফা দাখিল করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আর বেচারির বড় একটা দোষও ছিল না। ক্রমাগত লুচি ও তরকারির বোঝাইয়ে চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছিল;—কাজ করিবে কি? আমরা শিষ্টাচার করিয়া নিমন্ত্রণকারী ব—বাবুকে বলিলাম—"মহাশয়, এ যে agreeable surprise হইল। খুব চমৎকার পোলাও"। এই বলিয়া রাগান্ধ উদর মহাশয়কে অনেক কাকুতি মিনতিতে ঠাণ্ডা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ পোলাও ভক্ষণ করিলাম।

বাহিরে আসিয়া, আচমনের সময়ে, আমার এক বন্ধু সকৌতুকে বলিলেন, "Our poor stomachs have been literally crammed with diamonds instead of food", আর একজন সহাস্যে বলিলেন "Programme না থাকায় আজকের playটাই মাটি। ছাই মাথা মুণ্ডু যদি কিছু বুঝিয়া থাকি। এ যেন Pantomime show"। নিমন্ত্রিতের মধ্যে আর এক জন বলিলেন "এত agreeable surprise নয়। এ disagreeable surprise"। একটি নবা যুবা (সে তাহার বিবাহের এক বৎসর পরে প্রতিশ্রুত ঘড়ি ও চেন্ কৃপণ শ্বশুরের কাছে আদায় করিয়াছিল) সহাস্যে বলিল "Better late than never"।

অতএব আমার পাঠক পাঠিকাদিগকে আমি প্রথম হইতেই বলিয়া রাখিতেছি, "আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন; কোন মতেই disagreeable surprise হইবে না। সুধু লুচি তরকারি নহে,— সুতপ্ত সুরভি পোলাও-ও আমার রন্ধনশালায় প্রস্তুত

জামষেদজী নসেরবাঁজী তাতা।

পণ্ডিত বামন শিবরাম আপ্টে, এম. এ.।

আছে। সুধু গীতগোবিন্দী কবিতা নহে—ইহাতে মৃণালিনী ও দুর্গেশনন্দিনীও আছে। সুধু লুচি মণ্ডা নহে—omlette, cutlet ও আছে। অতি উপাদেয় Anglo-vernacular dish.—

Gentles, do not reprehend,
If you pardon, we will mend.

(ক্রমশঃ)

শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা।

শিক্ষার উন্নতি ও তন্নিমিত্ত দান।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে "Made in Germany" ("জর্ম্মানীতে প্রস্তুত") নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাহা পড়িয়া ইংরাজের এই জ্ঞান জন্মে যে পূর্ব্বে যে সকল দেশে ইংলণ্ডীয় শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহৃত হইত, এখন তথায় জর্ম্মানীতে প্রস্তুত দ্রব্যসমূহের ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া ইংরাজ বুঝিতে পারেন, যে জর্ম্মান শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা শিল্পে ও বাণিজ্যে যেরূপ উৎকৃষ্ট শিক্ষা পায়, ইংরাজ শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা তত ভাল শিক্ষা পায় না। এইরূপে কয়েকবৎসর পূর্ব্বে জনসাধারণের শিক্ষা বিষয়ে ইংলণ্ডের চোখ ফুটে। তাহার পর দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধ করিতে গিয়া ইংরাজেরা দেখিলেন যে যত সহজে বুঅরদিগকে পরাজিত করিবেন, ভাবিয়াছিলেন, তাহারা তত সহজে পরাজেয় নহে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ইহাও পরিলক্ষিত হয় যে বুঅরগণ ইংরাজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার করে, এবং ইংরাজ সেনানীগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর যুদ্ধকৌশল জানে। ইহাতেও ইংলণ্ড বুঝিতে পারিয়াছেন যে তিনি পাশ্চাত্য অন্যান্য কোন কোন দেশ অপেক্ষা শিক্ষার নিম্নতর সোপানে অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার সন্তানগণের শিক্ষা অনেকবিষয়ে চিরাগত প্রথা অনুসারে হইতেছে; অপরে অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া উন্নতিমার্গে তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছে।

ইংরাজ বুঝিয়াছেন, জাতীয় উন্নতি ও প্রাধান্যের মূলে শিক্ষা। যুদ্ধ এখনও পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হয় নাই, এখনও নরশোণিতে পৃথিবী প্লাবিত হইতেছে; কিন্তু যাঁহারা বর্ত্তমান সভ্যতার প্রকৃতি ও গতি ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, যে ভবিষ্যতের যুদ্ধ অন্যপ্রকারের হইবে। এখন যুদ্ধের অর্থ মারামারি কাটাকাটি, তখন ইহা শিল্পবাণিজ্যে ঘোরতর প্রতিযোগিতায় পরিণত হইবে। যে জাতি শিল্পনৈপুণ্যে, কলকারখানায় শ্রেষ্ঠ হইবে, সেই প্রধান হইবে। এই যুদ্ধের সূত্রপাত আমরা এখনই দেখিতে পাইতেছি।

শিল্পনৈপুণ্য এবং কলকারখানার শ্রেষ্ঠতা শিক্ষাপ্রসূত। কেহ যেন মনে না করেন যে কতকগুলি ছুতার কামারকে তাহাদের চিরন্তন প্রথানুযায়ী শিল্পশিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইল। সেরূপ শিক্ষারও প্রয়োজন আছে, কিন্তু কেবল সেরূপ শিক্ষায় আজকাল কাজ চলিবে না। আজকাল প্রতিদিন নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার নূতন নূতন উৎকৃষ্ট যন্ত্র ও প্রণালী উদ্ভাবিত হইতেছে। তাহার দ্বারা জিনিস ভাল এবং সস্তা উভয়ই হইতেছে। সুতরাং উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে শিল্পশিক্ষার অঙ্গীভূত না করিলে বর্ত্তমান কালে কোন জাতিই শিল্পযুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। সাধারণ শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, এই তিন অঙ্গের একত্র সমাবেশে জাতীয় শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয়। গবেষণা শিক্ষা না দিলে উচ্চ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা দেওয়া যায় না। এমন অনেক বৈজ্ঞানিক বিষয় আছে, যাহার অনুশীলন দ্বারা আপাততঃ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে কোন প্রকার সুবিধা হয় না। এই সকল "অকেজো" বিষয়কে বাদ দিলে চলিবে না। তাহার কারণ, প্রথমতঃ "অকেজো" বিষয়ের চর্চ্চাতেও বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও উদ্ভাবনী শক্তি বর্দ্ধিত হয়; দ্বিতীয়তঃ, আজ যাহা "অকেজো," ভবিষ্যতে তাহা মানুষের খুব কাজে লাগিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। ফরাশি বিজ্ঞান-পরিষদের সভাপতি ম লেভী তাঁহার বার্ষিক বক্তৃতাতে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডের "নেচর" নামক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্র তাহার সমর্থন করিয়াছেন।

* চরিত্রবল ব্যতিরেকে যে জাতীয় উৎকর্ষলাভ অসম্ভব, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা এখানে চরিত্ররূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত অন্যবিধ উপায়ের কথা বলিতেছি।

আমরা ছুঁচ, সুতা, ছুরী, কাঁচি, কাপড় চোপড়, গুড়, চিনি প্রভৃতি নিত্যাবশ্যক যে সকল জিনিষ প্রস্তুত করিবার ভার বহুকাল ধরিয়া অশিক্ষিত কামার, ময়রা, তাঁতি, প্রভৃতির হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত আছি, তৎসমুদয়ও অপর জাতি অপেক্ষা ভাল করিয়া প্রস্তুত করিতে হইলে উচ্চতম বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজন। ইহার অর্থ এ নয় যে প্রত্যেক কামার বা তাঁতিকে লর্ড কেল্‌ভিনের মত বৈজ্ঞানিক হইতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, জাতীয় শিক্ষার ও শিল্পের পরিচালকগণকে বিজ্ঞানে পারদর্শী হইতে হইবে, এবং শ্রমজীবীদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা এবং যন্ত্রাদির ব্যবহার শিক্ষা দিতে হইবে।

এখন দেখা যাক্, মোটের উপর কিসে শিক্ষা ভাল হয়। শিক্ষার জন্য তিনটি জিনিসের প্রয়োজন, শিষ্য, শিক্ষক, শিক্ষাদানের সরঞ্জাম। আমাদের দেশের লোকেরা কোন বিষয় শিখিতে অসমর্থ, ইহা কেহই বলিবেন না। আমাদের শিখিবার ক্ষমতা আছে। ত্রুটি যাহা আছে, তাহা চেষ্টা করিলে সহজেই সারিয়া যাইতে পারে। কিন্তু শিষ্য ভাল হইলেও উৎকৃষ্ট শিক্ষক ব্যতিরেকে কিছুই হয় না। উৎকৃষ্ট শিক্ষক বড় দুর্লভ। চরিত্রবল, শ্রমশীলতা, ধীরতা, শিক্ষা-কার্য্যে উৎসাহ এবং শিক্ষকতার মহত্ত্ব ও গৌরবে দৃঢ় বিশ্বাস, এসকল না থাকিলে ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না। কিন্তু এসকল উচ্চ কথা ছাড়িয়া দিলেও মোটামুটি দেখা যায় যে শিক্ষক যাহা শিখাইবেন, সে বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান চাই, এবং শিক্ষাদানপ্রণালীও ভাল করিয়া জানা চাই। আগে লোকে মনে করিত, শুধু জ্ঞান থাকিলেই হইল। কিন্তু এখন শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞমাত্রেই স্বীকার করেন যে শিক্ষাদান-প্রণালীও শিক্ষকের ভাল করিয়া জানা দরকার। এখন মনোবিজ্ঞানের কোন কোন অংশ শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভূত বলিয়া ধরা হয়। শিশুপ্রকৃতির পর্য্যালোচনাও শিক্ষা-তত্ত্বালোচনার অঙ্গীভূত হইয়াছে। আমাদের দেশে ভাবী শিক্ষকদিগকে শিক্ষাতত্ত্ব শিখাইবার ভাল বন্দোবস্ত নাই। তাঁহারা যে যে বিষয় শিখাইবেন, তাহাও ভাল করিয়া শিখাইবার বন্দোবস্ত নাই। এইজন্য এখনও কিছুকাল আমাদের ভাবী শিক্ষকগণের বিদেশে শিক্ষালাভ একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহা বহুব্যয়সাধ্য।

ভাল শিক্ষক হইবার মত শিক্ষা পাইয়াছেন, সামান্য বেতন দিয়া এরূপ কয়জন লোক পাওয়া যায়? সুতরাং যদি আমরা ভাল শিক্ষক চাই, ত অর্থব্যয় করিতে হইবে। পুনার ফর্গুসন কলেজের অধ্যাপক স্বর্গীয় বামন শিবরাম আপ্‌টে, বালগঙ্গাধর তিলক, গোখলে, ভাবী অধ্যাপক পরাঞ্জপে প্রভৃতির মত স্বার্থত্যাগী পণ্ডিত লোক সর্ব্ব-দেশেই দুর্লভ। সুতরাং শিক্ষাবিস্তারকার্য্যে কেবল এরূপ আত্মোৎসর্গের উপর নির্ভর করা যায় না। অর্থ চাই। যদি বা কেহ প্রাণের আবেগে অল্প বেতনে শিক্ষকতা করেন, তাহাতেও তাঁহার বিদ্যালয় তাঁহার সমুদয় কার্য্যশক্তির সম্যক্ ফল পাইবে না। কারণ, তাঁহাকে আর্থিক অনাটন দূর করিবার জন্য অর্থাগমের অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যিনি যে বিষয় শিক্ষা দেন, তদ্বিষয়ে যে সকল নূতন পুস্তক প্রকাশিত হয়, উৎকৃষ্ট মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রাদিতে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাঁহার সে সকল পড়া চাই। হয় এসকল পুস্তক ও পত্রিকা বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে থাকা দরকার, নয় শিক্ষকের সে সকল কিনিবার শক্তি থাকা চাই। যে দিক দিয়াই দেখুন, টাকা চাই। আবার বহি ও কাগজ কিনিয়া পড়িবার সময়ও ত চাই। কিন্তু যদি কোন শিক্ষককে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অন্য কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি পড়িবেন কখন? কলেজের অধ্যাপকগণের পাণ্ডিত্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের অপেক্ষা গভীরতর হওয়া উচিত, এবং নবাবিষ্কৃত তত্ত্বসকল তাঁহাদের আরও অধিক আয়ত্ত হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহাদের এক একজনকে দুতিন-টা বিষয় পড়াইতে হইলে এবং সপ্তাহে ২৪ হইতে ৩০ ঘণ্টা অধ্যাপনা করিতে হইলে ইহা কিরূপে সম্ভবে? তাঁহাদের নিজ নিজ বিষয়ের সাহিত্য ক্রয়ের সামর্থ্যই বা কোথায়? অধিকাংশ কলেজের ও সে সামর্থ্য নাই।

দেখা গেল যে ভাল শিক্ষক পাইতে হইলে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হয়। আর এক কারণেও অর্থব্যয়ের আবশ্যক। শিক্ষক যতই ভাল হউন, তিনি একা ২০।২৫টির চেয়ে বেশী ছাত্রকে এক শ্রেণীতে শিক্ষা দিতে পারেন না। সাধারণতঃ, আমাদের দেশে বি. এ. পাস করিবার আগে ছাত্রদের কেবল অধ্যাপকগণের পাঠ বা "বক্তৃতা" (lecture)

স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর।
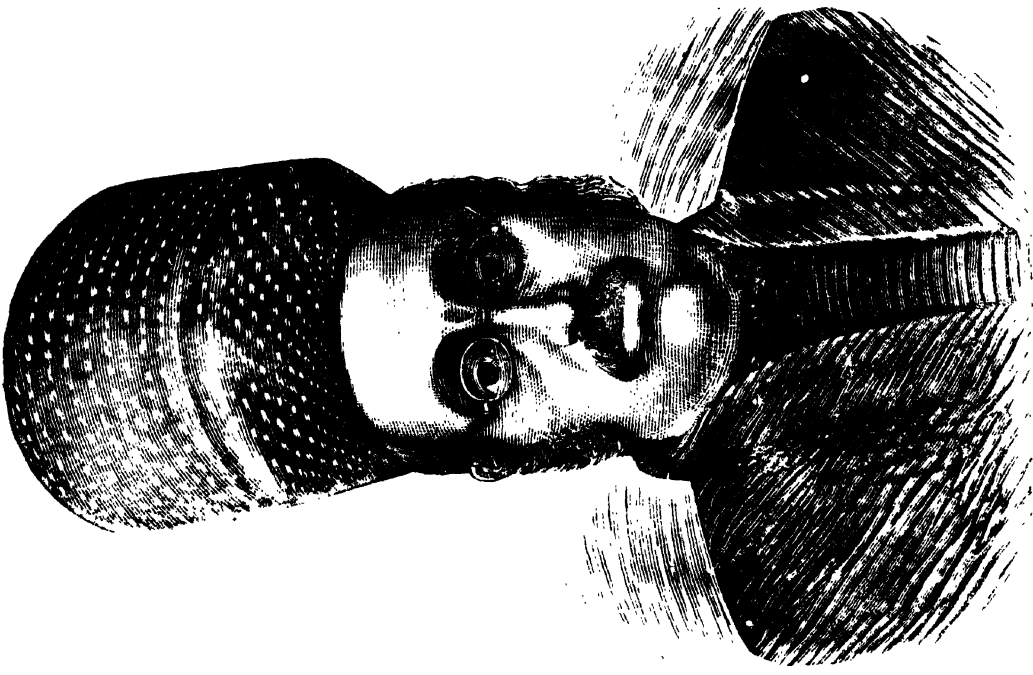
সর্ মঙ্গলদাস নাথুভাই।

শুনিয়া শিক্ষা লাভ করিবার মত শক্তি জন্মে না। তাহাদিগকে প্রকাণ্ড ক্লাসে বসাইয়া এই প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহা নামে মাত্র শিক্ষা। জ্ঞানে উন্নত ছাত্রগণ অধ্যাপকের কথা শুনিয়াই শিখিতে পারেন। কিন্তু অপর সকলের পক্ষে, কি বাল্যে, কি যৌবনে, অধ্যাপকগণের অধ্যাপনপ্রণালী উপযোগী নয়; যে প্রণালীতে প্রত্যেক ছাত্রের প্রকৃতি ও ব্যক্তিগত অভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারা যায়, তাহাই উৎকৃষ্ট প্রণালী। এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইলে এখনকার মত বড় বড় শ্রেণী রাখিলে চলিবে না। শিক্ষক এবং অধ্যাপকের সংখ্যা বাড়াইয়া শ্রেণীগুলি ছোট করিতে হইবে। কিন্তু ইহাও বহুব্যয়সাধ্য। কেবল ছাত্রদত্ত বেতন হইতে এই ব্যয় সঙ্কুলান হইতে পারে না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ পরীক্ষায় যে এত অধিক ছাত্র ফেল হয়, তাহা কেবল পরীক্ষকদের দোষে নয়; ভাল শিক্ষার অভাবও তাহার অন্যতম কারণ। আরও একটি কারণে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ান দরকার। তাহা পরে বলিতেছি।

সুশিক্ষা দিতে হইলে কি কি সরঞ্জামের প্রয়োজন, দেখা যাক্। প্রথমেইত স্কুল বা কলেজের গৃহের কথা মনে হয়। উহা ফাঁকা, পরিষ্কার, উচ্চস্থানে নির্ম্মিত হওয়া উচিত। উহার কামরাগুলিতে যথেষ্ট আলোক থাকা আবশ্যক। বায়ু চলাচলের সুবন্দোবস্ত থাকা দরকার। তদ্ভিন্ন এক এক কামরায় বহুসংখ্যক ছাত্রকে ঠাসাঠাসি করিয়া বসান উচিত নয়। স্কুল বা কলেজগৃহ যথাসাধ্য সুন্দর করিয়া নির্ম্মাণ করা উচিত। সৌন্দর্য্যবোধ শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। সৌন্দর্য্য মানুষের আত্মাকে উন্নত করে। স্কুল ও কলেজগৃহের চতুর্দ্দিকে যথেষ্ট যায়গা থাকা উচিত। তাহার কিয়দংশ ক্রীড়াক্ষেত্ররূপে ব্যবহারের জন্য রাখিয়া, অবশিষ্টভাগ বৃক্ষলতাদিদ্বারা পরিশোভিত করা কর্ত্তব্য। বেঞ্চ, ডেস্ক্, প্রভৃতিও বিবেচনা করিয়া নির্ম্মাণ করান উচিত। অল্পবয়স্ক খর্ব্বকায় ছাত্রদের জন্য উঁচু বেঞ্চ ও ডেস্ক্ অনিষ্টকর। আবার অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক দীর্ঘকায় ছাত্রদিগকে নীচু ডেস্ক্ দিলে, তাহাদিগকে কুঁজো হইয়া বসিতে হয়। এইজন্য পাশ্চাত্য অনেক সুসভ্যদেশে এরূপ ষ্টুল ও ডেস্ক্ ব্যবহৃত হয়, যাহা প্রয়োজনমত উঁচু নীচু করা যায়।

প্রত্যেক শিক্ষালয়ে যে এক একটি পাঠ-গৃহ এবং পুস্তকালয় থাকা উচিত, ইহা সকলেই জানেন। পুস্তকালয়ে পুস্তক ব্যতীত উৎকৃষ্ট মাসিকপত্রাদিও রাখা উচিত। আমার সম্মুখে আমেরিকার মিশিগান মহাবিদ্যালয়ের একখানি ক্যালেণ্ডার রহিয়াছে। তাহাতে দেখিলাম, উহার লাইব্রেরীর জন্য ৫৪৬ খানি সাময়িক পত্র লওয়া হয়। প্রত্যেক শিক্ষালয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণাগৃহ এবং তদুপযোগী যন্ত্রাদি থাকা আবশ্যক। কলেজে যে এরূপ গৃহ ও যন্ত্রাদির প্রয়োজন, তাহা সকলেই বুঝেন, কিন্তু ইস্কুলে ইহার আবশ্যকতা অনেকেই বুঝেন না। বিজ্ঞান-শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য মানুষকে নিজে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া চিন্তাদ্বারা নূতন নূতন তত্ত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ করা। সুতরাং ছাত্রেরা নিজহস্তে যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে না পাইলে, কিরূপে তাহাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা হইতে পারে? আমাদের দেশের অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগকেও দেশভাষা বা ইংরাজীতে কোন না কোন বিজ্ঞান পড়িয়া তাহাতে পরীক্ষা দিতে হয়। যেমন, বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতিতে পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু যন্ত্রাদি কোন্ বাঙ্গলা ইস্কুলে আছে? ইংরাজী ইস্কুলগুলিরও দশা প্রায় এইরূপ; এমনকি অনেক কলেজেও যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নাই। তাহার পর আর এক কথা। পাশ্চাত্য দেশসমূহে আজকাল ইস্কুলের ছাত্রগণকে পর্য্যাপ্ত আবিষ্কার বা গবেষণাপদ্ধতি অনুসারে বিজ্ঞান শিখান হয়। ইহাকে ইংরাজীতে heuristic method বলে। ইহাতে, ছাত্রকে কেবল একটি সত্য শিখাইয়া দিলেই নিজের কর্ত্তব্য শেষ হইল, শিক্ষক এরূপ মনে করেন না; কি পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া সেই সত্যের আবিষ্কার করিতে পারা যায়, যন্ত্রাদির সাহায্যে ছাত্রকে তাহা শিক্ষা দেওয়া হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বালককে নিজের চোখ কান ও বুদ্ধির ব্যবহার করিয়া নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে বলা হয়। ইহাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কিন্তু এরূপ শিক্ষা দিতে হইলে উপযুক্তসংখ্যক যোগ্য শিক্ষক চাই। একজন শিক্ষক ৫০টি বালককে এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিতে পারেন না। যন্ত্রাদিও চাইই। আমাদের দেশে যাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদেরও অধিকাংশের গবেষণা শিক্ষা হয় না। এক এক জন অধ্যাপক সাধারণতঃ ২।৩

জনের বেশী ছাত্রকে গবেষণাতে সাহায্য করিতে পারেন না। সুতরাং এরূপ শিক্ষাদানও বহুব্যয় সাধ্য, অথচ এরূপ শিক্ষা ব্যতিরেকে কোন জাতি বড় হইতে পারে না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার জন্য অনেক জন যোগ্য শিক্ষক বা অধ্যাপক, পরীক্ষা বা গবেষণাগৃহ, যন্ত্রাদি, এবং উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শিখিতে হইলে উদ্যান, কৃষিবিদ্যা শিখিতে হইলে কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্র, জ্যোতিষের জন্য পর্য্যবেক্ষণ ও মানমন্দির, প্রভৃতির প্রয়োজন। কেবল জড়বিজ্ঞানেই যে গবেষণার প্রয়োজন তাহা নয়। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্ত অনেক লোকেও হয় ত শুনেন নাই যে মনোবিজ্ঞানেরও পরীক্ষাগৃহ (psychological laboratory) আছে। তাহার পর, নানা প্রাচীন গ্রন্থ, শিলালিপি, প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রফলক, প্রভৃতির সাহায্যে কিরূপে ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হয়, তাহাও শিক্ষণীয়। কেবল মুখস্থ করিলেই ইতিহাস শিক্ষা হয় না। এইরূপ সকল বিদ্যাতেই পর্য্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন ও চিন্তার, গবেষণার, প্রয়োজন। কিন্তু সমস্তই অর্থব্যয়সাপেক্ষ।

ইস্কুলে ইতিহাস শিক্ষা দিতে হইলে ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রার আবশ্যক। অর্থাৎ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রধান প্রধান স্থান, দুর্গ, প্রাসাদ, গিরিসঙ্কট, স্তম্ভ, খোদিত অনুশাসনপূর্ণ পর্ব্বতগাত্র, ছাত্রগণকে দেখান উচিত। তদভাবে এই সকলের উৎকৃষ্ট চিত্র, প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের ছবি, ইস্কুল ও কলেজে রাখা উচিত। দেশের বড় লোকদের প্রস্তর-মূর্ত্তি ও চিত্র শিক্ষাগারে রাখিলে ছাত্রদের হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম সজাগ থাকে। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে এই সমুদয় চিত্র প্রদর্শিত ও বর্ণিত হইলে অনেক উপকার হয়। একটি চলনসই ম্যাজিক লণ্ঠন ১৫০।২০০ টাকায় হইতে পারে। ইহার সাহায্যে নানাবিধ বিজ্ঞানও শিখান যাইতে পারে। ভারতবর্ষে যত প্রাচীন দুর্গ, প্রাসাদ, চৈত্য, স্তূপ, দেবমন্দির, শিলালিপি, স্তম্ভ, প্রভৃতি আছে, সেক্রেটরী অব ষ্টেটের অনুমতিক্রমে লণ্ডনের ডবলিউ গ্রিগ্‌স্ এণ্ড সনস্ কাচের উপর তৎসমুদয়ের ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে প্রদর্শনোপযোগী চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। এরূপ ৫০০ চিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। পূরা সেট্‌টির মূল্য ৩০০ টাকা। মোট ২৫ সেট

ইস্কুল কলেজ চালান। একজনও কি একটি সেট্ কিনিয়া তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়াইবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন না? আমাদের দেশের নিম্নতম ও ক্ষুদ্রতম ইস্কুলেও ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু, আমরা যত দূর জানি, ভিন্ন ভিন্ন দেশের জন্তু, গাছপালা, মানুষ, প্রসিদ্ধ ইমারৎ, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতির চিত্র কোথাও প্রদর্শিত হয় না। ভূগোলবর্ণিত পর্ব্বত, উপত্যকা, গিরিসঙ্কটাদি দেখাইবারও কোন চেষ্টা করা হয় না। পর্য্যায়ক্রমে দিবারাত্রি, কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষের আবির্ভাব, ঋতুর পরিবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয় সর্ব্বত্রই পড়ান হয়, কিন্তু অরারি (orrery) অর্থাৎ গ্রহাদিগতিদর্শক যন্ত্রের সাহায্যে কে এই সকল বিষয় শিক্ষা দেন? শিক্ষকদেরই বা দোষ কি? ইস্কুলের অধ্যক্ষেরা টাকা না দিলে এসকল যন্ত্র আসে কোথা হইতে?

এখন আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। আমরা ছেলে বেলা ৺ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বস্তুবিচার পড়িয়াছিলাম। উহাতে কাচ, রবার, তারপিন্ তেল, হিং, প্রভৃতি বস্তুর বিবরণ আছে। বোধহয় এখনও এরূপ পুস্তক বিদ্যালয়ে পড়ান হয়। তদ্ভিন্ন, চারুপাঠ এবং তৎসদৃশ সাহিত্য-পুস্তক সমূহেও বালক বালিকাগণ প্রবাল, স্পঞ্জ, প্রভৃতির বিষয় পাঠ করে। এবম্বিধ পদার্থ সকল যাহাতে বালক বালিকারা দেখিতে ও নাড়িতে চাড়িতে পায়, তাহার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত। মহাকূর্ম্ম, মহাপশু, অতিকায় হস্তী, প্রভৃতির বিষয় চারুপাঠে বর্ণিত আছে। ইহাদের কোন কোনটির প্রস্তরীভূত কঙ্কাল ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগারে (Indian Museum) রক্ষিত আছে। শিক্ষকগণ যখন ইহাদের বিষয় পড়ান, তখন জিনিসগুলি ছাত্রগণকে দেখান প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন কি? পতঙ্গভুক্ বৃক্ষের বিষয় পড়াইবার সময় শিবপুরের বাগানে যাওয়া আবশ্যক মনে করেন কি? কিন্তু কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শিক্ষক ও অধ্যাপকের ছাত্রগণকে এই স্থানগুলি দেখান কর্ত্তব্য। কেহ বা জ্ঞানাভাবে, কেহ বা অর্থাভাবে, তাহা করিতে পারেন না। ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগারের মত বৃহৎ কৌতুকাগার প্রত্যেক শিক্ষালয়ের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখা অসম্ভব। কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষালয়ের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌতুকাগার

সর্ জামযেদজী জীজীভাই।
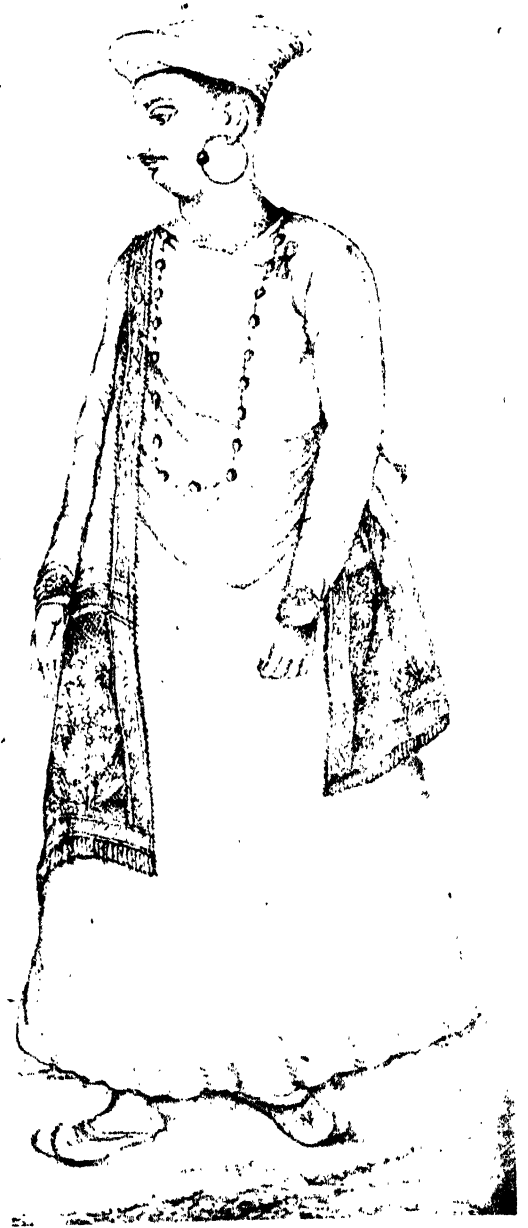
প্যাচেয়াপ্পা মুদালিয়ার।

হইলে এরূপ বস্তু সংগ্রহের একান্ত প্রয়োজন। বালক বালিকাগণ এই সংগ্রহকার্য্যে সাহায্য করিলে আরও ভাল হয়। চারুপাঠ ২য় ভাগে একটি প্রস্তরীভূত মহাকূর্ম্মের বৃত্তান্ত আছে। উহা কিরূপে প্রস্তরে পরিণত হইল, তাহাও উক্ত পুস্তকে বর্ণিত আছে। অবশ্য প্রত্যেক শিক্ষালয়ের জন্য ঐরূপ একটি মহাকূর্ম্ম পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু প্রস্তরীভূত ছোট ছোট শামুক, মাছ, প্রভৃতি সংগ্রহ করা অসম্ভব বা বহুব্যয়সাধ্য নহে। এইরূপে সকল বিষয়ের যথাসম্ভব সাক্ষাৎ জ্ঞান দিবার চেষ্টা না করিতে পারিলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কিন্তু ইহাও অর্থব্যয়সাপেক্ষ।

উৎকৃষ্ট শিক্ষালয়ের আরও দুইটি অঙ্গের উল্লেখ করিতে বাকী আছে। প্রথম, ব্যায়াম ও ক্রীড়াক্ষেত্র, দ্বিতীয়, ছাত্রাবাস। শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষা এবং তদ্দ্বারা মানসিক সুস্থতা রক্ষার জন্য অঙ্গচালন যে আবশ্যক তাহা সকলেই জানেন। এইজন্য নানাবিধ কুস্তি, ক্রীড়া, ধাবন, সন্তরণ, নৌচালন, প্রভৃতির প্রয়োজন। কিন্তু উপযুক্তরূপে ব্যবহৃত হইলে ক্রীড়াক্ষেত্র নেতৃত্ব, সহকারিতা (co operation), স্বীয় দলের জন্য নিজের স্বার্থ ও সুখত্যাগ, প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হয়। ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে, ওয়াটারলুর যুদ্ধে জয় ইটনের ক্রীড়াক্ষেত্রে লব্ধ হইয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে ইংরাজ সেনাপতি ওয়েলিংটন নিজ ইস্কুলের ক্রীড়াক্ষেত্রেই নেতৃত্বে দীক্ষা লাভ করেন। ব্যায়ামাগার ও ক্রীড়াক্ষেত্রের জন্য পাশ্চাত্যদেশ সকলে কিরূপ ব্যয় হয়, তাহা শুনিলে অনেকে বিস্মিত হইবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ মিসিগান মহাবিদ্যালয়ের উল্লেখ করিতেছি। তথায় পুরুষ ছাত্রদের ব্যায়ামাগার, ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতির জন্য ৬৫,০০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় দুই লক্ষ এগার হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। ছাত্রীদের জন্যও প্রায় এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। ব্যায়ামাদি শিক্ষা দিবার জন্য, এবং ব্যায়াম, ক্রীড়া প্রভৃতির সময় তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত লোক রাখা আবশ্যক। ছাত্রাবাসে ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও নীতির প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখা যায়, তাহারা নিজে বাসা করিয়া থাকিলে সেরূপ পারা যায় না। তদ্ভিন্ন, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই গৃহস্থালী শিখা উচিত। পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলার সহিত, নিয়মনিষ্ঠার সহিত, সময়ের মূল্য বুঝিয়া, সুশোভনভাবে কিরূপে গৃহে বাস করিতে হয়, তাহা এখনও আমরা শিখি নাই। ছাত্রাবাসে এই শিক্ষা কি দেওয়া যায় না? ছেলেদিগকে বাবু করা আমার উদ্দেশ্য নয়। অল্পব্যয়েও বহুপরিমাণে আদর্শানুরূপ গৃহস্থালী করা যাইতে পারে।

এখন দেখা গেল যে টাকা খরচ না করিলে ভাল শিক্ষা হয় না। এই টাকা কোথা হইতে আসিবে? ছাত্রদত্ত বেতন হইতে ইহার সামান্য অংশই উঠিতে পারে। তা ছাড়া, কেবল ছাত্রদের বেতনের উপর নির্ভর করিলে শাসন শিথিল হয়। এক এক শ্রেণীতে বহুছাত্র হওয়ায় পড়ানও ভাল হয় না। আমাদের গবর্ণমেণ্টও এত টাকা দিবেন না, বা দিতে পারিবেন না। সুতরাং দেশের ধনী লোকদিগকেই টাকার সদ্ব্যয় শিখিতে হইবে। আমেরিকার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের ধনীরা তথাকার ধনীদের মত সম্পন্ন নহেন। কিন্তু তাঁহাদের অপব্যয়ের টাকাটা ভাল কাজে দিলেই আপাততঃ অনেক উপকার হয়। শিক্ষাকল্পে আমেরিকার ধনীরা যেরূপ দান করেন, তাহার বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে একটি বড় বহি লিখিতে হয়। আমি কেবল দুই একটি আধুনিক দৃষ্টান্ত দিতেছি। গত জানুয়ারী মাসের আমেরিকান ম্যাচর্যালিষ্ট নামক পত্রে দৃষ্ট হয় যে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত এগার মাসে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের লোকে শিক্ষার্থে এক কোটি ষাট লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় পাঁচকোটি কুড়ি লক্ষ টাকা দান করিয়াছে। অবশ্য, ইহার সহিত উক্ত দেশের সরকারী ব্যয়ের কোন সম্পর্ক নাই। তাহা স্বতন্ত্র। এই পাঁচ কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা প্রায় আশীটি ভিন্ন ভিন্ন দানের সমষ্টি। সায়েন্স (science) নামক পত্র লিখিয়াছেন যে সম্প্রতি এক সপ্তাহে যুক্ত রাজ্যের লোকেরা শিক্ষার উন্নতির জন্য আট লক্ষ সত্তর হাজার ডলার, অর্থাৎ প্রায় আটাইশ লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এই সে দিন কার্ণেজী সাহেব, স্কটল্যাণ্ডের চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কচ্ ছাত্রগণ যাহাতে বিনাব্যয়ে পড়িতে পায়, তজ্জন্য তিন কোটি টাকা দান করিয়াছেন। এরূপ জাতি বড় হইবে না ত কি

আমরা হইব? এখন আমাদের দেশে যে সকল মহাত্মা শিক্ষার উন্নতির জন্য দান করিয়াছেন, কিম্বা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, বা যাঁহাদের প্রদত্ত সম্পত্তি শিক্ষা-কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে, তাঁহাদের কয়েকজনের দানের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দিতেছি। যে সকল সাধুচেতা ধনী ব্যক্তি নিজ আয় হইতে শিক্ষালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন, এস্থলে তাঁহাদের উল্লেখ করিব না।

মান্দ্রাজ সহরে পাচেয়াপ্পার কলেজ নামে একটি কলেজ আছে। উহা হিন্দু ছাত্রদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়; বিশেষতঃ মান্দ্রাজের হিন্দু ছাত্রদিগের জন্য। যাঁহার নামানুসারে এই কলেজের নামকরণ হইয়াছে, তাঁহার পূর্ণ নাম পাচেয়াপ্পা মুদালিয়ার। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে কঞ্জিভেরাম (কাঞ্চীপুর) নগরে পাচেয়াপ্পার জন্ম হয়। তিনি ভূমিষ্ঠ হইবার কয়েক মাস পূর্ব্বেই পিতৃহীন হন। তিনি কিছু ইংরাজী শিখিয়া "ডুবাষে"র বৃত্তি অবলম্বন করেন। সেকালে ডুবাষ অর্থাৎ দ্বিভাষীরা কতকটা দালালের কাজ করিতেন। তাঁহারা বড় বড় সওদাগরদিগের আমদানী পণ্যদ্রব্যের খুচরা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতেন, এবং যে সকল ইংরাজ সওদাগর ভাল করিয়া দেশভাষা বলিতে বা বুঝিতে পারিতেন না, অথচ দেশীয় লোকদের সাহায্যে অল্পমূল্যে দেশজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহিতেন, তাঁহাদের দালালের কাজ করিতেন। তৎকালে মান্দ্রাজের অধিকাংশ ইংরাজ কোম্পানীর চাকর হইলেও নিজ নিজ লাভের জন্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতেন। এই জন্য দ্বিভাষীদের বড় আদর ছিল। তখন দেশের লোক এবং ইংরাজের মধ্যে মধ্যবর্ত্তিতা করিবার জন্য, একের ইচ্ছা ও প্রয়োজন অপরকে জানাইবার জন্য, আর কেহ না থাকায় ডুবাষদের খুব প্রভাব ও রোজগার ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেবল দু একজন ইংরাজী লিখিতে পারিতেন, অধিকাংশই পারিতেন না, ভাঙ্গা ইংরাজী বলিয়া কোন প্রকারে কাজ চালাইতেন। কিন্তু সকলেই শুভ্র মসলিনের পোষাক, উজ্জ্বল জরী বসান শাল এবং পাগড়ী পরিধান পূর্ব্বক, প্রকাণ্ড মাঁকড়ী ও মরকতের দুল, হীরক ও পদ্মরাগমণি-খচিত বালা, স্বর্ণ মেখলা, অঙ্গুরী এবং মূল্যবান হার পরিয়া লাল রুমাল হাতে করিয়া মান্দ্রাজের রাজপথে যাতায়াত করিতেন। যান, হয় পাল্কি, নয় এক প্রকার সুরঞ্জিত গোশকট। ডুবাষের কর্ম্ম করিয়া পাচেয়াপ্পা নিজ ব্যবসাবুদ্ধি ও সাধুতার দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। অন্যান্য অনেক উপায়েও তিনি অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি ধর্ম্মকার্য্যে ও সংস্কৃত বিদ্যায় উৎসাহদানার্থ বহু অর্থ ব্যয় করিতেন।

পাচেয়াপ্পা মুদালিয়ারের কেবল একটি কন্যাসন্তান ছিল। তিনি মৃত্যুকালে দেবসেবায়, দরিদ্র ব্যক্তিদিগের সাহায্যের জন্য, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী সকলের উন্নতির নিমিত্ত, এবং অন্যান্য সৎকার্য্যে ব্যয়ার্থে নিজ সমগ্র সম্পত্তি দিয়া যান। তাঁহার প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে প্রথমতঃ তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ব্যয় হয় নাই। উহা জমিয়া সাড়ে সাত লক্ষ টাকা হয়। তাহার সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা লইয়া ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারে একটি কলেজ ও কতকগুলি বৃত্তি স্থাপন করা স্থির হয়।

জামষেদ্‌জী জীজীভাই পার্সিজাতীয়, তিনি ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সেই তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে মানুষ করেন। জীজীভাই বাল্যকালে গুজরাতী ও কিছু ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। তিনি ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে একটি বাণিজ্যজাহাজে কেরাণীর কাজ লইয়া চীনদেশ যাত্রা করেন। তখন তাঁহার পুঁজি প্রায় ১২০ টাকা। তিনি বোম্বাই ফিরিয়া আসিয়া নিজ সাধুতা-প্রভাবে ৩৫,০০০ টাকা ঋণ করিয়া ব্যবসায়ে খাটান। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি তাঁহার প্রায় দুই কোটি টাকা পরিমিত সম্পত্তির অধিকাংশ অর্জ্জন করেন। তিনি বিখ্যাত দাতা ছিলেন। কি কি কার্য্যে কখন কত টাকা দান করেন, কেবল তাহার একটি তালিকা দিতে গেলেও আমাদের প্রবন্ধটি অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িবে। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ২৫ লক্ষ টাকা দান করেন। আমরা এখানে কেবল তাঁহার শিক্ষা ও সাহিত্যের উন্নতি কল্পে প্রদত্ত দানের উল্লেখ করিব। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট জামষেদজী জীজীভাইকে নাইট্ উপাধী দেন। তদবধি তিনি সর্ জামষেদ্‌জী জীজীভাই নামে পরিচিত। তাঁহার বন্ধুগণ এই উপলক্ষে তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার সময় "সর্ জামষেদজী জীজীভাই অনুবাদ ফণ্ড" নামক একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করেন। উৎকৃষ্ট নানাবিধ পুস্তক গুজরাতী ভাষায় অনবাদ ইহার উদ্দেশ্য। সর জামষেদজী
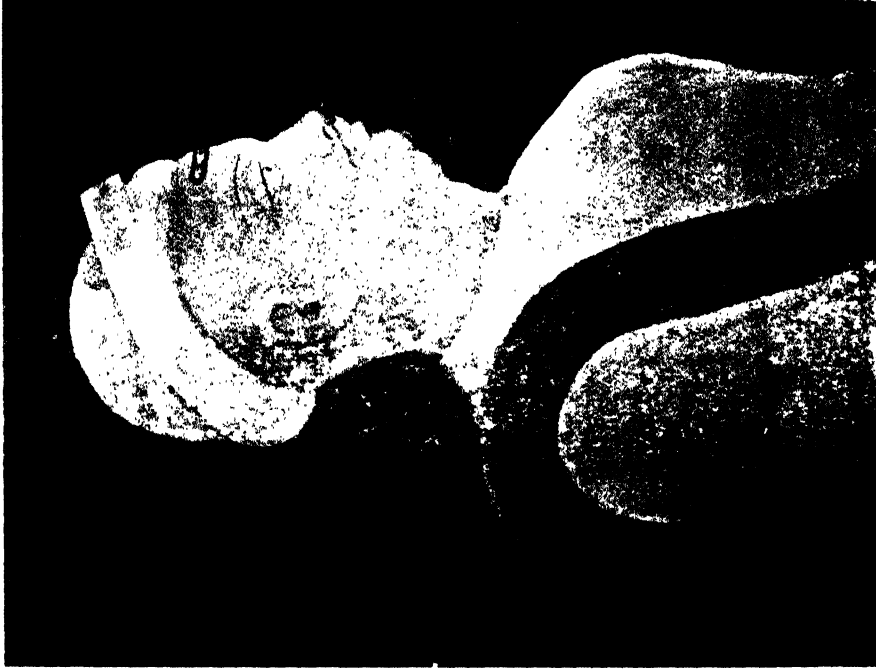
Photo from a painting] [By Prof. N. C. Nag.

পণ্ডিত গঙ্গাধর শাস্ত্রী পটবর্দ্ধন।

মুন্সী কালীপ্রসাদ কুলভাস্কর।

নিজে এই ফণ্ডে তিন লক্ষ টাকা দান করেন। তৎপরে তিনি দরিদ্র পার্সিদিগের সাহায্যার্থ এবং তাহাদের পুত্র কন্যাদের শিক্ষাবিধানার্থ আশ্রম ও কয়েকটি ইস্কুল স্থাপন করেন। তিনটি ইস্কুল বালিকাদিগের জন্য। তিনি অতঃপর এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে সর জামষেদজী জীজীভাই শিল্প ও বিজ্ঞান বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিখ্যাত ম্মাত্রে এই স্কুলের ছাত্র।

পণ্ডিত গঙ্গাধর শাস্ত্রী পটবন্ধন বরোদানিবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন উত্তর ভারত জয় করিয়াছিলেন, তখন মথুরাকে আপনাদিগের রাজধানী করিয়াছিল। শাস্ত্রী মহাশয় সেই সময় মথুরাতে বাস করিতেন। সেখানে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার একটি চতুষ্পাঠী ছিল, এবং যাহারা তীর্থযাত্রা করিবার জন্য মথুরাতে আসিত, তাহাদিগের থাকিবারও বন্দোবস্ত তিনি করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় মহারাজা সিন্ধিয়া তাঁহাকে এই কার্য্যের সাহায্যের জন্য ৫ খানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ইংরাজ সেনাপতি লর্ড লেক মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজিত করিয়া ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে আগ্রা, আলিগড়, প্রভৃতি স্থান সকল ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু ইংরাজেরা শাস্ত্রী মহাশয়ের গ্রামগুলি তাঁহার নিকট হইতে লন নাই, অতি সামান্য কর গ্রহণ করিতে থাকেন। শাস্ত্রী মহাশয় বিবাহ করেন নাই। তাঁহার কয়েকজন ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল। কিন্তু তাহারা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অনুপযুক্ত ছিল। সেই জন্য তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে উইল করিয়া উক্ত গ্রামগুলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতির জন্য এবং তীর্থযাত্রীদিগের সুবিধার জন্য দান করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ এই স্থির করেন যে ঐ গ্রামগুলির মধ্যে ৩টী গ্রামের উপস্বত্ব হইতে আগ্রা কলেজের কতক ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে এবং অপর ২টী গ্রাম হইতে মথুরায় যাত্রীর হাসপাতালের খরচ চলিবে। তদনুসারে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে যখন আগ্রা কলেজ সংস্থাপিত হয়, সেই অবধি ঐ তিন খানি গ্রামের উপস্বত্ব আগ্রা কলেজে আসিতেছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুর পর এবং আগ্রা কলেজ সংস্থাপনের পূর্ব্বে ঐ গ্রামগুলির উপস্বত্ব কোম্পানির হস্তে জমা ছিল। তাহাতে ১,৭৮,০০০ টাকা হয় এবং ঐ টাকাতে কোম্পানির কাগজ কেনা হইয়াছিল। ঐ কলেজের সুদও আগ্রা কলেজ পাইতেছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের দান হইতে আগ্রা কলেজ বৎসরে ২২,০০০ টাকা পান।*

স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর বঙ্গদেশে সুপরিচিত। তিনি জনহিতকর নানা কার্য্যে প্রভূত অর্থ দান করিয়াছিলেন। এখানে কেবল তাঁহার ঠাকুর আইন অধ্যাপকতা সম্বন্ধীয় দান উল্লেখ্য। এই কার্য্যে তিন লক্ষ টাকা উৎসর্গীকৃত হয়।

প্রাতঃস্মরণীয় হাজী মহম্মদ মহসীন প্রদত্ত সম্পত্তি হইতে আজিও বঙ্গের সহস্র সহস্র মুসলমান ছাত্র বহুসংখ্যক ইস্কুল ও কলেজে ন্যূনবেতনে পড়িতে পাইতেছে। হুগলী কলেজ তাঁহারই পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে প্রতিষ্ঠিত হয়। মহসীন ফণ্ডের পরিমাণ প্রায় ৯ লক্ষ টাকা।

সর্ মঙ্গলদাস নাথুভাই বোম্বাইয়ের কোপল বণিক জাতির শেঠ বা দলপতি ছিলেন। শিক্ষার জন্য দান ব্যতীতও তাঁহার অনেক সুকীর্ত্তি আছে। তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০,০০০ টাকা দান করেন। উহা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হিন্দুছাত্রগণের জন্য একটি "ভ্রমণ বৃত্তি" (Travelling Fellowship) স্থাপিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উইল অনুসারে তাঁহার পুত্রগণ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই টাকার আয় হইতে কয়েকটি বৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রগণকে শিল্পশিক্ষার্থ ইংলণ্ডে অন্যূন তিন বৎসর বাস করিতে হয়।

মুন্সী কালীপ্রসাদ হিন্দুস্থানী কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তি এলাহাবাদের কায়স্থপাঠশালা। ইহার জন্য তিনি স্বোপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া যান। সম্পত্তির মূল্য প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা। সর্দ্দার দয়াল সিংহের উইলের মোকদ্দমার এখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই। সুতরাং

---

*পণ্ডিত গঙ্গাধর শাস্ত্রী সম্বন্ধীয় বৃত্তান্তটির জন্য আমি আগ্রা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীলমণি ধর মহাশয়ের নিকট ঋণী। শাস্ত্রী মহাশয়ের ফোটোগ্রাফ খানির জন্য আমি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশয়ের নিকট ঋণী। যে চিত্রখানি হইতে ফোটোগ্রাফ লওয়া হয়, তাহা ভাল না থাকায় ছবি ভাল হয় নাই। — সম্পাদক

তাঁহার সম্পত্তি শিক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত হইবে কি না এখনও বলা যায় না। শ্রীযুক্ত জামষেদজী নসেরবাজী তাঁহার ৩০ লক্ষ টাকা দানের অঙ্গীকারের কথা সকলেই অবগত আছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্ ছাত্র প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির কথা না শুনিয়াছেন? এই বৃত্তির স্থাপয়িতা বিখ্যাত বণিক শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ এখনও জীবিত আছেন। তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ লক্ষ টাকা দানকরেন। উহার সুদ হইতে বার্ষিক ১৪০০. টাকা পরিমিত পাচটি বৃত্তি দেওয়া হয়। পূর্ব্বে কোন উপযুক্ত ছাত্র একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেই তাঁহাকে ৫ বৎসর ধরিয়া বৃত্তি দেওয়া হইত। এখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেও গবেষণা ও বিজ্ঞানুশীলনের পরিচয় দিতে হয়। এই পরিবর্ত্তনটি বড়ই ভাল হইয়াছে।

স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহোদয় ১৮৯৪ অব্দের ৬ই জানুয়ারি তারিখে স্বীয় জনকের নামে "বিশ্বনাথ ফণ্ড" ধনভাণ্ডার স্থাপনপূর্ব্বক উহাতে স্বোপার্জ্জিত দেড় লক্ষ টাকার কাগজ এবং এডুকেশন গেজেট সংবাদ-পত্র ও বুধোদয় যন্ত্র—মোট একলক্ষ যাটি হাজার টাকার সম্পত্তি—প্রধানতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চ্চার এবং কিয়ৎপরিমাণে দাতব্য চিকিৎসার সাহায্যার্থে দান করেন।

বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। কয়েক মাস হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইয়ুরোপে গিয়া শিল্প শিক্ষার জন্য বৃত্তি স্থাপনার্থ তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলাম যে ভাগলপুরের বিখ্যাত উকীল ৬ সূর্য্যনারায়ণ সিংহ বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

গ্রন্থকারমাহাত্ম্য।

[বঙ্কিমচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণে]

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে গ্রন্থকার নামক অপূর্ব্ব মনুষ্যজাতির উল্লেখ করিলেন, তাঁহারা ধরিত্রীর কোন খণ্ডে আবির্ভূত হইবেন, এবং জগতের কোন মহাকার্য্য সাধন করিবেন? তাঁহাদিগের কথা শুনিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিতেছে, অতএব আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই গুহ্য বৃত্তান্ত সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! গ্রন্থকারগণ কলিযুগের সন্ধ্যা-মুহূর্ত্তে এই ভারতভূমিতেই অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহারা নানা স্থানে, নানা প্রকারে প্রকটিত হইবেন। তাঁহাদিগের চক্ষু কোটরগত, কেশ রুক্ষ, বসন মলিন ও জীর্ণ, তাঁহাদিগের কটাক্ষ কুটিল, গতি কুটিল, এবং চিত্তও কুটিল।

যিনি মাতৃভাষায় অনভিজ্ঞ এবং অপর ভাষা যাঁহার পক্ষে বিষবৎ, তিনিই গ্রন্থকার।

যাঁহার রসনাগ্র ক্ষুরধার ও যাঁহার লেখনীর অগ্রভাগ সম্পূর্ণ ধারশূন্য, তাঁহাকেই গ্রন্থকার বলিয়া জানিবেন।

লক্ষ্মী যাঁহার দ্বারে পদার্পণ করেন না এবং যাঁহার প্রতাপে সরস্বতী পদ্মাসন ত্যাগ করিয়া সমুদ্রপারে পলায়ন করেন, তিনিই নিশ্চিত গ্রন্থকার।

হে মহাভাগ! সে কালে সংস্কৃত ব্যতীত আরও অনেক ভাষা জগতে প্রচলিত হইবে। যিনি সেই সকল ভাষা না জানিয়া তৎসমুদয়ের শ্লোক উদ্ধৃত করিবেন তিনিই গ্রন্থকার।

যাঁহার গৃহে রন্ধনশালায় অগ্নি জলে না, কিন্তু যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা ঈর্ষাগ্নি জলিতে থাকে, তিনিই গ্রন্থকার।

যিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থের বিজ্ঞাপন স্বয়ং রচনা করেন এবং সেই বিজ্ঞাপনে আপনাকে ব্যাসবাল্মীকির সমকক্ষ বলিয়া বর্ণনা করেন, তিনি গ্রন্থকার ব্যতীত আর কেহ নহেন।

যিনি স্বরচিত পুস্তকের স্বয়ং সমালোচনা করেন এবং সেই সমালোচনা অপরের নামে অন্য পত্রে প্রকাশ করেন, তিনিই গ্রন্থকার।

যাঁহার নাসিকায় মসিচিহ্ন ও পৃষ্ঠে কষাচিহ্ন, তাঁহাকে অভ্রান্তরূপে গ্রন্থকার বলিয়া জানিবেন।

যিনি গৃহে গৃহিণীর সমাদর প্রাপ্ত হন না ও বাহিরে পাঠকের সমাদর প্রাপ্ত হন না, তিনিই গ্রন্থকার।

যিনি পুস্তকবিক্রেতারূপী সূর্য্যকে গ্রহ উপগ্রহ রূপে প্রদক্ষিণ করেন, যিনি পুস্তকবিক্রেতা রাজাধিরাজের পারিষদরূপে তাঁহার পদতলে উপবিষ্ট হইয়া রসিকতার ভাণ করেন, তাঁহাকে নিশ্চিত গ্রন্থকার বলিয়া জানিবেন।

যিনি পুস্তকবিক্রেতার দ্বারে বিক্রয়লব্ধ পুস্তকের মূল্যের

জন্য, বা তদভাবে ভিক্ষার জন্য, দণ্ডায়মান থাকেন, তিনিই গ্রন্থকার।

যিনি স্বপ্রণীত পুস্তকে কোন ব্যক্তির যশোগান করিয়া তাঁহার নিকট কিছু প্রত্যাশা করেন তিনিই গ্রন্থকার।

যিনি গ্রন্থহস্তে সমালোচকের দ্বারে উপনীত হন, ও সমালোচনা মনোমত না হইলে সে দ্বার ত্যাগ করেন, তিনিই গ্রন্থকার।

হে রাজন্! সে কালে টেক্‌স্‌ট্ বুক কমিটী নামক একটী গূঢ় মন্ত্রণাসমিতি গঠিত হইবে। সেই সমিতির সভ্য-মহোদয়ের গৃহে উপনীত হইয়া তাঁহার পৌত্র ও দৌহিত্রকে যিনি ক্রোড়ে লইয়া ক্রীড়নক প্রদান করিবেন, তাঁহাকে গ্রন্থকার বলিয়া সংশয় করিবেন।

যিনি রাজপুরুষের সাক্ষাতে গমন করিয়া রাজভাষায় কথোপকথন করিতে অক্ষম, তিনিই গ্রন্থকার।

মহারাজ! গ্রন্থকারগণের গুণাবলী আমি এই কথঞ্চিৎ বর্ণন করিলাম। তাঁহাদিগের সমগ্র গুণগ্রাম স্বয়ং ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে কীর্ত্তন করিতে অক্ষম।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন! গ্রন্থকারমহাশয়দিগকে দূর হইতে নমস্কার করি। আপনি অপর প্রসঙ্গ উত্থাপন করুন।

প্রবাসী।

প্রবাসী! প্রবাসী বটে ভব পান্থশালে
ক্ষণিকের জীব মোরা! অজ্ঞাত অতীতে,
কোথা হ'তে এসেছিনু; চলিতে চলিতে,
যাইব অচিরে কোন্ অন্ধ অন্তরালে!
অনন্ত এ বিশ্বে, তবু, সান্ত দেশকালে
খুঁজি মোরা চিরগেহ; চাহি চারিভিতে,
সন্ত্রস্ত, চকিত চিতে,—যবে জানাইতে
প্রবাসের শেস, আসে মরণ অকালে!

হে প্রবাসী! একি ভুল? স্ববাস, প্রবাস
সকলি অলীক মায়া; কেন তা জান না?
আপনার মাঝে তব ভূত ভবিষ্যৎ,—
জগৎ তোমারি মনে!—তুমি অবিনাশ।
দেশ কাল সীমা শুধু মায়ার ভাবনা;
অনাদি অশেষ আত্মা, আত্মার জগৎ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

পর পৃষ্ঠায় যে চিত্রটি দেওয়া গেল, উহা লাল ইণ্ডিয়ান্ বা আমেরিকার আদিম নিবাসী কতকগুলি ব্যক্তির একখানি দরখাস্ত। তাহারা আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতির নিকট সুপীরিয়র হ্রদের (১০) নিকটবর্ত্তী কতকগুলি হ্রদের (৮) স্বত্বের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। প্রথমে ভিন্ন ভিন্ন ছবিগুলির অর্থ বুঝা চাই। তৎপূর্ব্বে আর একটি কথা জানা দরকার। ইণ্ডিয়ানদের এক এক গোত্রের এক একটি টোটেম (totem) আছে। এই টোটেমটি কোন জড় বস্তু, উদ্ভিদ্ বা ইতর প্রাণী হইতে পারে। এক গোত্রের লোকেরা এই টোটেমের বংশজাত ও তাহার সহিত আপনাদিগকে অদৃশ্য গূঢ় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ মনে করে। যদি মাছ কাহারও টোটেম হয়, তাহা হইলে সে মাছের প্রাণ বধ করা বা মাছ ভক্ষণ করা মহাপাপ মনে করে। টোটেম বধ বা ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ, কখন কখন টোটেম স্পর্শন বা দর্শন পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। ইণ্ডিয়ানেরা আপনাদিগকে টোটেমের নামে অভিহিত করে এবং শরীরে টোটেমের ছবির উল্কি ধারণ করে। এক্ষণে দরখাস্তটির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। দরখাস্তকারীদের দলপতি অঙ্কাবাবিসের টোটেম বক। এইজন্য একটি বক (১) দ্বারা তাহাকে সূচিত করা হইয়াছে। তাহার অনুচরদের কাহারও টোটেম ভালুক, কাহারও ক্ষুদ্র কচ্ছপ, কাহারও মার্টেন নামক নকুলসদৃশ জন্তু, আবার কাহারও টোটেম বা নরমৎস্য (৬)। এইজন্য অনুচরেরাও দলপতির মত নিজ নিজ টোটেম দ্বারা সূচিত হইয়াছে। অনুচরদের চোখ এক একটি রেখা দ্বারা দলপতির চক্ষুর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে তাহাদের মত এক। তাহাদের হৃৎপিণ্ডগুলিও এই রূপে যুক্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে তাহাদের ভাবের (feeling) ঐক্য আছে। দলপতির চক্ষু হইতে একটি রেখা যুক্তরাজ্যের সভাপতি মহাশয়ের দিকে গিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে আবেদনটি তাঁহারই নিকট করা হইয়াছে। আর একটি রেখা, কিসের জন্য দরখাস্ত করা হইতেছে, তাহা বুঝাইবার জন্য (৮) চিহ্নিত হ্রদগুলির দিকে গিয়াছে। কিরূপে লিখনের সৃষ্টি

হয়, তাহা বুঝিবার পক্ষে সাহায্য হইবে বলিয়া এই অদ্ভুত দরখাস্তটির অবতারণা করিয়াছি। সংক্ষেপে লিখনবিদ্যার ক্রমবিকাশ এইরূপে হইয়াছে বলিয়া বোধহয়। প্রথমে কোন বস্তু বা জন্তু বুঝাইতে হইলে তাহার চিত্র আঁকা হইত। তাহার পর কোন গুণ বা ভাব বা মানসিক অবস্থা বুঝাইতে হইলে তদুপযোগী ছবি আঁকা হইত। যেমন, গেল। এই করাতদ্বটির সাহায্যে বোল্‌তা কাঠ কাটিয়া সূক্ষ্ম করাতের গুঁড়ার মত গুঁড়া প্রস্তুত করে। তাহার পর নিজ মুখনিঃসৃত শিরিশের মত চট্‌চটে লাল মাথাইয়া এই গুঁড়াগুলির তাল পাকায়। তাহার পর এই মণ্ডটিকে জিহ্বা, ঠোঁট ও পায়ের দ্বারা বিস্তৃত করিয়া কাগজ প্রস্তুত করে। তাহার ছোট ছোট কামরাগুলি এই কাগজ দ্বারা নির্ম্মিত হয়।
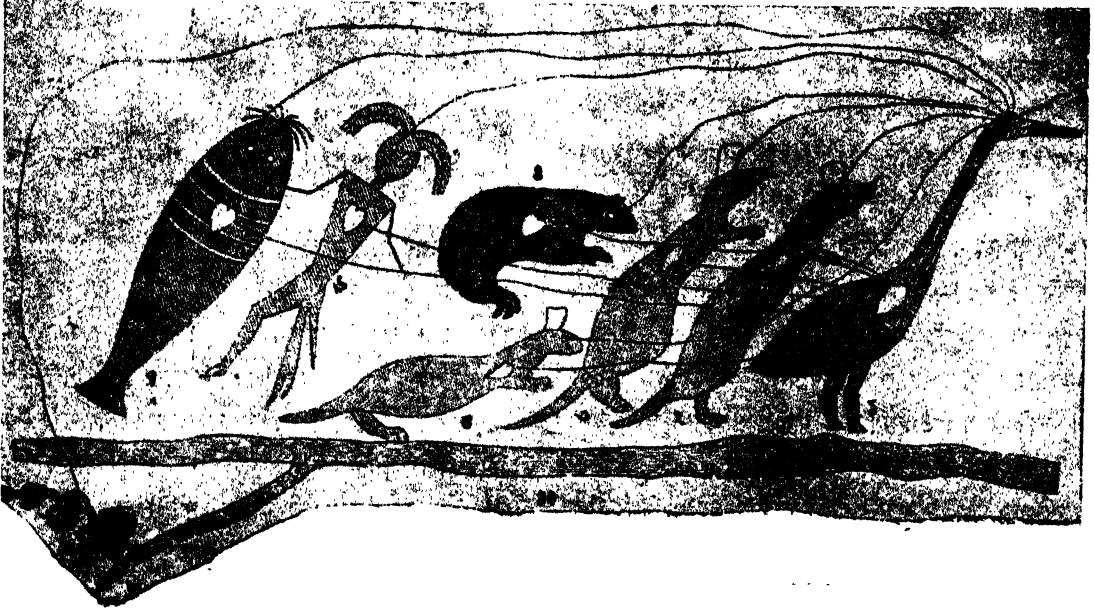
ধূর্ত্ততা বুঝাইবার জন্য শৃগালের, আনন্দ বুঝাইবার জন্য নৃত্যগীতপরায়ণা নারীর চিত্র। তাহার পর শৃগালের ছবি দ্বারা হয়ত কেবল শৃ এই অক্ষর (syllable) টি বুঝাইত। ক্রমে উহা কেবল "শ্‌" এই ধ্বনিসূচক একটি বর্ণে পরিণত হয়। অবশ্য ইহা একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্ত মাত্র। সকল দেশেই যে এই ক্রম অনুসারে লিখনবিদ্যার বিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা নয়।

***

কে প্রথমে কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিল, কেহই বলিতে পারে না। কোন্ জাতি প্রথমে কাগজ প্রস্তুত করে, তদ্বিষয়ে ততো সন্দেহ নাই। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মতে মিসর দেশের লোকেরাই প্রথমে কাগজ প্রস্তুত করে। চীনারাও বহু প্রাচীন কাল হইতে কাগজ তৈয়ার করিয়া আসিতেছে। কিন্তু মানুষের আগে আর একটি ক্ষুদ্র জীব কাগজ প্রস্তুত করিতে জানিত এবং এখনও কাগজ প্রস্তুত করিতেছে। তাহা বোল্‌তা। বোল্‌তার মুখে দুটি ধারাল করাত আছে। তাহার বর্দ্ধিতায়তন ছবি এখানে দেওয়া

মানুষেও আজকাল কাষ্ঠমণ্ড দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করিতেছে। ছেঁড়া কাপড় হইতে প্রস্তুত কাগজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কাষ্ঠমণ্ডের কাগজ সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা। কিন্তু অল্লাধিক পরিমাণে ছেঁড়া কাপড় ব্যবহার না করিলে কোন পদার্থ হইতেই কাগজ প্রস্তুত হয় না। আজকাল আমেরিকায় কাপাসের বীজের খইল হইতে কাগজ তৈয়ার করিবার চেষ্টা হইতেছে। চেষ্টা সফল হইলে এই কাগজই সকলের চেয়ে সস্তা হইবে।
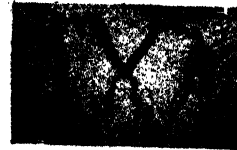
আমাদের দেশে সাবে বা বাবুই ঘাস হইতে সস্তাকাগজ প্রস্তুত হয়। অন্বেষণ করিলে আমাদের দেশে কাগজ প্রস্তুত করিবার উপযোগী আরও অনেক উদ্ভিদ্ পাওয়া যাইতে পারে।

প্রবাসী
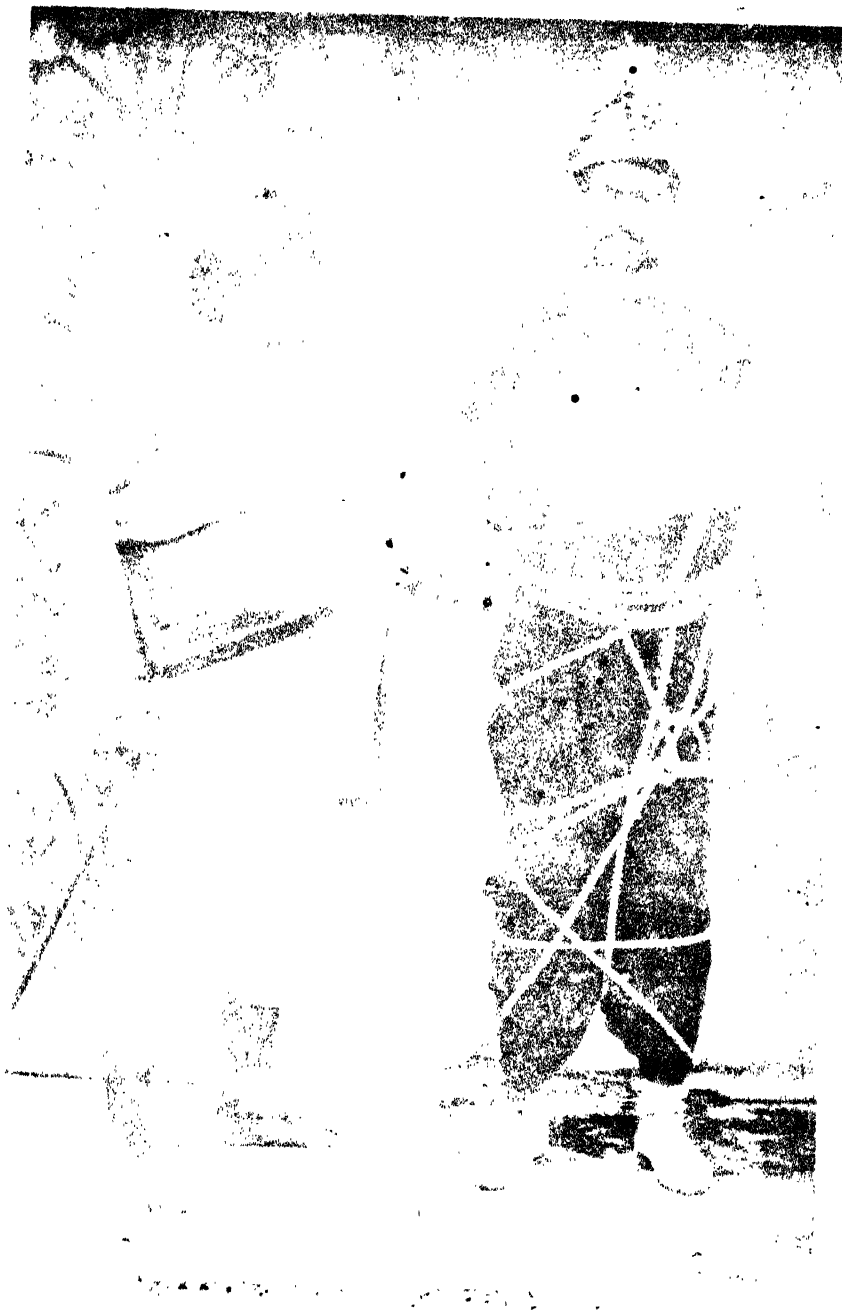
আষাঢ়, ১৩০৮। { ৩য় সংখ্যা

মুখে ছোটে, বিন্দি দাসী হেসে হ'ল সারা।
সে হাসি-নির্ঝরে ভাসি, যত দাস দাসী
দেয় উলু।—রাঙাদিদি, মহাক্রোধে আসি,
রাঙাইয়া দুই আঁখি, কহেন, "সাবাসি
তোদের উলুর কাণ্ড! হারাইলি জ্ঞান,
ওলো বিন্দি!—বহাইয়ে আনন্দ-তুফান,
বহাইয়ে দিবি কি লো সমস্ত কাটরা? *
সাবাসি বুকের পাটা! হাসির কি গর্‌রা!
কোথা বিয়া! কোথা বর! কিছু নাহি ধার্য্য!
হা! দেখ্ হাসির ঘটা, উলুর ঐশ্বর্য্য!"
দত্তজা (বাড়ির কর্ত্তা) সে মধ্যাহ্নকালে
অন্তঃপুরে, নিজকক্ষে, আল্‌বোলা গালে
পুরি, ছিলেন আরামে। তাম্রকূট-ধূম
আনিত, মুহূর্ত্ত-পরে, আনন্দের ঘুম!
এ উলু-চীৎকার শুনি, নাসিকার ডাক
গেল থামি; ধায় বুড়া, হইয়া অবাক্!
"কি হয়েছে? কি হয়েছে?"
"বর আসিয়াছে!"
গৃহিণী হাসিয়া কন, "মরে কি হ'য়েছে
তোদের লো বিন্দি দাসী?"—বিন্দি হাসি কয়,
"বাহিরে এসেছে বর,—এসেছে নিশ্চয়!—
উলু, উলু, উলু, উলু!—কন্যা তব ধন্যা;—
এমন সুন্দর বর!"
"এ হাসির বন্যা
থামাইব ঝাঁটা পিটি!" রাঙাদিদি রাগি
ছুটিলেন গৃহকোণে, সম্মার্জ্জনী লাগি!
গৃহিণী হাসিয়া কন, ধীরে ঝাঁটা কাড়ি,
"ছোট খুড়ি! দাসী মাগি এত বাড়াবাড়ি
করিতেছে! আছে কিছু ইহার ভিতর!
চল জানেলার কাছে, চল মা সত্বর!"

এখনো বিবাহ-দিন হয় নাই ধার্য্য।
এখনো টাকার পণ (আসল যা কার্য্য)
হয় নি জোগাড়। কর্ত্তার ভাবী বেয়াই
(ম'রে যাই ল'য়ে তাঁর গুণের বালাই!)
চাহিয়াছিলেন পূর্ব্বে বিশ হাজার মুদ্রা!
দত্তবাবু-চক্ষু হ'তে পলাইল নিদ্রা
সে প্রস্তাব শুনি! বহু বাক্যব্যয়,
বহুপত্র-লেখালিখি করিল উভয়
পক্ষ। শেষ কথা পরে, হইল নিশ্চয়,
বরকর্ত্তা লইবেন দশ হাজার মুদ্রা

চিন্তা-রাক্ষসীটি কিন্তু দিবানিশি বক্ষে
শুষিছে রুধির! বাপু, টাকাটা কি কম?
বঙ্গের বেয়াই! তুমি মানুষ? —না যম?

"উলু, উলু, উলু, উলু!" —সে আনন্দ ধ্বনি
ঘটাইল অন্তঃপুরে রঙ্গ রণ-রণি!
না হইতে 'আশীর্ব্বাদ' আসিয়াছে বর —
বধূ ও কন্যার দল ভাবিয়া কাতর!
শুধু এ উলুর নেশা ধরিল সবারে।
পাড়ার রূপসীদল, কাতারে, কাতারে,
ছুটিল গবাক্ষদ্বারে, জানেলার ধারে!
এ মধ্যাহ্নকালে তারা বিন্তি, গ্রাবু, পাশা,
খেলিতে আসিয়াছিল। হেরিতে তামাসা
ছুটিল সকলে। বল, কোন বাঙ্গালিনী
নীরবে বসিতে পারে, শুনি উলুধ্বনি?
কাহারো মোহন খোঁপা হইয়া চঞ্চল
ধরিল ভুজঙ্গবেশ। কাহারো অঞ্চল
ভূমিতে লুটায়ে পড়ি, মাথা খুঁড়ি বলে,
"হে সুন্দরি, ধলা দিয়া তুমি যাবে চ'লে?
তাও কভু হয়? পাদপদ্ম দয়া করি
মহিমাগৌরবে রাখ, হে বর-সুন্দরি,
এদেহ-উপরি! মম এ ক্ষৌম জীবন
হউক সফল, ধরি ও রাঙ্গা-চরণ"!
কোনো ধনী, স্বামীর বিনামা হস্তে ধরি,
ধলি ঝাড়ি, রাখিতেছিলেন যত্ন করি
সজ্জা গৃহে। অকস্মাৎ উলুধ্বনি শুনি
হরিণী শুনিল যেন বাঁশরীর ধ্বনি!
অন্যমনা হ'য়ে ধনী, মাথায় বহিয়া
জুতাজোড়া, তীরবেগে চলিল ছুটিয়া!
কোন বধূ তাম্বুলটি সাজিয়া যতনে
আনিতেছিলেন হর্ষে, দিতে সখী জনে।
কোথা সখী? অকস্মাৎ উলুর মুরলী
শুনি ধনী, শিষ্টাচার সব গেল ভুলি!
পুরি দিয়া সাজাপান আপন অধরে

কোনো ধনী [illegible]
কক্ষে পশি, [illegible]
ছুটিল বগলে [illegible]
তনয়বৎসলা [illegible]
মধে পুরি [illegible]
শুনি সে উ[illegible]
পিছে ক্ষুদ্র [illegible]

বাহিরে অন্[illegible]
উপস্থিত ভ[illegible]
বঙ্গের কৃতী [illegible]
সকলে অবা[illegible]
কর্ত্তা কন হা[illegible]
কর দেখি ডা[illegible]
ভবিষ্যজামাই [illegible]
দড়াদড়ি দিয়া [illegible]
বেঁধেছে কি ল'য়ে যেতে বাতুল-আগারে?"
সহাস্যে ডাক্তার কন, "এ মস্ত ব্যাপারে
নাহি মম হস্ত! your son-in-law is sound,
Can't guess why with ropes he is bound."
ছিলা বসি মধ্যস্থলে শ্রীরাম দারোগা।
কৌতুক-বিষাদে কন, "আমি কি অভাগা!
এত দড়াদড়ি, তবু মাথায় টোপোর!
অপরের করধৃত, তবু নহে চোর!"

এতক্ষণ চুপ করি, সব রসিকতা
লোকটি শুনিতেছিল, বিনা কোন কথা!
সহাস্যে পিয়ন কহে, "ডাকের পেয়াদা
আমি। বাবু! আপনারা নূতন কায়দা
শোনেন নি? এবৎসর হইয়াছে জারি।
আমারে বকসিস্ দাও, যাই অন্য বাড়ি!
সন্ধ্যা হবে; লও এই নূতন জলাহা!
তৃষ্ণায় বরের মুখ শুকায়েছে আহা!
দশহাজার টাকা দিয়া, ভি পি প্যাকেট্

লও বাবু ; আমি যাই, হইতেছে লেট্ !"
পিয়নের কথা শুনি, হাসিল সকলে
উচ্চশব্দে ! অনেকেই ভি পি পার্সেলে
শুধাইল, "ওহে বর ! দ্বিতীয় পিক্‌ইক্,
ওহে ডন্ কুইক্‌সোট্, অঙ্গদ রসিক,
কথা কও, শুনি অঙ্গদের রায়বার,
কেমনে লাঙ্গুলদণ্ডে, লোভেতে কলার,
অপার সমুদ্র লঙ্ঘি, আইলে এ পার ?"
পাশে ছিল বসি তথা সাহিত্য-আনন্দ,
'প্রবাসী'র সম্পাদক, বন্ধু রামানন্দ।
তাহারে বলিনু আমি, "এত দিন পরে
তোমার ভবিষ্যবাণী, অক্ষরে, অক্ষরে,
ফলিয়াছে ! তুমি যারে 'সঞ্জীবনী'-পত্রে
কল্পনায় হেরেছিলে, এ প্রয়াগক্ষেত্রে
এই দেখ আসিয়াছে সত্যই সে বর,
ভি পি পার্শেলেতে মরি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর !"
বন্ধু কন, "ধন্য এই postal invention !
Truth is surely stranger than fiction."
বালকেরা দিল সবে মহা হাততালি !
বরের কানের কাছে গিয়া শত গালি
দিল কেহ —"বর তুমি বড়ই উল্লুক !
বিংশ শতাব্দীর তুমি কেল্লুয়া ভল্লুক !
কোন মল্লুকের 'জু'র কোন জানোয়ার
বর তুমি ? কানমলা খাও দশহাজার !"
"উলু, উলু, উলু, উলু !" —একি গণ্ডগোল !
অদ্ভুত পারসেল্ দেখি সবাই পাগল !
এত উলু উলু ধ্বনি, এত যে আনন্দ,
গৃহকর্ত্তা রামদত্ত তবু নিরানন্দ !
ছেলেটি কার্ত্তিক যেন, বড়ই সুন্দর !
পুষ্পসম সুপ্রফুল্ল, হাস্য মনোহর,
এম-এ পাশ্, ওকালতি অতি শীঘ্র দিবে -
এ হেন জামাই-রত্ন ভাগ্যে কি ঘটিবে ?
দীর্ঘশ্বাস ফেলি কর্ত্তা, কহিলা গম্ভীরে
ডাকের পেয়াদাটিরে, অতি ধীরে ধীরে,
"প্যাকেটে জামাই আসা এ বড় অদ্ভুত !
পাঁচটি হাজার টাকা কেবল প্রস্তুত
আছে আজি, কালি দিব ধারধোর করি :
জামা'য়েরে খুলে দাও, কাটি দড়াদড়ি !"
ডাকের পেয়াদা ছিল ইংরাজিনবিশ।
সে বলিল, "দেখ বাবু কি strict notice.
'To your address the bridegroom is sent
Can't be delivered without full payment."

কথা শুনি, কর্ত্তাটির সুদীর্ঘ নিশ্বাস
বহিল। আমরা তার মাথায় বাতাস
করিয়া, কহিনু চুপে, "লিখুন 'Refused';
কাশীর কৌশল, তব বেয়াই কি goose !
নালিশ করিবে যবে, দেখে লব সবে,—
যা করে গোসাঁইজি, এবে ভাবিয়া কি হবে ?"
এত বলি, ক্ষুদ্র এক কাগজ উপরে
লিখিয়া Refused কথা, বৃহৎ অক্ষরে,
গঁদ দিয়া আঁটি দিনু বরের কপালে !
হাসিয়া উঠিল সবে। বাতায়ন-জালে
হেরিনু, কন্যার মাতা কাঁদিলা নীরবে ;
মাতৃময়ী কাতরতা সে হাসি-উৎসবে !

উত্তর বর।

কবিতা-বিহঙ্গি, তোর পাখাদুটি ছাটি
নাহি দিব ; ছাড়ি রুক্ষ ধরণীর মাটি
ওড়্ ঊর্দ্ধে ; মগ্নপ্রাণে, দুটি চক্ষু বুজে,
কর গান মনানন্দে আকাশ-গম্বুজে !
চাতকের মত তুই হর্ষ-নির্ঝরিণী
গাহি মর, শুনি তোর কুহকী রাগিণী,
বলুক পাঠক-বৃন্দ, গানে মাতোয়ারা,
"জ্যৈষ্ঠ-শেষে কি মধুর আষাঢ়ের ধারা !"

বৈঠক হইল খালি, সবে গেল চলি।
বিন্দি দাসী, চুপে চুপে, হয়ে কুতূহলী,
রাস্তায় ধরিল গিয়া ডাক-পেয়াদায়।

কহিল সহাস্যে, চক্ষুকিরণছটায়
ভুলাইয়া পেয়াদায়, "এই ছটি টাকা
লও বাপ্‌—সোজা কথা—বিল্কি আঁকাবাঁকা
কথা নাহি জানে—একবার গুপ্তদ্বার
দিয়া, খিড়কির দ্বার দিয়া, একবার
জামাতারে দেখাইয়া যাও। শাশুড়ির
বড় সাধ দেখিবারে তাঁর জামাইয়ের
চাঁদমুখ।"

ধন্য ওহে রূপার চাকতি।
আকাশে পাতালে মর্ত্যে অব্যাহতগতি!
তোমার চাকিনামন্ত্রে কেল্লার ফাটক
যায় খুলি! যাও দেখি, কে করে আটক?
পোষ্টদত্ত হৈল রাজি: প্যাকেট লইয়া,
খিড়্‌কির দ্বার দিয়া, দুই জনে গিয়া
উপস্থিত অন্তঃপুরে! মুখ ফিরাইয়া,
কিছু দূরে, পোষ্টদত্ত রহিল বসিয়া।
রাঙাদিদি মৃদুহাস্যে নাতিনীরে টানি
আনি, কহিলেন রঙ্গে, যোড় করি পাণি।
"ওহে চোরচূড়ামণি! প্রাচীর লঙ্ঘিয়া
সিঁধ কাটি হাতে করি, কার ঘরে গিয়া
পাইলে সুন্দর শাস্তি? দড়াদড়ি দিয়া
বাঁধিল তোমার দেহ, আদরে আঁটিয়া
এই মোর নাতিনীর মন করি চুরি
যাও যদি, তবে বুঝি তব বাহাদুরি!"
এত বলি রাঙাদিদি, নাতিনীরে ঠেলি
নবীন নাগরপানে, করি রঙ্গকেলি,
গেলা চলি!—লাজগ্রস্ত বধূ আর বর
কি করিবে, কোথা যাবে, ভাবিয়ে ফাঁফর!
"যৌবনবসন্তকালে জারিজুরি কার
খাটে বল? বিশ্বামিত্র মেনেছিল হার,
পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে যবে বয়স তাহার!"
এত বলি, ফুলধনু কার্ম্মুকেতে গুণ
দিল! কোথায় টঙ্কার? কপালে আগুন!
'নামের আখর যাহে কালো অলিকুল,
কামের অমোঘ বাণ—আমের মুকুল'
ছুটিল!—লাজের বাঁধ তবু না টুটিল!
চারিচক্ষে বরকন্যা নীরবে চাহিল।
ত্রয়োদশ বৎসরের সেই সে বালিকা,
কোমল, মৃদুলস্পর্শ, কুসুমকলিকা!—
কি সাধ্য ভাঙ্গিবে তার অবরোধ-দর্প!
কোথা তব বীরপণা, কৌশলী কন্দর্প?
যুবক কহিল হর্ষে, "লো আনন্দরাশি!
আমি তব চিরদাস!"—বালা, মৃদু হাসি,
লাজনতনেত্রে, ধীরে, চঞ্চলচরণে
পলাইল—যুবা চাহে আকুলনয়নে!
প্রেম-বিশ্বনাথ কিন্তু লভিলা বিজয়।
সে শুভমুহূর্ত্তে, মরি! উভয়ে উভয়
বাসিল রে ভাল, হ'ল চিত্ত-বিনিময়!
হে পাঠক—শোন বলি—কভু নহে ভুল:
বিফলে পাকেনি মোর এ বিপুল চুল!
শুদ্ধ শান্ত মনে যেই সরল অন্তরে,
অনঙ্গেরে দিয়ে ফাঁকি, প্রেমবিশ্বেশ্বরে
বিল্বদলে পূজি, আহা, ভাল বাসিয়াছে,
সেই ভাল বাসিয়াছে! আমড়ার গাছে
ফলে না বেদানা: পুণ্য স্বাতিরই জলে
উজ্জ্বল মুকুতা ফলে: কভু নাহি ফলে
গজমুক্তা গজে গজে: শিমুলের ফুল
গন্ধহীন: গোলাপেই সৌরভ অতুল!
কিছু ক্ষণ পরে ফিরি, দুষ্টা রাঙাদিদি
আইলেন, গৃহিণীরে লয়ে:—যথাবিধি
দধি, চিনি, থালে করি! মঙ্গল-আচার
সারিয়া, চিবুক ধরি ভাবী জামাতার,
কহিলা গৃহিণী—"বাছা, রাগ করিও না!
টাকা নাই, তাই হ'ল এ ঘোর লাঞ্ছনা!
তুমিই জামাই হবে, ইহাতে অন্যথা
নাহি হবে! আহা বাছা পাইয়াছ ব্যথা!
মা বলিয়া ডাক বাবা, জুড়াক্ পরাণ!
আহা কি মধুর বাণী!—তোমার কল্যাণ
হোক্ বাছা, থাক তুমি চিরজীবী হ'য়ে!"
"কার্ত্তিক এসেছে বটে দড়াদড়ি বয়ে!"

রাঙাদিদি হাসি কন। "থাকিতে ময়র
কেন এত হাটাহাটি? এত ঘোড়দৌড়?"
তার পর, একরাশ ফল আর মিষ্টি
আইল। জামাই ভাবে, একি সুধাবৃষ্টি!
কামাখ্যার ভ্যাড়া সাজি, কহিল জামাই
মনে মনে, "কন্যা ছাড়া কিছুই না চাই!
সৃষ্টিছাড়া আজগুবি বাবার ব্যাভার!
আমি চাই ঐ কন্যা।—ড্যাম্ দশ হাজার।"

সেই রাত্রে পোষ্টাল নিয়ম অনুসারে
জামাই-বাবাকে বর, দিব্য কারাগারে
রহিলেন বন্দী। কিন্তু যবে রাত্রিশেষে
প্রহরী ও সাক্ষী সব, দ্বারদেশে এসে,
নেহারিল, নাহি তথা সে পোষ্টাল বর!
খোঁজ! খোঁজ! প্রহরীরা ভাবিয়া ফাঁফর!
ছিন্ন সুধু দড়াদড়ি মাটির উপর
প'ড়ে আছে! একি কাণ্ড! পলায়েছে বর!
চড়ান্ত মাতাল এক, সুরার পয়সা
না থাকিত যবে হস্তে, রঙ্গে, নিজ পোষা
দুগ্ধফেননিভবর্ণ, মুক্তাসম আভা।
টগরপুষ্পের মত লাবণ্যের প্রভা!
বিলাতী বিড়ালটিকে রাখিয়ে বন্ধক
কিনিত মদিরা; কিন্তু হ'য়ে পলাতক
বিদায়-মুহূর্ত্তে, দুগ্ধপাত্রে মুখদিয়া,
চতুর মার্জ্জারবর যাইত ফিরিয়া
স্বামি-গৃহে। সেইরূপে কাহারে না বলি,
বিংশ শতাব্দীর বর গেল কি রে চলি?
কোতওয়ালি, চৌকি আর থানায় থানায়
প'ড়ে গেল হুলস্থূল! কোথা সে? কোথায়!

বুভুক্ষু, শিকারহারা ব্যাঘ্রের মতন
লোহিত নয়নযুগ, করিয়া ঝম্ফন,
বরের মহৎ পিতা, কাণীর বেয়াই,
ল'য়ে সঙ্গে দশ জন গুণ্ডা আর চাঁই,
আক্রমিল দত্তগৃহ। কিন্তু তথা একা,
বিন্দি দাসী উড়াইয়া ঝাঁটার পতাকা,
হইল রে বিজয়িনী! গুণ্ডারা বলিল,
"মহিষমর্দ্দিনী পুনঃ প্রয়াগে কি এল?"

তার পর, মহাবুদ্ধ বঙ্গের বেয়াই,
উড়ায়ে বুদ্ধির ঘুড়ি, ঘুরায়ে লাটাই,
বুঝাইতে গেল কেস সতীশ ডাক্তারে
"ড্যামেজের নালিশ হইতে বেশ পারে
হাইকোর্টে, on the original side;
যে হেতু ইহাতে আছে bridegroom, bride."
ডাক্তার সতীশ কন, "শোন মহাশয়,
বুদ্ধিতে তুমিই বড়, এ কথা নিশ্চয়!
আমি কত পরিশ্রমে দশটি হাজার
পাইলাম। তুমি প্রতিভার অবতার!
তুমি বিংশ শতাব্দীর পেমচাঁদ ছাত্র।
হেরি তোমায়, হিংসায় দহিছে এ গাত্র।
একেবারে, এক প্যাকেটে, দশটি হাজার জেরে
নিতে প্রভু, মারাত্মক প্রতিভার জোরে।
Tush! I have no time to attend to your pranks.
Take away those silver coins! Declined with
thanks!"

জলন্ত স্ফুলিঙ্গ সেই বঙ্গের বেয়াই,
তেজের সে অবতার, মহাবুদ্ধ, চাঁই,
সদরামীনের কোর্টে "বিশ হাজার চাই"
বলিয়া করিল রুজু ড্যামেজের কেস।
অগ্নিশর্ম্মা হৈলা শেষে ভস্ম-অবশেষ।
যথাকালে জজমেণ্ট হইল বাহির
একেবারে বেয়া'য়ের চক্ষু হ'ল স্থির!
"বাদী পাঠাইল এই অপূর্ব্ব প্যাকেট
প্রতিবাদী পাশে বটে, কিন্তু এই ভেট
পাঠানর পূর্ব্বে, কেন দিল না নোটিস?
এই হেতু মোকদ্দমা সমূলে ডিস্‌মিস
হইয়েছে! বাদী দিবে সমস্ত খরচা"।
বিন্দি দাসী হাসি বলে, "আচ্ছা হ'ল বাছা!"
চারিধারে হাস্যরোল। সবে বলে "উহু

কোথা হ'তে এল হেথা ? এ যে মহামল্ল !
বিংশ শতাব্দীর এ যে অপরূপ কল্প !"
বর কোথা ? বর কোথা ? লুকায়ে কাশ্মীরে,
ছয় মাস মনানন্দে ঝরণার নীরে
স্নান করি, পাহাড়ের দৃশ্য হেরি নানা,
খাইতেছিলেন বর আঙ্গুর বেদানা।
শেষে পাইলেন টের পিতৃ-রোষাগ্নির
নাহি অবশেষ, পুল হইলা হাজির !
শালিশালাজেরা হেরি আহ্লাদে অস্থির !
বলে তারা, "বন থেকে হইল বাহির
সোণার টোপোর মাথে বিহঙ্গ রুচির।"

বঙ্গের বেয়াই তব কলাপানা চক্র
কোথা গেল ? কোথা গেল চাল তব বক্র ?
"বিনা পণে দিব বিয়া !" হায় কি উদার !
কোথা গেল সেই শব্দ "দশটি হাজার"?
বর এল ! বর এল ! বাজিছে সাহানা
সানাইতে, কলহাস্যে ধায় পুরাঙ্গনা।
বিংশ শতাব্দীর বর আবার এসেছে !
এবার প্যাকেট নয়—মানুষ সেজেছে !
পড়ে গেল হুলস্থূল !—উৎফুল্ল-নয়ন
দত্তজায়া জামাতারে করিলা বরণ !
খোলা হ'তে নামে লুচি, টপ্‌বগ, তাজা,
জিবে গজা, পানতুয়া, ছানাবড়া, খাজা,
মতিচুর, সরপুলি, আর সরভাজা !
বিবাহ-উৎসব তুই পাকানের রাজা !
বাড়োদিদি হাসিছেন বদনে অঞ্চল ;
কহিছেন, "থাম কবি, মুখে আসে জল !"
"উলু উলু উলু উলু !" উলুর ফোয়ারা
মুখে ছোটে। বিন্দি দাসী হেসে হ'ল সারা !

বিবিধ প্রসঙ্গ।

জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় পুরাকালে বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা ও উপনিবেশস্থাপন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হয় ত এখনও অনেকের নিকট বিস্ময়কর মনে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। সর উইলিয়ম্ হণ্টর উড়িষ্যা-নামক পুস্তকে (Orissa, p. 314) লিখিয়াছেন—

"The ruin of Tamluk as a seat of maritime commerce affords an explanation of how the Bengalis ceased to be a sea-going people. In the Buddhist era they sent warlike fleets to the east and the west and colonised the islands of the Archipelago."

অর্থাৎ, "সামুদ্রিক বাণিজ্যের আড্ডা তমলুকের ধ্বংস হইতে বুঝা যায় যে, বাঙ্গালীরা কিরূপে সমুদ্রযাত্রা হইতে নিরস্ত হইতে বাধ্য হয়। তাহারা বৌদ্ধযুগে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে যুদ্ধপোতাবলি প্রেরণ করিত, এবং ভারতমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।" ডারুইনের সহিত একই সময়ে অভিব্যক্তিবাদের আবিষ্কর্ত্তা ওআলেস্ সাহেব তাঁহার মালয়দ্বীপপুঞ্জ (The Malay Archipelago, vol I p. 169) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"In the house of the Wadono or district chief at Modjo agong, I saw a beautiful figure carved in high relief out of a block of lava, and which had been found buried in the ground near the village ..... It represented the Hindu Goddess Durga, .."

অর্থাৎ, "আমি যবদ্বীপের মোজো আগং নামক স্থানে জেলার শাসনকর্ত্তার বাড়ীতে একটি সুন্দর খোদিত মূর্ত্তি দেখি ; উহা মাটিতে প্রোথিত ছিল, খুঁড়িয়া বাহির করা হয়। উহা হিন্দুদেবী দুর্গার মূর্ত্তি।" ওআলেস্ সাহেব তাঁহার গ্রন্থে এই দুর্গামূর্ত্তির একটি ছবি দিয়াছেন। তাহা অষ্টভুজা ; এক হস্তে মহিষাসুরের কেশ ধৃত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বোপকূলে যে সকল জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে কেবল বঙ্গোপসাগরকূলবাসীরাই দুর্গার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করে। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর হিন্দুরা দুর্গার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে না। সুতরাং এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত যে পুরাকালে বাঙ্গালীদের পূর্ব্বপুরুষেরা যবদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আপনাদের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

* * *

আমরা গতসংখ্যায় শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধে যে সকল স্বার্থত্যাগী শিক্ষকের নাম করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে কালীপ্রসন্ন

রামমোহনরায় সেমিনারী নামক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের উল্লেখ করা আমাদের কর্ত্তব্য ছিল। সম্ভবতঃ আমাদের অজ্ঞাত এইরূপ আরও অনেক মহাপ্রাণ শিক্ষক আছেন।

***

গত জ্যৈষ্ঠমাসের ৪ঠা, সূর্য্যগ্রহণ হইয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে পূর্ণগ্রাস হয় নাই। মরিশস, সুমাত্রা, প্রভৃতি দ্বীপে পূর্ণগ্রাস দৃষ্ট হইয়াছিল। এবার পূর্ণগ্রাস যেরূপ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল, সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। উহা মরিশসে ৩ মিনিট ১৫ সেকেণ্ড এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জের কোন কোন স্থানে সাড়ে ছয় মিনিট কাল স্থায়ী হইয়াছিল। সুতরাং এবার সূর্য্যসম্বন্ধীয় নানা জ্যোতিষিক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার বিশেষ সুযোগ হইবার কথা। কিন্তু গ্রহণের দিন মেঘ করায় অনেক স্থানে ভাল ফল পাওয়া যায় নাই। এশিয়ার মধ্যে কেবল জাপানীরাই স্বতন্ত্র পর্য্যবেক্ষণের বন্দোবস্ত করিয়াছিল। যে যে স্থানে পূর্ণগ্রাস দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলির নিকটে অসভ্য জাতি থাকায় সকল পর্য্যবেক্ষণের বন্দোবস্ত করাও সম্ভবপর হয় নাই। একেই ত অসভ্যজাতি যন্ত্রাদি দেখিলেই নানাপ্রকার সন্দেহ করে; তাহার উপর আবার কুসংস্কারবশতঃ তাহারা গ্রহণের সময় অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠে। গ্রহণ সম্বন্ধে অনেক অসভ্য জাতির বিশ্বাস বড়ই কৌতুকজনক। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, অসভ্যজাতিরা মনে করে যে গ্রহণের সময় হয় সূর্য্য ও চন্দ্র ঝগড়া করিতেছেন, কিম্বা অপদেবতারা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। এই জন্য অসভ্যলোকেরা গ্রহণকালে সূর্য্যচন্দ্রকে সাহায্য করিতে চেষ্টা করে। গ্রীনল্যাণ্ডবাসীরা চন্দ্রসূর্য্যকে ভাই ভগিনী মনে করে। চন্দ্র ভাই, সূর্য্য ভগিনী। তাহারা মনে করে, চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্র তাহাদের খাদ্যদ্রব্য এবং পরিধেয় ও পাতিবার চামড়াগুলি চুরি করিবার জন্য গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়ান। এমন কি তাহারা মনে করে যে, যে সকল লোক জীবনে মিতাচার ও সংযম অবলম্বন করে নাই, চন্দ্র গ্রহণের সময় তাহাদিগকে বধ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করেন। গ্রহণের সময় তাহারা তাহাদের সিন্দুক এবং কটাহগুলি বাড়ীর ছাদ বা চালের উপর লইয়া যায়, এবং তদুপরি আঘাত করিয়া এই অদ্ভুত বাদ্য দ্বারা চন্দ্রকে তাড়াইবার চেষ্টা করে। সূর্য্যগ্রহণের সময় স্ত্রীলোকেরা কুকুরগুলার কাণ মচড়াইয়া দেয়। যদি কুকুরগুলা কেঁউ কেঁউ করে, তাহা হইলে তাহারা মনে করে, যে প্রলয় কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। আমেরিকার ইরোকোয়ি জাতি মনে করে যে একটা রাক্ষস সূর্য্যচন্দ্রের আলোক রোধ করায় গ্রহণ হয়। গ্রহণের সময় তাহারা সকলেই রাক্ষসটাকে তাড়াইবার চেষ্টা করে। এই জন্য তাহারা ক্রন্দন, চীৎকার, ঢক্কানিনাদ, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি উপায়ে তাহাকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করে। এবং তাহাদের চেষ্টা সফলও হয়; কারণ কিছুক্ষণ পরেই আবার চন্দ্র বা সূর্য্যের আলোক তাহাদের উপর পতিত হয়! য়ুকেটানের আদিম নিবাসীরা মনে করে যে সূর্য্য বা চন্দ্রকে তাঁহাদের শত্রুরা আক্রমণ করায় গ্রহণ হয়। এই জন্য তাহারা এই সকল শত্রু বিতাড়নার্থ আপনাদের কুকুরগুলাকে ঠেঙ্গাইতে আরম্ভ করে, এবং অন্যান্য প্রকারে ঘোর কোলাহল করে। চিকুইটোরা মনে করে গ্রহণের সময় আকাশবাসী বৃহৎ কুকুরগুলা চন্দ্রসূর্য্যকে কামড়াইয়া ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে, এবং এইরূপ দংশনে রক্তপাত হওয়াতে গ্রহণের সময় তাঁহাদের রং লোহিতবর্ণ হয়। আকাশনিবাসী কুকুরগুলাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য তাহারা চীৎকার করিতে করিতে আকাশে তীর ছুড়িতে থাকে। প্রাচীন পেরুনিবাসীরা মনে করিত যে চন্দ্রগ্রহণের সময় চন্দ্র মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইবার জন্য তাহারা কুকুর ঠেঙ্গাইয়া একটা বিকট গোলমাল করিত। কাম্বোডিয়ানিবাসীরা মনে করে যে গ্রহণের সময় কোন অপদেবতা চন্দ্রসূর্য্যকে গ্রাস করে। ইহা আমাদের দেশের রাহুতে বিশ্বাসের অনুরূপ। তাহারা চন্দ্রসূর্য্যকে উদ্ধার করিবার জন্য ভীষণ শব্দ করে, ঢাক বাজায়, এবং আকাশে তীর ছোড়ে।

***

উত্তর পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশে বিশ পঁচিশ হাজার বাঙ্গালীর বাস। কিন্তু বাঙ্গালা এই প্রদেশের প্রচলিত ভাষা নয় বলিয়া সরকারী কোন ইস্কুলে ইহা শিখাইবার কোন বন্দোবস্ত নাই। বাঙ্গালীরা নিজের চেষ্টায় কাশী, প্রয়াগ প্রভৃতি যে যে শহরে ইস্কুল স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে কিন্তু এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পড়ান হইয়া আসিতেছিল।

গবর্ণমেণ্ট এপর্য্যন্ত ইহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। কিন্তু সম্প্রতি সরকারী শিক্ষাবিভাগ হইতে এক আদেশ প্রচারিত হইয়াছে যে, যে সকল ইস্কুলের ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা বা শিক্ষাবিভাগের কোন সাধারণ পরীক্ষা দিতে অধিকারী, তথায় বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারিবে না। সুতরাং এখন বাঙ্গালীর ছেলেকে ইস্কুলে বাঙ্গালা শিখিবার পূর্ব্বেই হিন্দী বা উর্দ্দু শিখিতে হইবে। কেবল কি তাই? চার বৎসরের বাঙ্গালী ছেলেকে হিন্দী বা উর্দ্দুতে সকল বিষয়ে উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষা দিতে হইবে। মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের সহিত কোন জাতির সম্বন্ধ ছিন্ন হইলে যে তাহার অবনতি হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আমরা এখন সেকথার আলোচনা করিব না। আমরা এখন কেবল এই বলিতে চাই, যে সর আণ্টনী ম্যাকডনেলের এই আদেশটি সর্ব্বপ্রকার প্রকৃষ্ট শিক্ষাপ্রণালীর এবং তাঁহার নিজের শিক্ষানীতির বিরোধী হইয়াছে। মাতৃভাষার সাহায্যেই শিশুদিগকে শিক্ষা দেওয়া স্বাভাবিক এবং সহজ। মাতৃভাষা ভাল করিয়া না শিখিয়া কোন ছাত্র অপর ভাষা শিখিতে গেলে তাহাও ভাল করিয়া শিখিতে পারে না। ইহা সোজা কথা। সর আণ্টনীও যখন প্রথম এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন, তখন, এখানকার সাধারণ পরীক্ষাগুলিতে ইংরাজীতে অনুত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক দেখিয়া, এই অনুমান করেন যে ছাত্রেরা নিজ মাতৃভাষা না শিখিয়াই অনেক স্থলে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করে, এই জন্য এরূপ কুফল ফলে। এই কারণে তাঁহার শাসনকালে এইরূপ নিয়ম হইয়াছে যে ইংরাজী ইস্কুলগুলিতেও সর্ব্বনিম্ন দুইটি শ্রেণীতে কেবল মাতৃভাষা ও তৎসাহায্যে সকল শিক্ষণীয় বিষয় শিখান হইবে। তৃতীয় বৎসরে ছাত্রেরা ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিবে; কিন্তু তখনও অপরাপর বিষয় মাতৃভাষার সাহায্যে শিখাইতে হইবে। এই নিয়ম মষ্ঠবার্ষিক শ্রেণী পর্য্যন্ত চলিবে। হিন্দুস্থানী বালকদের প্রাথমিক শিক্ষা যদি হিন্দী বা উর্দ্দুতে দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালী বালকদের বেলায় বাঙ্গালা কেন ব্যবহৃত হইতে পারিবে না? সত্য বটে, হিন্দুস্থানী গবর্ণমেণ্ট এজন্য কোন বন্দোবস্ত না করিতে পারেন; কিন্তু বাঙ্গালীরা নিজে বন্দোবস্ত করিলে তাহাতে কেন বাধা দেওয়া হয়? এডুকেশন কমিশনের রিপোর্টেও এইরূপ মন্তব্য অনেক স্থলে প্রকাশিত হইয়াছে যে বেসরকারী ইস্কুলসমূহ যাহাতে ঠিক্ সরকারী ইস্কুলের ছাঁচে ঢালা না হয়, তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত ইস্কুলগুলিকে তাহাদের আভ্যন্তরিক বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। এপ্রদেশে কিন্তু সর্ব্বপ্রকার ইস্কুল একই প্রকার পদ্ধতি ও পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করিতে বাধ্য। সকল ইস্কুলকে কঠোরতার সহিত এই নিয়ম পালন করিতে বাধ্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীদের ঘোরতর অনিষ্ট করিতে বসিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, বহুসংখ্যক হিন্দুস্থানী-বাঙ্গালীও একথা বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কখনই পূরা হিন্দুস্থানী হইতে পারিবেন না। বৈবাহিক আদান প্রদান এবং অন্য নানা প্রকারে তাঁহাদের সহিত 'স্বদেশী' বাঙ্গালীদের ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে ও থাকিবে। গবর্ণমেণ্টকেও বলি, যে সকল চাকরী ও গবর্ণমেণ্টের অনুমতি-সাপেক্ষ ব্যবসায়ে হিন্দী বা উর্দ্দু জানা দরকার, বাঙ্গালী তাহাতে নিযুক্ত বা প্রবৃত্ত হইতে চাহিলে হিন্দী উর্দ্দু জ্ঞানের সার্টিফিকেট দেখাইতে বাধ্য হইবেন, এই নিয়মই যথেষ্ট। যাহা হউক, হিন্দুস্থানী-বাঙ্গালীদের চুপ করিয়া থাকা উচিত নয়। একটি ধীরভাবে লিখিত যুক্তিপূর্ণ আবেদন গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন, গবর্ণমেণ্ট যাহাই করুন না কেন, গৃহে বালকবালিকাদিগকে বাঙ্গালা শিখাইয়া তাহাদের বাঙ্গালীত্ব রক্ষা করা প্রত্যেক হিন্দুস্থানী-বাঙ্গালীরই কর্ত্তব্য।

* * *

বাঙ্গালী ছাত্রেরা জ্ঞানোপার্জ্জনার্থ ইউরোপের নানাদেশ এবং জাপান ও আমেরিকায় গমন করেন। সুতরাং ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে বাঙ্গালী ছাত্র দৃষ্ট হইবে, তাহা বিচিত্র নয়। সকলেই জানেন, রুড়কী কলেজে বাঙ্গালী ছাত্র লয় না। কিন্তু হিন্দুস্থান ও পঞ্জাবের অধিবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে এ নিয়ম খাটে না। এই জন্য রুড়কীতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে তের জন বাঙ্গালী ছাত্র আছেন। লাহোর মেডিকাল কলেজে ১৮ জন বাঙ্গালী ছাত্র আছেন। এবৎসর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ পরীক্ষায় ৩ জন এবং ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষায় ৬ জন বাঙ্গালী ছাত্র পাশ হইয়াছেন।

বোম্বাই মেডিকাল কলেজে ৮ জন বাঙ্গালী ছাত্র আছেন। পুনাতেও কয়েক জন বাঙ্গালী ছাত্র এঞ্জিনীয়ারিং শিখিতেছেন।

***

১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ৬৯ খানি নূতন সংবাদ ও মাসিকপত্র প্রবর্ত্তিত হয় এবং ৩৭ খানি বন্ধ হইয়া যায়। ইহার কারণ নানা প্রকারের হইতে পারে। হয় ত, এতগুলি কাগজ পয়সা দিয়া পড়িবার লোক ছিল না, হয় ত পরিচালকগণের উৎসাহ ছিল, কিন্তু কাগজ চালাইবার মত বিদ্যাবুদ্ধি বা অর্থবল ছিল না। ভাল কাগজও অনেক দিন ক্ষতিস্বীকার করিয়া না চালাইলে দাঁড়ায় না। ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী সংবাদপত্র পাইয়োনীয়ার ৩।৪ লক্ষ টাকা লোকসান দিয়া তবে দাঁড়াইয়াছে। যাঁহারা বাঙ্গালা কাগজ পড়েন, তাঁহারা কেবল ধার করিয়া না পড়িয়া নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে কাগজ ক্রয় করিয়া পড়িলে, আরও অনেকগুলি কাগজ চলিতে পারে।

***

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বরাবরই ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণ বিষয়ে মনোযোগী। লর্ড কর্জ্জনের আমলে এবিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক খরচ হইতেছে। ১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দে মালদহ জেলায় অবস্থিত প্রাচীন পাণ্ডুয়ার কীর্ত্তিগুলি রক্ষার বিশেষ চেষ্টা করা হয়। প্রধানতঃ আদিনা মসজিদেরই জীর্ণসংস্কার করা হয়। একলাখি সমাধিমন্দিরটিরও জীর্ণসংস্কার করা হয়। পাণ্ডুয়ার ভগ্ন হর্ম্ম্যাদির সংরক্ষণে মোট ১৭৯৯ টাকা খরচ হয়। গৌড়েরও অনেক জঙ্গল কাটা হইয়াছে। রাজস্বের অবস্থা অনুসারে ইহারও মেরামত করা যাইবে। রোহতাসের প্রাসাদ ও মসজিদাদির মেরামতেও অনেক টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের কতকগুলি মন্দিরের জীর্ণসংস্কারে ১৯১৪ টাকা খরচ হইয়াছে। তথাকার লিঙ্গরাজের মন্দিরটি মেরামত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ৪০০ টাকা ও মন্দিরকমিটি ৪০০ টাকা ব্যয় করেন। খুর্দা ও কনারকেও জীর্ণসংস্কার কার্য্যে অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে।

***

উত্তর মেরু পৌঁছিবার জন্য অনেক বৎসর হইতে ইউরোপীয় জাতিরা চেষ্টা করিতেছেন। প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, জাপানীরাও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইংরাজজাতি নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারের চেষ্টা করায় তাঁহাদের চরিত্রে যে উদ্যম ও অসমসাহসিকতা বিকশিত হইয়াছে, তাহারই বলে ইংলণ্ড এত ক্ষমতাশালী; এই বিশ্বাসে জাপানী গবর্ণমেণ্ট জাপানীজাতির মধ্যে উদ্যম ও সাহস বাড়াইবার জন্য এই আয়োজন করিতেছেন। দক্ষিণমেরুর চতুঃপার্শ্বে যে বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে, তৎসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভার্থও কিছুকাল হইতে চেষ্টা হইতেছে। এই সকল চেষ্টার মূলে কৌতূহল, দুষ্কর কার্য্যে উৎসাহ, নানাবিধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানলিপ্সা এবং কিয়ৎপরিমাণে বণিগ্‌বৃত্তি, পরিলক্ষিত হয়। পুরাকালেও লোকে ভৌগোলিক ও অন্যবিধ জ্ঞানলাভার্থ এবং কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য ভ্রমণ করিত। কিন্তু সেকালে পর্য্যটক ও ঐতিহাসিকেরা এখন অপেক্ষা অধিক পরিমাণে কল্পনার আশ্রয় লইতেন। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটীর পুস্তকালয়ে একখানি চীনদেশীয় ভূগোলবৃত্তান্ত আছে। তাহাতে যে সকল মনুষ্যজাতির বর্ণনা আছে, তন্মধ্যে তিনমুখো মানুষ, বামন, একহস্তবিশিষ্ট মানুষ এবং নরমৎস্যের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু এই পুস্তকে ইহা অপেক্ষাও অদ্ভুত একটি জাতির বর্ণনা আছে। তাহাদের বক্ষঃস্থলে ছাতি হইতে পিঠ পর্য্যন্ত একটি ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র থাকায় তাহাদের যাতায়াতের বড়ই সুবিধা হয়। ছিদ্রের ভিতর একটা বাঁশ চালাইয়া দিয়া দুজন মানুষ সহজেই তাহাদিগকে একস্থান হইতে আর এক স্থানে লইয়া যাইতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই প্রাচীন গ্রীকগণ কত কি লিখিয়া গিয়াছেন। হেরডোটস তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন যে ভারতবর্ষে একপ্রকার পিপীলিকা আছে, তাহারা খেঁকশিয়াল অপেক্ষা কিছু বড়। তাহারা মাটীতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া গর্ত্তের চারিপাশে মৃত্তিকা স্তূপাকার করিয়া রাখে। ঐ মাটীর সঙ্গে সোণা মিশান আছে। ভারতবাসীরা মধ্যাহ্নকালে (যখন পিপীলিকারা গর্ত্তের বাহিরে আসে না) উটে চড়িয়া ঐ সোণা চুরী করিয়া আনে। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে ভারতবাসীদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে সকলে তাহাকে মারিয়া ভক্ষণ করে। পুরুষেরা পুরুষ রোগীকে, এবং স্ত্রীলোকেরা স্ত্রীরোগীকে ভক্ষণ করে। গ্রীকেরা আর এক ভারতবর্ষীয় জাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস

করিতেন, যাহাদের কান দুটি এরূপ সুবিস্তৃত, যে তাহারা একটি কান বিছাইয়া তাহার উপর শয়ন করিত, এবং আর একটি গায়ে দিয়া শীত নিবারণ করিত।

***

কেবল কার্পাসবস্ত্র বয়ন করিয়াই যে প্রাচীন ভারতবর্ষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা নয়। আমরা আজকাল মসিনা বা তিসির তৈলই ব্যবহার করি; ইহার ছালের সুতা হইতে লিনেন (linen) নামক যে উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহাও পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নির্ম্মিত হইত, এবং ইউরোপ ও এশিয়ার নানাদেশে সমাদৃত হইত। এই ব্যবসায়টি পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। আমাদের দেশে যে তিসির গাছ জন্মে, তাহা হইতে এখন প্রধানতঃ বীজ সংগ্রহ করা হয়। সুতরাং বস্ত্রবয়নের জন্য সুতা প্রস্তুত করিতে হইলে অন্যদেশ হইতে তদুপযোগী গাছের বীজ আনাইতে হইবে। নীল ও ইক্ষুর চাষের উন্নতির জন্য যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, তিসির চাষের উন্নতির জন্যও তদ্রূপ চেষ্টা হওয়া উচিত।

***

১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দে আসামী ভাষায় কেবল নয়খানি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। বাস্তবিক আসামী ভাষাকে বাঙ্গালা হইতে স্বতন্ত্র একটি ভাষায় পরিণত করিবার চেষ্টা এবং চট্টগ্রামের কথিত বাঙ্গালাকে একটি স্বতন্ত্র ভাষায় পরিণত করিবার চেষ্টা সমান বিজ্ঞতার লক্ষণ! স্বপ্রদেশ-প্রেম যাহাই বলুক, কতকগুলি অপরিণত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাকৃত ভাষা (dialect) ও সাহিত্য অপেক্ষা একটি সতেজ ও সমৃদ্ধ ভাষা ও সাহিত্য অধিক বাঞ্ছনীয়।

***

কলিকাতা রিভিউ পত্রে একজন লেখক লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারদের বার্ষিক আয় ১২ কোটি টাকা, কিন্তু তাঁহারা ধর্ম্মার্থে ও জনহিতকরকার্য্যে যে অর্থ ও সম্পত্তি দান করিয়াছেন, তাহা, এবং বৎসর বৎসর যাহা ব্যয় করেন, তাহা যত মূলধন হইতে সুদস্বরূপ পাওয়া যাইতে পারিত, তাহা, এই উভয়ের মূল্য ১৩ কোটী টাকা। অপরপক্ষে ইংরাজ হিসাব অনুসারে তাঁহাদের দানের পরিমাণ ৩ কোটী পাউণ্ড। ভারতবাসী যে ইংরাজ অপেক্ষা অধিক দানশীল, ইহা প্রমাণ করাই লেখক মহাশয়ের উদ্দেশ্য। ভারতবাসী যে দানশীল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, আমাদের বোধ হয়, অধিকাংশ সদ্ব্যয়ই বর্ত্তমান জমিদারদের পূর্ব্বপুরুষেরা করিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশে সৎকার্য্যে উৎসর্গীকৃত অনেক সম্পত্তির আয়ের সদ্ব্যবহারও হয় না। কোন কোন মোহন্তের চরিত্রতা ইহার অন্যতম প্রমাণ। আজ কাল আবার খেতাব-লালসারূপ একটা নূতন উপসর্গ জুটিয়াছে।

***

ভারতবর্ষীয় সামুদ্রিক জরিপ বিভাগের ১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দের কার্য্যবিবরণে (Administration Report of the Marine Survey of India, 1898-99) উক্ত বিভাগের কর্ম্মাধ্যক্ষ কাপ্তেন এণ্ডারসন একস্থানে লিখিয়াছেন যে একদা তিনি যখন নিকোবর দ্বীপের বনে বেড়াইতেছিলেন, তখন তথাকার একজন আদিমনিবাসী বলিল যে অতি নিকটেই একটা প্রকাণ্ড মৌচাক আছে। দূর হইতে মধুর গন্ধ পাইয়া সে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু কাপ্তেন এণ্ডারসন কিম্বা তাঁহার দলের কোন সাহেব গন্ধ পান নাই। বাস্তবিক দেখা যায় যে অসভ্য লোকদের ইন্দ্রিয়শক্তি সভ্য লোকদের চেয়ে প্রবল। আবার যাহারা জীবনের অধিকাংশ সময় ফাঁকা জায়গায় মুক্ত বাতাসে বাস করে, সহরের ও গৃহের রুদ্ধ দূষিত বাতাসে আবদ্ধ থাকে না, তাহাদের ইন্দ্রিয় সকল অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সবল। বুঅর যুদ্ধে ইংরাজসৈন্যগণ অপেক্ষা বুঅরসৈন্যগণ যে অধিকতর দূর হইতে শত্রুর আগমন বুঝিতে পারিয়াছে, যেখানে ইংরাজের চোখ দূর হইতে খাকীর রংএর সহিত প্রান্তরের রংএর পার্থক্য লক্ষ্য করিতে পারে নাই, সেখানে বুঅর তাহা পারিয়াছে, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ। আমেরিকার লালইণ্ডিয়ানদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, শ্রবণ ও ঘ্রাণশক্তির অনেক গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু ভারতবর্ষেও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। পঞ্জাবে এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন জেলায় খোজী নামক একশ্রেণীর লোক আছে। এই সকল স্থানে পশুচুরির খুব প্রাদুর্ভাব। চোরের পদচিহ্ন ও পশুর খুরের চিহ্নের অনুসরণ

যে সকল লোক লবণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিত, তাহা-দিগকে ধরিবার জন্যও খোজীরা নিযুক্ত হইত। এই কার্য্যে তাহাদের দক্ষতা অসাধারণ। একবার একটি পদচিহ্ন পাইলে তাহারা কি বালুকাময়, কি তৃণাচ্ছন্ন, কি কর্দ্দমাক্ত, কি শুষ্ক ও দৃঢ়, সর্ব্বপ্রকার ভূমির উপর দিয়া ঐ চিহ্নের অনুসরণ করিয়া অপহৃত পশুটি খুঁজিয়া বাহির করে। চিহ্নের অনুসরণ করিতে করিতে কোনও গ্রামের প্রবেশ-পথে আসিয়া পৌছিলে তাহাদের কাজ বড় কঠিন হইয়া উঠে। কারণ সেই পথ দিয়া কত পশুর দল যাতায়াত করে, তাহার সংখ্যা নাই। এই জন্য পশুচোরেরা যতগুলা সম্ভব গ্রামের মধ্য দিয়া যায়। ইহাতে কিন্তু চোরদের বিপদও আছে। কারণ, যত গ্রাম দিয়া যাইবে, ততই তাহারা গ্রামবাসীদের চোখে পড়িবে ও পশুগুলি সম্বন্ধে তাহাদের সন্দেহজাত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হইবে। বস্তুতঃ এই কারণে বিভিন্ন গ্রামবাসীদের যোগসাজস ব্যতিরেকে পশুচুরি সম্ভব নয়। এই জন্য বৃটিশ শাসনের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত রীতিটি প্রচলিত ছিল (এবং বোধহয় এখনও কোথাও কোথাও আছে)। যদি খোজী ও তাহার সাক্ষীরা কোন পশুপদচিহ্নের অনুসরণ করিতে করিতে গ্রামের সীমাস্থিত বহুসংখ্যক খুরের দাগের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহারা শেষ দাগটি খোলা ঢাকা দেয়, অথবা কাহাকেও সেখানে পাহারা দিতে রাখিয়া যায়। তাহার পর গ্রামে গিয়া মুখ্যা বা মড়লদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগকে "পঙ্‌চাও" করিতে বলে, অর্থাৎ গ্রামের অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত দাগটির অনুসরণ করিয়া দিতে বলে। যদি তাহারা তাহাদের গ্রামের খোজীর সাহায্যে এই কাজটি করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাদিগকে অপহৃত পশুটি মানিয়া দিতে হয় কিম্বা উহার মূল্য দিতে হয়। খোজী-দের দক্ষতা সম্বন্ধে বীমস্ সাহেব নিম্নলিখিত দুইটি সত্য ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। একবার মুলতানের বাজার হইতে একটি উট চুরি যায়। সেখানে নানাস্থান হইতে হাজার হাজার উট সমাগত হয়। অন্যান্য অনেক উটের ন্যায় এই উটটির পায়ের তলায় তাহার মালিকের চিহ্ন তপ্ত লোহার দ্বারা দাগিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দাগটি একজন খোজীকে দেখান হইল। সে সহরের চারিদিকে অনেক মাইল ঘুরিয়া গিয়াছে। আর একটি উটে চড়িয়া সে ছ শ মাইল এই দাগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া কাশ্মীরের পর্ব্বতমালা হইতে ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী গুজরাট সহরে পৌছিল। এখানে ভূমি খুব উর্ব্বরা এবং চাষও প্রচুর পরিমাণে হয়। সুতরাং এখানে দাগটি মিলাইয়া যাওয়ায় খোজী সাহায্যের জন্য বীমস্ সাহেবের শরণ লয়। বীমস্ তাহাকে আর একজন খোজী দেন। উভয়ের চেষ্টায় দাগটির পুনরুদ্ধার হয়। উভয়ে উটের মালিককে লইয়া কাশ্মীর রাজ্যের একটি ক্ষুদ্র সহরে জন্তু-টিকে খুঁজিয়া বাহির করে। আর একটি গল্প এই। ফিরোজ-পুরের নিকটে একটি মহিষ চুরি যায়। চোর ইহাকে শতদ্রু নদীর তীরে লইয়া গিয়া ইহার লেজ ধরিয়া সাঁতার দিয়া নদী পার হয়। খোজী খুরের দাগ ধরিয়া নদীতীরে উপস্থিত হয়। নদীটি সেখানে ৩মাইল চৌড়া। পরপারে সুদূর-প্রসারিত বার-নামক বালুকাময় প্রান্তর। সেখানে হাজার হাজার মহিষ চরে। স্রোতের বেগ সন্তরণকারীকে কতদূর ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে, খোজী তৎসম্বন্ধে এরূপ ঠিক অনুমান করিল, যে সে মনে কোন প্রকার সন্দেহ না করিয়া নদী পার হইয়া ঠিক যেখানে মহিষচোর উঠিয়াছিল সেই স্থানে উঠিল। তাহার পর দাগ ধরিয়া আরও কিছু দূর গিয়া মহিষ ও চোর উভয়কেই ধরিল।

* * *

অনেকেই রক্তবৃষ্টি ও চন্দনবৃষ্টির কথা শুনিয়া থাকিবেন। ভেক ও মৎস্যবৃষ্টির কথাও কেহ কেহ শুনিয়া থাকিবেন। রক্তবৃষ্টি হইলে সাধারণ লোকে সহজেই ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সকলের কারণ নৈসর্গিক বলিয়া জানিতে পারিলে আর কোন ভয় থাকে না। গত ৯ই মার্চ্চ রাত্রিকালে সিসিলি দ্বীপের অন্তঃপাতী পালার্মো সহরে আকাশ ঘন রক্তবর্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হয়। তখন প্রবল-বেগে দক্ষিণা বাতাস বহিতেছিল। তাহার পর রক্তের মত বৃষ্টি পড়িতে থাকে। সাহারা মরুভূমি হইতে বায়ুবেগে উত্থিত ও চালিত রক্তবর্ণ ধূলিসংযোগেই বৃষ্টির বর্ণ এই-রূপ হইয়াছিল। ঐ সময়ে দক্ষিণ ইতালীতেও এইরূপ রক্ত-বৃষ্টি, হরিদ্রাভ আকাশ এবং সিরক্কো-নামক উত্তপ্ত বায়ুর প্রবাহ লক্ষিত হয়। উত্তর আফ্রিকার আলজিয়ার্সেও রক্ত-

ও ধূলি বৃষ্টির সহিত মিশিয়া পড়ায় রক্তবৃষ্টির উৎপত্তি হয়। আরও একটি কারণে রক্তবৃষ্টি হয়। কোনও কোনও জলাশয়ে একপ্রকার অতিক্ষুদ্র রক্তবর্ণ উদ্ভিদ জন্মে। জলাশয়ের উপর দিয়া প্রবল চক্রবাত বা ঘূর্ণিবায়ু প্রবাহিত হইলে এই ক্ষুদ্র উদ্ভিদগুলি আকাশে উন্নীত হয়। পরে বৃষ্টিসহযোগে পড়িলেই লোকে বলে রক্তবৃষ্টি হইয়াছে। ঘূর্ণিবায়ুর বেগ ও শক্তির কথা সকলেই অবগত আছেন। যখন বড় বড় গাছ উহার দ্বারা সমূলে উৎপাটিত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে, তখন উহা জলাশয়ের উপর দিয়া গেলে যে কতকগুলা ভেক ও মৎস্যকে উড়াইয়া লইয়া যাইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এই কারণেই ভেক ও মৎস্যবৃষ্টি হয়। কলকারখানা হইতে উত্থিত ধূম ও কয়লার গুঁড়া বৃষ্টির সহিত মিশ্রিত হওয়ায় ইংলণ্ডে কখন কখন মসীবৃষ্টি হইতেও দেখা গিয়াছে।

* * *

যথেষ্ট পরিমাণে লবণ খাইতে না পাইলে গোরু দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইয়া পড়ে। কোন কোন শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনেও লবণের প্রয়োজন। কিন্তু লবণের উপর শুল্ক থাকায় আমাদের দেশের গরিব লোকেরাই যথেষ্ট পরিমাণে নুন খাইতে পায় না, গোরুকে দেওয়া ত দূরের কথা। এই জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেক বৎসর ধরিয়া এরূপ কোন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতেছেন, যদ্দ্বারা লবণকে মানুষের অখাদ্য করা যায়, অথচ অন্যান্য কাজে লাগাইতে পারা যায়। তাহা হইলে এই লবণ খুব কমমূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। ১৬ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতগবর্ণমেণ্ট প্রচার করেন যে যিনি লবণের "অস্বাভাবিকীকরণ" (denaturalisation) সম্পন্ন করিতে পারিবেন, তিনি পাঁচহাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন। আমরা যতদূর জানি, কেহ এখনও এই পুরস্কার পান নাই। পুরস্কারযোগ্য হইতে হইলে উদ্ভাবিত প্রক্রিয়াটির নিম্নলিখিত গুণ থাকা চাই—(১) কোন মানুষ উক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা বিকৃত লবণ ব্যবহার করিলে এরূপ অসুবিধায় পড়িবে, যে সে বরাবর উহা ব্যবহার করিতে পারিবে না। (২) কেহ অসাবধান হইয়া ঐ বিকৃত লবণ খাইলে বা ভাল লবণের সহিত মিশাইলে তাহার প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকিবে না। (৩) বিকৃত লবণ খাইয়া গবাদি পশু কোনপ্রকারে অসুস্থ বা দুর্ব্বল হইবে না। (৪) বিকৃত লবণভক্ষক গবাদির দুগ্ধ বা মাংস মানুষের অব্যবহার্য্য হইবে না। (৫) প্রক্রিয়াটির খরচ মণকরা চারি আনার অধিক হইবে না। (৬) দেশী লবণপ্রস্তুতকারীরা সাধারণ কোন উপায়ে বিকৃত লবণ হইতে মানুষের ব্যবহারোপযোগী লবণ বাহির করিতে পারিবে না। লবণ বিকৃত করিবার জন্য এপর্য্যন্ত যত চেষ্টা হইয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে পাওয়া যায়।

উপকথাতত্ত্ব।

ঊনবিংশ শতাব্দীকে বিশেষ করিয়া বিজ্ঞানশতাব্দী বলা হইয়াছে। এই শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চর্চ্চা যথেষ্ট হইয়াছে এবং নানা প্রকারের অভাবনীয় আবিষ্কারও হইয়াছে। মানব প্রত্যহ নূতন নূতন প্রাকৃতিক তথ্য অবগত হইয়াছে। তাহার ফলে আমরা এখন সৃষ্টিসমষ্টির মহত্ত্ব বিশদরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। আমরা অদ্য এমন একটি বিজ্ঞানের আলোচনা করিব, যাহা এক শতাব্দী পূর্ব্বে—শতাব্দী কেন, ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও—বিজ্ঞান বলিয়া গণ্য ছিল না। যদিও য়ুরোপে এবং আমেরিকায় তাহার চর্চ্চা এখন নিতান্ত অল্প নহে, তথাপি আমাদের দেশে আজ এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও অনেকে এই বিজ্ঞানের অস্তিত্বের বিষয়ও সম্যক জ্ঞাত নহেন। উৎকৃষ্টতর নামের অভাবে ইহাকে উপকথাতত্ত্ব (Folklore) বলা যাইতে পারে। ইহা সাধারণ মানবতত্ত্বের একটি বিভাগ।

প্রায় ১৭০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কবি আলেক্‌জাণ্ডর্ পোপ্ লিখিয়াছিলেন—

The proper study of mankind is man.

মানবই মানবের অনুশীলনের যোগ্য বিষয়।

কিন্তু জগতের সকল রহস্য বিলোড়ন করিয়া, নভোমণ্ডলের উচ্চতম প্রদেশ হইতে ভূগর্ভের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিয়া, এতকাল পরে মানবের দৃষ্টি অনুশীলনের সেই নিকটতম অথচ যোগ্যতম বিষয় মানবের প্রতি আকৃষ্ট

যাহার নাম মানবতত্ত্ব (Anthropology)। এই বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় মানুষ, মানুষের জীবন, মানুষের জাতি-বিভাগ, মানুষের চিন্তা ও সভ্যতার অভিব্যক্তি, ইত্যাদি। এই বিদ্যার আলোচনা অতি চিত্তাকর্ষক। আমরা আজ যাহা হইয়াছি, তাহা কি করিয়া হইলাম, ভূমণ্ডলের অন্যান্য অংশের মানুষেরা কি প্রকার, তাহারা কি ভাবে, কি করে, অসভ্য জাতিরা কিরূপে সভ্যতায় নীত হয়, এই সকল ও এবম্বিধ অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর কে না জানিতে ইচ্ছা করে? এই নূতন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া। অদ্য আমরা ইহার একটি বিশেষ বিভাগ Folklore * অর্থাৎ উপকথাতত্ত্ব সম্বন্ধে গুটিকতক কথা বলিব।

আমরা সকলেই বাল্যাবস্থায় বৃদ্ধা ঠাকুরমা কিম্বা দিদিমার নিকট নানারকম "রূপকথা" শুনিয়াছি। সেই সব রাক্ষসের গল্প, সোনার কাটি রূপার কাটির গল্প, কত পশু-পক্ষীর গল্প, যাহারা ঠিক মানুষের মত কথাবার্ত্তা কহিত, মানুষের মত ব্যবহার করিত, কাহার না মনে পড়ে? আজ কাল সে সব গল্প আমাদের মেয়েরা শিখে না, বলিতে পারে না; আজকাল পুরুষদিগের মধ্যেও অনেকে সেগুলিকে নেহাৎ ছেলেমানুষি মনে করেন। কিন্তু এ সংস্কারটি নিতান্ত ভুল। অন্যান্য দেশের "রূপকথা" সংগ্রহ করা হইয়াছে। তৎসমুদয় পড়িলে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে নানা-স্থানের "রূপকথা"র মধ্যে একটা বেশ সাদৃশ্য আছে; সেই এক ধরণেরই গল্প অনেক দেশে প্রচলিত। কেবল যে ভারত-বর্ষেরই নানাস্থানে সেইরূপ গল্প শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। সেই রকম গল্প বলিয়া হয়ত তিহারাণে মাতারা শিশুকে ভুলায়, সেই গল্পই হয়ত স্যাক্সনিদেশে ঘরে অগ্নির নিকট, ডেভনশায়রে ছেলের দোলা নাড়িতে নাড়িতে, পরিচারিকা আবৃত্তি করে। অবশ্য গল্পটি দেশবিশেষে কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু মোট কথাটা এক। সকলেই জানেন একই গল্প পাঁচ জন লোকে বলিলে কত বৈষম্য ঘটে। দেশ ও কালবিশেষে যে প্রভেদ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় ছেলেবেলায় সেই চতুর শৃগালের গল্প শুনিয়াছেন, বেগুনক্ষেতে বেগুন খাইতে গিয়া যাহার নাকে কাঁটা ফুটিয়াছিল। সেই কাঁটা বাহির করাইবার জন্য সে এক নাপিতের বাড়ী যায়; নাপিত কাঁটা বাহির করিতে গিয়া শিয়ালের নাক কাটিয়া ফেলে, শিয়াল নাপিতের নরুন কাড়িয়া লয়, পরে নরুনটির পরিবর্ত্তে একটি হাঁড়ি পায়, এবং ক্রমিক বিনিময়ের দ্বারা নানারূপ দ্রব্য লাভ করে, এবং শেষে একটা ঢোল পাইয়া এক তালগাছের উপর উঠিয়া 'ড্যাং ড্যাঙ্গা ড্যাং ড্যাং' করিয়া গান গাহিতে গাহিতে পড়িয়া মরিয়া যায়। এই গল্পটি বঙ্গদেশের, কিন্তু অনেকটা এই মর্ম্মের একটি গল্প মান্দ্রাজের দিকেও প্রচলিত আছে। তবে তাহার বিশেষত্ব এই যে সে গল্পের নায়ক শিয়াল নয়, একটি বাঁদর। তাহার ল্যাজে কাঁটা ফুটিয়াছিল এবং সে নাপিতের নিকট হইতে একটি ক্ষুর আদায় করে। অবশেষে সেও এক উচ্চ বৃক্ষের উপর উঠিয়া ঢোল বাজাইয়া গান করিতে থাকে। তবে সে পড়িয়া মরে নাই। অল্প চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে উভয় দেশে সেই স্থানের একটি সামান্য অথচ চতুর জন্তুকে গল্পের নায়ক করা হইয়াছে। কিঞ্চিৎ স্থানিক রঞ্জনের প্রভেদ আছে মাত্র, গল্পের ভাব এক। আমার বোধ হয়, অনুসন্ধান করিলে হয়ত প্রকাশ হইতে পারে যে এই শিয়ালের গল্পের অন্য একটা রূপভেদ আমাদের দেশেও চলিত আছে। কারণ, আমি একবার একটি ছোট বাঙ্গালীর মেয়ের কাছে এই গল্পটি শুনিয়াছিলাম এবং সে শিয়ালের স্থানে বাঁদরের কথা বলিয়াছিল। সে মেয়েটির মান্দ্রাজের সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই। তবে সে যাহার নিকট গল্পটি শিখিয়াছিল, সে কোন্ জেলার লোক, তাহা আমি এখনও ঠিক জানিতে পারি নাই।*

এইত গেল একটা আমাদের দেশের উদাহরণ। এই

* এই বিদ্যার আলোচ্যবিষয় বড় অল্প নহে। টোমস্ সাহেব এই শব্দ ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ব্যবহার করেন এবং তাহার পরিচ্ছেদ এইরূপ নির্দ্দেশ করেন; "that department of the study of antiquities and archæology which embraces everything relating to ancient observances and customs, to the notions, beliefs, traditions, superstitions, and prejudices of the common people."

* বঙ্গদেশে এবং দক্ষিণভারতে প্রচলিত উপকথার তুলনা করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু শরৎচন্দ্র মিত্র ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে Journal of the Asiatic Society of Bengal এ একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন (Vol. LXVII, part 3, pp. 86-102)।

নাম একটা বিদেশীয় "পরীর গল্প" আলোচনা করুন। সিণ্ডেরেলার (Cinderella) গল্প অনেক ছেলেই পড়িয়াছে—সেই দুঃখী মাতৃহীনা বালিকার গল্প, যাহার বিমাতা ও বৈমাত্রেয়া ভগ্নীরা তাহাকে অনেক কষ্ট দিত, এবং যাহার অবশেষে একটি রাজপুত্রের সহিত বিবাহ হয়। শ্রীমতী মেরায়ন কক্স একটি পুস্তকে নানাদেশ হইতে এই গল্পের ৩৪১টী রূপান্তর (variants) সংগ্রহ করিয়াছেন। ছোট অসহায় মেয়েটি সুন্দরী ও নম্রস্বভাবা, অন্যদের তাহার প্রতি ঈর্ষা ও অত্যাচার, দৈবসাহায্য, এবং অবশেষে সেই পদদলিতার সুখসম্পদ লাভ, রাজপুত্রের সহিত বিবাহ—এই মর্ম্মের গল্প আমাদের দেশে কিছু নূতন নহে।

আবার ধরুন নৃপতি লিয়রের গল্প। জগৎকবি শেক্সপীয়রের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই নাটক (King Lear) কে না পড়িয়াছে ? সুতরাং গল্পটি বিস্তৃতভাবে লিখিবার প্রয়োজন নাই। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে লিয়র নামে পুরাকালে ব্রিটেনে এক রাজা ছিলেন; তিনি নিজের কন্যাদের পিতৃপ্রেম পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদের প্রত্যেককে এই প্রশ্ন করেন যে কে তাঁহাকে কতটা ভাল বাসে। তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা যথার্থ তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিত। কিন্তু সে অন্য ভগ্নীদের মত বাক্‌চাতুরী অবলম্বন করিয়া পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিল না, পিতার আদেশে পিতৃধনে বঞ্চিতা হইয়া দেশত্যাগিনী হইল। কিন্তু ফরাসীরাজের সহিত বিবাহ হওয়ায় সাংসারিক ক্লেশ তাহাকে বড় ভুগিতে হইল না। পরে অন্য কন্যাদের নিকট লাঞ্ছিত হইয়া লিয়র বুঝিলেন যে কনিষ্ঠা কর্ডীলিয়ায় তিনি কি রত্ন হারাইয়াছেন। এই নাটকটি পুরাতন প্রবাদের উপর গঠিত, ঐতিহাসিক নহে। সুতরাং একটি পঞ্জাবে প্রচলিত গল্পের সহিত এই প্রবাদের তুলনা করা যাইতে পারে। পাদরি স্বীনার্টন সাহেব (যিনি পঞ্জাবের উপকথা সংগ্রহ করিয়াছেন) নিম্নলিখিত গল্পটি লিখিয়াছেন। এক রাজার চারিটি কন্যা ছিল। তিনি তাহাদিগকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা আমায় কি রকম ভালবাস ?" প্রথমা বলিল, "চিনির মত।" দ্বিতীয়া উত্তর করিল, "মধুর মত।" তৃতীয়া বলিল, "সরবতের মত।" সর্ব্বকনিষ্ঠাকে কিন্তু রাজা যখন সেই প্রশ্ন করিলেন, তখন সে বলিল, "আমি আপনাকে লবণের মত ভালবাসি।" রাজা তাহার উত্তর শুনিয়া বড় অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে বনবাসে পাঠাইলেন। কন্যার ভাগ্য কিন্তু সুপ্রসন্ন ছিল। বনে তাহার এক রাজপুত্রের সহিত পরিচয় হইল। তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়া স্বদেশে লইয়া গেলেন। পরে কোন সময়ে তাহার পিতা ঐ রাজপুত্রের দেশে বেড়াইতে আসেন এবং রাজপুত্রের অতিথি হন। রাজকন্যা নিজের পিতার অভ্যর্থনার জন্য নানাপ্রকার সুমিষ্ট খাদ্যাদি প্রস্তুত করাইলেন, কিন্তু মিষ্টাধিক্য হেতু রাজা সে সকল খাইতে পারিলেন না। তখন রাজকন্যা পিতার সমক্ষে খানিকটা বেশ লবণ দেওয়া শাকভাজা আনিয়া রাখিলেন। রাজা তাহা পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিলেন। তাহার পর অবশ্য কন্যা আত্মপ্রকাশ করিলেন, এবং পিতা অতি সাদরে দুহিতার সহিত সম্মিলিত হইলেন। এখন তিনি বেশ ভালরূপেই চিনি ও লবণের মধ্যে প্রভেদ উপলব্ধি করিতে পারিলেন। স্বর্গীয় লালবিহারী দে মহাশয়ের ইংরাজী ভাষায় লিখিত বঙ্গীয় উপকথাসংগ্রহের মধ্যেও এবম্বিধ একটি কাহিনী আছে।

আর একটা দৃষ্টান্ত দি। পাঠকপাঠিকাবর্গের মধ্যে অনেকেই বোধহয় সাত ভাই চম্পার গল্পের সহিত পরিচিত আছেন। গল্পটি বড় সুন্দর। একটি রাণীর উপর্য্যুপরি সাতটি পুত্র ও একটি কন্যা হয়, কিন্তু আটটিকেই প্রসবান্তে শত্রুপক্ষীয়েরা পুতিয়া ফেলে। সেই স্থানে ক্রমে আটটি গাছ হইল, সাতটি চাঁপার, একটি পারুলের। এইরূপে ভ্রাতাভগ্নীরা কিছুদিন বৃক্ষাকারে শোভা পাইতে লাগিল, পরে আবার মানবাকারে পরিণত হয়। মনুষ্যজীবনের এইরূপ বৃক্ষজীবনে পরিবর্ত্তনের উদাহরণ নানাদেশে পাওয়া যায়। এখানে একটি আফ্রিকার গল্পের উল্লেখ সঙ্গত হইবে। আবিসীনিয়া দেশে একটি মেয়ের কথা শুনিতে পাওয়া যায় যার সাতটি ভাই ছিল। তাহাদের প্রাণবিয়োগ হওয়ায় তাহাদের অস্থিসকল সেই ভগ্নী কোন স্থানে পুতিয়া ফেলে। পরে সেইস্থানে সাতটি তালগাছ জন্মিয়াছিল। সিসিলিদ্বীপেও এই মর্ম্মের একটি গল্প চলিত আছে। এক রাজা একটি যুবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজমাতা নববধূর উপর প্রসন্ন ছিলেন না। সেই রাণীর পরে পরে বারটি পুত্র এবং একটি

কন্যা হয়, কিন্তু সবগুলিকেই তাঁহার শাশুড়ী ঠাকরুণ বাগানে পুতিয়া ফেলেন। সেই স্থানে বারটি কমলালেবুর এবং একটি কাগজিলেবুর গাছ জন্মে। পরে এই রাজসন্তানেরা আবার মনুষ্যাকার প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বিদেশীয় উপকথার সাদৃশ্যের দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমরা উপরে যে ৩।৪টির উল্লেখ করিলাম, তাহা হইতে, আশা করি, ইহা প্রতীত হইবে যে একরকমের এক মস্মের গল্প পৃথিবীর বিভিন্নাংশে প্রচলিত আছে। একদেশে কি একজাতীয় মনুষ্যের মধ্যে উপকথার সাদৃশ্য লক্ষিত হইলে বরং বলা যাইতে পারিত যে গল্পগুলির উৎপত্তি একস্থানেই হইয়াছে, অন্য স্থানে লোকপরম্পরায় গিয়াছে মাত্র। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে একধরণের ধারণা সকল বিভিন্ন দেশে বিভিন্নজাতির মধ্যে প্রচলিত, এবং সেই সব দেশবাসীর পরস্পর কোন সংস্রব নাই, তখন আর স্থানীয় সংসর্গের দোহাই দিলে চলিবে না। সাধারণ মানবচরিত্রে ও মানবজীবনে এই সাদৃশ্যের অর্থ ও কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আবার ধরুন আর একরকমের উপকথা। ইহাকে ইংরাজিতে myth বলে, আমরা পৌরাণিকী কথা বলিতে পারি। ইহার উদাহরণ, আমাদের দেশের দেবদেবীর গল্প! পুরাতন গ্রীস্ ও রোমে যে সকল দেবদেবীর কথা চলিত ছিল, তাহার সহিত আমাদের গল্প গুলি অনেক মিলে। আমাদের ইন্দ্রের সহিত জিউস্ বা জোভের, শচীর সহিত হীরা বা জুনোর, সরস্বতীর সহিত আথীনী বা মিনর্ভার, রতিদেবীর সহিত আফ্রোডিটী বা ভীনসের তুলনা করুন; দেখিবেন, প্রাচীন কল্পনায় কতটা সাদৃশ্য! শুধু দেবদেবীর গল্পে যে এরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তা নয়। অন্য পৌরাণিকী কথা আলোচনা করিয়া দেখুন। রামায়ণের মোট গল্পটা কি? সীতাহরণ ও সীতা উদ্ধার। এইবার ইলিয়াড্ দেখুন। তাহারও মোট কথা ইহার অনুরূপ—সেখানেও সেই স্ত্রীহরণ ব্যাপার, সেখানেও স্বামীর অনুষ্ঠানে বিরাটসংগ্রাম, সেখানেও পরিশেষে স্ত্রীউদ্ধার এবং হরণকারীর সর্বনাশ।

একদল পণ্ডিতেরা এই সকল গল্পের অর্থ রূপকের বলেন সীতা বা হেলেন হরণ আর কিছু নয়, সূর্য্যের অস্তগমন ও নিশাসমাগমের ছায়ামাত্র; এই কাণ্ড প্রত্যহ হইতেছে, প্রতি রাত্রে আলোক এবং অন্ধকারের যুদ্ধ হইতেছে, আর প্রত্যূষে আলোকের জয় হইতেছে, গভীর তিমিররাশিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পূর্ব্বাকাশে আবার সূর্য্যদেব সঞ্জীবনীরশ্মিজাল বিকীর্ণ করিতেছেন। কয়জন লোক কিন্তু রাম ও সীতাকে এইরূপ রূপকময়ী কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে প্রস্তুত আছেন? অনেক ব্যাখ্যায় এই রকম ব্যাখ্যাকর্ত্তার বুদ্ধিমত্তা যথেষ্ট প্রকটিত হয়, কিন্তু কথাটা বড় পাঠকের মনে লয় না।

এই স্থানে এটা বলা কর্ত্তব্য যে আচার্য্য মোক্ষমূলর পৌরাণিক আখ্যানের অর্থ সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিয়া অনেক নূতন কথা বলিয়া গিয়াছেন। পুরাণতত্ত্বশাস্ত্র (comparative mythology) তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। মোক্ষমূলরের ধারণা ছিল যে পুরাণগৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিবার এক চাবি—শব্দার্থ। প্রাচীন মানব নানারূপ স্বাভাবিক দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বিবিধ বিশেষণপদের দ্বারা তৎসমুদয়ের বর্ণনা করিবার চেষ্টা করে; পরে অন্যান্য বস্তুও এই সকল বিশেষণের দ্বারা অভিহিত হয়। ক্রমশঃ লোকে উক্ত পদগুলির আদিম অর্থ ভুলিয়া গেল এবং পুরাতন কথা নূতন অর্থে বুঝিতে লাগিল। এই রকমে পৌরাণিক আখ্যানের সৃষ্টি হইল। একটি উদাহরণ দিলে বোধ হয় অধ্যাপক মোক্ষমূলরের মতটি পাঠকবর্গের অধিক হৃদয়ঙ্গম হইবে। আপলো ও ডাফ্নীর আখ্যায়িকা অনেকের জানা থাকিতে পারে। আপলো (Apollo) গ্রীসদেশের একজন প্রধান দেবতা। তিনি দেবরাজ জিউসের পুত্র এবং কলাবিদ্যাসম্ভাবয়িতা, পরে সূর্য্যদেবের সহিত সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রীকপুরাণে প্রকাশ যে ইনি ডাফ্নী (Daphne) নাম্নী নদীকন্যার রূপে বিমোহিত হইয়া তাহার প্রেমপ্রার্থী হন। ডাফ্নী তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করায় তিনি যুবতীকে ধরিতে যান। যুবতী পলায়ন অসম্ভব দেখিয়া অন্য দেবতার স্মরণ যাচ্ঞা করেন, এবং তাঁহারা তাঁহাকে নারল (laurel) বৃক্ষে পরিণত করিয়া দেন। তদবধি নারল আপলোর প্রিয়বৃক্ষ হইয়াছে। আপলো

এবং সেকালে য়ুরোপে কবিদেরও ঐরূপ মালা পরাইয়া দেওয়া হইত। এই আখ্যানের ব্যাখ্যা পণ্ডিত মূলর এইরূপ করিয়াছেন। মনে কর পুরাকালে কেহ উষার পর সূর্য্য উঠে, এই তত্ত্ব ব্যক্ত করিবার জন্য বলিল, "উজ্জ্বলবস্তুটি জ্বলন্তবস্তুটির পশ্চাদ্গামী হয়"। কারণ উষাকালে সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে আকাশ অগ্নিশিখাভ হয়। এখন মনে কর, "উজ্জ্বল বস্তু" সে সময়ে আর্য্যজাতির মধ্যে গ্রীক 'হিলিয়স্' (= সূর্য্য) শব্দের অনুরূপ কোন পদবাচ্য ছিল, এবং মনে কর "জ্বলন্তবস্তু"র অর্থেও কোন বাক্য ব্যবহার হইত, যাহা সংস্কৃত 'অহন' বা 'দহন' (= উষা) শব্দের অনুরূপ ছিল। সময়ে 'হিলিয়স' অর্থে লোকে আপলো দেবকে বুঝিতে লাগিল, এবং 'দহন' ডাফ্‌নীতে পরিণত হইল। আরও মনে কর যে 'ডাফ্‌নী' অর্থে লোকে কোন বৃক্ষবিশেষ বুঝিতে আরম্ভ করিল, কারণ সেই বৃক্ষের কাষ্ঠ শীঘ্রই জ্বলিয়া উঠিত। তার পর এক সময় আসিল যখন গ্রীকেরা কথাগুলির আদিম অর্থ ভুলিয়া গেল। তখন আপলো ডাফ্‌নীর পশ্চাদ্গামী হইতেছে শুনিয়া লোকে কি বুঝিবে? তাহারা দেখিল 'আপলো' পুংলিঙ্গ শব্দ, 'ডাফ্‌না' স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ। কাজেই তাহারা অর্থ করিল যে 'দেবযুবক আপলো লালসাপীড়িত হইয়া ডাফ্‌নীনাম্নী এক দেবদুর্লভা ললনাকে ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সেই রূপসী আপনাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বনামধারী বৃক্ষে পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়েন।' এখন বোধহয় পাঠক-পাঠিকারা শব্দব্যুৎপত্তি শাস্ত্রের সাহায্যে আপলো-ডাফ্‌নী আখ্যায়িকার গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিয়াছেন। মোক্ষমূলর প্রভূত পাণ্ডিত্য সহকারে নিজের মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে শব্দসাধনবিদ্যার সাহায্যে অনেক দেবদেবীর নামের অর্থ করা যাইতে পারে, এবং নামের মানে বুঝিতে পারিলেই সেই দেব বা দেবীসম্বন্ধীয় গল্পসমূহের গূঢ়ার্থ সহজেই অনুভব করা যায়। গ্রীক জিউস্ শব্দের অর্থ লোকে পূর্ব্বে ঠিক বুঝিতে পারিত না, সংস্কৃতভাষার সাহায্যে এখন জানা গিয়াছে উহার অর্থ আকাশ (দ্যৌঃ)। সুতরাং আকাশের সম্বন্ধে আদিম নর যাহা বলিয়াছে বা ভাবিয়াছে সে সবই মোক্ষমূলরের মতে জিউস্ সংক্রান্ত আখ্যান হইয়া উঠিতেপারে।

অধ্যাপক মূলরের মত তাহা হইলে এইরূপ দাঁড়াইতেছে। পৌরাণিকী কথার উৎপত্তি ভাষার দোষে বা গুণে। ইহা একটা মানুষের সৃষ্টি সন্দেহ নাই, কিন্তু অধ্যাপকের মতে মানুষের ভাষা ও চিন্তা একত্রীভূত হইয়া এই বিচিত্রপুরাণরাশি সৃষ্টি করিয়াছে।* একথা যে একে বারে অসত্য, তাহা বোধ হয় কেহ বলিবেন না। যথার্থই শব্দব্যুৎপত্তিশাস্ত্রের সাহায্যে অনেক পুরাতন জিনিষ এখন আমরা এক নূতন আলোকে দেখিতে শিখিয়াছি; অনেক জিনিষ যাহা পূর্ব্বে বুঝা যাইত না, এখন বুঝা যায়। কিন্তু যখন বিবেচনা করা যায় যে এই রকমের আখ্যান অন্যজাতিদের মধ্যেও পাওয়া যায়, যদিও তাহারা আর্য্যভাষা কহে না এবং তাহাদের সহিত আর্য্যজাতির কোন সংশ্রবের প্রমাণ পাওয়া যায় না; যখন আরও বিবেচনা করা যায় যে আমরা যেরূপে নৈসর্গিক ব্যাপার দেখি ও চিন্তা করি, অসভ্য মানবেরা এখনও সেরূপ করে না ও পূর্ব্বেও সেরূপ বোধ হয় করিত না—তাহারা জগতের সকল পদার্থই সজীব মনে করে এবং তাহাদের দেবদেবীকে ঠিক মানুষের মত কল্পনা করে; যখন আবার দেখিতে পাওয়া যায় যে শব্দার্থ লইয়া শাব্দিকদের মধ্যে ঘোর বিবাদ, একজনের নির্দ্ধারিত মূল (root) আর একজন স্বীকার করেন না;† তখন মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে অধ্যাপক মোক্ষমূলর ভাষার উপর কিছু অযথা জোর দিয়া ফেলিয়াছেন, মানবচিন্তাই এ প্রসঙ্গে প্রাধান্য পাইবার অধিকারী। পৌরাণিকী কথার মধ্যে রূপক অংশ, প্রাকৃতিক ঘটনা ব্যাখ্যার চেষ্টা, ইত্যাদি ত সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা বুঝিতে পারা যায় না, সেটা তাহার যুক্তিহীন, অর্থহীন এবং অসভ্য অংশ (যাহাকে মোক্ষমূলর "the silly senseless and savage element" বলিয়াছেন)। এই ধরুন দেবাদিদেব মহেশ্বর, এ হেন দেব "ভূত নাচাইয়া" কেন "ফিরে ঘরে ঘরে"। এ হেন দেবের কেন "কণ্ঠভরা বিষ"? আবার ইন্দ্রকে দেখুন, ইনি ত দেবরাজ, কিন্তু

* It is man, it is human thought and human language combined, which naturally and necessarily produced the strange conglomerate of ancient fable."—Max Müller, *Lectures on Language*, 2nd series, p. 410.

† একটা উদাহরণ স্বরূপ বলি, আমেরিকার বিখ্যাত পণ্ডিত হুইটনি (Whitney) স্বীকার করেন না যে সংস্কৃতভাষায় উষা অর্থে 'দহন' শব্দ কখন প্রচলিত ছিল।

অহল্যার সহিত ইঁহার নাম দেবভাবে জড়িত নয়। আবার দেবীদের মধ্যে মহাদেবের দুই পত্নীকে স্মরণ করুন;—একদিকে সেই চিরপ্রসন্না অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি, অন্যদিকে সেই নরমুণ্ডমালিনী শ্যামামূর্ত্তি। বেশী উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। পাঠক পাঠিকারা সহজেই আমাদের দেবদেবীর অনেক কার্য্য ও কীর্ত্তি স্মরণ করিতে পারিবেন, যাহা দেবচরিত্রে ঘোর কলঙ্কের কারণ। শুদ্ধ হিন্দুদেবদেবীই যে এইরূপ ছিলেন, তাহা নহে; সুসভ্য গ্রীসের দেবদেবীও লম্পট, নিষ্ঠুর, যথার্থ দেবত্বহীন। পৌরাণিক আখ্যানের এই অংশটা শব্দব্যুৎপত্তিশাস্ত্রের সাহায্যে ভাল বুঝা যায় না। কিন্তু যখন আমরা অসভ্যজাতির পুরাণ আলোচনা করি, তখন দেখিতে পাই যে তাহাদের দেবতারা ভারি অত্যাচারী; তাঁহারা নানারূপ কীর্ত্তি করেন, যাহা দেবতার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এই অসভ্য দেবদেবীর কার্য্যকলাপ তুলনা করিলে এটা প্রতীত হয় যে আমাদের বা গ্রীকপুরাণের কোন কোন অংশ কোন এক সময়ে উৎপন্ন, যখন হয় আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এইরূপ অসভ্য ছিলেন, কিম্বা অসভ্যজাতির সংসর্গে আসিয়া তাহাদের আচার ব্যবহার এবং তাহাদের বিশ্বাসধারণা খানিকটা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক আখ্যানের এই অসভ্য অংশ এক চিন্তাস্তরের অবশেষ, যে স্তর অনেক অসভ্য জাতি এখনও অতিক্রম করিতে পারে নাই; ভাষার দোষে তাহার উৎপত্তি নহে, মানবচিন্তাবিকারে তাহার উৎপত্তি।

কিন্তু উপকথা ও পুরাণেই এই নূতন বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় শেষ হয় নাই। মানবাচারসমূহ ইহার অনুশীলনের এক মহান্ উপযোগী বিষয়। কত রকমের চলিত প্রথা ও অনুষ্ঠান আছে, আমরা রোজ হয় ত সে সব করিতেছি, রোজ হয় ত দেখিতেছি; কিন্তু কয়জন লোক এই বিচারে প্রবৃত্ত হয় যে, এ সকল অনুষ্ঠানের অর্থ বা কারণ কি? এ প্রশ্নই বোধ হয় অনেক লোকের মনে উদয় হয় না। এই প্রশ্নের উত্তরের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করা উপকথাতত্ত্ববিদ্যার একটি মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঐ দেখুন, আমাদের ইংরাজি-আলোকপ্রাপ্ত বন্ধু একটা ঘোড়ার নালের আকারের সুবর্ণবস্তু তাঁহার ঘড়ির চেনে আটকাইয়াছেন। তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, "এটা কি?" তিনি বলিবেন, "সৌভাগ্যের (good luck) চিহ্ন।" অনুসন্ধান করিলে কিন্তু আপনি জানিতে পারিবেন যে উহার গুণ যাহা বলা হয় সেটা নালে বর্ত্তমান আছে পরন্তু সুবর্ণে নাই। অভ্যাসবশতঃ ঐ সুবর্ণালঙ্কার সাহেবেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। আরও অনুসন্ধান করিলে আপনি জানিতে পারিবেন যে নালের সৌভাগ্যচিহ্ন হইবার কারণ এই যে উহা লৌহবিনির্ম্মিত। লৌহের কত গুণ! লৌহ নিকটে থাকিলে কোনরকম অনিষ্ট হইতে পারে না, লৌহ সকল অনিষ্টকারী ও পাপ-শক্তিকে নিরাকৃত করে। সেই জন্যই গৃহিণীর হস্তে লৌহ দেখিতে পাইবেন (আজকালকার নব্যারা কিন্তু লৌহটা স্বর্ণদ্বারা ঢাকিয়া ফেলেন!), সেই জন্যই দেখিবেন যে কচিছেলেটিকে একলা শুয়াইয়া গেলে তিনি তাহার শিয়রে লোহার কাজললতা রাখিয়া যান, সেইজন্যই দেখিবেন যে ছেলেমেয়ের অসুখ হইলে তাহার বিছানার তলে তিনি কোন লৌহের বস্তু রাখিয়া দেন। কোন কোন ছেলের পায়ে লৌহের বেড়ি দেখিতে পাইবেন। তাহার অর্থ কি? সেই বালকের অগ্রজাত ভাইভগ্নী অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছে, তাই এই পুত্রকে অনিষ্ট হইতে—যম ও ভূতের হস্ত হইতে—রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে লৌহধারণ করান হইয়াছে। আমাদের মেয়েদের এইরূপ সংস্কার আছে যে লৌহ নিকটে থাকিলে ভূতে ধরিতে পারে না। লৌহের এত মর্য্যাদা কেন হইল যদি জানিতে চাহেন ত অনুসন্ধান আরও একটু বেশী দূর লইয়া যাওয়া আবশ্যক। আজকাল বিজ্ঞানসাহায্যে আমরা শিখিয়াছি যে আদিম মনুষ্য প্রথমে প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা সকল কার্য্য অতিবাহিত করিবার চেষ্টা করিত। তখন ধাতু সকল আবিষ্কৃত হয় নাই, লোকে পায় নাই, চিনিত না। পৃথিবী খনন করিয়া নানারকম প্রস্তরের অস্ত্র প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তরযুগ গত হইল, ক্রমশঃ লোকে লৌহ আবিষ্কার করিল। এই আবিষ্কারে নিশ্চয়ই একটা ঘোর পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। প্রস্তরের তুলনায় লৌহের উপকারিতা সহজেই উপলব্ধ হইতে পারে। লৌহব্যবহারকারী মানব প্রস্তরব্যবহারকারীকে সর্ব্বত্র পরাভূত করিল, চতুর্দ্দিকেই লৌহের আদর বাড়িতে লাগিল। সাধারণ [illegible]

করিতে পারে নাই। আদিম বা অসভ্য মানব যে লোহে নানারূপ অলৌকিক গুণ দেখিতে পাইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? আর সভ্যজাতির মধ্যে পুরাতন সংস্কার থাকিয়া যাওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নহে।

এইবার একটা বহুদেশব্যাপী প্রথার বিচার করা যাউক। বরক'নে প্রথম ঘরে আসিলে আমরা তাহাদের বরণ আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি করি। এই আচারের মধ্যে তাহাদের মস্তকের উপর ধান দূর্ব্বা রাখা একটি প্রধান নিয়ম। অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে পৃথিবীর নানাস্থানে ধান কিম্বা চাউলের এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত আছে। বিলাতে দম্পতিযুগলের উপর চাউল নিক্ষেপ করা হয়; সিলিবিস দ্বীপে শুদ্ধ বরের গাত্রে চাউল নিক্ষেপ করা হয়। দক্ষিণ-ভারতবর্ষে অনার্য্যজাতিদের মধ্যেও এইরূপ প্রথা আছে; বর ও ক'নে উভয়ে পরস্পরের মথে চাউল নিক্ষেপ করেন, এবং বাড়ীর কর্ত্তা ও গৃহিণীরা উভয়ের উপরে চাউল ঢালিয়া দেন। পরে কুটুম্বভোজে সেই চাউল ব্যবহৃত হয়। এই প্রথার অর্থ কি, যদি কোন বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করেন, ত শুনিবেন যে ইহা একটি মঙ্গলাচরণ, চাউল বৃদ্ধির চিহ্ন-স্বরূপ। এই শেষ বিশ্বাসের আরও একটা উদাহরণ দি। বোর্ণিও দ্বীপের সন্নিকট ক্ষুদ্রদ্বীপপুঞ্জে দেখা গিয়াছে যে তথাকার লোকেরা সুবর্ণ বা মণিমুক্তা পাইলে তাহার সহিত অল্প চাউল রাখিয়া দেয়। সে দেশবাসীদের ধারণা যে চাউল-সংযোগে ঐ সুবর্ণ বা মণিমুক্তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।

এই খানেই আর একটি বিবাহসংক্রান্ত আচারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেক পাঠকপাঠিকাই বোধ হয় জানেন যে বিলাতে বিবাহান্তে যখন বরক'নে ধর্ম্মমন্দির হইতে প্রত্যাগমন করেন, লোকে পুরাতন জুতা তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করে। এই প্রথা তুর্কদিগের মধ্যে এবং ট্রান-সিলভেনিয়ায় বেদিয়াজাতির মধ্যেও চলিত আছে। তুর্ক-দিগের মধ্যে বরের উপর এত পুরাতন জুতাবর্ষণ হয় যে সে বেচারি প্রাণের দায়ে ছুটিয়া অন্দরমহলে গিয়া আশ্রয় লয়। তাহাদের বিশ্বাস যে এই জুতাবর্ষণ দুষ্ট বা পাপদৃষ্টি দূরীভূত করে। বেদিয়াদের ধারণা যে বিবাহান্তে দম্পতিকে পাদুকাবৃষ্টির সহিত তাহাদের কুটীরে অভ্যর্থনা করিলে বর্ষেরও কোন কোন স্থানে অমঙ্গলদৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য লোকে চর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে অনেক দুঃখী গ্রামবাসী আপনার কুটীরের চালে একপাটি জুতা উলটাইয়া গুঁজিয়া রাখে। বিশ্বাস এই যে ভূত আসিবে না, দুষ্টলোকের দৃষ্টি পড়িবে না।

এই বিবাহপ্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে পড়িল। হোমাগ্নির চতুর্দ্দিকে যখন বরক'নেকে ঘুরান হয়, পাঠকপাঠিকারা হয় ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে তাহাদের দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে লইয়া যাওয়া হয়। সেইরূপ যখন কোন হিন্দু কোন মন্দির পরিক্রমণ করেন, তিনি দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে ঘুরেন। এই রকম গ্রামে কোন কোলুর বাড়ী যাইয়া যদি দেখেন ত দেখিবেন যে ঘানির চতুর্দ্দিকে বলদও সেই দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে যাইতেছে। দুটা বিদেশীয় উদাহরণ দি। শুনিয়াছি, সাহেবেরা খানার সময় মদের বোতলটা দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে চালান দেন। স্কট্-ল্যাণ্ডে কাহারও স্বস্তিকামনা করিলে তাহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। সেই দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে, সর্ব্বত্র এই বিধি। ইহার কারণ কি? এ প্রশ্নেরও উত্তর পুরাণতত্ত্ব হইতে পাওয়া যায়। মানব প্রায় সর্ব্বত্রই প্রথমে সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়াছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্তের সমান মহান দৃশ্য আর কি আছে? আমরা দেখি না, গ্রাহ্য করি না, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি, প্রথম মানুষ প্রাতে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া পূর্ব্বাকাশে এই আলোকপ্রকাশ দেখিয়া কিরূপ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকিবে; আর, এখনও অসভ্য মানব, যে কুটীর নির্ম্মাণ করিতে শিখে নাই, বৃক্ষতলে নিশাযাপন করে, এই প্রাত্যহিক আলোক ও অন্ধকারের খেলা দেখিয়া নিশ্চয়ই কিরূপ বিস্মিত হয়! সুতরাং সূর্য্যদেব যে মানবহৃদয়ে শীঘ্র অত্যুচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? বিশেষ করিয়া ভারতবর্ষ এমন দেশ যে এখানে লোকের প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর। এরূপ স্থানে যে সূর্য্য-দেব আদিম মানবের সরলহৃদয়ে খুবই প্রাধান্য লাভ করি-বেন, তাহা অনায়াসে অনুমিত হয়। সূর্য্যদেবের গতি দক্ষিণ হইতে বামে। এই সৌরগতির অনুকরণে দক্ষিণ হইতে

কত উদাহরণ দিব? যত অনুসন্ধান করা যায়, যত মনোযোগের সহিত দেখা যায়, ততই লৌকিক ব্যবহারে, আচার অনুষ্ঠানে, ধারণা ও সংস্কারে দেশবিদেশে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই মনে করুন, বাঙ্গালির মেয়েরা বলে, শুধু দোলায় দোল দিতে নাই, তাহাতে ছেলে শুয়াইয়া তবে দোল দিবে। হয়ত পাঠকপাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে এই সংস্কার চীনদেশে আছে, হল্যাণ্ডে আছে, সুইডেনে আছে, স্কট্‌ল্যাণ্ডেও আছে।

> Oh, rock not the cradle when the baby's not in,
> For this by old women is counted a sin.

আমাদের দেশে হাঁচি পড়িলে লোকে বলে "জীব সহস্র বৎসর", "শতজীব"; বিলাতে বলে "God bless you" কিম্বা "Good luck to you"। নানাদেশে এই রকমের প্রথার প্রচলন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে:—ফ্লরিডা, জুলুদেশ, পশ্চিম আফ্রিকা, পুরাতন রোম ও গ্রীস, এবং অন্যান্য স্থানেও হাঁচি পড়িলে মঙ্গলবাক্য বলিবার প্রথা আছে বা ছিল। আমাদের ইহা অভ্যাসসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কয়জন লোক জানে, কি ভাবে, যে পুরাকালে হাঁচি পড়িলে যথার্থই মঙ্গলকামনা করা প্রয়োজন হইত? কারণ তখন লোকের এই ধারণা ছিল যে, কোন দুষ্ট আত্মা (ভূত বা দৈত্য) শরীরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে হাঁচি হয়।

পাঠকপাঠিকারা হয়ত নিশি ডাকার কথা শুনিয়া থাকিবেন। কাহারও উৎকট রোগ হইলে সেকালে নিশিডাকা হইত। কিছু পূজা হইত, তাহার পর ঘোর রাত্রে একজন লোক হাতে একটা কাটা ডাব লইয়া বাহির হইত, এবং বাড়ী বাড়ী গিয়া গ্রামবাসীদের নাম ডাকিত। যদি কেহ উত্তর করিল, অমনি ডাবের মুখ বন্ধ করা হইল, আর সেই ডাবের জল রোগীকে গিয়া খাওয়ান হইল। তখন বিশ্বাস এইরূপ ছিল যে যে উত্তর করিল সে রোগ বহন করিবে, হয়ত মরিবে, কিন্তু আসল রোগী সারিয়া উঠিবে। সেইজন্য শুনিতে পাওয়া যায় যে তখন রাত্রে তিনবার নাম না ডাকিলে কেহ উত্তর করিত না বা দ্বার খুলিত না, তিনবার ডাকিলে স্থির হইয়া যাইত যে নিশির ডাক নহে। এই অনুষ্ঠানের মূলভিত্তি কি? এই বিশ্বাস, যে রোগ চালিত হইতে পারে। এ সংস্কার আমাদের দেশে এখনও যায় নাই। আমি প্রত্যূষে বেড়াইতে গিয়া অনেক দিন পথে স্থানে স্থানে দেখিতে পাই যে কেহ জল ঢালিয়া কিছু পুষ্প ছড়াইয়া গিয়াছে। ছেলেবেলায় শিখিয়াছিলাম যে এইরূপ স্থান ডিঙ্গাইয়া যাইতে নাই। কেন? না, বাড়ীতে পীড়া হইলে লোকে ঐরকম ফুলপ্রভৃতি ছড়ায়। যে উহাকে ডিঙ্গাইবে বা মাড়াইবে, তাহার সেই পীড়া হইবে। এই রোগচালন বিশ্বাসটা যে কেবল আমাদের দেশে পাওয়া যায়, তাহা নহে। অসভ্যজাতির মধ্যে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়ই, আমি এখানে সুসভ্য বিলাত হইতে গৃহীত দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ডেভনশায়রে কোন বালকের হুপিং (whooping) কাশি হইলে তাহার মাথা হইতে একটি চুল কাটিয়া রুটিতে মাখন মাখাইয়া তাহার মধ্যে রাখা হয়। সেই রুটি পরে কুকুরকে খাইতে দেওয়া হয়; বিশ্বাস কাশিটা কুকুরের হইবে, ছেলে বাঁচিয়া যাইবে। এই ধারণা স্কট্‌ল্যাণ্ডের লোকেদেরও আছে। বিলাতে আবার কাহারও আঁচিল হইলে সে তাহাতে একটা আলপিন ফুটাইয়া ফেলিয়া দেয়। সংস্কার এই যে যে আলপিনটা পাইবে তাহার আঁচিল বাহির হইবে, প্রথম ব্যক্তির আঁচিলটা খসিয়া যাইবে।

আর একটা অদ্ভুত প্রথার উল্লেখ করিয়া এই উদাহরণমালার উপসংহার করিব। বৃষ্টির প্রয়োজন প্রায় সকলদেশেই আছে; বৃষ্টি না পড়িলে বৃষ্টি ডাকিবার জন্য নানাদেশে নানাপ্রকার অনুষ্ঠানও করা হয়। একটি অনুষ্ঠান কিন্তু অদ্ভুত, এবং সেটি য়ুরোপেও পাওয়া যায়, ভারতবর্ষেও দেখা যায়। বৃষ্টি না পড়িলে সার্ভিয়াদেশে একটি মেয়েকে বিবস্ত্রা করিয়া পুষ্পে ভূষিতা করা হয়। সেই মেয়েটি কতকগুলি সখীর সহিত বাড়ী বাড়ী যায় এবং প্রত্যেক বাড়ীতে নৃত্য করে। গৃহস্বামিনী বাহিরে আসিয়া সেই মেয়েটির মাথায় একঘটি জল ঢালিয়া দেন এবং তাহার সখীরা বৃষ্টিসঙ্গীত গাহিতে থাকে। রুশিয়াদেশেও বৃষ্টি না পড়িলে গ্রামের চতুর্দ্দিক দিয়া নগ্না স্ত্রীলোকে লাঙ্গল লইয়া যায় এবং সন্ধিস্থানে একটি মুর্গী, একটি কুকুর এবং একটি বিড়াল পুতিয়া রাখে। রুশিয়ায় বিড়ালটি পবিত্র জীব এবং কুকুর

পুতিবার উদ্দেশ্য বোধহয় শিবাশিব দুই শক্তিকেই প্রসন্ন করা। এই নগ্নীভবনরীতির সদৃশ অনুষ্ঠানের কতকগুলি দৃষ্টান্ত ক্রুকসাহেব ভারতবর্ষে সংগ্রহীত করিয়াছেন।* ১৮৭৩।৭৪ সালে গোরক্ষপুর জেলায় দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সেই সময় নাকি রাত্রে বিবসনা স্ত্রীলোকেরা ক্ষেত্রসমূহে লাঙ্গল লইয়া ঘুরিত এবং বৃষ্টিদেবের আরাধনা করিত; পুরুষেরা তখন সেখানে আসিত না; তাহারা দেখিলে মন্ত্র বিফল হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কা। ১৮৯২ সালে অনেক দিন মির্জাপুর জেলায় বৃষ্টি পড়ে নাই। অবশেষে ২৭শে জুলাই তারিখে চুনারে এই ঘটনা হয়। রাত্রি ৯টা ও ১০টার মধ্যে এক নাপিতের স্ত্রী বাড়ী বাড়ী যাইয়া সকল স্ত্রীলোককে কর্ষণকার্য্যে যোগ দিতে আহ্বান করে। পরে তাহারা সকলে এক ক্ষেত্রে যাইয়া সমবেত হয় এবং পুরুষদিগকে সেখান হইতে সরাইয়া দেওয়া হয়। তখন এক কৃষকের বাড়ীর তিনটি স্ত্রীলোক পরিধেয় বস্ত্র খুলিয়া ফেলে, তাহাদের মধ্যে দুইটিকে বলদের মত লাঙ্গলে নিযুক্ত করা হয়, অন্যটি হলদণ্ডের বাঁট ধরে। তাহার পর সেই দুইটি স্ত্রীলোক লাঙ্গল টানিতে থাকে এবং অপরটি উচ্চৈঃস্বরে পৃথ্বীমাতার নিকট ধান, জল ও ভূমি প্রার্থনা করে ও বলে, "মা, আমাদের পেট ক্ষুধায় শুকায় ফাটিয়া যাইতেছে।" তখন গ্রামের জমিদার ও সরকার আসিয়া ক্ষেত্রের একধারে কিঞ্চিৎ ধান, জল ও ভূমি রাখিয়া যায়। তাহার পর সেই তিনটি স্ত্রীলোক পুনরায় বস্ত্র পরিধান করে এবং সকলে গৃহে প্রত্যাগমন করে। পরদিন নাকি বেশ বৃষ্টি হইয়াছিল। নগ্নতার সহিত বৃষ্টির কি সম্পর্ক ঠিক বুঝা যায় না, কিন্তু শুনা যায় যে ছত্তরপুর নগরে বৃষ্টি পড়িলে বুধবার ও রবিবার দিবসে বাড়ীর বধূ এবং তাহার ননদ দুইজনেই বিবস্ত্রা হইয়া ধান রাখিবার 'খাঁড়'তে যাইয়া সাতখানি গোবরের ঘুঁটিয়া ফেলিয়া আসে। বাড়ীতে মেয়েরা না থাকিলে মামা-ভাগিনেয়কে যাইয়া এই অনুষ্ঠান করিতে হয়। ডাটলাগু সাহেব এইরূপ নগ্নীভবনানুষ্ঠানের বিষয় অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাহার মত যে এ সকল অনুষ্ঠান কোন পুরাতন গ্রামদেবীর সাম্বৎসরিক উৎসবের অবশেষ।।

* W. Crooke, *Introduction to the Popular Religion and Folklore of Northern India*, pp. 41-3.

উপরোক্ত উদাহরণগুলি বিবেচনা করিলে বোধ হয় পাঠকপাঠিকাগণ এই কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন :—

(১) একধরণের উপকথা, আখ্যান ও লোকাচার পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রচলিত আছে;

(২) এই সব দেশের লোক একজাতি হইতে উৎপন্ন, তাহাও বলা যায় না, এবং একজাতীয় ভাষা কহে, একথাও সত্য নহে;

(৩) সভ্যদেশে অনেক প্রকার রীতি ও সংস্কার প্রচলিত আছে, যাহার পূর্ণবিকাশ অসভ্যদেশে দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহার অর্থ অসভ্যজাতির বিশ্বাস ও ধারণা আলোচনা করিলেই সম্যক্ বুঝিতে পারা যায়।

এই মনে করুন, আমরা যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে শ্রাদ্ধাদির সময়ে জলদান ও পিণ্ডদান করি, আজকালিকার অনেক নব্যশিক্ষিতেরা হয় ত মনে করেন, ইহা একটি অর্থহীন রীতি, একটা কুসংস্কার মাত্র। কিন্তু আফ্রিকা আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানে অসভ্যজীবন পর্য্যালোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে আদিম মানব যথার্থই বিশ্বাস করিত যে মৃতব্যক্তিকে খাদ্যাদি দেওয়া আবশ্যক, মৃত্যু হইলেই জীবনের অবসান হয় না, আত্মা পরলোকে গমন করে এবং পৃথিবীতে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়, সমস্তই ভৌতিকাকারে সেই পরলোকে যাইতে পারে; সুতরাং সেই মৃতব্যক্তির বা প্রেতের ব্যবহারার্থ তাহার প্রিয়বস্তু সকল পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। শুধু নির্জ্জীব বস্তু নহে—শুধু কুঠার কি ধনু কি বাণ কি খাদ্যদ্রব্য নহে—প্রিয় ঘোড়াটি, প্রিয় কুকুরটিকে পর্য্যন্ত মারা হয়, পত্নী, ক্রীতদাস, বন্ধু, সকলের প্রাণবধ করা হয়, যাহাতে মৃতব্যক্তির কোন জিনিসের অনাটন না ঘটে। বিধবাবধ প্রথাও অনেক দেশেই পুরাকালে চলিত ছিল। এখনও ফিজিদ্বীপে কোন পুরুষের মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রীদিগকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় শ্বাসাবরোধ করিয়া মারিয়া ফেলা হয়। ককেশসে মৃতব্যক্তির পত্নী এবং ঘোটক তাহার সমাধিস্তূপকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে, পরে সে বিধবারও আর কখন বিবাহ হয় না, সে ঘোটকেও আর কেহ চড়ে না। যে সতী আমাদের

খুব উচ্চ ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু কে বলিতে পারে যে সতীদাহ প্রথাটা পুরাকালে প্রেতাত্মার জীবনাবস্থান ও প্রয়োজনাবলিসংক্রান্ত অসভ্য বিশ্বাস হইতে প্রবর্ত্তিত হয় নাই?* সাহেবেরা যে সমাধিস্থানে ফুলের মালা প্রভৃতি রাখিয়া থাকেন, তাহা কি প্রেতাত্মার প্রীতির জন্য নহে? তাহা হইলে সভ্যতার অভ্যন্তরে অদ্যাবধি গাঢ় অসভ্যতা নিহিত রহিয়াছে।

সময়ে অনেক পরিবর্ত্তন হয়। অনেক বস্তু নূতন অর্থ ধারণ করে, অনেক চলিত আচার ও অনুষ্ঠানকে আধুনিক সভ্যতার সহিত মিলাইয়া লইবার চেষ্টা হয়। কিন্তু তথাপি অনেক প্রকার অনুষ্ঠান থাকিয়া যায়, যাহার আমরা কোন পণ্ডিত বা তাকিকোপযোগী ব্যাখ্যা দিতে পারি না, যাহার বিষয়ে স্বীকার করিতে হয়, যে 'ওটা একটা সেকেলে রীতি।' এই মনে করুন, বিবাহের পর যে সকল স্ত্রী-আচার হয়, কোনও পণ্ডিতে তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করেন না। কিন্তু এইরূপ আচারের অর্থ যদি অবগত হইতে চাহেন, তাহা হইলে সভ্যসমাজে ঘুরিলে হইবে না, সভ্যবিশ্বাসে ও সভ্যসংস্কারে তাহার স্থান নাই; যথার্থ দেখিতে গেলে উহা সভ্যতাবিরুদ্ধ। এণ্ড্রু ল্যাং বলিয়াছেন যে কোনদেশে একটা যুক্তি ও বিধিবিরুদ্ধ ব্যবহার দেখিতে পাইলে, তাহার অর্থ বুঝিতে হইলে এমন দেশে অনুসন্ধান করিবে, যেখানে ওরকম ব্যবহার যুক্তি ও বিধিবিরুদ্ধ নহে, বরং সে স্থানের লোকেদের আচার ও রীতির অনুরূপ।+ অধ্যাপক টাইলর বলেন যে সেকালের বিশ্বাস এবং আচারসমূহ বিবিধ মূঢ়তার জঞ্জালরাশি মাত্র, একথা মনে করা অত্যন্ত ভুল; একটু শ্রেণীবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেই তাহাদের মূলতত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। আর এইমূলতত্ত্ব অজ্ঞানপ্রসূত হইলেও যুক্তিবিরুদ্ধ নহে।* প্রাচীন এবং অসভ্য মানব সকলদেশেই বোধহয় একরূপ চিন্তা করিয়াছে। আমাদের চলিত উপকথা, পুরাণ ও লোকাচার সেই আদ্যকালের অবশেষ। বিভিন্ন জাতির আচার সংস্কারে একটু বিশেষত্ব থাকিতে পারে; কিন্তু এই উপকথা প্রভৃতির অনুশীলন করিলে যে আমরা অসভ্যতার ইতিহাস রচনা করিতে পারি, তাহাতে সন্দেহ নাই জগজ্জীবনের বাল্যাবস্থার ইতিহাস গড়া যাইতে পারে। আফ্রিকা বা গ্রীনল্যাণ্ডবাসীদের আচার ব্যবহার দেখিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের মনোভাব ও চিন্তার ইতিবৃত্ত আমরা খানিকটা উদ্ধার করিতে পারি, শুনিয়া হয় ত কেহ কেহ চমৎকৃত হইবেন, কিন্তু কথাটা সত্য। সুতরাং পাঠকপাঠিকার নিকট অনুরোধ যে তাঁহারা উপকথা ও লোকাচার সকল সংগ্রহ করুন। সকল গল্পই সংগ্রহ করা উচিত; কোন কথা অশ্লীল বা গ্রাম্য বা বালিশ বলিয়া ত্যাগ করা উচিত নয়। এইরূপ প্রত্যেক গল্প, প্রত্যেক সংস্কার (আপনারা হয় ত কুসংস্কার বলিবেন) মানবচিত্ত ও মানবচরিত্রের উপর প্রভূত আলোকবর্ষণ করে; এবং এই সকল গল্পকে বিদেশীয় গল্পের সহিত তুলনা করিলে অসভ্যতা হইতে সভ্যতার সেতু এবং মানবের ক্রমিক উন্নতির সোপান আমরা পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে পারি।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাশ্মীরদর্শন।

ইতিপূর্ব্বে সমুদ্রতীরে কয়েক বৎসর বাস করিয়াছিলাম। সমুদ্রের প্রশান্ত, উদার, উদাস মূর্ত্তি ও তরঙ্গভঙ্গভীষণ ঘোরগম্ভীরগর্জ্জিত রুদ্রমূর্ত্তি, দুই দেখিয়াছিলাম। পর্ব্বতশিখরেও কয়েক মাস বাস করিয়া নয়নের তৃপ্তিসাধন

* এখানে বলা আবশ্যক যে মোক্ষমূলরের মতে 'বিধবা' শব্দ হইতেই প্রমাণ হয় যে পুরাকালে আর্য্যজাতির মধ্যে সতীদাহ ছিল না। কারণ 'বিধবা'র শব্দার্থ পতিহীনা, কিন্তু 'ধব' (স্বামী) শব্দের প্রয়োগ এখন পাওয়া যায় না। সুতরাং শব্দটি নিশ্চয়ই খুব প্রাচীন হইবে। যে হেতু পতিহীনা স্ত্রীর জন্য বিশেষ একটা শব্দ এত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেইজন্য অনুমান করা যাইতে পারে যে সেকালের সমাজ বিধবাশূন্য ছিল না। Max Müller, *Chips*, vol. IV., p. 35.

+ When an apparently irrational and anomalous custom is found in any country the method is to look for a country where a similar practice is no longer irrational or anomalous, but in harmony with the manners and ideas of the people among whom it prevails.' A. Lang, *Custom and Myth*, p. 21.

* "Far from its [of savage religions] beliefs and practices being a rubbish heap of miscellaneous folly, they are consistent and logical in so high a degree as to begin as soon as even roughly classified, to display the principles of their formation and development and these principles prove to be essentially rational, though working in a mental condition of intense and inveterate ignorance." E. B. Tylor, *Primitive Culture*, vol. I., p. 22.

করিয়াছিলাম। একবার কাশ্মীর দেখিবার সাধ অনেক দিন হইতে মনে ছিল। যাত্রার সময় মনে কত রূপ কল্পনা উদয় হইতে লাগিল, তাহা বলিতে পারি না।

রাওয়ালপিণ্ডী পঁহুছিতে রাত্রি প্রায় দুইটা হইল। টঙ্গা প্রস্তুত ছিল। টঙ্গায় করিয়া মরী পাহাড়ে যাত্রা করিলাম। অনেকটা পথ সমভূমি। যখন চড়াই আরম্ভ হইল, তখন সূর্য্যোদয় হইতেছে। মরী যাইবার পথ সিমলা পথের মত সুন্দর নয়। মরীতে পঁহুছিতে বেলা প্রায় দশটা বাজিল। সেখানে আহার করিয়া টঙ্গা বদলাইয়া আবার বাহির হইলাম। পথে কোথাও কালবিলম্ব করিতে ইচ্ছা হইতেছিল না।

মরী হইতে কোহালায় একেবারে হু হু করিয়া নামিয়া যাইতে হয়। স্থানে স্থানে পথ খারাপ, আশঙ্কাও আছে। পথের দৃশ্যও তেমন মনোহর নয়। কোহালা বড় গরম; দুই ধারে পাহাড়, মধ্যে সঙ্কীর্ণ খাতে প্রহতশৈলচঞ্চলা আবিলসলিলা বিতস্তা বহিতেছে। তাহারই তীরে তীরে পথ। কোথাও অতি দূর নিম্নে ক্ষীণ সূর্য্যরশ্মিসমুদ্ভাসিত রজতসূত্রের ন্যায় স্রোতস্বিনী চলিয়াছে, জলকল্লোল শ্রুতিগোচর হয় না; কোথাও জলপ্রবাহ অতি নিকটে, ঝর ঝর ঘর ঘর রবে অর্দ্ধজলমগ্ন শৈলখণ্ডে আঘাত করিতে করিতে ছুটিয়াছে।

কোহালায় পুল পার হইতে হয়; পুলের এ পারে বৃটিশ রাজ্য, ও পারে কাশ্মীর রাজ্য। এ পারে পঞ্জাবী পুলিস, ওপারে কাশ্মীরী বন্দুকী। মহারাজা রণবীর সিংহের আমলে এই স্থানে বড় কঠিন প্রহরা থাকিত। কোন ইংরাজ আসিলেই দুইজন বন্দুকী তাহার সঙ্গ লইত। এখন সে শাসন নাই, কেবল বিড়ম্বনা আছে। পুল পার হইলেই নাম জিজ্ঞাসা করে, কে কি বৃত্তান্ত জানিতে চায়, শেষে একটা ধমক খাইয়া সরিয়া যায়। কোহালা পার হইয়া ক্রমে ক্রমে কাশ্মীরের অতুল নিসর্গ-ঐশ্বর্য্য চক্ষের সম্মুখে ফুটিতে লাগিল। স্থানে স্থানে নদী প্রশস্ত হইয়া দীর্ঘ বাঁকে ফিরিয়াছে, অপর দিকে ঘনবিন্যস্ত, গাঢ় বিটপীপূর্ণ শৈলশিখর, স্তরের পর স্তর, তাহার পর স্তর, সেই বিশাল, গম্ভীর, অতুল শোভা দেখিতে দেখিতে মন বিস্ময়পুলকে, বিমলানন্দে পূর্ণ হয়। দোমেলে পঁহুছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দোমেল—দুই মেল—বিতস্তার সহিত কৃষ্ণগঙ্গার মিলন। বিতস্তার জল সাদা, কৃষ্ণগঙ্গা শ্যামসলিলা—প্রয়াগে গঙ্গাযমুনার মিলনতুল্য। কিন্তু মিলনের সে স্থান আর কোথায় দেখিবে? পর্ব্বতের একটি চূড়া সম্মুখে প্রকাশ হইলে বিস্মিত হইতে হয়, কিন্তু এমন চূড়ার পরে চূড়া আর কোথাও দেখি নাই। প্রত্যেক শিখরে ভিন্নজাতীয় বৃক্ষ, প্রত্যেক শিখর মহাকায় পর্ব্বতসদৃশ। পর্ব্বতের পদতলে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে, শিরোদেশে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত কোমল কিরণ জ্বলিতেছে। মনে হইতে লাগিল যেন নদীতীরে দণ্ডায়মান হইয়া শ্যামজটাধারী পর্ব্বতরূপী ঋষিগণ নীরব, বিরাট সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছেন!

রাত্রিকালে টঙ্গা চলে না। গড়হীতে আহার করিয়া শয়ন। প্রত্যূষে উঠিয়াই আবার যাত্রা। ডাকবাংলাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মহারাজার সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র আবাসস্থান। মহারাজা এমন হিন্দু যে ডাকবাংলায় নামিলে হয় ত তাঁহার আহারই হয় না। বৈকালে বেলা তিনটার সময় বরাহমূলায় উপনীত হইলাম। এই স্থান হইতে কাশ্মীর উপত্যকার যথার্থ আরম্ভ। কারণ সেই স্রোতোজীর্ণ যুগ্ম পর্ব্বতশ্রেণী এই স্থানে পরস্পরের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে, মধ্যে বিস্তৃত সমতল ভূমি। নদীরও সে ছিন্ন ভিন্ন কোলাহলপূর্ণ রুষ্যমান মূর্ত্তি আর নাই, রূপালঙ্কৃতা অলসমন্থরগামিনী যুবতীর ন্যায় গতি। নদীতটে, নদীবক্ষে নৌকা ভাসিতেছে। ভূমির উর্ব্বরতাও এই স্থানে অনুভব করিতে পারা যায়। সেরূপ ধান্যক্ষেত্র আর কোথাও নাই, এমন গাঢ় হরিদ্বর্ণও বুঝি আর কোথাও নাই! এই স্থানে প্রথমে বহুসংখ্যক সফেদা বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইয়োরোপে যাহাকে পপ্লার বলে, তাহাই সফেদা। এত উচ্চ বৃক্ষ অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই পর্য্যন্ত টঙ্গা ছিল, এইখানে নৌকা করিতে হইত। ইংরাজের সহিত সর্ব্বদা থাকিয়া এই স্থানের মাঝিরা এত চতুর হইয়া উঠিয়াছে যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কলিকাতার মাঝির অপেক্ষা তাহারা সেয়ানা। সাহেব ঠকাইয়া অনেকেই বিস্তর অর্থসঞ্চয় করিয়াছে। এখন শ্রীনগর পর্য্যন্ত টঙ্গা হইয়াছে, যাহাদের সময় অল্প তাহারা আর বরাহমূলায় নৌকা করে না। নিরাপদ

কাশ্মীরী স্ত্রীলোক দেখিয়াছিলাম, কিন্তু এক বেশের প্রভেদ ব্যতীত আর কোন প্রভেদ লক্ষ্য করি নাই। কাশ্মীরী পুরুষকে দেখিবার জন্য কাশ্মীরে যাইতে হয় না, কাবুলী পাঠানদিগের মত তাহারা সর্ব্বত্র ছাইয়া পড়িয়াছে। বরাহমূলা পার হইয়া প্রভেদ লক্ষিত হইতে লাগিল। টঙ্গার শব্দ শুনিয়া ধান্য অথবা অপর ক্ষেত্র হইতে একটি অথবা দুইটি স্ত্রীলোক উঠিয়া চাহিয়া দেখে, অমনি একটা রূপের ছবি চক্ষের উপর দিয়া চলিয়া যায়। পরিধানে আপাদস্কন্ধ একটা বৃহৎ আলখাল্লা জামা, প্রায় মলিন। হাতাগুলা হাতের অপেক্ষা অনেক বড়, মাথায় কাপড়ের টুপি। দুই এক বার অবসর পাইয়া ভাল করিয়া দেখিলাম সেরূপ বর্ণ ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু কিছু অধিক লাল, অঙ্গ কিছু স্থূল, লাবণ্যের অভাব, মুখের শ্রী কিছু কর্কশ। ইহারা সব মুসলমান। একজন ইংরাজ আমাকে একবার বলিয়াছিলেন, কাশ্মীরের সুন্দরীদিগের যে এত প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি কাশ্মীরে তাহার কিছু দেখেন নাই। ভাবিলাম, ইংরাজ তবে সত্য বলিয়াছিলেন। কিন্তু কাশ্মীরের স্ত্রীলোকের রূপ আমি তখনও দেখি নাই। ধান্যক্ষেত্রে অথবা নৌকায় সে রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কুৎসিত নরনারীর সংখ্যা বিরল—ইহা সকলেই লক্ষ্য করে।

শ্রীনগরে পহুছিতে সূর্য্য অস্ত গেল। মীরা কা কতল নামক স্থানে নৌকা ছিল, সেইখানে টঙ্গা দাড়াইল। এই রকম নৌকাকে নৌগৃহ (house boat) বলে। দেখিতে ঠিক বাড়ীর মত, বজরার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ঘরগুলি বেশ বড় বড়, সজ্জিত, বৃষ্টি পড়িলে কোন ভয় নাই, তবে ঝড় হইলে সে জলগৃহ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করাই পরামর্শ। মাঝিরা তাড়াতাড়ি নৌকা টানিয়া ডাঙ্গায় তোলে, কিন্তু ঝড় হইলেই নৌকা উল্টিয়া যায়; কারণ হাউসবোটের তলা তক্তার ন্যায় সমান, জলের উপর ভাসিয়া থাকে। নদীতে জল এত অল্প যে আমাদের দেশের মত নৌকার তলা গঠিত হইলে নৌকা চলিতেই পারে না। তলা নাই বলিয়া কাশ্মীরের নৌকা এক হাত জলেও ভাসে। পাকের জন্য স্বতন্ত্র ডিঙ্গী, আর বেড়াইবার জন্য একটি ছোট বোট, তাহাকে শিকারী বলে।

সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ৭টা সেতু আছে। ভূমিকম্পে অনেক গৃহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। রাজপ্রাসাদকে শেরগড়ী বলে; ভূমিকম্পে ইহারও অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যায়; অতএব নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। শেরগড়ী ঠিক নদীর উপর।

রাত্রি জ্যোৎস্না। নৌকায় দাঁড়াইয়া আমি কাশ্মীর-রাজধানীর প্রথম সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। নদীর স্রোত এত মন্দ যে দেখিতে প্রায় পুষ্করিণীর মত। তীরে শ্বেতকায় সফেদা বৃক্ষ, জলে কালো ছায়া পড়িয়াছে। দূরে, রেসিডেন্সীর পশ্চাতে তখ্‌ত সুলেমান নামক পর্ব্বত রাজধানীর প্রহরী স্বরূপে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। স্বপ্নের মায়াপুরীর ন্যায় জ্যোৎস্নালোকিত সেই বিচিত্র দৃশ্য কখন ভুলিব না।

রাত্রে অন্যত্র আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। ফিরিতে রাত্রি প্রায় এগারটা হইল। জলপথেই গমনাগমন করিতে হয়। ডিঙ্গীতে ফিরিয়া আসিতেছি এমন সময় সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আর একটি ডিঙ্গীতে স্ত্রীলোকে গাহিতেছে। কাশ্মীরী ভাষায় গান, অর্থ বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু সুর সেই জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথের মর্ম্মে মর্ম্মে পশিতেছিল। বিতস্তার ন্যায় অলস রাগিণী, সে গানে অলস আকাঙ্ক্ষা, দূর হইতে অলস আহ্বান প্রেরিত হইতেছিল। চতুর্দ্দিকের আনন্দের মর্ম্মবেদনা সঙ্গীতে উচ্ছ্বসিত হইয়া শ্রোতার মর্ম্ম স্পর্শ করিতেছিল। কৌমুদী-অম্বরাবৃত প্রকৃতির সেই মনোমোহন রূপ, এবং সঙ্গীতের সেই বেদনাময় উন্মাদনা একত্র মিশ্রিয়া প্রাণে এক অভিনব ব্যাকুলতা উৎপাদন করিতেছিল।

পর দিবস সহর দেখিতে বাহির হইলাম। নদীর জলে বালক বালিকা খেলা করিতেছে, স্ত্রীলোকেরা বাসন মাজিতেছে, পুরুষেরা স্নান আহ্নিক করিতেছে। পণ্ডিত, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ও মুসলমান, এই দুই জাতি। বাদশাহী আমলে বোধ হয় জোর করিয়া কাশ্মীরবাসীকে মুসলমান করা হয়, কারণ গুলাম মহম্মদ ভট্ট (ভট্ট) এরূপ নাম কাশ্মীরে এখনও প্রচলিত আছে। ভট্ট যে কোন জাতি তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। এক এক জন পণ্ডিতকে দেখিলে বাস্তবিক প্রাচীন ঋষিদিগকে স্মরণ হয়। তপ-

আয়ত ও উজ্জ্বল। পণ্ডিতের ভিতরে কি আছে জানিনে হয়ত ভক্তি উড়িয়া যায়, কিন্তু সেই প্রাচীন আর্য্য ছাঁচ নিখুঁত রহিয়াছে। পণ্ডিতানীদিগকে দেখিলে তবে কাশ্মীরে রূপ কেমন বুঝিতে পারা যায়। ইতর মুসলমানদিগের সে কর্কশতা ব্রাহ্মণরমণীতে উজ্জ্বল কোমলতায় পরিণত হইয়াছে। বেশ একই প্রকার, মস্তকে টুপীর কিছু পার্থক্য আছে। আর পার্থক্য—কেশরের হরিদ্রারক্তাভ ললাটিকায়। গৌরী, তন্বী, ললাটপুণ্ড্রধারিণী, সাক্ষাৎ সরস্বতীরূপিণী সেই সকল ব্রাহ্মণবধূকে দেখিলে কেবল রূপের গরিমা নয়, রূপের পবিত্রতাও অনুভব করিতে পারা যায়। এই সকল অলোকসামান্যরূপবতী যে কালে মনস্বিনী ছিল, সেই কালেই আর্য্যজাতি পূর্ণ গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পণ্ডিতানী ও উচ্চশ্রেণী মুসলমান মহিলাগণ কাশ্মীরে প্রধান সুন্দরী।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখ দিয়া একটি পয়ঃপ্রণালী গিয়াছে, ডলহ্রদে যাইবার সেই পথ। পথে চীনারবাগ। এই চীনার এক জাতীয় প্রকাণ্ড বৃক্ষ, তাহার পত্রের আকারে নানাবিধ রূপার সামগ্রী প্রস্তুত হয়। চীনারের গুঁড়ি এত মোটা যে অনেক স্থানে সেই গুঁড়ি কাটিয়া লোকে তাহার ভিতর বাসোপযোগী স্থান প্রস্তুত করে, অথচ বৃক্ষের কোন ক্ষতি হয় না। এই চীনারবাগে সাহেবদিগের বাস, এই স্থানে তাঁহারা মনের সাধ মিটাইয়া বিলাসলালসা চরিতার্থ করেন। ডলহ্রদে রাশি রাশি রক্তপদ্ম ফুটিয়া থাকে। এই স্থানে জলে বাগান ভাসায়। Floating gardens শুনিতে যতটা আশ্চর্য্য মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। কতকগুলা কাঠ বাঁধিয়া তাহার উপর মাটী দেয়, তাহার উপর শাক সব্জী, তরি তরকারির গাছ বসায়, ও সেই সকল সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সেইগুলা হাটে বিক্রয় করে। সকল সামগ্রী যেমন প্রচুর তেমনি শস্তা, তথাপি লোক এত দরিদ্র যে তাহাদিগকে অতি কষ্টে দিনপাত করিতে হয়।

শাল বুনা দেখিবার উপযুক্ত। শাল ছাগলোমে নির্ম্মিত হয়। সে জাতীয় ছাগ কাশ্মীরে পাওয়া যায় না, ইয়ার্কন্দে জন্মায়। সেই স্থান হইতে লোম অপরিষ্কার অবস্থায় আনীত হয়। শ্রীনগরে লোম পরিষ্কার করিয়া সূতা তৈয়ারি সা, ঋ, গ, ম, বা নোটেশন আছে, শাল বুনিবার সেইরূপ একটা ছন্দের কৌশল আছে। যে রকম জমি বা হাশিয়া হইবে, তাহার চিত্রসকল কারিকরের সম্মুখে থাকে, আর একজন সুর করিয়া কিসের পর কি হইবে বলিতে থাকে, কারিকরেরা তাহাই শুনিয়া সেইরূপ করে। "লাল তিন," "কালা চার," "সাদা দশ," এইরূপ শব্দ হইতেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কিছু বলে, কেন না শুনিতে ঠিক গানের মত। দোরোখা পাড় সূচে প্রস্তুত হয়। শিল্পীর এমনি কৌশল যে কাপড়ের এক দিকে সেলাই করিতেছে, অথচ দুই দিকে একই রকম কার্য্য হইতেছে।

কাশ্মীরে সব সুন্দর। এত প্রকার সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ জগতে কোথাও নাই। যে জাতি এই স্থানে আদি উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহাদের মহত্বের কারণ কাশ্মীর দেখিলে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীনগর হইতে পামপুর কিছু দূরে। এই স্থানে কেশর বা জাফরান উৎপন্ন হয়। যেটুকু স্থানে উৎপন্ন হয়, তাহার বাহিরে আর তেমন জন্মায় না—হয় ফুল হয় না, না হয় ফুলে তেমন গন্ধ হয় না।

অন্যান্য সামগ্রীর মত কাশ্মীরের কলহও প্রসিদ্ধ। মারামারি প্রায় কখনই হয় না, কিন্তু গালাগালির বৈচিত্র্য ও ঘটা এমন না কি আর কোথাও নাই! ঝগড়াতে রূপকের ছড়াছড়ি। একটা ঝগড়ার বর্ণনা করিয়া এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ সমাপ্ত করি। কিন্তু পাঠক তাই বলিয়া সমস্ত কথাটাই কলহাত্ম বিবেচনা করিবেন না।

এক দিবস সূর্য্যোদয়ের কিছু পরে পরপারে তুমুল কোলাহল শুনিয়া নৌকা হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। নদী অপ্রশস্ত, এক পারে চীৎকার করিলেই অপর পারে শুনিতে পাওয়া যায়। দেখিলাম, একজন পক্ককেশ কিন্তু বলিষ্ঠকায় ব্যক্তি বসিয়া পাথর ভাঙ্গিতেছে; একটা স্ত্রীলোক ও দুই তিন জন পুরুষ তাহাকে ঘিরিয়া ভয়ানক চীৎকার ও আস্ফালন করিতেছে। সকলেই মুসলমান। নৌকার একটা মাঝিকে ডাকিয়া ব্যাপারখানা জানিলাম। যে পাথর ভাঙ্গিতেছে, স্ত্রীলোকটা তাহারই স্ত্রী; অপর পুরুষ দুইজন স্ত্রীর ভাই; ভাই ভগিনী একদিকে, আর সেই পাথর-

কাশ্মীর-চিত্রাবলী।

১
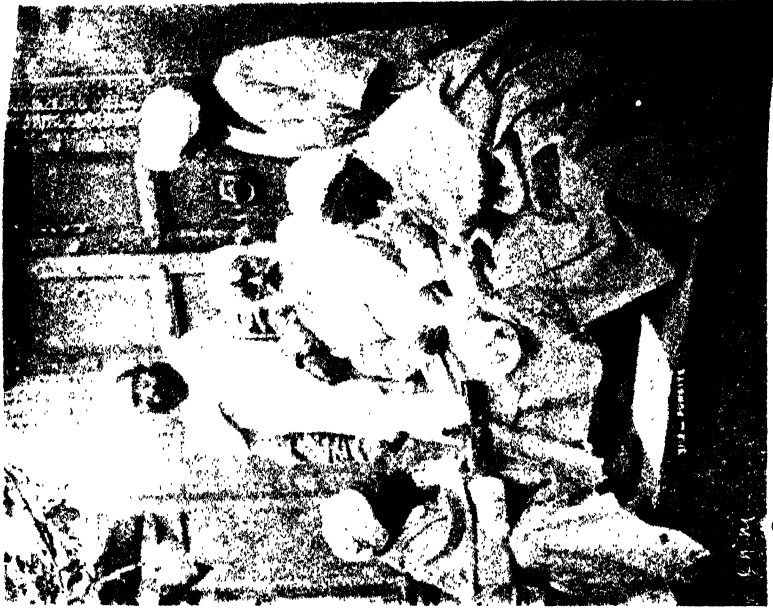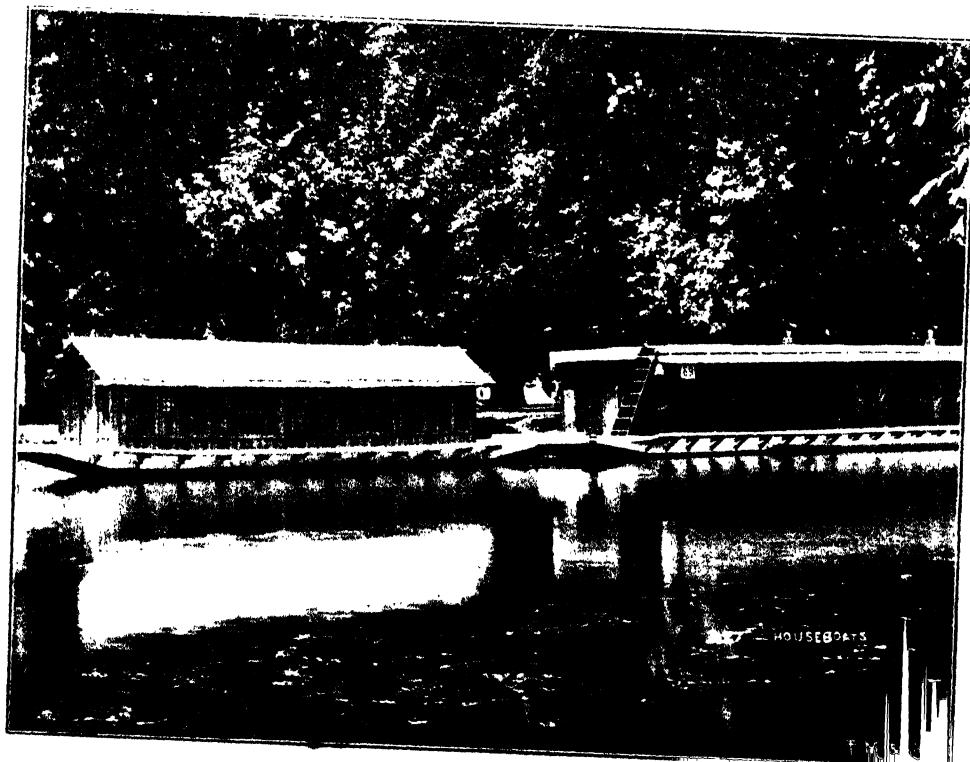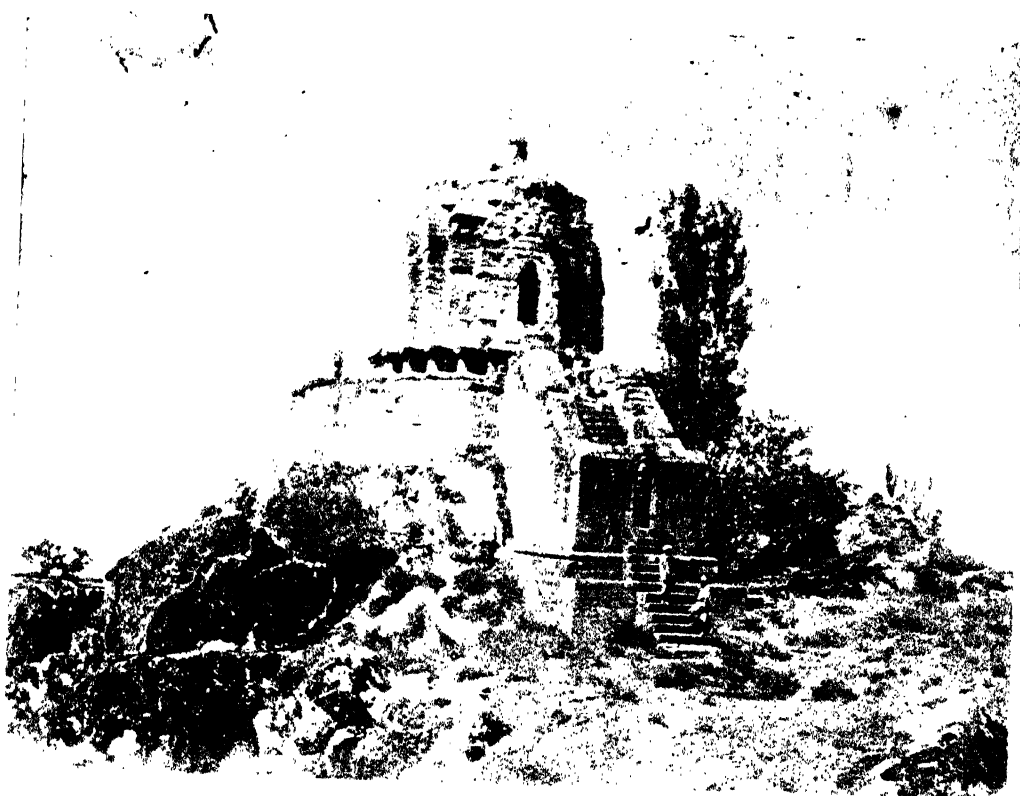
কারণ তাহার নগ্ন দেহ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তাহার শরীরে বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে। সে ব্যক্তি যেন কিছুই শুনিতেছে না, লোহার হাতুড়ি দিয়া এক মনে পাথর ভাঙ্গিতেছে। সহসা স্ত্রীলোকটা দৌড়িয়া তাহাদের নৌকায় প্রবেশ করিল—নৌকাছাড়া অনেকের অন্য গৃহ নাই—ও কতকগুলা মলিন, জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড আনিয়া স্বামীর সম্মুখে রাখিল। এ প্যান্টোমাইমের অর্থ এই, যে যখন তুমি আমায় বিবাহ করিয়াছিলে, তখন তোমার এইরূপ দুর্দ্দশা ছিল, অঙ্গে বস্ত্র জুটিত না, আমার জন্য এখন তুমি পরিতে পাও। ষাঁড় যেমন লাল ন্যাকড়া দেখিলে রাগিয়া উঠে, ময়লা ন্যাকড়াগুলা দেখিয়া তাহার স্বামী সেইরূপ জ্বলিয়া উঠিল হাতুড়ি ফেলিয়া, লাফাইয়া উঠিয়া, সকলকে গালি পাড়িতে লাগিল। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

আমার নৌকার পাশে প্রথিতযশা বিবেকানন্দ স্বামীর নৌকা বাধা ছিল। এই সময় তাঁহাকে ডাকিলাম। তিনি বাহির হইয়া আমার নৌকায় আসিলেন। সে ব্যক্তি আবার গিয়া পূর্ব্বের মত পাথর ভাঙ্গিতে লাগিল। তাহার স্ত্রী আবার নৌকায় গিয়া কতকগুলা হাঁড়ি লইয়া আসিল—অর্থ, তোমার এই রকম শুধু হাঁড়ি ছিল, পেটে ভাত জুটিত না, এখন আমার জন্য খাইতে পাইতেছ। কিছুকাল এই রকম রূপক যুদ্ধের পর এক শ্যালক আসিয়া, ভগিনীপতির মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গালি দিতে লাগিল। বৃদ্ধ তখন ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া শ্যালককে চপেটাঘাত করিল। অমনি শ্যালকদ্বয়, ভগিনী ও ভগিনীপতি জড়াজড়ি করিয়া ভাঙ্গা পাথরের উপর পড়িল। পাশে অনেক লোক দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, কিন্তু ছাড়াইবার জন্য কেহ অগ্রসর হইল না। বৃদ্ধের বাহুতে এমন শক্তি যে সে শ্যালকদ্বয় ও স্ত্রীকে প্রহার করিয়া, সরিয়া গিয়া বসিল। তাহারা তিন জন তিন রকম সুরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

বিবেকানন্দ স্বামী ও আমি ডিঙ্গীতে করিয়া, পার হইয়া, রঙ্গক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। এক শ্যালকের পিঠে পাথর ফুটিয়া রক্ত বহিতেছে। বিবেকানন্দ স্বামী বৃদ্ধকে বলিলেন, "স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলিস্, তুই এত বড় পাষণ্ড!" স্বামীর ক্রোধ দেখিয়া সকলে ভীত হইল। আমি মাঝিকে দিয়া স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করাইলাম, কি হইয়াছে? সে তাড়াতাড়ি লোহার হাতুড়িটা তুলিয়া লইয়া বলিল, আমাকে এই হাতুড়ি দিয়া মারিয়াছে। কথাটা বাড়াইয়া বলিল, কিন্তু আমরা তাহা অবিশ্বাস না করিয়া, তাহার স্বামীকে বলিলাম, "আয়, আমাদের নৌকায় আয়, তোকে পুলিসে দিব।"

তৎক্ষণাৎ স্বামীর স্ত্রীবিদ্বেষ অন্তর্হিত হইল! শ্যালারাও মিনতি করিতে লাগিল যেন অপরাধীকে ধরিয়া না লইয়া যাওয়া হয়। আমরা কোন কথা শুনি না দেখিয়া স্ত্রী নৌকায় গিয়া একটি শিশুকে কোলে করিয়া আনিয়া স্বামীর কোলে দিল যেন জন্মের শোধ সে একবার স্ত্রী-পুত্রকে দেখিয়া লইবে! সকলের নিকট বিদায় লইয়া বুড়া আমাদের নৌকায় উঠিল। আমাদের যে কি ক্ষমতা তাহাকে লইয়া যাই, সে কথা কেহ একবার জিজ্ঞাসা করিল না! এক জন সন্ন্যাসী আর একজন পরিব্রাজক, আমাদিগকে যদি মারিয়া তাড়াইয়া দেয় ত কোন উপায় নাই, কিন্তু কেহই কোন কথা বলিল না, কেহ বৃদ্ধকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল না। তাহাকে পারে লইয়া আসিয়া, খানিক বসাইয়া রাখিয়া, ধমক দিয়া আবার ছাড়িয়া দিলাম।

কোন্দলে ধামা চাপা দিবার একটা প্রবাদ আমাদের দেশে আছে; কাশ্মীরে তাহা নিত্য ঘটিয়া থাকে। দুইটা স্ত্রীলোক অনেকক্ষণ ঝগড়া করিয়া, দুটা ধামা আনিয়া উপুড় করিয়া রাখে। সে দিনের মত ঝগড়া ধামাচাপা রহিল। পর দিবস প্রভাতে দুই জনে লাথি মারিয়া, ধামা উল্‌টাইয়া দিয়া, আবার ঝগড়া আরম্ভ করে।

অপর সৌন্দর্য্যের সহিত কাশ্মীরের নামগুলিও সুন্দর। গোলাব, শিদর, প্রভৃতি উপত্যকার নাম, ভগ্নাবশিষ্ট মার্ত্তণ্ড মন্দির, বিতস্তার উৎপত্তি স্থান অনন্তনাগ, অমরনাথ, ক্ষীরভবানী, পামপুর, এ সকল নামেরও মোহিনী শক্তি আছে। এত সৌন্দর্য্য, এত গাম্ভীর্য্য, আর কোন স্থানে একত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

রাজা রামমোহন রায়।

হে রাজেন্দ্র! শ্যামহরা তমস্বিনী ঘোরা!
একটি নক্ষত্র নাই! আজি এই বঙ্গে
ভেসে যাই, ভেসে যাই, ভেসে যাই মোরা
রঙ্গময়ী লালসার চঞ্চল তরঙ্গে!
হাসি মনচোরা হাসি, অপাঙ্গে, ভ্রূভঙ্গে,
আহ্বানিছে নাস্তিকতা! সুরা রক্তাকারা
পাত্রে ঢালে মুক্তমতি! হ'য়ে মাতোয়ারা
অধর্ম্ম অঘোরপন্থী, হের, পিয়ে রঙ্গে।
হে রাজর্ষি! এস, এস, এ ঘোরা যামিনী
পোহাক! ফেরিয়ে, দেব! ভকতি উষারে
আবার হাসুক হর্ষে বঙ্গ অভাগিনী!
আন দেব জ্ঞানারুণে, সে আলো-জোয়ারে
স্নান করি, আহা! বঙ্গ, বিরহ-বিধুরা,
পতিক্রোড়ে হোক আজি মিলন মধুরা!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

রাজা রামমোহনরায়ের রাজনীতি।

কুমারী কলেট রাজা রামমোহনরায়ের একখানি জীবনচরিত লিখিবার জন্য অনেক বৎসর ধরিয়া উপাদান সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে এই পুস্তক সমাপ্ত বা প্রকাশিত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার এক বন্ধু তাঁহার সংগৃহীত উপাদানসমূহ হইতে তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক সমাপ্ত করেন। সম্প্রতি উহা প্রকাশিত হইয়াছে।

আমরা এই নবপ্রকাশিত পুস্তকখানি অবলম্বন করিয়া রাজা রামমোহনরায়ের ভারতবর্ষীয় রাজনীতির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিব। আমরা আজকাল যে সকল রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকি, রাজা রামমোহন রায়, তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান অনেকগুলির আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপ্রতিষ্ঠিত সংবাদকৌমুদী নামক সংবাদপত্রের দ্বিতীয় সংখ্যায় মফস্বলের আদালতগুলিতে জুরীর দ্বারা বিচার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য একটি আবেদন করা হয়। বিদেশীয় বন্দরে রপ্তানী না করা হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতালাভ ও সংরক্ষণার্থ রাজা যে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনচরিতপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

ইলবার্টবিলের সময় যে ঘোর আন্দোলন হইয়াছিল, আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেরই তাহা মনে থাকিতে পারে। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে যে নূতন জুরী আইন হয়, তাহাতে এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছিল যে ইউরোপীয় বা দেশীয় খৃষ্টান বিচারকগণ ভারতবাসী যে কোন হিন্দুমুসলমান প্রজার অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন; কিন্তু হিন্দুমুসলমান বিচারকগণ দেশীয় বা ইউরোপীয় খৃষ্টানগণের অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন না। দেশীয় লোকদের বিচারার্থ গ্র্যাণ্ডজুরী আহুত হইলে, তাহাতেও হিন্দু বা মুসলমান কোন ব্যক্তিই জুরর হইতে পারিবেন না। রামমোহনরায় এই আইনের প্রতিবাদ করেন।

শ্রমজীবিগণের মঙ্গলার্থ রামমোহনরায় ভারতবর্ষে ইউরোপীয় মূলধন ও ধনীর আগমনের পক্ষপাতী ছিলেন। নীলকরদিগের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হওয়ায় তিনি তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। অবশ্য, যেরূপ অত্যাচারের ফলে নীলদর্পণ লিখিত হয়, এবং যাহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া পাদ্রি লং সাহেব কারাগারে যান, রামমোহনরায়ের জীবদ্দশায় সেরূপ প্রজাপীড়ন ঘটিলে তিনি কখনই নীলকরদের পক্ষ সমর্থন করিতেন না। তিনি সংবাদকৌমুদীতে লেখেন যে নীলের আবাদ হওয়ায় অনেক পতিত জমির চাষ হইতেছে, এবং নিম্নশ্রেণীর লোকদের স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়াছে। চাষারা নীলকরদিগের নিকট হইতে অধিক বেতন পাওয়ায় এখন আর জমিদার ও বড় বড় মহাজনদের স্বেচ্ছাচারিতার কবলীভূত হয় না। ইউরোপীয় ভদ্রলোকগণ যত অধিক সংখ্যায় ভারতবর্ষে বসবাস করেন, জমির এবং দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকদের ততই মঙ্গল। রাজা বলেন, "আমার দৃঢ়বিশ্বাস মোটের উপর নীলকরেরা অন্য যে কোন শ্রেণীর লোক অপেক্ষা বাঙ্গালীদের অধিক উপকার করিয়াছেন।" কিন্তু তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে নীলকরদের মধ্যে অনেকে

'আংশিক অমঙ্গল ব্যতিরেকে কোন সাধারণ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না।" "দেশীয় লোকদের মধ্যে যদি কোন সম্প্রদায় নীলকরদিগকে আনন্দের সহিত দেশ হইতে তাড়িত দেখিতে চান, তাহা জমিদারসম্প্রদায়; কেন না, অনেক স্থানে নীলকরেরা রায়তদিগকে জমিদারদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছে।" এখানে বলা আবশ্যক যে রাজা ভারতবর্ষে "ভদ্র" ইউরোপীয়গণের বসবাসেরই পক্ষপাতী ছিলেন। পরে এই বিষয়টির পুনরুল্লেখ করিব।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা টাউনহলে, চীন ও ভারতবর্ষে সকলকে বাণিজ্য করিতে দিবার অধিকার প্রার্থনার্থ, এবং ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশস্থাপনে বাধা দরীকরণার্থ পার্লেমেণ্টে আবেদন করিবার জন্য, একটি সভা হয়। রামমোহন রায় বলেন, "নিজ অভিজ্ঞতা হইতে আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে ইউরোপীয় ভদ্রলোকদিগের সহিত আমরা যতই মিশিব, সাহিত্যিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে আমাদের ততই উন্নতি হইবে।"

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে রাজা ভারতবর্ষের বিচার ও রাজস্ব বিভাগ সম্বন্ধে যে পুস্তক প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার রায়তদের সহিত সহানুভূতি স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলেন, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমীদারদের উন্নতি ও ধনবৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু রায়তদের কোন উন্নতি হয় নাই। "চাষীদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে এবিষয়ের উল্লেখ করিতে গেলেই আমার অত্যন্ত ক্লেশ হয়।" তাহাদের অবস্থা ভাল করিবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিতে বলেন। প্রজারা যে খাজনা দিতেছে, তাহা আর যেন বাড়ান না হয়। এখন তাহারা যে খাজনা দেয়, তাহা এত বেশী যে তাহা দিতে গিয়া তাহারা অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়; সুতরাং তাহাদের খাজনা কমাইবার জন্য সরকার বাহাদুর জমীদারদের দেয় রাজস্ব কমাইয়া দিউন। ইহাতে যে রাজস্বের হ্রাস হইবে, বিলাসসামগ্রীর উপর কর বসাইয়া ও অধিকবেতনভোগী কলেক্টরদিগের পরিবর্ত্তে অল্পবেতনভোগী দেশীয় কলেক্টর নিযুক্ত করিয়া তাহার পরিপূরণ করা যাইতে পারিবে। তিনি আরও বলেন যে ইংলণ্ড হইতে কয়েকজন আদর্শ ভূস্বামী আসিয়া ভারতবর্ষে বসবাস করিলে ভাল হয়। কিন্তু তাহার সঙ্গে তিনি এই সর্ত্তটির উল্লেখ করেন, যে এই ইংরেজ ভূস্বামীরা যেন নিম্নশ্রেণীর লোক না হয়। প্রজাদের উন্নতির জন্য তিনি যে নীতির সমর্থন করেন, তাহা সাম্রাজ্যের পক্ষে কিরূপ হিতকর, তাহা গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হয়। তিনি বলেন, জমিতে রায়তদের স্থায়ী স্বত্ব স্বীকার করিলে তাহারা খুব রাজভক্ত হইবে। এই উদার নীতি অবলম্বনে আরও লাভ আছে। এক্ষণে যে স্থায়ী বৃহৎ সৈন্যদল পোষণ করিতে হয়, তৎপরিবর্ত্তে রাজভক্ত দেশরক্ষীর দল (militia) গঠিত হইলে অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইবে। এই ব্যয়সংক্ষেপ বর্দ্ধিত ভূমিকর দ্বারা অধিক রাজস্ব আদায় অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকর। এই যুক্তি সমর্থন করিবার জন্য তিনি পারস্তকবি সাদীর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করেন। তাহার অর্থ -"তোমার প্রজাদের সহিত বন্ধুভাবে বাস করিও, তাহা হইলে তোমার শত্রুদের যুদ্ধায়োজন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে। কারণ, ন্যায়বান রাজার প্রজারাই তাঁহার সৈন্যের কাজ করে।"

ভারতবর্ষের বিচারপ্রণালীবিষয়ক প্রশ্নোত্তর নামক পুস্তকে রাজা নানাবিধ সংস্কারের প্রস্তাব করেন। তাহার মধ্যে এইগুলিই প্রধান—আদালতে ফারসীর পরিবর্ত্তে ইংরাজীর ব্যবহার, দেওয়ানী আদালতে দেশী আসেসর (assessors) নিয়োগ, জুরীর বিচার (দেশী পঞ্চায়েৎপ্রথা যাহার সদৃশ) প্রবর্ত্তন, জজ এবং রাজস্ব সংগ্রাহকের কার্য্য পৃথককরণ, জজ এবং মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য পৃথককরণ, ভারতবর্ষের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন সংহিতাবদ্ধকরণ (codification), আইন করিবার পূর্ব্বে স্থানীয় প্রধান লোকদের পরামর্শ গ্রহণ। আর একখানি পুস্তকে তিনি বলেন, "দেশের প্রাচীন সম্রান্ত বংশের লোকেরা কোম্পানীর রাজত্বের উপর নিশ্চয়ই বিরক্ত। বুদ্ধিমান ভারতবাসীদিগের অনুরাগ লাভ করিতে হইলে, তাহারা যাহাতে যোগ্যতাবলে ক্রমোন্নতি অনুসারে রাজসরকারে উচ্চপদ পাইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।" তিনি মনে করিতেন ও বলিতেন যে উচ্চরাজপদ লাভ বিষয়ে ইংরাজ অপেক্ষা মুসলমান শাসন সময়ে আমাদের অবস্থা ভাল ছিল।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে হাউস অব কমন্সের একটি সিলেক্ট

কমিটি ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী কিরূপে সংস্কৃত হইতে পারে, তাহাই বিবেচনা করিতেছিলেন। রামমোহনরায় এই কমিটিতে নিজ মত জানাইবার জন্য একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। উহার আলোচ্য বিষয় ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশ স্থাপন। যে সনন্দের বলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতশাসন করিতেন, তদনুসারে ইউরোপীয়গণ অবাধে ভারতবর্ষে ভূমি ক্রয় বা বসবাস করিতে পারিতেন না। রাজা এই বিষয়ে সকলকে স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মতে ইউরোপীয়দিগকে এইরূপ বসবাসের স্বাধীনতা দিলে নয় প্রকার শুভফলের প্রত্যাশা করা যায়। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকেরা ভারতের কৃষি ও অর্থকর শিল্পের উন্নতি করিবে, দেশীয়দিগের নানা কুসংস্কার দূর করিবে, গবর্ণমেণ্টকে অপেক্ষাকৃত সহজে শাসনবিষয়ে উন্নত প্রণালী অবলম্বন করাইতে পারিবে, দেশীয় বা বৃটিশ অত্যাচারে বাধা দিবে, দেশে শিক্ষাবিস্তার করিবে, ভারতবর্ষীয় ঘটনাবলী সম্বন্ধে বিলাতের লোককে বেসরকারী মত জানাইতে পারিবে, এবং বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণকালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে অধিকতর বলশালী করিবে। শেষ দুই শুভ ফল এই যে, যদি ভারতবর্ষ উদারনীতি অনুসারে শাসিত হয় এবং পার্লেমেণ্ট মধ্যেমধ্যে ইহার অবস্থার অনুসন্ধান করেন, এবং রাজপুরুষগণের ক্রিয়াকলাপ আইনের দ্বারা নিয়মিত হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ বহুকাল ইংলণ্ডের উন্নত শাসনের অধীনে থাকিয়া উপকৃত হইবে, এবং প্রতিদানস্বরূপ ইংলণ্ডের মহত্ত্বের পোষণ করিবে। কিন্তু যদি ঘটনাক্রমে ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে, তাহা হইলেও ঔপনিবেশিক ও তাহাদের বংশধরগণ ভারতবর্ষকে ইউরোপের খৃষ্টান দেশসমূহের সমান উন্নত করিতে পারিবে, এবং ইহার প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও লোকসংখ্যাবলে, ও ইউরোপের সাহায্যে, এশিয়ার অন্যান্য জাতিকে জ্ঞানদানদ্বারা প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিবে।

তাহারপর কয়েকটি অসুবিধারও উল্লেখ করা হইয়াছে। ঔপনিবেশিকদিগের ঔদ্ধত্য ও প্রবঞ্চনাতে বৃটিশ নামে কলঙ্ক আসিতে পারে। তজ্জন্য রাজা প্রস্তাব করেন যে অন্ততঃ প্রথম কুড়ি বৎসর কেবল চরিত্রবান্ ও ধনবান্ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকেই বসবাস করিবার অধিকার দেওয়া হউক, আইনের চক্ষে দেশী ও বিলাতী সকল প্রজাকে সমান করা হউক, এবং মফঃস্বলের আদালতসমূহে ইউরোপীয় উকীল নিযুক্ত করা হউক। তাহার পর রাজা বলেন যে কেহ কেহ মনে করেন যে যদি অনেক ভদ্র ইউরোপীয় অধিবাসীর সংসর্গে ও দৃষ্টান্তে ভারতবাসীরা ধনশালী, সমুন্নত ও জনহিতবুদ্ধি (public spirited) হইয়া উঠে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অধিবাসীর দল আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মত বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিবে। তদুত্তরে রাজা বলেন, যে আমেরিকা ইংরাজের কুশাসনে বিদ্রোহী হইয়াছিল। চলনসই রকমের সুশাসন থাকিলেও কোন উপনিবেশ যে স্বাধীন হইতে চায় না, কানাডা তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

Yet as before observed, if events should occur to effect a separation (which may arise from many accidental causes, about which it is vain to speculate or make predictions), still a friendly and highly advantageous commercial intercourse may be kept up between two free and Christian countries, united as they will then be by resemblance of language, religion and manners

অর্থাৎ যদি ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ ঘটনাক্রমে পৃথক হইয়াই পড়ে, তাহা হইলেও দুটি স্বাধীন, একভাষাভাষী, তুল্যরীতিনীতি ও খৃষ্টান দেশের মধ্যে উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলজনক বাণিজ্যিক আদান প্রদান চলিতে পারিবে।

রাজা এই পুস্তিকাতে সাহসের সহিত সুদূর ভবিষ্যতের ভারতবর্ষকে ইংরাজীভাষী, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, সামাজিক বিষয়ে কতকটা ইংরাজীভাবাপন্ন, স্বাধীন এবং এশিয়ার শিক্ষাগুরুরূপে কল্পনা করিয়াছেন। দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যগুলির পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কালে ইংরাজীর জ্ঞানও যে ভারতবর্ষে সম্যক্ বিস্তারলাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের সামাজিক নানা বিষয়ে, পানাহারে, শিষ্টাচারে, পোষাকে যে ইতিমধ্যেই অনেকটা ইংরাজীভাব আসিয়াছে, তাহা ত দেখাই যাইতেছে। হয় ত সুদূর ভবিষ্যতে, অষ্ট্রেলিয়ার মত ইংলণ্ডের সহিত যুক্ত থাকিয়া, বা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতেও পারে। রাজার জাপানের অভ্যুদয় পূর্ব্বে হইতে জানিবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু শিল্পবিজ্ঞানে জাপান এশিয়ার (কিয়ৎপরিমাণে) বর্ত্তমান ও (আরও অধিক পরিমাণে) ভবিষ্যৎ শিক্ষাগুরু হইলেও, অন্যান্য রাজ্যে ভারত সম্ভবত এশিয়ার শিক্ষক হইবে। [illegible]

ম্ভব; কিন্তু প্রশ্ন এই, রাজা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে খৃষ্টান দেশ কেন বলিলেন? রাজার জীবনচরিতলেখিকা কুমারী কলেট খৃষ্টান ছিলেন। লেখিকার যে বন্ধু পুস্তকটি সমাপ্ত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিও তাহাই। কিন্তু তাঁহারাও বলেন যে রাজা খৃষ্টান ছিলেন না। মৃত্যুর পরেও তাঁহার দেহে যজ্ঞোপবীত ছিল, এবং মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকিয়া তিনি ঘন ঘন "ওঁ" শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিতলেখক বলেন যে কেহ হয় ত বলিতে পারেন, যে, ভারতবর্ষ খৃষ্টান হইবে এই লোভ দেখাইয়া, তিনি হয় ত ইংরাজদিগকে নিজ প্রস্তাবে রাজী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অনুমান রাজার অকপট মহৎ চরিত্রের বিরোধী। তদ্ভিন্ন, ভারতবর্ষ সম্ভবতঃ স্বাধীন হইবে, একথাও ত ঐ পুস্তিকাতে ছিল। একল্পনা ইংরাজের পক্ষে কখনই প্রীতিকর হইতে পারে না। সুতরাং রাজার চরিত্রে এরূপ কপটতার আরোপ করা যায় না। চরিতলেখক বলেন, রাজার নিজের পক্ষে এ কল্পনা প্রীতিকর না হইলেও তিনি হয় ত মনে করিতেন, ভারতবর্ষ প্রথমে খৃষ্টান হইবে এবং পরে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ অবলম্বন করিবে। আমরা কিন্তু আর একটি ব্যাখ্যা সম্ভব মনে করি। এক অর্থে, দেশের প্রভাবশালী ও রাজশক্তিপরিচালক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মকে তদ্দেশের ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। যেমন আয়র্লণ্ডের অধিকাংশ লোক রোমানক্যাথলিক হইলেও বহুকাল প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম তথাকার সরকারী ধর্ম্ম (state religion) ছিল। রাজার প্রস্তাবমত ভারতে ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইলে, ঔপনিবেশিক ও তাহাদের বংশধরগণ যে প্রভূত ক্ষমতাশালী হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাহাদের ধর্ম্মকেই সরকারী ধর্ম্ম বলা যাইতে পারিত। কিন্তু এ ব্যাখ্যাও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক নহে। আমাদের বোধ হয় রাজা মনে করিতেন, ভারতবর্ষের লোক ভবিষ্যতে খৃষ্টধর্ম্মের সারসত্যে বিশ্বাস করিবে। তাঁহার Precepts of Jesus নামক গ্রন্থে তিনি এই সারসত্যগুলি সঙ্কলন করেন। এই সারসত্যগুলি কিন্তু হিন্দু মুসলমানের ধর্ম্মেও অল্পাধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তাহা হইলেও, ইংলণ্ডের পাঠকসাধারণকে নিজের মনোগতভাব সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য তিনি বোধহয় "খৃষ্টান" অপেক্ষা অধিক উপযোগী শব্দ খুঁজিয়া পান নাই, এরূপও মনে করা যাইতে পারে। প্রশ্নটি কিন্তু রহস্যপূর্ণ।

ভারতবর্ষের জলবায়ু ইউরোপীয়দিগের স্বাস্থ্যের হানি করিবে, এই আপত্তির উত্তরে তিনি বলেন যে, আপাততঃ অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর স্থানগুলিতে উপনিবেশ স্থাপিত হইতে পারে।

রাজার প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার যুক্তিগুলির আলোচনায় এখনও লাভ আছে। রাজা যেমন বলিয়াছিলেন, ইংরাজেরা এখনও তাহাই বলেন, যে বিলাতী মূলধন দ্বারা ভারতবর্ষের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করা উচিত। এই উপায়ে শিল্পের উন্নতি ত হইতেছে। কিন্তু তাহা ইউরোপীয় শিল্প; টাকাগুলিও বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। রাজার প্রস্তাবের সপক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে, যে এই শিল্পোন্নতি ভারতবর্ষের স্থায়ী বাসিন্দা ইউরোপীয়গণকর্ত্তৃক সাধিত হইলে, টাকাটা বিদেশে যাইত না। এখন ইউরোপীয়গণের অনুকরণে ভারতবাসীরাও কলকারখানা করিতেছেন; ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইলে, এই অনুকরণ হয় ত আরও বিস্তৃত হইত। নীলকর ও চা-করেরাও একপ্রকার জমীদার; কিন্তু তাহাদের দ্বারা ত রাজার কল্পিত দেশহিতকর কার্য্যগুলি সম্পন্ন হইতেছে না? উত্তরে বলা যাইতে পারে, যে, তাহারা দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয় নাই, এবং সম্ভবতঃ অধিকাংশস্থলে রাজার প্রার্থিত "চরিত্রবান ও ধনবান শিক্ষিত ব্যক্তি"ও নহে। ভারতবাসী ইংরাজ ও দেশের লোক একযোগে আন্দোলন করিলে যে রাজনীতিক্ষেত্রে শীঘ্র ফললাভ হয়, জুরীবিজ্ঞাপনীজনিত আন্দোলনে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু স্বার্থের ঐক্য না থাকায় এইরূপ আন্দোলন প্রায় ঘটে না। ইংরাজেরা ঔপনিবেশিক হইলে হয় ত আরও স্বার্থের ঐক্য এবং তাহার ফলস্বরূপ আমাদের রাজনৈতিক অধিকার লাভের সুযোগ হইত। অপরপক্ষে আশঙ্কা এই যে আমরা হয় ত, যে যে দেশে ইউরোপীয়েরা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, তথাকার আদিমনিবাসীদিগের ন্যায় পদদলিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম। কিন্তু একটা প্রভেদ আছে। আমরা তাহাদের মত অসভ্য বা সংখ্যায় কম নহি।*

* রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ ও বক্ষঃস্থলের

হিন্দী পরিভাষা।

কোন একনির্দ্দিষ্ট ভাষার পরিভাষা প্রণয়ন করিতে হইলে ঐ ভাষার সমজাতীয় অপর সকল ভাষার পরিভাষা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। নতুবা কালবশে বিভিন্ন সমজাতীয় ভাষাসকল পরস্পর হইতে ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে বিসদৃশ ভাষাতে পরিণত হইয়া যায়। বাঙ্গালা, হিন্দী এবং মহারাষ্ট্রী ইহারা সংস্কৃতজ বলিয়া ইহাদিগকে সমজাতীয় ভাষা বলা যায়। কিন্তু আধুনিক পরিভাষাপ্রণালী-দ্বারা ইহারা পরস্পর হইতে একান্ত ব্যবচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছে। মধ্য-প্রদেশের কোন কোন স্থানে হিন্দী ও মহারাষ্ট্রী ভাষা সমভাবে প্রচলিত বলিয়া উক্ত প্রদেশে ঐ উভয় ভাষার অনেক পরিমাণে সমতা রক্ষা করা হইয়া থাকে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হিন্দীভাষা উর্দ্দুর সহিত মিশিয়া ক্রমে বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যাইতেছে। ওদিকে আবার বাঙ্গালা পরিভাষাকারগণ উক্ত উভয় ভাষার পরিভাষাকে উপেক্ষা করিয়া চলাতে বাঙ্গালা সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতেছে। এস্থলে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মধ্যে পরিভাষাজনিত সমতা রক্ষা করার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? আমার বোধ হয় সমজাতীয় ভাষার মধ্যে পরিভাষাজনিত সমতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজনীয়; নতুবা ভাষাশিক্ষা ক্রমে দুরূহ হইয়া পড়িবে।

কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়া কথাটা পরিষ্কার করা যাউক। যেমন ভূগোলে 'মোহানা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গালাতে তাহার অর্থ 'নদীর মুখ'; কিন্তু হিন্দীতে মোহানা বলিতে সেই জলপ্রণালী বুঝায় যাহা নিজ হইতে বৃহৎ অপর দুই জলভাগকে (বা সমুদ্রকে) সংযোজিত করে। মহারাষ্ট্রী ভাষাতেও মোহানা শব্দ শেষোক্ত অর্থাৎ ইংরাজি strait অর্থে ব্যবহৃত কিন্তু বাঙ্গালাতে মোহানা শব্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গালাতে gulf এবং bayর বিভিন্ন নামকরণ হয় নাই; কিন্তু হিন্দীতে gulf অর্থে 'খাড়ী' ও bay অর্থে 'অখাৎ' (বা আখাৎ) ব্যবহৃত হয়। আমরা যখন বঙ্গোপসাগর ও পারস্যোপসাগর বলিয়া উভয়কে একজাতীয় করিয়া দিয়া থাকি, তখন হিন্দীপাঠকারী তাহাদিগকে 'বাঙ্গাল কা অখাৎ' ও 'ইরান কী খাড়ী' বলিয়া তাহাদের পার্থক্য বুঝাইয়া দেয়। একটী পরিভাষাতে হিন্দীপরিভাষাকার যথেষ্ট মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। Isthmus এর বাঙ্গালা করা হইয়াছে 'যোজক'। কিন্তু হিন্দীতে তাহার নাম 'ডমরুমধ্য'। পাঠকগণ বোধ হয় সকলেই বানর নাচ দেখিয়াছেন। বানরনাচওয়ালার হাতে যে একটী বাদ্যযন্ত্র থাকে, তাহাকে 'ডমরু' বলে। সেই ডমরুর দুই দিক প্রশস্ত ও মধ্যভাগ সরু হয়। ইহার সহিত তুলনা করিয়া Isthmus এর অনুবাদ 'ডমরুমধ্য' করা হইয়াছে। এইরূপ সরল ও মৌলিক অনুবাদ সচরাচর অপর কোন ভাষায় দেখা যায় না। শব্দটী একান্ত সরল মনে না হইলেও ইহার অর্থ বালকগণ অতিসহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। এই দৃষ্টান্তটী দ্বারা আমি ইহাই দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে অনুবাদ দ্বারা পরিভাষা প্রণয়নকালে এমন শব্দ ব্যবহার করা বিধেয়, যাহা বিদ্যালয়ের বালকগণ সহজে বোধগম্য করিতে পারে।

হিন্দীপরিভাষাকার পরিভাষাপ্রণয়নকালে অনেকস্থলে সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করিয়া লৌকিক শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা, lake অর্থে 'হ্রদ' ব্যবহার না করিয়া 'ঝীল' প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইরূপ পরিভাষাপ্রয়োগ দ্বারা লিখিত ও কথিত ভাষার বৈষম্য অনেকাংশে কমিয়া যায় এবং ইহাদ্বারা ভাষাশিক্ষার অনেক সহায়তা হইয়া থাকে। আমি অনেক ভাষাবিদের মুখে শুনিয়াছি যে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত ও কথিত ভাষার যত বৈষম্য দৃষ্ট হয় এমনআর জগতে কোন ভাষায় দেখা যায় না। সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে একদেশীয় দশজন শিক্ষিত লোক একত্র হইয়া যে ভাষায় কথা কহে তাহা সেই দেশের লিখিত ভাষা। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে এই সাধারণ নিয়ম একেবারেই খাটে না। ছত্তিশগড়ী হিন্দীর সহিত কনোজীয় হিন্দীর অনেক পার্থক্য; আবার কনোজীয় হিন্দীর সহিত গাড়োয়ালী হিন্দীর আকাশপাতাল প্রভেদ। কিন্তু একজন ছত্তিশগড়ী শিক্ষিত লোক কনোজীয়

ছাঁচ লইয়া একটি মূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়। উহা এক্ষণে মাননীয় শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের কলিকাতাস্থ ভবনে রক্ষিত আছে। বসু মহাশয় উহার ফোটোগ্রাফ লইয়া চিত্র প্রকাশিত করিবার অনুমতি দেওয়ায় আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। মূর্ত্তিটি বিলাত হইতে আনিবার সময় ভাঙ্গিয়া যায়; বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় ভাঙ্গা অংশগুলি অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত জোড়া দিয়াছেন। সম্পাদক।

শিক্ষিত লোকের কিম্বা গাড়োয়ালী শিক্ষিত লোকের সহিত একত্র হইলে, পরস্পরের ভাষান্তরজ্ঞান না থাকাসত্ত্বেও, অনায়াসে বিশুদ্ধ হিন্দীতে আলাপ করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু একজন চট্টগ্রামের বাঙ্গালী, ময়মনসিংহের বাঙ্গালী ও মেদিনীপুরের বাঙ্গালী একত্র হইলে তাঁহারা কোন্ ভাষায় কথা কহিবেন তাহা ভাবিয়া ঠিক করা দায়; অথচ ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে তাঁহারা কখনই লিখিত বাঙ্গালাভাষায় কথা কহিবেন না।

হিন্দীভাষায় অনুবাদকগণ অনেকস্থলেই মৌলিকতা কিম্বা ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু একটি শব্দ প্রণয়নে তাঁহারা বড়ই ঠকিয়াছেন। Continent অর্থে মহাদেশ বুঝায়, এবং বাঙ্গালায় মহাদেশই করা হইয়াছে। কিন্তু হিন্দী ভাষাকার তাহার অর্থ করিয়াছেন 'মহাদ্বীপ'। এই শব্দ প্রাচীন সংস্কৃত হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই শব্দপ্রয়োগের ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে বিদ্যালয়ের বালকগণ সংজ্ঞা বলিতে গিয়া বিনা আয়াসে বলিয়া ফেলে "মহাদ্বীপ স্থলের অত্যন্ত বৃহৎভাগ যাহার চারিদিকে জল।" এ সংজ্ঞা যে সর্ব্বত্র খাটে না, অতএব তাহার শেষভাগ বলা অনর্থক, তাহা যে পর্য্যন্ত জোর করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া না হয়, সে পর্য্যন্ত বালকগণ উপরোক্ত প্রকারে মহাদ্বীপের সংজ্ঞা বলিতে কিছুতেই ছাড়িবে না। মধ্যপ্রদেশে হিন্দীতে উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষা পাস না করিলে দেশীয় বালকগণ ইংরাজি পাঠের অধিকারী হইতে পারে না। ইহার ফল এই হয় যে বালকদের জ্ঞানের মূলপত্তন মাতৃভাষায় বা হিন্দীতে হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারও ফল আবার এই হয় যে অনেক স্থলে হিন্দীতে যাহা ভুল শিক্ষা পায়, ইংরাজিতে তাহার সংস্কার থাকিয়া যায়। আমি পরিদর্শনকালে কোন ইংরাজি বিদ্যালয়ের মধ্যমশ্রেণীর বালকদিগের মুখে শুনিয়াছি যে "Continent is a large piece of land *entirely surrounded by water*."

বালকদিগের এই সংস্কার এত বদ্ধমূল যে কোন কোন বালক অনায়াসে ও বিনা সঙ্কোচে বলিয়া ফেলে যে তাহাদের ভূগোলবৃত্তান্তে এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া আছে! অবশ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর ভূগোল খুঁজিয়া উক্ত সংজ্ঞা বাহির করিতে না পারিলে তখন বালকগণের চৈতন্য হয়; কিন্তু এই ভুল সংস্কারের মূল পরিভাষাতে থাকিয়া যায়। এ কারণ আমি মধ্যপ্রদেশীয় 'অপার প্রাইমারী ভূগোলে' মহাদ্বীপ শব্দ উঠাইয়া দিয়া, বাঙ্গালা ভাষার অনুকরণে মহাদেশ শব্দ ব্যবহারার্থ প্রস্তাব করিয়াছি। এস্থলে ইহা জানা আবশ্যক যে এপ্রদেশে পাঠ্যগ্রন্থ নির্ব্বাচন যেমন শিক্ষাবিভাগের হাতে ন্যস্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়েও শিক্ষাবিভাগের যথেষ্ট প্রভুত্ব আছে; এমন কি গবর্ণমেণ্টের অর্থ ব্যয় করিয়া শিক্ষাবিভাগ নিজের তত্ত্বাবধানে পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকে। অতএব পরিভাষাসঙ্কলন বিষয়ে শিক্ষাবিভাগের কার্য্যক্ষেত্র অপ্রশস্ত নহে।

আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে যে সকল বিদ্যালাভ করিয়াছি সে সকল বিদ্যাতেই পরিভাষা সঙ্কলনের কার্য্য অধিক পরিস্ফুট হইয়া থাকে। ভূগোলবিদ্যা তাহার অন্যতম বলিয়া এস্থলে কয়েকটি ভৌগোলিক শব্দের আলোচনা করা হইল। যদিও ভারতবর্ষে গণিতচর্চ্চা অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা ইয়ুরোপীয় প্রণালীতেই গণিত শিক্ষা করিতেছি। একারণ গণিত বিষয়েও পরিভাষা সঙ্কলন হইয়া থাকে।

Greatest Common Measure ও Least Common Multiple এর বাঙ্গালা হইয়াছে,—'গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক' ও 'লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক'। কিন্তু হিন্দী ভাষাকার তাহাদের অনুবাদ করিয়াছেন 'মহত্তমসমাপবর্ত্তক' ও 'লঘুতম সমাপবর্ত্তিত'। আমার কাছে এই দুইটি সংজ্ঞা অতি সরস মনে হয়। হিন্দী ভাষাকারের মতে কোন সংখ্যাদ্বারা অপর কোন সংখ্যাকে নিঃশেষ ভাগ করার নাম 'অপবর্ত্তন'। যে সংখ্যাকে ভাগ করা হয় তাহাকে 'অপবর্ত্তিত' ও যাহাদ্বারা ভাগ করা যায় তাহাকে 'অপবর্ত্তক' কহে। কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাদ্বারা একাধিক সংখ্যাকে নিঃশেষ হরণ করা গেলে ঐ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাকে উক্ত সংখ্যাসমূহের 'সমাপবর্ত্তক,' এবং কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাকে একাধিক সংখ্যাদ্বারা হরণ করা গেলে ঐ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাকে উক্ত সংখ্যা সমূহের 'সমাপবর্ত্তিত' কহা যায়। পাঠকগণ এখন 'মহত্তম' ও 'লঘুতম' বিশেষণদ্বয়ের প্রয়োগদ্বারা উপরোক্ত সংজ্ঞাদ্বয়ের সুস্পষ্ট অর্থ বুঝিয়া লইতে পারিতেছেন। আমার বিশ্বাস যে এই দুইটি [illegible]

বুদ্ধি খাটাইয়াছেন ও জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষাকার তাহা করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা সংজ্ঞাদয় কেবল ইংরাজি সংজ্ঞাদয়ের ভাষানুবাদ মাত্র; তাহাতে জ্ঞান-সঙ্কলন ঘটে নাই।

এই প্রবন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্তদ্বারা আমি ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে পরিভাষাপ্রণয়নকালে সমজাতীয় ভাষাসমূহের পরিভাষা জ্ঞাত থাকিলে কত উপাদেয় ফললাভ করা যাইতে পারে, এবং ভাষার সামঞ্জস্য দ্বারা তাহাদের জাতীয়ত্বও কি পরিমাণে রক্ষা হইতে পারে। এক্ষণে বাঙ্গালার সহিত তুলনায় হিন্দীবর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে কিছু না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

কয়েক বৎসর গত হইল নব্যভারতে 'বানান বিভ্রাট'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, কিন্তু আমাদের জাতীয় চিন্তাশক্তির স্থিতিস্থাপকতাগুণ প্রবল থাকাতে সে বিষয়ে আর আলোচনা হয় নাই। আমার মনে পড়িতেছে তাহার একজায়গায় লেখা ছিল "বাঙ্গালা বর্ণমালার দুইটি জ য, তিনটি শ ষ স, দুইটি ণ ন ইত্যাদি। লিখিবার সময় কোনটির আশ্রয় লইব তাহা ভাবিয়া ঠিক করা কঠিন।" প্রবন্ধলেখক ইহাও বলিতে ছাড়েন নাই যে এই বানানবিভ্রাটহেতু তাঁহার কোন বন্ধু বাঙ্গালায় চিঠি লেখা বন্ধ করিয়া ইংরাজির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটি রহস্য মনে পড়িতেছে।

মধ্যপ্রদেশে যে সকল ব্যক্তি সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাঁহাদের একটি ডিরেক্টরী বা নামাদিসূচক পুস্তক প্রতি বৎসর দুইবার করিয়া ছাপা হয়; তাহাতে একঘরে শিক্ষকদিগের 'মাতৃভাষা' ও অপর এক ঘরে, অন্য যে সকল ভাষায় শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাহা লেখা থাকে। ঐ 'মাতৃভাষার' ঘরে দেখা যায় অনেক হিন্দুস্থানী হিন্দু 'উর্দ্দূ' লেখাইয়াছেন; কোন কোন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কিম্বা বাঙ্গালী হিন্দু তাঁহাদের মাতৃভাষা 'হিন্দী' লিখাইয়া থাকেন। কয়েক মাস গত হইল আমি কার্য্যানুরোধে ঐ পুস্তক সংশোধন করিতে গিয়া জানিতে পারিলাম যে এ সকল প্রদেশে এমন মহারাষ্ট্রীয় ও বাঙ্গালী অনেক আছেন যাঁহারা মাতৃভাষা বলিতে কিম্বা লিখিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। নব্যভারতের উপরোক্ত প্রবন্ধলেখক যদি তাঁহার বন্ধুটীকে এ প্রদেশে মাতৃভাষার ঘরে 'শূন্য' (০) পড়িত।

প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালায় যে বানানবিভ্রাট আছে, তাহা অক্ষরের দোষে নহে, উচ্চারণের দোষে। বাল্যকালে ব্যাকরণে মুখস্থ করা হইল, ষ ও ণয়ের উচ্চারণস্থান 'মূর্দ্ধা'। কিন্তু উচ্চারণকালে তাহার স্থান খুঁজিয়া পাইলাম না, সকলগুলিই একস্থান হইতে উচ্চারণ করিয়া বসিলাম। কাজেই বিভ্রাট ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

হিন্দীতে এই উচ্চারণবিভ্রাট নাই বলিয়া তাহাতে বানান বিভ্রাট ঘটিতে পারে না। হিন্দীশিক্ষাদানকালে নাম করিয়া তালব্য শ, মূর্দ্ধন্য ষ, দন্ত্য ন ইত্যাদি বলিতে হয় না; উচ্চারণদ্বারাই তাহাদের পার্থক্য জানা যায়। বাঙ্গালাতে হ্রস্ব দীর্ঘের উচ্চারণ পার্থক্য নাই, হিন্দীতে তাহাদের উচ্চারণপার্থক্য প্রত্যেক কথায় টের পাওয়া যায়। হিন্দীতে উচ্চারণে ভুল না করিলে বানান ভুল হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বাঙ্গালাতে দুইটি ব একাকার হওয়াতে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র অক্ষর বলিয়া গণ্য করা হয় না। কিন্তু হিন্দী ও মহারাষ্ট্রীভাষাতে তাহাদের উচ্চারণ স্বতন্ত্র, একারণ তাহাদের উভয়ের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। মহারাষ্ট্রীয় 'বাগ্লে' (অন্তঃস্থ ব) মহাশয় ইংরাজিতে আপন নাম Wagle লিখিয়া থাকেন। কয়েক দিন হইল এক বাঙ্গালা কাগজে দেখিতে পাইলাম তাঁহাকে 'ওয়াগ্‌ল্‌' করা হইয়াছে। এইরূপ বর্ণ-বিকৃতি কেবল আমাদের অন্য ভাষার পরিভাষা ও উচ্চারণ না জানার ফলমাত্র।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

উত্তর-পশ্চিমে বঙ্গসাহিত্য।

জাতির সহিত জাতীয় ভাষা চলিয়া আইসে। ইংরাজ যখন সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া কোন নবাবিষ্কৃত ভূভাগে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন জন্মভূমি, ঘর দ্বার, স্থাবর অস্থাবর অনেক সামগ্রীই পশ্চাতে ফেলিয়া এবং অনেক আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটাইয়া যান। কিন্তু মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না। লোকে স্বদেশ, স্বধর্ম্ম, স্বজনবর্গ পরিত্যাগ করিয়া নূতন রাজ্যস্থাপন করিতে, পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে এবং পরকে আপনার করিয়া লইতে

মানবের এতই নিজস্ব, এমনই প্রিয়। দেশীয় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ, বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায় এবং বিবিধ ঔপনিবেশিকের দল তাহার সাক্ষী। ক্ষুদ্র একটী দ্বীপ হইতে বহির্গত হইয়া ইংরাজ আজ নূতন এবং পুরাতন পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন; ইংরাজি সাহিত্যও বিশ্ব ব্যাপিয়াছে। চৈনীয় ঔপনিবেশিকগণের সহিত চীনভাষা পিকিন হইতে মার্কিনে গিয়াছে। শত শত বাঙ্গালী সুদূর আফ্রিকায় গিয়া "বাঙ্গালীটোলা" স্থাপন করিয়াছেন। সেখানেও বাঙ্গালা কাগজের গ্রাহক ও বাঙ্গালা পুস্তকের পাঠক আছেন। বিলাতে বসিয়া অনেক বাঙ্গালী মাতৃভাষার সেবা করিতেছেন। হিন্দী, উর্দ্দু, মহারাষ্ট্রী, গুজরাতী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় যাবতীয় প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে হিন্দুস্থানী ভাষাই অধিকসংখ্যক লোকের দ্বারা কথিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালার ন্যায় এমন উন্নত আর একটী চলিত ভাষা ভারতে নাই। অনাবৃতমস্তক বাঙ্গালী, বঙ্গভাষা এবং বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও পুস্তক দেশের কোথায় না প্রবেশ করিয়াছে? হিমালয়ে, পঞ্চনদ প্রদেশে, ব্রহ্মে, আসামে, দক্ষিণে, উত্তরপশ্চিমে এবং অযোধ্যায় ইহার নিদর্শন আছে। ভারতে রেল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর প্রবাসের সীমা বাড়িতেছে। কিন্তু বঙ্গদেশের বাহিরে যে যে স্থানে বাঙ্গালীর বাস, তন্মধ্যে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গসাহিত্যের প্রসার অধিক। ১৮৯১ সালের আদম সুমারির বিবরণীতে প্রকাশ, এ অঞ্চলে বাঙ্গালীর সংখ্যা ২১ সহস্রের কিছু অধিক। প্রতি দশ বৎসরে যেরূপ হারে সকল শ্রেণীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তদনুসারে বর্ত্তমানে বাঙ্গালীর সংখ্যা ২৫ সহস্রেরও অধিক হইবে। বারাণসী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, প্রভৃতি স্থানের অনেক হিন্দুস্থানী বাঙ্গালা শিক্ষা করায়, বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধিই পাইতেছে। প্রবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চ্চা কিরূপ বিস্তার লাভ করিতেছে সে সংবাদ অনেকেই রাখেন না। তাহার প্রধান কারণ এই যে সে সংবাদ জানিবার তেমন উপায়ও নাই। গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক শাসনবিবরণীতে বারাণসীর বঙ্গসাহিত্যসমাজ এবং এলাহাবাদের বঙ্গসাহিত্যোৎসাহিনীসভা ও বান্ধবসমিতির উল্লেখ আছে মাত্র। কিন্তু তাহার সম্মুখে টিপ্পনীস্তম্ভে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য* পাঠ করিলে প্রাণে অবসাদ উপস্থিত হয়। এলাহাবাদ বঙ্গসাহিত্যোৎসাহিনীসভা, মীরাটের "বীণা লাইব্রেরী", ঝাঁসীর বাঙ্গালা লাইব্রেরী, গোরক্ষপুরের "বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী" ও "বান্ধব সাহিত্যসমিতি" এবং কানপুরের বাঙ্গালা লাইব্রেরীর উন্নতি হইতেছে না। এই সকল পুস্তকালয় এবং সাহিত্যসভার বর্ত্তমান অবস্থার জন্য স্থানীয় শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ যে সম্পূর্ণ দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে সাধারণতঃ তাঁহাদের ঔদাসীন্যসত্ত্বেও "আগ্রা বাঙ্গালা লাইব্রেরী," "আগ্রা বঙ্গসাহিত্যসমিতি", লক্ষ্ণৌএর "বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী," এবং এলাহাবাদের "প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্যমন্দির" স্থানীয় বাঙ্গালা মহোদয়গণের সহানুভূতি এবং সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয় নাই। সুতরাং ইহারা স্বীয় উদ্দেশ্যপথে বেশ অগ্রসর হইতেছে। নাইনিতালের কতিপয় বাঙ্গালী "শৈল সাহিত্যসমিতি" নাম দিয়া একটী বাঙ্গালা পুস্তকাগার স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের এই উদ্যম অতীব প্রশংসনীয়। মথুরা, ফয়জাবাদ, গাজিপুর, আলীগড়, বেরিলি, সাহারনপুর এবং ইটাওয়া প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীর সংখ্যা ২০০ শতের কম ত নহেই, কোন কোন সহরে তিন শতেরও অধিক। মথুরার কথা স্বতন্ত্র। এখানে ১৮৯১ সালের আদমসুমারীর বিবরণীমতে বাঙ্গালীর সংখ্যা ৮৫৭৪ জন। এক্ষণে এই সংখ্যা আরও বাড়িয়া থাকিবে। এই বাঙ্গালীবহুল স্থানে বাঙ্গালা পুস্তকাগার, সাহিত্যসমাজ প্রভৃতি আছে কি না পাঠকগণকে শীঘ্রই জানাইতে পারিব আশা করি।

এঅঞ্চলে যে সকল অনুষ্ঠান বঙ্গসাহিত্যপ্রচারকার্য্যে সহায়তা করিতেছে, তন্মধ্যে কালীবাড়ী, হরিসভা, ব্রাহ্মসমাজ, খৃষ্টান মিশনরীসম্প্রদায়, ইংরাজি-বাঙ্গালা বিদ্যালয়, বালিকাবিদ্যালয়, বঙ্গসাহিত্যসভা এবং সাধারণ পুস্তকাগারই প্রধান। এ অঞ্চলে ইহার কোন না কোনটি সর্ব্বত্রই আছে। কোন কোন সহরে সকলগুলিই বিদ্যমান, অধিকন্তু অবৈতনিক সঙ্গীত ও নাট্যসমাজও আছে। তবে প্রবাসে সাধারণ পুস্তকাগার, সাহিত্যসভা ও বঙ্গবিদ্যালয় দ্বারা মাতৃভাষানুশীলন যত সুগম হয় এমন আর কিছুতে নহে। দুঃখের বিষয় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে বাঙ্গালাভাষা

* "Making but little progress. Is at a standstill. This is due partly to the apathy of the Bengali public and partly to the want of energetic co-operation." Administration Report of the N.-W. Provinces and Oudh, 1899-00.

শিক্ষার পথ রুদ্ধ করিয়া দিতেছেন। সুতরাং সাধারণ পুস্তক ও পাঠাগার এবং সাহিত্যসভাগুলির প্রতি প্রবাসী বাঙ্গালীগণের দৃষ্টি বিশেষরূপে পতিত হওয়া আবশ্যক। গৃহে গৃহে যাহাতে বাঙ্গালাশিক্ষার বিস্তার হয় প্রত্যেক বাঙ্গালী গৃহস্থের সেই চেষ্টা করিতে হইবে। এক্ষণে আর উদাসীন থাকিলে চলিবে না। অভিভাবকগণের অযত্নে অনেক বঙ্গসন্তানের বাঙ্গালা বর্ণপরিচয়ও হয় নাই। ইঁহাদিগের কথোপকথন অনেক সময় হাস্যের উদ্রেক করে। ইঁহারা যে ভাষায় কথা কহেন, তাহা না হিন্দী না বাঙ্গালা। ছোট বা কড়া জুতা পায়ে দিয়া "ফোস্কা" হইলে অনেকে বলিয়া থাকেন, "জুতা কামড়াইতেছে" বা "কাটিতেছে"। কোন কার্য্য করিতে বা কোন স্থানে যাইতে ইচ্ছা না থাকিলে আমরা যেমন অস্বীকারসূচক বাক্যে বলিয়া থাকি "ক'রব বৈ কি ?" "যাব বৈ কি ?" "ক'রলেম্ আর কি !" কিম্বা "গেলাম আর কি !"; তাঁহারা বলেন "করব থোড়াই," "যাব থোড়াই।" নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলে আমরা যেমন বলি, "আমার নাম অমুক" বা "আমার বাড়ী অমুক স্থান"; তাঁহারা বলিবেন, "আমার নাম অমুক হ'চ্চে" বা "আমার বাড়ী অমুক স্থানে হ'চ্চে"। কোন দ্রব্য দ্বিতীয় ব্যক্তির দ্বারা তৃতীয় ব্যক্তিকে দেওয়াইতে হইলে তাঁহারা বলিবেন, "উহা তাঁহাকে দেয়া করিয়া দিব।" এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। যে সকল প্রবাসী বাঙ্গালীর মাতৃভাষায় বর্ণপরিচয় হয় নাই কিম্বা যাঁহারা হিন্দুস্থানী বাঙ্গালায় কথা কহিয়া থাকেন, তাঁহারাই কেবলমাত্র অর্থকরী ভাষা শিক্ষার একান্ত পক্ষপাতী। তাঁহারা প্রায়ই বলিয়া থাকেন, বাঙ্গালাভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল। এই শ্রেণীর বাঙ্গালীগণ হিন্দুস্থানী ভাষায় কোন শ্লেষাত্মক বা রহস্যজনক বাক্যের বেশ রস গ্রহণ করেন, কিন্তু মাতৃভাষায় সেইরূপ কোন বাক্য উক্ত হইলে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না। তবে সুখের বিষয় দশবর্ষ পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি, এক্ষণে আর ততদূর নাই; মাতৃভাষানুশীলনের বৃদ্ধিই ইহার কারণ বলিতে হইবে।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বাঙ্গালা সাধারণ পুস্তকাগার ও সাহিত্যসমিতিগুলির প্রকৃত অবস্থা কিরূপ তাহা ক্রমশঃ দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

প্রয়াগে কমলাকান্ত।

আমি মধ্যাহ্নকালে আমার দ্বিতলগৃহের একটি নির্জ্জন কক্ষে শয়ন করিয়া নূতন বঙ্গদর্শন সহর্ষে পাঠ করিতেছি। সানন্দে পাঠ করিয়া দেখিলাম, মাসিক পত্রের সমালোচনা করিতে করিতে বৃদ্ধ কমলাকান্তের ভোঁতা কলমের উপরও সহৃদয় সম্পাদক মহাশয় বাসন্তী পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছেন।* আমার অতিশয় আমোদ হইল। সম্মুখে টেবিলের উপর আমার ফৌণ্টেন্ পেনটি (নিঝরিণী-কলম) রক্ষিত ছিল। সেটিকে হাত বাড়াইয়া তুলিয়া লইয়া তার কানে কানে সাদরে বলিলাম—"হে নিঝরিণী-সুন্দরি! তুমি কোন্ রুক্ষ কঠিন পাহাড়ের মনঃশিলার ভিতর ফল্গুবৎ অন্তঃসলিলা-রূপিনী ছিলে; হঠাৎ কমলাকান্তরূপী ভগীরথের ডাকে লীলাময়ী, নৃত্যময়ী, ঝঙ্কারময়ী, আবেগময়ী, কল্লোলিনী হইয়া মহাসাগরে ঝাঁপাইয়া আমিত্বের মহাপ্রসার লাভ করিলে? ধন্য মা তুমি! ধন্য তোমার এই অনুরক্ত ভক্ত!"

এই শব্দ কয়টি যেই উচ্চারণ করিয়াছি, অমনি—একি আশ্চর্য্য! একি মহা বিস্ময়ের ব্যাপার! তোমরা বলিলে বিশ্বাস করিবে না,—ফৌণ্টেন্ পেনটি তিড়িং মিড়িং করিয়া লাফাইয়া উঠিল! তাহার ভিতর হইতে একটি অপরূপ নদী-কন্যা বাহির হইল। সুন্দরীর আলুলায়িত কেশজালে জল-মুক্তা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। কতকগুলি শুভ্র কুন্দপুষ্পই কন্যার দশন, দুইটি প্রফুল্ল ইন্দীবরই কন্যার দুইটি নয়ন, একটি সুবৃহৎ রাজহংস কন্যার বাহন। দুইটি চক্রবাক ডানার ঝট্‌পট্ শব্দে মঙ্গলধ্বনি করিতেছে। কন্যার সুভুজে মৃণালময়ী বাঁশরী। কন্যা মুরলী বাজাইল;—আমি আনন্দে অচে-

* "স্বর্গীয় কমলাকান্ত শর্ম্মা লোকান্তর হইতে ইহলোকে এবং বঙ্গের বঙ্গদর্শন হইতে প্রবাসে গেলেন, এ ইন্দ্রজাল কে ঘটাইল? মায়াবী তাঁহার নাম গোপন করিয়া ফাঁকি দিতে পারিবেন না—কবির লেখনী ছাড়া এ যাদু আর কোথায়? যে কবি অশোকমঞ্জরী হইতে তাহার তরুণতা এবং বধূর ভূষণঝঙ্কার হইতে তাহার রহস্যকথাটি চুরি করিয়া লইতে পারেন, তিনি যে রাতারাতি বঙ্গদর্শন হইতে তাহার কমলাকান্তটিকে হরণ করিয়া প্রবাসে পালাইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হই না। কিন্তু চোরকে যদি আমাদের বঙ্গদর্শনে বাঁধিতে পারি, তবেই তাঁহার উপযুক্ত শাস্তি হইবে।"—বঙ্গদর্শন, বৈশাখ।

তন হইতে লাগিলাম। কন্যা মৃদুহাস্যে আমার শিয়রে আসিয়া বসিল। আমি কথা কহিবার প্রয়াস করিলাম ;—জিহ্বা জড়াইয়া গেল। কন্যা তুষারশীতল কর আমার চক্ষের উপর রাখিল,—আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

আমি কতক্ষণ ঘোর নিদ্রায় অচৈতন্য ছিলাম, বলিতে পারি না। এমন গাঢ় সুষুপ্তি আমি কস্মিনকালেও উপভোগ করি নাই। সহসা যখন আমার নাসিকাধ্বনি বন্ধ হইয়া গেল, আমি চক্ষু মেলিয়া দেখি—একি !—আমার হস্তপদ সমুদয় শরীর আড়ষ্ট, কি জিনিষ দিয়া যেন বদ্ধ। আমি কি এখনও নিদ্রিত ? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ? আমি আবার চক্ষু বুজিলাম। আবার চক্ষু মেলিয়া দেখি, সত্য সত্যই আমার হস্তপদ আবদ্ধ। সবিস্ময়ে ভাল করিয়া ঠাওরাইয়া দেখিলাম, বহুসংখ্যক বঙ্গদর্শন-পত্রের দ্বারায় আমার সমুদয় শরীর বাঁধা পড়িয়াছে। কেবল দুটি চক্ষু অনাবৃত রহিয়াছে। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম, "শীঘ্র এস, শীঘ্র এস, কে কোথায় আছ ! আমাকে কে বাঁধিয়াছে ; শীঘ্র আসিয়া এ বাঁধন খুলিয়া দাও।" আমার চীৎকারে কেহ কর্ণপাত করিল না। কেহই আসিল না। কে যেন খিল্‌খিল্ করিয়া মহাহাস্যে হাসিয়া উঠিল ; আমি চীৎকার করিয়া হতাশ হইয়া বলিলাম, "আমি কি পাগল হইয়াছি ?" কে যেন পরিচিতকণ্ঠে কলহাস্যে বলিল, "ঠাকুর, তুমি পাগল ? আমি একথা স্বপ্নেও বিশ্বাস করি না। "If it is madness, there is method in it" ইহা পাগলামি হইলেও ইহাতে নিয়মশৃঙ্খলা আছে।"

আমি উৎসুকনেত্রে চাহিয়া দেখি—একি ! আমার সম্মুখে য়ারে আসীন বঙ্গের কবিকুলনৃপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ কুর ;—সেই সৌম্য সহাস্যবদন, সেই দেবোপম অঙ্গযষ্টি ! ই চিরপরিচিত চিরানন্দ মূর্ত্তি দেখিয়া আমি আশ্বস্ত হইলাম, া-দৈত্য সভয়ে পলাইয়া গেল। রবি বাবু সহাস্যে বলিন, "ঠাকুর, আফিঙের মাত্রাটা বেড়েছে বুঝি ? আমি ক্ষণ হাঁকাহাঁকি করচি ; কোন্ কমলাক্ষখাদকের (lotus-ters) মুল্লুকে সান্ধ্যসমীরণ সেবন হ'চ্ছিল ?" আমি বিস্ময়ে বলিলাম, "ভ্রাতঃ, তুমি এ সময়ে অসময়ে প্রয়াগে ন ?" রবি বাবু বলিলেন, "ঠাকুর, তোমাকে শাস্তি দিবার য়,—বঙ্গদর্শনের এই বাঁধন, এই দড়াদড়ি তাহার সাক্ষী। বঙ্গদর্শন হইতে তাহার কমলাকান্তটিকে হরণ করিয়া প্রবাসে পলাইয়া আসিয়াছেন কেন ?" আমি সহাস্যে বলিলাম, "বাঃ—আমি চোর হইলাম কিসে ? জ্যান্ত মানুষকে তোমরা মৃত করিলে, সে অপরাধ কি তোমাদের নহে ? অশ্বত্থামার মত, কাকভূষণ্ডীর মত, সাহিত্যের কমলাকান্ত অজর, অমর।" রবি ঠাকুর সহাস্যে বলিলেন, "সে হিসাবে বঙ্গদর্শনও অমর।" আমি বলিলাম, "সতীদেহের মত বঙ্গদর্শন চারিদিকেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতী তাহার এক পীঠস্থান, নব্যভারত তাহার এক পীঠস্থান, সাহিত্য তাহার এক পীঠস্থান, প্রদীপ তাহার এক পীঠস্থান, প্রবাসী তাহার এক পীঠস্থান। আর দক্ষকন্যা দেহান্তে হিমাচলকন্যা হইয়া যেমন মৃত্যুকে উপহাস করিয়াছিলেন, তেমনি নবীন বঙ্গদর্শনও মৃত্যুঞ্জয় ! কিন্তু ভ্রাতঃ, এ যে অদ্ভুত শাস্তি—এ যে অপূর্ব্ব confinement (কারারোধ) !"

এই বলিয়া আমি এত অতিরিক্ত মাত্রায় হাসিতে লাগিলাম যে শেষে আমার মাননীয় অতিথিও সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর, এত হাসি কিসের ?" আমি অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া বলিলাম, "এই confinement শব্দটাই আমাকে এত হাসাইয়াছে। সে বহুকালের কথা। আমার কমলাকান্তী জীবনে অনেক হাস্যরসে রসময়ী ঘটনা ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা খাঁটি ইংরাজের মাদার টিংচার (সার নির্য্যাস)। —আমার বয়স যখন ২৪।২৫, তখন পঞ্জাবে রাজা—সিংহের বাটীতে আমি কেরাণী ছিলাম। আমি রাজাকে ইংরাজি সংবাদপত্র হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া শুনাইতাম। বড় বড় সাহেবদিগের সহিত রাজার তরফ হইতে চিঠি লেখালেখি করাও আমারই কাজ ছিল। একদিন কমিশ্নর সাহেব মহারাজকে এই মর্ম্মে একটি পত্র দেন—

"Dear Raja Saheb,

I am sorry I cannot accept your invitation. Mrs. is confined. So I cannot stir out." etc. etc.*

আমি সাশ্রুনেত্রে বলিলাম, "মহারাজ, আজ আমাদের ভারি দুর্ভাগ্য। কমিশনর সাহেবের পত্নী কারাগারে আবদ্ধা

* "প্রিয় রাজাসাহেব, আমি দুঃখিত হইতেছি যে আমি আপনার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। বিবি—সূতিকাগারে আবদ্ধা ["কারারুদ্ধা," এ অর্থও করা যাইতে পারে]। এই জন্য আমি ঘরের বাহির হইতে পারিতেছি না।"

হইয়াছেন।” কথা শুনিয়াই মহারাজ মর্ম্মপীড়িত হইলেন। সখেদে ও সবিস্ময়ে বলিলেন, “কমিশনরের বিবি যে বড়ই ভাল লোক ছিলেন; এ বোধ করি কাহারও ষড়যন্ত্রের ফল। ইহাকেই বলে ভবিতব্যতা।” আমি মহারাজের আজ্ঞায় ও অভিমতে লিখিলাম,

"Dear—,

I cannot persuade myself to believe that Mrs— could really have committed an offence. I am convinced that she has fallen a victim to some hellish conspiracy. I am exceedingly sorry to learn that she is in confinement."[1]

সহরে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল যে কমিশনর-পত্নী কারাগারে! সাহেবের বন্ধুবান্ধবেরা তো সাহেবকে খুব বিদ্রূপ করিল। তার পরদিন মহাক্রুদ্ধ কমিশনর স্বয়ং মহারাজের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। আমি নির্বুদ্ধিতার জন্য বড় লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইয়া কাজে ইস্তফা দাখিল করিতে বাধ্য হইলাম। বলা বাহুল্য, আমার দুষ্টামি কমলাকান্ত শর্ম্মা ছাড়া কেহই বুঝিতে পারেন নাই।”

“A really good story” (বাস্তবিকই একটি চমৎকার গল্প) বলিয়া রবি বাবু খুব হাসিলেন।

কিন্তু একি? রবি ঠাকুর কোথায়? সহসা অন্তর্দ্ধান! তবে কি ইহা আমার ভ্রান্তি? মধ্যাহ্নকালে জাগ্রত অবস্থায় কি স্বপ্ন দেখিলাম? লোকে বলে জীবিত লোকেরও ডবল (double)[2] আসা যাওয়া করে। তবে কি ইহা রবি ঠাকুরের ডবল্? আমি টেলিগ্রাফ দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলাম, “অমুক দিন মধ্যাহ্নে আপনি কি করিতেছিলেন?” উত্তর আসিল, “শিলাইদহে বসিয়া ডাব খাইতেছিলাম।” তার পর আমি আমার এক থিয়সফিষ্ট বন্ধুকে ধরিলাম। তিনি আমার সমুদয় সন্দেহের এইরূপ মীমাংসা করিয়া দিলেন—

“ওই যে ফৌণ্টেন্ পেনটি—উহাতে তুমি তোমার নদীর মূর্ত্তিময়ী কল্পনা project (ন্যাস বা নিরোপ) করিয়াছিলে, বলিয়াই উহা তিড়িং মিড়িং করিয়া লাফাইয়া উঠিয়াছিল। যেমন ফোনোগ্রাফে শব্দগুলি মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্কিত হয়, যেমন ফোটোগ্রাফে মূর্ত্তি মর্ম্মে মর্ম্মে অঙ্কিত হয়, সেইরূপ এই কলম-নির্ঝরে তোমার মূর্ত্তিময়ী কল্পনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। বিশ্বে এমন অলৌকিক দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আর ঐ বঙ্গদর্শনগুলি, যাহাতে তুমি আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা পড়িয়াছিলে, তাহা জড়ীভূত (materialized) সাহিত্যানুরাগ। আর রবীন্দ্রনাথের মূর্ত্তি—তাহা তো সাক্ষাৎ শরীরিণী প্রীতি। তাহা তো বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে দিবারাত্রি হিতকারী সুহৃদের মত হাসিতেছে।’ তোমার কাছে তাহার মানসীমূর্ত্তি দেহ পরিগ্রহ করিবে, এ আর বিচিত্র কি?”

[1] প্রিয় —, বিবি — যে সত্যসত্যই কোন অপরাধ করিয়াছেন, ইহা কোন মতেই মনকে বুঝাইতে পারিতেছি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন পৈশাচিক চক্রান্তে তাঁহার এই দশা ঘটিয়াছে। তিনি কারাবরুদ্ধা হওয়ায় আমি যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি।”

[2] ডবল্ (double) মানে আত্মাপুরুষের প্রতিরূপ অপর আত্মা। অনেকে বিশ্বাস করেন যে মানবাত্মার এইরূপ প্রতিরূপ আছে, এবং তজ্জন্য একই মানুষ একই সময়ে দুই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকিতে পারে।

আদর্শ কবি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হে সহৃদয় পাঠকপাঠিকাগণ! তোমরা প্রীতিপূর্ণ মাঙ্গলিক আশীর্ব্বাদ কর। তোমাদের মন্ত্রপূত আশিস-গঙ্গাজলে ধৌতশুভ্র ও পুলকিত হইয়া আমার কুরূপা কল্পনা-বধূ রূপলাবণ্যময়ী সুন্দরী হইয়া হাসিতে থাকুক। শ্যামাঙ্গী কুমারী যেমন বিবাহ-উৎসবে বারাণসীর চেলী পরিয়া, আপাদমস্তক অলঙ্কারমণ্ডিতা হইয়া, আদরের আদরিণী হইয়া, সোহাগের সোহাগিনী হইয়া, রূপবতী হয়, সেইরূপ দীপ্তিময়ী হউক। জীর্ণ পরিত্যক্ত অপ্রাপ্তসেবাযত্ন মলিন মালঞ্চ, যেমন শুষ্ক তরুশাখে চারি পাঁচটি বসোরা গোলাপ ফুটিয়া উঠিলে, হাসিয়া উঠে, সেইরূপ হাস্যময়ী হউক। চণ্ডালের গৃহে একমাত্র শেফালি বৃক্ষটি পুষ্পশ্রী ধারণ করিলে যেমন সমগ্র চণ্ডালপল্লী আমোদপূর্ণ হয়, সেইরূপ প্রমোদিনী হউক্। বহুকাল পরে, ভগ্ন শিবমন্দিরে, কোন সাধকসন্ন্যাসী আসিয়া শিবদেহে বিল্বদল ও জবাপুষ্প চড়াইলে দরিদ্র মন্দিরটি যেমন উৎসবময় হয়, সেইরূপ আনন্দময়ী হউক্।

বড় কন্যার নাম শোভা, ছোট কন্যার নাম মালতী, একমাত্র পুত্রটির নাম রামচন্দ্র। তাহাদের পিতা ধনদাস মথুরার শ্রেষ্ঠী। ধনদাসের অর্থাগম মন্দ ছিল না। কবি হেমচন্দ্রের পিতামাতার, শোভার পিতামাতার ও স্বয়ং শোভার

আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে হেমচন্দ্র ও শোভা পতিপত্নী হউক। কেবল একমাত্র হেমচন্দ্রের তিলমাত্র ইচ্ছা ছিল না। শোভা বিবাহযোগ্যা হইয়াছিল। বয়ঃক্রম পূর্ণ ষোড়শ বৎসর। সেকালে মথুরার শ্রেষ্ঠীমণ্ডলীতে বিবাহের বয়স নিরূপণে তত আঁটাআঁটি বাঁধাবাঁধি ছিল না। আর শোভা নিজ পিতামাতার দুলালী ছিল। এই জন্য পূর্ণযৌবনা হইয়াও অনূঢ়া ছিল।

হাঁ, আর এক কথা, শোভা দেখিতে কেমন ছিল? সে তিলোত্তমাও ছিল না, ভুবনমোহিনী হেলেনাও ছিল না। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া দর্শকের চিত্তে ধোকা লাগিত। যেমন অস্তগামী সূর্য্যের হেমাভকিরণে প্রদীপ্তা সন্ধ্যাসুন্দরীকে দেখিয়া গৌরী বলিব কি শ্যামাঙ্গী বলিব, ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠা একটি সমস্যাবিশেষ, সেইরূপ শোভাময়ী শোভার সৌন্দর্য্যে ও যৌবন-ঐশ্বর্য্যে একটি অদ্ভুত প্রহেলিকা ছিল। তাহার সমবয়সীরা তাহাকে আদর করিয়া রাধা বলিয়া ডাকিত।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে শোভা পিতৃভবন আলো করিয়া গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্ম করিতেছিল, এমন সময়ে তাহার সমবয়সী সখীরা কলহাস্যে পাড়া মাতাইয়া ধনদাসের গৃহে হাজির হইল। প্রত্যেকের মাথায় একটি কলসী। তাহারা জল ভরিবার জন্য যমুনার "নারীঘাটে" যাইতেছে। শোভাকেও সঙ্গের সাথী করিবার উদ্দেশে প্রাঙ্গণে রূপসীরা সার গাঁথিয়া দাঁড়াইল। তাহারা গাহিতে গাহিতে ঐকতানিক সুরে বলিল :

বেলা যে যায়, রাধে, জলকে চল্।*

একটি রঙ্গিণী গান গাহিয়া বলিল—

কলসী লয়ে শিরে, ললিতা ডাকে ধীরে,

অপরা গাহিল—

ভুজেতে বালা বাজে, চরণে মল,
উঠানে দাঁড়াইয়া সখীর দল;

তৃতীয়া গাহিয়া উঠিল—

পরাণে ঘুমঘোর, নয়নে সুখঘোর,
বিশাখা ডাকি কহে, "জলকে চল্।"

* এই স্থানে কবিভ্রাতা রবীন্দ্রনাথের "বধূ" নাম্নী মনোহারিণী কবিতার পদানুসরণ করিয়াছি।

তাহার পর সুন্দরীরা আবার ঐকতানিক সুরে গাহিয়া উঠিল—

আমরা গোপনারী, যাই গো সারি সারি,
পথেতে নরনারী চমকি চায়;
বলে গো, "এ কি রূপ, এ যে গো অপরূপ,
রূপ যে ফাটি পড়ে ধরণী গায়।
যেন রে কমলিনী যেন রে কুমুদিনী
সরসীজলসহ চলিয়ে যায়।"

কটিতে কিনকিনি ভুজেতে রিনিঝিনি
হাসিয়ে চলি সব গোপের বালা;
সোণালী অতসীর গোলাপী করবীর
যেন রে এক ছড়া ফুলের মালা।

আমরা গোপনারী, যাই গো সারি সারি,
গলেতে হার দোলে, কানেতে বালা,
বেগুনী লাল পাতে যেন গো চারিভিতে
দেয়ালি পরবেতে দীপের মালা।

আমরা চ'লে যাই, সুখের সীমা নাই,
মধুর গীত গাই, চলেছি ধীরে;
দীপের মালা পরি যেন রে শতভরী
মধুর কলকলে যমুনা নীরে।

দুইটি রঙ্গিনী হাততালি দিয়া গাহিল—

গাহিয়ে ধীরে ধীরে যাই গো নদীতীরে,
আমরা সারি সারি গোপের বালা,
ফাগুনে যথা যায় দোয়াতে কারাবায়
গোলাপ শত শত ভরিয়ে ডালা।

সেই হাস্যময়ী গীতিময়ী ক্রীড়াময়ী যুবতীদিগের রূপপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া গৃহটি যেন রাসমণ্ডলের শোভা ধারণ করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বাড়ীর গৃহিণী, শোভার মা, আসিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আজ বাছারা তোমরাই যাও; তোমাদের রাধা তোমাদের সঙ্গে যাবে না।" সকলে বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে বলিল "কেন? আমরা কি কোন দোষ ক'রেছি?" শোভার মা সহাস্যে বলিলেন, "না বাছা, তোমাদের দোষ কি? রাণীজি আমার শোভাকে পছন্দ ক'রেছেন, আর ব'লেছেন, 'শোভা আমার সখী হ'বে—শোভা যেন আর জল ভ'রতে কলসী কাঁখে

ঘাটে না যায়'।" শোভা ঈষৎ রাগিয়া বলিল, "আমি কি রাণীজির গোলাম?" শোভার মা বলিলেন--"তুই তো বড় হ'য়েচিস্। আজ বই কাল বিয়ে হবে, বিয়ের সম্বন্ধও হ'চ্চে। যদি পথে হেমচন্দ্র তোকে দেখ্‌তে পায়, সেই বা কি বল্‌বে?" হেমচন্দ্রের নাম শুনিয়া শোভাসুন্দরীর কপোল ব্রীড়ারঞ্জিত হইল। কিন্তু সে কৃত্রিম কোপে বলিল--"তবে এরা—এই আমার সহেলিরা কেমন ক'রে যায়?" শোভার মা হাসিয়া বলিলেন "ওদের ভিন্ন কথা। ওরা সকলেই যে বিবাহিতা।"

এমন সময়ে উচ্চহাস্যে "ধ'রেছি, ধ'রেছি," বলিয়া একটি ৯।১০ বৎসরের বালিকা রঙ্গভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। টুক্‌টুকে ঝিক্‌মিকে কন্যা। ঠিক্ যেন রাজা হিমাদ্রির বালিকা কন্যা উমাদেবীর ছবি—বিশ্বকর্ম্মা এণ্ড কোং কর্ত্তৃক ফোটোগ্রাফিত।—সকলে উচ্চরোলে হাসিয়া উঠিল। বালিকাকে দেখিয়া কি সকলে হাসিয়া উঠিল? না, তা নহে। তাহার করধৃত শিকলিবদ্ধ একটি অপরূপ আগন্তুককে দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। বালিকা মালতী শিকলীবদ্ধ পার্শ্বচরের গালে চপেটাঘাত করিয়া বলিল, "এ গালেতে একটা চড়, ও গালেতে একটা চড়।" হতবুদ্ধি জানোয়ারটি চড় খাইয়া কিছুই বলিল না। একটি যুবতী বলিল, "ওমা, কোথায় যাব গো! মালতি, ছোট বোনটি আমার, তুই এই ডাকাতটাকে কেমন ক'রে ধরলি? সে দিন ও আমার কাপড় ধ'রে ছিঁড়ে দিয়েছিল। ওকে আমরা বিলক্ষণ চিনি। ঐ দেখ, ওর কপালে মস্ত টীকা। শ্রীরাম পাণ্ডা ওকে ধ'রে ওর কপালে দাগ ক'রে দিয়েছিল। ও দাগী চোর।" আর এক যুবতী সহাস্যে বলিলেন, "খুব হ'য়েছে। এখন বাছাধন কেমন ক'রে পালাবে! সে দিন আমি খেতে ব'সেছিলেম, তুমি আমার সমস্ত লুচিগুলি হরণ ক'রে বৃক্ষারোহণ ক'রেছিলে। বল বাছা, এখন?" মালতীর মা বলিলেন, "ধন্যি বুকের পাটা! একরত্তি মেয়ে। কি সাহসে ও রাক্ষসটাকে ধরলি? ছেড়ে দে—নইলে তোকে কাম্‌ড়ে দেবে!" মালতী হাততালি দিয়া বলিল, "কাম্‌ড়াতে আর হবে না—সে দফা রফা! এগালে একটা চড়, ওগালে একটা চড়!" শোভা বলিল, "ওকে কি ক'রেচিস্? ওযে একেবারে ভালমানুষ ব'নে গেছে।" মালতী হাসিয়া বলিল, "যাদু ক'রেচি।" শোভা বলিল, "রঙ্গ রাখ্। বানরটা যেন ঘুম থেকে উঠেছে। একেবারে জুজু ওর ভ্যাবাচাকা লেগে গেছে"। বালিকা বলিল, "আমি রোজ বাবার জন্যে কচুড়ি তোয়ের ক'রতাম, ও কেন এসে রোজ চুরি ক'রে খেয়ে ফেল্‌তো? আজ ভাঙ্গের কচুড়ি ক'রে রেখেছিলাম। তুই চারিটি খেয়েই নেশায় চুর। কেমন ধরেছি! কেমন ধরেছি! আর বাবার কচুড়ি খাবে? এগালে একটি চড়, ওগালে একটি চড়।"

সকলে হাসিয়া উঠিল। মালতীর মা মালতীকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বুদ্ধি তোকে কে দিলে?" মালতী বলিল, "রাণীজি"। একটি যুবতী সহাস্যে বলিল, "মালতি, তুই বানরচন্দ্রকে বশ ক'রেচিস্; তোর বড় বহিন হেমচন্দ্রকে এমনি ক'রে বশ ক'রবে।" শোভা ঈষৎ হাসিয়া বিদ্রূপকারিণীর পৃষ্ঠে একটি অতি মৃদু মুষ্ট্যাঘাত করিলেন।

তখন দশমীর চন্দ্র আকাশে হাসিতেছিলেন। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশী বাজিতেছিল। যুবতীরা শোভার কাছে বিদায় লইয়া গাহিতে গাহিতে যমুনার ঘাটের দিকে চলিল—

আমরা গোপনারী যাই গো সারি সারি
পথেতে নরনারী চমকি চায়,
বলেগো, "এ কিরূপ, এযে গো অপরূপ,
রূপ যে ফাটি পড়ে ধরণী গায়।
যেন রে কমলিনী যেন রে কুমুদিনী
সরসীজলসহ চলিয়ে যায়।"
কটিতে কিনিকিনি ভুজেতে রিনিঝিনি
হাসিয়ে চলি সব গোপের বালা,
সোণালী অতসীর গোলাপী করবীর
যেন রে এক ছড়া ফুলের মালা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শোভা সেস্থল পরিত্যাগ করিয়া উপরে ছাদে গিয়া বসিল। চন্দ্রের দিকে তাকাইয়া সগর্ব্বে মনে মনে বলিল, "ও চাঁদের অপেক্ষা আমার হেমচন্দ্রের মুখচন্দ্র শোভাময়।" শোভা এখনও জানে না যে হেমচন্দ্রের হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা কবিহৃদয়ের রাজরাজেশ্বরী মা ভারতী। তাহার আবার বিবাহ কি? শোভা হেমচন্দ্রের সহিত কত খেলা করিয়াছে। দুইজনে সমবয়সী। শোভা হেমচন্দ্রকে চির-দিন ভাল বাসিয়াছে। আর হেমচন্দ্র কি শোভাকে ভাল

বাসে না? হাঁ, ভালবাসে বই কি। বাল্যকালে বাগানে গিয়া দুই জনে কত শেফালি, মল্লিকা, টগর, জাতি ও যূঁই ফুলে নিজ নিজ কোঁচড় পূর্ণ করিত। হেমচন্দ্র যখন নাগাল পাইত না, তখন নিজ স্কন্ধের উপর বালিকাকে তুলিত ও বলিত, "গাছে আচ্ছা করিয়া নাড়া দাও।" শুভ্র শুভ্র পুষ্পে ধরিত্রীদেহ আচ্ছন্ন হইত। কি শুভ্র ফুল! কি শুভ্র হৃদয়! কি শুভ্র আনন্দ! যখন শোভা সাত বছরের কন্যা ছিল, তখন একদিন হেমচন্দ্র শোভার পিতৃভবনে হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইল। হেমচন্দ্রের মাথায় একটা সুবৃহৎ ধামা। শোভার মা জিজ্ঞাসা করিল, "হেমচন্দ্, তোমার মাথায় ও কি?" হেমচন্দ্র সহাস্যে বলিল, "এতে জাতি, যূঁই, মল্লিকা, করবী, পদ্মকরবী, সকল রকমেরই ফুল আছে। আর এর ভিতর আছে, পাহাড়ি গোলাপ, মস্ত প্রকাণ্ড গোলাপ।" হেমচন্দ্র ধীরে ধীরে ধামাটি ভূমিতে নামাইল। একি! সত্য-সত্যই যে পাহাড়ি গোলাপ। এক রাশ জাতি যূথী শুভ্র পুষ্পরাশি—তাহার মধ্য হইতে পাহাড়ি গোলাপ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বাহির হইয়া বলিল, "আমি শোভা নই—আমি পাহাড়ি গোলাপ।" সকলে বালকবালিকার স্বচ্ছ আনন্দে আমোদ অনুভব করিয়া হাসিতে লাগিল। আর একদিন শোভা নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিল। তখন শোভার বয়স ত্রয়োদশ। একটা রাক্ষসাকার বিকট কচ্ছপ শোভার পা ধরিয়াছিল। হেমচন্দ্র রাক্ষসটার সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া মূর্চ্ছাগতা শোভাকে উদ্ধার করিয়াছিল। সে কথাও শোভার মনে পড়িল। ভইয়া হেমচন্দ্ তাহার বহিনী শোভাকে কি ভাল বাসে না? অবশ্যই ভাল বাসে। হায় সরল হৃদয়ের নির্ভর!

ছাদে বসিয়া শোভা তন্ময়চিত্তে হেমচন্দ্রের ভাবনা ভাবিতেছে, এমন সময়ে শোভার ক্ষুদ্র ভ্রাতা রামচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র সাতবছরের বালক। তাহার হস্তে একটি ময়না। সে ঈষৎ দুঃখিতস্বরে বলিল "বহিন্ শোভা, এ ময়না ভারি দুষ্ট; ডাকচে না, কথা ক'চ্চে না। আমি এত বল্চি, বল্ 'রামচন্দ্রজীকি জয়,' কিছুতেই ব'ল্বে না।" শোভা স্নেহে বলিল, "ভইয়া, ও পাখীটার আর দোষ কি? ও সমস্ত দিন তোমার কাছে একশো বুলি বলেছে—ওরও তো প্রাণ আছে। ওকে এখন খাঁচায় পুরে রাখ, ও আরাম করুক।" দুষ্ট রামচন্দ্র বলিল, "কেন পড়্বে না, অবিশ্যি পড়বে। বল 'রামচন্দ্রজীকি জয়'। ও যদি না পড়ে, কাটি দিয়ে ওকে বুলি বলাব। পড়্ ময়না, পড়্।" শোভা ভয় দেখাইয়া বলিল, "জান তো? ও রাণীজির ময়না—ও যেমন তেমন লোকের ময়না নয়। সেদিন তোমার জ্বালায় অস্থির হ'য়ে ময়না রাণীজির বাটীতে—যেখান থেকে এসেছিল—উড়ে গিয়েছিল। রাণীজি কোন বিপদ হ'য়েচে ভেবে ছুটে আমাদের দেখ্তে এলেন। এবার আর এসে হাস্বেন না। এবার এসে নিশ্চিত তোমাকে বেঁধে নিয়ে যাবেন, আর কয়েদখানায় পুরে তোমাকে ফেলে রাখ্বেন।" বালক অন্য মনে বলিল, "ঐ শোন, বহিন, নীচে ফুলওয়ালী এসে বল্চে 'চাই ফুলের মালা চাই।' আমি নীচে যাই। আমি একগাছি মালা নিজের গলায় দিব। আর একগাছি আমার ময়নার গলায় দিব।" এই বলিয়া চঞ্চল বালক ছুটিয়া নীচের দিকে চলিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"চাই ফুলের মালা," "চাই ফুলের মালা," বলিতে বলিতে ফুলওয়ালী ছাদে যেখানে শোভাসুন্দরী ধ্যানমগ্না ছিলেন, আসিয়া উপস্থিত হইল। "ওমা, বহিন্ শোভা, তুমি এখানে? আমি তোমাকে নীচে আতিপাতি ক'রে খুঁজেছি। শেষে রামচন্দ্রের মুখে শুনলাম তুমি ছাদে আছ। তাই তাড়াতাড়ি ওপরে এলাম। আহা, কেমন চাঁদের আলো! কি সুন্দর স্থান! চাঁদ সুন্দর, তুমি সুন্দর, আর তোমার জন্যে এই যে কয়গাছি হরশিঙ্গারের (শিউলীফুলের) মালা এনেছি, এগুলিও সুন্দর। এ মথুরানগরীতে দুইজন হরশিঙ্গারের মালা ভাল বাসে, রাণীজি, আর আমার বহিন্ শোভা। বাহবা! কেমন মানিয়েছে! জয় রাধাজীকি জয়।"

ফুলওয়ালীর বয়স ১৯।২০ হইবে। সে কুমারী ও সুন্দরী। কেমন সুন্দরী? আঃ! তাহাও কি বলিতে হইবে? তাহাকে দেখিলে বোধ হয়, যে দেশে লাল টুকটুকে ডালিম ও বেদানা রাশি রাশি উৎপন্ন হয়, সেই দেশের কোনও রৌদ্রকিরণ-পরিপক্ক ফলরাশিপূর্ণ নয়নাভিরাম উদ্যানে তাহার জন্ম হয়। তাহার উৎসবময়ী মুখশ্রীর প্রতি নেত্রপাত করিলেই বোধ হয় যে দেশে কমলালেবু ও সন্তরার পুষ্পসৌরভে দিগন্ত আমোদিত হয়, সেই দেশের কোনও [illegible]

লালিত হইয়াছে। উপমাটা কিছু সৃষ্টিছাড়া হইল বটে? তা কি করি? রূপ তাহার ফাটিয়া পড়িতেছিল; তাহার বিম্বাধর হইতে সৌরভ উথলিয়া পড়িতেছিল। সে সৌরভ মালার নহে, তাহা মোহিনীর সুরভি নিশ্বাসের। আমি অন্য উপমা কোথা হইতে আহরণ করিব?

শোভা বলিল, "বহিন ফুলওয়ালি, তুমি আমাকে বড়ই ভাল বাস; তাই তুমি আমার সবই সুন্দর দেখ।" ফুলওয়ালী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "ফুল, জ্যোৎস্না আর কালিন্দীর জল, কেনা ভাল বাসে?" শোভা সাদরে বলিল, "তব আমি তোমার পায়ের ক'ড়ে আঙুলের যুগ্যি নহি। ভুবনে এমন রূপ কার আছে গা? যেন ভুবনমোহিনী রতি দেবী মর্ত্ত্যে এসেছেন।" শোভা ফুলওয়ালীকে সস্নেহে আপনার কাছে বসাইল; তাহার পৃষ্ঠে সাদরে হাত বুলাইতে লাগিল। সে সোহাগবন্যায় পড়িয়া ফুলওয়ালী কাঁদিতে লাগিল। সে বলিল, "বহিন রাধা, তুমি আর রাণীজি ছাড়া কেহ আমাকে এত আদর, এত যত্ন করে না। আমি চিরদুঃখিনী।" শোভা বলিল, "সে কি ব'লচ? তুমি ব্রাহ্মণকন্যা—আমরা তোমার পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে পবিত্র হ'য়ে যাই। পূর্ব্বজন্মের কোন কর্ম্মের ফলে আজ তুমি ফুলওয়ালী, নইলে রূপে গুণে ধন্যা তুমি—তোমার যে রাজরাণী হবার কথা।" ফুলওয়ালীর চিত্তে শান্তি আসিল। হায়, মিষ্টকথা! জগতে তুমি এত দুর্ল্লভ কেন?

শোভা বলিল, "আজ এই চন্দ্রালোকে তোমার পূর্ব্বকাহিনী শুনবই শুনব। কতবার শুনতে চেয়েচি, কতবার তুমি বাহানা ক'রেচ। আজ বহিন তুমি অসঙ্কোচে বল, তুমি ব্রাহ্মণকন্যা হ'য়ে ফুলওয়ালী হ'লে কি প্রকারে?" ফুলওয়ালী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, "আমি গুজ্জরদেশের ব্রাহ্মণকন্যা। গীরনার পাহাড়ের ক্রোড়ে জুনাগড়নগরে আমার জন্ম হয়। আমার নাম রুক্মিণী। বহিন রাধা, আমি পা ছড়িয়ে বসি; তুমি আমার ক্রোড়ে মাথাটি রেখে, আমার মুখের দিকে তাকিয়ে—হাঁ, ঠিক্ হয়েচে—মন দিয়ে শোন; আমি তোমার চাঁদমুখ দেখ্‌তে দেখ্‌তে সব দুঃখ ভুলে যাব। জীবনকাহিনী বর্ণনা ক'রতে ক'রতে যদি এক চোখ দিয়ে জল পড়ে, তা'হলে আমি তৎক্ষণাৎ তা অঞ্চল দিয়ে মুছে অন্য চক্ষু দিয়ে প্রাণভ'রে হাসব। বহিন শোভা,—তোমার যেমন নাম, তেমনি তোমার রূপগুণ। জগতে এ শোভার মতন কি শোভা আছে?"

(ক্রমশঃ)

শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা।

শর্করা-বিজ্ঞান

ষষ্ঠ অধ্যায়।

জমি প্রস্তুত।

ইক্ষু লাগাইতে হইলে গভীরভাবে জমির চাস করা আবশ্যক। সাধারণতঃ এদেশে কোদালের দ্বারা জমি কোপাইয়া পরে অন্যান্য আবাদ করার নিয়ম আছে। কিন্তু কোদালের দ্বারা জমি কোপাইতে খরচ অনেক পড়িয়া যায়।
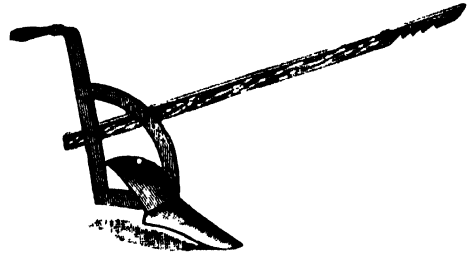
৫ম চিত্র। শিবপুর লাঙ্গল।

শিবপুর লাঙ্গল ব্যবহার দ্বারা কোদালে কোপানর মত কাজই হইয়া থাকে, অথচ এই লাঙ্গল ব্যবহারে বিঘা প্রতি চারি আনা মাত্র খরচ পড়ে। এদিক ওদিক্ করিয়া শিবপুর লাঙ্গলের দ্বারা দুইবার চাস দিবার পরে আর লাঙ্গল ব্যবহার না করিয়া পঞ্চ-ফাল চক্র-হল (Five-lined
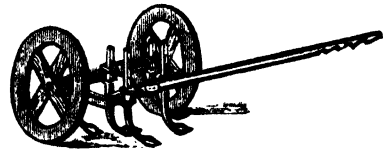
৬ষ্ঠ চিত্র। পঞ্চফাল চক্র-হল।

grubber) ব্যবহার করাতে আরও কিছু সুবিধা আছে। একবিঘা জমি লাঙ্গল দিতে যদি।০ আনা খরচ হয়, তবে একবিঘা জমি এই যন্ত্র ব্যবহার দ্বারা সুগভীর ভাবে চাষ দিয়া লইতে কেবল ৵০ আনা খরচ পড়ে। ইহাতে ঘাস আগাছা ও শিকড় সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রত্যেক বার

লাঙ্গল বা চক্র-হল ব্যবহার করিবার পরে জমি সমতল করিবার ও জমির ঢেলা ভাঙ্গিবার জন্য, মৈ ব্যবহার করা উচিত। মৈ দিবার কার্য্য 'হ্যারো' বা বৃহৎ-বিদের (৭ম চিত্র) দ্বারা আরও ভাল হইয়া থাকে। জমি প্রস্তুত হইয়া গেলে যদি

৭ম চিত্র। বৃহৎ-বিদে।

উহাকে দিনকতক ফেলিয়া রাখা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে পুনরায় ঘাস মারিবার ও জমি আল্গা করিয়া লইবার জন্য লাঙ্গল, চক্র-হল ও বৃহৎ বিদে ব্যবহার না করিয়া বাখার (৮ম চিত্র) ব্যবহার করা বিধেয়। বাখার দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং এদেশে ইহার ব্যবহার প্রচলিত করিতে পারিলে সমূহ উপকার দর্শিবে। বাখার

৮ম চিত্র। বাখার।

দ্বারা লাঙ্গলের তিন গুণ কার্য্য হয়। ঘাস ও আগাছা কাটিয়া দেওয়ার জন্য, জমি উপর উপর আল্গা করিয়া দিবার জন্য এবং জমি সমতল করিয়া দিয়া বীজরোপণের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য বাখার অতি শ্রেষ্ঠ যন্ত্র।

দ্বি-পক্ষ লাঙ্গল ব্যবহার দ্বারা ভিলি প্রস্তুত করিয়া লইয়া কিরূপে কলম লাগাইতে হয়, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়।

উৎপাদন পর্য্যায়।

কোন্ ফসলের পরে ইক্ষু লাগান যাইতে পারে, বা লাগাইলে অধিক লাভ হয়, ইহা জানা বিশেষ আবশ্যক। ইক্ষু একবৎসরকাল জমিতে থাকিয়া জমির সত্ত্ব অনেক টানিয়া লয়। এ কারণ একই জমিতে ক্রমাগত ইক্ষু লাগাইলে জমি নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া যায় এবং সারেরও নিতান্ত ধরিয়া ইক্ষু জন্মাইলে ঐ স্থানে ইক্ষুর হানিজনক পোকা ও 'ধসা' ব্যাধির বীজাণু সকল অধিক পরিমাণে জন্মিয়া গিয়া ইক্ষুর আবাদ এককালীন ঐ স্থান হইতে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। এইরূপ নানা কারণে ইক্ষু উৎপাদন কিরূপ পর্য্যায়ে হওয়া উচিত, ইহা স্থির করা আবশ্যক। খড়ি ইক্ষু লাগাইতে হইলে উপর্য্যুপরি চারি বৎসর একই স্থানে ইক্ষু জন্মাইয়া লাভ অধিক হয় বলিয়া এই ইক্ষু সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু চারি বৎসরের অধিককাল ধরিয়া খড়ি-ইক্ষুও একই জমিতে রাখা কখনই উচিত নহে। ৮।১০ বৎসর একই গোড়া হইতে এই ইক্ষু বাহির হইতে পারে বটে, এবং ভাল করিয়া সার দিয়া আবাদ করিতে পারিলে চারি বৎসরের অধিক কালও লাভ থাকিতে পারে বটে; কিন্তু ব্যাধি সকল জন্মিয়া গিয়া পাছে ইক্ষুচাষের সমূহ ক্ষতি হইয়া যায়, একারণ চারি বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া খড়ি-ইক্ষু এক স্থানে রাখিয়া দিবার প্রয়াস পাওয়াও অন্যায়। অগ্নি দ্বারা ধসা ব্যাধির বীজ এবং কীটের ডিম্বাদি নষ্ট করিয়া, পরে চাষ ও সার দিয়া ও জলসেচন করিয়া, খড়ি-আক্ জন্মাইলে ব্যাধির সম্ভব থাকে না বটে, কিন্তু অগ্নি দ্বারা শুষ্ক পত্রাদি দগ্ধ করাতে জমির ক্ষতি হয়। কীট মারিতে গিয়া অগ্নি দ্বারা পিপীলিকাও মরিয়া যায়। পিপীলিকা দ্বারা ইক্ষু-দণ্ডের কীট অনেক নষ্ট হইয়া থাকে এবং যাহাতে পিপীলিকা মরিয়া যায় এরূপ উপায় করা ভাল নহে। অগ্নি-সংযোগে পত্রাদি দগ্ধ করিলে জমির সারভাগও হ্রাস হয়।

২০। সাধারণতঃ আশুধান্যের পরেই ইক্ষু লাগানর নিয়ম আছে; অর্থাৎ, আশ্বিন মাসে আশুধান্য কাটিয়া লইয়া, কার্ত্তিক হইতে ভাল করিয়া চাষ আবাদ করিয়া, মাঘ ফাল্গুন মাসে আগা বসাইয়া দেওয়াই, সাধারণ নিয়ম। ইহা অপেক্ষা ফাল্গুন মাসে আলু উঠাইবার পরে অঙ্কুরিত 'টিকলি' বসান ভাল। আলুতে অধিক পরিমাণ সার ব্যবহার না করিলে ভাল ফল পাওয়া যায় না, অথচ আলু গাছ জন্মাইবার কারণ সমস্ত সারটী ব্যবহৃত হইয়া যায় না, অবশিষ্ট সার দ্বারা ইক্ষুর উপকার দর্শে। আলু জন্মাইবার ও উঠাইবার কারণ জমি ওলট্-পালট্ হইয়া উত্তম চাষ হইয়া যায়; ইহার পরে মৈ দিয়া

সমানের বন্দোবস্ত হইতে পারে। অন্য কোন রবিশস্য কর্ত্তনের পরেও ইক্ষু লাগাইবার সময় থাকে বটে, কিন্তু আলু উঠাইবার পরে জমি যেরূপ সুন্দর অবস্থায় থাকে, সরষপ বা কলাই বা অন্য কোন রবিশস্য উঠাইবার পরে জমির অবস্থা সেরূপ করিয়া লইয়া ইক্ষু লাগাইতে গেলে ইক্ষু লাগাইবার প্রশস্ত সময় বাহির হইয়া যায়। তবে আশু ধান্য উঠাইবার পরে যদি ইক্ষু লাগাইতে হয়, তাহাতে অনেক সময় বর্ষা নষ্ট হয়; তদপেক্ষা কলাই, মুগ বা ছোলা উঠাইবার পরে, চৈত্র মাসে ইক্ষু লাগান ভাল। এরূপ করাতে মধ্যে আর একটা ফসল লইতে পারা যায়।

২১। ইক্ষু লাগাইবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নিয়ম,—চৈত্র বা বৈশাখ মাসে জমিতে চাষ করিয়া বরটী, শন বা ধইঞ্চা বুনিয়া দিয়া, ভাদ্র মাসে, অর্থাৎ ফুল দেখা গেলেই, শন বা ধইঞ্চা গাছগুলি কাটিয়া জমিতেই পচাইয়া (অথবা বরটী গাছগুলিতে গরু চরাইয়া দিয়া), পরে কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই শন বা ধইঞ্চার কাঠগুলি উঠাইয়া লইয়া, জমিতে চাষ দিয়া চূণ ছিটাইয়া, আলু লাগাইয়া, ফাল্গুনে সেই আলু উঠাইয়া, অমনই আক লাগান। আশু ধান্য লাগাইবার কারণ জমি হইতে যত লাভ হইবে, শন বা ধইঞ্চাকাঠি বিক্রয় দ্বারা তত লাভ না হইতে পারে, কিন্তু বরটী, ধইঞ্চা বা শন জন্মাইবার কারণ জমির উর্ব্বরতাশক্তি এত বাড়িয়া যাইবে, যে আলু ও আক, দুইটী ফসলেরই তদ্দ্বারা উপকার দর্শিবে। এইরূপ পর্য্যায়ে কার্য্য করিতে পারিলে আলু ও আক উভয় ফসলের জন্যই সারের খরচ অনেক বাঁচিয়া যাইবে। ধইঞ্চা জন্মাইয়া জমি যেরূপ সহজে উর্ব্বরা ও আগাছাশূন্য করিয়া লওয়া যায়, এরূপ সহজে এ কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইবার আর কোন উপায় আমি জানি না। চারি মাসের মধ্যে ধইঞ্চা গাছগুলি আট দশ হাত উচ্চ হইয়া উঠে। পানের বরজে ধইঞ্চাকাটি ব্যবহার হয়; কিন্তু জ্বালানী কাষ্ঠরূপেও যদি এই কাঠি ব্যবহার করা যায়, তাহাতেও লাভ আছে। ধইঞ্চা, শন বা বরটী গাছ কি কারণে জমির উর্ব্বরতাশক্তি এতাদৃশ বৃদ্ধি করে, এ বিষয়ে অবগত হইতে হইলে শিকড়শুদ্ধ একটা ধইঞ্চা, শন বা বরটী গাছ উঠাইয়া দেখা কর্ত্তব্য। শিকড়ে ছোট ছোট পেষণ করিলে যে এক প্রকার পিচ্ছিল পদার্থ নির্গত হয়, উহা বিশেষ সারবান। এতদ্ব্যতীত ধইঞ্চা প্রভৃতি গাছের পাতা পচিয়াও সার হয়। পচনকালে চূণের সাহায্য পাইলে পাতা ও শিকড় আরও সত্বর সার পদার্থে পরিণত হয়। বিঘা প্রতি দুই মণ চূণ ছিটাইয়া দিলেই যথেষ্ট। ধইঞ্চা গাছ জন্মাইয়া পরে আলু লাগান, আলুতে যে ভাল করিয়া সার দেওয়ার সমতুল্য, তাহা দেখাইবার জন্য শিবপুর কৃষি-ক্ষেত্রের বাৎসরিক বিবরণী হইতে নিম্নে একটা তালিকা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল—

	একার প্রতি কত উৎপন্ন হইয়াছে।	
	১৮৯৮ সাল	১৯০০ সাল।
ধইঞ্চা জন্মাইবারপরে বিনা-সারে আলু জন্মাইয়া	৭,১৯০ পাউণ্ড	৬,১৮৭ পাউণ্ড
ধইঞ্চা জন্মাইয়া পরে একার প্রতি ১০ মণ রেড়ির খোল দিয়া	৭,১১০ „	...
ধইঞ্চা জন্মাইয়া পরে একার প্রতি ১০ মণ মহুয়ার খোল দিয়া	...	৬,৬৫৫ „
ধইঞ্চা না জন্মাইয়া, একার প্রতি ৩০০ মণ পচা গোবর সার ব্যবহার দ্বারা	৪,১১৫ „	...
ধইঞ্চা না জন্মাইয়া, একার প্রতি ৫০০ মণ পচা গোবর-সার ব্যবহার দ্বারা	..	২,০৩৭ „

২২। গোবর-সার ব্যবহার করা অপেক্ষা ধইঞ্চা জন্মাইয়া আলু লাগান কত ভাল তাহা দুই বৎসরের ফল হইতেই বুঝা যাইতেছে। ধইঞ্চা জন্মাইয়া আলু লাগাইতে পারিলে খোল দিবারও বিশেষ আবশ্যক নাই, ইহাও প্রায় প্রমাণিত হইয়াছে। পাতা ও শিকড় পচিয়া যে সার হয়, তাহা ৩৪ মাসের মধ্যে জমি হইতে নির্গত হইয়া যায় না। এ কারণ আলু উঠাইবার পরে ধইঞ্চা সারের অবশিষ্টাংশ ইক্ষুর উপকারার্থ ব্যয়িত হয়। সাধারণ কৃষি-কার্য্যের আনুষঙ্গিক ভাবে যদি ইক্ষুর চাষ করিতে হয়, তাহা হইলে

কাটিয়া ভাল করিয়া সার দিয়া আলু লাগাইয়া, পরে ফাল্গুন মাসে আলু উঠাইয়া আক লাগানও মন্দ নিয়ম নহে। এ নিয়মে চাষ করিলে সারের জন্য খরচ কিছু অধিক হয়।

(ক্রমশ)

অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার।

যে জাতির আত্মশ্রদ্ধা নাই, তাহার পক্ষে বড় হওয়া কঠিন। অতীত বা বর্ত্তমান অবদান এই প্রকার ভিত্তিভূমি। পুরাকালে উন্নত অবস্থাপন্ন কোন জাতি বর্ত্তমানে অধঃপতিত হইয়া যদি নিজ পূর্ব্বগৌরব ভুলিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পরম হিতকারী বন্ধু কে? যিনি সেই জাতিকে তাহার পূর্ব্বগৌরবের কথা স্মরণ করাইয়া দেন, পূর্ব্বগৌরব আবার লাভ করিতে উৎসাহ দেন, তিনি সে জাতির শ্রেষ্ঠ বন্ধু। এই জন্য, অধ্যাপক মোক্ষমূলরের মৃত্যুর পর যখন লোকে এই আলোচনায় ব্যস্ত ছিল যে, স্বর্গীয় আচার্য্যদেব ভারতবাসীর কি উপকার করিয়া গিয়াছেন, তখন আমাদের মনে হইয়াছিল, যে সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই বলা যায় যে, অধ্যাপক মোক্ষমূলর ভারতবাসীদিগকে তাহাদের লুপ্ত আত্মশ্রদ্ধা পুনঃপ্রদান করিয়া গিয়াছেন। একা মোক্ষমূলরই যে এই কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা নয়। আরও অনেকে তাঁহার

এই বিশ্বাস জন্মে যে, আমরা এককালে বড় ছিলাম। এই ক্ষীণ আশাও আমাদের মনে জাগিয়া উঠে যে হয় ত আমরা পরে আবার বড় হইতে পারিব। বহুশতাব্দীর আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দাসত্বে আমরা এরূপ জড়ভাবাপন্ন হইয়াছিলাম, যে তন্দ্রা, মোহাবেশ যেন ভাঙ্গিয়াও ভাঙ্গিতেছিল না। ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারে, সাহিত্যে, প্রতিভাশালী লোক দেখা দিয়াছিলেন। আমাদের আলস্য দূর করিবার জন্য একজন প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন ছিল। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু সেই বৈজ্ঞানিক। তিনিও একা আসেন নাই।

এখন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, যে আমরা বর্ত্তমানকালে জ্ঞানের জন্য কেবলই জগতের লোকের মুখ চাহিয়া থাকিব, বিধাতার এ ইচ্ছা নয়। অপর দশজন যেমন শিখিতেছে পারি। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পরাধীনতা আমাদের চিরসহচর হইবে না, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক বসু তাঁহার এক বৈদ্যুতিক আবিষ্ক্রিয়াদ্বারা লর্ডকেলবিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণকে বিস্মিত করেন। সম্প্রতি তিনি আর এক অধিকতর বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা বিদ্বমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

গত ১০ই মে লণ্ডনের রয়াল ইনষ্টিটুশনে অধ্যাপক বসু একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় The Response of Inorganic matter to Mechanical and Electrical Stimulus, অর্থাৎ যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় জড়পদার্থের প্রতিচেষ্টা। এই বক্তৃতাতে বসু মহাশয় জীব ও জড়ের ঐক্য বহুপরিমাণে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কেহ যদি বৈদ্যুতিক ব্যাটারি স্পর্শ করেন, তাহা হইলে তাঁহার শরীরে যেমন আক্ষেপ উপস্থিত হয়, জড়েও তদ্রূপ হয়। জৈবপদার্থের উপর বিষের যেমন ক্রিয়া আছে, জড় পদার্থের উপরও তেমনি আছে। এইরূপ নানা বিষয়ে তিনি জড় ও জীবের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। জগদীশ বাবু উপনিষদের একটি শ্লোকের অনুবাদ আবৃত্তি করিয়া তাহার বক্তৃতার পরিসমাপ্তি করেন। তাহার অর্থ, "এই বিশ্বের পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর মধ্যে যাহারা সেই এককে দেখেন, সনাতন সত্য তাঁহাদেরই অধিগত হইয়াছে, আর কাহারও নয়, আর কাহারও নয়।"

বসু মহাশয়ের সম্পূর্ণ বক্তৃতা পাঠ করিবার সুযোগ আমরা এখনও পাই নাই। বিজ্ঞানজগতে তাঁহার আবিষ্কারের মূল্য কতটুক, তাহাও ঠিক বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু উহার প্রকৃত গুরুত্ব যাহাই হউক, আমাদের নিকট উহা অমূল্য। নীতিশতককার সত্যই বলিয়াছেন--

"পরিক্ষীণঃ কশ্চিৎ স্পৃহয়তি যবানাং প্রসৃতয়ে
স পশ্চাৎ সম্পূর্ণঃ কলয়তি ধরিত্রীং তৃণসমাম্।
অতশ্চানৈকান্ত্যাদ্ গুরুলঘুতয়ার্থেষু ধনিনাম্
অবস্থা বস্তূনি প্রথয়তি সঙ্কোচয়তি চ ॥"

আমাদের পূর্ব্বগৌরব ও বর্ত্তমান আশা যেরূপই হউক না কেন, ইহাতে আমাদের অহঙ্কারে স্ফীত হইবার কিছুই কারণ নাই। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া

যে তাঁহাদের একান্ত অযোগ্য সন্তান নহি, তাহাই আমাদের চরিত্র ও কার্য্য দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা উচিত। জগদীশবসুপ্রমুখ ভারতবাসী বৈজ্ঞানিকগণের কথাও যেন আমাদিগকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করে। আমরা তাঁহার স্বদেশবাসী, এই ত সম্পর্ক। তাঁহার একাগ্রতা, স্বার্থত্যাগ, কঠোর তপস্যার অনুকরণ আমরা যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও করিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা তাঁহাকে আপনার লোক বলিতে অধিকারী হইব। রক্তের সম্পর্ক, একদেশবাসিতা, একজাতীয়তা, এসকল কিছুই নয়; চরিত্রের সাদৃশ্য ও আচরণের ঐক্যই আত্মীয়তার, জ্ঞাতিত্বের প্রকৃত ভিত্তি। আমরা যদি নিজ নিজ সাধ্যানুসারে মহতের পদানুসরণ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের তাঁহাদের কীর্ত্তিতে গৌরব অনুভব করিবার কি অধিকার আছে?

অসময়।

মালা নয়, জ্বালা এ যে আছি বুকে করি,—
ধর ধর অঞ্জলি আমার!
কাঁটা যদি থাকে তায়, চরণকমল ছায়
স্নেহে তবু নিও উপহার।
হৃদে নাই ছায়া জল, শুধু ধূ ধূ মরুস্থল,
সর্ব্বনেশে শূন্যের ভাণ্ডার!—
ধর ধর অঞ্জলি আমার।

ওপারে হাসিছে কারা, এপারে একেলা
লুটাতেছি গুমরি গুমরি!
খেয়া তরী শেষবার হয়ে গেছে নদী পার,
ফেলিয়াছি অসময় করি।
নদীজলে রক্ত ভাসে, বালুরাশি হাহা শ্বাসে;
এল এল আঁধার শর্ব্বরী!
লুটাতেছি গুমরি গুমরি।

ভয়ে ভয়ে চেয়েছিনু তোমারে যেদিন,
কেন ধরা দিলে না তখন?
ভেঙ্গে ভেঙ্গে বার বার রচেছিনু উপহার;
বৃথা গেছে অনেক যতন!
আসিয়াছ, হে নিদয়ে, এ দুর্দ্দিনে, অসময়ে
দেখিবারে দাসের সাধন!
কেন ধরা দিলেনা তখন?

কোথা সেই পদ্মবন, বসন্তবিলাস?
হোক্ আজ শ্মশানে বাসর!
করুণ প্রসন্ন মুখে এলে যদি ভক্ত-দুখে,
সাজানু বরণডালা, হাসি মুখে লও মালা,
লও সাথে কণ্টক কঙ্কর!
হোক্ আজ শ্মশানে বাসর!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

মৃত্যু।

মাতৃ-অঙ্কে বাল্যকালে করিতাম ক্রীড়া—
পাশে তুমি নেহারিতে আনন আমার!
যৌবনে জাগিত প্রাণে যুবতীর ব্রীড়া—
সলজ্জ হসিত মুখ দেখেছ দোঁহার!
বিপদে বান্ধব গেছে, আত্মীয় স্বজন,—
তুমি হে একাকী নাহি যাও তেয়াগিয়া!
সংসার-অরণ্যে একা কোরেছি রোদন,
পেয়েছি সান্ত্বনা পুনঃ তোমারে স্মরিয়া।

নিত্যসখা, চিরসাথী, ভ্রমিতেছ সঙ্গে,
তথাপি তোমার নাহি পাই পরিচয়;
তাই কি শিহরে প্রাণ তোমার ভ্রূভঙ্গে,
শুনিলে তোমার নাম কম্পিত হৃদয়?
মিত্র তুমি, সখা তুমি, নহ তুমি অরি,
নেহারিলে ছায়া তব মিছে কেন ডরি!

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

কবি-ভগিনীর প্রতি।

দূর হ'তে বহুদিন, হে বীণাবাদিনি,
শুনি তব গুণ-গাথা, কবিতা-ঝঙ্কার;
আজি পূর্ব্ব-সিন্ধুকূলে, হেরিনু তোমার
সংসার-আশ্রম পূত, বিজনবাসিনি!—
কল্পনা-আকাশ হ'তে, আজি লো ভাবিনি!
পতিপুত্র পরিজনে পূর্ণপ্রেমালয়ে
বিরাজো মানবী-রীতি ধরিয়া হৃদয়ে;—
মুক্ত পক্ষ যুক্ত এবে, নভোবিহারিণি!

বল, কবি! বল আজি, গৃহিণী-জীবন
কেমন লাগিছে মনে? আদর্শ অসীম,
কাব্য-সঙ্গীতের রাজ্য, আজো কি লো জাগে
মায়া-আবরণ ভেদি?—হের কি স্বপন?
কি সাধনা এবে তব?—শান্তি মধরিম

Photo by] [*B. K. Mhatre.*

ম্হাত্রেনির্ম্মিত সরস্বতী-মূর্ত্তি।

প্রবাসী

প্রথম ভাগ। | শ্রাবণ, ১৩০৮। | ৪র্থ সংখ্যা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

মানবতত্ত্ববিদেরা অনুমান করেন যে শরীরকে অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টা হইতেই পরিচ্ছদপরিধানের সূত্রপাত হয়। কিন্তু শীতনিবারণার্থ বস্ত্রের ব্যবহারও বোধ হয় অতি পুরাকালেও প্রচলিত ছিল। অতি অল্পসংখ্যক অসভ্যজাতি এখনও সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ অসভ্যজাতিদের মধ্যেও কটিতটে কৌপীনের সমতুল্য কিছু পরিবার রীতি আছে। অনেক অসভ্যজাতি শরীরের শোভা বাড়াইবার জন্য নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চিত্রিত করে ও উল্কি পরে। দার্শনিক হর্বার্ট স্পেন্সারের মতে ধর্ম্মবিশ্বাস হইতেই এই প্রথার উৎপত্তি হইয়া থাকিবে, কিন্তু এখন ইহা কেবল সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন জন্য এবং ব্যক্তিবিশেষ কোন জাতীয় বা গোত্রীয় তাহা বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়। উল্কি পরার সহিত যে ধর্ম্মবিশ্বাসের যোগ আছে, তাহার পরিচয় আমাদের দেশেও পাওয়া যায়। আমার মনে পড়ে আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন বাঁকুড়ায় আমাদের পল্লীতে প্রাচীনা ব্রাহ্মণ গৃহিণীরা যে সকল নববধূর উল্কি হয় নাই, তাঁহাদের হাতের জল অশুদ্ধ মনে করিতেন। বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য জেলায় উল্কিসম্বন্ধে এরূপ বা অন্যবিধ কোন বিশ্বাস আছে কি না, জানিতে কৌতূহল হয়। সভ্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও নাবিকেরা হাতে নঙ্গর, জাহাজ, প্রভৃতির উল্কি পরে। নব-জীলণ্ড দ্বীপের স্ত্রীলোকেরা সমস্ত মুখ উল্কিকলঙ্কিত না করা লজ্জার বিষয় দেখ, ওর ঠোঁট্ কেমন রাঙা! মা গো!" ডাল্টন বলেন, ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তবাসী খায়েনেরা তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে নানা প্রকার জন্তুর চিত্রের উল্কি পরায়। তাহারা নিজেই বলে যে ইহাতে তাহাদের স্ত্রীলোকদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু তাহারা এটা করে কেবল তাহাদের নারীদিগকে কুৎসিত করিবার জন্য; কারণ, তাহারা স্বভাবসুন্দরী বলিয়া প্রতিবাসী অপরজাতীয় পুরুষদিগের দ্বারা দলে দলে অপহৃত হয়। নব-জীলণ্ডবাসীদের উল্কির শোভা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ক্যারোলাইন দ্বীপবাসীদের উল্কিতেও শিল্পনৈপুণ্য আছে।

***

অসভ্যদেশে পুরুষদের মধ্যেও কেশরচনার নানাবিধ অদ্ভুত প্রণালী দৃষ্ট হয়। আণ্ডামানদ্বীপবাসীরা প্রায় সকল সময়েই মাথা মুড়াইয়া থাকে। নব-হিব্রাইডিজ্ দ্বীপবাসীরা চুলে গাছের ছাল জড়াইয়া শতশত সূক্ষ্ম চূর্ণকুন্তল রচনা করে। সুদানে ডিঙ্কানামক এক নিগ্রোজাতি বাস করে, তাহারা চুলে লাল রং লাগায়। তাহাদের মধ্যে কোন কোন ফুল বাবু এইরূপ রঙ্গীন চুলগুলিকে খাড়া দাঁড় করাইয়া রাখে। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন মাথায় আগুন লাগিয়াছে। কিন্তু ফিজিদ্বীপবাসীদের কেশবিন্যাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈচিত্র্য আছে। তাহাদের অধিকাংশ দলপতির এক একজন কেশরচক আছে। কেশরচনাকার্য্যে প্রতিদিন অনেক ঘণ্টা সময় যায়। সুতরাং এবিষয়ে তাহারা নব্য টেরিকাটা আমাদিগকে

পরিধি ২ হাত হইতে ২॥০ হাত। এই জন্য তাহারা বালিশে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতে পারে না, সংকীর্ণ কাঠের বালিশে ঘাড় রাখিয়া ঘুমায়। আমরাও অনেকে টেরি ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে প্রবল শীতেও মাথায় র‍্যাপার বা শাল দি না। হয় ত রাত্রে মাথায় লেপ মুড়িও দি না। এরূপ সুখ অপেক্ষা সোয়াস্তি ভাল! ফিজি-দ্বীপবাসীদের কেশরচনা দেখিয়া যোগীন্দ্রবাবুর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতে ভূদেববাবুর বর্ণিত নিম্নোক্ত গল্পটি মনে পড়িল—

"এক দিন কলেজে আসিয়া মধু আপন মাথা আমাকে দেখাইয়া বলিল, 'দেখ দেখি, কেমন চুল কাটিয়াছি; ইহার জন্য আমার এক মোহর ব্যয় হইয়াছে।' মধু সেদিন ফিরিঙ্গির মত চুল কাটিয়া আসিয়াছিল। সম্মুখের চুলগুলা বড়, ঘাড়ের চুলগুলা ছোট। আমি বলিলাম, 'একি করিয়াছ? তোমার পক্ষে এ ঠিক হয় নাই। তুমি একজন জীনিয়াস্ (genius); জীনিয়াস যারা, তারা নূতন নূতন বিষয় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। তুমি যদি পাঁচ চূড়া, কি সাত চূড়া, কি ন চূড়া কাটিয়া আসতে, তা হোলে যাহোক একটা নূতন রকম কিছু হ'তো; তা না ক'রে ফিরিঙ্গীর মত চুল কেটে এসেছ। এরূপ নীচ অনুকরণ প্রবৃত্তিটা ভাল নয়।'"

***

ভারতবর্ষের নানাস্থানে যে সকল অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল একটি লৌহের উপর উৎকীর্ণ। তাহা দিল্লীর নিকটবর্ত্তী মেহারৌলীর লৌহস্তম্ভের উপর খোদিত দৃষ্ট হয়। উহা মহারাজ চন্দ্রের চৈত্যোপলিপি (epitaph)। অবশিষ্ট অনুশাসনগুলি হয় তাম্রের নতুবা পাথরের। তাম্রের গুলি তাম্রশাসন নামে পরিচিত। অপর গুলি শিলাশাসন, শিলালেখ বা প্রশস্তি নামে পরিচিত। এই সকল শিলা ও তাম্রশাসনাদি ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই পাওয়া গিয়াছে। উত্তরে পেশাওয়ার জেলার য়ুসফজাই মহকুমান্তর্গত শাহবাজ্‌গঢ়ী হইতে দক্ষিণে প্রাচীন পাণ্ড্যদেশপর্য্যন্ত, এবং পশ্চিমে কাঠিয়াওয়াড় হইতে পূর্ব্বে আসাম পর্য্যন্ত, পর্ব্বত-গাত্রে, পাষাণস্তম্ভে, গুহা ও দেবমন্দিরের দেওয়াল, কড়ি ও থামে, প্রাচীন গ্রাম বা নগরের অবস্থানভূমিতে, প্রভৃতি নানাস্থানে তাম্রশাসনাদি পাওয়া গিয়াছে। নেপালে, লঙ্কা-দ্বীপে এবং কাম্বোডিয়াতেও প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনেকগুলি ছেন প্রধানতঃ নর্ম্মদা ও মহানদীর উত্তরে অবস্থিত প্রদেশ-সমূহে প্রাপ্ত অনুশাসনগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহাদের সংখ্যাই সপ্তশতাধিক। সর্ ওয়াল্টর এলিয়ট্ কানাড়াপ্রদেশ হইতেই ৫৯৫ খানির হাতের লেখা প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। ডাক্তার হুল্ট্‌স্ তাঁহার দক্ষিণভারতীয় অনুশাসনসংগ্রহে প্রধানতঃ তামিল দেশ হইতে সংগৃহীত প্রায় তিনশত প্রকাশিত করিয়াছেন। রাইস্ সাহেব তৎপ্রণীত এপিগ্রাফিয়া কর্ণাটিকার দুই খণ্ডে ১৭৬৫টির আলোচনা করিয়াছেন। এরূপ আরও আট খণ্ড প্রকাশিত হইবে। বেলগাঁও এবং ধারওয়ার জেলায় ফ্লীট্ সাহেব প্রায় এক হাজার অনুশাসনের ছাপ লইয়াছেন। ভারতের কত স্থান যে এখনও খুঁজিতে বাকী আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমুদয় তাম্র ও শিলাশাসন প্রাচীন ভারতবর্ষের কালক্রমানুসারী ইতিহাস লিখিবার প্রধান উপকরণ। নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন মুদ্রাও এবিষয়ে ঐতিহাসিকগণের একটি প্রধান অবলম্বন। শাসনগুলি হইতে অনেক বিচিত্র বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। দক্ষিণভারতবর্ষে শ্যায়মঙ্গলম্ এবং তিরুক্কোভ্‌ূর নামক স্থানদ্বয়ে ৩টি শাসন পাওয়া গিয়াছে। দুইটিই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর। একটিতে এইরূপ লিখিত আছে যে একজন লোক ভ্রমক্রমে নিজ-গ্রামের আর একজনকে শরবিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলে। জেলার শাসনকর্ত্তা ও লোকেরা একত্র হইয়া এই বিচার করেন, যে, আসামী অসাবধানতাবশত যে অপরাধ করিয়াছে তজ্জন্য তাহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত নয়; কিন্তু তাহাকে শ্যায়মঙ্গলম্‌স্থিত ভূনাথের মন্দিরে একটি দীপ জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে। তদনুসারে সে ষোলটি গাভী দান করিয়াছিল। উহাদের দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ঘৃত ঐ দীপে পোড়ান হইত। অপর শাসনটিতেও ঠিক্ এইরূপ একটি অপরাধ ও বিচারের বৃত্তান্ত আছে। কোন রাণীর আদেশে জলাশয় খনন, কোন শৈব সন্ন্যাসীর স্বেচ্ছায় জ্বলন্ত চিতারোহণ, কোন বীরের ব্যাঘ্রশিকার, প্রভৃতি নানা বার্ত্তা নানা শাসন হইতে জানা যায়। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ পুস্তকাকারে অনেকগুলি অনুশাসন মুদ্রিত করিয়াছেন। অন্যান্য ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গেসঙ্গে,

From] ফিজিদ্বীপবাসীদের কেশরচনা। [Atelier

উঁকিপরা ক্যারোলাইন দ্বীপবাসী। [Ancient
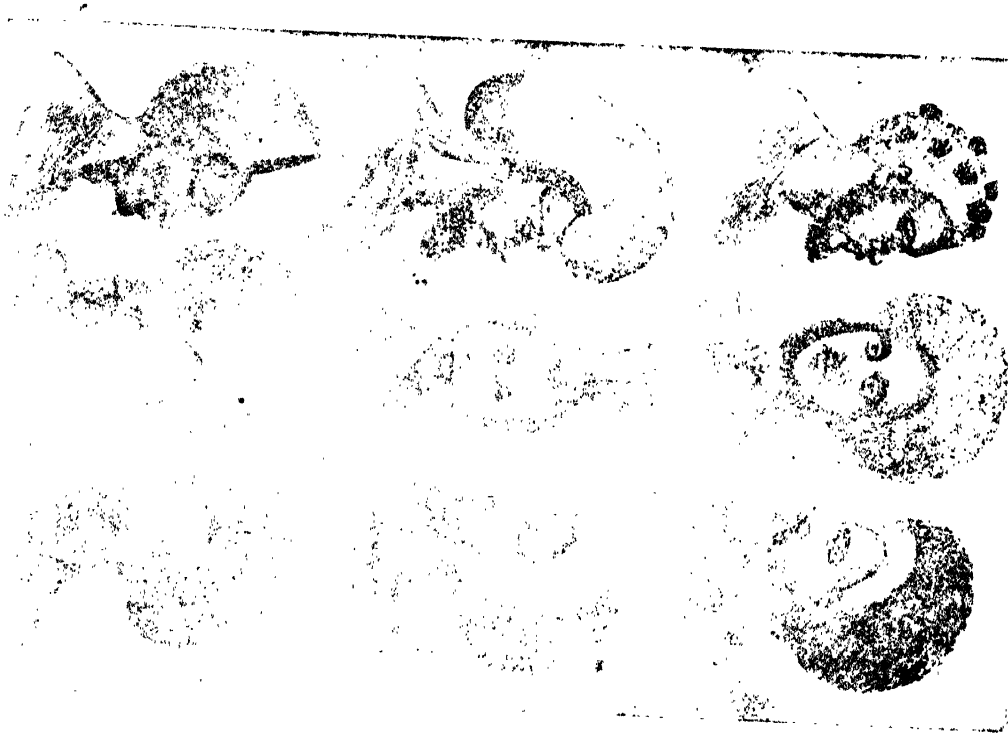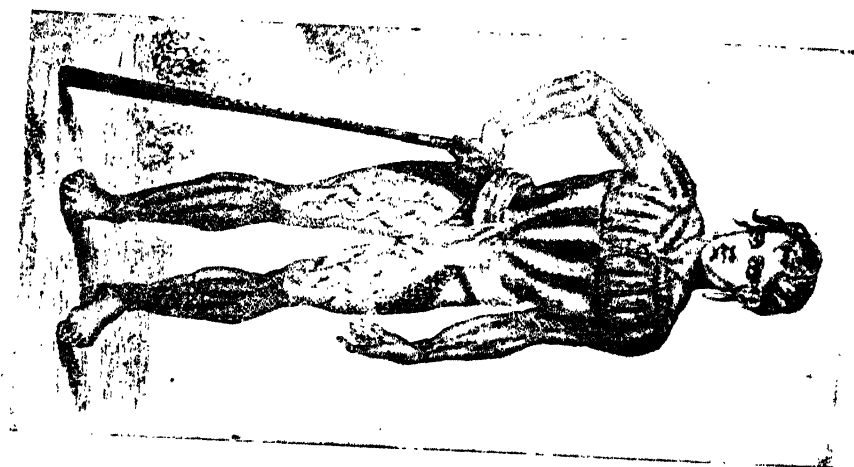
অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহারও পরিচয় পাওয়া যায়। অনুশাসন সংগ্রহ এবং তৎসমুদয়ের পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ। ভারতবাসী অতি অল্পলোকেই এপর্যন্ত একাজে হাত দিয়াছেন।

*
* *

বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি হওয়ায় আজকাল অনেক স্বভাবজ দ্রব্যেরই নকল হইতেছে। কিন্তু এপর্যন্ত কেহ রাসায়নিকের মত কৃত্রিম হাতীর দাঁত ও তিমির হাড় প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। কতকটা হাতীর দাঁতের মত জিনিষ সিন্ধুঘোটকের দাঁত ও একপ্রকার তিমির দাঁতেও পাওয়া যায়। কিন্তু আসল গজদন্ত যেমন উৎকৃষ্ট, এ জিনিষ তেমন নয়। হাতী দুইজাতীয়, এশিয়ার এবং আফ্রিকার। আফ্রিকার হাতী হইতেই অধিক দাঁত পাওয়া যায়; কারণ আফ্রিকার হস্তিনীদেরও প্রকাণ্ড দাঁত হয়। তদ্ভিন্ন, কিছু দিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আফ্রিকাতে অসংখ্য হস্তিযূথ বিচরণ করিত। ঐতিহাসিকযুগে ভারতে কখনও এত হাতী পাওয়া যায় নাই। ভারতবর্ষের গজদন্ত কোনকালেই বেশী পরিমাণে ইউরোপে চালান হইত না। কারণ, এখানে যাহা পাওয়া যাইত, প্রায় সমস্তই নানাবিধ শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া যাইত। এইজন্য ইউরোপ বরাবরই গজদন্তের জন্য প্রধানতঃ আফ্রিকারই মুখাপেক্ষা করেন। কিন্তু আফ্রিকাতেও হাতীর সংখ্যা খুব কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু লুপ্ত হস্তিজাতীয় জন্তু হইতে এখনও অনেকদিন "গজদন্ত" পাওয়া যাইবে। অতি পুরাকালে অতিকায় হস্তী (mammoth) এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার নানাদেশে পাওয়া যাইত। এখনও ইহাদের দেহাবশেষ সাইবীরিয়ার টুণ্ড্রানামক প্রান্তরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তথায় শীতের আধিক্যবশতঃ বৎসরের অধিকাংশ সময় মৃত্তিকা জমিয়া বরফাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য কখন কখন অতিকায় হস্তীর মৃতদেহ এরূপ তাজা অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, যে লোম, চামড়া বা মাংস বিন্দুমাত্রও বিকৃত হয় নাই; হাড় ও দাঁতের ত কথাই নাই। সাইবীরিয়ার বরফাচ্ছন্ন প্রান্তরের উপর দিয়া তথাকার অধিবাসীরা এক প্রকার চক্রবিহীন গাড়ীর সাহায্যে যাতায়াত করে। এক জাতীয় কুকুর এই পুরাতন অথচ তাজা মাংস ভোজন করে। কেবল কুকুরেরাই যে খায়, তাহা নয়; তদ্দেশের যাকুটজাতীয় লোকেরাও ঐ মাংস রুচিপূর্ব্বক ভক্ষণ করে। অতিকায় হস্তী হইতে লব্ধ "গজদন্ত" বোধ হয় প্রাচীন গ্রীকদিগের পরিচিত ছিল। প্রাচীনকাল হইতে চীনদেশীয় লোকেরাও ইহার বিষয় অবগত আছে। নবম বা দশম শতাব্দীতে আরব বণিকেরা সাইবীরিয়া হইতে ইরান ও সীরিয়া পর্য্যন্ত একটি বাণিজ্য বর্ত্ম প্রতিষ্ঠিত করে। তাহাদের কাগজপত্রে ভল্গানদীতীরবর্ত্তী বোলঘারি নগরের সমীপে প্রোথিত গজদন্তের অস্তিত্বের উল্লেখ আছে। সাইবীরিয়ার অতি অল্প অংশই এ পর্য্যন্ত অন্বেষিত হইয়াছে। এই জন্য মনে হয়, ভবিষ্যতে হাতীর দাঁত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিলে, সাইবীরিয়ার ভূগর্ভোত্তোলিত অতিকায় হস্তীর দাঁত ও হাড় হইতে গজদন্তের অভাব বহুকাল ধরিয়া মোচিত হইতে পারিবে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের বাজারে ১৬৩০টি অতিকায় হস্তীর দাঁত বিক্রীত হইয়াছিল।

*
* *

কেনাবেচার সময় আমরা যাহাকে "ফাও" বলি, হিন্দুস্থানে তাহাকে "ঘেলৌনা" বা "ঘেলুয়া" বলে। এইরূপ ফাও দেওয়া ও লওয়ার প্রথা থাকায় এদেশে অনেক জিনিসের শ একশতে হয় না; ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আমের শ ১২০টিতে, বাঁশের শ ১১০টাতে, তরমুজের শ ১২০টাতে হয়। ঘেলৌনা সম্বন্ধে অনেক মজার গল্প হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে। হরবোংপুরে (এলাহাবাদের পরপারস্থিত ঝুসীতে) হরবোং নামে এক রাজা ছিলেন। ইনি রংপুরের ভবচন্দ্র রাজার মত; ইহার সম্বন্ধে একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে—

অন্ধের নগরী বেবুঝ রাজা,
টকা সের ভাজী, টকা সের খাজা।

অর্থাৎ নগরী অজ্ঞানপূর্ণ, রাজা নির্ব্বোধ; ভাজী ও খাজা উভয়ই পয়সা সের বিক্রী হয়। এই প্রবচন প্রচলিত হইবার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে রাজার কুশাসনে লোকেরা দিনে ঘুমাইত ও রাত্রে কাজ করিত। রাজার হুকুমে ভাজী ও খাজা সমান দামে বিক্রী হইত। এখন ফাও বা ঘেলৌনার গল্পটা

কিনিয়া বিক্রেতাকে বলিল, "আমাকে ফাও দাও।" বিক্রেতা রাজী না হওয়ায়, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই রাজার নিকট গেল। রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন "হাঁ, হাঁ, অবশ্য, অবশ্য; ফেলৌনী দিতে হইবে বৈ কি? ফেলৌনী ব্যতিরেকে জিনিস কেনা বেচার কথা আমি কখনও শুনি নাই। তোমার আর কোন পশু নাই?" বিক্রেতা বলিল, "কেবল এই বাছুরটির মা আছে।" রাজা বলিলেন, "তবে এ বাছুরের মাটিকেই ফেলৌনীস্বরূপ দাও; কারণ পুরাতন রীতি ভঙ্গ করা উচিত নয়।" ইহা হইতে "পড়েয়া বাছুর লেনা, ভৈস ফেলৌনী," এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। এই রাজার নামের সহিত আর একটি প্রবাদ সংযুক্ত আছে। তাহা "জিসকী লাঠী, উস্‌কী ভৈঁস।" উৎপত্তি এইরূপ। একটি লোক একটা মহিষ কিনিয়া বাড়ী লইয়া যাইতেছিল। পথে আর একজন লোক আসিয়া বলিল "মহিষটা আমার"। অনেক ঝগড়া দ্বন্দের পর উভয়েই রাজার নিকট গেল। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, "মহারাজ, লাঠি ব্যতিরেকে আপনি কখনও কাহাকেও গৃহী পশু তাড়াইয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছেন কি? ওর লাঠি নাই। আমার আছে। অতএব স্পষ্টই প্রমাণ হইল যে মহিষটা আমার।" রাজা বলিলেন, "ঠিক, ঠিক; আমার এখন মনে হইতেছে বটে, সকল রাখালের হাতেই একটা করিয়া লাঠি থাকে। অতএব আমি এই মীমাংসা করিতেছি যে, লাঠি যাহার, মহিষটাও তাহার।" এই নৃপকুলচূড়ামণির মৃত্যুও তাহার সুবুদ্ধির পরিচায়ক। সাধু গোরখনাথ ও তাহার গুরু মচ্ছন্দর (মৎস্যেন্দ্র) তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে হরবোংএর রাজ্যে উপস্থিত হন। হরবোংপুরে সকল জিনিসই সমান দরে বিক্রী হয় শুনিয়া গোরখনাথ গুরুর নিষেধসত্ত্বেও তথায় বাস করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কয়েক দিন যাইতে যাইতেই নগরে একটা খুন হইল। অপরাধী ধরা পড়িবার পূর্ব্বেই ফাঁসীকাঠ খাড়া হইল এবং ফাঁসীর দিন ধার্য্য হইল। কিন্তু নির্দ্ধারিত দিবসে অপরাধীকে না পাওয়ায় এবং ফাঁসীর দড়ি খুব মোটা ও শক্ত হওয়ায় রাজা হুকুম করিলেন, যে, সমবেত জনতার মধ্য হইতে স্থূলতম দুজন লোককে ধরিয়া পরদিন ফাঁসী দেওয়া হইবে। গোরখনাথ ও মচ্ছন্দর সকলের হুকুম হইল। তাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ স্থির করিয়া মশানে উপস্থিত হইলেন, এবং কে আগে ফাঁসী যাইবেন, তাহা লইয়া পরস্পর তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া দিলেন। রাজা ঝগড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, মচ্ছন্দর বলিলেন, "আমি শাস্ত্র এবং পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি যে অদ্য যে আগে ফাঁসী যাইবে, সে তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠধামে যাইবে। এই জন্য আমি আগে মরিতে চাই।" রাজা বলিলেন, "বটে! এমন সৌভাগ্য তোমাদের মত সামান্য লোকের জন্য নয়। আমিই আগে ঝুলিব।" সুতরাং তাঁহারই ফাঁসী হইল!

*

বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার ছাত্রেরা বহুকাল হইতে এল্ এ ও এণ্ট্রেন্স্ পরীক্ষায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে মাসিক ২৫, ২০, ১৫ ও ১০ টাকা বৃত্তি পাইত। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এখন বৃত্তিগুলির পরিমাণ কমাইয়া যথাক্রমে ২০, ১৮, ১২ ও ৮ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বৃত্তির সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষতি না করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার উৎসাহ দিলে আমরা সুখী হইতাম। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা ভারতগবর্ণমেণ্টকে যে শিক্ষাবিষয়ক অনুজ্ঞা পত্র (The Educational Despatch of 1854) লেখেন, তাহাতে ভারতবাসিগণের উচ্চশিক্ষার অনেক সুবন্দোবস্তের সূত্রপাত হয়। এই পত্রে লিখিত ছিল যে যোগ্য ছাত্রগণকে যে বৃত্তি দিতে হইবে তাহার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইবে

"at such a sum as may be considered sufficient for the maintenance of their holders at the Colleges or Schools to which they are attached, and which may often be at a distance from the homes of the students."

উদ্ধৃত অংশটি পাঠকগণ ভারতবর্ষীয় এডুকেশন কমিশ্যনের রিপোর্টের ২৭৯ ধারায় দেখিতে পাইবেন। যখন বৃত্তিগুলির পরিমাণ ২৫, ২০, ১৫ ও ১০ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তখন উচ্চতম বৃত্তিগুলির টাকায় বৃত্তিভুক্ ছাত্রদের বেতন ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় চলিতে পারিত। আজকাল চলিত না; বিশেষতঃ যদি ছাত্রেরা কলিকাতায় এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িত। গবর্ণমেণ্ট কোথায় বৃত্তিগুলির পরিমাণ

থেকে কোন দেশেই প্রকৃত প্রাথমিক শিক্ষা উন্নতি লাভ করে নাই। সুতরাং আমাদের দেশে যে ইহার বিপরীত ফল ফলিবে, এরূপ মনে করা ভুল। আমাদের দেশের ধনীরা পাশ্চাত্য দেশের ধনীদের মত ঐশ্বর্য্যশালী নহেন, কিন্তু আমাদের ছাত্রদের জন্য পাশ্চাত্য দেশের ছাত্রদের মত এত বেশী খরচও হয় না। আশা করি গবর্ণমেণ্ট যেমন উচ্চ শিক্ষাকে অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিতেছেন, আমাদের ধনী লোকেরা সেই পরিমাণে ইহার সহায় হইবেন। নতুবা দেশের আশা কোথায়? বিখ্যাত ফরাসি লেখক রীনন তাঁহার Questions Contemporaines নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন —

"It is the university which makes the school. * * The education of the masses is the result of the high culture of certain classes. The people of those countries which, like the United States, have created a great school system for the people without a serious higher instruction shall for a long time yet expiate their fault by their intellectual mediocrity, their coarseness, their superficiality, and their lack of general intelligence."

আষাঢ়ের "প্রবাসী"তে "রাজা রামমোহন রায়" শীর্ষক কবিতাটি অনবধানতাবশতঃ কবির শেষ সংশোধনানুসারে মুদ্রিত হয় নাই। সংশোধিত পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"হে রাজেন্দ্র! অমসরা তমস্বিনী ঘোরা!
একটি নক্ষত্র নাই! আজি এই বঙ্গে,
ভেসে যাই, ভেসে যাই, ভেসে যাই মোরা,
লীলাময়ী লালসার চঞ্চল তরঙ্গে!
অপাঙ্গে মাধুরীরাশি, চাতুরী ভ্রূভঙ্গে,
আস্বাদিছে নাস্তিকতা! সুরা রক্তাকারা
পানপাত্রে মুহুর্মুহু! হয়ে মাতোয়ারা
অধর্ম্ম অঘোরপন্থী নাচে, হের, রঙ্গে!
হে রাজর্ষি! ধ্যানবলে, নারদীকে শ্বলে,
আন, আন উষারূপা অনিন্দ্যসুন্দরী
ভকতিরে! জ্ঞানারুণ উদয়-অচলে
ছড়াক্ আলোকরাশি! পোহাক্ শর্ব্বরী!
আর্দ্রকেশে, শুভ্রবেশে, আনন্দে ধরিয়া
হরিপাদপদ্ম, বঙ্গ উঠুক হাসিয়া!"

আমাদের দেশের বৃদ্ধ ইংরাজীশিক্ষিত কোন কোন কৃতী ব্যক্তির সম্বন্ধে এরূপ গল্প শুনা যায় যে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থাপন্ন কোনও লোকের গৃহে রাধুনী বা ভৃত্যের কাজ করিয়া লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। আজকাল কিন্তু যে সকল দরিদ্র ছাত্র স্বাবলম্বন দ্বারা শিক্ষা লাভ করেন, গৃহশিক্ষকের কাজই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বিত উপায় বলিয়া শুনা যায়। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের দরিদ্র ছাত্রেরা কি কি উপায়ে নিজের খরচ চালান, তৎসম্বন্ধে জুনমাসের সেঞ্চুরী পত্রিকায় একটি সুন্দর সচিত্র প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে দরিদ্র ছাত্রেরা কেহ বা মাংসের দোকানে, কেহ বা মদিখানায় বিক্রেতার কাজ করেন, কেহবা গ্রীষ্মকালে হোটেলে কেরাণীগিরি করেন, কেহ কেহ বা উনন পরিষ্কার পর্য্যন্ত করেন! প্রত্যেক শিক্ষালয়ে ছাত্রদিগকে ধার দিবার জন্য স্বতন্ত্র ফণ্ড আছে; বৃত্তিও আছেই। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে দরিদ্র ছাত্রদের কাজ জুটাইয়া দিবার জন্য এক একটি স্বতন্ত্র আফিস্ আছে। কোন গৃহস্থ বা ব্যবসাদারের লোকের প্রয়োজন হইলে সেই আফিসে খোঁজ করিলেই হয়। আফিসে কর্ম্মপ্রার্থী ছাত্রদের তালিকা থাকে। আমেরিকাতে গৃহশিক্ষকের কাজই ছাত্রদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। বেতনের হার ঘণ্টায় অর্দ্ধ ডলার (প্রায় ১॥৴০) হইতে দুই ডলার (প্রায় ৬।৵০) পর্য্যন্ত। কোন কোন অভিজ্ঞ গৃহশিক্ষক বৎসরে চারি হাজার টাকারও উপর রোজগার করিয়াছেন। আমাদের পাঠকগণ অবশ্যই জানেন যে পাশ্চাত্য দেশে ছাত্রগণ কলেজে বাস করেন। কোন কোন ছাত্র সহরের ব্যবসাদার ও ছাত্রগণের মধ্যে মধ্যবর্ত্তিতা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন। ছাত্রগণ দরকারী জিনিষ তাঁহাদেরই মারফতে প্রাপ্ত হন। অনেকে কলেজের সংবাদপত্র ও মাসিক পত্র চালাইয়া নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। আমাদের দেশের সম্পাদকগণের অন্য আয় না থাকিলে দেওয়ানী জেলে যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। কোন কোন ছাত্র সহপাঠীদের খানার বন্দোবস্ত করিয়া নিজেরও খরচ পোষাইয়া লন। কেহ বা খানা খাইবার সময় হোটেলে বা অন্যত্র পরিবেশনকারী ভৃত্যের কাজ

করা যাইতে পারে; যথা: হাণ্ডবিল বিতরণ, সিগার পান, রেলওয়ে ষ্টেশনে দারবানের কাজ, বড় বড় সহরে দ্রষ্টব্য স্থানাদিপ্রদর্শকের কাজ, ফল বিক্রয়, আম বিক্রয়, সন্ধ্যাকালে রাস্তায় গ্যাস জ্বালান ও প্রভাতে তাহা নির্ব্বাপণ, বেলা তিনটা হইতে দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত ট্রামকারে কণ্ডক্টরের কার্য্য, ইত্যাদি। লেখকের প্রবন্ধটি দীর্ঘ না হইলে আমরা উহার সারসঙ্কলন করিয়া দিতাম। উহা হইতে অনেক শিখিবার আছে।

২।

ভূপালের সমীপে সাঁচী নামক স্থানে অনেকগুলি বৌদ্ধ-স্তূপ আছে। এই স্তূপগুলির সিংহদ্বারের খোদিত প্রস্তরসমূহ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন শিল্প, আচার ব্যবহার, পরিচ্ছদ, সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি নানাবিষয়ক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারা যায়। কোন কোন খোদিত মূর্ত্তি বা দৃশ্যের ফোটোগ্রাফ পূর্ব্বেই লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সমুদয় খোদিত দৃশ্যের ফোটোগ্রাফ গত বৎসর লওয়া হইয়াছে। বোম্বাই প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক কজেন্স সাহেব (Mr. Cousens) গত বৎসর ১২ × ১০ ইঞ্চি মাপের ১২৫ খানি ফোটোগ্রাফ লইয়াছেন। এই ফোটোগ্রাফগুলিতে সাঁচীর প্রধান স্তূপের চারিটি সিংহদ্বারের সমুদয় দৃশ্যের সকল খোদাই কাজেরও প্রতিকৃতি উঠিয়াছে। ফোটোগ্রাফগুলির নকল সাধারণে ক্রয় করিতে পাইলে সুখের বিষয় হইবে, নতুবা বিলাতে ইণ্ডিয়া আফিসের গুদামজাত হইলে কাহারও লাভ নাই।

ভারতবর্ষের শিল্প।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে নানাবিধ ললিতকলা (fine arts) এবং জীবনসাধন শিল্পের (industrial arts) উন্নতি হইয়া আসিতেছে। ঋগ্বেদে দেখা যায়, যে, যে যুগে উহার স্তোত্রগুলি রচিত হইয়াছিল, তৎকালে আর্য্যেরা কাপড় বুনিতে এবং বর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ, তনুত্রাণ, এবং নানাবিধ যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন। তাঁহারা স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকা, প্রস্তরনির্ম্মিত নগর, খদির ও শিশুকাষ্ঠের রথ, এবং নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন। প্রতীত হয়, যে প্রাচীন আর্য্যেরা নৌকা ও জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন। ইহাতে সুবর্ণমুদ্রার প্রচলন, ধাতু গলান, কর্ম্মকারের ভস্ত্রাযন্ত্র, সুবর্ণসজ্জাবিশিষ্ট অশ্ব, প্রভৃতির উল্লেখ আছে। বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ হইতে ইহাও প্রমাণ হয় যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অতি প্রাচীনকাল হইতেই সঙ্গীতের চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন।

কৌষেয় বস্ত্র বলিতে রেশমী কাপড় বুঝায়। পাণিনির ব্যাকরণে চতুর্থ অধ্যায়ে এই কৌষেয় কথাটির ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে পাণিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০ অব্দে জীবিত ছিলেন। সুতরাং তৎকালে যে ভারতবর্ষে পট্টবস্ত্রের ব্যবহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে শতপথ ব্রাহ্মণ পাণিনীয় ব্যাকরণ অপেক্ষাও প্রাচীন। এই শতপথ ব্রাহ্মণে "কৌশবাসে"র উল্লেখ আছে। সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র যে অতি প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষ হইতে রোমকসাম্রাজ্যে ও অন্যত্র রপ্তানী হইত ইহা সুপরিজ্ঞাত কথা। বার্ড্‌বুড্‌ সাহেব বলেন, আনুমানিক ৪৫০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে লিখিত এষ্টারের পুস্তক (Book of Esther) নামক বাইবেলের অংশবিশেষে প্রথম অধ্যায়ে মূল হিব্রুতে "কার্পাস" কথাটি আছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, প্রায় আড়াইহাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের কার্পাসবস্ত্র সুদূর য়ুডিয়া দেশে সুপরিজ্ঞাত ও প্রচলিত ছিল। বোগদাদের খলিফাগণের অন্তঃপুরে ঢাকাই মসলিনের প্রভূত আদর ছিল। আমরা অজণ্টাগুহাচিত্রাবলী শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে বুদ্ধদেবের জীবিতকালে ভারতবর্ষে অতিশয় সূক্ষ্মবস্ত্রের ব্যবহার ছিল। মোগলবাদশাহদিগের সময় যে সূক্ষ্ম রেশমী ও কার্পাসবস্ত্রের যারপর নাই আদর ছিল, তাহা অনেকেই জানেন। আকবরের পরিচ্ছদাগারসংলগ্ন কারখানায় বহুসংখ্যক সুদক্ষ তন্তুবায় কাজ করিত। সম্রাট তাহাদিগকে নানাপ্রকারে উৎসাহ দিতেন। জাহাঙ্গীরের আমলে প্রস্তুত ১৫ গজ লম্বা এবং একগজ চৌড়া ঢাকাই মস্‌লিনের ওজন হইত মোটে পাঁচতোলা। এখন অত বড় মস্‌লিন্‌ প্রায় দশ তোলার কম ওজনে প্রস্তুত হইতে পারে না। সেকালে ওরূপ একখান মস্‌লিনের দাম ছয় শত টাকা হইত। এখন যাহা প্রস্তুত হয়, তাহার দাম দেড় শত টাকার বেশী

আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার জন্য বরাত দিয়া তিনটি থান প্রস্তুত করান হয়। প্রত্যেকটি ২০ গজ লম্বা, এক গজ চৌড়া এবং ওজনে প্রায় সাড়ে নয় তোলা। খুব ভাল কুড়ি গজ লম্বা ও এক গজ চৌড়া মস্‌লিনের থান অঙ্গুরীর ভিতর দিয়া টানিয়া লওয়া যাইতে পারে। এরূপ একটি থান বুনিতে ছয় মাস লাগে; মূল্য ৩০০ টাকা। বিখ্যাত পর্য্যটক টাভের্নিয়ে বলেন যে পারস্য সম্রাট শাহ সাফির (১৬২৮-১৬৪১খৃঃ অঃ) দূত ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া নিজ প্রভুকে একটি রত্নখচিত নারিকেল উপহার দেন। উহার ভিতর ৩০ গজ লম্বা একটি মস্‌লিনের পাগড়ি ছিল। উহা এরূপ কোমল ও সূক্ষ্ম ছিল যে ছুঁইলে মনে হইত না যে কিছু ছুঁইলাম। বোধ করি এইরূপ সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনাবৃতা নিজ প্রেমপাত্রীর উদ্দেশে এক হিন্দুস্থানী কবি লিখিয়াছেন—

"আতে হৈ অপ্নে মুঁহ্ পে দুপাট্টেকো তান কর;
দেতে হৈ হম্‌কো মরবং-ই দীদার ছান কর।"*

এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম মস্‌লিন পূর্ব্বে ঢাকায় প্রস্তুত হইত, তাহা ঘাসের উপর বিছাইয়া দিলে দেখিতে পাওয়া যাইত না। সান্ধ্যশিশির হইতে পৃথক্ করা যাইত না বলিয়া ইহার নাম ছিল, "শব্‌নম" (সান্ধ্যশিশির)। আর এক প্রকার মস্‌লিনের নাম ছিল, "আব্-রওআন" (প্রবহমান জল), কারণ ইহা জলে ফেলিলে অলক্ষ্য হইয়া যাইত। রেশমী কাপড়ের চাঁদতারা, বুল্‌বুল্‌চশ্ম (বুলবুলের চোখ), মজ্‌চর (রজত-লহরী) প্রভৃতি আরও অনেক কবিত্বপূর্ণ নাম ছিল।

ভারতবর্ষেই তন্তুবয়নবিদ্যা পৃথিবীর মধ্যে প্রথমে পূর্ণ উন্নতিলাভ করে। এখানকার সূক্ষ্ম মস্‌লিনই যে সর্ব্বত্র আদৃত হইত, তাহা নয়; মনুস্মৃতির পূর্ব্বযুগ হইতে আমাদের দেশের কিংখাব্ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্র বিদেশে আদৃত হইয়া আসিতেছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের সময় তাঁহাকে রাজন্যবর্গ যে সকল উপহার দেন, তন্মধ্যে হিন্দুকুশের পশুরোম, গুজরাতের আভীরদিগের তৈয়ারি পশমী শাল,

প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যান্য সমুদয় তান্তব দ্রব্যের (textile fabrics) সংক্ষিপ্ত উল্লেখও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ঋগ্বেদে স্বর্ণালঙ্কারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অজন্টাগুহাচিত্রাবলী প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে প্রাচীন ভারতে অলঙ্কারের কিরূপ প্রাচুর্য্য ছিল। বাস্তবিক সোনার কাজ পুরাকালে ভালই হইত। রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থ হিরণ্ময়ী সীতামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রামায়ণকে কিঞ্চিন্মাত্রও ঐতিহাসিক মনে না করিয়া, উহাকে কেবল কাব্য মনে করিলেও, উহার রচনা কালে যে স্বর্ণকারগণের এইরূপ বৃহৎ প্রতিকৃতিনির্ম্মাণের ক্ষমতা ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সোনারূপার কাজ সাউথ কেনসিংটন কৌতুকাগারে রক্ষিত আছে। ঐতিহাসিকের চক্ষে মূল্যবান এই দ্রব্য দুটির মধ্যে প্রথমটি একটি সোনার কৌটা এবং অপরটি একটি রূপোর থালা। সোনার কৌটাটি জেলালাবাদের নিকটবর্ত্তী বিমারনের দ্বিতীয়সংখ্যক বৌদ্ধস্তূপে পাওয়া যায়। কৌটাটির সহিত কতকগুলি তাম্রমুদ্রা ছিল। তাহা হইতে স্থির হইয়াছে যে স্তূপটি, এবং সুতরাং, কৌটাটি আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০ অব্দের। ইহার উপর সুন্দর খোদাই কাজ আছে। ইহার একটি চিত্র দেওয়া গেল। এই

বৌদ্ধস্তূপে প্রাপ্ত স্বর্ণকৌটা।

* ইহার তাৎপর্য্য এই—"তিনি তাঁহার দুপাট্টা (এক প্রকার চাদর) তাঁহার মুখের উপর টানিয়া আসিতেছেন; তাঁহার সৌন্দর্য্যরূপ

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সোনা-রূপার নানাবিধ অলঙ্কার ও অন্যান্য দ্রব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবারও স্থান নাই। কৌতূহলী পাঠক শিল্পের এই এবং অন্যান্য শাখার বৃত্তান্ত বার্ডউড সাহেবের The Industrial Arts of India এবং শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের A Hand-book of Indian Products-এ দেখিতে পাইবেন।

নানা প্রকার গৃহ, মন্দির ও গুহানির্ম্মাণে যে প্রাচীন আর্য্যদিগের বিশেষ দক্ষতা ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। বৌদ্ধযুগেই ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের বিশেষ উন্নতি হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাস্করগণ নিজ নিজ নৈপুণ্যের অনেক চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে এখনও গ্রীকদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। গ্রীক ভাস্করেরা মানুষ ও দেবদেবীর মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্যের যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, ভারতীয় শিল্পিগণ তাহার নিকটেও যাইতে পারেন নাই। ভারতের যে সকল প্রাচীন মন্দিরাদি এখনও বিদ্যমান আছে, তাহাতে প্রস্তরে খোদিত যে সকল নরনারীর ও দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়, তৎসমুদয়ে ভাস্করগণের অসাধারণ ধৈর্য্য, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় এবং সিদ্ধহস্ততার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু গ্রীক ভাস্করগণের ন্যায় উন্নত প্রতিভার পরিচয় তাহাতে নাই। মন্দিরাদির গঠনপ্রণালী এবং তাহাদের গাত্রে অঙ্কিত চিত্রগুলি সম্বন্ধেও এই সকল কথা খাটে। ইহা ফর্গুসন প্রভৃতি ইউরোপীয় শিল্পসমালোচকগণের মত। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তও এই মতে সায় দিয়াছেন। তিনি বলেন, কপিল ও কালিদাসের দেশে প্রতিভার অভাব ছিল না। কিন্তু উচ্চবর্ণের লোকেরা ক্রমে ব্যবসায়ে বিমুখ হইয়া পড়ায়, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি ললিতকলাগুলি নিম্ন শ্রেণীর লোকদের একচেটিয়া হইয়া পড়ে। এমত অবস্থায় প্রতিভার পরিচয় কেমন করিয়া পাওয়া যাইবে? বার্ডউড্ সাহেব আরও একটি কারণের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হিন্দুদের পৌরাণিক অনেক দেবদেবী এবং তাঁহাদের অবতারগণের মূর্ত্তি অস্বাভাবিক। হিন্দু শিল্পিগণ ধর্ম্মভাবের প্রেরণায় তাঁহাদের ভাস্কর্য্য ও চিত্রে অন্ধভাবে পুরাণোক্ত বর্ণনার অনুসরণ করিয়াছেন, সৌন্দর্য্য সৃষ্টির পৌরাণিক বর্ণনা ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিয়াছেন, সেখানেই সৌন্দর্য্যরচনায় বহু পরিমাণে সফলপ্রযত্ন হইয়াছেন। প্রাচীন ভারতে চিত্রবিদ্যার অবস্থা কিরূপ ছিল, অজণ্টাগুহাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া গিয়াছে। সংস্কৃত কাব্যেও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কালিদাসের শকুন্তলার ষষ্ঠ অঙ্ক এবং ভবভূতির উত্তররামচরিতের প্রস্তাবনার নাম করিতে পারা যায়।

প্রাচীন ভারতে আরও নানাপ্রকার শিল্প ছিল। সমুদয়ের বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে একটি পুস্তক লিখিতে হয়। সে ক্ষমতাও আমার নাই, অধিকন্তু পুস্তকমুদ্রণ করিবার জন্য প্রবাসী প্রতিষ্ঠিতও হয় নাই। এখানে কেবল একটি শিল্পের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের এই অংশের উপসংহার করিব। মহাভারত রচনাকালে হিন্দুগণ কাচের ব্যবহার জানিতেন। যুধিষ্ঠির যখন রাজসূয় যজ্ঞ করেন, তখন একটি রাজকীয় মণ্ডপের কুট্টিম স্ফটিকনির্ম্মিত ছিল। দুর্য্যোধন এই মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া কুট্টিমকে জল মনে করিয়া পরিচ্ছদ গুটাইয়াছিলেন। এই স্ফটিক কাচ বই আর কিছুই নয়।

স্বর্গীয় রাণাডে মহাশয় ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ সামাজিক সমিতির অধিবেশনে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে, ভারতবর্ষ মুসলমানশাসনাধীন হওয়ায় কি কি উপকার হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করেন। তিনি ভারতীয় শিল্পের উন্নতির উল্লেখ করিয়াছিলেন কি না, এখন মনে পড়িতেছে না। কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান প্রতিভার সম্মিলনে শিল্পের সকল বিভাগেই যে উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নানাবিধ ধাতব দ্রব্য নির্ম্মাণ, অলঙ্কার নির্ম্মাণ, কফ্তগিরি ও বিদ্রি (damascening), মীনার কাজ (enamelling), লাক্ষালেপন (lacquer work), যুদ্ধাস্ত্রনির্ম্মাণ, হাতী ও ঘোড়ার সাজ প্রস্তুতকরণ, আবলুস, চন্দন ও অন্যান্য নানাবিধ কাঠের উপর খোদাই, ঝিনুক এবং স্বর্ণাদি প্রতিবপন (inlaying), হাতীর দাঁত খোদাই, হাতীর দাঁতের উপর ক্ষুদ্র চিত্রাঙ্কণ (miniature-painting), প্রস্তর ও মৃত্তিকার মূর্ত্তি রচনা, গালার কাজ, প্রভৃতি শিল্পের নানা অঙ্গেই হিন্দু মুসলমান প্রতিভার সম্মি-

From] [*Birdwood.*

মাস্থলিপাটাম ছিট।
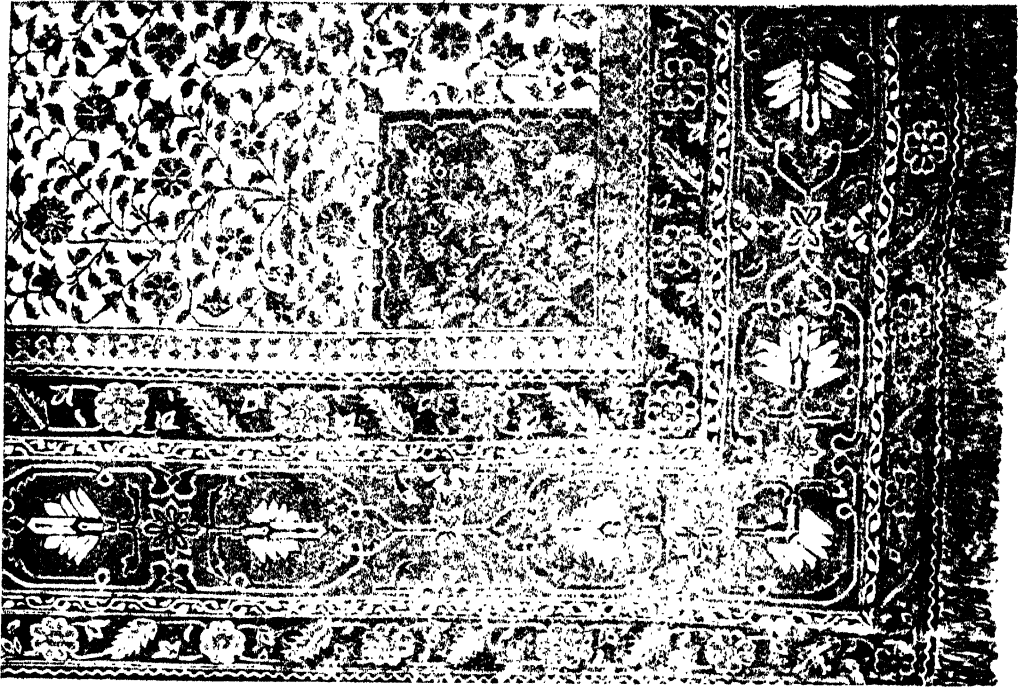
From] হয়দরাবাদের রেশমী গালিচা। [Birdwood
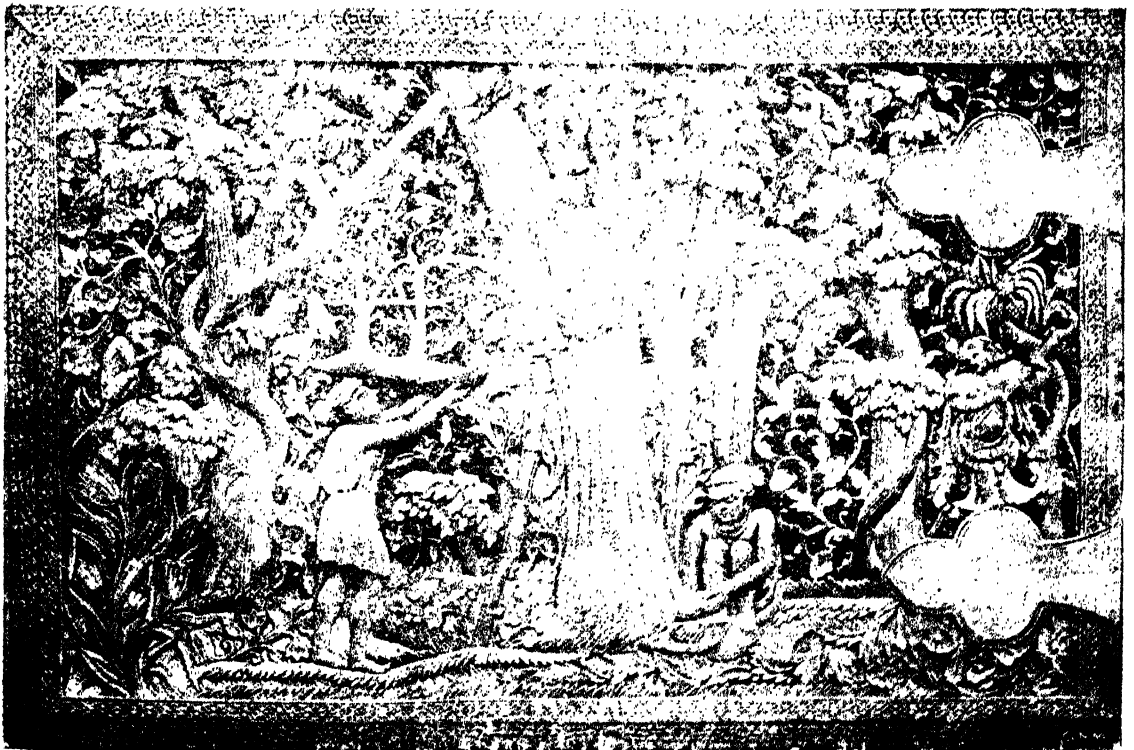
From] ত্রিবাঙ্কোড়ের চন্দনকাঠের উপর খোদাই। [Birdwood
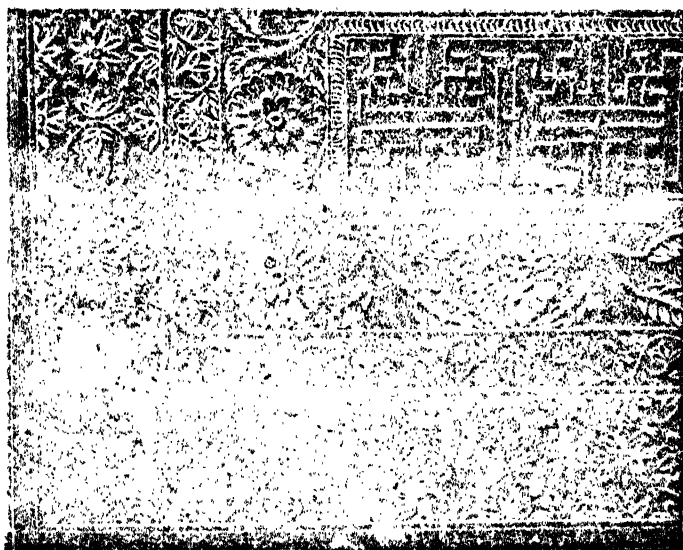
[From] আব্‌লুসের উপর খোদাই। [Birdwood.
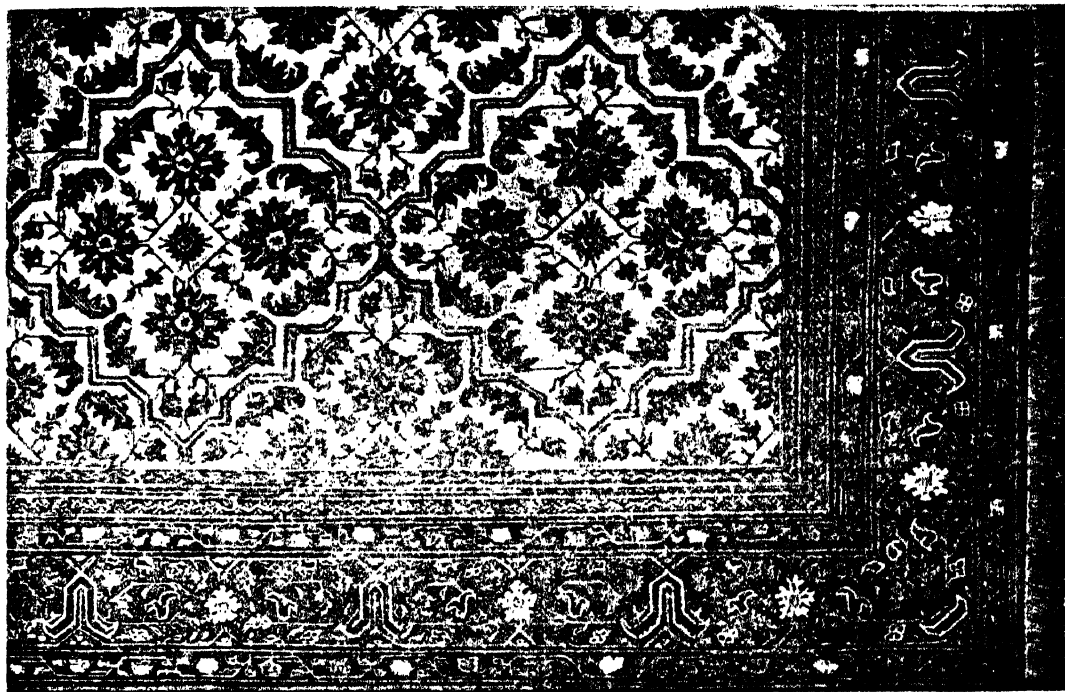
From] করমণ্ডলের গালিচা। [Birdwood.
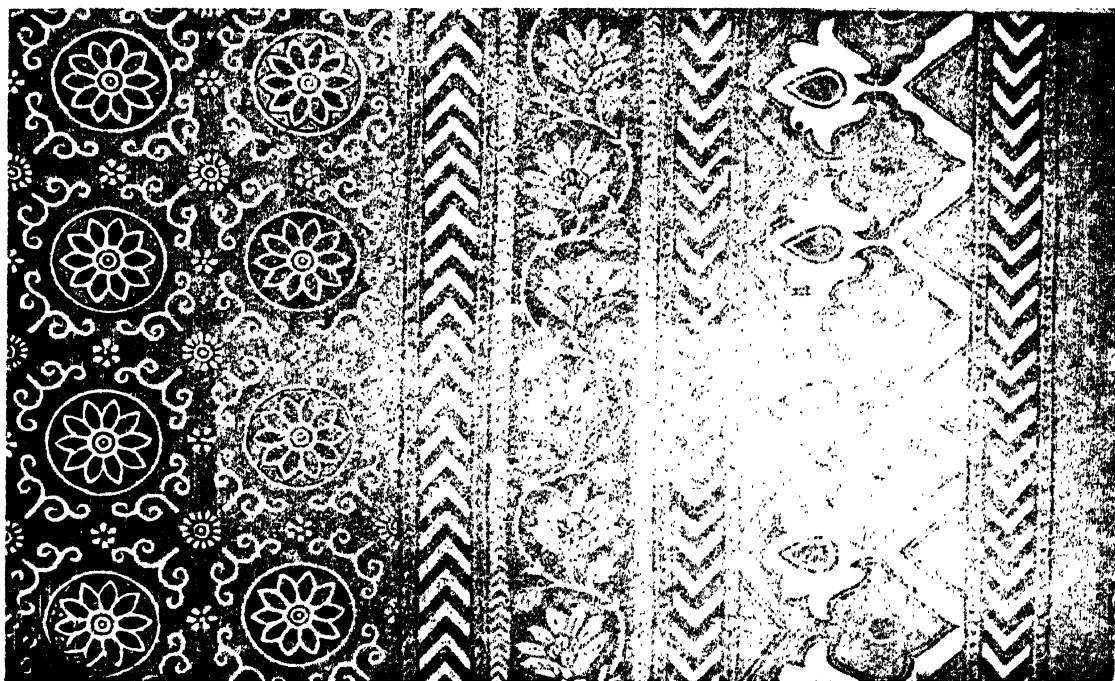
From] বরোদার হস্তমুদ্রিত তোষকের কাপড়। [Birdwood.
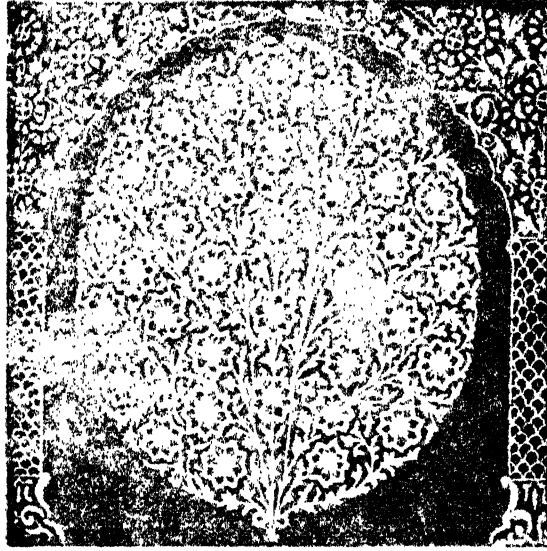
From] [*Birdwood.*

সোনার কফ্‌ত্‌গিরি করা পঞ্জাবী মসলার বাক্স।
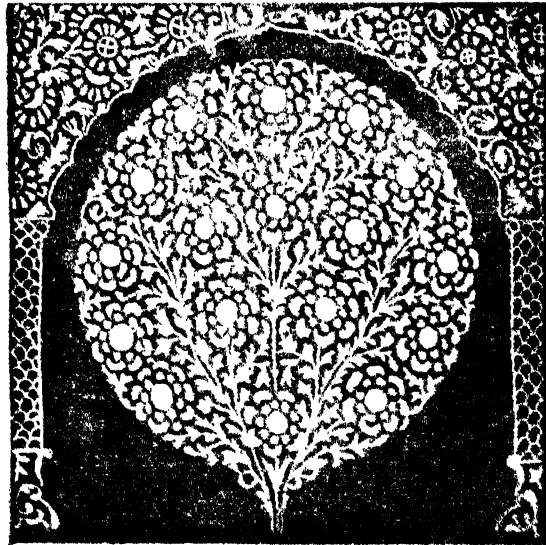
From] [*Birdwood.*

সোনার কফ্‌ত্‌গারি করা পঞ্জাবী মসলার বাক্স।

সমুদয় শিল্পকেন্দ্রে পরিলক্ষিত হয়। মোটা ও মিহি কাপাস এবং রেশমী বস্ত্র, সতরঞ্জি, গালিচা প্রভৃতি বয়ন, কাপড়ের উপর নানাপ্রকার ফুলতোলা ও অন্যান্য ছুঁচের কাজ, কিংখাব, প্রভৃতি, মোগল বাদশাহদিগের উৎসাহ পাইত। আকবর বাদশাহ একজন প্রধান শিল্পোৎসাহী সম্রাট ছিলেন। তাঁহার রাজকীয় কারখানায় বহুসংখ্যক শিল্পী কাজ করিত। সম্রাট প্রতি সপ্তাহে একবার প্রত্যেক শিল্পীর কাজ দেখিতেন। যাহার কাজ ভাল হইত, সে পুরস্কার পাইত ও তাহার বেতন বাড়াইয়া দেওয়া হইত। বিখ্যাত ফরাশি পর্যাটক বের্ণিয়ে যখন ভারত ভ্রমণ করেন, তৎকালে বঙ্গদেশে বস্ত্র শিল্পের অবস্থা খুব উন্নত ছিল। তিনি লিখিয়াছেন, তৎকালে বাঙ্গালা দেশ হইতে মোটা ও মিহি কাপাস এবং রেশমী কাপড় যে কি পরিমাণে এশিয়া ও ইউরোপের নানাদেশে রপ্তানী হইত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

ভারতবর্ষে শিল্পের অবনতি হইল কেমন করিয়া? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। সামান্য অধ্যয়ন ও চিন্তার ফলে এবিষয়ে আমাদের যে ধারণা জন্মিয়াছে, এস্থলে আমরা তাহাই সংক্ষেপে লিখিতেছি।

রাজার পরিবর্ত্তন শিল্পের অবনতির একটি প্রধান কারণ। মুসলমান রাজা ও তাঁহাদের অনুচরগণ ভারতবর্ষে বাস করিতে আসিয়াছিলেন। সুতরাং অনেকে প্রকৃত শিল্পানুরাগবশতঃ এবং অনেকে অন্ততঃ আপনাদের বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য এতদ্দেশীয় প্রাচীন ও মুসলমান প্রভাবজাত শিল্পের উৎসাহদাতা ছিলেন। ইংরাজ শাসনকালে তাহা ঘটে নাই। সত্য বটে, ইংরাজেরা ভারতের প্রাচীন মন্দিরাদি মেরামত করাইতেছেন, অজণ্টা গুহাচিত্রাবলীর মত প্রাচীন শিল্পের শেষ চিহ্নগুলি তাঁহাদের দ্বারাই সংরক্ষিত হইতেছে, তাঁহারাই মোগলস্থাপত্য ও তৎসম্পৃক্ত শিল্পবিষয়ে সুন্দর সচিত্র পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই বিলাতে ভারতীয় শিল্পসংরক্ষিণী সমিতি গঠিত করিয়াছেন, তাঁহারাই ভারতবর্ষে কয়েকটি শিল্পবিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহারাই নানাস্থানে কৌতুকাগার স্থাপন করিয়া তাহাতে নানাবিধ অতি প্রাচীন ও আধুনিক শিল্পদ্রব্য রাখিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা প্রায় দুই শতাব্দী ভারতশাসনের পর যে বিদেশী সেই বিদেশীই আছেন। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য রুচির পার্থক্যবশতঃ তাঁহারা অনেক সময় আমাদের শিল্প পছন্দও করেন না। সকল দেশেই রাজারা যে সকল হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করেন, সংখ্যা, আয়তন ও সৌন্দর্য্যের হিসাবে, তাহাদের সহিত অপরের নির্ম্মিত হর্ম্ম্যাদির তুলনাই হয় না। রাজনির্ম্মিত হর্ম্ম্যাদি অপরের অনুকরণীয় হয়। আমাদের দেশেও তাহাই ঘটিতেছে। ইংরাজের পূর্ত্তবিভাগকর্ত্তৃক নির্ম্মিত সরকারী বাড়ীগুলি একই ছাঁচের; কিন্তু ছাঁচটি সাধারণতঃ বিদেশী। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তব তাজের প্রভাবে কোন কোন সরকারী অট্টালিকায় হিন্দসারাসানীয় স্থাপত্য রীতি কিয়ৎপরিমাণে অনুসৃত হইয়াছে। অন্যত্র সরকারী হর্ম্ম্যগুলি বিদেশী রীতি অনুসারে নির্ম্মিত। তাহার দেখাদেখি আমাদের রাজারাজড়া ও ধনী লোকেরাও বিদেশী ধরণের গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন। কারণ, পরাধীনতায় মনটাও দাসত্ব করে, রুচিও দাসত্ব করে। আমরা আরাম পাই আর নাই পাই, ভারতের আব হাওয়ার উপযোগী হউক বা না হউক, আমাদের ঘরটা বিলাতী ছাঁচের, আসবাব বিলাতী ছাঁচের, পোষাক বিলাতী ছাঁচের হওয়া চাই। আমাদের রুচি এরূপ বিকৃত হইয়াছে, যে, অনেক সময় বিচার না করিয়াই দেশীয় জিনিষকে আমরা অবজ্ঞার চক্ষে দেখি এবং "বিলাতী" অর্থে উৎকৃষ্ট বুঝি। বলা বাহুল্য, আমরা উৎকৃষ্ট বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারের বিরোধী নহি। কিন্তু ইহাও বলি, যদি দেশী ও বিদেশী জিনিষ উৎকর্ষে উনিশ কুড়ি হয়, তাহা হইলে বিদেশী কুড়ি অপেক্ষা দেশী উনিশকেই আমাদের পছন্দ করা উচিত। বাগান ও বাড়ী সাজাইবার জন্য ভাল মন্দ প্রস্তর ও প্যারিস-প্লাষ্টারের মূর্ত্তি আমাদের দেশের অনেক লোকে রাখেন; কিন্তু তাঁহাদের কয়জন এরূপ মূর্ত্তি গড়িয়া দিবার বরাত দিয়াছেন, তাহা জানিতে কৌতূহল হয়। আমাদের বস্ত্র ও অলঙ্কার সম্বন্ধীয় রুচিবিকারের জন্য এখন ইংরাজও আমাদের নিন্দা করিতেছেন। বার্ডউড্ সাহেব বলেন —

"Indian native gentlemen and ladies should make it a point of culture never to wear any clothing or ornament but of native manufacture and strictly native designs, constantly purified by comparison with the best examples, and the models furnished by the sculptures of Amravati, Sanchi, and Bharhut." *Indian Arts*, p. 244.

অজণ্টা গুহাচিত্রাবলী হইতে এবং আমাদের বর্ত্তমান

সংখ্যায় মুদ্রিত স্বর্ণকৌটার চিত্র হইতে এ বিষয়ে অনেক সঙ্কেত পাওয়া যায়।

গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে ভারতীয় রীতির অবহেলায় শিল্পের অন্যান্য শাখারও অনিষ্ট হইয়াছে। শিল্পরসজ্ঞেরা বলেন, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, তক্ষকের কাজ, প্রতিবপন (inlaying), কাচের উপর চিত্রাঙ্কন, এ সকল স্থাপত্যের আত্মীয় জ্ঞাতি-কুটুম্ব। স্থাপত্যের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ সকলের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য ভারতীয় স্থাপত্য অবহেলিত হওয়ায় এই সকল শিল্পেরও অবনতি হইতেছে।

আমরা অনেক শতাব্দী ধরিয়া দৈহিক শ্রমসাপেক্ষ ব্যবসায় মাত্রকেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখায় যে শিল্পের উন্নতির পথ রুদ্ধ এবং অবনতির পথ উন্মুক্ত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের রাজধানী ও দরবার শিল্পোৎসাহের কেন্দ্রস্থল ছিল। তাঁহাদের অমাত্যগণ ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণও এইরূপ উৎসাহ দিতেন। আবার সাধারণ ধনী ব্যক্তিরাও শিল্পানুরাগী ছিলেন। এখন সে রাজারাও নাই, অমাত্যেরাও নাই, ধনও নাই। যে ধন আছে, আমরা তাহা দিয়া বিলাতী চক্‌চকে অপকৃষ্ট জিনিষ কিনিয়া আপনাদিগকে খুব সমজদার মনে করিতেছি। এখনও বিলাতের নানা কৌতুকাগারে নানাকারুকার্য্য খচিত সোনার রূপার পাত্র, কর্ণফুলিগিরি ও বিদ্রি এবং মীনাকরা কত ভারতীয় থালা, বাটী, কুজো, কৌটা, বাক্‌স, দানী এবং আরও নানাবিধ পাত্র রহিয়াছে। আমরা এখন সোনার দরে বিলাতী কাচের ও মাটীর বাসন কিনিতেছি ও ভাঙ্গিতেছি। সুন্দর সুন্দর দেশী গালিচা, ছিট, লেপ, তোষক ও পর্দার কাপড় পরিত্যাগ করিয়া আমরা অজস্র বিলাতী জিনিস কিনিতেছি।

রুচি ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে যে শিল্পের অবনতি হয়, তাহারও একটা ছোট ছোট দৃষ্টান্ত দিলে বোধ হয় মন্দ হইবে না। লক্ষ্ণৌয়ের চিকনের কাজ পূর্ব্বে রেশমের উপর ও হইত, এখন কেবল সূতি হয়। ফতেপুর জেলার কিষণপুর গ্রামে রেশমী ছিট ছাপা হইত, এখন আর হয় না। আমরা নগ্নশির বাঙ্গালী ত সচরাচর কোন প্রকার টুপি বা পাগড়ী ব্যবহার করি না। হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী প্রভৃতিদের মধ্যে মাথা খোলা রাখা অসভ্যতা। কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বে যে পরিমাণে পাগড়ী ব্যবহার করিতেন, এখন পাশ্চাত্য সভ্যতার কল্যাণে তাহা আর করেন না। সুতরাং পাগড়ী বাঁধিবার অনেক প্রকার কাপড় আর প্রস্তুত হইতেছে না। রেশমী শালের ব্যবহার প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে জুতার ও চটিজুতার রেশমী উপর-সাজ খুব প্রচলিত ছিল। এখন ফরমাইস না দিলে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ মসনদে বসিতেন, তাহার জন্য বিশেষ এক প্রকারের রেশমী কাপড় প্রস্তুত হইত। এখন ড্রইং-রূমে গদি-আঁটা চেয়ার এবং বেণ্টউড্‌ চেয়ারের উপদ্রবে সে মসনদ্‌ও প্রায় দেখা যায় না, তাহার উপযোগী কাপড়ও পাওয়া ভার। পূর্ব্বে হাতীর হাওদায় বিছাইবার ও হাতীকে সাজাইবার জন্য কত প্রকার কাপড় ও অলঙ্কার প্রস্তুত হইত। ঘোড়ার জিনেরই বা কত বাহার ছিল। সেকালকার হস্ত্যশ্বপরিশোভিত বিচিত্রবর্ণালঙ্কৃত রাজধানীর রাজপথগুলির কথা ভাবিলেও সুখ হয়।

আমাদের শিল্পের অবনতির আর এক কারণ ইউরোপীয় কলকারখানার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ইংরাজের আইন। প্রথমে ইংরাজের আইনের কথা বলি। বার্ড্‌উড্‌ সাহেব বলেন—

"In 1677 "Manchester cottons," made up in imitation of Indian cottons, were still made of wool. But in vain did Manchester attempt to compete on fair free-trade principles with the printed calicoes of India, and gradually Indian chintzes became so generally worn in England, to the detriment of the woolen and flaxen manufactures of the country, as to excite popular feeling against them, and the Government, yielding to the clamour, passed the law, in 1721, which disgraced the statute book for a generation, prohibiting the wear of all printed calicoes whatever."—*Indian Arts, p.* 242.

এইরূপ আরও আইন করিয়া এবং ভারতীয় বস্ত্রের উপর শতকরা ৬০।১০ টাকা কর বসাইয়া ইংলণ্ড ভারতীয় বস্ত্রের সর্ব্বনাশ করেন। এই সেদিন বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদিগকে জব্দ করিবার জন্য সূত ও বস্ত্রের উপর ট্যাক্স বসান হইয়াছে। তাহার উপর বিলাতী, মার্কিন ও ইউরোপীয় সস্তা কলের কাপড়ের প্রতিযোগিতা আছে। কাপড় সম্বন্ধে যেরূপ, অন্যান্য দ্রব্য সম্বন্ধেও তদ্রূপ কলের জিনিষের প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

তাহার পর আর এক কথা। এক্ষণে আমাদের দেশের

পরস্পর ব্যবহারে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহাতেও কুফল ফলিয়াছে। লকবুড্ কিপলিং সাহেব ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দের পঞ্জাব প্রদর্শনীর রিপোর্টে লিখিয়াছেন, "গৃহ-নির্ম্মাণের সময় কারিগরদিগকে বেতন দেওয়া হয়; কিন্তু যখন তাহারা কোন সূক্ষ্ম কঠিন কাজ করে, তখন তাহা-দিগকে মুক্তহস্তে মিষ্টান্ন, তামাক, সরবৎ প্রভৃতি দেওয়া হয়। কোন কোন জেলায় ছুতার একটি খোদিত জানালা বা দ্বারের চৌকাঠ প্রস্তুত করিলে তাহা সকলকে দেখাইবার জন্য এক দিনের ছুটি লয়। তাহার পর একটি চাদর বিছাইয়া ঐ চৌকাঠ যে গৃহকে শোভিত করিবে, তাহার সম্মুখে উহা স্থাপন করে; এবং তথায় উপবেশনপূর্ব্বক নগরবাসীদিগের প্রশংসা, অভিনন্দন ও পুরস্কার লাভ করে। বেশ ভাল খোদাইয়ের জন্য কখন কখন এক এক জন কারিগর এইরূপে এক দিনে একশ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার পাইয়াছে।" এইরূপ রীতি বাঙ্গালা দেশে কোন কালে ছিল কি না, জানি না। এখন ত নাই। পঞ্জাবেও বোধ হয় ক্রমে অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ রীতি থাকিলে যে শিল্পী উৎসাহিত হন, এবং ইহা লোপ পাইলে যে শিল্পের অবনতি হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল হ্যাভেল সাহেব গত জানুয়ারী মাসের কলিকাতা রিভিউ পত্রে ভারতবর্ষে শিল্প-শিক্ষা শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার এক স্থানে আছে, "আগেকার ভারতীয় শিল্পীদের কাজ ইউরোপে চালান হইয়া গিয়া অপর ভারতীয় শিল্পীদের দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া পড়িত না। যদি কেহ একটি বেশ সূক্ষ্ম খোদাইয়ের কাজ করিত, তাহা হইলে কেবল যে তাহার শিল্পি-ভ্রাতারাই উহার আলোচনা করিত, তাহা নয়, উহা বাজারের একটা কথা-বার্ত্তার বিষয় হইত, সহরের একটা দ্রষ্টব্য জিনিষ হইত, এবং ভবিষ্যদ্বংশাবলীর প্রশংসা ও অনুকরণের বিষয় হইয়া থাকিত।" বাস্তবিক এই কথাগুলি বড়ই সত্য। ভাল কাজ-গুলি যদি সমস্তই বিদেশে চলিয়া যায়, তাহা হইলে কি আদর্শ দেখিয়া আমাদের শিল্পীরা কারিগরী শিখিবে? আমরা এই প্রবন্ধে যে নয় খানি শিল্পজাত দ্রব্যের চিত্র দিলাম, তাহার মধ্যে তিন খানি জর্ম্মানির বর্লিননগর হইতে প্রকা-জিনিষগুলিও বার্লিনেই আছে। বাকী ছয় খানি ছবির মূল জিনিষগুলি বিলাতে সৌথ কেনসিংটন কৌতুকাগারে আছে। অজণ্টাগুহাচিত্রাবলীর নকলগুলিও বিলাতের ক্রিষ্টাল প্যালেস প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। তাহার পর সেগুলি প্রায় সমস্তই ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের কোন নকল বা ফোটোগ্রাফ নাই। এই চিত্রসমূহ যাহার নকল, গুহার সেই মূল ছবিগুলিও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার পর আবার যে ছবিগুলির নকল প্রস্তুত হইয়াছে, সেগুলিও বিলাতে চালান হইয়াছে। আমরা শিখিবই বা কি দেখিয়া, এ বিষয়ে আমাদের জাতীয় আত্মশ্রদ্ধাই বা কি দেখিয়া সজীব থাকিবে? বিদেশী লোকেরা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের অনেক ভাল জিনিষই স্বদেশে লইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে।

নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এখন আবার আমাদের শিল্পশিক্ষার দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। বহু শতাব্দী ধরিয়া উচ্চশ্রেণীর লোকেরা শিল্প হইতে দূরে থাকায় ভারতীয় শিল্পের উন্নতি না হইয়া বরং অবনতি হইয়াছে। এখন উচ্চশ্রেণীর লোকেরাও স্বদেশে এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশে শিল্প শিক্ষা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই কেহ কেহ যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বসাধারণে বিখ্যাত চিত্রকর রবিবর্ম্মাকেই বেশী জানেন। রবিবর্ম্মা ক্ষত্রিয়। মারাঠা ভাস্কর ম্হাত্রেও ক্ষত্রিয়। ইনি প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে দেবমন্দির-পথ-বর্ত্তিনী মারাঠা যুবতীর মূর্ত্তি গড়িয়া যশস্বী হন। আমার সম্পাদনকালে "প্রদীপে" সেই মূর্ত্তির ছবি প্রকাশিত হইয়া-ছিল। এখন ম্হাত্রের বয়স প্রায় ২৭ বৎসর। তিনি গত বৎসরের পারিস প্রদর্শনীতে একটি সরস্বতীমূর্ত্তি পাঠাইয়া-ছিলেন। তথায় উহা সসম্মান উল্লেখের প্রশংসাপত্র এবং রৌপ্য পদক দ্বারা পুরস্কৃত হইয়াছে। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষেরা উহা তথায় বিক্রয় না করিয়া ম্হাত্রে মহাশয়কে ফেরত দেন। কিন্তু ভাল করিয়া প্যাক না করায় মূর্ত্তি খানি সম্পূর্ণ ভগ্না-বস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে। ম্হাত্রে আমাকে লিখিয়াছেন, যে, ইহাতে তাঁহার সহস্রাধিক মুদ্রা লোকসান হইয়াছে। এই মূর্ত্তির একখানি ছবি দেওয়া গেল। ম্হাত্রে লিখিয়াছেন, ইহা ইতিপূর্ব্বে

মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উঁহার ফোটোগ্রাফ আমাকে পাঠাইয়া না দিলে আমি উঁহার অস্তিত্বের বিষয়ও অবগত হইতে পারিতাম না। আমি এই জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। বোম্বাইয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মূর্ত্তিতে কোন ধূর্ত্ত কাল

Photo by] [*D. K. Mhatre*

শ্রীযুক্ত গণপত কাশীনাথ ক্ষাত্রে।

রং মাখাইয়া দেয়। দেশী বিদেশী অনেক রাসায়নিক দাগ উঠাইবার চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রযত্ন হন। সর্ব্বশেষে অধ্যাপক গজ্জর দাগ তুলিয়া দেন। বোম্বাইয়ে নিজ রাসায়নিক গবেষণাগারে এই স্বনামখ্যাত অধ্যাপক গজ্জর ক্ষাত্রেকে একটি বিস্তৃত কক্ষ দিয়াছেন, এবং তাঁহার জন্য ফরমাইস্ সংগ্রহ করিতেছেন। ক্ষাত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে ইউরোপে পাঠাইবারও চেষ্টা হইতেছে। ক্ষাত্রে-নির্ম্মিত এই সুঠাম মনোজ্ঞ মূর্ত্তির সমালোচনা করি বা তাহার সৌন্দর্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝাইয়া দি, এরূপ ক্ষমতা আমার নাই। সৌন্দর্য্যসৃষ্টি যে কত কঠিন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। খুঁত ধরা সহজ, কিন্তু রচনা করা কঠিন। আমরা চিরপরিচিত সুন্দর মুখও কল্পনার তুলি দিয়া মানস-পটে পরিষ্কার করিয়া আঁকিতে পারি না। যে রূপ আত্মীয়

বা আত্মীয়া নিকটে নাই, তাঁহার মুখচ্ছবিও স্পষ্ট মনে পড়ে না। সুতরাং একটি সুন্দরী মানসী মূর্ত্তি আপাদমস্তক মনোমধ্যে গঠিত করিয়া তাহাকে নিখুঁত বাহ্য জড়রূপ দেওয়া যে কত কঠিন, তাহা অনুমান করা দুষ্কর নহে।

ক্ষাত্রের সরস্বতীমূর্ত্তিতে ময়ূরের সমাবেশ দৃষ্ট হইবে। রবি-বর্ম্মার সরস্বতীচিত্রেও ময়ূর আছে। দক্ষিণ-ভারতে লোকে ময়ূরকেই সরস্বতীর বাহন মনে করে।

আমাদের মূল বক্তব্য বিষয় হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা বলিতেছিলাম যে উচ্চশ্রেণীর লোকদের শিল্পশিক্ষায় মনোনিবেশ একটা সুলক্ষণ। কারণ, তাহা হইলে শিল্পে আবার ভারতীয় প্রতিভা স্ফূর্ত্তি পাইবে। ইহার মধ্যে আরও একটি আশার বীজ নিহিত আছে। সকলেই জানেন, আমরা কংগ্রেসে এক জাতি বলিয়া বক্তৃতা করিলেও, আমাদের প্রাদেশিক ঈর্ষা বিদ্বেষ অবজ্ঞা যথেষ্ট আছে। প্রাদেশিকই বা বলি কেন? বাঙ্গালী ত বেহারীকে ছাতুখোর বলেনই, কলিকাতাবাসীর চক্ষে আর সকল বাঙ্গালীই বাঙ্গাল ;—এবং কেনা জানে যে, "বাঙ্গাল মনুষ্য নয়?" যত দিন আমরা পরস্পরকে না জানিব, না চিনিব, এবং জানিয়া চিনিয়া শ্রদ্ধা করিতে না শিখিব, তত দিন জাতীয়তা কেবল কথার কথা মাত্র। জানিবার চিনিবার শ্রেষ্ঠ উপায় ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলা মিশা। কিন্তু ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীদের কয়জনের এরূপ মিশিবার সুযোগ আছে? সুতরাং সাহিত্যের আশ্রয় লইতে হয়। যে বাঙ্গালী তুলসীকৃত রামায়ণ পড়িবে, বুঝিবে, সে আর হিন্দুস্থানীকে অবজ্ঞা করিতে পারিবে না। যে হিন্দুস্থানী বা মারাঠা আমাদের মধুসূদন, বঙ্কিম প্রভৃতির রচনার রসাস্বাদন করিবে, সে আর আমাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারিবে না। যে চিন্তামণি বা কুরাল পড়িবে, সে আর মান্দ্রাজীকে জাম্ববান মনে করিতে পারিবে না। কিন্তু এতগুলি ভাষা শিখিয়া সাহিত্যচর্চ্চা করিবার অবকাশ, ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি কয়জনের আছে? কেহ বলিতে পারেন, কেন, ভারতের সর্ব্বত্রই শিক্ষিত লোকে ইংরাজী লিখিতেছেন, তাঁহাদের ইংরাজী লেখা পড়িয়া তাঁহাদিগকে চিনিয়া ফেল। সত্য, কিন্তু এই সকল ইংরাজী লেখায় ভারতের কোন প্রদেশের জনসাধারণের

শিল্পসৌন্দর্য্যকে জাতীয় একতা পরিবদ্ধনের আমরা একটি শ্রেষ্ঠ সাধন মনে করি। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বুঝাইতে অল্প লোকেই পারেন, কিন্তু নিরক্ষর লোকেও সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে। এই জন্য, যে দিন বঙ্কিমচন্দ্রকে একজন মারাঠা "আমাদের বঙ্কিম" বলিবে, সে দিন কখনও না আসিতে পারে, আসিলেও হয় ত তাহা সুদূর ভবিষ্যদগর্ভে নিহিত; কিন্তু ইতিমধ্যেই সৌন্দর্য্যরসিক বাঙ্গালী রবিবর্ম্মাকে আপনার লোক বলিয়া মনে করিতেছেন। সেই সঙ্গে দাক্ষিণাত্যবাসী আমাদের চক্ষে গৌরবান্বিত হইয়া আসিতেছেন। এই আত্মীয়তার অনুভূতি আমাদের বিবেচনায় কংগ্রেস-মণ্ডপে পঞ্জাবী-হিন্দুস্থানী বাঙ্গালী-মান্দ্রাজী মারাঠা-কণ্ঠ হইতে যুগপৎ উচ্চারিত ভবরে-নিনাদ অপেক্ষা কম মূল্যবান নহে।

আমাদের ধনবৃদ্ধি।

হাট ডেভিস সাহেব যখন আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট, আমি তখন ডিপুটী। সেই সময় তাঁহার সহিত পরিচয়। এখন আমি ঘরে বসিয়া কিছু পেন্সন পাই। হাট ডেভিস সাহেব বোর্ড অব রেভেনিউর মেম্বর হইয়া আসিয়াছেন।

সে দিন একটী অপরাহ্ন-সমিতিতে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সাহেব আমাকে দেখিয়া, পুরাতন বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন, এবং আমাকে নিকটে বসাইয়া অনেক গল্প সল্প করিতে লাগিলেন। কথায় কথায় দেশের দারিদ্র্য-বৃদ্ধির কথা উঠিল। সাহেব বলিলেন, "গবর্ণমেণ্টের কর-শোষণে দেশ দরিদ্র হইয়া গেল, এ কথা সর্ব্বদাই তোমাদের মুখে লাগিয়া আছে। গবর্ণমেণ্টের ত কিছুতেই রক্ষা নাই, আর দোষ থাকিলে যে গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিবে, সে কথা আমি বলি না। কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি। সতের আঠার বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি এই কলিকাতায় অণ্ডর-সেক্রেটারি ছিলাম, তখন আমি পীতাম্বর দত্তকে জানিতাম। শুনিতাম সে ধনী, কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইতাম না। পীতাম্বর মরিয়া গিয়াছে, তাহার তিন পুত্র বাড়ী বাড়াইয়াছে, তিন জনেই খুব ধনীর মত থাকে। যেখানে মাঠ ছিল, সেখানে বড় বড় অট্টালিকা পরিয়া আসে। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে, দেশের লোক দিন দিন ধনী না নিধন হইতেছে?"

কথাটা আর চলিল না, কারণ এই সময় বঙ্গের প্রধান শাসনকর্ত্তা আগমন করিলেন। হাট ডেভিস সাহেব উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিলেন, আমিও ভিড়ের ভিতর মিশাইয়া গেলাম।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া কথাটা ভাবিয়া দেখিলাম। হাট ডেভিস সাহেব এ দেশের লোকের মিত্র, নেটিভকে নিতান্ত ঘৃণা বা অবজ্ঞা করেন না। তিনি যাহা বলিলেন, সাধারণতঃ লোকের চক্ষে সেইরূপ ঠেকিবারই কথা। অনেক তলাইয়া না বুঝিলে দেশে ধন বাড়িয়াছে বই কমিয়াছে মনে হয় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ধনীরা বড় জোর উৎকৃষ্ট ধুতি চাদর পরিত। এখন সিমলা ফরাসডাঙ্গার ধুতিতে আর মন উঠে না, রেশমের বস্ত্র নহিলে হয় না। নানাবিধ বর্ণের রেশমের পঞ্জাবী পিরান, রেশমের ধুতি, রেশমের চাদর, উঠিয়াছে। তাহার উপর পাড় ও ছিলার বাহার আছে। বোম্বের সাড়ী পর্য্যন্ত পুরুষ মানুষকে পরিতে দেখা যায়। সাচ্চা জরির আঁচলাদার চাদর, কিনখাবের হাতকাটা জামা ও বেনারসী সাটিনের ধুতি দেখিয়া কাহাকেও বাইজী বলিয়া ভ্রম হয়। কেহ প্রত্যহ জুতা বদলায়, কেহ প্রতি দিন নূতন নূতন আংটী পরে, কেহ নৃত্যশীল ময়ূরের মত সাজিয়া বাহির হয়। ধনীর সভায় পম্প শু ছাড়িয়া অন্য জুতা মানায় না, কত রকম সুগন্ধ সামগ্রী ব্যবহার হয়, তাহার সংখ্যা করা যায় না। ধনীর সভা দেখিলেই যেন ঐশ্বর্য্যের হাট মনে পড়ে। এ সকল ধনবৃদ্ধির লক্ষণ ছাড়া আর কি বলিব?

কিন্তু কেবল এইটুক দেখিয়া আমরা কেমন করিয়া ক্ষান্ত হইব? হার্ট ডেভিস সাহেব পীতাম্বর দত্তের নাম করিতেছিলেন, তাহার কথা একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। সে ব্যক্তি নিজে টাকা রোজগার করিত। টাকা বাড়িতে লাগিল কিন্তু চাল বাড়িল না। যখন লক্ষপতি হইল, তখনও একখানি কোম্পাস গাড়ী, একটি ঘোড়া। বেশভূষার কোন কালেই ধুমধাম ছিল না। এক দিকে উপার্জ্জন, অপর দিকে টাকা সুদে আপনি বাড়িতে লাগিল। টাকা বাড়াইতে বাড়াইতে পীতাম্বর মরিয়া গেল।

সমান অংশে পাইল। অতএব পীতাম্বরের অপেক্ষা তাহার পুত্রদিগকে ধনী বলা যায় না। এদিকে পীতাম্বর যে রোজগার করিত, ছেলেরা তাহা করে না। পীতাম্বরের কালে বাড়ীতে যথেষ্ট স্থান ছিল, এখন স্থান কুলায় না। বাড়ী বাড়াইতে হইল। তাহার পর ভাইয়ে ভাইয়ে মনান্তর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সকলের আলাদা বাড়ী করিবার কথা হইতেছে। পীতাম্বরের একটি ঘোড়ায় চলিত, এখন এক এক ছেলের দুইটি তিনটি করিয়া জুড়ি। গাড়ীও প্রত্যেকের দুই তিন খানি করিয়া আছে। পীতাম্বর থান পরিয়া বেড়াইত, তাহার পুত্রেরা উৎকৃষ্ট দেশী ধুতী ও রেশমের কাপড় ছাড়া পরে না। পীতাম্বরের কালে আসল টাকা বাড়িত, সুদও বাড়িত; এখন আর সুদে চলে না, আসলে টান পড়িয়াছে। তথাপি লোকের চক্ষে পুত্রেরা পিতার অপেক্ষা ধনী, কেন না পীতাম্বরের টাকা কোম্পানির কাগজে ও ব্যাঙ্কে থাকিত, ছেলেদের টাকা গাড়ীতে ঘোড়াতে, কাপড়ে চোপড়ে, নানা দিকে বাহির হইয়া পড়িতেছে। কেহ বলে, ইহাদের এত বিষয়, যে কখন নষ্ট হইবে না; আবার কেহ বলে ইহারা কাপ্তেন হইয়াছে, বেশী দিন টাকা থাকিবে না।

অক্ষয় সম্পত্তি সঞ্চিত হইতে পারে না, কারণ সঞ্চয় বন্ধ হইয়া ব্যয় হইতে আরম্ভ হইলেই সম্পত্তি ফুরাইবে, তা সে যত বড় সম্পত্তি হউক। সমুদ্র শোষণ করা যায় না এই জন্য যে পৃথিবীর যাবতীয় নদ নদী তাহাতে দিবারাত্র জল ঢালিতেছে; কিন্তু নদী সব যদি শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে সাগর শুকাইতে কতক্ষণ? ধন থাকিলে ধনী, ব্যয় করিলে আর ধনী থাকে না। টাকাটা হাত বদলাইবার সময় কখন কখন ঝন্ ঝন্ করিয়া খুব শব্দ করিয়া যায়—সেইটা ধনের প্রদর্শনী। উপার্জ্জন বা আয় ও সঞ্চয় সর্ব্বদা বাড়িতে থাকিলে ধনী বলা যাইতে পারে, নচেৎ নয়। ভূসম্পত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সম্পত্তি। এই সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইলে ইংলণ্ডের মত জ্যেষ্ঠানুক্রম নিয়ম (Law of primogeniture) অত্যাবশ্যক। ভারতবর্ষে স্বাধীন রাজোয়াড়ায় ও উপাধিধারী বড় বড় জমিদারীতে এ নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে। না থাকিলে রাজাও থাকে না, জমিদারীও থাকে দুর্লভ যে, পোষ্যপুত্র লইয়া অনেক সময় বংশ ও বিষয় রক্ষা করিতে হয়। ইংলণ্ডে এ পদ্ধতি একেবারে নাই। যদি কোন উপাধিধারী ধনী নিঃসন্তান ও আত্মীয়কুটুম্বশূন্য থাকে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু হইলেই উপাধি লুপ্ত হয়। আমাদের দেশের সকল জমিদারীতেও এ নিয়ম নাই। পুত্র, ভাগিনেয়, দৌহিত্র প্রভৃতিতে জমিদারী ভাগ হইয়া যায়। এই জন্য ছোট তরফ, বড় তরফ, দু আনি, চার-আনি, দশ-আনি প্রভৃতি অংশাদারের উল্লেখ। ক্রমে আনা হইতে পাই, তাহার পর কড়া ক্রান্তি, অবশেষে শূন্য। এইরূপ গঠন ও ভঙ্গই অধিক, সংরক্ষণ বিরল। এ কথা স্বীকার করি যে জমিদার যায় কিন্তু জমিদারী থাকে, ভূমির মূল্য বা আয় যায় না। তবে আমাদের দেশে জমিদারসম্প্রদায় স্থায়ী নয়, কোন ঘর যাইতেছে, কেহ বা নূতন উঠিতেছে। আর, তাহাতে দেশের লাভ লোকসান কিছুই নাই। সে কথা বিচার্য্য না হইলেও, কেবল জমিদারদিগের ভিতর ধন বৃদ্ধি হইতেছে, এ কথাও স্বীকার করা যায় না। অর্থাৎ ধনবৃদ্ধির যে চাক্ষুষ প্রমাণ গ্রাহ্য মনে হয়, জমিদারদিগের ভিতর তাহাও পাওয়া যায় না।

ধন বাড়ে কিসে? এক দিকে ধন উপার্জ্জিত হইবে, আর এক দিকে সঞ্চিত হইতে থাকিবে, তবেই বাড়িবে। আমাদের দেশে পিতার সম্পত্তিতে সকল পুত্রই সমান অধিকারী, সুতরাং পুরুষানুক্রমে ধনী থাকিবার উপায় নাই। তাহার পর অন্য দেশে পুরুষানুক্রমে যেমন ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকে, আমাদের দেশে তাহাও নাই। যাহার বাপের টাকা আছে, সেই বসিয়া খাইতে চায়। লোকেও তাহাই মানিয়া লয়। অমুকের বাপ অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছে সুতরাং উহাকে আর খাটিয়া খাইতে হইবে না, এই কথাই লোকের মনে ও মুখে আসে। উপার্জ্জনে কেবল অনিচ্ছা নয়, লজ্জা বোধ হয়। যে জাতি ধনী, তাহাদের যে প্রধান গুণ, আমাদের তাহাই নাই। বাণিজ্যই ধনের প্রধান উপায়, বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন, এ কথা সংস্কৃত ভাষায় আছে, কিন্তু আমাদের চক্ষে বাণিজ্য অপেক্ষা প্রায় আর সকল বৃত্তিই শ্রেষ্ঠ। গবর্নমেন্টের একটু পদস্থ কর্ম্মচারী আপনাকে লক্ষপতি ব্যবসাদারের অপেক্ষা বড় মনে করে। এই

অভিমানটাই উল্টা রকমের। চাকরীর চেয়ে যে ব্যবসা বড়, এ কথা না বুঝিলে ধনবৃদ্ধি হইবে কোথা হইতে? ইংরাজেরা এ কথা বুঝে, তাহাদের ধনও বাড়িতেছে। হাই-কোর্টের জজগিরি অপেক্ষা বড় বণিক হওয়া অনেক ভাল, এ কথা বুঝিতে পারিলে ত ধন বাড়িবে। বাঙ্গালীর সব আছে, কেবল এই বুদ্ধি নাই, সেই জন্য বাঙ্গালী পার্সি মাড়োয়ারীর সমকক্ষ হইতে পারিল না। আমাদের দেশে লোকে ত শুধু ধনী হইতে চায় না, সেই সঙ্গে সঙ্গে বুনিয়াদী বড় মানুষ হইতে চায়, বংশমর্য্যাদার জন্য অস্থির হইয়া উঠে। বিলাতে যেমন বিয়ার ও বেকন বেচিয়া অনেকে লর্ড হয়, এ দেশেও অনেকে টাকা পাইয়া রাজা রায় বাহাদুরীর জন্য দ্বারে দ্বারে লালায়িত হইয়া বেড়ায়। কিন্তু বিলাতে টাকাও থাকে, বংশও থাকে, এ দেশে না থাকে টাকা, না থাকে বংশ। টাকাও পুরুষানুক্রমে থাকে না, উপাধিও থাকে না। বিলাতে যেমন এই সকল নূতন লর্ডকে purse-proud upstarts বলে আমাদের দেশেও তেমনি নূতন রাজা রায় বাহাদুরকে আঙ্গুলটা ফুলিয়া কলাগাছ বলে। কিন্তু আমাদের যেমন গোড়ায় গলদ বিলাতে তাহা নাই। এই পীতাম্বর দত্ত চামড়ার কারবার করিয়া টাকা করে। ছেলেরা সে কারবার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহাদের সাক্ষাতে সে কথা বলিলে তাহারা বিরক্ত হয়। টাকাটা চিরকাল তাহাদের বংশে আছে, তাহারা দশ বিশ পুরুষে বড় মানুষ, এ কথা বলিলে খুসী হয়। পীতাম্বরের বাপ ৫৲ টাকার সরকারী করিত বলিলে হয় ত সে লোকের আর মুখদর্শন করে না। পীতাম্বরের পূর্ব্বপুরুষেরা সুন্দরবনের স্বাধীন রাজা ছিল, এমন কথা কেহ বলিলে তাহাকে পেট পূরিয়া সন্দেশ খাওয়ায়। বিলাতে টমস্ হলওয়ে এক গুলি করিয়া বৃহৎ ধনী হইয়াগেল, তাহার পুত্রও তাহাই করিতেছে, বসিয়া পৈত্রিক সম্পত্তি খাইতে চায় না। অধিক কথায় কাজ কি, স্বয়ং রথচাইল্ডেরা পুরুষানুক্রমে টেবিলে বসিয়া কেরানীর মত খাটিয়া আসিতেছে, ময়ূরের মত পেখম ধরিয়া, ঘুরিয়া নাচিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে না।

আমাদের দেশে জল বরং বাঁধা যায় কিন্তু ধন বাঁধা যায় না। টাকাটা যেন ভোজবাজীর মত আসে যায়। নন্দন-সে মাস কয়েকের মধ্যেই মরিয়া গেল, বৎসর দুই পরে বাড়ীর ইট কাঠ বিক্রী হইয়া গেল, যেমন সমভূমি ছিল আবার তেমনি হইল। আলাদিনের অট্টালিকাকে ইহার পর আর উপকথা বলা যায় না। ধনবৃদ্ধি হয় কখন, না যখন পুরুষানুক্রমে অর্থ উপার্জ্জন বৃদ্ধি হয়। ইংরাজের এক একটা হৌস এমন কত পুরুষ চলিতেছে। আমাদের মনেরই সে গঠন নাই। পৈত্রিক সম্পত্তি হয় লোকে অপব্যয় করে না হয় তাহাকে প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে। যদি বাড়ে ত কেবল কৃপণতার গুণে, উপার্জ্জনের বলে নয়। তিন পুরুষে সমান ভাবে উপার্জ্জন করিতেছে এমন আমাদের দেশে ত কই দেখিতে পাওয়া যায় না। কলিকাতায় লোকে বিশ্বাসই করে না যে, কাহারও ঘরে ধন অধিক দিন থাকে। যদি কেহ গাড়ী ঘোড়ার অধিক ধূমধাম করে অমনি লোকে বলে উহার বাড়ী বাঁধা পড়িয়াছে। কথাটা মিথ্যাও নয়। যাহারা বড়মানুষী করে, তাহারা ব্যয়ের অনেক পথ আবিষ্কার করে বটে কিন্তু উপার্জ্জনের কোন উপায় করে না। কলসী হইতে জল ঢালিতে দেখিয়া যদি লোকে অনুমান করে, যে, কলসী শূন্য হইবে, তাহা হইলে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না।

কথাটা তাই আমি ভাবিয়া দেখিলাম। ধনবৃদ্ধির জন্য যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক আমাদের তাহা কিছুই নাই, সুতরাং সে সম্ভাবনাও নাই। তবে অর্থনাশের নানা উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। ইংরাজ ধনীরা যেমন থাকে আমাদের দেশের ধনীরা সেইরূপ থাকিতে শিখিতেছেন, অথচ এ জ্ঞান নাই যে ইংলণ্ডের কিম্বা আমেরিকার একটা বড় ধনী আমাদের সব ধনীগুলিকে ক্রয় করিয়া পকেটে পূরিলে কেহ টেরও পায় না। ইংলণ্ডে এক লক্ষ টাকায় একটা ঘোড়া বিক্রয় হয়; আমাদের দেশে কয়টা ধনীর ঘরে এক লক্ষ টাকা আছে? আপাত দৃষ্টিতে যাহা ধনবৃদ্ধি বোধ হয়, হার্টডেভিস সাহেবের চক্ষে যাহা পড়িয়াছিল, তাহা ধনক্ষয় মাত্র, বহুরূপীর ন্যায় নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চঞ্চলা লক্ষ্মী কত লোককে ছাড়িয়া যাইতেছেন।

জলাতঙ্ক।

সুরসিক মার্কিন লেখক লওয়েল (Lowell) বলিতেন—জগতে এমন কতকগুলি জ্ঞাতব্য ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, যাহাদের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা দূর করিলে জ্ঞানের বোঝাটা যে নিতান্ত ভারী হইয়া দাঁড়ায় তাহা নহে! জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা বিষয়টা যেরূপ গুরুতর, তাহাতে "জ্ঞানের বোঝা" ভারী হওয়ার আশঙ্কা থাকিলেও বোধ হয় এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা অসঙ্গত হইবে না।

জানি না, বিধাতা কেন জীবদেহকে এত দুরন্ত রোগের লীলাক্ষেত্র করিয়া গড়িলেন। যে সকল দুরপনেয় ব্যাধির কথা ভাবিতেও প্রাণ আতঙ্কে অধীর হয়—যাহারা মানবদেহকে একেবারে যন্ত্রণার জাঁতায় পিষিয়া ফেলে, যাহাদের তাড়নায় মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করিতে সাধ যায়—তাহাদেরই অন্যতম দৃষ্টান্তস্থল জলাতঙ্ক রোগ। এই উৎকট রোগের চিকিৎসার জন্য, কিছুকাল হইল, কসৌলিতে "পাষ্টর ইন্‌ষ্টিটিউট্" (Pasteur Institute) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাষ্টর-প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা-প্রণালী ও তাহার ফলাফল সম্বন্ধে অনেকেরই মনে নানাপ্রকার ভ্রমাত্মক বিশ্বাস জন্মিয়াছে; এই জন্যই, বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে চারিদিক হইতে এত প্রতিবাদের গোলাগুলি ছুটিয়াছিল।

সাধারণতঃ ক্ষেপা কুকুরের কামড়েই এই ভয়ঙ্কর রোগের বিষ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। এই রোগের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, জল দেখিলে—এমন কি কোন তরল পদার্থ গিলিবার কথা ভাবিলেও রোগীর দুর্বিষহ যাতনা উপস্থিত হয়। বলা বাহুল্য যে এই লক্ষণ হইতেই রোগের নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু অনেকেই শুনিলে বিস্মিত হইবেন যে, "ক্ষেপা কুকুরের" জলাতঙ্ক থাকে না—বরং সে আগ্রহের সহিত জলপান করিয়া থাকে। এই

রোগের নিদান

আজিও সম্যকরূপে জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ অন্যান্য সংক্রামক রোগের ন্যায় ইহাও কোন বিশেষ জীবাণু-দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়। কুকুর, শৃগাল প্রভৃতি পশুদের শরীরে প্রকাশ পায়, এবং সেই অবস্থায়ই আমরা তাহাদের "ক্ষেপা" বলিয়া থাকি। ক্ষেপা কুকুরের লালারসও বিষাক্ত, সুতরাং এই রোগ সহজেই এক কুকুর হইতে অন্য কুকুর কিম্বা অপর কোন জন্তুতেও সংক্রামিত হইতে পারে। এস্থলে "ক্ষেপা" অর্থে উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ নহে। পূর্ব্বোক্ত রোগের "বীজ" শরীরে না থাকিলে—কোন কুকুর যতই উত্তেজিত হউক না কেন তাহার দংশনে জলাতঙ্ক রোগ জন্মিতে পারে না।

কুকুর

যেমন মানুষের স্নেহ মমতার অধিকারী, বোধ হয় পশুদের মধ্যে এমন আর কেহ নয়। মানুষের এমন একান্ত ভক্ত ও অনুগত দাস আর মিলে না। ক্ষিপ্তাবস্থায় আমাদের এই নিত্যসহচরের যে দারুণ যাতনা হইয়া থাকে, তাহা দেখিলে হৃদয় বিগলিত হয়। চোখের চাহনিতে, নানা প্রকার ভাবভঙ্গী দ্বারা, ও কত অব্যক্ত ভাষায় যে প্রতি নিয়ত অনুরাগ জানাইত, সে আর পূর্ব্বের মত নাই। কাহারও সঙ্গ আর তাহার ভাল লাগে না; কিন্তু নির্জ্জনেও তাহার শান্তি নাই। একদণ্ড স্থির হইয়া বসিতে না বসিতেই আবার যেন কিসের তাড়নায় ছুটিয়া বেড়ায়। তাহার প্রত্যেক কার্য্য লক্ষ্য করিলে মনে হয় যেন কোন অশরীরী আততায়ীর ভয়ে তাহার প্রাণ সদা সশঙ্কিত। বুঝি বা এই অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশেই সে থাকিয়া থাকিয়া শূন্যে নখাঘাত ও দংশন করে। আমরণ তাহার দংশনের প্রবৃত্তি যায় না। কিন্তু প্রথম প্রথম কেবল জড়পদার্থ চিবাইয়াই সেই প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়। রোগের লক্ষণ যতই ভীষণতর হইতে থাকে, ততই দংশনের ইচ্ছা আরো বলবতী হয়। তখন আর মানুষ, গোমেষাদি নিকটের কোন প্রাণীই বাদ যায় না; তবে, স্বজাতীয়ের উপরই ক্ষিপ্ত কুকুরের আক্রোশটা বড় বেশী। এই অবস্থায় অপর কোন কুকুর একবার তাহার দৃষ্টিপথে পড়িলেই হয়; তাহাকে কামড়াইয়াই সে যেন নিজ যন্ত্রণার সম্যক্ প্রতিশোধ তুলিয়া লয়।

মানুষের শরীরে

এই বিষ প্রবেশ করিলে সাধারণতঃ পাঁচ ছয় সপ্তাহের মধ্যেই

লুই পাস্টর

বিষয় বর্ণনা করিতেও গা শিহরিয়া উঠে। এক মর্ম্মভেদী নিরাশার ছবি রোগীর মুখে প্রতিফলিত হয়, যেন কোন আসন্ন বিপদের শঙ্কায় তাহার হৃদয় ক্লিষ্ট। আহারে অরুচি, বাক্যালাপে অনিচ্ছা, জীবনে বিরাগ; উচ্চ শব্দ, উজ্জ্বল আলোক, এমন কি চঞ্চল বায়ুতাড়নাও তাহার অসহ্য হয়। হতভাগ্য রোগীর মুখের দিকে চাহিলে মনে হয় আনন্দ ও শান্তি তাহার হৃদয় হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়াছে। ক্রমে তাহার শরীরে এক অনির্দ্দেশ্য যাতনা উপস্থিত হয়। সামান্য উত্তেজনাতেও তাহার সর্ব্বাঙ্গে দারুণ আক্ষেপ ঘটে। এই অবস্থায় কিছু গলাধঃকরণ করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠে, এমন কি, সে কথা মনে হইলেও অসহ্য যন্ত্রণায় কণ্ঠনালী রুদ্ধ হয়। তৃষ্ণায় যখন প্রাণ যায়, রোগী জীবনের মায়া কাটাইয়া বারিপাত্র মুখে ধরে—কিন্তু সে জল একবিন্দু ওষ্ঠে সংলগ্ন হইবামাত্র আতঙ্কে তাহার অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ স্পন্দিত হইতে থাকে, এবং শাপগ্রস্তের ন্যায় তাহার দৃষ্টি স্থির ও মুখশ্রী বিকৃত হয়। রক্তমাংসের শরীর আর কত সহিতে পারে? এইরূপে কয়েক দিন অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভুগিয়া রোগীর প্রাণ দেহমুক্ত হয়।

সাধারণ চিকিৎসাতন্ত্র এই উৎকট রোগের নিকট একেবারে হার মানিয়াছে। এখন দেখা যাক পাষ্টর ইহার প্রতীকারের জন্য কি করিয়াছেন। পাষ্টরের অসাধারণ অধ্যবসায়ের

প্রথম পুরস্কার

এরূপ এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হইল যে, ক্ষিপ্তকুকুরের স্নায়ুমণ্ডলীতেই তাহার রোগের তীব্র বিষ অবস্থিতি করে। সুতরাং স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যই এই বিষ দেহান্তরে প্রবর্ত্তনের প্রকৃষ্ট উপায়। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখাইলেন যে, যদি কোন শশকের করোটির কিয়দংশ উঠাইয়া, সেই স্থানের অনাবৃত মস্তিষ্কের উপর কোন ক্ষিপ্ত কুকুরের একটুকরা মেরুমজ্জা (spinal cord) রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে অল্পকালের মধ্যেই সেই শশকেও, রোগের লক্ষণ সকল দেখা যায়। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই এই আবিষ্কারের উপকারিতা উপলব্ধি হইবে।

তাহার লক্ষণ পরিস্ফুট হওয়া পর্য্যন্ত অল্পাধিক সময়ের ব্যবধান থাকে; এই সময়কে

"বিকাশাবসর"

বলা যাইতে পারে। ক্ষিপ্ত কুকুর দংশনের পর সাধারণতঃ পাঁচ ছয় সপ্তাহের মধ্যেই জলাতঙ্ক রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়; কিন্তু এই রোগের "বিকাশাবসরের" কোন স্থিরতা নাই। এরূপ ঘটনা বিরল নহে যে, কোন কুকুরের দংশনজনিত ক্ষত শীঘ্র শুকাইয়া গেল, রোগের কোন লক্ষণ কয়েক মাস—এমন কি—বৎসরেও দেখা দিল না; "কুকুরটা তবে ক্ষেপা নয়" এই ভাবিয়া সকলে এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন। তারপর প্রতীকারের পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া কোথা হইতে জলাতঙ্ক রোগ একেবারে গা ঝাড়া দিয়া উঠিল! আবার এমনও অনেক সময়ে ঘটে যে, কেহ সুস্থ কুকুরের কামড় খাইয়াই "হয় ত কুকুরটা ক্ষেপা" এই ভাবিয়া নানা প্রকার কাল্পনিক বিভীষিকা দেখিয়া থাকেন। জলাতঙ্ক রোগের অমূলক আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। কখন কখনও এরূপ কাল্পনিক রোগের লক্ষণ সকলও সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। তবেই দেখুন, কোন

দংশনকারী কুকুর ক্ষিপ্ত কি না

তাহার সন্দেহাতীত প্রমাণ লাভের কোন উপায় থাকা নিতান্ত আবশ্যক। পাষ্টর-উদ্ভাবিত পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সহজেই তাহার মীমাংসা হইতে পারে। সন্দেহজনক কুকুরের এক-টুকরা মেরুমজ্জা (spinal cord) সুরুয়ার সহিত গাড়িয়া তাহা কোন শশকের দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে পর যদি এই শশকে রোগের লক্ষণ দেখা যায় তবেই জানিতে হইবে যে পরীক্ষিত কুকুরের দেহে জলাতঙ্ক রোগের বীজ ছিল। আর যদি সতর্কতার সহিত এইরূপ পরীক্ষার পরও কোন বিষের প্রমাণ না পাওয়া যায়, তবে ত আর কোন আপদই থাকে না। এখন দেখা যাক, জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা-প্রণালী কিরূপ। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, পাষ্টর-প্রবর্ত্তিত তন্ত্রের মূলমন্ত্র "বিষে বিষক্ষয়"।

যেমন ব্যাধি তেমনি ব্যবস্থা।

পাষ্টর বুঝিলেন, ক্ষিপ্ত কুকুরের দেহজাত প্রচণ্ড বিষই

হয়ত বা আস্তে আস্তে অল্প মাত্রায় এই বিষ শরীরে সহাইয়া লওয়া যাইতে পারে। এই ধারণায় তিনি পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বিষের তেজ ইচ্ছামত বাড়াইবার ও কমাইবার উপায় আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। তিনি দেখাইলেন যে কোন ক্ষিপ্ত কুকুরের মেরুমজ্জা (spinal cord) লইয়া যদি কোন কাচের ঢাকনার ভিতর শুষ্ক বাতাসে ঝুলাইয়া রাখা যায়, তবে সেই মেরুমজ্জাস্থ বিষের তেজ দিন দিন একটু একটু করিয়া কমিতে থাকে। অর্থাৎ মেরুমজ্জা যতই "বাসি" হইবে, ততই তাহার বিষের তেজ কমিবে। এইরূপে ১৪ দিন শুষ্ক বাতাসে থাকার পর তাহার প্রকোপ এত কমিয়া যায় যে তখন সেই বিষ কোন জীবের দেহে প্রবেশ করাইলে আর কোন ক্ষতি হয় না। এই ত হইল

ইচ্ছানুরূপ বিষের তেজ কমাইবার উপায়।

অপর দিকে আবার দেখা গেল কোন ক্ষিপ্ত কুকুরের দেহজাত বিষ দ্বারা কোন শশকে রোগ প্রবর্দ্ধিত হইতে যত সময় লাগে, তদপেক্ষা অল্প সময়েই সেই রুগ্ন শশকের দেহ হইতে বিষ লইয়া অপর এক শশকে রোগ জন্মাইতে পারা যায়; এবং এই দ্বিতীয় শশকের বিষ দ্বারা তৃতীয় এক শশকে আবার আরো শীঘ্র রোগ সংক্রমিত হইতে পারে। অর্থাৎ, ক্ষিপ্ত কুকুর হইতে আরম্ভ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে এক শশক হইতে শশকান্তরে রোগের বিষ সঞ্চালিত হইয়া আসিলে তাহার তেজ উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। সুতরাং এই উপায়ে আবশ্যক মত বিষের উগ্রতা বাড়াইতে পারা যায়।

এখন আসল কথা কিরূপে কোন জীবকে এমন "বিষসহ"

করা যাইতে পারে যে আর ক্ষেপা কুকুরের দংশনে তাহার ক্ষতি হইবে না। এ সম্বন্ধে পাষ্টরের পরীক্ষার পন্থা মোটামুটি এইরূপ—মনে করুন একটি শশককে "বিষসহ" করিতে হইবে। এজন্য অবশ্য পরীক্ষাগৃহে সারি সারি কতকগুলি ক্ষিপ্ত কুকুরের মেরুমজ্জা পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে শুষ্ক বাতাসে ঝুলান আছে। ইহাদের কোনটা সদ্য প্রস্তুত হইয়াছে, কোনটা দুই দিন মাত্র, কোনটা বা তিন দিন যাবৎ; এইরূপে বলা হইয়াছে যে মেরুমজ্জা যত পুরান হইবে ততই তাহার বিষের তেজ কম হইবে। প্রথমতঃ চৌদ্দ দিন রক্ষিত মেরুমজ্জার একটুক্‌রা লইয়া কিছু সুরুয়ার সহিত তাহা মাড়িয়া পরীক্ষিত শশকের দেহের ভিতর প্রবিষ্ট করান হয়। পর দিন তাহার শরীরে তের দিনের বিষ পূর্ব্বোক্ত উপায়ে প্রয়োগ করা হয়। তৃতীয় দিনে তাহাকে বারো দিনের বিষ দেওয়া হয়, এবং তাহার পর উত্তরোত্তর অপেক্ষাকৃত "টাট্‌কা" বিষ প্রয়োগ করিয়া অবশেষে সদ্যপ্রস্তুত মেরুমজ্জার বিষ এই শশকের দেহে সহাইয়া লওয়া হয়। এইখানেই শেষ নহে, ইহার পরও বিষের তেজ আরো বাড়ান হয়। এইরূপে কিছু দিনের মধ্যেই পরীক্ষিত জীবের শরীরে এত উগ্র বিষ সহিয়া যায় যে তাহার নিকট ক্ষিপ্ত কুকুরের লালারস-জাত বিষের তেজ তুলনায় কিছুই নহে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে বাস্তবিকই এরূপ "বিষসহ" শশককে আর ক্ষেপা কুকুরে কামড়াইয়া তাহার বিশেষ কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

এ ত বেশ কথা। কিন্তু ক্ষেপা কুকুর পাছে কোন দিন দংশন করে এই ভয়ে আর কেহ আপনার দেহটাকে "বিষসহ" করিয়া রাখিতে রাজি হইবে না। তবে

যাহাকে ক্ষেপা কুকুরে কামড়াইয়াছে

তাহার কি উপায় হইবে? তাহাকে বাঁচানই পাষ্টর-প্রবর্ত্তিত উপায়ের প্রধান বাহাদুরী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জলাতঙ্ক রোগের "বিকাশাবসর" কয়েক সপ্তাহব্যাপী; অর্থাৎ রোগের বীজ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, তাহার লক্ষণ প্রকাশিত হইতে কয়েক সপ্তাহ বিলম্ব হয়। এই সময়ের মধ্যেই, পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে দষ্ট ব্যক্তির দেহকে "বিষসহ" করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই এরূপ তীব্র বিষ রোগীর শরীরকে দখল করিয়া বসে যে ক্ষিপ্ত কুকুরের দংশনজনিত বিষ আর তাহার কাছে ঠাঁই পায় না। সুতরাং ক্ষেপা কুকুরের কামড় খাইয়াও সে ব্যক্তি জলাতঙ্ক রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করে।

জোসেফ মাইষ্টার (Joseph Meister) নামক কোন ফরাশি বালককে এক ক্ষিপ্ত কুকুর শরীরের নানা স্থানে

তাহার জীবনের মায়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই মাইষ্টারকে লইয়াই পাষ্টর মানুষের দেহে তাঁহার চিকিৎসার উপকারিতার প্রথম পরীক্ষা করিলেন। পাষ্টরের চিকিৎসায় মাইষ্টার বাঁচিয়া গেল। শুধু মাইষ্টার কেন, ফ্রান্সের সহস্র সহস্র লোক পাষ্টরের প্রসাদে অসহ্য যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাইয়াছে। সংশয়ীদের সংখ্যা একেবারে বিলুপ্ত না হইলেও বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে পাষ্টর-উদ্ভাবিত চিকিৎসাতন্ত্রের মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে।

বিষে বিষক্ষয়

কিরূপে হয়, এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। অল্পে অল্পে কোন দুরন্ত রোগের বিষ জীবদেহে প্রবর্ত্তিত হইলে কি কৌশলে তাহা সেই জীবকে রোগের হাত হইতে বাচায় এ কথার তিনটি উত্তর হইতে পারে।

১ম। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে সেই রোগের বীজ ব্যাকটিরিয়া (Bacteria) নামক এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জাণু মাত্র, তবে এ কথা মানিতে হইবে যে অন্যান্য গাছপালা যেমন জমিতে পোষণোপযোগী সামগ্রী না পাইলে বাচিতে পারে না, তেমনি এই ব্যাকটিরিয়া যত ক্ষুদ্র হউক না কেন, সারবান "জমি" না পাইলে মরিয়া যাইবে। এখন মনে করুন, কোন জীবদেহকে অল্প সংখ্যক ব্যাকটিরিয়া আক্রমণ করিল। সে দেহে সেই প্রকার ব্যাকটিরিয়ার উপযুক্ত "আহার" যতটুকু ছিল, তাহারাই নিঃশেষ করিয়া ফেলিল, তারপর সেই অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে আর তাহাদের দল বৃদ্ধির আশা কোথায়? বহুসংখ্যক ব্যাকটিরিয়া তখন সেখানে জুটিলে তাহারা দুর্ভিক্ষে মারা যাইবে! সুতরাং বসন্ত রোগ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বসন্তের বীজ লইয়াই টীকা দেওয়ার মত অল্প মাত্রায় কোন কোন রোগের বিষ শরীরে চালাইয়া তাহাদের হাত এড়ান যাইতে পারে।

২য়। অল্পসংখ্যক ব্যাকটিরিয়া আগেই শরীরে প্রবেশ করিয়া যে সেখানকার "জমি" অসার করিয়া দেয় তাহা নহে। এই জীবাণুরা কোন দেহে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়া দলবৃদ্ধির চেষ্টা দেখিতে থাকে। কিন্তু দেহের ভিতরে যতই এই শত্রুদের বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে, "বিষঘাতী" পদার্থ জন্মিতে থাকে, যাহার প্রভাবে সেই রোগের বিষ একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

৩য়। শরীরের কোন স্থানে বিষ প্রবেশ করিলেই সেখানে মহা গোলযোগ বাধিয়া যায়। কারণ, আমাদের রক্তে ও শরীরের প্রায় সর্ব্বত্রই এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষাণু ঘুরিয়া ফিরিয়া প্রহরীর কাজ করে; তাহারা শরীরের মধ্যে কাহারো অনধিকার প্রবেশ সহিতে পারে না; কোন অনিষ্টকর পদার্থ দেখিলেই তাহারা ক্ষেপিয়া উঠে! কিন্তু 'ঘুষখোর' প্রহরীদের মত ইহাদেরও বশ করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। অতি অল্প পরিমাণে বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে ইহারা তত আপত্তি করে না। শুধু তাহাই নহে; ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া বিষের মাত্রা বিলক্ষণ বাড়াইয়া দেওয়া যায় এবং এই প্রহরীরা যেন সংসর্গগুণে আস্তে আস্তে সকল উপদ্রব অকাতরে সহ্য করিতে শিখিয়া ফেলে! এ কথার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। অহিফেনসেবীরা প্রায়ই প্রথমতঃ খুব অল্প মাত্রায় আরম্ভ করেন। কিন্তু অনেক স্থলেই কালক্রমে আফিমের মাত্রা এত বাড়িয়া উঠে যে সেই পরিমাণ অহিফেন অপর কেহ সেবন করিলে নিশ্চয়ই ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হয়েন। অথচ আফিমখোরদিগের মৌতাতের পর বিশেষ কোন অসুবিধা হয় বলিয়া বোধ হয় না। অল্পে অল্পে সহানর এমনই গুণ।

এই তিনটি ব্যাখ্যার মধ্যে কোনটি যে জলাতঙ্ক চিকিৎসা সম্বন্ধে ঠিক খাটে, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা শক্ত কথা। বিষক্ষয়ের কৌশলটা যেমনই হউক, পাষ্টরের চিকিৎসা-প্রণালী যে বিশেষ সুফলপ্রদ সে বিষয়ে আর সন্দেহ করিতে পারি না।

জানি না কোন পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মর্ত্ত্যে জলাতঙ্ক রোগের প্রবর্ত্তন ও তজ্জনিত নরকযন্ত্রণার বিধান হইয়াছে। এই উৎকট রোগের লক্ষণ দেখিলে হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে আকুল ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হয়—"ত্রাহি মধুসূদন," "ত্রাহি মধুসূদন"। শুনেছি, পুরাকালে মুনিগণ দুশ্চর তপস্যার বলে দেবতার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতেন, যাহার প্রসাদে রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যু দূরে যাইত। পাষ্টরের একাগ্রচিত্ত সাধ-

তাহার প্রসাদে জগতের দুঃখভার অনেক লাঘব হইবে,—এই মঙ্গল বার্ত্তা সর্ব্বত্র ঘোষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ।

শর্করা-বিজ্ঞান।

অন্তম অধ্যায়।

ব্যাধি-নিবারণ।

উদ্ভিদাণুজনিত দুইটি রোগ ইক্ষুর মধ্যে জন্মিয়া থাকে। একটির নাম 'বোঞ্চা', অপরটির নাম 'ধসা'। বোঞ্চা রোগ কোলেটোট্রিকাম্ ফাল্‌কেটাম (colletotrichum falcatum) নামক উদ্ভিদাণু (microscopic fungus) দ্বারা ঘটিয়া থাকে। ধসা রোগ ট্রাইকোস্ফিরিয়া স্যাকারি (Tricho spheria sacchari) জাতীয় উদ্ভিদাণু হইতে ঘটিয়া থাকে। উভয় রোগই একই উদ্ভিদাণু হইতে জন্মিয়া থাকে এইরূপ সম্প্রতি সাব্যস্ত হইয়াছে। ইক্ষুদণ্ড লোহিত এবং পরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পচিয়া গেলে উহা উদ্ভিদাণুজনিত ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ অবস্থাগত ইক্ষুদণ্ডে প্রায় কীটকোটরও দেখিতে পাওয়া যায়। কীট কোটর প্রস্তুত করাতে উদ্ভিদাণুর বীজ কোটরের মধ্যে অবস্থান করিয়া জন্মিবার সুবিধা পায়, এ কারণ কীট ও উদ্ভিদাণু উভয়ঘটিত ক্ষতি যুগপৎ প্রায়ই লক্ষিত হয়। কিন্তু কীট-কোটর আছে অথচ উদ্ভিদাণুর চিহ্ন নাই, অথবা উদ্ভিদাণুতে ইক্ষু নষ্ট করিতেছে, অথচ কীটের উপদ্রব নাই, এরূপ অবস্থাও কখন কখন লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ কীট লাগিবার কারণই ইক্ষুদণ্ড 'বোঞ্চা' লাগা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে এইটিই অধিক সম্ভব। পরে রোগ যখন অধিক পরিমাণে জন্মিয়া যায় তখন পোকা লাগা না হইলেও ইক্ষুদণ্ডে এই রোগ বাড়িতে থাকে। কীট ব্যতীত যদি এই রোগ দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছে দেখা যায়, তখন ইক্ষুতে ধসা লাগিয়াছে অনুমান করিতে হইবে। ধসা লাগা এদেশে কখন কখন হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশে ইক্ষুতে ধসা লাগিয়া সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। কীটকোটরগুলি এই রোগের অন্যতম প্রবেশদ্বার। অন্যান্য দেশে গাছগুলি তিন ফুট উচ্চ হইয়া গেলেই নিম্ন হইতে পাতা বার কারণ ইক্ষুদণ্ডে যে সকল ক্ষতস্থান বাহির হইয়া থাকে ঐ সকলে উদ্ভিদাণুর বীজ সহজে স্থান প্রাপ্ত হইয়া ঐ সকল দেশের ইক্ষুক্ষেত্রে রোগের বৃদ্ধি এত অধিক হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ইক্ষুদণ্ডের উপর পাতা বাঁধিবার নিয়ম আছে। ইহাও কীটের উপদ্রবের ও উদ্ভিদাণুর বীজ দণ্ডের উপর স্থান অধিকার করার পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ। অন্য দেশের অনুকরণে এদেশে পাতা ছিঁড়িয়া (trashing) দিবার নিয়ম প্রচলিত না করিয়া, পাতা দ্বারা ইক্ষুদণ্ড বাঁধিয়া দিবার নিয়ম সাধারণতঃ প্রচলিত করা ভাল।

২৪। মরীচি, বার্বেডো প্রভৃতি স্থানে ইক্ষু অধিক পরিমাণে জন্মিবার কারণও কীট ও উদ্ভিদাণুঘটিত রোগ ঐ সকল দেশে অধিক পরিমাণে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অল্প বিস্তর পরিমাণে রোগ আমাদের দেশে সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়। মাদ্রাজ প্রদেশে উদ্ভিদাণুজনিত ইক্ষু-রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ প্রদেশেও স্থানবিশেষে এবং ইক্ষুর জাতিবিশেষে ধসা রোগের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ কারণ যাহাতে কীট ও উদ্ভিদাণু নিবারিত থাকে এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

২৫। ইক্ষুদণ্ডের গাত্রে এবং অভ্যন্তরে নানাজাতীয় কীট লাগিয়া ইক্ষুর বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত কয়েক জাতীয় কীটের মধ্যে মাজেরা-পোকা, উই, ঘুন ও বেধ-পোকা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করে। অন্য কীটগুলির দেশীয় নাম না থাকাতে কেবল উহাদের লাটিন নাম দিতে বাধ্য হইলাম।

(১) বেধ-পোকা (Xyleborus perforans) কঠিন পক্ষ-বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ। ইহা কীটাবস্থায় ইক্ষুদণ্ডের মধ্যে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া অভ্যন্তরে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়।

(২) মাজেরা-পোকা (Chilo simplex) ক্ষুদ্রকায় প্রজাপতিজাতীয় পতঙ্গের কীট। ইহা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ছিদ্র করিয়া ইক্ষুর অভ্যন্তরে অল্প দূর মাত্র চলিয়া গিয়া কোটর মধ্যে গতায়াত করিয়া কোটরের চতুষ্পার্শ্ব হইতে ইক্ষুর রস শোষণ করিয়া থাকে। পতঙ্গ অবস্থায় কোটরের ছিদ্রপথ দিয়া বাহির হইয়া ইক্ষুদণ্ডের উপর ও পত্র ও

ডিম্ব হইতে পুনরায় কীট বাহির হইয়া দণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে। বীজের জন্য যে টিকলি বা ডগা ব্যবহার হয়, উহার মধ্যে মাজেরা-পোকা ও বেরু-পোকা উভয় জাতীয় পোকাই লুক্কায়িত অবস্থায় থাকিয়া, ভবিষ্যৎ ফসলের ক্ষতি করিয়া থাকে। টিকলিতে যে পরিমাণ উদ্ভিদাণু বা কীট নিহিত থাকে, ডগাতে সে পরিমাণ থাকে না। টিকলি ব্যবহার দ্বারা ইক্ষুদণ্ডের উন্নতি হয় বটে, কিন্তু প্রতিকারের উপায় না করিয়া টিকলি ব্যবহার দ্বারা ব্যাধির সম্ভাবনা অধিক হইয়া পড়ে।

(৩) ইক্ষু পাকিবার সময় এবং কাটিবার পরে গৃহমধ্যে রাখিয়া দিলে উহাতে ঘুন লাগে। ঘুন ক্ষুদ্রকায় একপ্রকার কীট (Dinoderus minutus)।

(৪) শ্বেতকায় প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন কীট, যাহা বাঁধা-কপিরও পাতা কাটিয়া নষ্ট করে, উহা ইক্ষুর পাতাও কাটিয়া ফেলে। ইহার নাম মানসিপিয়াম্ নেপালেনসিস্ (Mancipium Nepalensis)।

(৫) কলম হইতে অঙ্কুর বাহির হইতেছে এমন সময়ে এক জাতীয় কীট অঙ্কুরগুলি গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া দেয়। ইহার নাম একিয়া মেলিসান্তে, (Achaea melicerte)। ইহা ক্ষুদ্রকায় 'কাটুরি-পোকা' জাতীয় প্রজাপতির কীট। কীটাবস্থায় ইহা মৃত্তিকা মধ্যে থাকিয়া রাত্রিযোগে বাহির হইয়া গোড়া ঘেঁসিয়া গাছ কাটিয়া দেয়।

(৬) স্কার্পোফেগা আউরিফ্লুয়া (Scirpophaga auriflua) ও ড্রাগানা পানসেলিস্ (Dragana pansalis) নামক দুই জাতীয় প্রজাপতির কীটও ইক্ষুর পাতা খাইয়া নষ্ট করে।

(৭) ইডেলাস্ মার্মরেটাস্ (Oedalus marmoratus) ও পিসিলোসেরা হায়েরোগ্লাইফিকা (Pœcilocera hieroglyphica) নামক দুই জাতীয় উইচিংড়িও ইক্ষুর পাতা খাইয়া ফসলের ক্ষতি করে।

(৮) ব্লিসাস্ জিবাস্ (Blissus gibbus) নামক কঠিন ও চিত্রিতপক্ষ বিশিষ্ট ক্লিঞ্চ্-বাগ্ (Clinch bug) জাতির অন্তর্গত একপ্রকার পতঙ্গ কীট ও পতঙ্গ উভয় অবস্থাতেই ইক্ষুদণ্ডের উপর হইতে উহার রস শোষণ করিয়া উহাকে বিবর্ণ ও হীনবল করিয়া দেয়।

নামক অতি ক্ষুদ্রকায়, শুভ্র ধূলিবৎ পদার্থলেপিত, ঈষৎ লোহিতবর্ণ, নিশ্চল, পক্ষবিহীন কীট পত্র ও দণ্ডের সন্ধিস্থলে থাকিয়া দণ্ডের রস শোষণ করিয়া থাকে।

(১০) পিপীলিকা ও উইও ইক্ষুদণ্ডের বিশেষতঃ কলমের, ক্ষতি করিয়া থাকে। পিপীলিকা কিছু ক্ষতি করে বটে, কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা পিপীলিকা দ্বারা উপকারই অধিক দর্শে। কোটরাভ্যন্তরস্থ মাজেরা-পোকা ও বেরু-পোকা ডেরাইলাস্ ওরিয়েন্টালিস্ জাতীয় পিপীলিকা দ্বারা ভক্ষিত হইয়া অনেক মারা যায়। রেড়ির খোল ব্যবহার দ্বারা উইয়ের উৎপাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। ভাল করিয়া ক্ষেত্র ডুবাইয়া জল সেচন করিতে পারিলেও উইয়ের উৎপাত কমিয়া যায়। কলমেই যখন উইয়ের উৎপাত অধিক হয়, তখন কলমেরই সহিত রেড়ির খোল মিশ্রিত করিয়া লাগান আবশ্যক। লোহিতবর্ণের ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকার উৎপাত ঘটিলে হরিদ্রা-চূর্ণ ছিটাইলে উপকার দর্শে।

১১। কীটের ও উদ্ভিদাণুজনিত রোগের প্রতিকারাপেক্ষা নিবারণোপায় অবলম্বন করাই বিহিত। নিবারণোপায় পঞ্চবিধ।

১ম উপায়, পুনঃ পুনঃ অনেক দিবস ধরিয়া চাষ করা। ইহা দ্বারা একিয়া মেলিসান্তে প্রভৃতি পতঙ্গের পুত্তলিকা ও কীট সহজে সালিক প্রভৃতি পক্ষী দ্বারা ভক্ষিত হইয়া নষ্ট হইয়া থাকে।

২য় উপায়, ইক্ষুক্ষেত্রের চতুষ্পার্শ্বে ধন্যা ও তুলফা গাছ লাগাইয়া দেওয়া। তীব্র গন্ধযুক্ত ওষধি হইতে প্রজাপতি জাতীয় পতঙ্গ অন্তরে থাকে।

৩য় উপায়, কলম কীট ও অণুনাশক পদার্থের সহিত মিলিত করিয়া বসাইয়া দেওয়া। একভাগ শেঁকো-বিষ চূর্ণ, ৫ ভাগ তুঁতিয়া চূর্ণ, ১০ ভাগ চূণ, ১০ ভাগ ছাই, ৫ ভাগ ভূসা, ১০ ভাগ হরিদ্রাচূর্ণ ও ২০০ ভাগ রেড়ির খোল চূর্ণ, একত্রে ৫০০ ভাগ জলে মিলিত করিয়া, কলমগুলি এই মিশ্র পদার্থে ডুবাইয়া লইয়া অনতিবিলম্বে জমিতে বসাইয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে কলমের মধ্যে নিহিত উদ্ভিদাণু ও কীট সমুদায় মরিয়া যায় এবং বাহির হইতেও উই প্রভৃতি কীট আসিয়া কলমকে বা অঙ্কুরিত গাছকে আক্রমণ

৪র্থ উপায়, ক্ষেত্রে ডুবাইয়া জল দেওয়া। ছিটাইয়া মাসে চারিবার জল দেওয়া অপেক্ষা ডুবাইয়া মাসে একবার জল দেওয়াতে উপকার অধিক হয়। উইচিংড়ি কাটরি পোকা এবং উই, ডুবাইয়া জল দেওয়াতে মারা পড়ে।

৫ম উপায়, ইক্ষুশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী ভূমি মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া উস্কাইয়া দেওয়া। ইহাতে মৃত্তিকা মধ্যে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে কীটেরা বাসা নির্ম্মাণ করিবার সুবিধা পায় না। ইহাতে গাছগুলিরও তেজ বাড়িয়া উদ্ভিদাণু জনিত ব্যাধির এবং রাইপার্সিয়া জাতীয় চলচ্ছক্তিহীন কীটের আক্রমণ প্রায় ঘটে না।

৬ষ্ঠ উপায়, পাতা বাঁধিবার কারণ ব্যাধি কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত হওয়া সম্ভব, একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

নবম অধ্যায়।

চাষের নিয়ম।

ইক্ষু জন্মাইতে হইলে গভীরভাবে চাষ দেওয়া বিশেষ আবশ্যক। আলু উঠাইবার পরেই যদি ইক্ষু লাগান হয়, তাহা হইলে মৈ দিয়া জমি সমতল করিয়া, দ্বিপক্ষ লাঙ্গল দ্বারা জুলি প্রস্তত করিয়া লইয়া, ইক্ষু লাগান চলিতে পারে। কলাই, সর্ষপ প্রভৃতি ফসল জন্মাইবার পরে ইক্ষুর জন্য চাষ করিতে হইলে, মাঘ ফাল্গুন মাসে, কাল বিলম্ব না করিয়া উপর্য্যুপরি যতবার চাষ দেওয়া যাইতে পারে তত বার চাষ দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু মাঘের শেষে বৃষ্টি না হইলে কলাই বা সর্ষপ উঠাইবার পরেই জমিতে লাঙ্গল দেওয়া দুরূহ হইয়া উঠে। অগ্রহায়ণ মাসের পর হইতে যখনই বৃষ্টি হইবে তখনই ধান্যের জমি বা অন্য যে কোন জমি পতিত অবস্থায় থাকুক না কেন, লাঙ্গল দিয়া প্রস্তুত করিয়া লইলে ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে আকের কলম লাগাইবার পক্ষে উপযোগী হইয়া থাকিবে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জমি প্রস্তুত করিয়া শ্রেষ্ঠ চর্ব্ব্যজাতীয় কোন ইক্ষু লাগাইতে পারিলে একটি সুবিধা হয়.—পর বৎসর দুর্গোৎসবের পূর্ব্বেই ঐ ইক্ষু প্রস্তুত হইয়া যাওয়াতে, উহা বিলক্ষণ দামে বিক্রয় করিতে পারা যায়। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ইক্ষুর কলম লাগাইলে একটি ক্ষতি হয়.—শীতের কয়েক মাস গাছ ভাল বাড়িতে না পাইয়া গাঁইটগুলি অতি নিকট নিকট জন্মে এবং ফাল্গুনে লাগান আকের যেমন তেজঃ হয়, শীতের পূর্ব্বে লাগান আকের কখনই সেরূপ তেজঃ হয় না। এ কারণ মোটের উপর ধইঞ্চা লাগাইয়া, পরে আলু লাগাইয়া, তৎপরে ইক্ষু লাগানই প্রশস্ত নিয়ম।

২৮। মরীচি-দ্বীপে যেরূপ গর্ত্তের মধ্যে বা থানার মধ্যে ইক্ষুর কলম লাগায়, তদপেক্ষা বঙ্গদেশে যেরূপভাবে সমতল জমিতেই জুলি কাটিয়া কাটিয়া ইক্ষু বসানর নিয়ম আছে, তাহাই প্রশস্ত। তবে কোদালি দ্বারা জুলি কাটাই হউক আর দ্বিপক্ষ লাঙ্গল দ্বারাই জুলি কাটা হউক, জুলির নিম্নে তিন ইঞ্চি আল্গা মাটীর উপর কলম বসাইয়া উহার উপর আর তিন ইঞ্চি মাটী চাপাইয়া দিয়া পরে জুলির মধ্যে জলদিয়া কলম সিক্তাবস্থায় রাখিতে হইবে। গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া কলমের অঙ্কুর বাহির করিয়া লইয়া পরে উক্ত নিয়মে কলম বসাইলে অতি সত্বর গাছ বাহির হইয়া পড়ে।

২৯। কলম বসাইয়া জল দিবার এক সপ্তাহের মধ্যেই জমি একবার কোদালি বা হাণ্টার-হো দ্বারা অথবা অন্য প্রণালীতে আল্গা করিয়া দিতে হইবে, নতুবা জমির উপর চাপ বাঁধিয়া অঙ্কুর বাহির হইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিবে। জমি আল্গা থাকিলে, যাহাতে 'চোঁক' বাহির হইয়াছে এরূপ কলম লাগাইতে পারিলে ফাল্গুন মাসে জল সেচনের এক সপ্তাহের মধ্যে গাছ বাহির হইয়া পড়ে। গাছগুলি অর্দ্ধহাত পরিমাণ উচ্চ হইলে, ছাই ও সোরা (বিঘা প্রতি প্রত্যেক দ্রব্য এক মণ) মিলিত করিয়া, জমিতে ছিটাইয়া দিয়া, আর একবার জলসেচন করিতে হইবে। এই জলসেচনেরও পরে এক সপ্তাহের মধ্যে জমি আর একবার হাণ্টার-হো দ্বারা আল্গা করিয়া দিতে হইবে। ফাল্গুন মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত ৪।৫ বার জলসেচনের আবশ্যক হওয়া সম্ভব। খড়ি আক প্রভৃতি অচর্ব্ব্য জাতীয় আক লাগাইলে জল সেচন করিয়া চৈত্র মাসে কলম লাগাইয়া দিয়া, বৈশাখ মাসের প্রথমে আর একবার মাত্র জল দিলেই যথেষ্ট হয়। জল যদি ৫ ফুটের মধ্যে পাওয়া যায় তাহা হইলে দোন ব্যবহার করাই ভাল। যদি ৮ ফুট নিম্নে জল থাকে তবে সিউনী চালাইয়া জল সেচন করা উচিত। যদি ৪০।৫০ হাত গভীর কূপ হইতে জল উঠাইয়া [illegible]

হইলে 'মোটের' বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। দোনের দ্বারা এক ব্যক্তি প্রত্যহ তিন বিঘা জমির জল উঠাইতে পারে। সিউনী দ্বারা চারি ব্যক্তি (দুই জন পালা পালি করিয়া) প্রত্যহ অর্দ্ধ বিঘা জমির উপযুক্ত জল উঠাইতে পারে। মোটের দ্বারা এক জোড়া বলদ ও একজন মানুষ প্রত্যহ ছয় কাঠা জমির উপযুক্ত জল উঠাইতে পারে। জমিতে জল চালাইয়া দিবার জন্য পৃথক এক ব্যক্তির আবশ্যক। তবে সিউনী ব্যবহার করিতে গেলে যে দুই ব্যক্তি সিউনী ছাড়িয়া দিয়া বিশ্রাম করিতে যাইবে, তাহারাই জল জমিতে চালাইয়া দিতে পারে। দোন চালাইতে হইলেও যে ব্যক্তি ক্ষেত্রে জল চালাইবে, সে ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে দোন চালাইলে, পালাপালি করিয়া কার্য্য চলিতে পারে। 'বালদেব্‌-বালতি' (চিত্র দেখ) নামে এক প্রকার ডবল-

দোন কানপুরের পরীক্ষাক্ষেত্রের কারখানায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৪ ফুটের মধ্যে জল থাকিলে এই কলের দ্বারা জল উঠানতে বিলক্ষণ লাভ আছে।
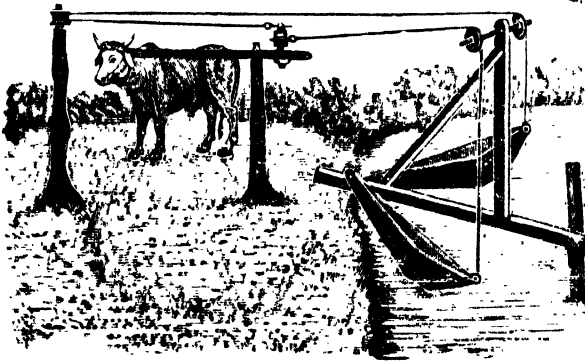
৩০। যদি ধইঞ্চা লাগাইয়া, আলু জন্মাইয়া আর ৫।৭ মণ করিয়া এপেটাইটের গুঁড়া ছিটাইয়া, ইক্ষু জন্মান যায়, তাহা হইলে বিঘা প্রতি একমণ ছাই ও একমণ সোরা ভিন্ন আর কোন সার ব্যবহার করা আবশ্যক করে না। তবে এপেটাইট ও সোরার যোগাড় না হইলে বিঘা প্রতি ৫।৭ মণ করিয়া রেড়ির খোল গুঁড়া করিয়া ব্যবহার করা আবশ্যক। সারের জন্য বিঘা প্রতি ১০।১২ টাকা ব্যয় করা উচিত। শিবপুর কৃষিক্ষেত্রে খড়-আকের একমণ জমিতে এই বৎসরে (অর্থাৎ ইং ১৯০০-১৯০১ সালে) একার প্রতি ব্যবহারানন্তর ফেলিয়া দেওয়া হয় সেই কয়লা, এবং ৫। মণ সোরা, সাররূপে ব্যবহৃত হয়, এবং অপর একখণ্ড জমিতে একার প্রতি ২০। মণ রেড়ির খোল ব্যবহৃত হয়। প্রথমোক্ত জমিখণ্ড হইতে একার প্রতি ৪৮৩। মণ ইক্ষুদণ্ড ও ৩৬। মণ গুড় পাওয়া যায়। এই ইক্ষুদণ্ড হইতে শতকরা ওজনে ৫৯ ভাগ রস বাহির হয়। যে জমি-খণ্ডে রেড়ির খোল ব্যবহৃত হয় উহা হইতে একার প্রতি ৪০৫ মণ ইক্ষুদণ্ড ও ৩১ মণ গুড় প্রস্তুত হয় এবং শতকরা ওজনে ইক্ষু হইতে ৫৬ ভাগ রস বাহির হয়। গত মাঘ মাসের বৃষ্টির পরেই, হাড়ের কয়লার গুঁড়া ও সোরা যে জমিতে সাররূপে ব্যবহৃত হয়, ঐ জমির ইক্ষু কাটা হয়। ঐ সময়ে ইক্ষুগুলি সম্পূর্ণ পাকে নাই, এবং জমিতেও তখন বিলক্ষণ রস ছিল। আর একমাস বিলম্ব করিয়া কাটিলে এই জমি হইতে আরও অধিক গুড় পাওয়া যাইত। রেড়ির খোল যে জমিতে সার রূপে ব্যবহৃত হয়, ঐ জমির আর একমাস বাদে (ফাল্গুন মাসে) সম্পূর্ণ পক্কাবস্থায় কাটা হইয়াছিল। হাড়-সারের উপকারিতা রেড়ির খোল অপেক্ষাও যে কিছু অধিক এই পরীক্ষা দ্বারা এরূপ উপলব্ধি হয়।

৩১। বর্ষা পড়িয়া গেলে জমিতে জল না দাঁড়ায় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। বর্ষার মধ্যে গাছ ৪।৫ হাত উচ্চ হইয়া গেলে পাতা দ্বারা ইক্ষুদণ্ডগুলি আবৃত করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সুপক্ব ও শুষ্ক পত্রগুলি 'মোচড়' দিয়া নমিত করিয়া ইক্ষুদণ্ডের উপর জড়াইয়া বাঁধিতে হয়। যতদূর নিম্ন হইতে বাঁধা আরম্ভ করিতে পারা যায় ততই ভাল। গাছগুলি মাথা ভারি হইয়া পড়িয়া না যায় এ কারণ তিন চারিটা গাছ উপরি ভাগে একত্র করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শ্রাবণ মাসে বাঁধাই আরম্ভ করিয়া ভাদ্রমাসে শেষ করিতে না করিতে আবার দেখা যাইবে আর একবার গাছগুলিতে পাতা জড়ান ও বাঁধন আবশ্যক হইয়াছে।

৩২। হাণ্টার-হো হইবার ব্যবহার করিতে পারিলে আর পৃথক্ করিয়া কোদালী দ্বারা গাছের গোড়ায় মাটী চাপাইয়া দিবার আবশ্যক করিবে না। ফাল্গুন, চৈত্র ও

হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক বারে জল দিবার এক সপ্তাহ পরেই হাণ্টার-হো ব্যবহার করা চলিতে পারে। গাছগুলি দুই ফুট উচ্চ হইয়া গেলে উহার মধ্য দিয়া গোরু চালাইয়া হাণ্টার-হো ব্যবহার করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। দুইবার বা তিনবার হাণ্টার-হো ব্যবহার করিবার পরে যদি জমি নরম অবস্থায় অথচ কর্দ্দমময় নহে, এরূপ ভাবে পাওয়া যায়, তাহা হইলে হাতে-চালান হো ব্যবহার করা চলিতে পারে। যদি কলম লাগাইবার একমাস পরে দেখা যায় জমিতে নিতান্ত ঘাস চাপিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে হাণ্টার-হো বা হাতে চালান হো মাত্র ব্যবহারের উপর নির্ভর না করিয়া, একবার নিড়ানি বা খুর্পি দ্বারা পরিষ্কার করিয়া নিড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। পরে গাছগুলি ভাল করিয়া বাহির হইলে সার দিয়া জল-সেচন করিয়া হাণ্টার-হো ব্যবহারানন্তর গাছগুলি একহাত উচ্চ হইয়া গেলে আর একবার জল দিবার পরে হাণ্টার-হো চালাইলে, গাছের গোড়ায় দুইবারে মাটী চাপান হইয়া যাইবে। ইহার পরে প্রত্যেক বার জল-সেচনের পরে একবার করিয়া হাতে-চালান হো ব্যবহার করা উচিত। বিলাতি নিয়মে যদি ছয়ফুট অন্তর দুই খানি করিয়া কলম (২ হাত ব্যবধানে) লাগান হয়, তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া বলদসংযুক্ত হাণ্টার-হো চালান যাইতে পারে। শ্রাবণ মাস হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত দুইবার পাতা বাঁধিয়া দিবার পরে, মাঘ মাস অবধি আর কিছু করিবার আবশ্যক করে না। তবে আশ্বিন মাসেই যদি বর্ষা শেষ হইয়া যায় তাহা হইলে কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের মধ্যে দুই বার জল-সেচন ও দুই বার 'কোদালি' দ্বারা জমি উত্থান আবশ্যক হইতে পারে। ক্ষেত্রের মধ্যে শায়িত অবস্থায় অনেক ইক্ষু থাকিবার কারণ বর্ষান্তে 'হো' চালানর পক্ষে বাধা জন্মে। জমির অবস্থা বুঝিয়া জল-সেচনের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। মাঘ মাসে যখন সমস্ত পাতা শুকাইয়া আসিয়াছে দেখা যাইবে, তখন গাছ কাটা আরম্ভ হইবে। গাছের তেজ আছে এবং জমিও সিক্ত রহিয়াছে এরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইলে, মাঘ মাসে আক্ কাটা আরম্ভ না করিয়া ফাল্গুন মাসে আরম্ভ করা ভাল। সাহেবেরা যে যে দেশে ইক্ষুর চাষ করিয়া থাকেন, মাথাগুলি কাটিয়া দিবার (topping) নিয়ম আছে। ইহাতে ইক্ষুদণ্ডে শর্করার ভাগ অধিক হয় এবং উপরিভাগস্থ অঙ্কুরগুলি গাছে থাকিয়াই প্রস্ফুটিত হইবার উপক্রম হয়। এইরূপ উপরিভাগস্থ ইক্ষুদণ্ড হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল কলম হয়। এক বিঘা জমির আক্ কাটিতে ও ঝুড়িতে দুই জন লোকের দশ দিন লাগে, অথবা ২০ জন লোক এক-দিনে এই কার্য্য সমাধা করিতে পারে। কোদালি দ্বারা জমি ঘেঁসিয়া আক কাটা উচিত। ইহাতে দুইটি উপকার আছে (১ম) যত অধিক পরিমাণ ইক্ষু কাটিয়া লইতে পারা যায় ততই ভাল। (২য়) 'মুড়া-কাটা' বা চাঁদিমারা' করিয়া আক্ কাটিয়া লইতে পারিলে সেই গোড়া হইতে অধিক তেজে গাছ বাহির হয়। যদি একই গোড়া হইতে ৩।৪ বৎসর ইক্ষু জন্মান হয়, তাহা হইলে যতদূর সম্ভব গোড়া-ঘেঁসিয়া ইক্ষু কাটা আবশ্যক।

১১। ইক্ষুদণ্ডগুলি কাটিয়া ও ঝুড়িয়া পরিষ্কার ভাবে লইয়া আসিয়া মাড়াই কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। এক বিঘা জমির আক্ মাড়িতে এদেশে চারি হইতে আট দিবস লাগিয়া থাকে। দুই জোড়া বলদ, একটা চারি রোলার বেহিয়া-মিল, গোটাকতক কলসী বা টিন, গোটাকতক ঝাজ্‌রি, দুইখানা বড় কড়া, দুইটা উকড়িমালা, দুইটা নাদ্, খানিক চুণ্, এক বোতল ফস্ফরিক্ এসিড্, কয়েক খানা লিট্‌মস্-পেপার ও একটা তাম্র আচ্ছাদিত তাপমান যন্ত্র (২০০ ডিগ্রি অবধি তাপ দেখা যায় এরূপ তাপমান যন্ত্র), এই কয়েকটি সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আক্‌মাড়াই আরম্ভ করিতে হয়। চারি রোলার বেহিয়া-মিল্ সমস্ত দিবস (অর্থাৎ নয় ঘণ্টা) চালাইলে কেবল মাত্র ২৫ মণ ইক্ষু মাড়াই করিতে পারা যায়। ২৫ মণ ইক্ষু হইতে ১৫।১৬ মণ রস নির্গত হয়, এবং এই রস হইতে ২॥০ মণ আন্দাজ গুড় প্রস্তুত করিতে পারা যায়। সমস্ত দিবস উনান জ্বলিতে থাকিলে ৫ ফুট ব্যাসের কড়া হইতে চারি বারে ২॥০ মণ গুড় নামিবে, অথবা দুই খানি কড়া ব্যবহার করিলে ৬।৭ ঘণ্টায় ২॥০ মণ গুড় নামাইতে পারা যায়। ছয় ফুট ব্যাসের কড়া হইতে প্রত্যহ ৩॥০ মণ গুড় নামান যায়। লোহার কড়া অপেক্ষা মাটীর হাঁড়িতে রস জ্বাল দিলে গুড় অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হয়।

দেওয়া। মান্দ্রাজ স্কুল অব্ আর্ট্স্এ এলুমিনিয়ম্এর নাদ, এলুমিনিয়মের কড়া, এবং এলুমিনিয়মের ঝাঁজ্‌রি কিনিতে পাওয়া যায়। বৃহদায়তনে কার্য্য করিতে হইলে বেভিয়া-মিল্ ব্যবহার করাও ঠিক্ নহে। এককালীন ৮০০ বিঘা ইক্ষু লাগাইয়া দুইমাসের মধ্যে এই ইক্ষু মাড়াই করিয়া গুড় প্রস্তুত করিতে হইলে, ষ্টীম-এঞ্জিন, হরিজণ্টাল্ রোলার-মিল্, ও ভেকুয়াম্-প্যান ব্যবহার করা আবশ্যক। ষ্টীম্-এঞ্জিন কিনিতে ১৫,০০০।১৬,০০০ টাকা ব্যয় হয়। ৮০০ বিঘা ইক্ষুর আবাদের আর আর সমস্ত সরঞ্জাম কিনিতে হইলে আরও ৫,০০০।৬,০০০ টাকা ব্যয় হয়। এই সকল সরঞ্জাম বার্লিন সহরের সাঙ্গারহাউসার এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত হয়। বেভিয়া মিল্এ এককালীন ৩।৪ খানি মাত্র ইক্ষু পেষিত হইয়া থাকে। এই কলের রোলারগুলির ব্যাস ৮ বা ৯ ইঞ্চি। হরিজণ্টাল রোলার-মিলের দৈর্ঘ্য ৭ ফুট এবং প্রত্যেক রোলারের ব্যাস প্রায় ৩০ ইঞ্চি। ৪০ হস পাওয়ার এঞ্জিনে এই রোলারমিল্ চালাইতে পারিলে প্রত্যহ ৩,০০০ মণ ইক্ষু হইতে ৩০০ মণ গুড় প্রস্তুত হইতে পারে, অর্থাৎ দুই মাসের মধ্যে ৮০০ বিঘা ইক্ষু অনায়াসে মাড়াই করিয়া, উহার রস জ্বাল দিয়া উহা হইতে গুড় প্রস্তুত কার্য্য চলিতে পারে।

(ক্রমশঃ)

জাহাঁগীরের সময়ের আগরা।

আজকাল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের অনুগ্রহে, দিল্লী ও আগরার পথ অতি সুগম হইয়াছে। ভ্রমণকারীরা দৃশ্য দর্শনের জন্য আগরা দেখিতে যান, প্রবাসীরা কর্ম্মোপলক্ষে আগরায় বাস করেন। আগরার প্রতিষ্ঠাতা মহাগৌরবান্বিত সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর, ও জাহাঁগীরের আমলে এই আগরার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে অনেকেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে। সেই কৌতূহল তৃপ্তির জন্য "প্রবাসী"তে বর্ত্তমান প্রবন্ধের সূচনা। ইহা হইতে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইবে, মোগল বাদশাহদিগের সেই সময়ে আগরা, বর্ত্তমান আগরা হইতে অনেক পৃথক ছিল। সময়ের অবস্থা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই জানেন জাহাঁগীর বাদশাহ, বিলাসে নিমগ্ন থাকিলেও, রাজ্যশাসনে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে এক প্রবল শক্তি সর্ব্বদাই কার্য্য করিত। এ শক্তি আর কেহই নহেন, স্বয়ং নূরজাহা বেগম। এরূপ অসাধারণ শক্তিশালিনী রমণী ইতিহাসের পত্রপৃষ্ঠে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। নূরজাহা ও জাহাঁগীরের যুক্ত নামে যে মুদ্রা অঙ্কিত হইত, তাহার এক পৃষ্ঠে লেখা ছিল—"নূরজাহার নামসংযোগে এই স্বর্ণখণ্ডের মূল্য বৃদ্ধি হইল।" কথাটা সম্পূর্ণ প্রকৃত। যাহারা ইতিহাসের প্রকৃত নূরজাহা বেগমের চিত্র দেখিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের সহিত একমত হইবেন।

জাহাঁগীর নিজের এক খানি জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া যান। এখানি নানাবিধ অতিরঞ্জিতঘটনাপূর্ণ হইলেও, সেই সময়ের অতি উৎকৃষ্ট ইতিহাস। ইতিহাসের হিসাবে ইহা একটী বহুমূল্য পদার্থ। কোন মোগল বাদশাহই এরূপে, অসঙ্কোচে, সরলতার সহিত নিজজীবনের কাহিনী প্রস্ফুটিত করিতে পারেন নাই বা করিবার চেষ্টা মাত্র করেন নাই।

জাহাঁগীর "তুজুকে" বা তাঁহার নিজের জীবনেতিহাসে তাঁহার সময়ের অবস্থা ব্যতীত পূর্ব্বের অবস্থাও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার এক স্থলে লেখা আছে—"আফগান লোদী সম্রাটদের সময়ে আমার আগরার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা একটু বর্ণনা করিব। আফগান লোদীবংশের রাজত্বের পূর্ব্বে আগরায় একটী দুর্গ ছিল। এ দুর্গটী হিন্দুদিগের নির্ম্মিত। তথায় লোকজনও অনেক থাকিত। গজনীর মামুদ যে সময়ে আগরা আক্রমণ করেন, সেই সময়ে মাসুদ সাদ সুলেমান নামক একজন কবি আগরার অবস্থা বর্ণনা করিয়া এক কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে মামুদের যুদ্ধপ্রণালী ও বিজয়বার্ত্তা লিখিত হইয়াছিল। উল্লিখিত প্রাচীন দুর্গ সম্বন্ধে তাহাতে নিম্নলিখিত দুইটী পংক্তি আছে—

হিসারে আগ্‌রা পয়দা শুদ অজ মিয়ানে গর্দ।
বিসানে কোহ বেরো বারে ওয়ায় চুঁ পেসার॥

অর্থাৎ ধূলিবিন্দুপরিপূর্ণ মেঘরাশির নীচে, উচ্চ গৃহচূড়া-সমন্বিত জনাকীর্ণ আগরা মেঘমণ্ডিত উচ্চ পর্ব্বতের ন্যায়

তাহার পরের অবস্থা জাহাঙ্গীর উল্লেখ করেন নাই। আকবর কর্তৃক আগরার নূতন প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে তিনি তৎসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। তাহার সারাংশ এই— "আগরা হিন্দুস্থানের মধ্যে একটা প্রাচীন হিন্দুনগরী। যমুনার তীরে একটি পুরাতন হিন্দুদুর্গ ছিল। কিন্তু আমার গৌরবান্বিত পিতা সম্রাট আকবরশাহ, আমার জন্মের পূর্ব্বে ইহা ভূমিসাৎ করেন। এই স্থানে লোহিত সৈকত প্রস্তরের এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মিত হয়। এত বড় দুর্গ পৃথিবীর আর কোন স্থানেই নাই। যে সমস্ত ভ্রমণকারী পৃথিবীর নানা অংশে নানা রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও ইহার অনুরূপ দুর্গ অন্যত্র দেখিতে পান নাই। ইহা সম্পূর্ণ হইতে ১৫।১৬ বৎসর লাগে। ইহাতে চারিটি বড় তোরণ, ও দুইটা ক্ষুদ্র তোরণ আছে। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৩৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়। ইরানের প্রচলিত "তামান" নামক মুদ্রার ১১৫ হাজার, ও তুরানের "খানিস্" মুদ্রার এক ক্রোর ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। আগরা সহরটাতে এত বাড়ীঘর ছিল, যে ইরাক, খোরাসান, মাহওয়ারান্নহর নামক বিখ্যাত সহরগুলি একত্র করিলেও, সৌধ ও জন-সংখ্যায় আগরার সমকক্ষ হইত কি না সন্দেহ। আগরার পশ্চিমাংশেই বসতি খুব ঘন ছিল। এই অংশের বেড় সাত ক্রোশ, দৈর্ঘ্য দুই ক্রোশ ছিল। দ্বিতল, ত্রিতল, চতুস্তল মনোরম অট্টালিকাসমূহে আগরার চারিদিক পরিপূর্ণ ছিল। প্রকাশ্য রাজপথ, এমন কি গলিপথ-গুলিও, এত জনতাপূর্ণ ছিল যে সহজে পথিকগণ রাস্তার এক ধার হইতে অন্য ধারে যাইতে পারিত না।

আগরা এ সময়ে ঐশ্বর্য্যময় অবস্থায় শোভিত। চারিদিকে সুন্দর শোভনোদ্যান, আমীর ওমরাহদের গগনস্পর্শী প্রাসাদ, নানাবিধ পণ্যপূর্ণ বিপণী। রাজপথে অনন্ত, বিরামহীন কোলাহল সহরকে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। বাজারে বিপণীসমূহে রাশি রাশি ফল। আগরায় নিজ উৎপন্ন নানাবিধ তরমুজ, খরবুজা, আম্র প্রভৃতি প্রচুর। আমটা কিছু অধিক পরিমাণে বাজারে আসিত। আমি নিজে নানাবিধ মুখরোচক আমের আচারের পক্ষপাতী ছিলাম। মহাপরাক্রান্ত সম্রাট্ "অর্শ আশিয়ানি"* আমার পূজনীয় পিতৃদেবের সময়ে নানাবিধ "বিলায়তী" (বিদেশী) ফল আগরার বাজার পরিপূর্ণ করিত। আঙ্গুরের আমদানি অজস্র ছিল। সাহেবী (শ্বেতবর্ণ), হাব্‌শি (কৃষ্ণবর্ণ) এবং কিস্‌মিশি (কটা) বর্ণের নানাবিধ আঙ্গুর আগরার যে কোন দোকানে এই ফলের সময়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। আর একটা সুমিষ্ট রসাল ফল আগরার বাজারে বড়ই আধিপত্য বিস্তার করিত। ইহার নাম আনারস। ফিরিঙ্গী বা ফ্রাঙ্ক দিগের মুল্লুক হইতে এই ফল আমার পূর্ব্বপুরুষেরা ভারতবর্ষে আমদানী করেন। ইহার সুন্দর গন্ধ, সুমিষ্ট স্বাদ; আগরার সরকারী গুলফিশান উদ্যানে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

হিন্দুস্থানের প্রকৃতির বক্ষে পরিপুষ্ট সুগন্ধি পুষ্পবৃক্ষগুলির উপর আমার বড়ই স্নেহ ও অনুরাগ। একবার একজন উচ্চপদস্থ ওমরাহ আমার বিনানুমতিতে একটা নবপ্রস্ফুটিত বৃক্ষের পুষ্প চয়ন করিয়া আমাকেই উপহার দিতে আসিয়া-ছিলেন। আমার স্মরণ আছে আমি বৃক্ষকে স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য

করা হইত। এই জন্য—

তৈমুরলঙ্গকে— সাহেব কীরান্,
বাবরকে—ফির্দ্দৌস্ মাকানি
হুমায়ুনকে—জন্নৎ আশিয়ানি,
আকবরকে— অর্শ আশিয়ানি
জাহাঙ্গীরকে— জন্নৎ মাখানি এবং

সাহজাহানকে—ফির্দ্দৌস্ আশিয়ানি আলা হজরৎ বলা হইত।

*বাবর শাহ যমুনার তীরদেশে একটা উদ্যান ও রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। তিনি বাগানের নাম দেন "গুলফিশান;" পারসী ভাষায় ইহার নাম ছিল "চার বাগ"। বাবর শাহ বলিয়াছেন হিন্দু-স্থানে "আব-রওয়ান" বা জলপ্রণালী না থাকায়, কৃষিসম্বন্ধীয় উন্নতি আদৌ পরিলক্ষিত হইত না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমি যেখানেই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছি, সেই খানেই জলপ্রণালী ও খালের বন্দোবস্ত করিয়াছি, সুন্দর উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছি। আগরায় উপস্থিত হইবার পর যমুনার উভয় দিকের তীরভূমি পরীক্ষা করিয়া আমি একটা সুন্দর স্থান নির্ব্বাচন করি। আগরার আশে পাশের স্থান-গুলি আমার আশানুরূপ না হইলেও চেষ্টা চরিত্র দ্বারা ইহার উন্নতি করিয়া লইতে আমার বাসনা জন্মে। প্রথমত একটা সুগভীর ইঁদারা খনন করান হয়। এই ইঁদারা দ্বারা কেবল যে উদ্যানের কাজই হইত তাহা নহে, হামামখানা পর্য্যন্ত স্নানের জল যাইত। কয়েকটা দীঘিকা খনন দ্বারা উদ্যানের শোভা আরও বৃদ্ধি হয়। এই উদ্যানের মধ্যে হিন্দুদিগের প্রণালী অনুসারে কয়েকটি বারদোয়ারিও নির্ম্মিত হয়। আমি গোলাপ, নাগকেশর, বেলা, চামেলি প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্পের বড় পক্ষপাতী ছিলাম। বাগানের চারিদিকে পুষ্পবৃক্ষ রোপণ করি। হিন্দুস্থানের মৃত্তিকার রসে ফলের সুমিষ্টতা বড়ই বৃদ্ধি হয়। আমার

হইতে বঞ্চিত করার অপরাধে তাহার উপরে প্রীত না হইয়া তাহাকে লাঞ্ছনা করি। আমার বিশ্বাস হিন্দুস্থানে যত সুগন্ধি পুষ্প জন্মে এরূপ জগতের কোন স্থানেই জন্মে না। হিন্দুস্থানের বুকের উপর যে সকল পুষ্পিত তরুলতার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তুর্কিস্থানের, ইরানের শত শত উদ্যান অন্বেষণ করিলে তাহার একটিও দেখিতে পাওয়া যায় না। "চম্পা"কে আমি বড় ভাল বাসি। সর্ব্বাগ্রে আমি চম্পারই নামোল্লেখ করিব। ইহার বর্ণসমাবেশ যেমন নেত্রতৃপ্তিকর, গন্ধও সেইরূপ মোলায়েম। জাফ্‌রাণের ফুলের মত ইহার গঠনপ্রণালী, আর বর্ণ শ্বেতাভ হরিদ্রা। বৃক্ষ শাখাপ্রশাখাদি-পরিপূর্ণ, ছায়াময়। যখন ফুলের সময় হয়, তখন একটী বৃক্ষেই সমস্ত উদ্যান সুগন্ধে ভরপূর হইয়া উঠে। চম্পার পর কেওড়া। কেওড়ার ফুলের গন্ধ অতি মনোহর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী। ইহার গন্ধ মৃগনাভিকেও পরাস্ত করে।

ইহার পর "নারবেল"। ইহার সুগন্ধ অতি মনোরম। ফুলগুলির বর্ণ যেন কাশ্মীরের পর্ব্বতগাত্রে গলিত তুষারের ন্যায়। যেমন সুন্দর গন্ধ, দেখিতেও তেমনি সুন্দর। ইহার দলগুলি পরস্পরের উপর ঘনসন্নিবিষ্ট। একটী সমগ্র ফুল পূর্ণ বিকশিত হইলে তাহা নেত্র ও নাসিকার সমান তৃপ্তি সাধন করে। ইহার পর "মৌলশ্রী"। (অন্যান্য স্থানে কোথাও কোথাও আমরা "বৌলশ্রী" পড়িয়াছি।) ইহার গন্ধ অতি মিষ্ট। "সেঁউতী" ফুল কেওড়ারই মত। তবে পার্থক্যের মধ্যে এই, কেওড়ায় কণ্টক সমাবেশ আছে, সেঁউতীতে তাহা নাই। ইহা ব্যতীত বিলায়তী জেস্‌মিন নামক ফুলের গাছও বাগানে ছিল। সকল ফুল হইতেই অতি সুন্দর তৈল প্রস্তুত করা হইত। এই তৈলের সুগন্ধ যেন জীবিত অনাঘ্রাত প্রফুল্ল পুষ্পের মত।"

আগরার সৌধাবলীর সম্বন্ধে জাহাঙ্গীর বড় বেশী একটা বলেন নাই। তখন আগরার প্রধান শোভা তাজের কোন বিকাশই ছিল না। আগরার প্রকাণ্ড সৌধগুলি আদ্যোপান্ত রক্তপ্রস্তরমণ্ডিত। আগরা দুর্গও আদ্যোপান্ত রক্তপ্রস্তরে গ্রথিত। আকবর শাহ যাহা কিছু করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই রক্তপ্রস্তরের। আজও কালের স্মৃতি-বিলোপকারী নির্ম্মম হস্তের শক্তিকে ব্যর্থ করিয়া আগরার জাহাঙ্গীরের সময়ে আগরার সৌধসৌন্দর্য্য বড় কম ছিল না। জনপূর্ণ নগরী, কোলাহলময় গৃহপ্রাঙ্গণ, সঙ্গীত-কাকলীপূর্ণ অন্তঃপ্রকোষ্ঠ, অশ্বগজপদাতিপূর্ণ রাজপথ-বিহারী বাহিনীপুঞ্জ আর আমীর ওমরাহদের গগনস্পর্শী প্রাসাদ আগরার শোভাসৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত। রাজধানী হইলেই সেই কেন্দ্রে বাণিজ্যের উন্নতি অপরিহার্য্য; জাহাঙ্গীরের আগরা বাণিজ্যপ্রধান নগরী ছিল। বহুমূল্য বিচিত্র-পণ্য-সজ্জিত বিপণীগুলি দেখিয়া অনেক বিদেশীয় ভ্রমণকারী মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন।*

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

গৃহ।

গৃহের সৃষ্টিকর্ত্রী রমণী। গৃহ হইতে সমাজ এবং সমাজ হইতে জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং গার্হস্থ্য, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে রমণী আদ্যাশক্তি। গার্হস্থ্য, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে রমণী আদ্যাশক্তি? যে রমণী অবলা, যিনি পুষ্পের আঘাতে মূর্চ্ছা যান, যাঁহার দ্বারা সংসারের কোনও কঠোর ও শ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন হয় না, যিনি লতারূপিনী এবং পুরুষরূপ মহীরুহের আশ্রয় ব্যতি-রেকে এক মুহূর্ত্তও দণ্ডায়মান থাকিতে অসমর্থা, "পণ্ডিত-চূড়ামণি"রা যাঁহার আত্মাকে অপূর্ণ ও অবিকশিত বলিয়াছেন, সেই রমণী গৃহের সৃষ্টিকর্ত্রী? সেই রমণী গার্হস্থ্য, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে আদ্যাশক্তি? হাঁ, সেই রমণীই গার্হস্থ্য, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে আদ্যাশক্তি। জিজ্ঞাসা করি, গৃহ কি? গৃহ কি কেবল কতকগুলি মৃৎ-প্রস্তর-ইষ্টক-কাষ্ঠ-তৃণাদির সমষ্টি, না, আরও কিছু? গৃহ আরও কিছু বটে। গৃহ কেবল মৃৎ-প্রস্তর-ইষ্টক-কাষ্ঠ-তৃণাদির সমষ্টি নহে। ইহা ত গৃহের কঙ্কাল মাত্র। আত্মীয়স্বজনই গৃহের

---

*একজন বিদেশীয় ভ্রমণকারী জাহাঙ্গীরের আগরার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকটিত করিয়াছেন--

"Agra was a very great citie and populous, built with stone, having fair and large streets. . . . it hath a fair castle and strong entrenched about with a ditch. A great resort of merchants from Persia and out of India and very much merchandise. Not above 12 miles from Fatehpur a citie as great as

রক্তমাংস, অস্থিমজ্জা। যাহারা রমণী, তাঁহারাই গৃহের প্রাণ। যে গৃহে রমণী নাই, যে গৃহে করুণাময়ী মাতা নাই, স্নেহময়ী ভগিনী নাই, আনন্দদায়িনী কন্যা নাই এবং স্নেহ-শান্তি-করুণানন্দরূপিনী স্ত্রী নাই, সে গৃহে আর সকলই থাকুক, সে গৃহ যে গৃহ নহে, সে গৃহ যে এক অরণ্য-বিশেষ, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি, ভার্য্যা চ প্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং, যথারণ্যং তথা গৃহম্॥

অর্থাৎ, যাহার গৃহে মাতা নাই এবং প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা নাই, তাহার অরণ্যেই গমন করা উচিত। যেহেতু তাহার পক্ষে গৃহ ও যেরূপ, অরণ্য ও তদ্রূপ।

দেহ প্রাণবিমুক্ত হইলে, তাহা যেমন অসার, অশুচি ও অস্পৃশ্য হইয়া যায়, গৃহে রমণী না থাকিলে, তাহাও তদ্রূপ অবস্থা লাভ করে। রমণীর মধুর পবিত্র হাস্যজ্যোৎস্নায় যে গৃহ আলোকিত না হয়, যে গৃহের প্রাঙ্গণভূমি রমণীর কোমল অরুণচরণস্পর্শে পুষ্পময়ী হইয়া না উঠে, যে গৃহের বায়ুরাশি রমণীর পবিত্রসত্তায় পরিপূর্ণ হইয়া সৌগন্ধময় ও সুখস্পর্শ না হয়, রমণী যে গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ও বিধাত্রী নহেন, সে গৃহ আর যাহাই হউক, তাহা যে গৃহ নহে, ইহা ধ্রুব সত্য। সে গৃহ এক মহাশ্মশান মাত্র। কখনও তাহা মানবের বাসযোগ্য নহে। তাহা কেবল ভূতপ্রেত ও পিশাচেরই উপযুক্ত আবাসস্থল।

শুনুন, তত্ত্বদর্শী আর্য্য মহর্ষি জলদগম্ভীর স্বরে কি বলিতেছেন—

"গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

গৃহিণীই গৃহ। অর্থাৎ রমণীই গৃহের প্রাণ। রমণী না থাকিলে গৃহ আদৌ গৃহপদবাচ্য নহে।

কোনও ব্যক্তির সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করিলে, আমরা চলিত কথায় বলিয়া থাকি, তিনি "গৃহ-শূন্য" হইয়াছেন, অথবা তাঁহার গৃহ শূন্য হইয়াছে। স্থূলতঃ, এই দুইটি বাক্যের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে বটে, কিন্তু মূলতঃ কোনও প্রভেদ নাই। স্ত্রী মরিলে, লোকে গৃহশূন্য হয়, অথবা তাহার গৃহ শূন্য হইয়া যায়, ইহা কিরূপ কথা? স্ত্রীই নাই মরিয়াছেন, কিন্তু আর সকলে ত আছেন? পিতা আছেন, তবে গৃহ শূন্য হইল কিরূপে? প্রথম বাক্যে, গৃহের অর্থ গৃহিণী অর্থাৎ সহধর্ম্মিণী। দ্বিতীয় বাক্যে গৃহ অর্থে ঘর বুঝাইতেছে। দেখুন, রমণী যে গৃহের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে বিজড়িত এবং রমণীই যে গৃহের প্রাণ, তাহা এই দুইটি বাক্যেই কেমন সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হইতেছে।

কিন্তু, হয়ত, আপনারা বলিবেন, গৃহিণীকে গৃহ বলা একটি চলিত কথা মাত্র। চলিত কথা বটে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু চলিত কথা বলিয়াই কি, তন্মধ্যে যে মহান সত্যটি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করিতে হইবে? জগতের অনেক সত্যই ত চলিত কথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এস্থলে একটি উদাহরণ দিব। "দুহিতা" শব্দের অর্থ কন্যা। কিন্তু দুহিতা শব্দের মৌলিক অর্থ "দোহনকারিণী," অর্থাৎ যিনি গাভীর দুগ্ধ দোহন করেন। দোহনকারিণী কিরূপে কন্যায় পরিণত হইলেন, তাহা কেবল আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে, কিছুতেই বুঝিতে পারিব না। দুগ্ধ-দোহনকারিণীর সহিত আমাদের গৃহের কল্যাণাস্পদা কন্যার সম্পর্ক কি, তাহা বুঝিতে হইলে, আমাদের সেই স্মরণাতীত যুগের গার্হস্থ্য ও সামাজিক অবস্থার চিত্র মানসচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। আর্য্যেরা যখন কৃষিকার্য্য ও গোপালনে নিযুক্ত ছিলেন, গোধনই যখন তাঁহাদের ধনসম্পত্তি ছিল, তখন গাভীসকলের দুগ্ধ দোহন করিবার ভার কন্যার উপরেই অর্পিত থাকিত। এই জন্য আর্য্যেরা কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন "দুহিতা"। এক্ষণে আমাদের গার্হস্থ্যজীবনের ও সামাজিক আচার ব্যবহারের বিস্তর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। কন্যা এক্ষণে আর গাভীর দুগ্ধদোহনকার্য্যে নিযুক্তা থাকেন না বটে, কিন্তু তাহা হইলেও, "দুহিতা" শব্দে তাঁহার সেই অতীত যুগের প্রাত্যহিক অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের ইতিবৃত্তটি কেমন সুন্দর ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, দেখুন। "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" এই চলিত বাক্যটির মধ্যেও যে মানবজাতির উন্নতির ইতিহাস ও সেই উন্নতিসাধনে রমণীর মহীয়সী শক্তির পরিচয় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা আমি বিশ্বাস করি। তত্ত্বদর্শী আর্য্যগণ বুঝিয়াছিলেন যে, রমণী গৃহ হইতে অভিন্ন—সেই

তলই হউক। মৃৎ-প্রস্তর-ইষ্টক-কাষ্ঠ-তৃণাদির সমষ্টি মাত্রই গৃহ নহে। ভগবান্ রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যবাসী এবং রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াও, সীতাদেবীর সমভিব্যাহারে যথার্থ গৃহী ছিলেন। সীতাদেবী রাবণকর্ত্তৃক যে দিন অপহৃতা হন, সেই দিন হইতেই তিনি, ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণের সাহচর্য্যেও, প্রকৃত-প্রস্তাবে অরণ্যবাসী হইয়াছিলেন এবং অরণ্যবাসের যথার্থ কষ্টও অনুভব করিয়াছিলেন। আর্য্য মহর্ষিগণ, মহারণ্যের মধ্যে সামান্য পর্ণকুটীরবাসী হইয়াও, মহাভাগা ঋষিপত্নী-গণের সহবাসে, যথার্থ ও আদর্শ গৃহী ছিলেন। প্রেমময়ী স্ত্রীই গৃহের প্রাণ; স্ত্রীই গার্হস্থ্যাশ্রমের একমাত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। স্ত্রী না থাকিলে, গৃহ ও গার্হস্থ্যাশ্রমের অস্তিত্ব অসম্ভব।

রমণীর এই অদ্ভুত শক্তিসম্বন্ধে যদি এখনও কাহারও সন্দেহ থাকে, তবে তিনি একবার আমার সঙ্গে বহির্জগতে আসুন। আমি তাঁহাকে স্ত্রীজাতির এই অদ্ভুত শক্তি প্রত্যক্ষ দর্শন করাইব।

ঐ দেখুন, সম্মুখে একটি বৃক্ষ রহিয়াছে। দারুণ শীত-ঋতুর সমাগমে বৃক্ষটি পত্রপল্লবশূন্য। কিন্তু ইহার উপরে একটি পক্ষি-নীড় সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে। নীড়টি দাঁড়কাকের। কাকদম্পতি কত যত্নে ও আগ্রহে যে এই নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। নীড়ের উপরিভাগে কোনও আচ্ছাদন নাই। ঐ নীড়ে বাস করিলে, ইহারা যে রৌদ্রের উত্তাপ, বৃষ্টির ধারা কিম্বা নীহারপাত হইতে কোনওরূপে রক্ষা পাইবে, তাহার কিছু-মাত্র সম্ভাবনা নাই। আর সেরূপ উদ্দেশ্যে যে নীড়খানি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় না। যেহেতু ইহারা বৎসরের মধ্যে নয়মাসকাল কোনও প্রকার নীড় নির্ম্মাণ না করিয়াই দিনযাপন করে। তবে ঐ নীড় নির্ম্মাণের আবশ্যকতা কি? আবশ্যকতা আছে। পক্ষিণীর অণ্ড-প্রসব ও সন্তানোৎপাদনের সময় উপস্থিত; অণ্ডগুলির রক্ষা, এবং তাহা হইতে যথাসময়ে শাবক জন্মিলে, সেই পক্ষহীন অসহায় শাবকগুলিরও লালন পালনের নিমিত্ত এই নীড়ের প্রয়োজন। পক্ষিণী বিশ্বপাতার অপূর্ব্ব মায়াবলে আপনার অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং পক্ষী মহাশয়ও তাহা বুঝিতে

প্রস্তুত করিয়াছে। এই যে পক্ষিনীড় দেখিতেছি, ইহাই গৃহের অঙ্কুর। দেখুন, এই নীড়রূপ গৃহের প্রয়োজন হইল, কেবল পক্ষিণীরই জন্য। আপনারা হয়ত বলিবেন, পক্ষি-ণীর জন্য নহে, পক্ষিণীর অণ্ড ও শাবকদিগের জন্য। ধরিতে গেলে, প্রকৃত উদ্দেশ্য তাহাই বটে; কিন্তু পক্ষিণী না থাকিলে, অণ্ড ও শাবকেরই বা সম্ভাবনা কোথায় থাকিত? সুতরাং পক্ষিণীই যে নীড়ের আদি কারণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইস্থলে হয় ত কেহ কেহ বলিবেন যে, সন্তানপ্রসব ও সন্তান রক্ষার জন্য জগতের সকল জীব জন্তুই কিছু গৃহ বা কোনও রূপ আশ্রয় নির্ম্মাণ করে না। সকল জীবের মধ্যে যাহা নিয়ম নহে, তাহাকে একটি সাধারণ নিয়মের মধ্যে পরিগণিত করা অনুচিত।

আমিও তাহাই বলি। সন্তানপ্রসব ও সন্তানরক্ষার জন্য অনেক জীবজন্তু আদৌ কোনও প্রকার আশ্রয় নির্ম্মাণ করে না, তাহা সত্য বটে। কিন্তু যাহারা আশ্রয় নির্ম্মাণ করে এবং যাহারা আশ্রয় নির্ম্মাণ করে না, তাহাদের মধ্যে বিস্তর প্রভেদও আছে। উদাহরণ স্বরূপ, প্রথমতঃ গো, অশ্ব, মৃগ, মহিষ ইত্যাদির উল্লেখ করা যাউক। যে সকল গো-অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত হইয়াছে, তাহাদের কথা আমি ধরিতেছি না। যাহারা বন্য ও স্বাভাবিক অবস্থায় অরণ্যে বিচরণ করে, তাহাদের কথাই বলিতেছি। বন্য গাভী, বন্য অশ্বী বা বন্য মৃগী সন্তানসম্ভবা হইলে, কোনও আশ্রয় নির্ম্মাণ বা আশ্রয় অন্বেষণ করে না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, তাহাদের সন্তানগণের জন্য কোনও রূপ আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না। ইহাদের সন্তানেরা ভূমিষ্ঠ হইয়াই চক্ষুষ্মান চলচ্ছক্তিসম্পন্ন এবং জননীর স্তন্যপানে ও আহারান্বেষণে সমর্থ হয়। মৃগ, গো, মহিষেরা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। সুতরাং ইহাদের দল যেখানে গমন করে, বৎসেরাও সেখানে যাইতে সমর্থ হয়। বিশ্বপাতার অপূর্ব্ব কৌশলে, এই বৎসগণের পদাদি এরূপ পটু যে, ইহারা ইহা-দের জননী প্রভৃতি অপেক্ষাও অধিকতর দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে। যাহারা শৃঙ্গী, তাহাদের মধ্যে বলবানেরা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল পশুদিগকে ও বৎসদিগকে অনায়াসে রক্ষা করিতে পারে। অশ্বাদির ন্যায় যাহারা শৃঙ্গী নহে,

তাহারা নিমেষমধ্যে দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে পারে। সুতরাং এই সকল জন্তুদের বংসাদির রক্ষা বা লালনপালন জন্য যে কোনওরূপ আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

কিন্তু শ্বাপদজন্তুগণের শাবকেরা প্রসূত হইয়াই চক্ষুষ্মান্ বা দ্রুতগমনক্ষম হয় না। সিংহী, বাঘ, ভল্লুকী প্রভৃতির শাবকগণকে কিছুকাল কোনও নিভৃতস্থলে রক্ষা করা প্রয়োজনীয় হয়। এই কারণে, ইহারা গভীর অরণ্য, দুর্গম পর্ব্বত প্রভৃতিস্থলে বাস করিতে ভাল বাসে। সিংহী বাঘী প্রভৃতি সন্তানসম্ভবা হইলে, অরণ্যের মধ্যে কোনও নিভৃতস্থল, পর্ব্বতগুহা বা দুর্গম সুড়ঙ্গের অন্বেষণ করে এবং সেই স্থলে শাবকগণকে নিরাপদে রক্ষা করিয়া আহারান্বেষণে বহির্গত হয়। যে পর্য্যন্ত শাবকেরা চক্ষুষ্মান ও সমর্থ তাহাদের অনুসরণ করিতে সমর্থ না হয়, সে পর্য্যন্ত সেই পর্ব্বতগুহা, নিভৃত স্থান বা সুড়ঙ্গ প্রভৃতিই তাহাদের গৃহস্বরূপ হয়। এই স্থলেও দেখুন, সিংহী, বাঘী বা ভল্লুকীর জন্যই, অন্ততঃ কিছুকালের নিমিত্তও, গৃহের সৃষ্টি হইল।

সন্তান রক্ষা করিতে না হইলেও, হিংস্র জন্তুগণ অন্য সময়ে যে কোনও প্রকার নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় গ্রহণ না করে, তাহা নহে। কিন্তু সেরূপ আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট হওয়া না হওয়া তাহাদের সুবিধাসাপেক্ষ। সন্তান রক্ষা ও পালনের জন্য কিন্তু তাহাদিগকে আশ্রয় অবশ্যই নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়।

গৃহপালিতা মার্জ্জারী ও কুক্কুরী সন্তানসম্ভবা হইলে শাবকরক্ষার নিমিত্ত গৃহের মধ্যে নিরাপদ ও নিভৃত স্থানের কিরূপ অন্বেষণ করে, তাহা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

মসিক-সন্তানেরাও প্রসূত হইয়া চক্ষুষ্মান্ হয় না। তাহাদেরও রক্ষা এবং লালনপালনের জন্য যে নিভৃত আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়, তাহা গৃহস্থমাত্রেই অবগত আছেন। কালভুজঙ্গী অণ্ডপ্রসব করে এবং সেই অণ্ডসমূহে উত্তাপ দেওয়া প্রয়োজনীয় হয়। এই কারণে তাহারও বিবর কিম্বা কোনও নিভৃত নিরুপদ্রব স্থলের প্রয়োজন হয়। অণ্ডপ্রসবকারী সরীসৃপ মাত্রেই অণ্ডাদি রক্ষার জন্য কোন না কোন আকারে আশ্রয়নির্ম্মাণ বা আশ্রয়স্থলের অনুসন্ধান করে। ঊর্ণনাভ মাকড়সা প্রভৃতিও অণ্ডাদি রক্ষার জন্য একপ্রকার গৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা হইলে, পিপীলিকারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া এবং মুখে অণ্ড লইয়া আশ্রয়স্থলের অভিমুখে কেমন অগ্রসর হয়, তাহাও সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। বৃক্ষে এক প্রকার বৃহদাকারের বিষাক্ত পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা অণ্ডাদি রক্ষার নিমিত্ত বৃক্ষের পত্রসকল একত্র গ্রথিত করিয়া কেমন সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করে, তাহা নিশ্চিত অনেকের বিদিত আছে। বানরমহাশয়েরা "হস্তপদাদি সংযুক্ত" হইয়াও শীতে ও বৃষ্টির জলে অত্যন্ত "অবসন্ন" হন; তথাপি তাঁহারা কোনও প্রকার আশ্রয়নির্ম্মাণের চেষ্টা করেন না। বানর মহাশয়েরা বিলক্ষণ জানেন, গৃহনির্ম্মাণ করা কেন প্রয়োজনীয়। অণ্ডরক্ষা ও শাবকের লালনপালনের জন্যই পক্ষীদের নীড়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বানরদের তদ্রূপ কোনও প্রয়োজন হয় না। বানরশিশুমহাশয় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ ("বৃক্ষস্থ" বলিলেই ঠিক হইত) হইবার কিয়ৎক্ষণ পরেই শাখায় শাখায় আনন্দে লম্ফ প্রদান করেন এবং জননীর বক্ষে ও উদরে দৃঢ়লগ্ন হইয়া নানাস্থানে বিহার করিয়া বেড়ান। সুতরাং তাঁহার লালনপালনের জন্য কোনও প্রকার আশ্রয়নির্ম্মাণের আবশ্যকতা হয় না।*

উল্লিখিত দৃষ্টান্তনিচয়ের আলোচনা করিয়া, পাঠক পাঠিকাবর্গ এক্ষণে নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিতেছেন যে, অন্য সময়ে নিত্যব্যবহারের জন্য তত প্রয়োজনীয় হউক আর নাই হউক, স্ত্রীজাতি সন্তানসম্ভবা হইলে, অসহায় সন্তানগণের রক্ষা ও সুচারু লালনপালনের জন্য এবং স্থলবিশেষে অসহায়া জননীরও রক্ষার জন্য, কোনও প্রকার আশ্রয় নিতান্তই প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই আশ্রয়ই গৃহের অঙ্কুরস্বরূপ। সুতরাং স্ত্রীজাতিই যে গৃহের সৃষ্টিকর্ত্রী, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

ইতর প্রাণিগণ অসহায় সন্তানগণের রক্ষার নিমিত্ত যখন কোনও প্রকার আশ্রয়ের আবশ্যকতা অনুভব করে, তখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চৈতন্যময় মানব যে তাহার অসহায় সন্তানের ও

---

* বানরী দুর্ভাগ্যক্রমে যদি পুত্র প্রসব করে তবে কিছুদিনের জন্য তাহার নিভৃত আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। দলপতি বা "বীর" মহাশয় বড় ঈর্ষাপরায়ণ। কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্ম হইলে তিনি তাহাকে "অঙ্কুরেই" বিনষ্ট করিবার জন্য উৎসুক হন। এই কারণে, পুত্র

সন্তানের জননীর রক্ষার নিমিত্ত উপযুক্ত আশ্রয় নির্ম্মাণের আবশ্যকতা অনুভব করিবে না ইহা আদৌ সম্ভবপর নহে। মানবশিশুকে বহুকাল পর্য্যন্ত জননীর লালনপালনের উপর নির্ভর করিতে হয়। জননীকেও কিছুকাল পর্য্যন্ত শারীরিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ আশ্রয়ে থাকিতে হয়। সুতরাং মানবকে ইহাদের জন্য দীর্ঘকালস্থায়ী ও বাসোপযোগী গৃহের নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল।

আদিম অবস্থায় মানবেরা যে প্রথমে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে জানিত না, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। বৃষ্টিঝঞ্ঝা হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাহারা সময়ে সময়ে পর্ব্বত গুহাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। স্বাভাবিক পর্ব্বতগুহাই যে মানবের প্রথম গৃহ এবং ইদানীন্তন কৃত্রিম গৃহাদিরও আদর্শ, তাহা আধুনিক পণ্ডিতবর্গ স্বীকার করিয়া থাকেন। বৃষ্টিঝঞ্ঝাদির সময় ব্যতিরেকে, বিশেষ প্রয়োজন না হইলে, তাহারা প্রায়ই গুহার আশ্রয় লইত না। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া বন্য ফলমূলে কিংবা মৃগয়ালব্ধ আহারসামগ্রীদ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তাহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া এবং চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া হয়ত কোনও বৃক্ষতলেই নিশাযাপন করিত এবং রজনী প্রভাত হইলে, আবার দলবদ্ধ হইয়া বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণপূর্ব্বক পশু হননাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইত। নানাকারণে এবং অত্যন্ত সামান্য সামান্য কারণেও, একদলের সহিত অপরদলের প্রায়ই কলহবিগ্রহ উপস্থিত হইত। সেই সমস্ত কলহবিগ্রহে প্রভূত রক্তপাত এবং প্রাণনাশও হইত। বলসম্পন্না রমণী-রাও যে সেই সমস্ত বিবদমান দলের অন্তর্ভুক্ত না থাকিত, এবং কঠোর শ্রমসাধ্য মৃগয়ায় যোগদান না করিত, তাহা নহে। তবে সকলেই যে তাহা করিতে পারিত, তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। যাহারা সন্তানসম্ভবা, আসন্নপ্রসবা বা সদ্যপ্রসূতা হইত, তাহারা উদ্দাম পুরুষ-রমণীগণের সহিত মিলিত হইয়া, উদ্দাম পুরুষরমণীগণের সহিত যুদ্ধ করিতে কিম্বা কঠোর মৃগয়ায় যোগদান করিতে সমর্থা হইত না। আর যাহারা শিশু, তাহারাও এই সমস্ত শিকারী বা যোদ্ধৃ দলের সহিত মিলিত হইতে পারিত না। এই অসহায়া দুর্ব্বলা রমণী ও এই অসহায় দুর্ব্বল শিশুগণের সেই নির্দ্দিষ্ট আশ্রয়ই সেই আদিম মানবদলের গৃহস্বরূপ ছিল। যখন মৃগয়াযোগ্য পশ্বাদির অভাববশতঃ, কিম্বা অন্য কোনও কারণবশতঃ, এই মানবদলকে এক স্থল পরিত্যাগ করিয়া আর একস্থলে যাইতে হইত, তখন তাহাদের দলভুক্ত অসহায় রমণী ও দুর্ব্বল শিশু বৃদ্ধের রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রে উপযুক্ত আশ্রয়স্থানের অনুসন্ধান করা যে তাহাদের পক্ষে একটি সর্ব্বপ্রধান ও অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই আশ্রয়স্থল স্থিরীকৃত হইলে পর, তাহারা যুদ্ধবিগ্রহমৃগয়াদি নিত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিত।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রধানতঃ রমণীর জন্যই গৃহের প্রয়োজন। অতএব রমণীই যে গৃহের সৃষ্টিকর্ত্রী তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি ?

কিন্তু হায়, রমণি, তুমি কি করিলে ? গৃহের সৃষ্টি করিতে গিয়া, তুমি চিরদিনের জন্য পরের অধীন হইয়া পড়িলে ? যদি তোমাকে গর্ভধারণ ও সন্তান পালন করিতে না হইত এবং প্রসবজন্য দৌর্ব্বল্যের ও সন্তানস্নেহের বশ-বর্ত্তিনী হইয়া কোনও নিরাপদ আশ্রয়স্থলের আকাঙ্ক্ষিণী হইতে না হইত, তাহা হইলে, রমণি, আজ আর কেহ তোমাকে পরাধীন বলিতে পারিত না, আজ আর তোমাকে নিজ অদৃষ্টের নিন্দা করিতে হইত না এবং ভ্রাতার সহিত একই মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাকে তত্তুল্য সমান অধিকার লাভে বঞ্চিত হইতে হইত না। আজ তুমি সেই পশুবৎ উদ্দাম মানবদলের সহিত সমানভাবে মিলিত থাকিয়া মহারণ্যমধ্যে মৃগয়াকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে পারিতে, অহর্নিশ দ্বন্দ্বকলহশোণিতপাতে লিপ্ত থাকিয়া "পরমানন্দ" লাভ করিতে পারিতে এবং "স্বাধীনতা"র উন্মুক্তবাতাসে ভ্রমণ করিয়া আপনার জীবনকে ধন্য করিতে পারিতে। তুমি এই সমস্ত "অমূল্য" অধিকার লাভ করিতে পারিতে বটে, কিন্তু পৃথিবীকে এরূপ সুন্দর ও সুখময় স্থানে পরিণত করিতে পারিতে না; তুমি উদ্দাম মানবরূপী পশুর পশুত্ব মোচন করিতে পারিতে না; তাহাকে আত্মসংযম, পরার্থ-পরতা, দয়া ও ধর্ম্মের শিক্ষা দিতে পারিতে না এবং তাহাকে উন্নতির পথে ধাবমান করিতে পারিতে না। তোমার

নগর, নগর হইতে রাজ্য এবং রাজ্য হইতে সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। তুমি, তোমার ভর্ত্তা ও তোমার সন্তানসন্ততি, এই সমস্ত লইয়া একটি পরিবার গঠিত হইয়াছে। একটি পরিবার হইতে অনেকগুলি পরিবারের উৎপত্তি এবং অনেকগুলি পরিবারের সমষ্টিতে একটি গোত্রের উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ অনেকগুলি গোত্রের সমষ্টিতে একটি সমাজ বা জাতির সম্মিলনে একটি মহাজাতি হইয়াছে। তোমাকে এবং তোমার সন্তানসন্ততিবর্গকে নিরাপদে রক্ষা করিবার নিমিত্তই, উদ্দাম মানব অপরকে এবং অপরের সন্তানসন্ততিবর্গকেও নিরাপদে রাখিতে উৎসুক হইয়াছে এবং তোমার সুখসম্পাদনার্থ অপরেরও সুখসম্পাদন করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইরূপে তুমি উদ্দাম মানবকে বশীভূত করিয়াছ। তাহার পশুত্ব মোচন করিয়াছ, তাহাকে সংযমী করিয়াছ, তাহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়াছ এবং তাহাকে ব্রহ্মরূপ পরমানন্দলাভের অধিকারী করিয়াছ। তাই বলিতেছিলাম, রমণি, তুমি মানবীরূপে এক মহতী দেবতা এবং মানবের গার্হস্থ্য, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে আদ্যাশক্তি। তোমার মহিমা যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন। তুমি পরাধীন হইয়াছ বলিয়া ক্ষুব্ধ হইও না। তোমার পরাধীনতায় তোমার মহান জয়লাভ ঘটিয়াছে। তুমি গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ও সংসারের রাজ্ঞীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। তোমার মহতী শক্তি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত এবং সমগ্র সংসার ভক্তিবিনম্রচিত্তে আজ তোমার পদানত। তুমি মানবজাতির জননী এবং তুমি সকলেরই পূজার্হা। আর্য্য মহর্ষিগণ তোমার এই অতুল গৌরব হৃদয়ঙ্গম করিয়াই ভাববিহ্বলচিত্তে এইরূপ তোমার গুণগান করিয়াছেন—

> নারী হি জননী পুংসাং নারী শ্রীরুচ্যতে বুধৈঃ।
> তস্মাদেবোহে গৃহস্থানাং নারীপূজা গরীয়সী॥
> যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
> যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
> অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
> ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ॥ ইত্যাদি।

এই তোমার পদ, এই তোমার গৌরব, এই তোমার শক্তি। অতএব তুমি তোমার এই পদ, গৌরব ও শক্তি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া স্বকর্ত্তব্য সাধনে অগ্রসর হও এবং সংসারকে স্বর্গধামে পরিণত কর। তোমার উন্নতিতে জগৎ উন্নত, তোমার পবিত্রতায় জগৎ পবিত্রীভূত এবং তোমার মহিমায় জগৎ মহিমান্বিত হইবে। হে মানবগৃহের অধিষ্ঠাত্রি দেবি, তুমি উত্থান কর, জাগরিত হও এবং আত্মজ্ঞান লাভ কর, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

২৯শে পৌষ, ১৩০৭।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

প্রবাসীর জীবনসঙ্গীত।

১

—তবে কি জীবন, এমনি করিয়া,
নিরাশ বিফল হবে ?
চিরদিন, হায় ! বুক বিদরিয়া,
শোকের নিশ্বাস ব'বে ?
শুধই স্বপনে, শুধু কল্পনায়,
আকাশকুসুম সম,
আপনা আপনি মিলাইবে, হায় !
সাধের জীবন মম ?
তবে কি নারিব দিয়া প্রাণমন
সেবিতে জনম-ভূমি ?
যাবে কি চলিয়া জনম মতন,
হে চির-আদর্শ ! তুমি ?

২

কালসিন্ধুতীর আসিছে নিকটে,
উর্ম্মিরোল শোনা যায় ;
জীবনের তরি লাগিবে না তটে,
ভাঁটায় নামিয়া ধায় !
—তবে কি বিদায়, এ জনম-তরে,
সকল জীবন সাধে ?
হায় ! কত কাজ জগৎ ভিতরে ;
ফেলে যেতে প্রাণ কাঁদে !
কত সাধ ছিল, মানুষ হ'বার,
মানুষ করিতে সবে ;
কিছুই হ'ল না,— বুঝি এই বার,

৩

জলবিম্ব সম, ভেসে উঠেছিনু,
মিশিব বুদ্বুদ-প্রায় ;
কে-ই বা জানিবে, প্রাণ দিয়েছিনু
মনে-মনে বিশ্ব-পা'য় !
আমার ভগন আশার সমাধি,
আমারি চিতার সনে,
লুপ্ত হ'য়ে যাবে, —তার অস্থ-অ দি
খুঁজিবে না কোন জনে !
তা'তে ক্ষোভ কেন ? নিষ্ফল প্রীতির
স্মৃতি কেন র'বে, হায় ?
বিজনে, মানসে, লীলা যে নীতির,
চিতেই সে লয় পায় ।

৪

তবু, তবু, হায় ! পরাণ ভেদিয়া,
উঠে মর্ম্ম-কাতরতা ;
তবু ইচ্ছা হয়, মরণে খেদিয়া,
জানাই জগতে ব্যথা ।
এ ক্ষীণ অঙ্গুলে, ছিন্ন বীণা তার
যেমন তেমনে বাঁধি ;
সাধ যায় তবু বারেক আমার
জীবন-সঙ্গীত সাধি !
বেদনা-ঝঙ্কারে, দিই জাগাইয়া
জগতের ভাইবোনে ;
বুঝাই আভাসে, দেশের লাগিয়া,
কত সেবা ছিল মনে !

৫

কথার মমতা, শূন্য বাচালতা,
কি হবে সে ধ্বনি ল'য়ে ?
প্রাণের সঙ্গীত, অন্তরের ব্যথা,
অন্তরেই যা'ক্ ব'য়ে ।
বাহির হইতে, পশিয়া ভিতরে,
দেখুক সবাই চাই,
কত দীনতার অবসাদ ভরে
কত স্বার্থ-সুখে আছে সবে রত,
বাহিরের দেহ লয়ে ।
নীরব সঙ্গতে চকিতের মত,
দেখুক সজাগ হ'য়ে !

৬

হায় ! এ সঙ্গীতে পারিবে কি দিতে
মৃত জনে নব প্রাণ ;
শিলা তরুলতা অর্ফিউস-গীতে
হ'ত যথা জীবমান !
এ যে বিলাসীর আরামের দেশ,
আবেশে বিভল সবে ;
'কমল বিলাসী', আয়াসের লেশ
জাগাতেও কেন লবে ?
আপনার সুখ, নিন্দা অপরের,
ভায়ে ভায়ে মনোবাদ ;
রমণী-অঞ্চল সম্বল ঘরের ;
এ নিয়ে পূরাবে সাধ !

৭

বিশ্বহিত লাগি কে সঁপিবে প্রাণ,
কে ল'বে জীবন-ব্রত ?
কে উঠিবে জাগি ? কে গাহিবে গান
—এ তিমিরে, আশা-রত ?
ধনমান যশঃ নারীপ্রেম-সুধা,
কে পারিবে তেয়াগিতে ?
সহি' শতক্লেশ, বহি, তৃষা ক্ষুধা,
কে রহিবে জীব-হিতে ?
বিভুনামে রুচি, বিশ্বজীবে দয়া,
হ'য়েছে কথার কথা ;
কে আবার দিয়ে সেবা বিশ্বজয়া,
প্রচারিবে সে বারতা ?

৮

নাহি প্রাণে তেজ, মনে নাই বল,
বীণায় নাহিক তান ;
এ ক্ষীণ প্রয়াস, নিয়ত নিষ্ফল,—

আমি যাহা চাই, নারিব বুঝাতে,
বুঝিতে নারিনু ভালো !
শুধু আনমনে, নিরজন রাতে
দেখেছিনু ক্ষীণ আলো !
দেহ ভেঙ্গে আসে, অবসন্ন মন,
পড়িয়া রহিল কাজ !
আদর্শ আমার, হ'ল না সাধন,
চলিনু,—বিদায় আজ !

৯

অতীতের স্তর রহিল তেমন ;—
সত্য-রত্ন-আবিষ্কার
রহিল পড়িয়া ; শুধুই নয়ন
দেখে গেল খনি তা'র !
শিল্প-কলা জ্ঞান- সাধনার, আর
হ'ল নাকো অবসর ;
দারিদ্র্য, হীনতা, দুঃখ ঘুচা'বার,
দিন গেল অতঃপর !
কবিতায় গাঁথি আদর্শ প্রাণের
রাখিব স্বজন-মাঝে ;
ঘুচিল সে সাধ ! না হ'ল গানের
সফলতা কোন কাজে।

১০

কিছুই হ'ল না ! হ'বে না কিছুই,
ভগ্নতনু মন নিয়ে !
ভাবনাই সার ; কল্পনায় ছুঁই
বিশ্বপ্রাণ প্রাণ দিয়ে !
হে বিশ্বদেবতা ! ফলহীন সেবা
বল, কি হে গ্রাহ্য হ'বে ?
কে বুঝাবে তত্ত্ব ? শান্তি দিবে কেবা,
কোথা, দেব ! যাই তবে ?
যে আকাঙ্ক্ষা দিয়ে এ প্রাণ গঠিয়ে,
ধরায় পাঠায়েছিলে ,
না জানি কেন বা, ভেঙ্গে সব দিয়ে,
শূন্য হাতে ডেকে নিলে।

জাপানপ্রবাসীর পত্র।

"প্রবাসী" নাম দেখিবামাত্র প্রবাসীদের মনে কিছু না কিছু লিখিবার ইচ্ছা হইবার কথা। ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ও সঞ্জীবনীতে প্রবাসীর সূচনা পাঠ করিবামাত্র কিছু লিখিতে বলবতী ইচ্ছার উদ্রেক হইয়াছিল। এত দিন পরে আজ তাহাই কার্য্যে পরিণত হইতেছে।

বাল্যকালে কবির কবিতা পাঠে "অসভ্য জাপান" এই যে এক ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল, তাহা সহজে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এখানে আসিবার পূর্ব্বের ত কোন কথাই নাই, এমন কি এখানে আসিবার পরেও এই ধারণা সুস্পষ্টভাবে বর্ত্তমান ছিল। এখন পাঠকপাঠিকাদের অনেকেই হয় ত জাপানকে আর অসভ্য বলেন না ; কারণ সেই চীন-জাপানের যুদ্ধ অনেকেই ভুলেন নাই। আবার এই বৎসরের চীন উৎপাতে জাপান কিরূপ কার্য্য করিয়াছে, তাহা হয় ত এখনও সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছেন ; সর্ব্বশেষে সে দিন যে প্রবলপরাক্রান্ত রুসরাজ কেবলমাত্র ক্ষুদ্র জাপানের দৃঢ় প্রতিবাদে গুপ্তসন্ধিতে মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ অধিকারাশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহা বোধ হয় সকলের মনে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। প্রথম প্রতিবাদে রুসরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর পাঠাইলেন, "রুশিয়া-চীনে সন্ধি ; রুশিয়া তৃতীয় শক্তির সঙ্গে তর্ক করিতে রাজি নন।" জাপান কি করিলেন ? গোপনে যুদ্ধের সব আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, অধিকতর দৃঢ় প্রতিবাদ রুশিয়ার নিকট প্রেরণ করিলেন। রুসরাজ আর উপেক্ষা করিতে সাহস করিলেন না ;—সকলেই বিদিত আছেন রুসরাজ গুপ্তসন্ধি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহা পড়িয়া অনেকে হয় ত মনে করিবেন, যে আমি পশুশক্তির পরিমাণ অনুসারে সভ্যতার তারতম্যের বিচার করি, কিন্তু আমি সে দলের লোক নহি। আমি স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে বলি যদ্দ্বারা পৃথিবী নরশোণিতে কলঙ্কিত হয়, চীনেই হউক, আর দক্ষিণ আফ্রিকাতে বা মানিলাতেই হউক, তাহা সভ্যতার পরিচায়ক নহে। সন্তপ্ত হৃদয়ে বলিতে হয়, মানবজাতি এখনও সভ্যতার উচ্চসোপানে আরোহণ করে নাই। যত দিন পর্য্যন্ত

হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত প্রকৃত সভ্যতা বহুদূরে, মানবসমাজ স্বর্গরাজ্য হইতে বহু দূরে! তবুও বর্ত্তমান সভ্যতার তারতম্যের বিচার করিবার কতক উপায় রহিয়াছে। বেশী দূরে যাইতে চাহি না, এই বর্ত্তমান চীন উৎপাত হইতেই, সভ্যতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। পাঠকপাঠিকাগণ হয় ত চীনদের উপর তথাকথিত সুসভ্য জাতিদের অত্যাচার-কাহিনী শুনিয়া হতাশ হইয়াছেন, যাহারা আপনাদিগকে যীশুর শিষ্য বলে, তাহাদের পশুভাব দেখিয়া ক্ষুণ্ণমনে জগদীশের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। যুদ্ধে যে অনেক চীনবাসীকে বধ করা হইয়াছে সে বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি না; তাহা কেবল সাধারণ মানবজাতির অসভ্যতার পরিচায়ক। কিন্তু শিশুহত্যা, বালকবালিকার প্রাণহরণ, নির্দ্দোষী নিরুপায় নরনারী হত্যার কি করিয়া সমর্থন করিব? নরহত্যা চুরি ডাকাতি অগ্নিকাণ্ড, এই সব আর কি বর্ণনা করিব? বর্ণনা পাঠ করিতে শোকে ক্রোধে দেহ মন জর্জ্জরিত হয়। সভ্য নামে পরিচিত, যীশুশিষ্য নামধারী নরপিশাচগণ নরপশুগণ স্ত্রীলোকের শেষ লজ্জা পর্য্যন্ত বলপূর্ব্বক হরণ করিতে বিরত হয় নাই। এই সব পাঠ করিলে কোন্ মানব অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারে? এই কি সভ্যতা? এই কি ধর্ম্ম? এই কি শিক্ষা? এই সকল কার্য্যেও পশ্চিমের সুসভ্য ফ্রান্স, রুশিয়া, জর্ম্মানী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণার পাত্র; ইহারা পশুভাব যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছে; কুকার্য্যে ধরণী কলুষিত করিয়াছে। এই সব কুকার্য্যের বর্ণনা পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, জাপান অতি উন্নত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অসভ্য প্রাচ্যজাতি সুসভ্য পাশ্চাত্যজাতিসমূহের আদর্শস্থান অধিকার করিয়াছে। আমি বলি না যে জাপানী সৈন্য কোনও অত্যাচার করে নাই। কিন্তু তুলনা কর, জাপানের প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাইবে। অনেক স্থলে জাপানী সৈন্যগণ চীনবাসিদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়াছে।

যাহা হউক, চীনের যুদ্ধ বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে; কথাপ্রসঙ্গে অনেক বলিয়া ফেলিলাম! এক্ষণে সকলেরই বিশ্বাস, যে গত ত্রিশ বৎসরে জাপান তাহার বর্ত্তমান পরিক্রমান সমুদয় উন্নতি করিয়াছে; পাশ্চাত্য সভ্যতা ইহার এই যে, আমরা পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজশক্তির সংশ্রবে থাকিয়াও কেন এত উন্নতি লাভ করিতে পারিতেছি না? জাপানের যেমন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ যুদ্ধ-জাহাজ আছে, আমাদের সেইরূপ যুদ্ধ-জাহাজ নাই কেন, সে বিষয়ে আমি কিছু বলিতেছি না। কারণ ইংরেজরাজ আমাদের জন্য সব করিতেছেন। তবে জিজ্ঞাসা করি, সভ্যতাভিমানী ভারতবাসি, তোমাদের মধ্যে একতা নাই কেন? আজ নহে, বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই নাই। ইহা কি সভ্যতার লক্ষণ? কবির "অসভ্য জাপানে" প্রাচীন কাল হইতেই ইহা আছে, তাই জাপান স্বাধীন, তাই ক্ষুদ্র জাপান বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া ভারতের ন্যায় পরাধীন নহে। মুসলমানের অধীনতা স্বীকারের ইতিহাস পাঠ কর, দেখিবে ভারতে একতার অভাবই পরাধীনতার একমাত্র কারণ। তাহা আজকাল দৈনিককার্য্যে যথেষ্ট দেখিতে পাই। আত্মীয় স্বজনে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, এমন কি পিতাপুত্রে বিবাদ করিয়া, আদালতে গিয়া, অপব্যয় করিয়া অনেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। এই কি সভ্যতা? এই কি পুরাতন আর্য্যজাতি? এই কি সেই চীন ও গ্রীক ভ্রমণকারীদের ভারতবাসী?

জাপানী অতিশয় শান্তিপ্রিয়! ইহাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি ইহারা তর্কস্থলেও উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে না। অবশ্য এখানেও আদালত আছে, মোকদ্দমা আছে, কিন্তু তথাপি বলিতেছি, জাপানীরা অতীব শান্তিপ্রিয়। বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে যাহাদের বাড়ী, তাঁহাদের অনেকেই হয় ত মেয়েদের ঝগড়া দেখিয়া থাকিবেন। সেই সিংহী-গর্জ্জন এ জীবনে ভুলিবার কথা নহে! পুরুষদেরত কথাই নাই। বালকদের মধ্যে ক্রীড়ার সময় যে সামান্য বিবাদের সূত্রপাত হয়, তাহা হইতে কি তুমুল সর্ব্বদিনব্যাপী ঝগড়ার সূত্রপাতই না হয়। এই বিবাদে দুই পক্ষের সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত ভূতলে আনীত হন। কোন্ ভদ্রলোকের সাধ্য যে সেই সুশ্রাব্য মধুর বাণী শ্রবণ করিতে পারে? কই, জাপানের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বহু সহস্র মাইল ভ্রমণ করিলাম, প্রধান মন্ত্রী হইতে খনির সামান্য কুলীদের সঙ্গে অনেক মিশামিশি হইল, কিন্তু সেই বাল্যস্মৃতির ঝগড়ার

হইল না। কুবাক্যের ত কোন কথাই নাই। ভারতের বিষয় সকলেই বিদিত; আদালত হইতে সামান্য মুটে মজুরের কথা পাঠকপাঠিকাগণ ভালরূপ জ্ঞাত আছেন। কিন্তু শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, এখানে এ পর্য্যন্ত "বাকা" অর্থাৎ বোকা ভিন্ন কাহাকেও অন্য কোন গালি দিতে শুনি নাই। এমন কি নীচ লোকের বালক বালিকারাও 'বাকা' ভিন্ন অন্য গালি দেয় না। কোন কোন সময়ে "নিকুরাশি" (abominable) "ঘৃণার পাত্র" বলিয়া গালি দিতে শুনিয়াছি। ভারতের অশ্লীল গালি, যাহা ভদ্রলোকে উচ্চারণ করিতে পারে না, শুনিলে কর্ণে হাত দিতে হয়, তার সঙ্গে বাকা ও নিকুরাশি এই দুই গালির তুলনা কর। এই কি প্রাচীন সভ্যতা, আর এই কি "অসভ্য জাপান"? আমার এই বর্ণনা জাপানের যে স্থানে পাশ্চাত্য সভ্যতা তিলমাত্রও প্রবেশ করে নাই, তথাকার পক্ষেও সত্য; ইহা পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল নহে; প্রাচীনকাল হইতেই জাপানের এই অবস্থা।

একতা অতি প্রাচীন কাল হইতে এখানে বিদ্যমান, তাই জাপানীরা স্বাধীন। জাপানের ন্যায় রাজভক্ত দেশ পৃথিবীতে বোধ হয় দ্বিতীয় নাই। এখানকার লোকেরা রাজাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করে। তাহাদের বিশ্বাস আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সমাট জিম্মো স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন এবং সমস্ত জাপানী তাঁহারই সন্তান সন্ততি। এই আড়াই হাজার বৎসর একই রাজবংশ রাজত্ব করিতেছে। এরূপ দৃষ্টান্তও পৃথিবীর কোন ইতিহাসে পাওয়া যাইবে কি? সমুদয় জাপানী সম্রাটের পতাকার নীচে একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়াছে: তাই ইহারা দেশের জন্য প্রাণ দিতে ভয় করে না, তাই ক্ষুদ্র জাপানকে প্রবল পরাক্রান্ত রুশিয়াও ভয় করে। যে কোন জাতীয় উৎসবের দিনে সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে গৃহে গৃহে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত জাতীয় পতাকা, সূর্য্য-পতাকা, উড্ডীয়মান দেখিতে পাইবে। ইহাতে কি একতা প্রকাশ পায় না? কই ভারতে এইরূপ দৃশ্য ত কখনও দেখি নাই। কখনও এরূপ ছিল কি? একতা ভিন্ন উন্নতির আশা কোথায়? সুসভ্য ইংরাজের সংশ্রবে থাকিয়াও বাঙ্গালা দেশে কয়টা কোম্পানী বা বণিক্‌গোষ্ঠী আছে? দরিদ্র জাপানী একাকী বাণিজ্য করিতে শত শত লোক একত্র হইয়া শত শত কারবার আরম্ভ করিল। একতা তাহাদিগের স্বভাব, তাই গ্রামে গ্রামে কোম্পানী দেখিতে পাওয়া যায়। অসভ্য জাতি এক দিনে সভ্য হইতে পারে না। তাহাদের মধ্যে এই সব গুণ ছিল যাহা সভ্যতাভিমানীদের মধ্যে নাই; তাই তাহারা উন্নত হইতে উন্নততর সোপানে আরোহণ করিবে। ভারতবাসি! স্বদেশের উন্নতির জন্য এক হও, দেখিবে দশ বৎসরে কত কি করিতে পার। দেখ, তোমাদের কত সুবিধা। শান্তির জন্য কোন চিন্তা করিতে হইবেক না, ব্রিটিশরাজ সব করিতেছেন। ধর্ম্মের জন্য, সমাজের জন্য, অর্থের জন্য এক হও, দেখ, ভারতেও উন্নতি হয় কি না। ভারতে অর্থের অভাব নাই; ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিরক্ষার জন্য এক কোটী টাকা আদায় হইলে, শিল্পশিক্ষার জন্য কয়েক কোটী আদায় হয় না? একতা নাই, তাই ভারতে লক্ষ লক্ষ লোকে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। বেশী নয়, দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একশত যুবককে নানা শিল্পে শিক্ষিত করিয়া ব্যবসায়ে নিযুক্ত কর, দেখি দেশের অবস্থা ফিরে কি না। কেবল কথাতে হইবে না, কার্য্যে দেখাইতে হইবে। তবে সভ্য বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। বাঙ্গালীরা খুব বকিতে পারে, খুব লম্বা লম্বা তেজস্বী বক্তৃতা করিতে পারে, কিন্তু কার্য্যে সর্ব্বপশ্চাতে। শিল্প বাণিজ্য ভিন্ন দেশের উন্নতির আশা বৃথা; বেশী চাইনা, যদি দেশের ধন দেশে রাখিতে পার, তবেই যথেষ্ট; যদি পশ্চিমাভিমুখী অর্থনদীর প্রবল স্রোত রোধ করিতে পার, কৃতার্থ মনে করিও। বাঙ্গালী পঞ্জাবীকে পর ভাবে, বোম্বেবাসী মান্দ্রাজীকে পরদেশবাসী বলিয়া মনে করিতেছে, এই ত ভারতের একতা! এ অবস্থায় উন্নতি সুদূরপরাহত। স্বদেশপ্রেম নাই, লোকে সংকীর্ণতায় পূর্ণ; আমার স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই জানি না। কই ভারতে ত অনেক রকমের ধুতী তৈয়ারী হয়, কিন্তু কয়টি বাঙ্গালী বাবু দেশী ধুতি ব্যবহার করেন? সাধারণ লোকের কথা ছাড়িয়া দিলাম—কয়জন শিক্ষিত লোক দেশীধুতি ব্যবহার করেন? যদি উন্নতি চাও, স্বদেশপ্রেমিক হও। ডসনের জুতা না হইলে কি সাহেব সাজা চলে না? ভারতে কি জুতাও তৈয়ারী হয় না? বোম্বে যাও, দেখিতে পাইবে, অনেকেই দেশীধুতী ভিন্ন বিলাতী

কর, যতদূর সম্ভব দেশী দ্রব্য পাইলে বিলাতী জিনিষ ব্যবহার করিব না এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশে বাণিজ্যশিল্পাদির প্রচলন চেষ্টা কর, দেখি ত্রিশবৎসরে ভারতের অবস্থা ফিরে কিনা। একতা চাই, একতাই সর্ব্বোন্নতির মূল। বাঙ্গালার দুর্দ্দশা দেখ, মহারাণীর স্মৃতিরক্ষার জন্য যত সভা হইয়াছে, সকল স্থানেই শিল্পশিক্ষার্থ অর্থ ব্যয় করিবার জন্য প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালার কোথাও এইরূপ হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। পঞ্জাবে আজ যাহা কিছু হইতেছে, তাহাতেই অর্থকরীবিদ্যা সংযুক্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমি বলি না যে সকল ছাত্রই এখানে আসিতে চেষ্টা করিবে। আমেরিকা, জর্ম্মানী, ফ্রান্স ও সর্ব্বশেষে ইংলণ্ড যাইতে চেষ্টা কর। আমেরিকার ভাষা ইংরাজী, তাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধার কথা। যদি কোথাও যাইতে না পার, জাপানে আইস; স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া অপমানবহুল কোন চাকরী ব্যতিরেকে দুপয়সা উপার্জ্জন করিয়া পরিবার পালন করিতে পারিবে।

শ্রীরমাকান্ত রায়।

বঙ্গের বাহিরে বঙ্গসাহিত্য।

[বঙ্গদেশের বাহিরে বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, আমরা ক্রমে ক্রমে অতিসংক্ষেপে তৎসমুদায়ের বৃত্তান্ত মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা করি। প্রবাসী বাঙ্গালীর রচিত বা সম্পাদিত পুস্তক বা পত্রিকার নামও আমরা প্রকাশিত করিতে চাই। বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা, পঞ্জাব, মধ্যভারতবর্ষ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, ব্রহ্মদেশ, এবং দেশীয় স্বাধীন, করদ ও মিত্র রাজ্য হইতে অতিসংক্ষেপে লাইব্রেরী প্রভৃতির বৃত্তান্ত পাইলে আমরা অনুগৃহীত হইব। সম্পাদক।]

আগ্রা—আগ্রায় প্রায় ৮০০ শত বাঙ্গালীর বাস। এখানে আগ্রা বাঙ্গালালাইব্রেরী নামে একটি সাধারণ পুস্তকাগার ও পাঠাগার আছে। ১৮৭৮ সালে স্থানীয় পদস্থ বাঙ্গালীগণের দ্বারা ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র সান্ন্যাল, রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় অবিনাশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মিত্রের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় কৃতবিদ্যব্যক্তিগণের এবং পুস্তকালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। পরে যে কারণেই হউক ১৮৮৭ সালে লাইব্রেরী এককালে বন্ধ হইয়া যায়। লাইব্রেরীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় অগত্যা ইহাকে মিউনিসিপাল আফিসগৃহে স্থানান্তরিত করেন। একাদশ বর্ষকাল আগ্রা বাঙ্গালালাইব্রেরীর আর নাম শুনা যায় নাই। ১৮৯৮ সালে ইহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মিত্র এবং আগ্রা সেণ্টজনস্ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ, প্রমথ কতিপয় বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি আগ্রার কালীবাড়ীতে উঠাইয়া আনিয়া লাইব্রেরীকে পুনর্জ্জীবিত করেন। তদবধি ইহা বেশ শৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে। এক্ষণে ৫০।৬০ জন গ্রাহক হইয়াছেন। ইঁহারা বাঙ্গালা পুস্তক ও পত্রিকাদি নিয়মিত পাঠ করেন। কেহ কেহ বাঙ্গালা সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদিও লিখিয়া থাকেন। গত বর্ষে ইহাতে ১০২০ খণ্ড পুস্তক ছিল। এক্ষণে নূতন পুস্তক অনেক ক্রীত হইয়াছে। লাইব্রেরীর মাসিক আয় ১২ টাকা, ব্যয়ও প্রায় তদনুরূপ। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক অল্পই আছে। অভিধানের নিতান্ত অভাব। স্থানীয় ভদ্রমণ্ডলী লাইব্রেরীকে অনেক ভাল ভাল বাঙ্গালা গ্রন্থ উপহার দিয়া ইহার কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন এবং আগ্রহের সহিত অর্থসাহায্য করিয়াছেন। এই লাইব্রেরীর সংশ্লিষ্ট "আগ্রা বঙ্গসাহিত্যসমিতি" নামে একটি সাহিত্যসমাজ আছে; উহা বারাণসী এবং এলাহাবাদস্থ ইংরাজী-বাঙ্গালা স্কুল ও বালিকাবিদ্যালয়ের ন্যায় বালকবালিকাগণকে মাতৃভাষা শিক্ষা দিয়া থাকে। বাঙ্গালীর ছেলেকে প্রকৃত বাঙ্গালী করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। আগ্রা বঙ্গসাহিত্যসমিতি বঙ্গসন্তানগণের মাতৃভাষা শিক্ষার যেরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসমিতির অনুকরণীয়। সমিতি বর্ষে বর্ষে পঞ্চাশ ষাট জন বালক বালিকার বাঙ্গালা রচনা, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পাঠ এবং পদ্যাবৃত্তির পরীক্ষা করিয়া থাকেন এবং শ্রেণীবিভাগমত পাঠ্যপুস্তক, পরীক্ষার স্থান ও সময় প্রভৃতি পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্ধারণ করিয়া দেন। কে কোন্ শ্রেণীতে পরীক্ষা দিবে, ছাত্র বা ছাত্রীকে তাহা আবেদনপত্রে লিখিয়া দিতে হয়। আগ্রা এবং টুণ্ডলাবাসী সকল বালক ও বালিকা

বালিকাগণ পরীক্ষা দিতে পারেন না। স্থানীয় "ভিক্টোরিয়া-হাইস্কুলে" বালকদের এবং জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে বালিকাদিগের পরীক্ষা গৃহীত হয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ বালক-বালিকাগণের মধ্যে রৌপ্যপদক ও পুস্তকাদি পারিতোষিক প্রদত্ত হয়। গত বর্ষে এই সমিতি হইতে ৪টি রৌপ্যপদক এবং মূল্যবান্ পুস্তকাদি বিতরিত হইয়াছিল। জনৈক শিক্ষিতা বঙ্গমহিলা এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ., লিখিয়াছেন, তাঁহার কতিপয় বন্ধুবান্ধবের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের ফলেই যে কেবল লাইব্রেরী ও সমিতি আশানুরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা নহে। এই সুফল আগ্রানিবাসী সমগ্র বাঙ্গালীর সমবেত সহানুভূতি-প্রসূত। স্থানীয় বাঙ্গালীসাধারণের সাহায্য না পাইলে সমিতি কখনই কৃতকার্য্য হইত না।

লক্ষ্ণৌ—১৮৯১ সালের আদম সুমারি অনুসারে এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা ১২০১; এক্ষণে প্রায় ১৫০০। এখানে "Bengali Young Men's Association" নামে যুবক সমাজ আছে। যুবকসমাজ বলিয়া উহা কেবল তরুণ-বয়স্কগণের দ্বারা গঠিত এবং পরিচালিত নহে। বাঙ্গালী যুবকগণের শারীরিক এবং মানসিক উন্নতির জন্য শিক্ষিত যুবক এবং স্থানীয় গণ্যমান্য প্রবীণ ব্যক্তিগণের দ্বারা গঠিত, পুষ্ট এবং পরিচালিত। ১৩।১৪ বৎসর পূর্ব্বে এখানে "Bengali Cricket Club" নামে একটি ক্রীড়াসমিতি ছিল। ১৮৯০ সালে বাঙ্গালী যুবকগণের একটি ব্যায়াম-সমিতি গঠিত হয়, এবং ১৮৯১ সালে "বঙ্গীয় সাহায্যভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯২ সালে, এক্ষণে ইংলণ্ডপ্রবাসী শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ, এম এ, মহাশয়ের যত্নে ঐ তিনটি সমিতি একত্রিত হইয়া "বঙ্গীয় যুবকসমাজ" নামে একটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সুবৃহৎ সভায় পরিণত হয়। এই সভা সাহায্য-ভাণ্ডার, ব্যায়াম এবং ক্রীড়াবিভাগ, বক্তৃতাসভা এবং পুস্তকালয় ও পাঠাগার এই কয় ভাগে বিভক্ত। প্রতিবৎসর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ও স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরের মৃত্যু উপলক্ষে গরীব দুঃখীদিগকে ভিক্ষা প্রদত্ত হয়। কুমার শ্রীযুক্ত ভুবনরঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের পোষকনাথ চক্রবর্ত্তী, এম.এ, এবং লক্ষ্ণৌ উকীলসম্প্রদায়ের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বসু, এম এ, মহোদয়দ্বয়ের সভাপতিত্বে, সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সম্পাদকতায় এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের উৎসাহে ও অর্থসাহায্যে সভার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এক্ষণে ইহার মাসিক ২৫৲ টাকা আয় দাঁড়াইয়াছে। সভ্যসংখ্যা এক্ষণে অন্যূন ১০০ জন। সভার সংশ্লিষ্ট পুস্তকাগারের নাম "বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী"। বহুকাল পূর্ব্বে এখানে Bengali National Club নামে একটি পাঠাগার ছিল। ১৮৮৮ সালে উহা উঠিয়া যায়। তাহার পর হইতে আর কেহ উহার সন্ধান জানেন না। সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার চর্চ্চা বন্ধ হয়। বর্ত্তমান সভার সভ্যগণ ৫০ খানি ইংরাজী পুস্তক এবং ৫০ খানি বাঙ্গালা পুস্তক লইয়া বিদ্যাসাগরলাইব্রেরীর কার্য্য আরম্ভ করেন। এক্ষণে বাঙ্গালা পুস্তকের সংখ্যা ৮০০ হইবে। পাঠাগারে কয়েকখানি কাগজ রাখা হয়। গত বর্ষে ইহার আয় হইয়াছে ৩৩১৷৵৫, ব্যয় ২৯৯৵১০। সভা ও লাইব্রেরীর কাজকর্ম্ম রিপোর্ট প্রভৃতি সমস্তই ইংরাজীতে হইয়া থাকে। এগুলি মাতৃভাষায় হইলে সভার উদ্দেশ্য বোধ হয় অধিক সিদ্ধ হইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

সাধুর হাসি।

পশিয়া শব্দের হাটে, বিপুল বিপণি
খুঁজিলাম, বুঝাইতে সাধুর সুহাসি।
কোথায় উপমা? শুধু শূন্য শব্দরাশি!
সৌন্দর্য্যের সাজি হস্তে মোহিনী ধরণী
হাসিতেছে! —ভক্তিভরে, হইয়ে উল্লাসী,
কহিলাম, "হে ধরিত্রি! কোথা সে সুষমা,
সাধুর হাসির যোগ্য উজ্জ্বল উপমা"?
হাসিয়া কহিলা দেবী, "সব পুষ্প বাসি"!
দেখাইয়া দিলা মাতা, মধুর ইঙ্গিতে,
একটি উপমা:— এক বালিকা যুবতী
ফিরিয়াছে পিত্রালয়ে; সহাস্যে ত্বরিতে,
ধরিল মায়েরে, বেড়ি সে স্নেহ-মূরতি!
"হে সাধু! মায়ের কণ্ঠ, সংসার ছাড়িয়া,
তেমতি কি ধর তুমি, হাসিয়া, হাসিয়া?"

গোলাপ ফুল

জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠ গোলাপরতন,
যাহার মাধুর্য্যে মুগ্ধ এ তিন ভুবন ॥
বিধাতার সৃষ্ট আরো নানা ফুল আছে,
কিন্তু সবে হার মানে গোলাপের কাছে ॥
একাধারে রূপ গুণ কিছুতেই নাই,
যাহার তুলনা দিয়া গোলাপ বুঝাই ॥
মনোমুগ্ধকর গন্ধ; প্রীতিফুল্ল হার,
প্রেমিকের উপহার প্রেম-পারাবার ॥
দেব-পূজা বিবাহাদি শুভকার্য্য যত,
সকল কাজেতে আছে গোলাপ নিয়ত ॥
সব জাতি সমভাবে গোলাপেরে হেরে,
বিশেষ ইংরাজ তারে বড় স্নেহ করে ॥
বৈদ্যনাথে মেল থামে গোলাপের তরে,
গাজীপুর ইস্তাম্বুলে (কনষ্টাণ্টিনোপল)
সবাই আদরে ॥
ঔষধেও গোলাপের আদর সমান,
গুলকন্দ, গোলাপ জল বিশেষ প্রমাণ ॥
নিত্য উপকারী বস্তু গোলাপ যখন,
বাগানে রাখহ তারে করিয়া যতন ॥
রোপণের এই হয় প্রশস্ত সময়,
হেলায় বসিয়া দিন করিও না ক্ষয় ॥
পারিজাত নার্শরিতে পাইবে কলম,
সাড়ে তিন শত আছে বিভিন্ন রকম ॥
সবিশেষ বিবরণ জানিবার তরে,
নাম ধাম স্পষ্ট করে জানাও আমারে ॥
ঘরে বসি বিনামূল্যে কর দরশন,
সুন্দর তালিকা বহি নয়ন-রঞ্জন ॥

বরোদার মহারাজা সয়াজী রাও গায়েকোয়াড় ॥

prabasi

প্রবাসী

প্রথম ভাগ। ভাদ্র, ১৩০৮। ৫ম সংখ্যা।

৮ গ্রহ-কঙ্কর।

আমরা এক্ষণে সৌরজগতে যে সকল গ্রহের অস্তিত্ব জানিতে পারিয়াছি, তাহাদের মধ্যে ছয়টী মাত্র গ্রহ অতি প্রাচীনকাল হইতে মানুষের নিকট পরিচিত ছিল। ইহারা কোন্ সময়ে কোন্ জাতিতে কাহা দ্বারা প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা জানা যাইতেছে না। প্রাচীন আর্য্য-জাতি বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবার বহুপূর্ব্বে যে এই গ্রহগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এই ছয়টী গ্রহের আবিষ্ক্রিয়া হইতেই জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের মূল পত্তন হইয়াছিল।

প্রতিদিন রাত্রিকালে আকাশের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিলে, মন স্বতঃই তারকাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং তাহাদের কতকগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ বা দলবদ্ধ করিয়া এক একটী কল্পিত মূর্ত্তি গঠনে প্রবৃত্তি যায়। আদি মানব, যিনি প্রথম আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মনেও ঐ ভাব প্রবল হইয়াছিল। ক্রমে দেখিতে দেখিতে ইহা অনুভূত হইল যে তারকাদিগের মধ্যে কোন কোনটা স্থানচ্যুত হইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে চলিয়া যাইতেছে। তৎকালে লোকে জানিত, চন্দ্র সূর্য্যই চলিতেছে। এখন আবার তারকারও গতি দেখিয়া সেই দিকে মন দিল, এবং যথাক্রমে ঐরূপ পাঁচটী তারকা আবিষ্কৃত হইল। আকাশের নিশ্চল তারকা-জগতে এই পাঁচটী গতিশীল তারকা, চন্দ্র এবং সূর্য্যকে লইয়া একটী নূতন জাতি সৃষ্টি করা হইল এবং তাহাদের নামকরণ হইল—"গ্রহ"। হিন্দু জ্যোতিষে এই সাতটী জ্যোতিষ্ক এখন পর্য্যন্ত গ্রহ নামে অভিহিত হয় এবং তাহাদের গতি পৃথিবীপরিতঃ গণনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইয়ুরোপে কোপর্ণিকস্ নামক জনৈক জ্যোতিষী প্রথম প্রমাণ করেন যে, চন্দ্রই একমাত্র জ্যোতিষ্ক যাহা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া চলিতেছে; সূর্য্য স্বয়ং গতিহীন; এবং পৃথিবী ও অপর পাঁচটী গ্রহ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া চলিতেছে। এই সকল গ্রহের নাম, ধাম, গতিবিধি, সমস্তই অতি প্রাচীন কাল হইতে গণনা হইয়া আসিয়াছে। ইহারা এত পরিচিত যে প্রত্যেক চিন্তাশীল জাতির মধ্যেই এই গ্রহ কতিপয়ের কিছু না কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এ কারণ প্রবন্ধের আরম্ভেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আমরা যে সকল জ্যোতিষ্ককে এক্ষণে "গ্রহ" আখ্যা প্রদান করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে ছয়টী গ্রহ অতি প্রাচীন কাল হইতেই মানব-জাতির নিকট পরিচিত ছিল। ইহাদিগকে বিনা আয়াসে মুক্তনেত্রে দেখা যায় বলিয়াই, অতি প্রাচীনকালে মানুষের জ্ঞানের আদিতেই ইহারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

যে কালে চন্দ্র, সূর্য্য এবং অপর পাঁচটী গ্রহকে লইয়া একটী গ্রহ জাতি কল্পনা করা হইয়াছিল, তাহার অব্যবহিত পরেই ঐ সাত গ্রহের নামানুসারে "বারের" নামকরণ এবং "সপ্তাহের" সৃষ্টি হইয়াছিল। এই নামকরণ

ও সপ্তাহগণনা সকল চিন্তাশীল জাতির মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু হিন্দুজাতি চিন্তাশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া আরও দুইটী "গ্রহ" আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারা "নবগ্রহ" নামধেয় একটী দেব পরিবারের সৃষ্টি করেন। ঐ দুইটী "গ্রহ" আমাদের এক্ষণকার পরিচিত কোন গ্রহ নহে। তাহাদের নাম "রাহু" ও "কেতু"। গণিতচর্চ্চা হিন্দুজাতির পৈত্রিক সম্পত্তি;—ঐ গণিতবলে তাঁহারা "গ্রহ"দিগের গতির ক্রম নির্দ্দেশ করিতে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, চন্দ্রের ভ্রমণপথও গতিশীল! এক আবর্ত্তনে চন্দ্র যে পথে চলিতেছে, তাহার পৌনঃপুনিক আবর্ত্তনে আর সে পথ আপন স্থানে স্থির থাকিতেছে না; অর্থাৎ চন্দ্র নিয়ত একপথে চলিতেছে না। চন্দ্রের গতিপথে দুইটী বিশিষ্ট বিন্দু আছে, যেখানে পূর্ণিমা কিম্বা অমাবস্যাতে চন্দ্র অবস্থিতি করিলেই "গ্রহণ" লাগে। পূর্ণিমাতে গ্রহণ লাগিলে তাহা "চন্দ্রগ্রহণ" হয় এবং অমাবস্যাতে লাগিলে তাহা "সূর্য্যগ্রহণ" হয়। কিন্তু উভয় গ্রহণই যে চন্দ্রের ভ্রমণপথে উক্ত বিশিষ্ট বিন্দুদ্বয় দ্বারা সাধিত হয়, তাহা হিন্দু জ্যোতির্বিদ্গণের নিকট অজ্ঞাত রহিল না। আবার গণিতে গিয়া দেখা গেল যে, ঐ বিন্দুদ্বয় নিয়ত চলিয়া যাইতেছে এবং চলিতে চলিতে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে একবার পৃথিবীকে আবর্ত্তন করিয়া আসিতেছে। ইহাদের এই গতি দেখিয়াই ইহাদিগকে দুইটী অদৃশ্য "গ্রহ" নাম দেওয়া হইয়াছিল। পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার দিনে ঐ অদৃশ্য গ্রহদ্বয় চন্দ্র কিম্বা সূর্য্যের নিকটস্থ হইলেই তাহাকে "গ্রাস" করে; ইহারই নাম "গ্রহণ"। আমরা এক্ষণে জানিয়াছি যে, ঐ বিন্দুদ্বয় ক্ষেত্রজ্যামিতির কল্পিত বিন্দু মাত্র। ইহাদের কোন ভৌতিক অস্তিত্ব নাই।

উপরোক্ত ছয়টী গ্রহের জ্ঞান বিশিষ্টীকৃত হইলে পর বহুকাল পর্য্যন্ত আর কোন নূতন গ্রহ আবিষ্কার হয় নাই। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হর্শেল যন্ত্রসাহায্যে প্রথম গ্রহ আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্ক্রিয়ার প্রণালী অনেকাংশে প্রাথমিক প্রণালীর ন্যায়। কেবল মুক্ত নেত্রের দৃষ্টিশক্তির পরিবর্ত্তে, সুতীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণ-নেত্রের প্রখর দৃষ্টিশক্তি প্রযুক্ত হইয়া, সাধারণ মুক্তদৃষ্টির অগোচর বস্তু দেখা গিয়াছে মাত্র। নতুবা এস্থলেও সেই প্রাথমিক প্রণালী প্রযুক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ অনেকগুলি তারকার স্থিতি পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখা গিয়াছিল, যে, একটী জ্যোতিষ্ক নিয়তই স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। অনেক পর্য্যবেক্ষণের পর ইহার গতি নির্দ্দিষ্ট হইলে ইহাকে গ্রহ বলিয়া জানা গেল। এই আবিষ্ক্রিয়াকে অপর সকল পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রহাবিষ্কারের ন্যায় একটী "আকস্মিক ঘটনা" ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। এই নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে কেহ কদাপি কল্পনাও করেন নাই যে, ঐরূপ একটী গ্রহ থাকিতে পারে। এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার প্রভূত মানসিক বলের পরিচায়ক বলিয়াই হর্শেলের আবিষ্কারের বিশেষত্ব!

Chamberss' Hand-book of Astronomy নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগে ২৪৭ পৃষ্ঠার টীকাতে লেখা আছে যে, 'ব্রহ্মদেশে সূর্য্য, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি ভিন্ন, "রাহু" নামে একটী অষ্টম "অদৃশ্য" গ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায়। বকানন নামক জনৈক পণ্ডিত এই "রাহু"কে হর্শেলাবিষ্কৃত নূতন গ্রহ মনে করিয়া হর্শেলের আবিষ্কারের গৌরব ক্ষুণ্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।' প্রবাসীর পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন যে, ব্রহ্ম দেশস্থ "রাহু" হিন্দুশাস্ত্রের অষ্টম গ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং পূর্ব্বে রাহু ও কেতুর প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে জানিতে পারিতেছেন যে, হর্শেলের নূতন গ্রহের সহিত রাহুর কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে! চেম্বার্সের টীকা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তাহা আর পাঠকগণের বুঝিতে বাকী রহিল না।

[১২৯৯ সালের অগ্রহায়ণের ভারতীতে 'গ্রহের নামকরণ' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিবার বহু পূর্ব্বে আমি সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, যে, ইয়ুরোপে আবিষ্কৃত য়ুরেনস্ ও নেপচ্যুন গ্রহদ্বয়ের নাম বাঙ্গালায় "রাহু" ও "কেতু" রাখা যাইবে, তাহা হইলে হিন্দুদিগের কাল্পনিক "নবগ্রহ" অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু চেম্বার্সের গ্রন্থের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইলে উপরোক্ত টীকা পাঠ করিয়া আমাকে ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল; কারণ তাহা না হইলে অনেক হিন্দুই, বকাননের ন্যায়, রাহু ও কেতুকে প্রকৃতই বহুপূর্ব্বাবিষ্কৃত য়ুরেনস এবং নেপচ্যুন গ্রহদ্বয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে ছাড়িতেন না!]

উপরোক্ত নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হইবার নয় বৎসর পূর্ব্বে, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে, বোদ নামক জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ, গ্রহদিগের দূরত্বের একটা ক্রমবিধান আবিষ্কার করেন। এক পিতার সন্তান হইলেই পরস্পর 'ভাই ভাই' সম্বন্ধ হয়। এক সূর্য্যের পরিবারভুক্ত এতগুলি গ্রহ যে একেবারে সম্বন্ধশূন্য, ইহা মনে করা যাইতে পারে না। এই ধারণা করিয়া বোদ অনেক চিন্তার পর একটা বিধান আবিষ্কার করেন। বিধানটি এই। একটী ০ বসাইয়া তাহার অগ্র ও পশ্চাতে দুইটী ৩ লেখ, এবং পশ্চাতের (অর্থাৎ বামদিগের) ৩ এতে বিয়োগ চিহ্ন লাগাও। তৎপর সম্মুখের ৩ এর পর তাহার দ্বিগুণ ৬ লেখ, ও তৎপর ৬ এর দ্বিগুণ ১২ লেখ। এইরূপে যথাক্রমে লিখিয়া গেলে সংখ্যাগুলি এইরূপ দাঁড়াইবে,—

৩ ০ ৩ ৬ ১২ ২৪ ৪৮ ৯৬ ইত্যাদি।

এখন ইহাদের প্রত্যেকেতে ৪ যোগ কর, তাহা হইলে নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি পাওয়া যাইবে।

১ ৪ ৭ ১০ ১৬ ২৮ ৫২ ১০০ ইত্যাদি।

এক্ষণে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর যে দূরত্ব তাহাকে দশ ভাগ করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগকে যথাক্রমে ৪, ৭, ১৬, ৫২ ও ১০০ দ্বারা গুণ করিলে, ঐ গুণফল হইতে যথাক্রমে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির দূরত্বের ক্রমানুপাত পাওয়া যাইবে। ইহাই বোদাবিষ্কৃত বিধান। প্রকৃত পক্ষে ঐরূপ ভাগ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে, গ্রহদিগের দূরত্বের ক্রমানুপাত এইরূপ দাঁড়ায় ;—

৪ ৭ ১০ ১৫ ৫২ ৯৫। এই সংখ্যা কতিপয়ের সহিত বোদের সংখ্যাগুলির অতি নিকট সম্পর্ক দেখা যায়।

হর্শেলাবিষ্কৃত নূতন গ্রহে এই বিধান প্রয়োগ করিলে দেখা যায় যে, বোদের বিধানানুসারে তাহার ক্রমানুপাত ১৯৬ (অর্থাৎ ৯৬×২+৪) হইবে, এবং প্রকৃত পক্ষে তাহার ক্রমানুপাত ১৯২। উক্ত গ্রহ আবিষ্কৃত হইলে পর তাহার সহিত বোদের বিধানের অনেক নিকট সামঞ্জস্য দেখিয়া অনেক পণ্ডিত এই বিধানে আস্থাবান্ হইলেন।

কিন্তু ইহা দেখা গেল যে, বোদের বিধান সত্য হইলে সূর্য্যের অনতিদূরে, সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের এক দশমাংশ দূরত্বে অবস্থিত একটী গ্রহ থাকা আবশ্যক ; এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের কক্ষের মধ্যভাগে অপর একটী গ্রহ চাই, যাহার দূরত্ব সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের দশমাংশের ২৮ গুণ হইবে। সূর্য্যের অতি নিকটস্থ গ্রহ বিষয়ে অনেকে আস্থাবান্ হন নাই, কারণ শূন্যের 'পশ্চাতে' বিয়োগাত্মক ৩ বসাইতে অনেকে রাজি হন নাই। * কিন্তু মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষান্তর্ভাগে যে এক কিম্বা 'একাধিক গ্রহ স্তূপাকারে' বিচরণ করিতেছে, তাহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকে কল্পনাবলে ঐ গ্রহের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত করিয়া তাহার নাম "পলাতক" গ্রহ রাখিয়াছিলেন। অনেক জ্যোতির্ব্বিদ দূরবীক্ষণ লাগাইয়া আকাশমার্গে তাহাকে অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। জ্যোতিষ রাজ্যে ভাববলে গ্রহাবিষ্কারের প্রয়াস এই প্রথম!

কোন একটা জ্যোতিষ্ককে বহুকাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার স্থিতি বিপর্য্যয় দেখিলেই, তাহার গতি নিরাকরণ করিয়া তাহাকে 'গ্রহ' বলিয়া আবিষ্কার করা যায়। আকাশের পুঞ্জীকৃত জ্যোতিষ্ক নিয়ত পর্য্যবেক্ষিত হইতেছে ; অতএব পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা গতি প্রত্যক্ষ করিয়া গ্রহাবিষ্কার করা স্বাভাবিক। কিন্তু গণনা দ্বারা গ্রহের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়া তাহা আবিষ্কার করিতে প্রয়াস পাওয়া এই প্রথম! তাহাও আবার সংখ্যার একটী অকারণ লব্ধ সমাবেশ দ্বারা গ্রহের অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করা,— এই আবিষ্ক্রিয়ার সফলতাতে মানব মনের ভাব-প্রধানতা সম্যক উপলব্ধি করা যায়! কতকগুলি সংখ্যার বিচিত্র অথচ অতি সহজ সমাবেশ দ্বারা গ্রহজগতে দূরত্বের একটী ক্রম নির্দ্দেশ হইল। কিন্তু তাহার কারণ কেহই এ যাবৎ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হন নাই ; অথচ এই অকারণলব্ধ সংখ্যাসমাবেশ হইতে সৃষ্টির একটী বিচিত্র জিনিষ আবিষ্কৃত হইয়াছে!

হর্শেলের নূতন গ্রহ আবিষ্কৃত হইলে পর তাহাতেও এই বিধানের প্রযুক্তি দেখিয়া জ্যোতির্ব্বিদ সমাজে

* বুধের কক্ষান্তরালে সূর্য্যের সন্নিকটে একটী গ্রহের অস্তিত্ব অনেক খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ এ যাবৎ বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন, এবং ইহার নাম "বৈশ্বানর" রাখা হইয়াছে। (১৩০০ সালের আষাঢ় এবং আশ্বিন ও কার্ত্তিকের 'সাহিত্য' পত্রিকা দ্রষ্টব্য।) তাহার দূরত্ব বোদের বিধানের 'একের' ঘর পূরণ করিয়া থাকে।

'পলাতকের' অস্তিত্ব বিষয়ে এক প্রকার স্থির বিশ্বাস জন্মাইল। তখন কয়েক জন জ্যোতিষী আকাশ তন্ন তন্ন করিয়া এই পলাতকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পনর বৎসর বৃথা চেষ্টার পর ১৮০০ খৃঃ অঃ সেপ্টেম্বর মাসে ছয় জন জ্যোতিষী মিলিয়া এক সভা আহ্বান করিলেন, এবং তাহাতে এই স্থির করিলেন যে, রাশিচক্রকে ২৪ সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া, তাঁহারা প্রত্যেকে তাহার চারি ভাগ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, যাহাতে 'পলাতক' কিছুতেই তাঁহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি না পায়। অপর লোকেরা এই জ্যোতিষিমণ্ডলের সঙ্কল্প জ্ঞাত হইয়া এই দলের নাম রাখিলেন,—"বিমান-পুলিশ!"

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বর্ষের প্রথম রাত্রিতে ইতালি দেশে পিয়াট্‌সী (Piazzi) নামক জনৈক জ্যোতিষী একটী ক্ষুদ্রকায় নূতন গ্রহ ধরিয়া ফেলিলেন। (ইনি বিমান-পুলিশ' দলের একজন ছিলেন না!) ইহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জানা গেল যে, এই গ্রহ বোদের বিধানের সংখ্যা সমাবেশে ২৮শের ঘর পূরণ করিতেছে। কিন্তু ইহা আকারে এত ক্ষুদ্র যে ইহাকে চিনিয়া রাখা দায় হইয়া পড়িল; গণনা দ্বারা দেখা গেল ইহার আয়তনের ব্যাস ২০০ মাইলের কম। মাসাধিক কাল পর্য্যবেক্ষণের পর পিয়াট্‌সী পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ঐ সময়ে ক্ষুদ্র গ্রহটী সূর্য্যান্তরালে লুক্কায়িত হইল। অপর কোন জ্যোতিষী আর তাহার সন্ধান পাইল না। পিয়াট্‌সীর পর্য্যবেক্ষণ ফল এত সংক্ষিপ্ত ছিল যে, তাহাদ্বারা ইহার ভবিষ্যৎ স্থিতি গণনা অসম্ভব হইয়া পড়িল। অল্প কয়েক সংখ্যক পর্য্যবেক্ষণ ফল হইতে কোন গ্রহের সমগ্র গতিপথ আবিষ্কার করিবার প্রণালী তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

এই সময় গৌস্ নামক একজন পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় জর্ম্মান যুবক বোদ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গ্রহগতি গণনার এক নূতন প্রণালী উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি এক নূতন প্রণালী বাহির করিয়া তদ্দ্বারা উক্ত ক্ষুদ্র গ্রহের গতি গণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।*

ঐ গণনার ফলে এক বৎসর পরে ওল্‌বর্স্ (Olbers) নামক জনৈক জ্যোতিষী উক্ত 'পলাতক' গ্রহকে পুনরায় 'গ্রেপ্তার' করিতে সক্ষম হইলেন! উক্ত 'পলাতক' গ্রহকে 'গ্রেপ্তার' করিতে গিয়া ওল্‌বর্সের আশ্চর্য্যের পরিসীমা রহিল না। তিনি গৌসের নিকট হইতে 'পরোয়ানা' পাইলেন এক 'পলাতক' ধরিবার জন্য;—কিন্তু পরোয়ানার নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখেন, তথায় দুই 'পলাতক' হাজির!

গৌস্ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট স্থানের আশে পাশে পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া, ওল্‌বর্স্ অল্পায়াসেই প্রথম 'পলাতকের' সন্ধান করিলেন। পিয়াট্‌সীর বিশেষ অনুরোধে ইহার নামকরণ হইল,—"সিরিস" (Ceres)। সিরিসের গতিপথ নির্দ্দেশার্থ পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া, কয়েকদিনের মধ্যে ওল্‌বর্স দেখিতে পাইলেন, যে, সিরিসের পাশে তাহার আর একটী দোসর আসিয়াছে! এই নূতন 'পলাতক' দেখিতে অনেকটা সিরিসের মত,—তাহার আয়তন ও গতি সিরিসের অনুরূপ। ওল্‌বর্স্ সত্যই ইহাকে সিরিসের এক যমজ ভ্রাতা মনে করিয়া তাহার গতি পর্য্যবেক্ষণে তৎপর হইলেন।

এক পলাতক ধরিতে গিয়া দুই পলাতক ধরা পড়াতে জ্যোতির্ব্বিদ সমাজে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। গৌস্ এই নূতন গ্রহের গতি ইত্যাদি গণনা করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন, যে, ইহা প্রকৃতই সিরিসের দোসর! এই দুইটী গ্রহ এক এক সময় এত কাছাকাছি চলে যে, তাহারা যদি ক্ষুদ্র না হইয়া পৃথিবীর দ্বিগুণ ব্যাস বিশিষ্ট হইত, তাহাহইলে তাহারা পরস্পরের কাছাকাছি হইবার সময়, একটী হইতে লাফাইয়া অন্যটীতে যাওয়া যাইতে পারিত।

এক আসামী খুঁজিতে গিয়া দুই আসামী ধরা পড়িলে পুলিশ যেমন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া উভয়কে 'চালান' দেয়, জ্যোতির্ব্বিদ সমাজও উক্ত পলাতকদ্বয়কে 'চালান' দিতে ছাড়িলেন না। তাহাদের বিচার হইল, এবং ইহা সাব্যস্ত হইল যে, এককালে ঐ স্থানে একটী বৃহৎ

* এই নবপ্রণালী পরিশেষে ১৮০৯ খৃঃ অব্দে, Theoria Motus Corporum Cœlestium নামে এক বৃহৎ গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়। আমি ইয়ুরোপ প্রবাস কালে বহুকষ্টে ইহার একখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলাম। শ্রীঅঃ

'পলাতক' ছিল, তাহা দৈববশে ভগ্ন হইয়া এবম্বিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'পলাতক' দলের সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব অনুসন্ধান করিলে আরও 'পলাতক' ধরা পড়িবে, এই আশায় আশান্বিত হইয়া জ্যোতিষিগণ দ্বিগুণ উৎসাহে গ্রহানুসন্ধানে তৎপর হইলেন; এবং তাহার প্রথম সূচনাস্বরূপ দূরবীক্ষণের তীক্ষ্ণতা বাড়াইতে লাগিলেন।

প্রথম চারিটী 'পলাতক' ধরিতে সাত বৎসর লাগিয়াছিল। তাহার পর ৪০ বৎসর অদম্য অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও জ্যোতিষি-সমাজ একটা বই 'পলাতক' ধরিতে পারিলেন না। এই পঞ্চম 'পলাতকের' স্বরূপ গণনা করিয়া দেখা গেল যে, ইহার ব্যাস ৬০ মাইলের কম! (এ যাবৎ যতগুলি 'পলাতক' ধরা পড়িয়াছে, তাহাদের কোনটাই আর প্রথম চারিটীর ন্যায় বৃহৎ পাওয়া যাইতেছে না।) অতি ক্ষুদ্রকায় 'পলাতক' ধরিতে দূরবীক্ষণের যত খানি তীক্ষ্ণতা থাকা প্রয়োজন, তাহা লাভ করিতেই উক্ত ৪০ বৎসর লাগিয়াছিল। অতঃপর সকলে বুঝিতে পারিলেন যে, 'পলাতক' ধরা কেবল দূরবীক্ষণের তীক্ষ্ণতার উপরই নির্ভর করিতেছে। ফলেও দেখা গিয়াছে যে, যতই দূরবীক্ষণের তীক্ষ্ণতা বাড়িতেছে, ততই প্রতি বৎসর অনেকগুলি 'পলাতক' ধরা পড়িতেছে। কোন কোন বৎসর দশ, পনর, এমন কি বিশটী পর্য্যন্ত 'পলাতক' ধরা পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে Palisa নামক একজন অষ্ট্রিয়ান জ্যোতিষী ৭৪টী ও Peters নামক একজন আমেরিকান জ্যোতিষী ৪৮টী আবিষ্কার করিয়াছেন। মান্দ্রাজ মান-মন্দিরেও এ যাবৎ পাঁচটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত চারি শতের অধিক আবিষ্কৃত হইয়াছে; এখনও আরও কত আছে কে বলিতে পারে?

আমেরিকা মহাদেশবাসী Watson নামক জনৈক বিখ্যাত জ্যোতিষী ২১টী 'পলাতক' ধরিয়াছিলেন; এবং মৃত্যুকালে তাঁহার আজন্মসঞ্চিত ধনরাশি এই পলাতকদিগের রক্ষণাবেক্ষণ জন্য রাখিয়া গিয়াছেন! পাঠকগণ হয়তঃ বলিতেছেন, আকাশের জ্যোতিষ্কের আবার রক্ষণাবেক্ষণ কিরূপ?—ইহা বলা হইয়াছে যে, এই সকল 'পলাতক' অতি ক্ষুদ্রকায়। ইহাদিগকে সকল সময় চিনিতে পারা যায় না। অনেকবার এমন ঘটিয়াছে যে, কোন 'পলাতক' একবার ধরা পড়িয়া, আবার তাহার অনুধাবক জ্যোতিষীর অবহেলা কিম্বা মেঘাবরণাদি কোন দৈব উৎপাতে পুনরায় পলায়ন করিয়াছে। তাহার পর অন্য কোন অনুধাবক কর্তৃক পুনরায় নূতন 'পলাতক' বলিয়া ধরা পড়িয়াছে; এবং পরিশেষে তাহার পরিচয়াদি জ্ঞাত হওয়াতে পূর্ব্বধৃত বলিয়া জানা গিয়াছে। এতগুলি 'পলাতক' একটা সঙ্কীর্ণ মণ্ডলীর মধ্যে ধাবিত হইতে গেলে তাহাদিগকে চিনিয়া রাখা বড়ই কঠিন ব্যাপার। এ কারণ Watson সাহেব এই বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার সঞ্চিত অর্থে তাঁহা দ্বারা ধৃত 'পলাতক' গুলি নিয়ত অনুধাবিত হইতে থাকিবে। দৈব উৎপাত ভিন্ন অন্য কোন কারণে যেন তাহাদিগকে অবহেলা করা না হয়, অর্থাৎ একটী দূরবীক্ষণ ও একজন অনুধাবক জ্যোতিষী যেন নিয়ত এই 'পলাতক' গুলিকে পাহারা দেয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রথম চারিটী 'পলাতক' ধরার পর পঞ্চম 'পলাতক' ধরিতে প্রায় ৪০ বৎসর লাগিয়াছিল। এই ৪০ বৎসর পরিশ্রমের পর পঞ্চম 'পলাতক'কে ধরিয়া দেখা গেল যে, তাহা সাধারণ গতিবিজ্ঞান মানিয়া চলিতেছে না।

প্রথমতঃ কয়েকটা সংখ্যার অকারণলব্ধ সমাবেশ হইতে 'পলাতক' ধরিবার চেষ্টা হয়, এবং প্রকৃতপক্ষে প্রথম 'পলাতক' ধরা পড়ে। তাহার পর দৈববলে দ্বিতীয় 'পলাতক' ধরা দেয়। অনন্তর এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, একটী বৃহৎ 'পলাতক' ভগ্ন হইয়া অনেকগুলি ক্ষুদ্র 'পলাতকের' উৎপত্তি হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তকে ধ্রুব মানিয়া অনুসন্ধান করিতে গিয়া আরও দুইটী 'পলাতক' ধরা পড়ে; তাহার পর ৪০ বৎসর পরে দেখা গেল যে, একটী অতি ক্ষুদ্র পলাতক ধরা পড়িল। ইহার পর দূরবীক্ষণের তীক্ষ্ণতা যত বাড়িতে লাগিল, ততই প্রতি বৎসর অনেকগুলি 'পলাতক' ধরা দিতে লাগিল। ইহা হইতে সহজে ধারণা করা যায় যে, যে সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়াতে এই সকল 'পলাতক' ধরা পড়িয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই ধ্রুব সিদ্ধান্ত হইবে। কিন্তু গতিবিজ্ঞানবলে ইহা জানা যায়

যে, যদি কোন গ্রহ ভগ্ন হইয়া খণ্ডাকারে পরিণত হয়, এবং ঐ সকল খণ্ডগ্রহ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পূর্ব্বকালীয় অখণ্ড গ্রহের ন্যায় চলিতে থাকে, তাহা হইলে সৌর জগতের যে স্থলে ঐ খণ্ডোৎপাত ঘটিয়াছিল, উক্ত প্রত্যেক খণ্ড-গ্রহ স্ব স্ব আবর্ত্তন ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে গিয়া, ঐ খণ্ডোৎপাত স্থল দিয়া গমন করিবে। অর্থাৎ সকল খণ্ড-গ্রহের গতিপথ পরস্পরকে একই বিন্দুতে (যে বিন্দুতে খণ্ডোৎপাত ঘটিয়াছিল,) ছেদন করিবে। পঞ্চম 'পলাতক' আবিষ্কারের পর এ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের কক্ষপথ কোন এক বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদন করিতেছে না! ইহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, হয়ত গতিবিজ্ঞান মিথ্যা, নতুবা উপরোক্ত ক্ষুদ্র 'পলাতক' জনন বিষয়ক সিদ্ধান্ত মিথ্যা!

গতিবিজ্ঞান অকাট্য সিদ্ধান্ত, অতএব তাহা মিথ্যা নহে। কিন্তু উপরোক্ত সিদ্ধান্ত কল্পিত মাত্র; অতএব তাহা পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। যে পর্য্যন্ত অন্য কোন সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করা না হয়, সে পর্য্যন্ত 'পলাতক' ধরা যেমন চলিতেছে, তেমনই চলিতে থাকিবে। কেবল পাঠকগণ ইহা জানিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে, যদিও একটা মিথ্যা অভিযোগ সাজাইয়া এতগুলি 'পলাতক' ধরা হইল, তথাপি 'পলাতক' গুলি যে ধরা পড়িয়াছে এবং তাহারা যথার্থই 'পলাতক' ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। পুলিসের কায়দাই এরূপ যে, মিথ্যা মোকদ্দমাতে কোন আসামী ধরা পড়িলে, পরে তাহার অন্য কোন অপরাধ সাব্যস্ত হইলে, প্রথম অপরাধ মিথ্যা বলিয়া সেই আসামী নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। নীতিবাদীরা যাহাই বলুন না কেন, জগতে মিথ্যারও উপযোগিতা রহিয়াছে। বিধাতার রাজ্যে একটী মিথ্যা সমস্যাও বৃথা যায় না!

আকাশ হইতে যে সকল উল্কা ধরাতলে পড়িতে দেখা গিয়াছে, তাহারা প্রায়ই বিসদৃশ আকার বিশিষ্ট। ক্ষুদ্র গ্রহগুলিও, অপর গ্রহদিগের ন্যায় বর্ত্তুলাকার কিম্বা বর্ত্তুলাভাসাকার (Spheroidal) না দেখাইয়া, উল্কার ন্যায় বিসদৃশ আকার বিশিষ্ট দেখাইয়া থাকে। একারণ ইহাদিগকে উল্কার সমজাতীয় মনে করা যায়। কিন্তু উল্কামালা যেরূপ ঝাঁক বান্ধিয়া আকাশে চলে, ইহারা তাহা না করিয়া পরস্পর স্বতন্ত্র ভাবে আপন আপন পথে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া চলিতেছে. এই জন্য ইহাদিগকে "গ্রহ" শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের ক্ষুদ্র কায় এবং সংখ্যার আধিক্য হেতু আমি ইহাদের "গ্রহকঙ্কর" নামকরণ করিলাম।

ইহাদের পথ এত জটিল যে কোন একটী "কঙ্কর" অপর বহুসংখ্যক "কঙ্করের" পথ অতিক্রম না করিয়া চলিতে পারে না। অথচ এই শত বৎসরের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা জানা যাইতেছে, যে, ইহারা কখনও একটী অপটীর গায়ে পড়িতেছে না। এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা কেবল বিশ্ববিধাতার বিচিত্র বিধানেরই পরিচায়ক!

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

বঙ্গসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ।

যে সকল মহাত্মার চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ত্তমান উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে পাঁচটী শ্রেণীতে এবং তাঁহাদের যুগসমূহকে পঞ্চযুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টির ইতিহাস, পৃথ্বী সৃষ্টির পৌরাণিক ইতিহাস অপেক্ষা অধিকতর আমোদ ও আনন্দজনক; বাইবেলের "জেনেসিসের" সৃষ্টিপ্রকরণ হইতে ইহা অধিকতর কৌতুকাবহ এবং অধিকতর প্রয়োজনীয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান প্রস্তাবে এই সকল বিস্তৃত কথার বিশদরূপে আলোচনা করিবার স্থান এবং সময় নাই। আমরা কেবল দ্বিতীয় যুগের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিবার জন্যই এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি।

যাঁহাদিগকে আমরা কবিওয়ালা, যাত্রাওয়ালা, তর্জ্জাদার, ঝুমুরওয়ালা, কথক, পাঁচালিকার প্রভৃতি উপাধিতে অভিহিত করিয়া থাকি, বঙ্গসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের তাঁহারাই অধিকর্ত্তা। ঝুমুর, তর্জ্জা, "কবি" প্রভৃতির নামে অনেকেই বিরক্ত হইতে পারেন, সত্য; বিরক্ত হইবার কারণও আছে, স্বীকার করি; কিন্তু ইহারা বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন পক্ষে—বাঙ্গালীর চিন্তাশীলতা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে—যে সহায়তা করিয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় ইহার সামান্য অশ্লীলতা

সর্ব্বথা মার্জ্জনীয়। 'কবি'র পূর্ব্বে যাত্রার সৃষ্টি হয়; যাত্রার পরে কথক এবং পাঁচালিকারের আবির্ভাব, তদনন্তর ঝুমুর ও তর্জ্জার উৎপত্তি। বাঙ্গালা দেশে যাত্রা এক অপূর্ব্ব জিনিষ! পৃথিবীর আর কোনও দেশে, কোনও সমাজে, "যাত্রা" নাই; এই যাত্রার বলে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বৈষ্ণবকুলতিলক চন্দ্রশেখর দাস, বাঙ্গালা দেশে যাত্রার স্রষ্টা। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে যাত্রা ছিল না। চন্দ্রশেখর অদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য এবং জাতিতে কায়স্থ; তাঁহার যাত্রার নাম "হরিবিলাস", এই পালাই তাঁহার যাত্রার প্রথম পালা। তদনন্তর তাঁহার পালার সংখ্যা অধিক হইলে যাত্রাটি "শেখরী যাত্রা" বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। ঐ যাত্রার মোটে তিনটী গান সংগ্রহ করিতে আমরা সমর্থ হইয়াছি। একটী এখানে উদ্ধৃত হইল।

(ভৈরবী)

"দশদিশ নিরমল ভেল পরকাশ।
সখীগণ মনে ঘন উঠয়ে তরাস॥
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ূর।
দাড়িম্বে বসিয়া কীর বলয়ে মধুর॥
দ্রাক্ষাডালে বসি ডাকে কপোত কপোতী।
তারাগণ সনে লুকায়ল তারাপতি॥
কুমুদিনীবদন তেজল মধুকর।
কমল নিয়ড়ে আসি মিলয়ে সত্বর॥
শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর।
জাগহ সকল লোক নাহি মান ডর॥
শেখরে শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চোর হৈয়া সাধু পারা রহিয়া শুতিয়া॥"

চন্দ্রশেখরের শিষ্যের নাম জগদানন্দ। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বাল্যকাল হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরের হরিবিলাস পালায় ইনি "রাই" সাজিতেন। জগদানন্দ, চন্দ্রশেখর অপেক্ষা অধিকতর উচ্চদরের কবি ছিলেন। জগদানন্দের গানের শব্দবিন্যাস, ওজস্বিতা, মাধুর্য্য এবং ভাব এত সুন্দর যে, এক একটা গীত পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকারদিগের কবিতার সহিত তুলনীয় হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, জগদানন্দপ্রণীত বহু গীতের মধ্যে আমার অল্পমাত্রই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। একটা গীতের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

(ভৈরবী)

জাগহো বৃষভাণুনন্দিনী মোহন যুবরাজে। ধুয়া।
অকরুণ পুন বাল অরুণ
উদিত মুদিত কুমুদবদন
চমকি চুম্বি চঞ্চরী পদ্ম
মিনিক সদন সাজে।
কি জানি সজনী রজনী থোর
ঘুম ঘন ঘোষতি ঘোর
গত যামিনী জিত দামিনী
কামিনী কুল লাজে।
জাগহো বৃষভাণুনন্দিনী মোহন যুবরাজে॥
কুহু কত হত শোক কোক
জাগর অবশ অবচ লোক
শুক সারিক কাকলী—পিক
নিধুবন তরু আওয়াজে॥

জগদানন্দ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধিবাসী ছিলেন। এই মহকুমায় কবি কাশিদাসের জন্মস্থান। বটতলা হইতে প্রকাশিত "পদকল্পতরু" নামক পুরাতন গ্রন্থের ১৩২ পৃষ্ঠায় এই গীত প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। তদনন্তর অমৃতবাজার-পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক অতি সুন্দররূপে সংগৃহীত, সম্পাদিত এবং প্রকাশিত পদকল্পতরুতে ইহা প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। জগদানন্দের পরে সাত জন যাত্রাওয়ালার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আমরা এখন পর্য্যন্তও তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ পাই নাই। এখনও অনুসন্ধানে নিযুক্ত রহিয়াছি। এই সাত জন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যাত্রাওয়ালার অন্তর্দ্ধানের পরে রসিকচূড়ামণি কিরণ দাস, চন্দ্রোদয় মজুমদার, মোহন সরকার, অনপরাধ ঘোষাল, উদ্ধব সামন্ত, হৃষীকেশ গোস্বামী, জগদীশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং হরিহর বটব্যালের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী ছিলেন এবং "বেগো"র গাঙ্গুলী বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহারই প্রসিদ্ধ "বালকের" নাম গোবিন্দ অধিকারী। যাত্রার দলের "ছোকরা" গিরি করিয়া, গোবিন্দ শেষে "অধিকারী" হইয়া পড়েন। বাঙ্গালা ভাষা, গোবিন্দ অধিকারীর নিকটে বিশেষ ঋণী। তাঁহার পদাবলী, বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ পক্ষে অনেক সহায়তা করিয়াছে। তাঁহার "শারি শুকের দ্বন্দ" বাঙ্গালা ভাষায় এক অপূর্ব্ব জিনিষ!

গোবিন্দ অধিকারী ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব ছিলেন। গোবিন্দ অধিকারী মহাশয়ের কালে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের "খাস্ যাত্রা" আর ছিল না, এখনও আর নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগে আমরা ছত্রিশ জন যাত্রাওয়ালার নাম পাইয়াছি। ইহাদের প্রত্যেকেই অল্প বা অধিক পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ সাধন পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন। এই ছত্রিশ জনের মধ্যে, সেখ বকাউল্লা, বিশ্বনাথ মাল, রামময় দাস, রাজনারায়ণ দাস, লোকনাথ রজক (লোকা ধোবা), মহেশ ঠাকুর, কান্তি তেলি, রঘু (রোগা) তামুলী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সেখ বকাউল্লা 'বোকো সেখ' বলিয়া খ্যাত। ইনি মুসলমান; ইঁহার পিতা মাতাও মুসলমান ছিলেন। ইনি মুসলমান হইয়াও বাঙ্গালা ভাষায় অসাধারণ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার গীতাদি বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম অলঙ্কার। কান্তি তেলি, রোগো তামুলী, লোকা ধোবা, বিশো মাল প্রভৃতির বাঙ্গালায় অধিকার এবং বঙ্গ সাহিত্যের সহিত সম্পর্ক কম ছিল না। লোকা ধোবার—

> কি সুন্দর, শুনিতে সুন্দর,
> বিদ্যাসুন্দর মনোহর ॥
> ছলে বলে কৌশলে,
> মালিনীরে ফাঁকি দিলে,
> উভয়ের মন অন্তঃশীলে,
> বহে নদী ফল্গু যেমন।

প্রভৃতি গীত, কবিতাশক্তির সুন্দর পরিচায়ক।

বকাউল্লা সেখের—

> বল্‌লে কি হয় পুরুষ যেমন নারী তেমন নয় ॥
> নারীর গুণ শুন বলি,
> আপনি কালী মুণ্ডমালী,
> স্বামীর বুকে পদ দিয়ে
> নৃসিংহ করিল জয়।
> বল্‌লে কি হয় পুরুষ যেমন নারী তেমন নয়।

অথবা "বলগো সীতে, এ দুরন্ত শীতে, এ বনে আসিতে" ইত্যাদি গীত অতি মনোহর, অতি সুন্দর। এই সময়ে সুন্দর দাস নামে এক উড়িয়া কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। এই উড়িষ্যাবাসী কায়স্থের বাঙ্গালা ভাষায় অতি আশ্চর্য্য অধিকার ছিল। তাঁহার গীত ও কবিতা পৃথিবীর যে কোনও ভাষার অলঙ্কারস্বরূপ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। আমাদের "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি, উৎকর্ষ ও বিস্তৃতির ইতিহাস" নামক বিপুলবপু গ্রন্থে এ সকল গীতের আলোচনা করা যাইবে। ঐ গ্রন্থ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সুন্দরদাস উড়ের এক বাঙ্গালী বাদ্যকর ছিল; তাহার নাম অক্ষয় ঘোষ। অক্ষয় জাতিতে গোয়ালা, কিন্তু যেমন "বাজিয়ে" তেমনি "গাইয়ে"। কেবল তাহাই নহে, অক্ষয় ঘোষ অত্যন্ত সুবক্তা ছিলেন এবং তাঁহার বাঙ্গালা লিখিবার ক্ষমতাও বেশ ছিল। তাঁহার তৎকালীয় বাঙ্গালার একটু নমুনা দিতেছি—

> "এতাবৎ কালের উপদ্রবাবলীর বিবরণমালা উপযুক্ত কালে ব্রাহ্মণ বৃন্দের শ্রুতিগোচর না হইবায় কাকতালীয় ন্যায়সূত্র মাফিক্ তদানীন্তন গোস্বামীপুঙ্গব বে-কায়দা প্রাপ্তি নিবন্ধন গোলমালে হয়রাণ পর্শাণ্ হইবায় বর্ণিত বিষয় দুইটার বিশেষ ব্যাখ্যা একেবারেই অসম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় অথবা জলবুদ্বুদের ক্ষণিক স্থিতি ও ক্ষণিক অন্তর্দ্ধানের ন্যায় সে কথা ক্ষণেমধ্যেই জাগ্রত হইয়া উঠিবার বহুল কারণ দৃশ্যমান হইয়াছিল। অনন্ত আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ার পর আর কি বসুন্ধরা সলিলে অপূর্ণ থাকিবে?" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই অক্ষয় ঘোষ সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহার নিবাস বর্দ্ধমান জেলায় ছিল। অক্ষয়ের অনেক কবিতা আমাদের নিকটে আছে। অক্ষয়ের "চিঁড়ে মুড়কী" কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় এক নূতন জিনিষ। এই কবিতার অর্দ্ধাংশ পাইয়াছি, বাকি এখনও পাই নাই। সমগ্র না পাইলে ইহার প্রকাশে মজা নাই, এজন্য তাহার নমুনা দিলাম না। ইন্দ্র বাবুর "পঞ্চানন্দ" মাসিক পত্র আকারে যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন উহাতে "মুড়ি" নামে এক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ কবিতার পদবিন্যাসে এবং সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া সুরসিক ইন্দ্রনাথ বাবু, লেখককে "ঈশ্বর গুপ্তের জীবন্ত শিষ্য" বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। ঐ মুড়ির কবিতার সুলেখকের সহায়তায় অক্ষয় ঘোষের অনেক কবিতা আমরা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। চিঁড়ে মুড়কীর পদ্য মুড়ীর পদ্য হইতে স্বতন্ত্র হইলেও মুড়ীর পদ্যকে উহার একটু নমুনা স্বরূপ বলা যাইতে পারে। এই অসাধারণ মুড়ীর কবিতার ভূমিকা এইরূপ—

> ধন্য ধন্য মুড়ি তুমি!
> আসি এই বঙ্গভূমি,
> উদ্ধারিছ বঙ্গবাসীগণ।
> কাঙ্গাল বিষয়ী যত,
> সদা তব অনুগত,
> কভু হর তাপসের মন ॥

" মুড়িভোজী পেলে লঙ্কা
স্বর্গে যায় মেরে ডঙ্কা
শঙ্কা করে সদা তারে যম।
আদার সনে হ'লে যোগ
অমৃতে আদিত্য ভোগ,
কলার সঙ্গে নহে কিছু কম॥" ইত্যাদি।

বর্দ্ধমানজেলাবাসী এই মুড়ির কবিতাকার বলেন, অক্ষয় ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র নটবর ঘোষ চব্বিশ পরগণার প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা বলিয়া বিখ্যাত হন, এবং তাঁহার প্রপৌত্র কেশব ঘোষ রাজসাহী জেলায় বিবাহ করিয়া সুন্দররূপে ইংরাজী ভাষায় অধিকার লাভ করতঃ এখন উচ্চ পদে আসীন। কেশব বাবু The Beauties of Bengalee Literature নামক গ্রন্থ রচনা করিতেছেন, শুনিয়া আমরা আপ্যায়িত হইলাম। ভরসা করি, এই গ্রন্থে অনেক নূতন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইব।

তাহার পরে, দাশুরায়ের পাঁচালি, রসিক রায়ের পাঁচালি এবং গোবৰ্দ্ধন দাসের পাঁচালি উল্লেখ করিবার যোগ্য। কেশব চাঁদ, ননীলাল, যদু ঘোষ প্রভৃতি পাঁচালিকারের দ্বারাও বঙ্গভাষার অনেক উপকার হইয়াছে। কথকদিগের মধ্যে ধরণীধর কথক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহার সুযোগ্য পুত্র মুরলীধর বাবু বি. এ. পাশ করিয়া কটক নগরের রাভেন্‌শা কলেজের অধ্যাপক কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ঝুমুরের মধ্যে দেবদাসী, রাইরাণী, মা ভবানী, যুগলমতি, বামাদাসী, প্রভৃতি শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের নাম উল্লেখ করিবার উপযুক্ত। ইঁহাদের ঝুমুরে অশ্লীলতার লেশমাত্র ছিল না, অথচ পদাবলী অতি মধুময়ী এবং অতি উচ্চভাবপরিপূর্ণা। তর্জ্জার মধ্যে স্বরূপ হাজরা, জগৎ মিত্র, নয়ন রায় এবং শ্রীনিবাস মহাচার্য্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ইঁহাদের সকলের নিকটেই বাঙ্গালা ভাষা ঋণী; ইঁহারাই বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগের উজ্জ্বল রত্ন।

এইবারে আমরা কবিওয়ালাদিগের সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া প্রস্তাব সমাপ্ত করিব। কবিওয়ালাদিগের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত, হরুঠাকুর, ভোলাময়রা, জগন্নাথ দাস, গুড়্‌গুড়ের দল, শ্রীমতি মোহিনী দাসী, আণ্টুনী ফিরিঙ্গি, রাম বসু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ঈশ্বর গুপ্ত, গুড়্‌গুড়ে, হরুঠাকুর প্রভৃতি উচ্চ দরের 'কবি' বটেন, কিন্তু ভোলাময়রা সকলকে টেক্কা দিয়াছেন। আণ্টুনী ফিরিঙ্গি হইয়াও বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছেন। মুষ্টি মুষ্টি ধূলি প্রক্ষেপে মুসলমানের যেমন কবর হয়, নানা লোকের অল্প অল্প সহায়তায় বাঙ্গালা ভাষার তেমনই উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ধোবা, নাপিত, তেলি, তাম্বুলী, ময়রা, মুসলমান প্রভৃতি অনেক জাতিই বাঙ্গালা সাহিত্যাট্টালিকার মিস্ত্রি স্বরূপ; শেষে বাকি ছিল ফিরিঙ্গি——আণ্টুনী সাহেব সে বাকিটুকু পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। "কবি" ওয়ালাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব জগৎকে বিস্মিত করিতে পারে। এই উপস্থিত বুদ্ধিতে ভোলা ময়রা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই বিষয়ে ইঁহার নিকটে ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড়্‌গুড়ে হারি মানিয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্তের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, ভোলা ময়রার অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তাহার মধ্যে আণ্টুনী ফিরিঙ্গি এবং জগন্নাথ দাস বড় বলবান্ প্রতিযোগী বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। দুঃখের বিষয় ভোলা ময়রার সকল কথা আমরা পাই নাই; অনেক দিন পূর্ব্বে "ভারতী"তে ভোলাময়রার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই প্রবন্ধের লেখক অনেক নূতন কথা শুনাইয়াছিলেন। আণ্টুনী গাহিত,—

"ভজন পূজন জানিনা মা!
জেতেতে ফিরিঙ্গি।
যদি দয়া ক'রে তার মোরে
এ ভবে, মাতঙ্গি॥"

গান শুনিয়াই, ভোলা ময়রা ভগবতী সাজিল, এবং গাহিতে লাগিল—

"আমি পার্ব্বোনারে তরাতে
আমি পার্ব্বোনারে তরাতে।
সিশুখৃষ্ট ভজ্‌গা তুই, শ্রীরামপুরের গির্জ্জাতে।
আমি পার্ব্বোনারে তরাতে।" ইত্যাদি।

ভোলার ভবানীপুরের বারোয়ারীতে সেই গান—

আমি সে ভোলানাথ নই,
আমি সে ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা,
বাগবাজারে রই।
আমি সে ভোলানাথ নই।
যদি সে ভোলানাথ হই,
যদি সে ভোলানাথ" হই,
তা'হলে——"। ইত্যাদি।

সেই গান এখনও পল্লীগ্রামের লোকের বৈঠকখানায় আমোদের জিনিস বলিয়া আদর পাইয়া থাকে। রাম বসুর "মনে রৈল সই মনের বেদনা" গীত, রাখাল ছেলেদেরও কণ্ঠে এখন শুনা যায়। কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ভোলাময়রা অদ্বিতীয়। মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত জাড়া গ্রামের ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব জমিদারদিগের বাটীতে ভোলাময়রার এবং জগাদাসের (জগন্নাথ দাসের) কবি হইতেছিল। ঐ গ্রামের জমিদার ব্রাহ্মণ এবং অধিবাসীদের অধিকাংশই জাতিতে চাষা, গ্রামের পার্শ্বে মানিককুণ্ড নামক স্থানে খুব বড় বড় মূলা জন্মিত, এখনও জন্মে। জগন্নাথ দাস লোভী ছিল এবং খোষামোদ করিয়া, সত্যের অবমাননা করিয়া, পয়সা লইতে ভাল বাসিত। জগন্নাথ জাড়ার প্রশংসাচ্ছলে গাহিল—"এই জাড়া গ্রাম সাক্ষাৎ বৃন্দাবন স্বরূপ, ইহা মর্ত্ত্যের গোলোক, ইহার পুষ্করিণীসমূহ রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ইত্যাদি।" ভোলা উত্তর দিল—

"কি কোরে বল্লি জগা
জাড়া গোলোক বৃন্দাবন।
এখানে বামুন রাজা চাষা প্রজা
চৌদিকে তার বাঁশের বন॥
কোথারে তোর রাধা কুণ্ড,
কোথারে তোর শ্যাম কুণ্ড
সাম্‌নে আছে মানিক কুণ্ড
করগা মূলা দরশন।
কি কোরে বল্লি জগা
জাড়া গোলোক বৃন্দাবন;
ওরে "কবি" গাবি পয়সা লবি,
খোসামুদী কিকারণ॥
কি কোরে বল্লি জগা
জাড়া গোলোক বৃন্দাবন॥" ইত্যাদি।*

ভোলার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। রমাপতি ঠাকুর নামে আর একজন লোক প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি নিজে কবি-ওয়ালা ছিলেন না, কিন্তু তিনি 'কবির' ছড়া ও গীত বাঁধিয়া দিতেন। রমাপতির "সখি ধর ধর" গীত ভাদ্রমাসের ভাগীরথীর তরঙ্গভরা; এই গীতের পদবিন্যাস, শব্দচাতুরী, অলঙ্কার এবং ভাব অতি প্রশংসনীয়। রমাপতির বেহাগ রাগিণীর একটি গান এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"সখি। শ্যাম না এলো।
অবশ অঙ্গ, শিথিল কবরী
বুঝি বিভাবরী আজি অমনি পোহা'ল॥
ঐ দেখ সখি শশাঙ্ক কিরণ
উষার প্রভায় হলো সঙ্কীরণ
পাতায় পাতায় বহে প্রাতঃসমীরণ
কুমুদিনী হাস্যবদন লুকা'ল।
শর্ব্বরীভূষণ খদ্যোতিক তারা,
দেখ সখি সবে প্রভাহীন তারা,
নীলকান্ত মণি হলো জ্যোতিহারা,
তাম্বুলের রাগ অধরে মিশা'ল॥
সখি! শ্যাম না এলো॥
তাপিত হৃদয় রমাপতি কয়,
এ বিরহ ধনি তোমা বোলে নয়;
নিশাগতে যেন প্রভাত নিশ্চয়,
রজনীর সুখ-বিলাস ফুরাল॥
সখি! শ্যাম না এলো।"

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

৺ প্যারীচাঁদ মিত্র।

প্রায় অষ্টাদশ বৎসর অতীত হইল, বঙ্গের আঁধার আকাশের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র—প্যারীচাঁদ মিত্র, খসিয়া পড়িয়াছে। ইনি টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামেই অধিক পরিচিত। প্যারীচাঁদ, হুগলী জেলার অন্তর্গত পানীসেহালার বিখ্যাত মিত্র বংশীয়। ইহঁারা প্রসিদ্ধ জমিদার ছিলেন। প্যারীচাঁদের পিতামহ গঙ্গাধর মিত্র, হাটখোলার

---

* "প্রবাসী"র একজন হিতৈষী আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, "কবিওয়ালাদের মধ্যে হরিবোলা দাসও প্রসিদ্ধ। যজ্ঞেশ্বর, হারু কৈবর্ত্ত ও হরিবোলা দাস সমসাময়িক। যজ্ঞেশ্বর ও হরিবোলার মৃত্যু হইয়াছে; হারু অদ্যাপি জীবিত। ভোলাময়রার প্রতিদ্বন্দ্বীর পুরানাম যজ্ঞেশ্বর; জাতিতে ধোপা, বাড়ী মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোণায়। মেদিনীপুরের ঘাটাল অঞ্চলে এখনও অনেক কবিওয়ালা আছেন। 'কি কোরে বল্লি যোগে' আমাদের এইরূপ 'পাঠ' শুনা আছে। [আমরাও এইরূপ শুনিয়াছি। সম্পাদক।] প্রসিদ্ধ ৺ রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় কবিওয়ালা তো ছিলেনই না, পরন্তু কবির ছড়া বাঁধিয়া দিতেন বলিয়াও প্রসিদ্ধি নাই। তিনি সুগায়ক বলিয়াই প্রসিদ্ধ। ৺ প্যারী চাঁদ মিত্রের জীবনীতে যে রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, ইনি সেই রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বর্দ্ধমান রাজার অন্যতম গায়ক ছিলেন। উক্ত রাজার প্রদত্ত চন্দ্রকোণাতে তাঁহার জায়গীর আদি এখনো আছে—তাঁহার পৌত্রেরা তাহা ভোগ করিতেছেন। রমাপতির স্ত্রীও বেশ গান রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার স্বামীর "সখি শ্যাম না এলো" গান শুনিয়া "সখি শ্যাম আইল" গানটী রচনা করিয়া সেই রাগিণীতে গাহিয়া তাহার উত্তর দিয়াছিলেন।"

মদনমোহন দত্তের কন্যাকে বিবাহ করিয়া, ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য, কলিকাতায় নিমতলা ষ্ট্রীটে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া বসবাস করেন। ইনি কলিকাতার বিখ্যাত ধনী রামদুলাল সরকারের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন; অধিকন্তু মহাজনী ও বিল ডিস্‌কাউন্টের কর্ম্ম করিতেন। গঙ্গাধরের তিন পুত্র রামনারায়ণ, নিমাইচাঁদ ও নন্দলাল। রামনারায়ণের সহিত রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। রামনারায়ণ কাব্যানুরাগী ও কবি ছিলেন। তিনি রাধামোহন সেনের সহিত একত্রে "সঙ্গীত-তরঙ্গিনী" নামক কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তখন ঐ গ্রন্থের যথেষ্ট আদর হইয়াছিল। রামনারায়ণের পাঁচ পুত্র—মধুসূদন, শ্যামচাঁদ, নবীনচাঁদ, প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদ।

চতুর্থ পুত্র প্যারীচাঁদ, ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই তারিখে নিমতলাস্থ ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। প্যারীচাঁদ যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বঙ্গে কি ইংরাজি, কি আধুনিক বাঙ্গালা ভাষা, কাহারও স্রোত বহে নাই। তখন বাঙ্গালা "বটতলার মহাভারত," "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" "দাশু রায়ের পাঁচালী" ও পার্সী "বাগ-ও-বাহার," "বোস্তাঁ," গোলেস্তাঁ" প্রভৃতি পুস্তকের যথেষ্ট আদর ছিল। প্যারীচাঁদ প্রথম হইতেই ইংরাজি শিক্ষা করিয়াছিলেন। পার্সীও বেশ ভাল রকম শিখিয়াছিলেন। ইনি ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। ডাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ সিকদার ও রাজা দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি প্যারীচাঁদের সহপাঠী ছিলেন।

প্যারীচাঁদের সামান্য উচ্চারণ দোষ ছিল, কিন্তু তিনি কয়েক মাসের মধ্যে অদ্ভুত অধ্যবসায় বলে তাহা সম্পূর্ণ শোধন করিয়াছিলেন। অল্প কালের মধ্যে তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও তীক্ষ্ণ প্রতিভার কথা চারিদিকে প্রকাশ পাইয়াছিল। স্যার জন পীটার গ্রান্টের উৎকৃষ্ট রচনার জন্য ঘোষিত পুরস্কার, প্যারীচাঁদ অন্যান্য সহাধ্যায়ীকে পরাজিত করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। ইনি প্রথম শ্রেণীতে ১৬৲ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার বাল-স্বভাব-সুলভ চাপল্য ছিল না। ইনি বাল্যকাল হইতেই অতি গম্ভীর ছিলেন বলিয়া অধ্যাপক ডাঃ টাইট্‌লার তাঁহাকে বাল্যকালেই "দার্শনিক" আখ্যা দান করিয়াছিলেন। তখন কে জানিত, পরে বাস্তবিকই তিনি একজন "দার্শনিক" হইবেন?

প্যারীচাঁদের বিদ্যানুরাগ ও কার্য্যতৎপরতার পরিচয় পাইয়া স্যার এডওয়ার্ড রায়েন ও কেমারন্ সাহেব তাঁহাকে (প্রসন্নকুমার ঠাকুর ছাড়িয়া দিলে) ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্যারীচাঁদের স্বাধীন প্রাণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে ব্যাকুল। তিনি কি করিয়া সরকারী কার্য্য গ্রহণ করিবেন? তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি জীবনে কখনও সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই।

পাঠত্যাগের পর প্যারীচাঁদ, নিজভবনে এক অবৈতনিক ইংরাজি স্কুল স্থাপন করিয়া, প্রতিদিন প্রাতঃকালে কতিপয় বন্ধুর সহিত বালকদিগকে শিক্ষা দিতেন। প্রসিদ্ধ ডিরোজারিও ও হেয়ার সাহেব তাঁহার স্কুল পরিদর্শন করিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দান করিতেন। তিনি পরে কৃতজ্ঞচিত্তে ইংরাজিতে ও বাঙ্গালাতে হেয়ার সাহেবের জীবনচরিত লেখেন। তিনিই হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ সভার ও হেয়ার প্রাইজ্ ফণ্ডের স্থাপয়িতা। এই সময় তিনি এক্‌ইজিসন অব্ জেনারেল নলেজ্ সভার সভ্য হন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাদাতা স্যার চার্লস মেটকাফের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া প্রথমে এস্‌প্লেনেড রোডে ডাঃ ষ্ট্রঙ্গের (Dr. Strong) বাটীর একটী নিম্নতল গৃহে মেটকাফ বা কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপন করেন, এবং নিজে উহার ডেপুটী লাইব্রেরীয়ান হন। তিনি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মেটকাফহলের (Metcalf Hall) জন্য চাঁদা আদায় করিতে যারপর নাই পরিশ্রম করিতেন। পরে গঙ্গাতীরে প্রশস্ত মেটকাফহল প্রস্তুত হইলে তথায় কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী উঠিয়া যায় এবং সকলে তাঁহাকেই লাইব্রেরীয়ান মনোনীত করেন। বড়ই দুঃখের বিষয় আর কয়েক মাস পরেই ভারত গবর্ণমেণ্ট মেটকাফ হল লইবেন। তাহাহইলে আর আমরা কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর নাম শুনিতে পাইব না।

প্যারীচাঁদ এই সময় খড়দহ নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ* জমিদার, ৮০,০০০ হাজার শালগ্রাম সংগ্রহকারী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কনিষ্ঠা কন্যা বামাকালীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, ও কালাচাঁদ শেঠের সহিত অন্তর্ ও বহির্ব্বাণিজ্যে নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরেই একাই নিজের নামে, প্যারীচাঁদ, মরীচি দ্বীপের "কোকোনদা লিনারস কোং", "পিপন্ এডাম কোং" ও "রিচার্ডসন কোং", লণ্ডনের "ওয়াট কোং", বর্ম্মার "নর্ম্মান গ্রাণ্ট কোং", বোম্বাইয়ের "কারসম দাস মাধব দাস কোং", মধ্যপ্রদেশস্থ নাগপুরের "মহেশচন্দ্র চাটর্জি কোং" প্রভৃতি কোম্পানির সহিত কারবার করিতেন। প্যারীচাঁদের সত্যনিষ্ঠারগুণে তাঁহার ব্যবসা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। চারিদিকে তাঁহার সাধুতার কথা প্রকাশ পাইয়াছিল। ক্রমে ব্যবসা বাণিজ্যে তিনি প্রায় দশ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এক দিনের জন্যও সংসারসুখে মুগ্ধ, কি বিলাসী হন নাই।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটী, (যাহা এক্ষণে বৃটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামে অভিহিত,) বাগ্মী জর্জ্জ টম্সনের সহযোগে ও যত্নে এবং প্যারীচাঁদের অধ্যবসায়ে স্থাপিত হয়; এবং প্যারীচাঁদই উহার প্রথম সেক্রেটরী হইয়াছিলেন। তিনি সাধারণ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তাঁহাকে উক্ত সমিতি আজীবন সভ্য নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন।

প্যারীচাঁদ বাল্যকাল হইতেই রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহিত "জ্ঞানান্বেষণ" ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকের সহিত "বেঙ্গল স্পেকটেটর" নামক সাময়িক পত্র প্রকাশ করিতেন। প্যারীচাঁদই এদেশে বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকার পথপ্রদর্শক। তাঁহার প্রকাশিত "মাসিক পত্রিকার" ভূমিকায় লিখিত থাকিত—"এই পত্রিকা সাধারণের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের জন্ত ছাপা হইতেছে। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদের জন্ত এ পত্রিকা লিখিত হয় নাই।"

সে সময় তেমন সরল বাঙ্গালা গদ্য লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল না। গদ্য যাহা ছিল, তাহা অত্যন্ত পণ্ডিতী গোছের, অনেকে বুঝিতে না পারায় পড়িতেন না। প্যারীচাঁদ এই সময় টেকচাঁদঠাকুর নাম দিয়া ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ "আলালের ঘরের দুলালে"র সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় উপন্যাস লেখার পথপ্রদর্শক হন। ইহার পরেই তিনি ঐ নামে মদ্যপান ও জাতিভেদ আক্রমণ করিয়া "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়" নামক একটী সুন্দর পুস্তিকা লেখেন। তিনি লাইব্রেরীতে বসিয়া "ইংলিষম্যান," "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া," "ইণ্ডিয়ান ফীল্ড," "হিন্দুপেট্রিয়ট," "কলিকাতা রিভিউ" "বেঙ্গল হরকরা" প্রভৃতি সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। তখন কব্‌হ্যারী 'ইংলিষম্যানের', ডাঃ জর্জ্জ স্মিথ্ "ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া"র, কিশোরীচাঁদ মিত্র "ইণ্ডিয়ান ফীল্‌ডে"র ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "হিন্দুপেট্রিয়টে"র সম্পাদক ছিলেন। কিশোরীচাঁদ তাঁহার সহোদর, তদ্ভিন্ন সকলেই তাঁহার পরম বন্ধু ছিলেন। "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে প্রকাশিত তাঁহার 'প্রজা ও জমিদার' প্রবন্ধ লর্ড এলবিমার্লের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং ইহার বিষয় লইয়া বিলাতের হাউস্ অব লর্ডস্ সভায় মহা আন্দোলন হইয়াছিল (vide London *Times* 5th July, 1853)। লর্ড ডাল্‌হাউসীর সময় প্যারীচাঁদ "পুলিস কমিশনে" পুলিসের অত্যাচারকাহিনী নির্ভীক ভাবে প্রচারিত করিয়া, এবং বিখ্যাত "নীল কমিশনে" নির্ভয়ে সাক্ষ্য দিয়া, সর্ব্ব সাধারণের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ভাজন হইয়াছিলেন।

মানবের অদৃষ্ট চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। সুখ চিরস্থায়ী নহে। সুখের পর দুঃখ নিশ্চয়ই আসে। প্যারীচাঁদের আট পুত্র ও তিন কন্যা হইয়াছিল। সংসারে লক্ষ্মী সরস্বতী বিরাজ করিতেছিল। এমন সময়ে (১৮৬০ খৃষ্টাব্দে) প্যারীচাঁদের পত্নী সাতপুত্র ও তিনকন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। পত্নীবিয়োগে অধীর হইয়া তাঁহার প্রথম দুই পুত্রের উপর বিষয়াদি ন্যস্ত করিয়া প্যারীচাঁদ তাঁহার বৈবাহিক শিবচন্দ্র দেবকে সঙ্গে লইয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, প্রকৃতির ক্রোড়ে শান্তি পাইবেন, কিন্তু কোথাও তিনি তাহা পান নাই। প্রায় দুই

* ইঁহাদের (বিশ্বাসদের) পূর্ব্বপুরুষ চন্দ্রনাথ পাহাড়ের সিঁড়ি ও খড়দহের শ্যামসুন্দরের মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র

INDIAN PRESS, ALLAHABAD.

বৎসর বিদেশেই ছিলেন। দেশ ভ্রমণকালে গোয়ালিয়রে উপস্থিত হইলে, বিখ্যাত গায়ক তানসেনের সাম্বৎসরিক উৎসবে প্যারীচাঁদেরও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তানসেনের সমাধির নিকট বহু গায়ক গায়িকার সমাবেশ হইয়াছিল। একটি গায়ক একটি নূতন সুরের আলাপ করাতে চারিদিকে গোলমাল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই কি সুর নির্দ্ধারণে অক্ষম হওয়ায়, শেষে প্যারীচাঁদ, একজন বাঙ্গালী, "কুকুবরাগিণী" বলায় সভাস্থ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া, তাঁহার গলায় পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া গুণের সমাদর করিয়াছিলেন। এই দেশ ভ্রমণের বিষয় সুরসিক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাঁহার "হুতুম প্যাঁচার নক্সায়" দ্বিতীয় ভাগে লিখিয়া গিয়াছেন। এবং প্যারীচাঁদও তাঁহার "যৎকিঞ্চিৎ" পুস্তকে এই দেশভ্রমণের কতক কতক বর্ণনা করিয়াছেন।

প্যারীচাঁদ যে কেবল সঙ্গীতবিদ্ ছিলেন, তাহা নয়, তিনি একজন সুরসিক মজ্‌লিসী লোকও ছিলেন। নিম্নলিখিত কয়েকটী ঘটনায় তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আহিরীটোলার রাধামাধব মিত্রের পুত্রের বিবাহে প্যারীচাঁদ ইটালীর দেবনারায়ণ দের বাড়ীতে বরপক্ষের কর্ত্তা হইয়া যান। সভাস্থলে দেনা পাওনা লইয়া গোলযোগ হওয়াতে প্যারীচাঁদ বলিয়াছিলেন, "কন্যাকর্ত্তা যদি টাকা না দিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার কেবল নামটা বদলাইলে এ পক্ষ ক্ষান্ত হইবেন।" তাহাতে দেবনারায়ণ দে রাগিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি কি ইন্‌সলভেন্টের আসামী যে নাম বদলাইব?" প্যারীচাঁদ উত্তরে বলিয়াছিলেন, "তাহা হইতেও খারাপ। নাম বদলাইতে অবশ্য হইবে, নচেৎ টাকা দাও। তোমার নামের আদিতে "দে" অন্তেতে "দে;" তবে কেবল দিতেই আসিয়াছ। এ ক্ষেত্রে দিতে অস্বীকার করিলে কাজেই নামটা বদ্‌লাইতে হইবে।" এ কথায় সকলে হাসিয়া ফেলাতে গণ্ডগোল মিটিয়া গিয়াছিল। অপর একস্থলে রাজা পরে মহারাজা কমলকৃষ্ণের ভবনে কায়স্থদিগের এক অধিবেশন হয়। উক্ত সভাতে কলিকাতার বড় বড় লোক সকলে—রাজা কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা দিগম্বর মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, চোরবাগানের দীননাথ মিত্র, জজ মহেন্দ্রনাথ বসু, হাটখোলার ভুবনচাঁদ দত্ত প্রভৃতি—উপস্থিত ছিলেন। প্যারীচাঁদও ছিলেন। সভা আরম্ভের পূর্ব্বে রাজবাটীর নিয়মমত রাজাদের মালাচন্দন দিবার জন্য অনেক লোক মালাচন্দন লইয়া আসিল দেখিয়া প্যারীচাঁদ কৌতুক করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "র'স, বুঝিয়া সুঝিয়া মালা দিতে হইবে। রাজাদের ছিলে চলিবে না, দেখা যাউক, কলিকাতার আদি নিবাসী কাহারা। কলিকাতার আদি নিবাসী যখন পালেরা, তখন কৃষ্ণদাসেরই মালা প্রাপ্য। কি বল, রাজেন্দ্র?" কৃষ্ণদাসেরই গলায় মালা দেওয়া হইল এবং সভাস্থ সকলেই খুব হাসিয়াছিলেন। আর একবার, কোন্নগরে শিবচন্দ্র দেবের বাটীতে ব্রাহ্মসভার অধিবেশনে গান হইতেছিল, "শিশু যখন ঘুমায়ে থাকে, তুমি কর চৌকীদারী।" প্যারীচাঁদ আর থাকিতে পারেন নাই। সভাভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়াই বলিয়াছিলেন, "হ্যাঁহে, কি গাইছিলে? তিনি কি মিউনিসিপাল কনেষ্টবল।" কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি হাসিয়া উঠাতে সমাজ প্রতিষ্ঠাতা বাহিরে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "প্যারী তুমি বুড় হইলে, কিন্তু তোমার রঙ্গ গেল না।"

যাহা হউক প্যারীচাঁদ দেশে আসিয়াও বিষয় কর্ম্মে তেমন আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। পুত্রদের হাতেই পূর্ব্বের মত বিষয়াদি ছিল। তিনি ডেপুটী লাইব্রেরীয়ান হইবার কিছুকাল পরেই, তাঁহার উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়া এ,এইচ্, ব্লেচিন্‌ডেন্ সাহেব উপরে লিখিয়া তাঁহাকে "কৃষিসমাজের (Agri-Horticulture Society of India) সহকারী সভাপতি করেন। উক্ত সমিতি মেট্‌কাফ হলে উঠিয়া যাইলে প্যারীচাঁদ উদ্ভিদ্‌বিদ্যার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত থাকায়, উক্ত বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সেজন্য ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আলিপুর কৃষি প্রদর্শনী মেলায় সাহায্য করিতে, তৎকালীন বঙ্গের ছোটলাট হালিডে সাহেব প্যারীচাঁদকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সময় প্যারীচাঁদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হন।

বলিতে কি সে সময় এদেশে স্ত্রীশিক্ষা ছিল না বলিলেই

হয়। উপরি উক্ত প্রদর্শনীর কিছুকাল পরেই কুমারী কার্পেণ্টার ভারত ভ্রমণে কলিকাতায় আসেন। তাঁহার সহিত প্যারীচাঁদ, প্রভৃতি লোকের, এতদ্দেশীয় স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল; এবং কুমারী কার্পেণ্টারও এ বিষয়ে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর ও প্যারীচাঁদ প্রভৃতির সাহায্যে, বেথুন সাহেব বেথুন স্কুল স্থাপন করেন। তৎকালে কন্যাকে স্কুলে দেওয়া দোষের মধ্যে পরিগণিত হইত এবং কোনও ভদ্রলোক কন্যাকে স্কুলে দিতে সাহসও করিতেন না। প্যারীচাঁদের শিক্ষা কেবল কেতাবী শিক্ষা নয়। তিনি স্বদেশীয়দিগকে সদৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য, আপন কন্যাকে অবলীলাক্রমে সর্ব্ব প্রথম স্কুলে ভর্ত্তি করিয়াছিলেন, * এবং সে জন্য তিনি দেশের লোকের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। তিনি বেথুন সোসাইটীর প্রথম সম্পাদক হইয়াছিলেন।

ছোটলাট স্যার উইলিয়ম গ্রে সাহেবের সময়, প্যারীচাঁদের ও কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী উভয়েরই অভ্যুদয় কাল। ছোটলাট গ্রে সাহেব, ড্যামপিয়ার, ওগিলবি, ডাঃ ডফ্, হেনরী গুডীব, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি মহোদয়েরা বেলা ৪টার পর লাইব্রেরীতে মিলিত হইয়া ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির আলোচনা করিতেন। প্যারীচাঁদ লাইব্রেরীতে থাকার জন্য সকল প্রকার পুস্তক আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন। এ কারণ সংবাদপত্র বা পুস্তক লিখিতে হইলে সকলেই তাঁহার নিকট যাইতেন এবং সকলেই তাঁহাকে "সজীব লাইব্রেরী ও সজীব মনোবিজ্ঞান" আখ্যা দান করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ স্যার উইলিয়ম গ্রের সহিত ঘনিষ্ঠতা হওয়াতে একদিন তিনি প্যারীচাঁদের দুই পুত্র অমৃতলাল ও চুণিলালকে দেখিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "প্যারীচাঁদ, তুমি যদি বল, আমি ইহাদিগকে কলিকাতার সন্নিকটে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট করিতে পারি।" রামগোপাল ঘোষ পাশেই বসিয়াছিলেন। তিনি দাঁড়াইয়া উঠিয়া অবাক্ হইয়া কহিয়াছিলেন, "কি প্যারী! তোমার ছেলেদের শেষে কোম্পানির চাকুরীতে ঢোকাইবে?" প্যারীচাঁদ স্বভাবতই বিনয়ী; সেজন্য এই কথা শ্রবণে কিছুক্ষণ অবনত মস্তকে থাকিয়া লাট সাহেবের দিকে তাকাইয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আপনার গবর্ণমেণ্টকে আমার পুত্রদের জন্য ভারগ্রস্ত করিতে ইচ্ছা করি না।" মনুষ্য অদৃষ্টের দাস! অদ্য তাঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রলাল সব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কর্ম্ম করিতেছেন! আর একদিন ছোটলাট গ্রে সাহেব আসিয়া প্যারীচাঁদকে তাঁহার কাউন্সিলের মেম্বর হইবার জন্য জিদ্ করায়, তাঁহার কথা এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাস হইতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত উক্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। প্যারীচাঁদের প্রাণ অতি কোমল ছিল। পশুদের প্রতি কলিকাতার গাড়োয়ানদের অত্যাচার দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তিনি পশুক্লেশনিবারণে বদ্ধপরিকর হইয়া "পশুক্লেশনিবারিণী" বিল উক্ত সভায় আইনে পরিণত করান। তাঁহার যত্নে ও অধ্যবসায়ে ও কোল্স্‌ওয়ার্থী গ্রাণ্টের আনুকূল্যে কলিকাতা সহরে পশুক্লেশনিবারিণী সভা স্থাপিত হয়; এবং তাঁহার বন্ধু গ্রাণ্টের পর তিনি অনেক দিন ঐ সভার সেক্রেটরী ছিলেন। তিনি শেষ জীবনে তাঁহার এই বন্ধুর আদর্শ জীবনচরিত লেখেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের পদ গ্রহণের সময় লাইব্রেরীয়ানের (Librarian) পদত্যাগ করেন, কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অবৈতনিক সম্পাদকের কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন। তিনি শেষ জীবনে লাইব্রেরীতে তেমন যাইতে পারিতেন না। তাঁহার যাওয়া কম হওয়াতে, বড় একটা কোন বিদ্বান লোক লাইব্রেরীতে আসিতেন না। লর্ড লিটন্ একবার লাইব্রেরী পরিদর্শন কালে এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "প্যারীচাঁদ একটী জীবন্ত লাইব্রেরী; তিনি আর তেমন আসিতে পারেন না; কাজেই আর কেহ তেমন আসেন না।" ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ওড়িশা দুর্ভিক্ষে পীড়িত লোকের কষ্টে কাতর হইয়া, প্যারীচাঁদ কলিকাতায় নিজ ভবনে অন্নছত্র খুলিয়াছিলেন।

পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির শেয়ারে প্যারীচাঁদের

* আমরা এইরূপ শুনিয়াছি যে, স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের এক কন্যাই বেথুন স্কুলের প্রথম ছাত্রী। সম্পাদক।

বিস্তর টাকা আবদ্ধ থাকায় তিনি উক্ত কোম্পানির এক-জন ডিরেক্টরের পদে পূর্ব্বেই মনোনীত হইয়াছিলেন; অধিকন্তু এখন ইংরাজ মহলে অত্যন্ত আধিপত্য হওয়ায় ডেভিড উইলসন সাহেব, আপনি বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাকে উইলসন হোটেলের ডিরেক্টর নিযুক্ত করিয়া যান। এই সময় চারিদিক হইতে তাঁহাকে ডিরেক্টর হইতে আহ্বান আসিতেছিল; কিন্তু সময়াভাব বশতঃ এড়াইতে না পারিয়া কেবলমাত্র ডারাং এবং বেঙ্গল এই দুই চা-কোম্পানির ডিরেক্টরী পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

লক্ষ্মী সরস্বতী এক স্থানে থাকেন না ইহা যথার্থ। প্যারীচাঁদের সংসারে তাহাই হইল। মরীচি দ্বীপের জন্য চাটার করা জাহাজ 'লেডীবার্ড' কার্ত্তিকে ঝড়ে ডুবিয়া গেল। তৎকালে বিমা প্রথার প্রচলন ছিল না, এজন্য উহাতে প্যারীচাঁদকে তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। পরে পোর্ট ক্যানিংএ পোর্ট করিবেন বলিয়া সিলার সাহেব বহু আড়ম্বর করিয়া লীলা খেলা সম্বরণ করিলেন। প্যারীচাঁদ স্ত্রীবিয়োগের পর বিষয় কর্ম্ম দেখিতেনও না এবং তাঁহার তেমন বৈষয়িক বুদ্ধিও ছিল না। তাঁহার প্রথম দুই পুত্র বিষয়-কর্ম্ম দেখিতেন। পোর্ট ক্যানিংএ যাঁহাদের শেয়ার ছিল, তাঁহারা সিলার সাহেবের আড়ম্বর বুঝিতে পারিয়া শেয়ার বিক্রয় করিয়া সাফ হইয়াছিলেন; কিন্তু প্যারীচাঁদের পুত্রগণ সিলার সাহেবের লীলা বুঝিতে না পারায় একেবারেই বঞ্চিত হইয়াছিলেন। বিপদের স্রোত একবার বহিলে কিছুতেই থামে না। ওদিকে তাঁহার বোম্বাই এজেন্ট প্রতারণা করিয়া প্যারীচাঁদের একলক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিল। এই সকল প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতে "প্যারিচাঁদ মিত্র এণ্ড সনসের" আফিস পতনের আগে নড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু প্যারীচাঁদ অটল। এই সকল বৈষয়িক বিপদের সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মধুসূদনের কাল হয়।

এখন রহিলেন কেবল প্যারীচাঁদ ও কিশোরী চাঁদ। দেখিতে দেখিতে কিশোরীও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। পত্নী বিয়োগের পর প্যারীচাঁদের ৪ উপযুক্ত পুত্র, ২ কন্যা ও এক জামাতার কাল হওয়াতে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়াছিল। তাঁহার মাতা ঠাকুরাণী পঞ্চপুত্রের মাতা হইয়া অবশেষে এক পুত্র প্যারীচাঁদের ক্রোড়ে ১০৪ বৎসর বয়সে স্বর্গলাভ করেন। মাতৃবিয়োগের পরও প্যারীচাঁদের এক পৌত্র ও এক প্রপৌত্র মারা যায়।

প্যারীচাঁদের মাতৃভক্তি আদর্শস্থল। তিনি প্রতি দিন প্রাতে উঠিয়া মার পাদোদক পান করিয়া অন্যান্য কর্ম্ম করিতেন। আহার কালে মা উপস্থিত না থাকিলে আহার তৃপ্তির সহিত হইতই না। তিনি মাকে সেকালে কাশী, বৃন্দাবন, পুষ্কর, জ্বালামুখী, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ করাইয়াছিলেন। ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কুমুরপুকুর গ্রামে মার দ্বারা একটা প্রকাণ্ড দীঘি প্রতিষ্ঠা করাইয়া তুলট আদি ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। মার গঙ্গাতীরস্থ থাকিবার সময় তিন দিবস প্যারীচাঁদের আহার নিদ্রা ছিল না। অন্তর্জ্জলীর সময় মার মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া "মা কোথায় ফেলিয়া গেলে" বলিয়া ৬০বৎসর বয়স্ক বিজ্ঞ প্যারীচাঁদকে রোদন করিতে দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া মাতৃভক্তির জন্য ধন্য ধন্য করিয়াছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদের পত্নীবিয়োগের পর হইতে পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন আসিয়া তাঁহার মধুর আলাপনে তাঁহাকে অনেক শান্তি প্রদান করিতেন। স্ত্রী পুত্র, কন্যা, জামাতা, পৌত্র, প্রপৌত্র, প্রভৃতির মৃত্যুতে প্যারীচাঁদের মন ইহলোকের অসারতা উপলব্ধি করিয়া পরমেশ্বরের ধ্যান ধারণায় ও পরলোকতত্ত্ব নিদ্ধারণে নিযুক্ত হইয়াছিল। তিনি প্রতিদিন প্রত্যুষে ৪টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া বেড়াইতে যাইতেন। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিলে বিখ্যাত গায়ক চন্দ্রকোণা নিবাসী রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে ব্রহ্মনাম শুনাইতেন। বয়স এত হইয়াছিল কিন্তু পড়াশুনা ছাড়েন নাই। গান শ্রবণের পর সংবাদপত্র ও গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া স্নান করিতেন। স্নানান্তে উপাসনা ও আহারাদি করিয়া বিবিধ সভার কার্য্যে গমন করিতেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাটী আসিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপৌত্র দেবেন্দ্রলালের হারমোনিয়ম আলাপনে ঈশ্বর গান শ্রবণ করিতে বড়ই ভাল বসিতেন। গান শ্রবণান্তে অধ্যয়নে নিযুক্ত

হইতেন। সন্ধ্যার সময় বেদান্তসার, বৈদান্তিক রাজযোগ, উপনিষদ, হটযোগ প্রদীপিকা, গুরুগীতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রভৃতি পুস্তক পড়িতে বড়ই ভাল বাসিতেন।

আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে জজ্ এডমণ্ড, ঈগলস, ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি, কর্ণেল অলকট প্রভৃতি লোকের সহিত তিনি লেখা পড়া করিতেন। প্যারীচাঁদ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, ও রাজকৃষ্ণ মিত্রের সহিত প্রেততত্ত্বের অনুশীলনে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহার বিদ্যা ও গবেষণায় মুগ্ধ হইয়া ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি ও কর্ণেল অলকট তাঁহাকে নিউইয়র্কের ও লণ্ডনের থিওসফিকেল সোসাইটীর ফেলো ও ভারতের স্পিরিচুয়াল সোসাইটীর সভাপতি করেন। ইউরোপের ও আমেরিকার অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহার বড় সম্মান করিতেন। এই সময়ে তিনি নরেন্দ্রনাথ সেনের অনুরোধে রামকমল সেনের জীবনচরিত লেখেন। তিনি প্রেততত্ত্ববিষয়ে আমেরিকার "ব্যাণার অব্ লাইট্" ও "লণ্ডন স্পিরিচুয়েলিষ্ট" প্রভৃতি কাগজে প্রবন্ধ লিখিতেন ও আত্মা ও অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে আরও তিনখানি ইংরাজি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। প্যারীচাঁদ প্রেততত্ত্বে এতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে, পার্শ্বের ঘরের লোক প্রায়ই প্রেতাত্মার সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা শ্রবণে ভয় পাইয়া উঠিত। মেস্‌মেরিজম তিনি ভালরূপ অভ্যাস করিয়াছিলেন। অনেক পীড়িত ব্যক্তি দেশ বিদেশ হইতে জলপড়া লইতে ও মেস্‌মেরাইজড্ হইতে তাঁহার নিকট আসিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রায় সকলে আরোগ্য হইত। "অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার নিকট ঐ বিষয়ের আলোচনার জন্য প্রায়ই যাইতেন। ধর্ম্মালোচনার জন্য কেশবচন্দ্র সেনও তাঁহার নিকট প্রায়ই যাইতেন।

ঈশ্বরপিপাসু হইয়া যাহা কিছু পাইয়াছিলেন, তাহার বিষয়ে তিনি অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন কালের স্ত্রীজাতির অবস্থা ও উৎকর্ষ বর্ণনা করিয়া "এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা," যোগ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বর্ণনা করিয়া "আধ্যাত্মিকা", সঙ্গীত পুস্তক "গীতাঙ্কুর," বাঙ্গালা ভাষা, স্ত্রীশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষার সহায়তা করিয়া "বামাতোষিনী" ও "কৃষিপাঠ," স্ত্রীশিক্ষার জন্য নীতি উপদেশ ও আদর্শ স্ত্রীজীবনী সম্বলিত "রামারঞ্জিকা" ও একটী "অভেদী" নামক অধ্যাত্মবাদ বিষয়ক উপন্যাস লেখেন। তিনি রস্তমজী কাওয়াসজীর জীবনচরিত ও অন্যান্য কতকগুলি আত্মা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন কিন্তু প্রকাশ করিবার সময় পান নাই।

প্যারীচাঁদ, মাছ মাংস প্রভৃতি দ্রব্য অনেক দিনই ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাতৃবিয়োগের পর সংসার ত্যাগ করিয়া বনবাসী হইবার ইচ্ছা তাঁহার বড়ই প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু সুবিধা না হওয়ায় স্বীয় জীবন বনবাসীর উপযোগী করিবার জন্য অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়া ফলমূল খাইয়া জীবন যাপন করিতেন। সুখের জীবনে অত কষ্ট সহ্য হইবে কেন? শীঘ্রই উদরী রোগের সূচনা হইল। তিনি সুস্থাবস্থায় দাসদাসীকে আপনার সন্তানাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন। তিনি ভালমন্দ যাহা আহার করিতেন, তাহার অর্দ্ধেক দাসদাসীর জন্য রাখিয়া দিতেন। পীড়ার দারুণ ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়াও একদিনের জন্যও তাহাদিগকে কোনও কর্কশ কথা বলেন নাই। সে দুরারোগ্য পীড়ার কিছুতেই উপশম হইল না, নশ্বর শরীর শুকাইয়া চলিল, শারীরিক বল খর্ব্ব হইতে লাগিল, শরীরশৃঙ্খল ছিন্ন করিবার দিন যত সন্নিকট হইয়াছিল, ততই অমল আত্মা উজ্জ্বলমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। অবশেষে ১৮৮৩ সালের ২৩ শে নবেম্বর রাত্রি ১০॥০ ঘটিকার সময় অমর আত্মা দেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া অমরলোকে চলিয়া গেল। প্যারীচাঁদ, তিন পুত্র—অমৃতলাল, চুনিলাল, ও নগেন্দ্রলাল—ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এই অষ্টাদশ বৎসরে সকলেই গিয়াছেন, আছেন কন্যাটী ও নগেন্দ্রলাল।

কৃষ্ণদাস পাল, ডাঃ কে, এম, ব্যানার্জি প্রভৃতি বাঙ্গালী, ও কেস্‌উইক্ ওয়াগ্‌ষ্টার প্রভৃতি ইংরাজ প্যারীচাঁদের জন্য শোক প্রকাশার্থ কয়েকটী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি কলিকাতা টাউনহলে স্থাপিত হইয়াছে; এবং তাঁহার একখানি সুন্দর তৈলচিত্র এতদিন মেটকাফ্ হলেই আছে, এবং আশা করি গবর্ণমেণ্ট মেটকাফ্ হল লইলেও উহা পূর্ব্বের ন্যায় স্বস্থানে

রক্ষিত হইবে। প্রতি বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে সর্ব্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রের জন্য তাঁহার নামের একটী স্বর্ণপদক দেওয়া হইয়াছে। পশুক্লেশনিবারিণী সভা তাঁহার নামে কয়েকটী জলের টব কলিকাতার রাস্তায় দিয়াছেন। বহুসংখ্যক ইংরাজ প্যারীচাঁদের বিষয় বিবিধ কাগজে লিখিয়াছিলেন; তন্মধ্যে পাদ্রি ডল লিখিয়াছিলেন যে, প্যারীচাঁদ তাঁহার গির্জ্জায় উপাসনা শ্রবণার্থ যাইতেন, কিন্তু একদিন ডলসাহেব যীশু-খৃষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলায়, প্যারীচাঁদ আর সে গির্জ্জায় যান নাই। এই ঘটনায় পাদ্রি সাহেব প্যারীচাঁদের বিশ্বাস ও সৎসাহসের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

যে সময়ে প্যারীচাঁদ "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে সময়ের বাঙ্গালা ভাষার অবস্থার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। উক্ত পুস্তকের তখন ভূরি ভূরি বিক্রয়ে স্পষ্টই বোধ হইয়াছিল যে, উহা ইংরাজ বাঙ্গালী কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইতেছে। এই পুস্তকের চরিত্র এত সুন্দরভাবে গ্রন্থকারের সিদ্ধহস্তে বর্ণিত যে আজ প্রায় ৬০ বৎসর ঐ পুস্তক প্রকাশিত হইবার পরে নোয়াখালীর ভূতপূর্ব্ব সেসন জজ এ. পি. পেনেল সাহেব সম্প্রতি তাঁহার নোয়াখালীর খুনী মকদ্দমার রায়ে আসামীবিশেষের সহিত ঠকচাচার চরিত্রের তুলনা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, Every Bengalee will remember the ঠকচাচা of Allaler Ghorer Dulal। "কলিকাতা রিভিউ" পত্রের সমালোচক লিখিয়াছেন, "আমাদের গ্রন্থকারের নিরীহ রহস্য গোল্ড-স্মিথের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় ও স্থানে স্থানে ফিল্ডীং এর রহস্য শক্তির কথা মনে করাইয়া দেয়।" জি, ভি, ওস্ওয়েল সাহেব, যিনি ইংরাজদিগের অনুরোধে সম্প্রতি "আলালের ইংরাজি করিয়াছেন, বলেন, "এদেশে প্যারী-চাঁদের থ্যাকারের স্থান প্রাপ্য।" যে সকল সিভিলিয়ান এদেশে আসেন, তাঁহাদের বিভাগীয় বাঙ্গালা পরীক্ষার জন্য এই পুস্তক পাঠ্য। এখনও সাহেব মহলে এই পুস্তকের বিশেষ আদর আছে, এবং অনেকেই ইহার সহিত বিশেষ পরিচিত। আমাদের উপন্যাসগুরু বঙ্কিম বাবু "লুপ্ত-রত্নোদ্ধারে"র ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "আলালের ঘরের দুলালের দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।"

শ্রীনীরেন্দ্রলাল মিত্র।*

তেলেগুদেশে।

অনেক দিন হইতে তেলেগুদেশ দেখিবার বাসনা ছিল। এক্ষণে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ যাইতে কোন ক্লেশ নাই। মাদ্রাজ ডাক গাড়ী ও যাত্রী গাড়ী প্রত্যহ গমনাগমন করিতেছে। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে অবসর পাইয়া আমরা কয়েকজন গোদাবরী দর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম।

বাঙ্গলা দেশ ছাড়িয়া সুবর্ণরেখা নদী পার হইলেই ওড়িয়াদেশ আরম্ভ। ওড়িয়াদেশের পরেই তেলেগুদেশ। চিল্কা হ্রদ পার হইতে না হইতেই উহার আরম্ভ। ওড়িয়া ও তেলেগুদেশের মধ্যস্থলে কোন নদী বা পর্ব্বত বা অপর কোন প্রাকৃতিক সীমা নাই। বস্তুতঃ পূর্ব্বকালে ওড়িয়া-দেশ এখনকার অপেক্ষা আরও দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন প্রাচীন ওড়িশার † খানিকটা মাদ্রাজ প্রেসি-ডেন্সির অন্তর্গত হইয়াছে।

ওড়িশার পর তেলেগুদেশের প্রধান নগর বহরমপুর, সংক্ষেপে বরমপুর, সাধু ভাষায় ব্রহ্মপুর। বাঙ্গলার বহরমপুর হইতে পৃথক্ করিবার নিমিত্ত এই বহরমপুরকে গঞ্জাম বরম্পুর বলিতে হয়। কটক হইতে সন্ধ্যার সময় ডাক গাড়ীতে আমরা বরম্পুর যাত্রা করিয়া রাত্রি প্রায় ২টার সময় বরমপুর ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। বামে বিস্তীর্ণ চিল্কাহ্রদ, দক্ষিণে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন পাহাড় শ্রেণীর মধ্য দিয়া আমাদিগকে অনেক পথ যাইতে হইল। জ্যোৎস্নার আলোতে চিল্কাকে সমুদ্রতুল্য বোধ হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে রেল চিল্কার জলের ধারেই বসান হইয়াছে।

---

* লেখক স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের পৌত্র। সম্পাদক।

† বাঙ্গলা ভাষায় কি রকমে 'উড়িয়া' ও 'উড়িষ্যা' নাম দুটি চলিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। যে নামে যে পরিচিত হইতে চায়, শুদ্ধ হউক অশুদ্ধ হউক, তাহাকে সেই নামেই ডাকা কর্ত্তব্য। চলিত কথায় বা লিখিত ভাষায় 'উড়িয়া' ও 'উড়িষ্যা' বলিয়া কোন শব্দই নাই। লোকের নাম ওড়িয়া, দেশের নাম ওড়িশা। এই দুই শব্দ চলিত।

চিল্কা লম্বায় প্রায় ৩০ মাইল, চৌড়ায় হারাহারি প্রায় ২০ মাইল। জলের মধ্যে কত দ্বীপ হইয়াছে, কত পাহাড় জলের উপরে মাথা উচু করিয়া রহিয়াছে। যাঁহারা ভাবুক, এবং যাঁহারা সহরের কেবল বাড়ী দেখিয়া দেখিয়া বিরক্ত, তাঁহারা রম্ভার নিকটস্থ চিল্কা দেখিয়া পরম পুলকিত হইবেন। প্রসিদ্ধ ওড়িয়া কবি কিন্তু বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত রাধানাথ রায় মহাশয় চিলিকাতে কত শোভাই দেখিয়াছেন, কত ভাবের উচ্ছ্বাসে তাঁহার 'চিলিকা' পূর্ণ হইয়াছে।

ডাক গাড়ী কিন্তু এত ভাবিতে এত দেখিতে সময় দেয় না। আমাদিগকে গভীর রাত্রে বরমপুরে আনিয়া ফেলিল। ষ্টেসনে নামিয়াই জানিলাম, তেলেগুদেশে ঘোড়ার গাড়ীর আমদানী হয় নাই। অবশ্য সাহেবদের ঘোড়ার গাড়ী আছে, দুই একজন ধনী লোকেরও এক আধ খান আছে, কিন্তু সাধারণ লোকের নিমিত্ত ভাড়া গাড়ী পাওয়া যায় না। গো গাড়ীর অভাব নাই, এক জোড়া গরুর বদলে একটি গরু গাড়ী টানিয়া থাকে। শুধু এখানেই নহে, তেলেগুদেশের অন্যান্য সহরেও ঘোড়ার গাড়ীর অত্যন্ত অভাব। ভদ্র লোকেরা, আপিসের কর্ম্মচারীরা আবশ্যক হইলে গো-যানেই গমনাগমন করিয়া থাকে।

ষ্টেসন হইতে কিছু দূরে আমাদের নিমিত্ত বাসা নির্দ্দিষ্ট ছিল। কোন ওড়িয়া ভদ্রলোকের অনুগ্রহে আমরা ঘোড়ার গাড়ী পাইয়াছিলাম। তাঁহার নাম শুনিলে অনেক বাঙ্গালী পাঠক নিশ্চিত বিস্মিত হইবেন। নামটি ডেনিয়াল মহান্তী। তাঁহার এক পুত্রের নাম জোন্‌স মহান্তী, অন্য এক জনের নাম ভাস্কর মহান্তী। পরে জানিলাম, তিনি খ্রীষ্টসম্প্রদায়ভুক্ত, তাই এমন বিচিত্র নাম। আমাদের কাছে এই রকম নাম আর বিচিত্র ঠেকে না। কটকে খ্রীষ্টসম্প্রদায়ভুক্ত অনেক ওড়িয়ার এই প্রকার অপরূপ নাম শুনিতে পাওয়া যায়। জন, জেকব, জোন্‌স, রিচাড, ফিলেমন প্রভৃতির পরে পাত্র, দাস, মহান্তী ইত্যাদি যথেষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। বোনাপার্ট সাহু, রিচার্ডচন্দ্র দাস ইত্যাদি নামের অর্থ করিতে ভবিষ্য মানবকুল অক্ষম হইবে। তবে, কালোহি দুরতিক্রমঃ। নাম-সঙ্কর কালমাহাত্ম্যেরই পরিচয় দিতেছে।

প্রাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া দেখি আমাদের বাসার প্রায় চারি দিকেই স্থানে স্থানে পাথর মাথা উচু করিয়া আছে। এই সকল পাথর বিলক্ষণ শক্ত; এত শক্ত যে সহজে কাটিয়া আকার দিতে পারা যায় না। তাই ওড়িয়া ভাষায় এই রকম পাথরকে অকর্ম্মশিলা বলে। ইংরাজি "নীস" বলা অপেক্ষা অকর্ম্মশিলা বলাই ভাল। সহরের ভিতরে ভিতরে কোন কোন স্থানে এইরূপ পাথর কোথাও বা উচ্চ, কোথাও বা চারিদিকের ভূমির সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ এখান হইতে পূর্ব্বঘাট গিরি শ্রেণীর আরম্ভ বলা যাইতে পারে। রাজমহল হইতে আরম্ভ করিয়া ওড়িশার জাঙ্গল দেশের পাহাড়সমূহকে যদি পূর্ব্বঘাটের অন্তর্গত মনে করিতে পারা যায়, তাহা হইলে কোন কথা উঠিতে পারে না। কিন্তু আরব সাগরের কত নিকটে পশ্চিমঘাট, সাগরের ঠিক ঘাটই বটে; কিন্তু পূর্ব্বঘাট ঠিক সেরূপ নয়। সমগ্র দক্ষিণাপথ পার্ব্বত্যদেশ। তাহার মধ্যে উচু নীচু পাহাড় থাকিবেই। পূর্ব্ব দিকের এই সকল খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন পাহাড়কেই পূর্ব্বঘাট বলিতে হয়। অতএব নামটি তত সার্থক হয় নাই। অন্ততঃ পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট এক প্রকার নহে।

পার্ব্বত্য দেশ বলিয়া তেলেগু দেশে জলের বিশেষ কষ্ট। বরমপুরে অনেক পুষ্করিণী আছে বটে, কিন্তু একটারও জল মিষ্ট নহে। কূপের জল বরং ভাল, কিন্তু মহানদীর মত সুমিষ্ট জল কেবল গোদাবরীতেই পাইয়াছিলাম। কি বরমপুরে, কি অন্যত্র পাথর বাঁধান কূয়া আছে, কিন্তু জল ক্ষারীয় বিস্বাদ। একে গ্রীষ্মকাল, তাহাতে জলের কষ্ট; তেলেগু দেশের প্রতি আমার বন্ধুগণ চলিয়া গেলেন। তার উপর এখান হইতে দ্রাবিড় ভাষার ল ও ড প্রধান শব্দের আরম্ভ। একটি কথা বুঝিবার যো নাই, একটি শব্দ উচ্চারণ করিতে পারা যায় না, কেবল হাড়ুড়ুডু বলিয়া বোধ হয় আর এক বিচিত্র, বাসা হইতে বাহির হইয়া যে দিকেই দেখি, সেই দিকেই বড় বড় তেঁতুল গাছ। এক স্থানে কেবল তেঁতুল গাছের একটা বাগান (?) দেখিতে পাইলাম। তখন মনে হইল, ঝাল লঙ্কা ও তেঁতুল না হইলে তেলেগু আমাদের

ভোজন সমাধা এক দিনও হয় না। বাল্যকালে শুনিয়াছিলাম, তেঁতুল গাছের হাওয়া যত রোগ টানিয়া আনে। কিন্তু তেলেগুদিগের বলিষ্ঠ দেহ দেখিলে তেঁতুলের অখ্যাতি চলিয়া যায়। শুধু বরমপুর কেন, প্রসিদ্ধ বিজিয়ানাগ্রামে, বিশাখাপত্তনেও সহরের বসতির মধ্যে বড় তেঁতুল গাছ। রাজামহেন্দ্রীতে তরিতরকারির বাজারে গিয়া দেখি, তেঁতুলপূর্ণ ঘরে বসিয়া দোকানদার সের সের তেঁতুল বিক্রয় করিতেছে। পাশের একখান ঘরে বড় বড় টাবা নেবুর মত এক রকম নেবু—বোধ হয় খুব টক—স্তূপাকার হইয়া আছে। পাশের আর একখান দোকানে লঙ্কার সেইরূপ স্তূপ। এমন ঝাল যে, জিহ্বা স্পর্শ মাত্রে জ্বালায় অস্থির হইতে হয়। যে দেশে কুটুম্বের তত্ত্বের মধ্যে লাল লঙ্কা (মিরকাইলু) প্রেরিত হয়, সে দেশে উহা নিশ্চিত উপাদেয়। গঞ্জাম জেলার পার্লাখেমড়ী নামক রাজ্যে তিন চারি ক্রোশ ব্যাপিয়া চিন্তাপাণ্ডুর (তেঁতুলের) বাগান আছে।

তেলেগুদিগের গৃহনির্ম্মাণে কিছু বিশেষত্ব আছে। উচ্চ 'পিণ্ডা', খোলার চাল,গেরিমাটীর লাল রঙ্গ, ইটের থামের মত গোলাকার ক্রমশঃ সরু লাল রঙ্গলিপ্ত কাঠের খুঁটী; ঘরগুলি দেখিতে মন্দ নয়। নিকোন পুছন পরিষ্কার, লালরঙ্গের দেওয়ালে সাদা চিত্র; মন্দ দেখায় না। সহর গুলিও বাহিরে বেশ পরিষ্কার, তবে বাড়ীর ভিতরে যত ময়লা। ছোট ছোট ঘর, ছোট ছোট বাড়ী, তার মধ্যে ময়লার জঞ্জাল। তবে কিনা, সকলের চোখ সমান নয়, নাকও সমান নয়; বাঙ্গলা দেশের অনেক সহরে নাক টিপিয়া চলিতে হয়। এমন পরিষ্কার সহর কলিকাতা; প্রথম প্রথম দুই তিন দিন শ্বাস রুদ্ধ হইবার মত হয়।

বরম্পুরে একদিন থাকিয়া আমরা প্রসিদ্ধ বিজিয়ানাগ্রাম যাত্রা করিলাম। ইংরাজির অনুকরণে আমরা কখনও বিজিয়ানাগ্রাম, কখনওবা ভিজিয়ানাগ্রাম করিয়া ফেলিয়াছি। ওড়িয়া মালীরা উহাকে ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া ইজানগরে দাঁড় করাইয়াছে। বস্তুতঃ আসল নাম বিজয়নগর। তেলেগু ভাষার প্রকৃতি অনুসারে শেষে ম্ আসে, ফলে বিজয়নগরম্ হয়। বিজয়নগরম্‌কে বরং বিজিয়ানাগ্রাম বলিলে তেলেগু ভদ্রলোকেরা মার্জ্জনা করিতে পারেন, কিন্তু ভিজিয়ানাগ্রাম করিলে অশিক্ষিত বলিয়া ভাবিবেন।

বিজয়নগরম্ ষ্টেসনটি ছোট, কিন্তু লতাপাতায় সুন্দর। এক তেলেগু ভদ্রলোক ষ্টেসন মাষ্টার, পায়ে তেলেগু চটি, গায়ে সাদা ইংলিশ কোট, পরণে এক প্রান্তে মুক্ত লম্বিত কচ্ছ, ছোট কিন্তু চৌড়া ধুতী, মাথায় পাগড়ী। ইহাই তেলেগু ভদ্রলোকদিগের সভ্য পরিচ্ছদ। ভুলিয়াছি, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র। বস্তুতঃ, তেলেগুদিগের পরিচ্ছদ দেখিলেই তাহাদিগকে আযোতর জাতি বলিয়া বোধ হয়, কি রকম কাপড় চোপড় পরিলে ঠিক মানাইবে, যেন এখনও তাহা স্থির হইতে পারে নাই। একথা পরে হবে।

বরমপুরে যদি বা ওড়িয়া কিছু কিছু চলে, বিজয়নগরে কেবল তেলেগু। যাহারা মনে করেন, হিন্দি জানিলে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত লোকের সহিত কথোপকথন করিতে পারা যায়, দ্রাবিড় দেশে আসিলে তাঁহাদের এই ধারণা পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। বাঙ্গলা, হিন্দি, মরাঠী, ওড়িয়া—সকলেই সংস্কৃতমূলক। ইহাদিগের সাধুভাষায় কতকটা বুঝিতে পারা যায়, এবং এক একটা খাঁটি সংস্কৃত শব্দ শুনিলে প্রথম প্রথম আশ্চর্য্য বোধ হয়। কিন্তু তেলেগুর ন্যায় দ্রাবিড় ভাষার প্রত্যেক শব্দই নূতন। অত্যল্প তেলেগু হিন্দি বুঝে; তাহারা হয়ত কর্ম্মোপলক্ষে পশ্চিমে বেড়াইয়া আসিয়াছে। অন্য দিকে বঙ্গদেশ অপেক্ষাও ইংরাজি চলন অধিক মনে হয়। দক্ষিণে মান্দ্রাজের দিকে যতই যাওয়া যায়, ইংরাজি চলন তত অধিক দেখা যায়। গোশকট-চালক গোয়ালা পর্য্যন্ত ইংরাজি বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত করে। বাজারে ইংরাজি পোঁওে পিতল কাঁসা বিক্রয় হয়। বিদেশীয় ভাষায় গোলযোগে পড়িতে না হয়, এজন্য কলিকাতায় অনেক সাহেবেরা বাড়ীতে তেলেগু খানসামা, তেলেগু আয়া নিযুক্ত করিয়া থাকেন। ওড়িশায় শিক্ষিত ভদ্রলোক মাত্রেই বাঙ্গলা জানেন, লিখিতে না পারিলেও ছাপা পড়িতে, শুদ্ধ বলিতে বেশ অভ্যস্ত। কিন্তু ওড়িশা ছাড়িয়া দক্ষিণে গেলেই বাঙ্গলাভাষার শেষ দেখা যায়।

আমরা প্রাতে বিজয় নগরে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেসন হইতে বাহির হইবামাত্র এক সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়িল।

সম্মুখে এক প্রকাণ্ড দীঘিকা, যদিও সমগ্র জলপূর্ণ নহে, তথাপি তাহার বিস্তারে ও তিন পাশের দূরস্থ পাহাড়-মালার বেষ্টনে মনোরম দেখায়। দীঘির অপর পার্শ্বে মহারাজার দুর্গবেষ্টিত প্রাসাদ, বামে নগর, দক্ষিণে তাল নারিকেলের বন। নগরের পশ্চাতে পাহাড়, যেন পাহাড়ের কোলে নগরটি স্থাপিত। কিন্তু সেই জলের কষ্ট। পাথরবাঁধান কূপ অনেক আছে, কিন্তু কূপে জল অল্প, নাই বলিলেই হয়। দলে দলে স্ত্রীলোকেরা মস্তকে বড় বড় কলস লইয়া কূপের নিকট জনতা করিয়া থাকে। প্রত্যেকের হাতে জল তুলিবার নিমিত্ত তালপাতার ঠোঙ্গা। ঠোঙ্গা বেশ হালকা, অথচ দুই ঘটী জল অনায়াসে উঠে, কূয়ার গায়ে ঠেকিয়া তত ভাঙ্গিবার নহে। এই ঠোঙ্গার চলন এদেশে খুব আছে। রাজামহেন্দ্রীতে এই প্রকার ঠোঙ্গা টিনের তৈরি হইয়া থাকে। কলাই-ভাঙ্গা যাঁতার একটা পাটী মাঝামাঝি কাটিয়া তাহাকে ফাঁপা করিলে যেমন দেখায়, ঠোঙ্গার আকার তেমনই।

অপরাহ্ণে আমরা মহারাজার প্রাসাদ দেখিতে বাহির হইলাম। দুর্গের ভিতরে ঢুকিতে হইলে কোন কর্ম্মচারীর অনুমতি লইতে হয়। আমাদের সঙ্গী দোভাষী যুবক অনুমতি আনিলেন। কিন্তু ভিতরে ঢুকিয়া যেই অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইব, দ্বারবানেরা আমাদিগকে জুতা ত্যাগ করিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। আমরা থামিয়া গেলাম। দেবালয় নহে, ভিতরের বাড়ীও নহে, বাহির বাড়ীতে ঢুকিতে জুতা কেন খুলিব, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। শেষে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, দেশীয় লোক মাত্রেই জুতা খুলিয়া যায়, কেবল সাহেবেরাই জুতা ও বুট পায়ে রাখিয়া ভিতরে ঢুকিতে পারে। এ সকল কথা অবশ্য দোভাষীর সাহায্যে হইল। যখন বলিলাম, আমরা বাঙ্গালী, জুতা খুলি না, তখন ভৃত্যেরা খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া রহিল, এমন নূতন কথা যেন কখনও শুনে নাই। কারণ তেলেগু দেশে জুতা পরিচ্ছদের মধ্যে নহে। বেশভূষা করিয়া ভদ্রলোকেরা পাদুকা-হীন পদে রাজপথে স্বচ্ছন্দে চলিয়া বেড়ায়। যাঁহারা পাদুকা ধারণ করেন, তাঁহারা পাদুকাহীন হইতে কিছুমাত্র ভাবেন না। পথে পুলিশপ্রহরী, মাথায় লাল বোঁচা পাগড়ী, গায়ে খাকী কোট, পাজামা, কিন্তু পা খালী। জমাদার বেশ পোষাক আঁটিয়াছেন, কিন্তু খালী পায়ে নিজের গাম্ভীর্য্য যেন রাখিতে পারিতেছেন না। সে দেশে জুতা পরাই অসাধারণ, তাহাতে আমরা জুতাশুদ্ধ বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতে চাই! এরূপ যাইতে হইলে একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক। বস্তুতঃ তাঁহাকে এ নিমিত্ত কমিটি বসাইতে হইবে কি না, আমরা তাহাই ভাবিতে ভাবিতে ভিতরে যাইবার আশা ত্যাগ করিয়া মহারাজার উদ্যান দেখিতে গেলাম। সেখানে জুতার ভাবনা নাই, কেন না বাগানটি বিলাতী ধরণের, মাঝে জলের ফোয়ারা, এক পাশে টেনিস ইত্যাদি খেলিবার স্থান। মহারাজা যুবা, একজন সাহেব শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন। জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু আচার ব্যবহারে তেলেগু। এইরূপ ওড়িশার কোন কোন করদ রাজ্যের রাজা ক্ষত্রিয়, কিন্তু আহার বিহারে আচার ব্যবহারে ওড়িয়া হইতে পৃথক্ করিতে পারা যায় না। কেবল আহারের ও বিবাহের সময় ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিতে পারা যায়। বিজয়নগরের মহারাজার আয় প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা, পদগৌরব বিলক্ষণ আছে; তবে নামে মহারাজা, ক্ষমতায় বাঙ্গলা দেশের জমীদার।

বিজয়নগরের জরি দেওয়া উৎকৃষ্ট ধুতী ও সাড়ী তেলেগু তাঁতির নৈপুণ্য প্রকাশ করে। বাঙ্গলার মুরশিদাবাদ বহরমপুরের মত গঞ্জাম বরম্‌পুর গরদের ধুতী সাড়ীর নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। এক এক গরদের ধুতী ২৫৲।৩০৲ টাকায় প্রায় বিক্রয় হয়। বিজয়নগরের কার্পাস বস্ত্রের উপর জরির পাড়। ধুতী লম্বায় ৮।৯ হাত, বহরে প্রায় ৩ হাত, চাদর ৬ হাত, ধুতী চাদরে ১৪ হাত। সাড়ী ১০।১২।১৪ হাত। ১৪৲।১৫৲ টাকায় এক রকম চলনসই এক জোড়া ধুতী বা সাড়ী পাওয়া যায়। ২৫৲।৩০৲ টাকায় যাহা পাওয়া যায়, তাহাও নাকি খুব উৎকৃষ্ট নয়। এই সকল ধুতী সাড়ী তত সরু সূতার নয়, বাহাদুরী সূতার পাইটে, সমানভাবে জমানতে। আমাদিগের পক্ষে ৩ হাত বহরের অথচ লম্বায় ছোট ধুতী তত উপযোগী নয়। কিন্তু সাড়ীগুলি বাঙ্গলা দেশে বেশ চলিতে পারে। তবে, জরি বাঁচাইয়া ধুইতে জানিবার ধোপা আবশ্যক।

তেলেগুদিগের কাপড় পরার রীতি অনুসারে এত বহর না রাখিলে চলে না, এবং হয় জরি, না হয় রেশম, না হয় ছাপা পাড় চাই। ১২।১৪ হাত সাড়ীর জন্য স্ত্রীলোকদিগের লজ্জা নিবারণ বেশ হয়। ১০ হাতী সাড়ী পরিলে উপরে ওড়না স্বরূপ একখান চাদর আবশ্যক হয়। বোধ করি, বাঙ্গালী মেয়েরা ভিন্ন ভারতের আর কোথাও কেহ বস্ত্রপরিধানে এত কৃপণতা করে না। মাড়োয়ারী, মরাঠী স্ত্রীলোক স্বচ্ছন্দে বাড়ীর বাহিরে আসিতে পারে। কাপড় সামলাইতেই তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না; এমন কি ওড়িয়া স্ত্রীলোকও হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত সাড়ী পরিলেও ১২।১৪ হাত লম্বা সাড়ীর গুণে লজ্জানিবারণে সবিশেষ দক্ষ। কেবল বাঙ্গালী মেয়েরাই,—তাও পশ্চিমবঙ্গের—কাপড় পরিতে জানে না বোধ করি, ১২ হাত সাড়ীর প্রচলন হইলে কতকটা উন্নতি হইতে পারে।

আমরা বিজয়নগরে একদিন থাকিয়া প্রাতে ৭টার ডাক গাড়ীতে রাজামহেন্দ্রী যাত্রা করিলাম। বেলা প্রায় ৩টার সময় প্রখর গ্রীষ্মের রৌদ্র ভোগ করিয়া রাজামহেন্দ্রী ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। গোদাবরীর উপরেই রাজামহেন্দ্রী নগর। কিন্তু ষ্টেসন হইতে নগর প্রায় দুই মাইল দূরে, অথচ ঘোড়ার গাড়ী নাই। একজন ভদ্রলোক ভাড়া দিবার নিমিত্ত দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়াছেন। দেখিলে বোধ হয়, গরুর গাড়ীকে কোন রকমে ঘোড়ার গাড়ী করিয়াছেন। যেমন গাড়ী, তেমনই ঘোড়া; তার উপর পথের লোক সরাইবার অভিপ্রায়ে তেলেগু চালকের বিকট চীৎকার। ওড়িয়া মাঝির নৌকায় চড়িয়া নদী পার হইয়াছি, নৌকা ছাড়িবার সময় সে কলরব, সে ব্যস্ততা বেশ মনে আছে, এবং নৌকা ঠিক চলিবার সময় মাঝির মুখের গাম্ভীর্য্য, সাহসিকতার লক্ষণ বেশ মনে হইতেছে; যেন প্রতিক্ষণে তাহারা যাত্রীকে বলিতে থাকে, দেখ জলরূপ ভূতের বুকে চড়িয়া যাইতেছি অথচ ভয় করি না! সেইরূপ রাজামহেন্দ্রীতে তেলেঙ্গা গাড়োয়ানের অশ্বচালনা দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, বনের জানোয়ার ধরিয়া গাড়ী চালান সোজা কথা নহে। যাহাহউক, রাজামহেন্দ্রী সহরের লোকজনকে ডাকিয়া আপনাদিগকে দেখাইতে দেখাইতে বাসায় পঁহুছিলাম।

বাসাটি দোতলা, নূতন তৈয়ারী, সেখানকার সবজজ মহাশয়ের; সবজজের নামের গুণেই হউক, বা নূতন বাড়ী বলিয়াই হউক, দেখিলাম সহরের প্রায় সকলেই বাড়ীটিকে চিনে। কিন্তু হায়! সন্ধ্যার সময়ের ঘোর বৃষ্টির সমস্ত জল বাহিরে না পড়িয়া ঘরের ভিতরেই পড়িতে লাগিল। রাত্রে শুইবার নিমিত্ত তিলার্দ্ধ শুক্‌ন জায়গা রহিল না। কি করিয়া রাত্রি কাটান যাইবে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে সহরটার উপর ভারি রাগ হইতে লাগিল। কিন্তু নাচার। উপরে পাকা ছাত করিয়া সদরআলা মহাশয় কি বিষম ভুলই করিয়াছেন। দেওয়ালের সঙ্গে ছাতের জোড় মিশে নাই, অবিরল ধারা বিগলনের পক্ষে কোন বাধাই ছিল না। বলিতে ভুলিয়াছি, তেলেগু দেশে পাকা বাড়ী থাকিলেও পাকা ছাত প্রায় নাই। যেমন বাড়ীই হউক, রাজার হউক, সরকারী আফিস আদালত হউক, রেলের ষ্টেসন হউক, উপরে খোলা; লাল খোলা পরিপাটী সাজান, কোথাও বা দুই তিন প্রস্ত খোলা। দূর হইতে দেখিতে বেশ সুন্দর, খোলা খুব মজবুত, দেশে বানর নাই, ভাঙ্গেও না। ছাইবার গুণে ঘোর বৃষ্টিতেও বিন্দুমাত্র জল ঘরের ভিতরে পড়ে না। আমরা যদি এই রকম একটা বাড়ী পেতাম!

প্রাতে কিন্তু প্রসন্নসলিলা গোদাবরী দেখিয়া আমাদের মন প্রসন্ন হইল। শীঘ্র স্নানাহ্নিক সমাপন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। কিন্তু সুখশান্তি কোথায়? ওড়িশা ক্ষেত্র ছাড়িয়া পাণ্ডাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু হায়, একদল তেলেগু পাণ্ডাদের হাড়্‌ডুড়্‌ শব্দে কাণের সূক্ষ্ম ঝিল্লী বিলক্ষণ ক্ষুব্ধ হইতে লাগিল। গোদাবরী তীর্থে স্নান করিতে আসি নাই, বুঝায় কে? গোদাবরী যে আদি গঙ্গা, তাহার প্রমাণ হৃদয়ঙ্গম করায় কে? নিতান্ত নিরুত্তর দেখিয়া একজন পাণ্ডা সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় লইল। কিন্তু বলিতে কি, হাড়্‌ডুড়্‌ বরং ছিল ভাল, দেবভাষার এমন তেলেগু উচ্চারণে মন ব্যথিত হইতে লাগিল। যাহাহউক, স্নান সংকল্প না করাইয়া ছাড়িল না; তটে মার্কণ্ডেশ্বরের মন্দির, সেই ঘাটে স্নান করিয়া কোটিজন্মের পাপ ধৌত করা গেল। তিন মাইল দূরে কোটিলিঙ্গম্ ছিল; সেখানে যাইতে

পারিলে ভবিষ্যতে কোটিজন্মের পাপও মোচন হইতে পারিত। গোদাবরীতে অগাধ জল, বিস্তারে দুই মাইল। কিন্তু কটকে মহানদীর তুল্য জল আনিকট দ্বারা বাঁধা। রাজামহেন্দ্রী হইতে তিন মাইল নীচে গোদাবরীর চারি মুখ চারিটা বাঁধে আবদ্ধ হইয়াছে। চারিটা বাঁধের মাঝে মাঝে তিনটা খাল দূরস্থিত কৃষিক্ষেত্রে জল সেচন করিতেছে। এদিকে রেল গাড়ী যাইবার নিমিত্ত দুই মাইল লম্বা সেতু গোদাবরীর বুকের উপর দাঁড়াইয়া আছে। একখানা ছোট ষ্টীমার এ পারের লোক ও পারে লইয়া যাইতেছে।

কটকে আম ফুরাইয়া আসিয়াছিল, রাজামহেন্দ্রীতে তখনও মাবুড়িপাণ্ডুলু (আম) অপর্য্যাপ্ত। এ সব অঞ্চলে চাল্‌তার আকারের মত এক রকম আম পাওয়া যায়। স্বাদে ও অন্যান্য গুণে ছোট ফজলী বলিয়া ভ্রম হয়। রেলের অনুগ্রহে এই আম 'ইজানগর' হইতে কটকে রপ্তানী হইতেছে। কিন্তু কলিকাতায় এই আম কখনও দেখি নাই। বোধ করি, আমব্যবসায়ীরা এই আমের সন্ধান জানে না। নইলে, যখন কলিকাতায় আম উঠিতে আরম্ভ করে না, তখন এই চাল্‌তা আমে বেশ দু-পয়সা লাভ হইতে পারে। বিজয়নগরের মহারাজারই নাকি আমের শতাধিক বাগান আছে। সেখানে, বিশাখাপত্তনে আমের কলম যথেষ্ট পাওয়া যায়। বিজয়নগরে আমরা এই আম টাকায় ১২টা, বিশাখাপত্তনে ২০টা, রাজামহেন্দ্রীতে ২০টা করিয়া কিনিয়াছিলাম। ইহা ছাড়া অন্য অনেক রকম আম পাওয়া যায়, সে গুলির মধ্যে বাছিয়া লইতে পারিলে বঙ্গদেশের আমের সংখ্যা বাড়াইতে পারা যায়। এখানকার আনারসেরও প্রশংসা করিতে পারা যায়।

বোধ হয় কলিকাতার ফল ব্যবসায়ীরা জানে না যে, ওড়িশার সমুদয় ফল বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা অন্ততঃ ১৫ দিন আগে পাকে। কোন কোন ফল এক মাস আগেও পাকিয়া থাকে। কটকে মাঘ মাসে তরমুজ পাকে, আম বৈশাখ মাসে প্রচুর, পাকা তাল পৌষ মাসে পাওয়া যায়। ওড়িশা ফলের দেশ নহে, কিন্তু আম কাঁঠাল আনারস প্রভৃতি যে দুই চারিটী আছে, তত ভাল না হইলেও আগে পাকিবার গুণে বঙ্গদেশে আদর পাইতে পারে। বোধ হয়, ওড়িশার গ্রীষ্মাধিক্যই ফল আগে পাকিবার কারণ। বিজয়নগর কি বিশাখাপত্তনে অন্যান্য ফলও পাওয়া যাইতে পারে। বোধ হয় সেখানেও কলিকাতার আগে পাকিয়া থাকে।

তেলেগুদিগের ধুতী সাড়ী উড়ানীর ছাপা পাড় দেখিয়া প্রথমে মনে হইয়াছিল, সে সকল কাপড় সে দেশে তৈয়ারি হইয়া থাকে। এক কালে এ দেশ ছাপা কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মসলিপত্তন এখনও এই দুর্দ্দিনে পূর্ব্বখ্যাতি কিয়ৎ পরিমাণে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সমুদয় রাজামহেন্দ্রীর বাজার তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, মসলিপত্তনের দুই দশ খান নিকৃষ্ট ছাপা ছাড়া সমুদয় ছাপা কাপড় বিলাতী! কলিকাতার বাজারে আমাদের পরিবার মত বিলাতী ধুতী চাদর দেখিয়া প্রথম প্রথম মনে হয়, বুঝি বাঙ্গলা দেশ ছাড়িলে বিলাতী ধুতী চাদরও সঙ্গ ছাড়িবে। কিন্তু তেলেগু রমণীর নিমিত্ত ১২।১৪ হাত সাড়ী হইতে পুরুষদের নিমিত্ত ৮।৯ হাত ধুতী ও তদনুরূপ চাদর বিলাতে বুনা হইয়া ও পাড় ছাপা হইয়া তেলেগু দেশের বাজার পূর্ণ করিয়াছে। মনে হইত বাঙ্গলাই বুঝি পাশ্চাত্য সভ্যতার ঢেউয়ে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে, বেশভূষায়, আহারে আচরণে ইংরাজি অনুকরণে বেশ দক্ষতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু দেখিলাম, বাঙ্গলা বরং পদে আছে, উন্মুক্তকচ্ছপ্রান্ত ছাপা-পাড় ক্ষুদ্র ধুতী পরিয়া, গলায় নেকটাই বাঁধিয়া, বুকে ওয়েষ্ট কোট ও খোলা কোট বাহির করিয়া, অথচ আধুনিক রীতির ধূমে মাথায় ছাপা-পাড় পাগড়ী আঁটিয়া রাজপথে ভ্রমণ করিতে, ফটো তুলাইতে তেলেগু ভায়ারা লজ্জা বোধ করেন না। ওড়িয়া ভায়ারা প্রাচীন বেশভূষার আমূল সংস্কার করিতেছেন, এখন কবে গলার মালাটি যায়, তাহারই অপেক্ষা করিতেছেন। সেইরূপ বোধ হয় তেলেগু ভায়ারা কপালের ফোঁটার অন্তিম কাল দেখিবার প্রত্যাশায় বসিয়া আছেন। এ দিকে কিন্তু আসল সভ্যতাতেই হীন, পায়ে জুতা নাই, অন্ততঃ বিলাতী জুতা বুট এখনও তত চলন হয় নাই। জাতীয়তা রক্ষা করিতে জাতীয় ভাষার চর্চ্চা আবশ্যক। কিন্তু

তেলেগু পাঠশালায় তেলেগু বর্ণপরিচয় শেষ হইতে না হইতে ইংরাজি বর্ণপরিচয় আরম্ভ হয়। শুনিয়াছি তেলেগু সাহিত্য নাকি বিলক্ষণ পুষ্ট। অবশ্য তাহা প্রাচীন কালের। এ কালে কে কোথায় নিজের মাতৃভাষার চর্চা করিতেছে? দূর প্রদেশে প্রবাসী বাঙ্গালী তাহার ধুতী চাদর ছাড়ে নাই। কিন্তু তেলেগুদিগের মাথায় কে এমন উৎকৃষ্ট বেশের লোভ ঢুকাইয়া দিল? তেলেগুদিগের মাথা খোলা রাখাই রীতি; এ বিষয়ে তেলেগু ওড়িয়া বাঙ্গালী এক *। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার ঘোরে মাথায় ফেল্টক্যাপ প্রচুর পরিতেছে, পাগড়ীটা বোধ করি জাতীয়তা রক্ষার নূতন উদ্যম, কেবল ইয়ঙ্গ তেলেগুর সভ্য হইবার অনুকরণ-প্রয়াস।

জাতীয়তা, প্রাচীনতা রক্ষা করিতে রমণীরাই সমাজের চিরসহচরী। তেলেগুদিগের মধ্যে জেনানা নাই বটে, কিন্তু রমণীগণ প্রাচীন বেশভূষা ত্যাগ করেন নাই। জেনানায় অভ্যস্ত লোকের নিকট অজেনানা দেশের মুক্তভাবে স্বচ্ছন্দমনে নিঃসঙ্কোচে বিচরণশীলা গৃহলক্ষ্মীগণ প্রথম প্রথম বিস্ময় উৎপাদন করেন। বাঙ্গালীর মেয়ে বাড়ীর বাহির হইলেই জড়পুটুলী। কি যেন বিষম বিপদে পড়েন, কে যেন দেখিতে পাইল, কে যেন তাকাইয়া আছে, এই ভাবনাতেই শশব্যস্ত। একদিকে ব্রীড়া, অন্যদিকে পদস্খলনের, সমুচিত বস্ত্রাভাবের আশঙ্কা তাঁহাদের মুখে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা যদি মরাঠী বা তেলেগু রমণীর স্বচ্ছন্দতা, নির্ভয়ে গমনাগমন, মুখের ভদ্রোচিত গাম্ভীর্য্য দেখিতেন, তাহা হইলে অনেক শিখিতে পারিতেন। বুঝিতেন, একদিকে যেমন বাঙ্গলার নূতন সৃষ্টি নিউ উয়োমানের মাধুর্য্যহীনতা, বোধ হয় লজ্জাহীনতাও, নাই; অন্য দিকে বালিকার সুবর্ণপুষ্পশোভিত লম্বিত বেণী, এবং যুবতী ও প্রৌঢ়ার বামনিবদ্ধ-কবরীর মধ্যে চাঞ্চল্যহীন গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখও সৌন্দর্য্যবিকাশে কোন অংশে হীন নহে।

তেলেগুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্বর্ণ দেহের বর্ণ দেখিয়া প্রায় চিনিতে পারা যায়। গৌরবর্ণ ব্যক্তি মাত্রেই ব্রাহ্মণ, শূদ্র ও বৈশ্যবর্ণ মাত্রেই কৃষ্ণবর্ণ। ক্ষত্রিয় আছে কি না, জানি না; একজনও দেখি নাই। গৌরবর্ণ দেখিয়া ব্রাহ্মণ ঠাওরাইতে প্রায় ভুল হয় না। ব্রাহ্মণেরা এক প্রকার তিলক কাটিয়া থাকেন, তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিতে সংশয় থাকে না। তেলেগু ব্রাহ্মণ দেখিতে সুপুরুষ, দেহও বলিষ্ঠ। ব্রাহ্মণ রমণী অবশ্য গৌরী, কিন্তু কিঞ্চিৎ লাবণ্যহীনা বোধ হইল। বোধ হয় তেলেগু রমণী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী।

গোদাবরী হইতে প্রত্যাগমনকালে আমরা অল্পকালে বিখ্যাত ওয়াল্‌তেরে আসিলাম। এই স্থানটি স্বাস্থ্যকর বলিয়া খ্যাতি হইয়াছে। তার উপর, সমুদ্রকূলে স্থাপিত বলিয়া লোকের দৃষ্টি সহজে পড়িয়াছে। ওয়াল্‌তের কিন্তু দুইটি—একটি পুরাতন, অপরটি নূতন, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান প্রায় দুই মাইল। তেমনই নূতন ওয়াল্‌তের ও বিশাখাপত্তনের মধ্যে ব্যবধান প্রায় দুই মাইল। তিনটিই সমুদ্রকূলে; মধ্যে নূতন ওয়াল্‌তের, দক্ষিণে বিশাখাপত্তন, উত্তরে পুরাতন ওয়াল্‌তের। বিশাখাপত্তন শুদ্ধ নাম, তেলেগু ভাষায় বিশাখাপত্তনম্। ইংরাজিতে হইয়া গিয়াছে ভিজিগাপাটম; সংক্ষেপে সাহেবেরা ভাইজাগে দাঁড় করাইয়াছেন। বিশাখাপত্তন জেলা; সেখানে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির আফিস আছে। কিন্তু সাহেবেরা প্রায় সকলেই নূতন ওয়াল্‌তেরে বাস করেন। এইরূপে সাহেবী পাড়া হইতে নূতন ওয়াল্‌তেরের জন্ম হইয়াছে। সাহেব ভিন্ন অন্য কোন লোকের বাস সেখানে নাই। তাঁহাদের ক্লব সেখানে। এই ক্লবের ম্যানেজার একজন বাঙ্গালী। তাঁহারই সাহায্যে নূতন ওয়াল্‌তেরে আমরা একটি বেশ বাড়ী পাইয়াছিলাম। না পাইলে বড় কষ্টে পড়িতে হইত। বস্তুতঃ সেখানে সুবিধামত বাড়ী পাওয়া দুর্ঘট। পুরাতন ওয়াল্‌তেরে বাড়ী পাওয়া যায়।

উক্ত বাঙ্গালী ভদ্র লোকটির কথায় তেলেগু দেশে প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা মনে হইতেছে। দেখিলাম এমন প্রসিদ্ধ স্থান নাই, যেখানে বাঙ্গালী নাই। বরমপুরে একজন বাঙ্গালী উকীল, তথায় বেশ মান্যগণ্য। রাজামহেন্দ্রীতে একজন বাঙ্গালী কবিরাজি করিতেছেন,

* এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ভদ্র তেলেগু মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতির মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ এক প্রকার সনাতনী প্রথা।

তাঁহার দুই একজন আত্মীয় সেখানে কণ্ট্রাক্টরী করেন। সেখানে স্কুলের আসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর একজন বাঙ্গালী; বিশাখাপত্তনে ঈষ্টকোষ্ট ট্রেডিং কোম্পানী নামে বাঙ্গালীর দোকান, ওয়ালতেরে ক্লবের ম্যানেজার বাঙ্গালী ছাড়া আরও কয়েকজন আছেন। দক্ষিণে বেজওয়াডায় নাকি একটি ছোটখাট বাঙ্গালী পাড়া হইয়াছে। তেলেগুরা বাঙ্গালীদিগকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করে। শিক্ষিত তেলেগুরা মনে করে, বাঙ্গালী এক অদ্বিতীয় জাতি। গোদাবরীতে কোন তেলেগু ভদ্র লোককে বাঙ্গালীর প্রতি অতিরিক্ত শ্রদ্ধাবান্ দেখিলাম। পাছে এই শ্রদ্ধা গিয়া শেষে ঘৃণা আসে, তাই তাঁহাকে একটু সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে হইল। তিনি দুই চারিজন বাঙ্গালীকে জানেন বা কাগজে তাঁহাদের সুনাম পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে বিলক্ষণ কাপুরুষ, দুরাচার আছে, সকলেই সাধুচরিত্র ও দেশানুরাগী নহে। হায়, এই শেষোক্ত কথা প্রবাসী কয়েকজন বাঙ্গালীর সম্বন্ধে শুনিতে পাইলাম। তাঁহারা নিজেদের এমন অযাচিত মানসম্ভ্রম হেলায় হারাইয়াছেন যে, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী জাতির নামে কলঙ্ক আনিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবুর প্রশংসা গোদাবরীতে যে যুবা কোরাণীর নিকট শুনি, না জানি কোন কোন প্রবাসী বাঙ্গালীর কুৎসিৎ চরিত্র শুনিলে তিনি কত মর্ম্মাহত হইবেন। প্রবাসী বাঙ্গালীর কত দায়িত্ব আছে, যিনি তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম, তিনি যেন কোথাও দীর্ঘকাল প্রবাসে না কাটান। সমাজবন্ধনের বাহিরে গিয়া যথেচ্ছাচারের প্রলোভন ত্যাগ করা সকলের সাধ্য নয়, কিন্তু তা বলিয়া নিজের মান সম্ভ্রম খোয়াইয়া ফল কি? তেলেগুদিগের প্রতি কোন বাঙ্গালীর ঘৃণার ভাব দেখিলাম। ইহা দ্বারা তিনি যে নিজের উন্নতির পথ রোধ করিতেছেন, তাহা বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ তেলেগুরা অতিশয় বিনয়ী। রেল ষ্টেসনের কেরাণী ও ষ্টেসন মাষ্টার হইতে আফিসের ছোট বড় কর্ম্মচারী, স্বাধীন জমিদার, উকীল—যাঁহারই সহিত কথা কহিয়াছি, তাঁহারই বিনয়নম্রতায় পরিতুষ্ট হইয়াছি। অবশ্য ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা হইয়াছে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক কথাতেই Sir শব্দ ব্যবহার করিতে শুনিয়াছি। বাঙ্গালী অশিষ্টাচার করিয়া মনে করে, Spirit দেখাইলাম, কিন্তু শিষ্টাচারের সহিত Spirit শোভা পায়, অন্যত্র মূর্খস্য লাঠ্যৌষধম্ মনে আসে।

কি কথা বলিতে বলিতে কি কথায় আসিয়া পড়িয়াছি। বলিতেছিলাম, ওয়াল্‌তের স্থানটি মনোরম। সহরের জনতা কোলাহল দুর্গন্ধ নাই, সমুদ্রের বাতাসে গ্রীষ্মকালের মশা পর্য্যন্ত তিষ্ঠিতে পারে না। পাহাড় জঙ্গল স্থানে স্থানে প্রকৃতির মনোহারী ভাব জাগাইয়া তুলে। সহরের ভিতরে প্রকৃতির দুইটি গম্ভীর বিষয়ের অভাব ঘটে। সেখানে অকূল সমুদ্র বা উচ্চ পাহাড় থাকে না। পুরীতে সমুদ্র আছে বটে, কিন্তু পাহাড়ের গায়ে সমুদ্র নাই। আছে কেবল বালুকা। পাহাড়, জঙ্গল, সমুদ্র একাধারে দেখিতে হইলে ওয়াল্‌তেরে যাইতে হয়। গ্রীষ্ম নাই, কটকে যখন ১০৪° ফা গরম বাতাস ছুটিতে থাকে, তখন ওয়াল্‌তেরে ৯৪° ফা। ওয়াল্‌তের জায়গা বেশ, কিন্তু সেই জলকষ্ট। মাইল দুই মাইল দূরস্থিত সমুদ্রের নিকটের কুয়া হইতে ব্যবহারের সমস্ত জল সংগ্রহ করিতে হয়। তার উপর ওয়াল্‌তেরে হাট বাজার নাই, দুই মাইল দূরে বিশাখাপত্তনে না গেলে খাদ্যসামগ্রী কিছুই পাওয়া যায় না। খাদ্যসামগ্রী যে আমাদের পছন্দসই, তাহাও বলা যায় না। একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। তেলেগু শূদ্র ভিন্ন ব্রাহ্মণ বৈশ্যেরা মৎস্য মাংস ভোজন করেন না। অনেকে ভাতের পরিবর্ত্তে এক বেলা 'মাণ্ডিয়ার' জাউ খাইয়া থাকেন।

বিশাখাপত্তনের বিকৃত নাম ভাইজাগ, সংক্ষিপ্ত বলিয়া ঐ নাম চলিত বলিতে হইবে। পূর্ব্বে সমুদ্রতটে নাকি বিশাখেশ্বরীর মন্দির ছিল, এখন তাহা রত্নাকর নিজের গর্ভে টানিয়া লইয়াছেন। বিশাখাদেবীর নিমিত্ত বিশাখাপত্তন নামের উৎপত্তি। ওয়াল্‌তের হইতে সমুদ্রতট দিয়া বিশাখাপত্তনে যাইতে পাকা রাস্তা আছে, বামে সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ, দক্ষিণে তাল বন ও রোপিত নারিকেল গাছ। বস্তুতঃ দক্ষিণ দেশটাকে এক এক সময় তালগাছের দেশ বলিয়া মনে হয়। তালগাছ গুলির জন্ম বৃথা হয় নাই, তাহাদের মুণ্ডিত মস্তক দেখিলেই বোধ হয়, তেলেগুরা গাছের যথোপযুক্ত ব্যবহার করিয়া থাকে।

বিশাখাপত্তন সহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবে স্থানে স্থানে দুর্গন্ধেরও অভাব নাই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিশাখাপত্তন সুন্দর। সহরের সদর রাস্তার গায়ে স্থানে স্থানে অকর্ম্মশিলার উচ্চ পাহাড়, অদূরে সাগর। সমুদ্র-বাতাস সর্ব্বদা বহিতেছে, এজন্য সেখানে তত গরম হয় না। নূতন শিল্পের মধ্যে গজদন্তের, মহিষশৃঙ্গের, চন্দন কাষ্ঠের সুন্দর পরিপাটী বাক্স, ছড়ি, খেলানা, ফটোফ্রেম প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হয়। হাতীর দাঁতের অনুরূপ শাদা হাড়ের নক্সা করা মহিষের শিঙ্গের কাজ গুলি অবশ্য তত সুন্দর হয় না। এইরূপ একটা মাঝারি আকারের ফটো ফ্রেম ২৲।৩৲ টাকায় পাওয়া যায়, গজদন্তের কাজ থাকিলে মূল্য দ্বিগুণ হয়। চন্দন কাঠের ছড়ি, মাথায় হাতীর দাত—মূল্য ১০৲।১২৲ টাকা। সকল কাজের উপরটা এমন মসৃণ যে কারুকে ধন্য বলিতে হয়। শুনিলাম, বিক্রয় মন্দ হয় না, দেশ দেশান্তরে যায়, বিলাতের প্রদর্শনীতে পুরস্কার পায়। বস্তুতঃ উপরের পালিশ দেখিলে প্রথমে বিলাতী বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু পরিকল্পনা অলঙ্করণ দেখিলে দেশের শিল্প বলিতে কোন সংশয় থাকে না। লিখিবার নিমিত্ত ডেস্ক্, মণিমুক্তা রাখিবার বাক্স, এক একটার ১৫০৲।২০০৲ টাকা দাম। দুইজন কারিগর বিখ্যাত। এক জনের নাম গামুগুলা চিন্না বিরন্না গারু, অপরের নাম গামুগুলা রামলিঙ্গম্ গারু। ঠিকানা বিজিগাপাটনে পত্র দিলেই তাহারা তাহাদের জিনিষের মূল্য-তালিকা পুস্তক পাঠাইয়া থাকে। একটা দেশের শিল্পের বিষয় দুই এক কথায় বলা চলে না। এজন্য তেলেগুদিগের সোণারূপার অলঙ্কার কিম্বা পিতলকাঁসার বাসনের উল্লেখ না করিয়া প্রবন্ধান্তরে জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

তেলেগুদেশের দুইটি বিষয় এখন মনে হইতেছে। দেশটি ওড়িশার মত গরীব নয়, এবং বাঙ্গলার মত 'সভ্য' নয়।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

আণ্ডামানী।*

আণ্ডামানবাসীদিগের সংখ্যা যেরূপ কমিয়া আসিতেছে, তাহাতে তাহাদের শীঘ্রই সম্পূর্ণ বিলোপের আশঙ্কা হয়। এইজন্য ইহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা যায়, লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা মানবতত্ত্ববিজ্ঞানের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জে ক্ষুদ্র বৃহৎ ২০০টি দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে কতকগুলিতে কোন মানুষ নাই। ভূতত্ত্ববিদেরা মনে করেন যে, এই দ্বীপপুঞ্জ পূর্ব্বে এশিয়া মহাদেশের সহিত যুক্ত ছিল। মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড বসিয়া গিয়া সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হওয়ায় অবশিষ্টাংশ সাগর পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বীপে পরিণত হইয়াছে। দ্বীপগুলি যে এখনও ক্রমশঃ বসিয়া যাইতেছে, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

আণ্ডামান নাতিশীতোষ্ণ। ইহার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১০০ ইঞ্চের উপর। বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন বৃষ্টি পড়ে। জলবায়ুর অবস্থা এইরূপ হওয়ায় এখানে স্নায়বিক অবসাদ, উদরাময়, ম্যালেরিয়া জ্বর ও কাশির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। দ্বীপগুলি সমুদ্রতট পর্য্যন্ত নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে বেত্রাদির জঙ্গল এরূপ ঘন যে, অরণ্যচারী আণ্ডামানীগণও তাহার ভিতর দিয়া যাইতে পারে না। দ্বীপগুলির প্রাকৃতিক দৃশ্য অনেক স্থলে বড় সুন্দর। কিন্তু আণ্ডামানীগণ তাহা বুঝিতে বা উপভোগ করিতে অসমর্থ। এখানে কোনও বড় বন্য জন্তু দৃষ্ট হয় না। আদিম নিবাসীরা নানাবিধ ফলমূল, মাছ, চিংড়ী, মধু ও পোকা মাকড় খাইয়া প্রাণ ধারণ করে।

আণ্ডামানবাসীরা নেগ্রিটো জাতীয়। ভারতবর্ষের সাঁওতাল, কোল, প্রভৃতি জাতির মধ্যে নেগ্রিটো রক্তের সংমিশ্রণ আছে, য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এইরূপ অনুমান করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন আণ্ডামান দখল করেন, তখন বৃহৎ আণ্ডামান দ্বীপে আনুমানিক ৬,০০০ এবং ক্ষুদ্র আণ্ডামান দ্বীপে ২,০০০ লোক ছিল।

* *A History of our Relations with the Andamanese* Compiled from Histories and Travels, and from the Records of the Government of India. By M. V. Portman, M.A.I., &c., Officer in charge of the Andamanese Two Volumes, 1899.

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বহু প্রাচীনকালে আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জ এশিয়া মহাদেশের সহিত সংযুক্ত ছিল। আণ্ডামানবাসী-দিগের মধ্যে এরূপ জনশ্রুতিও আছে যে, একবার প্রলয় হইয়া তাহাদের দেশের অনেক অংশ সমুদ্রে ডুবিয়া যায়।

আণ্ডামান নামটির উৎপত্তি সম্বন্ধে পোর্টম্যান সাহেব বলেন যে, মালয়বাসীরা প্রাচীনকাল হইতে আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জে গিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে ধরিয়া আনিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত। তাহারা আণ্ডামানীদিগকে রামায়ণবর্ণিত বানর বা হনুমান মনে করিত। মালয়েরা হনুমান কথাটি "হণ্ডুমান" এইরূপ উচ্চারণ করে। এই হণ্ডুমান হইতে আণ্ডামান নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

আণ্ডামানীরা ১২টী গোত্রে এবং ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক গোত্র আবার অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত এক এক গোত্রের লোকে একই প্রকার তীর ধনু ব্যবহার করে, একই রকম গহনা ও উল্কি পরে এবং প্রায় একই ভাষায় কথা কহে। গোত্রনির্ব্বিশেষে আণ্ডামানী-দের আর এক প্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে তাহারা "আর-য়াউটো" অর্থাৎ বেলাবাসী, এবং "এরেমটাগ" অর্থাৎ অরণ্যবাসী, এই দুই দলে বিভক্ত। বেলাবাসী ও অরণ্যবাসীদের মধ্যে প্রভেদ এই :—বেলাবাসীরা প্রধা-নতঃ সমুদ্রতীরে বাস করে, এবং প্রধানতঃ সমুদ্র হইতে নিজ নিজ খাদ্য আহরণ করে। এইজন্য তাহারা জঙ্গল-বাসিগণ অপেক্ষা সাঁতার ও ডুব দিতে এবং মাছ বিঁধিতে অধিক দক্ষ। তাহারা এরেমটাগ-গণ অপেক্ষা সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু এবং মৎস্য ও অপরাপর সামুদ্রিক জীবগণের বিষয় অধিক জানে। এরেমটাগ বা জঙ্গলবাসীরা জঙ্গ-লের ভিতর দিয়া পথ চিনিয়া যাইতে ও শূকর শিকার করিতে অধিকতর দক্ষ। তাহারা আণ্ডামানের প্রাণী ও উদ্ভিদ্ সমূহের বিষয় আর-য়াউটোগণ অপেক্ষা অধিক জানে, কিন্তু তাদের চেয়ে ভীরু ও ধূর্ত্ত। জঙ্গলবাসীরা কচ্ছপাদি শরবিদ্ধ করিতে পারে না। বেলাবাসী ও জঙ্গলবাসীদের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান চলে। একই গোত্রের দুইটি ভাগের মধ্যে অনেক সময় যুদ্ধ হয়। আণ্ডামানীদিগের মৈত্রীর ক্রম নিম্নলিখিতরূপ। পরি-বারের মধ্যে তাহাদের প্রীতি খুব বেশী। এক গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যেও ভাব আছে। এক গোত্রের লোকদের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে সদ্ভাব আছে। পরিচয় থাকিলে স্বকীয় দলের অন্যান্য গোত্রের লোকদের সঙ্গে তাহারা ভদ্রতা রাখিয়া চলে। স্বকীয় দলভুক্ত অপরিচিত অন্যান্য গোত্রের লোকদিগকে, এতদ্ব্যতীত অপর আণ্ডামানী-দিগকে এবং সমুদয় বিদেশী লোককে তাহারা শত্রু মনে করে। আণ্ডামানীদের গোত্র জন্মগত। "বেলাবাসী" বা "জঙ্গলবাসী" নামও জন্মের উপর নির্ভর করে। কখন কখন পুত্রীকরণ (adoption) দ্বারা একজন "জঙ্গলবাসী" "বেলাবাসী" হইতে পারে, কিন্তু "বেলাবাসী" কখনই "জঙ্গলবাসী" হইবে না। কারণ বেলাবাসীরা জঙ্গলবাসী-দিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে।

আণ্ডামানী পুরুষদের গড় উৎসেধ ৪ ফুট ১০½ ইঞ্চি, স্ত্রীলোকদের ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। পুরুষদের গড় স্বাভাবিক দৈহিক উত্তাপ ৯৯ ডিগ্রী, স্ত্রীলোকদের ৯৯.৫। পুরুষ-দের গড় নাড়ী-স্পন্দন মিনিটে ৮২ বার, স্ত্রীলোকদের ৯৩ বার। পুরুষের গড় শ্বাসপ্রশ্বাস মিনিটে ১৯ বার, স্ত্রী-লোকের ১৬ বার। পুরুষদের গড় ওজন ৯৬ পাউণ্ড ১০ আউন্স, স্ত্রীলোকদের ৮৭ পাউণ্ড। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ইহাদের স্বাভাবিক দৈহিক উত্তাপ আর্য্য জাতীয় মানবদিগের উত্তাপ অপেক্ষা কিছু বেশী। ইহার ঠিক কারণ নিরূপিত হয় নাই। হয়তঃ তাহাদের খাদ্য প্রধানতঃ আঙ্গারিক (carbonaceous) বলিয়াই এরূপ হয়, কিম্বা সর্ব্বদা ম্যালেরিয়াপূর্ণ দেশে বাস করায় হয়ত অনেক সময়েই তাহাদের প্রচ্ছন্ন জ্বর থাকে, যাহা তাহারা নিজেই অনুভব করিতে পারে না।

তাহারা শীতকে বড় অপসন্দ ও ভয় করে। কিন্তু তাহাদের দেশ অপেক্ষা শীতল ভারতবর্ষীয় কোন স্থানে তাহাদিগকে লইয়া গেলে তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না. বরং স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। তাহারা রোদ বেশ সহিতে পারে, কিন্তু কখনও কখনও তাহাদের খুব মাথা ধরে ও রৌদ্রজনিত জ্বর হয়। তাহারা খুব গ্রীষ্মের সময়ও দিবা দ্বিপ্রহরে সম্পূর্ণ উলঙ্গ ভাবে, মাথা কোন প্রকারে আবৃত না করিয়া জলে স্থলে সর্ব্বত্র বিচরণ করে। খুব রোদের সময় ডোঙ্গায় করিয়া জলে বিচরণ করিতে হইলে তাহারা

কখন কখন পাতার ছাতা ব্যবহার করে। তাহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা মোটেই সহিতে পারে না। ক্ষুৎপিপাসা বোধ হইবামাত্রই উপায় থাকিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ উভয়ই নিবারণ করে। তাহারা সাধারণতঃ ২৪ ঘণ্টার বেশী না ঘুমাইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু কখন কখন কোন বড় নাচ উপলক্ষে তাহাদিগকে চারিদিন চারি রাত্রি জাগিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। তাহারা তাহার পর কিন্তু অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে।

তাহাদের কাহারও কাহারও গলার স্বর গম্ভীর ও কর্কশ হইলেও অধিকাংশেরই স্বর অনুচ্চ ও মিষ্ট। তাহারা স্বভাবতঃ "দূরদর্শী"। তাহারা অনেক সময় শাদা ও লাল রংএ শরীর রঞ্জিত করে। তাহা না করিলে পুরুষেরা এবং যুবতী নারীরা দেখিতে কুৎসিত নয়। তাহাদের নাসিকা সুগঠিত, ঠোঁট পাতলা, মুখের হাঁ ছোট, দন্তপংক্তি সমোচ্চ ও শাদা, চক্ষু উজ্জ্বল, এবং দেহ সুঠাম। বুড়াবুড়িরা অনেক সময় বড় কদাকার হয়। আণ্ডামানীদের রং কয়লার মত কাল। কাহারও কাহারও গ্রীবাস্থি, কপোলফলক (cheek bones) প্রভৃতি রক্তাভ কপিশ বর্ণ হয়। তাহাদের আঙ্গুল ও ঠোঁট হইতে কখনও কখনও কাল রং উঠিয়া যাওয়ায় তাহাদিগকে শবলিত দেখায়। তাহাদের চুলের রং ঝুলের মত কাল, গাঢ় কপিশ, সোনালি, লাল, প্রভৃতি হয়। ভিন্ন ভিন্ন গোত্রের কেশরচনাপদ্ধতি স্বতন্ত্র। কেহ বা মস্তক মুণ্ডন করে, কেহ দীর্ঘ জটা ধারণ করে, কেহ মাথার মাঝখানে এক গোছা চুল রাখিয়া দেয়, কেহ বা খুব খাট করিয়া চুল কাটে। তাহাদের শরীর প্রায়ই অতিরিক্ত রোমশ হয় না। কিন্তু সম্পূর্ণ লোমহীনতাও দেখা যায় না। কাহারও কাহারও সামান্য দাড়ি গোঁফ হয়। দাড়িগোঁফবিশিষ্ট ব্যক্তিদের অহঙ্কারের সীমা থাকে না। তাহারা ভ্রূ কামাইয়া ফেলে।

ইহাদের মধ্যে স্বাভাবিক অঙ্গবৈকল্য প্রায় দেখা যায় না। বোঝা বহিবার জন্য তাহারা মাথার উপর একটা মোটা ফিতা ব্যবহার করে। এইজন্য মাথার মাঝখানে একটা দাগ পড়িয়া যায়। এই দাগ স্ত্রীলোকদের মধ্যে অধিক লক্ষিত হয়। কারণ তাহাদিগকে জ্বালানি কাঠ প্রভৃতির ভারি বোঝা বহিতে হয়। প্রায় ছয় বৎসর বয়স হইতে বোঝা বহায় তাহাদের মাথার খুলি পর্য্যন্ত ফিতার দাগে দাগে নীচু হইয়া যায়। আণ্ডামানীরা ৬০।৬৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে।

ইহাদের মধ্যে জন্মগত উন্মাদ প্রায় দেখা যায় না। নরহত্যা করিবার প্রবল ইচ্ছারূপ উন্মাদ কখনও কখনও দেখা যায়। এইরূপ ক্ষিপ্ত লোকেরা কাঁচা মাংস, মাটি প্রভৃতি খাইতে আরম্ভ করে, এবং কোনও মানুষকে মারিলে তাহার কাঁচা চর্ব্বি খায় ও রক্ত পান করে। এইরূপ রাক্ষসপ্রবৃত্তি ক্ষিপ্ত লোকেরা কিছুদিন অত্যন্ত বিভীষিকা উৎপাদন করে। কিন্তু প্রায়ই কেহ না কেহ জ্ঞাতিবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য শীঘ্রই তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে।

আণ্ডামানী বালকবালিকা ও যুবকযুবতীদের বুদ্ধি, এবং তাহাদের স্বাভাবিক অবস্থার সহিত সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত বিষয় বুঝিবার ক্ষমতা, যথেষ্ট আছে। পোর্টম্যান সাহেব বলেন যে যাহাদের বুদ্ধি বেশী, তাহাদের চেহারা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত, এবং স্বভাব কোপন। চল্লিশের পর আণ্ডামানীদের বুদ্ধি কমিয়া আসে। তাহার পর তাহারা অধিকতর বর্ব্বর ও বিবাদপ্রিয় হয়।

আণ্ডামানীরা পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে ধীর ও মৃদুস্বভাব, শিশুবৎসল, কিন্তু আশুক্রোধী রাগিলেই খুন করিয়া বসে। তাহারা নিষ্ঠুর, ঈর্ষাপরায়ণ, বিশ্বাসঘাতক এবং বৈরনির্য্যাতনপ্রিয়। উপকার বা অনিষ্ট বেশীদিন তাহাদের মনে থাকে না। তাহারা কৃতজ্ঞতার কোন ধার ধারে না। তাহারা নিজ নিজ পত্নীকে ভাল বাসে, মন্দগুণ গুলি অপরিচিত ব্যক্তিদের জন্য রাখিয়া দেয়। তাহারা আমোদপ্রিয়, মৃগয়াসক্ত এবং স্বাধীনচিত্ত। তাহারা কোন কাজই অধিকক্ষণ ধরিয়া করিতে ভাল বাসে না। স্ত্রীলোকদের বুদ্ধি পুরুষদের সমান না হইলেও নিতান্ত কম নয়। বৃদ্ধারা অনেক সময়ই সম্মানলাভ করে। তাহারা পুরুষদের চেয়ে দীর্ঘজীবী হয় এবং বৃদ্ধবয়সে কোপনস্বভাব বা কলহপ্রিয় হয় না। আণ্ডামানীরা নারীকে পুরুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করে। স্ত্রীরা কার্য্যত স্বামীদের দাসী; তাহাদের সমস্ত কাজই স্ত্রীরা করে।

আণ্ডামানীদের দৃষ্টিশক্তি স্বভাবতঃ ইউরোপীয়দিগের দৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা তীক্ষ্ণ নহে; অভ্যাস এবং জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজন বশতঃ কখন কখন তীক্ষ্ণ হয় বটে। তাহারা সভ্যজাতিদের প্রিয় সুগন্ধি বা পুষ্পের সুঘ্রাণের প্রতি কোন অনুরাগ দেখায় না; ফুল দিয়া নিজ নিজ দেহকেও ভূষিত করে না। তাহারা অন্ধকারে কেবল ঘ্রাণ দ্বারা কাহাকেও চিনিতে পারে না। পোর্টম্যান সাহেবের মতে তাহাদের কোন ইন্দ্রিয়শক্তিই স্বভাবতঃ সভ্যজাতিদের ইন্দ্রিয়শক্তি অপেক্ষা তীক্ষ্ণ নহে। অভ্যাস প্রয়োজন ও শিক্ষা প্রযুক্ত অধিক তীক্ষ্ণ হয় মাত্র।

ওঙ্গে-শ্রেণীভুক্ত গোত্রগুলি ব্যতীত অপর সমুদয় গোত্রের আণ্ডামানীরা উল্কিদ্বারা দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ "বিভূষিত" করে।

আণ্ডামানীদের নাম তিন রকমের। (১) জননী-জঠরে থাকিবার সময়ে শিশুর যে নাম হয়, আমরণ সেই নাম ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক গোত্রে এইরূপ নাম মোটে প্রায় কুড়িটি আছে। যখন কোন স্ত্রীলোক অন্তঃসত্বা হন, তখন তিনি শিশুর এই নাম রাখেন। যমজ সন্তান হইলে ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার নামকরণ হয়। যদি কাহারও প্রথম সন্তান মারা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় সন্তান হইলে তাহাকে প্রথম সন্তানের নামটি দেওয়া হয়, এবং তাহাতে "ঈল্" অর্থাৎ "দ্বিজ" বা "পুনর্জাত" কথাটি যোগ করিয়া দেওয়া হয়। কারণ, আণ্ডামানীরা বিশ্বাস করে যে পূর্ব্বমৃত সন্তানটিই আবার জন্মিয়াছে। আমাদের দেশেও কিয়ৎ পরিমাণে এই প্রকার একটি বিশ্বাস আছে। সেই জন্য কোন মাতার সন্তান পুনঃ পুনঃ মারা গেলে মৃত শিশুটির কান কাটিয়া বা বিঁধিয়া দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য, যেন সে আবার না আসে, বা আসিলে ঐ চিহ্ন দ্বারা যেন তাহাকে চেনা যায়। (২) বিদ্রূপাত্মক বা বিশেষত্বসূচক নাম। শিশুদের নিজের বা তাহাদের পিতামাতার শারীরিক গঠনে বা আচরণে কোন বিশেষত্ব থাকিলে এইরূপ নাম দেওয়া হয়। এগুলি বিদ্রূপাত্মক, অঙ্গবৈকল্যসূচক, বা সম্মানজ্ঞাপক হইতে পারে। (৩) পুষ্প-নাম। এই নাম কেবল স্ত্রীলোকদিগকেই দেওয়া হয়। কোন বালিকা যে সময়ে প্রাপ্তবয়স্কা হয়, তখন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পুষ্পের মধ্যে যেটি ফুটিতে থাকে, তদনুসারে স্ত্রীলোকটির পুষ্পনামকরণ হয়। পুষ্পপ্রস্ফুটনের সহিত নারীজীবনের অবস্থাবিশেষের সাদৃশ্যবোধ আমাদের দেশেও আছে। মনুষ্যশিশুর জন্ম, এবং, পুষ্প হইতে বীজ, ও তাহা হইতে বৃক্ষশিশুর জন্ম, এই উভয়ের সাদৃশ্যই এরূপ বোধের মূল বলিয়া অনুমিত হয়। আণ্ডামানীরা কতকগুলি সম্মানসূচক নামও ব্যবহার করে। প্রৌঢ় পুরুষগণকে সম্মানার্থ "মাঙ্গ্ আ" ও "মাম্", এবং বিবাহিতা নারীগণকে "চান" বলা হয়। সন্তানেরা পিতামাতাকে নাম ধরিয়া ডাকে না। যুবকযুবতীরা বয়োজ্যেষ্ঠদিগের সহিত কথা কহিবার সময় তাহাদের বিদ্রূপাত্মক বা বিশেষত্বসূচক এবং কখন কখন তাহাদের ডাকনাম (proper name) পর্য্যন্ত ব্যবহার করে না।

আণ্ডামানীরা একটি মাত্র বিবাহ করে। বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদের যৌন নীতি ভাল না হইলেও বিবাহের পর স্ত্রীপুরুষ উভয়েই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থাকে।

পীড়ার সময় আণ্ডামানীরা লাল গৈরিক লেপন ও সেবন করে। জ্বর হইলে ও মাথা ধরিলে তাহারা কপাল হইতে এবং ফোড়া হইলে যেখানে ফোড়া হয় সেখান হইতে রক্তমোক্ষণ করে। কোন স্থানে বেদনা বোধ হইলে সেখানে মানুষের হাড়ের মালা পরে। তাহারা একেবারে পথ্যাপথ্যজ্ঞানবিবর্জ্জিত নহে।

তাহারা গাছে চড়িতে খুব পটু এবং খুব দ্রুত হাঁটিতে ও দৌড়িতে পারে। আর-য়াউটোরা সুনিপুণ সন্তরক; তাহারা ঠিক যেন জলচর জীব। ফেনিল সমুদ্রতরঙ্গের মধ্যে তীরধনু দ্বারা মাছ মারিতে ইহাদের অসাধারণ দক্ষতা দৃষ্ট হয়।

তাহারা স্বপ্নে এবং "জ্ঞানী লোক"দের ভবিষ্যদ্বাণীতে দৃঢ় বিশ্বাস করে। তাহারা নির্ভুলরূপে দুইয়ের অধিক গণিতে পারে না; পাঁচ পর্য্যন্ত কোন প্রকারে কষ্টে সৃষ্টে পারে।

আণ্ডামানীরা যাযাবর ও বড় নোংরা। এই জন্য তাহারা (ক্ষুদ্র আণ্ডামান ব্যতীত অন্যত্র) স্থায়ী বা বৃহৎ কুটীর নির্ম্মাণ করে না। এক একটি গ্রামে সাধারণতঃ ১৪টী কুঁড়ে ঘর থাকে। সেগুলি ডিম্বাকারে সজ্জিত। ঘার

Photograph by আণ্ডামানীদের নৌকানির্ম্মাণ। *Bourne and Shepherd.*

[Photograph by] আণ্ডামানী নাচ। [*Bourne and Shepherd.*

Photograph by] আণ্ডামানীদের কচ্ছপ শিকার [*Bourne and Shepherd.*

Photograph by] আণ্ডামানীরা মাছ বিঁধিতেছে। [*Bourne and Shepherd.*

ভিতরের দিকে। গ্রামের মধ্যে নাচের জন্য কতকটা ফাঁকা যায়গা থাকে। কুঁড়ে ঘরগুলি সম্মুখে সাড়ে চারি ফুট এবং পশ্চাতে ৮ ইঞ্চি মাত্র উঁচু। চাল ঘাস পাতা প্রভৃতি দিয়া ছাওয়া, চারি পাশে দেওয়াল থাকে না। কুঁড়ে ঘরগুলি ৪ ফুট লম্বা ও ৩ ফুট চওড়া; ইহাই এক একটি পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট। গ্রামের এক প্রান্তে অবিবাহিত পুরুষদিগের জন্য এবং অপর প্রান্তে অবিবাহিতা নারীগণের জন্য এক একটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কুটীর থাকে।

আণ্ডামানীরা প্রত্যেকে স্বস্বপ্রধান। কিন্তু গোত্রের বয়োবৃদ্ধগণের কিছু ক্ষমতা আছে। মেজাজ, যুদ্ধে ও মৃগয়ায় শৌর্য্য, বুদ্ধির উৎকর্ষ, প্রভৃতি অনুসারে এক এক জন গোত্রপতি নির্ব্বাচিত হন। তিনি ক্রমে ক্রমে এই পদের অধিকারী হইয়া উঠেন; বাস্তবিক যে পঞ্চায়েত করিয়া তাঁহাকে নির্ব্বাচন করা হয়, তাহা নয়। এই অসভ্য জাতির মধ্যে, বার্দ্ধক্যের সম্মান আছে। কাহারও বিরুদ্ধে কেহ অপরাধ করিলে, ফরিয়াদী নিজেই আসামীর সম্পত্তি নষ্ট করিয়া কিম্বা তাহাকে জখম বা খুন করিয়া তাহার দণ্ড দেয়। আণ্ডামানীরা নরমাংসভোজী নহে।

ইহাদের কোন লিখিত ভাষা নাই। পরস্পরের মধ্যে চিন্তা বা ভাব বিনিময়ের জন্য কোন সঙ্কেতাদির ব্যবহারও নাই। প্রত্যেক গোত্রের ভাষা প্রায় স্বতন্ত্র। অপর গোত্রের লোকে তাহা প্রায় বুঝিতে পারে না।

ইহাদের মধ্যে এক প্রকার দীক্ষা আছে। ১২ হইতে ১৬ বৎসর বয়সে দীক্ষা হয়। এই বয়স হইতে দীক্ষিত ব্যক্তিরা কোন কোন খাদ্য দ্রব্য বর্জ্জন করে। কয়েক বৎসর পরে কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ এবং নাচের পর আবার এই সকল খাদ্য ভক্ষিত হয়। ইহাদের বৈবাহিক ক্রিয়াকলাপ খুব সাদাসিদে। গ্রামের মুখ্যারা যখন কোন যুবকযুবতীর বিবাহেচ্ছা বুঝিতে পারে, তখন একটি নবনির্ম্মিত শূন্য কুটীরে কন্যাকে উপবেশন করায়। বর জঙ্গলে পলায়ন করে, কিন্তু কিছু লড়ালড়ি এবং অনিচ্ছার ভাণের পর সে বল প্রয়োগ দ্বারা ধৃত ও আনীত হয় এবং কন্যার ক্রোড়ে উপবেশিত হয়। ইহাই বিবাহ। বিবাহের পর নবদম্পতি পরস্পরের সহিত সামান্যই কথা বলে এবং অন্ততঃ এক মাস পরস্পরকে খুব লজ্জা করিয়া চলে। তাহার পর একত্র ঘর করিতে থাকে।

মৃত্যুর পর শিশুগণকে তাহাদের পিতামাতার কুটীরের মেজেতে সমাহিত করা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে অগভীর কবরে পুঁতিয়া ফেলা হয়, কিম্বা অধিক সম্মান দেখাইতে হইলে, মৃতদেহকে পুলিন্দার মত করিয়া মুড়িয়া ও বাঁধিয়া একটী গাছে মাচার উপর রাখিয়া আসা হয়। তাহার পর সেই গাছের বা গোরের নিকট দূর হইতে সহজদৃশ্য বেত গাছের পাতার থোপা বাঁধিয়া রাখা হয়। তিন মাস সেদিক দিয়া কেহ যায় না। এই তিন মাস মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বন্ধুরা ধূসরবর্ণ মাটী মাখিয়া এবং নৃত্য না করিয়া অশৌচ পালন করে। অশৌচান্তে মৃত ব্যক্তির হাড়গুলি খুঁড়িয়া বা বৃক্ষ হইতে নামাইয়া প্রক্ষালনানন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা করিয়া গহনার মত পরিধান করে। এই অলঙ্কার গুলির রোগনিবারণশক্তিতে তাহারা দৃঢ় বিশ্বাসী! ইহার পর নৃত্যানন্তর অশৌচ শেষ হয় এবং দেহ হইতে ধূসর মাটী ধুইয়া ফেলা হয়।

বৃহৎ আণ্ডামানবাসীরা দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলনের সময় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করে। এই রোদন কখন কখন কয়েকঘণ্টাব্যাপী হয়। ওঙ্গে-গোত্রীয়েরা মিলনের সময় পরস্পরের কোলে বসে, আদর করিয়া গায়ে হাত বুলায়, এবং নীরবে কয়েক বিন্দু অশ্রু মোচন করে। বিদায়ের সময় আণ্ডামানীরা পরস্পরের হাতে ফুঁ দেয়। এ সময় মনের ভাব বা আবেগ প্রকাশ করা শিষ্টাচারসম্মত নহে।

আণ্ডামানীরা আকাশবাসী, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে সর্ব্বস্রষ্টা, মনুষ্যের মত ক্রোধ-অনুরাগ-বিরাগ-বিশিষ্ট এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। তিনি দণ্ড দেন, ঝড় বহান। তাঁহাকে কোন প্রকারে সন্তুষ্ট করা যায় না। তিনি যাহাতে ক্রুদ্ধ হন, এরূপ কাজ আণ্ডামানীরা করে না। তাহাদের প্রার্থনা, পূজা বা বলিদানের কোন ধারণা নাই। এই ঈশ্বরকে তাহারা প্রীতি করে না। এই ঈশ্বর ব্যতীত তাহারা জঙ্গলের উপদেবতা ও সমুদ্রের উপদেবতায়ও বিশ্বাস করে। ইহারা এবং অন্যান্য নিকৃষ্ট

উপদেবতারা কেবল অমঙ্গল ঘটায়। আণ্ডামানীরা বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পরে তাহাদের আত্মা ভূগর্ভে একটি স্থানে যায়, কিন্তু তাহাদের অনন্ত দণ্ড বা পুরস্কার বা তদুপযোগী স্বর্গনরকনামক কোনও স্থানসম্বন্ধে কোন ধারণা নাই।

তাহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে। কেবল পুরুষেরা কটিবন্ধ ও হার পরে এবং স্ত্রীলোকেরা পাঁচ ছয়টা পাতার গোছা বা গাছের ছাল কটিতটে পরিধান করে।

তাহারা চাষ করিতে জানে না; এবং ইংরেজাধিকারের পুর্ব্বে কোন পশুপক্ষীও পুষিত না। তাহারা এক একটা গাছের গুঁড়ির ভিতর হইতে বাইস্ দ্বারা কাঠ কাটিয়া বাহির করিয়া ডোঙ্গা প্রস্তুত করে। ডোঙ্গাগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। তাহারা তাহাদের খাদ্য রাঁধিয়া খায়। মাটীর রন্ধন পাত্র নির্ম্মাণ করিয়া আগুনে পুড়াইয়া লয়। যত দিন হইতে তাহারা ঝড়াদি দ্বারা নষ্ট জাহাজ হইতে লোহা পাইতেছে, ততদিন হইতে লোহার ব্যবহার করিতেছে, নতুবা ঝিনুক, শামুক ও মাছের কাঁটাই ব্যবহৃত হইত। তাহারা বেশ ঝুড়ি এবং বাঁশের ও কাঠের বাল্‌তি তৈয়ার করিতে পারে। লতার ছাল হইতে দড়ি, বেতের ছালের শীতলপাটি প্রভৃতিও তাহারা প্রস্তুত করিতে পারে।

নৃত্য এবং ঢাকের বাদ্যই তাহাদের প্রধান আমোদ। নৃত্য পাঁচ প্রকারের।

ভারতবর্ষীয় লবণ।

লবণ ব্যবহার করেন না, এমন লোক খুব কমই আছেন। আবার ভারতবর্ষে লবণ ব্যবহারের জন্য কর দেন না, অতি শিশু দুগ্ধপোষ্য বালকবালিকা ছাড়া, এমন লোকও বোধ করি কেহ নাই। ভারতবর্ষে লবণ বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তথাপি লিভারপুল ইত্যাদি স্থান হইতেও ভারতবর্ষে লবণ চালান হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে লবণ অনেক প্রকার পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান—সৈন্ধব নামে খ্যাত পঞ্জাবের পার্ব্বতীয় লবণ; রাজপুতানার সাম্ভর হ্রদ সম্ভূত সামর লবণ; কচ্ছদেশীয় সামুদ্রিক লবণ (নাম বারাগোড়া), চিল্‌কা, তুতীকোরিন, প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলজাত আরও কয়েক প্রকার লবণ; এবং রাজপুতানার জলহীন মরুভূমিস্থিত কয়েকটি স্থানের আরও কয়েক প্রকার লবণ, যথা পাঁচভদ্রা, ডিডোয়ানা, ফালোডী; লুনী (ইহা ঐ নামের শুষ্ক নদীগর্ভে স্থানে স্থানে পাওয়া যায়), ইত্যাদি।

বঙ্গদেশে যে গুঁড়া লবণ লিভারপুল বা পাঙ্গা নামে বাজারে বিক্রীত হয়, তাহার অধিকাংশই বৈদেশিক। কিন্তু তাহার সহিত অপর প্রকারের লবণও ভেজাল দেওয়া থাকে। বেহারের প্রায় সমস্ত স্থানেই এক প্রকার নোনা মাটি আছে; তাহা হইতে এক অংশে শোরা অপর অংশে লবণ গালাইয়া বাহির করা হইয়া থাকে। ঐ লবণ লিভারপুলের ন্যায় পরিষ্কার না হইলেও বর্ণ এবং আকৃতিতে তাহার সহিত সৌসাদৃশ্য থাকায়, বাজারে প্রায় মিশ্রিত হইয়াই বিক্রীত হয়। সুন্দরবনের ভিতর এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার দক্ষিণে স্বতঃই সমুদ্রের ধারে রৌদ্রের তাপ পাইয়া অনেক লবণাক্ত মৃত্তিকা স্ফীত হইয়া শুকাইয়া থাকে। ঐ দেশের অধিবাসিগণ এই নোনা মাটি উঠাইয়া গোপনে পরিষ্কার করে। এই মৃত্তিকাতে শতকরা ৫০ ভাগ লবণ পাওয়া যায়। লবণপ্রস্তুতকারীদের নাম এতদঞ্চলে মলুঙ্গী বলিয়া খ্যাত। মলুঙ্গীদিগের নিকট হইতে ব্যবসায়িগণ লবণ ক্রয় করিয়া লয়, এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণ লবণের উপর শুল্ক দান করিয়া সরকারী পাসের সাহায্যে বক্রী লবণও গুপ্তভাবে সকল বাজারে চালান দেয়। এই লবণও লিভারপুলের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট আজকাল মলুঙ্গী এবং লবণব্যবসায়ীদিগের কার্য্যের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর ঠিক্ ভিতর না হইলেও, তাহার অতি নিকটবর্ত্তী, গুড়া, বাঘমারী প্রভৃতি কয়েকটি পল্লীতে আজিও অনেকগুলি শোরা ও লবণের লাইসেন্সপ্রাপ্ত কারখানা আছে।

অহিফেণবিভাগের নীচেই লবণবিভাগের আয় বলা যাইতে পারে। বিনা অনুমতিতে গভর্ণমেণ্ট কাহাকেও লবণ প্রস্তুত করিতে দেন না। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে এমন অনেক ক্ষারযুক্ত স্থান আছে, যেখানে

বঙ্গোপকূলস্থ স্থানসমূহের ন্যায় রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে লবণ ভূগর্ভ হইতে স্বতঃই ফুটিয়া বাহির হয়। ফতেপুর জৌনপুর প্রভৃতি ২১।১টি জেলার স্থানে স্থানে বৃহদায়তন লবণক্ষেত্র আছে। ঐ সকল স্থানের বায়ু ক্ষারসমুদ্ভূত এক প্রকার তীব্র গন্ধে এরূপ পরিপূর্ণ থাকে যে, ঐ ক্ষেত্র সকলের কিঞ্চিৎ দূর হইতেই শ্বাসক্রিয়া কষ্টকর হইয়া উঠে। এইরূপ "প্রস্ফুটিত" লবণ সময়ে সময়ে এক ফুটেরও অধিক গভীর হয়। এসকল স্থান গভর্ণমেণ্ট অতি সাবধানে রক্ষা করেন এবং কাহাকেও এই সকল ভূমি হইতে লবণ প্রস্তুত করিবার অনুমতি প্রদান করেন না।

সরকারী কর না দিতে হইলে আজ ভারতীয় লবণের মূল্য তাহার জন্মস্থান সকলে বোধ হয় ৵০ হইতে জোর ॥৵০ আনা মণের অধিক হইত না। কিন্তু লবণবিভাগের আয়ে বিস্তর লাভ দেখিয়া ইহা গভর্ণমেণ্ট আপনার একচেটিয়া ব্যবসা করিয়াছেন। রাজপুতানায় এবং মধ্য ভারতে যে সকল ছোট বড় লবণক্ষেত্র আছে, তাহার উপর পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ অধিকার ছিল না। সেগুলি প্রায় সমস্তই দেশীয় রাজাদিগের অধিকারে স্থিত ছিল। কিন্তু সেখানকার লবণের প্রসার উত্তর ভারতে নিষিদ্ধ করা গভর্ণমেণ্ট যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া ঐ লবণ যাহাতে কর না দিয়া ব্রিটিশ রাজ্যে আনীত ও বিক্রীত না হইতে পারে তদভিপ্রায়ে এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উড়িষ্যার কটক হইতে পঞ্জাবপ্রান্ত পর্য্যন্ত এবং পরে পঞ্জাব ইংরাজের হস্তগত হইলে অটক নদীর তীর পর্য্যন্ত এক Permit Line বা লবণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ এবং কর আদায়পূর্ব্বক ছাড় পত্র দিবার সীমারেখা স্থাপিত হইল। তিন চারি হস্ত পরিমিত একটা পথ প্রস্তুত করিয়া তাহার উভয় পার্শ্বে, বাবলা, মনসা এবং অন্যান্য ঘন কণ্টকাকীর্ণ গাছ পালা রোপিত হইল। এইরূপে সুরক্ষিত ঐ সীমাপথ কটক হইতে অটক পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নরূপে প্রসারিত হইল। আবার উভয়পার্শ্বস্থ বেড়ার ভিতর ভাগে—অর্থাৎ ঐ সীমারেখার উপরে—বালুকা ও গুঁড়া মাটি এরূপ ভাবে রক্ষিত হইল যে, কেহ বেড়া ভাঙ্গিয়া ঐ ধূলিময় মার্গ অতিক্রম করিলেই তাহার পদচিহ্ন সেই স্থানে স্পষ্টরূপে অঙ্কিত হইয়া যাইত। এই সুদূরব্যাপী অদ্ভুত রেখার স্থানে স্থানে প্রহরিগণ অতি সন্তর্পণে পাহারা দিত। Patrol এবং ইন্‌স্পেক্টরগণ প্রত্যহ এই মার্গ অতি যত্নে পরিদর্শন করিতেন এবং তাঁহাদের পশ্চাদ্‌গামী দু তিন জন লোক ধূলির উপর পদচিহ্নাদি মারিয়া দিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র পথের উপর টানিয়া লইয়া যাইত। পথ ইহাতে এরূপ পরিস্কৃত হইয়া যাইত যে, পাখী বসিলে তাহারও পদচিহ্ন তৎক্ষণাৎ তাহার উপর মুদ্রিত হইয়া যাইত। এই অদ্ভুত পথ পরিষ্কার করিবার যন্ত্র অতি সামান্য ব্যয়েই তৈয়ার হইত। অর্থাৎ একটা ছোট কাঠে কতকগুলা কুঁচির ন্যায় ছোট ছোট কাঁটা বা কাষ্ঠখণ্ড লাগান থাকিত, এবং তাহাতে একটা লম্বা বাঁট দিয়া লইলেই চোরধরা কল প্রস্তুত হইয়া যাইত। লবণ-চোর ধরিবার জন্য এই Permit Lineএর উপর সর্ব্বশুদ্ধ ১৮,০০০ লোক নিযুক্ত ছিল। কিন্তু যাহাদের জন্য এত সরঞ্জাম, সেই চোরও কম ছিল না। প্রায়ই মোট মাথায়, একপাল ছাগলের পিঠে বা উট, বলদ প্রভৃতি পশুর পিঠে লবণ চাপাইয়া বেড়া ভাঙ্গিয়া অনায়াসে দক্ষিণ দিক হইতে বেড়ার উত্তর ভাগস্থিত ইংরাজরাজ্য মধ্যে সরকারী কর না দিয়া এবং প্রহরীদিগের হস্তে লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য, রাত্রিযোগে বহুসংখ্যক লবণব্যবসায়ী সর্ব্বদা যাতায়াত করিত; এবং লবণাসুরগণ সীমার নিকটে তৎক্ষণাৎ চোর ধরিতে না পারিলে পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া আপনাপন প্রখর বুদ্ধির পরীক্ষা দিত। কিন্তু সময়ে সময়ে এই চোরধরা ব্যাপারে বড় মজাদারি বুদ্ধিই প্রকাশ পাইত। একবারকার একটা গল্প, যাহা কোন বৃদ্ধ 'লাইন'-কর্ম্মচারীর মুখে শুনিয়াছিলাম, এস্থানে লিখিতেছি।

খোজী (ছদ্মবেশে পদচিহ্ন অনুসরণকারী) আসিয়া হঠাৎ একবার কোন চৌকীর পেট্রোল সাহেবকে সংবাদ দিল যে, কিয়দ্দূরস্থিত একটা গ্রামে কোন মহাজনের বাটীতে সেদিনকার চোরাই মালের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। যদি কালবিলম্ব না করিয়া গ্রেপ্তার করা যায়, তাহা হইলে সমস্ত মাল ও আসামী ধরা পড়িবে। পেট্রোল সাহেব লোক, প্রকাশ্যভাবে গ্রামসকলে ঢুকিলেই

সকল উদ্দেশ্য প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং আসামী ফেরার হইবে। সুতরাং সাহেব পাল্কীর ভিতর গিয়া বধূ সাজিয়া বসিলেন, চারজন মোটা মোটা কাহার পাল্কী বহিয়া লইয়া চলিল, এবং দেশীয় দারোগা মহাশয়, ছোকরা মানুষ, দেখিতেও বেশ সুশ্রী,—বরবেশে রাতারাতি নূতন তৈয়ারী হরিদ্রারঞ্জিত পোষাক পরিয়া অশ্বারোহণে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন। যত অপরাপর পেয়াদা জমাদার প্রভৃতি বরকর্ত্তা ও বরযাত্র সাজিয়া বাদ্যভাণ্ড করিয়া ধুমধামে মহাজন আলয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কথিত আছে যে, অপরাধী মহাজনের গ্রামে উপস্থিত হইয়া বরকন্যাকে একটী সরাইএ কিয়ৎকালের জন্য আশ্রয় লইতে হইয়াছিল, কিন্তু সরাইস্বামিনী ভাটিয়ারী কন্যা দেখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং ক্রমশঃ তাহার সন্দেহ হওয়ায় নানাপ্রকার সুশ্রাব্য ইতর ভাষায় আগন্তুকদিগের অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। তখন প্রকাশভয়ভীত বরের খুল্লতাত জমাদার সাহেব—ভাটিয়ারীকে লইয়া গিয়া ধীরে ধীরে পাল্কীর দ্বার উন্মুক্ত করিলেন এবং শিশুপালের ন্যায় রূপবতী বধূর মুখচন্দ্র দর্শন করাইলেন। পাঠক বুঝিতেই পারিয়া থাকিবেন যে, এবার বধূই তাঁহার দর্শনকারিণীকে কিঞ্চিৎ অর্থ উপহার দিয়াছিলেন, বধূর মুখ দেখিয়া কেহ তাঁহাকে কিছু উপহার দেয় নাই। যাহা হউক কিয়ৎক্ষণ পরে এই বিবাহ-অভিযান যুদ্ধাভিযানে পরিণত হইয়াছিল এবং মহাজনের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল।

এইরূপে চোরধরা হইত। কিন্তু সাধুদিগের বিড়ম্বনাও কম ছিল না। 'লাইনের' চৌকী পার না হইলে কোন যাত্রীরই এক দেশ হইতে অপর দেশে যাইবার উপায় ছিল না; এবং চৌকিতে উপস্থিত হইলে স্ত্রীপুরুষ গাড়ী ঘোড়া বাক্স পেটারা সকলেরই তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসী লওয়া হইত। যদি আধ ছটাক মাত্রও নিষিদ্ধ লবণ কাহারও নিকট পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তাহার যন্ত্রণার শেষ থাকিত না এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাহার দ্রব্য সামগ্রী এবং লবণবাহী গো অশ্ব যান শকট আদি বাজেয়াপ্ত হইত। এই সকল বস্তুর মূল্য হইতে অর্দ্ধভাগ গ্রেপ্তারকর্ত্তা পাইতেন।

গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত এইরূপে প্রতিনিয়ত প্রজাদের উপর উৎপীড়ন হইত। কারণ অনেক সময়ে বৃথা দোষারোপ করিয়াও উৎকোচ লইবার প্রথা যে প্রচলিত ছিল না, তাহা একেবারে বলা যায় না। যাহা হউক, যে লবণের কর আদায়ের জন্য এত কড়া আইন প্রচলিত ছিল, গবর্ণমেণ্ট তাহার জন্মস্থানগুলি ক্রমশঃ অধিকার করিয়া লইলেন। সাম্ভর হ্রদ মহারাজা জয়পুর ও মহারাজা যোধপুরের সম্পত্তি; গবর্ণমেণ্ট যোগাড় যন্ত্র করিয়া উহার ঠিকা লইয়াছেন এবং তজ্জন্য উভয় দরবারকে প্রতি বৎসর রাজস্ব (Royalty) স্বরূপ অর্থ এবং উক্ত রাজদ্বয়ের মধ্যে ব্যবহার জন্য কিছু কিছু নিষ্কর লবণ ছাড়িয়া দিতেছেন।

শুনিতে পাওয়া যায় যে, মহামতি হিউম সাহেব যখন লবণবিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হন, তখন তিনি এই সুদীর্ঘ সীমারেখা ও তাহার কার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে পরিদর্শন পূর্ব্বক লাইন ভাঙ্গিয়া দিবার প্রস্তাব করেন; এবং পরে যখন লবণের জন্মস্থানের চাবী গবর্ণমেণ্টের হস্তে আসিয়া পড়িল এবং আর তল্লাশী লইবার আবশ্যকতা থাকিল না, সে সময় হিউম সাহেবের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইল। অবশ্য ইহাতে সহস্র সহস্র লবণ-সেনানীবৃন্দের গৃহে গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল।

এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সাম্ভর ইত্যাদি লবণের জন্মস্থানেই কর আদায় করিয়া মাল ছাড়িয়া থাকেন। এই সেদিন পর্য্যন্ত সিন্ধুনদের তীরে পুরাতন 'লাইনে'র শেষ স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু কোহাট পর্ব্বতের লবণ খনি ইংরাজের করায়ত্ত হওয়ায় তাহাও এক্ষণে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে উত্তরভারতের লবণ-মহকুমার অধিকার বেহার হইতে কোহাট পর্য্যন্ত। কলিকাতার কারখানাগুলি গত জুন মাসে বঙ্গদেশীয় লবণবিভাগের অধীন করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মান্দ্রাজ ও বম্বে অঞ্চলেও দুই বিভিন্ন বিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগ এক এক কমিশনার দ্বারা পরিচালিত। কেবল বঙ্গীয় লবণবিভাগ Bengal Customsএর অধীন।

এক্ষণে কোন্ কোন্ দেশে কি কি প্রণালীতে লবণ প্রস্তুত হইতেছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণন বোধ হয় অপ্রীতিকর

হইবে না। কলিকাতার এবং বেহারের লবণের কারখানায় প্রায় একই প্রণালীতে কার্য্য হইয়া থাকে। প্রথমে ৪-৫ ফুট ব্যাসের একটী গোলাকার চৌবাচ্চা প্রস্তুত করা হয়। ইহাকে ফিল্টার বলে। ফিল্টারের চতুর্দ্দিকের দেওয়াল প্রায় ১৮ ইঞ্চি উচ্চ রাখা হয়। এই দেওয়ালের অন্তর্ভাগে ইট রাখিয়া এবং তাহার উপর খড় পাতিয়া দেওয়া হয়। লবণাক্ত মৃত্তিকা প্রায় পুরাতন দেয়াল ও অপরিষ্কার স্থান প্রভৃতি হইতে চাঁচিয়া সংগ্রহ করা থাকে। ঐ মৃত্তিকা উপর্য্যুক্ত খড়ের উপর ফিল্টারের মধ্যে প্রায় ৮।৯ ইঞ্চি পরিমাণ রক্ষিত হয়। তাহার উপর জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। জল দ্বারা মৃত্তিকামিশ্রিত লবণ গলিয়া একটী নলের ভিতর হইয়া ফিল্টারের বাহিরে স্থিত নাদে গিয়া উপস্থিত হয়। এই রস জ্বাল দিয়া লইলেই লবণ হয়। ইহা দেখিতে ঠিক লিবারপুলের মত। অবশ্য প্রস্তুতের তারতম্যে অল্পবিস্তর ময়লাও হইয়া থাকে।

পঞ্জাবে খেওড়ার পর্ব্বতে লবণের খনি আছে। তাহা হইতে কাটিয়া লবণ বাহির করা হয়। এই লবণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সকল প্রকারে আবর্জ্জনারহিত। দেখিতে শ্বেত ও রক্তাভ প্রস্তরের ন্যায়। যখন এই খনি শিখরাজের অধিকৃত ছিল, অতি কদর্য্যভাবে ইহার খননকার্য্য সম্পন্ন হইত। কিন্তু এক্ষণে ইহার ভিতরে দেখিবার অনেক বস্তু আছে। খনির ভিতর অন্ধকার। দর্শকগণের জন্য আতশবাজি জ্বালিয়া দিলে দেখিতে অতি চমৎকার হয়, ঠিক যেন হীরকনির্ম্মিত প্রকাণ্ড অট্টালিকার মধ্যে দর্শক উপস্থিত। আলোকের সাহায্যে চারিদিক ঝকমক্ করিতে থাকে। ইংরাজহস্তে খনির অভ্যন্তর এরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে, যেন উহা বাস্তবিকই একটী সুদৃশ্য অট্টালিকা। বড় বড় প্রকোষ্ঠ, সুন্দর গোল ছাদ, বড় বড় থাম, তাহার গাত্রে নানারূপ কারুকার্য্য, সমস্তই ঈষৎ গোলাপীমিশ্রিত শ্বেতবর্ণ, দেখিতে বড়ই মনোমুগ্ধকর। বড় ও ছোটলাট সাহেবগণ খনি দর্শন করিতে যাইলে তাঁহাদের আমোদার্থে আতশবাজী এবং আলোকের বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, খেওড়ায় এত লবণ আছে যে, ইহার অন্ত এখনও সুদূর ভবিষ্যতে নিহিত। কোহাটের লবণও পার্ব্বতীয় খনি হইতে কাটিয়া বাহির করা হয়। দেখিতে প্রস্তরাকার, বর্ণ শ্যাম।

রাজপুতানার মরুভূমিতে কয়েক স্থানে লবণ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে সাম্ভর হ্রদই প্রধান ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য; এবং খেওড়ার ন্যায় এখানকারও সরকারী কারখানা খুব বড় রকমের। সাম্ভর হ্রদ দীর্ঘে প্রস্থে প্রায় ৫২ বর্গমাইল স্থান অধিকার করিয়া আছে। সর্ব্বদা সামান্য গভীর নোনা জলে স্থানে স্থানে পরিপূর্ণ থাকে। হ্রদকূলে আইল বাঁধিয়া চতুষ্কোণ অনেকগুলি কেয়ারী বাঁধা হয়। ঐ জল তুলিয়া কেয়ারীতে রক্ষিত হয় এবং সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে শুকাইয়া গেলে লবণাকার ধারণ করে। পরে ঐ লবণ তুলিয়া লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতসম স্তূপ সকলে একত্রিত করা হয়। ঐরূপ এক একটা স্তূপে ২।৩ লক্ষ মণ লবণ সঞ্চিত থাকে। এই লবণের আকৃতি ষট্‌কোণ বা পঞ্চকোণ Crystalএর ন্যায়। উত্তর-পশ্চিমের প্রায় সকল বাজারেই সাম্ভর লবণ পাওয়া যায়।

সাম্ভর হ্রদের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখযোগ্য। হিউম সাহেব তাঁহার সরকারি রিপোর্টে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

আধুনিক সাম্ভর গ্রামের কয়েক মাইল দূরে, সিরথলা নামে এক গ্রাম ছিল। ৫৪০ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রামে মাণিক রায় নামক চৌহানবংশীয় এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি নিকটবর্ত্তী প্রান্তরে আপন পিতামহীর গো-পাল চরাইতেন। সে সময় নাকি ঐ স্থানে সুদূরব্যাপী এক নিবিড় বন ছিল। কিছুদিন পরে বৃদ্ধা পিতামহী নিত্যই দেখিতেন যে, কোন বিশেষবর্ণা একটী গাভী আদৌ দুগ্ধ দান করে না। ক্রমশঃ সন্দেহ হওয়ায় তিনি মাণিক রায়কে দুগ্ধাপহরণের জন্য প্রায়ই ভৎর্সনা করিতেন। কিন্তু গাভীর দুগ্ধ কে অপহরণ করে, মাণিক তাহার কিছুই জানিতেন না। এজন্য অতঃপর তিনি সতর্ক হইয়া গাভীটির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই জানিতে পারিলেন যে, সুযোগ পাইলেই গাভী পাল হইতে বিলগ্ন হইয়া কোথায় চলিয়া যায়। পূর্ব্বকথিত বনের মধ্যবর্ত্তী এক স্থানে একটী পর্ব্বত ছিল, এবং তাহার

উপর 'দেবীর'* একটী মন্দির ছিল। গাভী সেই দিকেই যাইত। মাণিক রায় একদিন তাহার পদানুসরণ করিয়া দেখিলেন যে, গাভী ক্রমশঃ গিয়া দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল। মন্দির মধ্যে একজন যোগী ধ্যানমগ্ন বসিয়া ছিলেন। গাভী তাঁহার সম্মুখস্থ একটী ঘটীতে দুগ্ধ ক্ষরণ করিতে লাগিল। ঘটী পরিপূর্ণ হইলে গাভী পুনরায় আপন পালে ফিরিয়া গেল। কিন্তু মাণিক রায় প্রচ্ছন্নভাবে মন্দির মধ্যেই অবস্থিতি করিলেন। কিয়ংক্ষণ পরে যোগীর ধ্যানভঙ্গ হইল এবং তিনি আপনার মুখ হইতে একটি গুটিকা বাহির করিয়া ভূমিতে রাখিলেন ও পরে পাত্র গ্রহণপূর্ব্বক দুগ্ধ পান করিলেন। মাণিক রায় ইত্যবসরে ক্ষিপ্রহস্তে ঐ গুটিকা উঠাইয়া লইলেন, এবং তাহা হস্তে ধারণ করিয়া এক মুহূর্ত্তের মধ্যে চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক প্রধান প্রধান তীর্থের দর্শন পাইলেন। যথন যোগীর দুগ্ধ পান শেষ হইল, তিনি যেখানে গুটিকা রাখিয়াছিলেন, তাহা সেখানে দেখিতে না পাইয়া আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র মাণিক রায় উহা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। যোগী তাঁহাকে সেখানে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং বলিলেন, এই অমূল্য দ্রব্য তোমারই নিকটে থাকুক। কিন্তু মাণিক রায় অত্যন্ত নির্লোভ প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন, কোনমতেই ঐ গুটিকা লইতে সম্মত হইলেন না। যোগী তাঁহার এই সাধুপ্রকৃতি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন, 'দেবীর সম্মুখে যাও, তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।'

মাণিক রায় যোগীবরের আজ্ঞানুসারে গিয়া করযোড়ে দেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। তথন দেবীর কৃপায় সেখানে একটি সুদৃশ্য অশ্ব আবির্ভূত হইল। দেবীর অনুমতি পাইয়া মাণিক তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। দেবী বলিলেন "এই অশ্ব তোমাকে তোমার গৃহে লইয়া যাইবে, কিন্তু তুমি কোন মতে পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। অশ্ব তোমাকে যেদিকে লইয়া যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিঃসঙ্কোচে চলিয়া যাও, তোমার মঙ্গল হইবে।" মাণিক তাহাই করিলেন। অশ্ব অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তাহার গতির সহিত বনের সকল চিহ্ন লুপ্ত হইতে এবং বনের পরিবর্ত্তে সেই স্থানের সমস্ত ভূমি স্বর্ণরৌপ্যে আচ্ছাদিত হইতে লাগিল সন্ধ্যাকালে অশ্ব প্রায় ২৫ ক্রোশ পথ এইরূপে অতিক্রম করিল, কিন্তু সেই সময়ে ঘটনাক্রমে মাণিকের পাগড়ী এক বৃক্ষশাখায় আবদ্ধ হওয়ায়, অন্যমনস্কতাপ্রযুক্ত তিনি মুখ ফিরাইয়া শাখা হইতে উহা ছাড়াইয়া লইলেন। এতদ্দ্বারায় দেবীর অনুজ্ঞার ব্যতিক্রম হওয়ায় ঘোটক আর এক পদও অগ্রসর হইল না। অগত্যা মাণিক রায়কে সেদিনকার মত গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইল।

পর দিবস সূর্য্যোদয়ের সহিত সিরথলাবাসিগণের নয়নপথে এক অদ্ভুত দৃশ্য উন্মুক্ত হইল। চতুর্দ্দিক স্বর্ণরৌপ্যের সুবিস্তীর্ণ ক্ষেত্র সূর্য্যালোকে ঝকমক্ করিতেছিল। যে যেখানে ইহা দেখিল ভয়ে আশ্চর্য্যে অবাক্ স্তম্ভিত হইয়া গেল, এবং স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া এই অদ্ভুত দৃশ্যের অর্থ কি আলোচনা করিতে লাগিল। তথন মাণিক রায় অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বদিবসের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিলেন। তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া সিরথলার বিজ্ঞমণ্ডলী একমত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় দেবীর নিকট যাইয়া তাঁহার উপহার ফিরাইয়া লইবার জন্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন। কারণ এই স্বর্ণরৌপ্যের জন্য পরস্পর ঈর্ষাপরবশ হইয়া অনেক লোকক্ষয় ও সিরথলার সমূলে ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

সুতরাং মাণিক রায় পুনরায় দেবীর নিকট গিয়া গ্রামবাসিগণের প্রার্থনা নিবেদন করায় দেবী বলিলেন, "আচ্ছা, সাচ্চা চাঁদীর স্থানে কাঁচ্চা (কাঁচা) চাঁদী থাকিবে।" দেখিতে দেখিতে সমস্ত সুবর্ণ ও রজতভূমি জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

সিরথলাবাসিগণ বহুকাল পর্য্যন্ত ঐ জলের প্রকৃত গুণ গ্রহণে অসমর্থ ছিল। মথুরার একজন সুবা একবার পুষ্করতীর্থ গমনকালে ঐ হ্রদের তীরে আসিয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারাই ঐ জলে লবণের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছিল। সাম্ভরের বর্ত্তমান কানুনগো নাকি ঐ সুবার বংশধর।

* এখনও পর্ব্বতোপরি দেবযানীর এক মন্দির আছে। এই দেবযানী কে?

সান্তর ব্যতীত ভারতবর্ষের আরও অনেক স্থলে, এবং হিমালয়ের পরপ্রান্তস্থ তিব্বতেও অনেক স্থানে বহুল পরিমাণে লবণ পাওয়া যায়, কিন্তু স্থানাভাবে এস্থলে সে সকলের বর্ণন অসম্ভব। এ সকল স্থলে লবণ কোথা হইতে আসিল, ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহার আলোচনা করুন।

শ্রীগিরিজাকুমার ঘোষ।

জাতীয় ভাষার উন্নতি।

মে মাসের "রিভিউ অব্‌ রিভিউজ্‌" পত্রে পার্লেমেন্টের আইরিশ সভ্য টমাস্‌ ওডনেল সাহেব একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। জাতীয় ভাষা সংরক্ষণের আগ্রহ ও অনুরাগে সে প্রবন্ধটি পূর্ণ। জাতীয় ভাষা রক্ষার জন্য তাঁহাদের কি সুমহৎ সানুরাগ চেষ্টা, উক্ত প্রবন্ধ হইতে তাহাই কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করা আমার অভিপ্রায়। আমি উহার গুটিকত চিন্তাকে ভিত্তি করিয়া একে একে কয়েকটি কথা উপস্থিত করিব—

(১) আমরা যদি কল্পনা করি যে আমাদের কোন ব্যবস্থাপক সভায় কোন দেশীয় সভ্য তাঁহার জাতীয় ভাষায় বক্তৃতা করিতেছেন, সে কল্পনায় জাতীয় ভাষার প্রতি সেই বক্তার কি অকৃত্রিম অনুরাগের চিহ্ন পাওয়া যায় না? আমাদের পক্ষে ইহা নিতান্ত কল্পনা হইলেও ব্রিটিশ পার্লেমেন্টের আইরিশ সভ্য ওডনেলের পক্ষে তাহা কল্পনায় পর্য্যবসিত হয় নাই! তাঁহাকে বিদ্রূপ সহ করিতে হইলেও তিনি পার্লেমেন্টে আইরিশ ভাষায় বক্তৃতা করিয়া জাতীয় ভাষা সংরক্ষণের চেষ্টাকে আরও অগ্রসর করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের কিন্তু সকলই বিপরীত, কারণ আমরা মনুষ্যত্বে বড় খাট। আমরা যদি ইংরাজিনবীশ দুজন ঘরেও কথা বলি, তবে অবিমিশ্র ইংরাজিতে না বলিলেও একটা অপূর্ব্ব খিচুড়ী ভাষায় বলিয়া থাকি। ইংরেজের বাহিরটা অনুকরণে আমরা এতটা ব্যস্ত যে কার্য্যক্ষেত্রে, অনিবার্য্য কারণ ব্যতীতও, যাহা লিখিতে বা বলিতে হয়, তাহাও অনেক সময় ইংরাজিতেই সমাধা করিতে চাই। এ স্রোতটা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ফিরিয়াছে বটে; কিন্তু এখনও দেখা যায়, যে সভার সকল কাজ বাঙ্গালায় হইল, সে সভার সভাপতি ইংরাজিতে আপন মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। আমাদের যদি জ্ঞানালোচনার জন্য কোন সভা সমিতি থাকে, তবে তাহারও একটা ইংরাজি নামকরণ করিতে হইবে, যথা—"লিটারেরি ক্লাব।" যাহা হউক, বাঙ্গালা সাহিত্যের পাঠক সংখ্যা যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, এদিকে যে লোকের মতি গতি হইতেছে, এ বিষয়ে যে একটা চেতনা জাগ্রত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই আমাদের জানিয়া রাখিলে ক্ষতি নাই, আইরিশগণ তাঁহাদের জাতীয় ভাষার জন্য কি চেষ্টা করিতেছেন।

(২) আইরিশ ভাষা বিস্তারের জন্য যে সমিতি আছে, একা আয়র্লণ্ডেই তাহার দুই শতটী শাখা বিদ্যমান। আমেরিকায়ও সে সভার শাখা ব্যাপ্ত হইয়াছে। লণ্ডন, ম্যানচেষ্টার, লিভারপুলে আইরিশ ভাষায় বক্তৃতা দিলে তাহা আগ্রহের সহিত শুনিতে বহু লোক সমবেত হয়। আয়র্লণ্ডের দুই শত সভার তুলনায় বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে মাত্র একটী "সাহিত্য-পরিষদ" এবং অল্পকাল হইল একটী "সাহিত্য সভা" গঠিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের বাহিরে যে সকল প্রবাসী বাঙ্গালী আছেন, ভাষার মধ্য দিয়া তাঁহাদের সহিত একটা সংযোগ সংস্থাপনের জন্য বিশেষ কোনও সভা সমিতি আছে কি না জানি না। এলাহাবাদে "প্রবাসী" পত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এরূপ একটা মহতী কল্পনা কাহারও মনে উদিত হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। প্রবাসের বাঙ্গালী প্রাণে জাতীয়তা সঞ্চারিত করিবার পক্ষে "প্রবাসী" জাতীয় ইতিহাসে এক নব অধ্যায়ের অবতারণা করিল। আইরিশদিগের তুলনায় স্বপ্রদেশে ও প্রবাসে আমাদের জাতীয় ভাষা বিস্তারের চেষ্টা কত ক্ষীণ। অন্যে না দেখাইয়া দিলে আমাদের কোন্ উদ্যমটা যে মহৎ, তাহাও যেন আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আইরিশদিগের মনুষ্যত্বের সহিত আমাদের মনুষ্যত্বের তুলনা না হইতে পারে, কিন্তু অনেক বিষয়ে তাঁহাদের অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থা তুলনীয়। জাতিকে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য আইরিশগণ যে কারণে জাতীয় ভাষার

পুনরুদ্ধারের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছেন, আমাদের তদ্রূপ কারণের অভাব নাই।

(৩) জাতীয় ভাষা সংরক্ষণের অনুকূলে উক্ত আইরিশ মহোদয় স্বদেশীয় অপরাপর বিচক্ষণ ব্যক্তির মত ও যুক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে মিঃ জন্ রেড্মণ্ডের মতটা কিছু উগ্র; তিনি মনে করেন দুর্ভিক্ষ অথবা অন্য দশ প্রকার নিপীড়ন অপেক্ষা ইংরাজি ফ্যাসন এবং ইংরাজি চিন্তাপদ্ধতি তাঁহাদের দেশের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। তাঁহাদের দেশের লোক যে আইরিশত্ব বর্জ্জন করিয়া আচার ব্যবহারে চিন্তায় দিন দিন ইংরাজে পরিণত হইতেছে, ইহাকে তাঁহার দেশের পক্ষে তিনি মহা অকল্যাণকর মনে করেন। আমরা ইংরাজি রাজত্ব ও ইংরাজি ভাষাকে ভিন্ন চক্ষে দেখি। আমরা জানি ইংরাজ না হইলে আমাদের জাতীয় জীবনের যতটা জড়তা ঘুচিয়া গিয়াছে, তাহা হওয়ার কোন সহজ সম্ভাবনা ছিল না; ইংরাজি ভাষা যে পাশ্চাত্যালোক এদেশে বিস্তার করিয়াছে, তাহার অপরাপর উপকারের মধ্যে ইহা একটা উল্লেখ যোগ্য বিষয় যে, আমরা ঘরের যে সকল জিনিষে অবহেলা করিতেছিলাম, সেগুলির আদর করিতে শিখিয়াছি। অতএব ইংরাজ রাজত্ব ও ভাষার নিকট আমরা সজ্ঞানে বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা নবালোকের স্রোতে এতদূর ভাসিয়া আসিয়াছি, যে আমাদের চক্ষুর নিকট দিয়া দুই চারিটা ভাল জাতীয় আচার এবং প্রথাও ভাসিয়া গিয়াছে; আমাদের এক্ষণে এই চৈতন্য হইয়াছে যে, ইংরাজি সভ্যতা ও আমাদের সভ্যতার প্রণালী ও উদ্দেশ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। ইংরাজের এমন অনেক ইংরাজত্ব আছে, যাহা নিতান্তই তাঁহাদের জাতীয়, আর আমাদের পক্ষে কাজেই অতি বিজাতীয়; সে গুলি আমরা গ্রহণ করিয়া হজম করিতে পারিব না; বেশী দিন টেকাইতে পারিব না। মিঃ রেড্মণ্ড যে ইংরাজি ফ্যাষানটাকে তাঁহাদের দেশের পক্ষে মহা অনিষ্টকর বলিয়াছেন, সে কথাটা আমাদের দেশের পক্ষে সর্ব্বৈব সত্য। ইংরাজের দশটা গুণ আমরা অবশ্যই গ্রহণ করিব; কিন্তু ইংরাজ হইয়া গ্রহণ করিতে পারিব না; সেগুলি ভারতীয় থাকিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। এত কথা কেন? এত কথা শুধু জাতীয় একপ্রাণতার জন্য। আমরা যদি ভাষা ও পরিচ্ছদে বিজাতীয় হই, আচার ব্যবহারে বিজাতীয় হই, তবে আমাদের জাতীয় হৃদয় বলিয়া একটা জিনিস আর থাকে না; এমন একটা হৃদয়-তন্ত্রী থাকে না, যাহাতে আঘাত করিলে সকল গুলি প্রাণে জাতীয় সুখদুঃখানুভূতির একটা প্রবাহ প্রবাহিত হইতে পারে। জাতীয় জীবন গঠন, পরিপোষণ ও বর্দ্ধনের জন্য জাতীয় ভাষা একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। এই নিমিত্তই আইরিশদিগের নিজ ভাষার সমধিক উন্নতি সাধনের জন্য এমন উৎসাহ, আগ্রহ ও আয়োজন।

(৪) উক্ত প্রবন্ধলেখক এক স্থলে তাঁহার জাতীয় ভাষার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"its value as a barrier to the irreligion and gross materialism of the present age"—অর্থাৎ "বর্ত্তমান যুগের অধর্ম্ম ও জড়বাদের অন্তরায় স্বরূপেও আইরিশ ভাষার কার্য্যকারিতা রহিয়াছে।" বর্ত্তমান সভ্যতার জড়াসক্তি এবং বণিগ্‌বৃত্তি যে জীবনের শুভ্রতা, সরলতা, সত্যনিষ্ঠা ও সংযমে নিদারুণ আঘাত করে, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল নহে; আমাদের স্বাভাবিকতা হারাইয়া আমাদের পক্ষে আচার ব্যবহারে, রুচি আকাঙ্ক্ষায় যে না-স্বদেশী না-বিদেশী হইবার উৎকট সম্ভাবনা হইয়াছে, তাহাও আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি। সত্য বটে, বঙ্গসাহিত্য দু দিনের; কিন্তু ইহার পশ্চাতে ধাত্রী, ভিত্তি ও চিরপ্রস্রবণ রূপে যে সংস্কৃত সাহিত্য দণ্ডায়মান, তাহাতে এরূপ আধ্যাত্মিকতা, নিষ্ঠা ও অন্তর্ম্মুখীন ভাব রহিয়াছে যে, তাহা হইতে বঙ্গসাহিত্য-সেবিগণ আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া না ফেলিলে, এই নবালোকের ভিতরে এই নববঙ্গসাহিত্যে এমন আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্ম্মুখীনতা সংক্রামিত করিতে পারেন, যাহাতে উৎকট জড়াসক্তির ভিতরেও জাতীয় জীবনকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারে, এবং আমরা স্বদেশীয় ভূতকালের সাধনা ও উন্নতির সহিত প্রাণের সংযোগ রাখিয়া কি ভাবে প্রকৃতিস্থ থাকিয়া আমাদের অধঃপতিত জাতিতে নবজীবন সঞ্চারিত করিব, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারি।

(৫) মূল প্রবন্ধে একজন আইরিশ কবির কয়েকটী

কথাও উদ্ধৃত হইয়াছে। আইরিশ কবি বলিতেছেন—"কোন জাতির পক্ষে নিজ রাজ্য অপেক্ষাও নিজ ভাষা রক্ষা করা সমধিক কর্ত্তব্য। ভাষা যেমন সুদৃঢ় প্রাচীরের কার্য্য করে, দেশের কোন নদী বা দুর্গও সে কাজ করিতে পারে না।" কথাটা কিরূপ হইল? রাজ্য যাইতে পারে, ধন সম্পত্তি যাইতে পারে, দেশ দরিদ্র হইতে পারে, পুনঃ পুনঃ দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইতে পারে, বিদেশীয় সভ্যতার বিরুদ্ধ স্রোত আসিয়া জাতীয় একতার সকল বন্ধন গুলি একে একে শিথিল করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে পারে; কিন্তু যতক্ষণ জাতির একটা ভাষা জীবিত থাকে, ততক্ষণ সকলগুলি প্রাণকে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ রাখিবার একটা মহাশক্তি থাকিয়া যায়।

(৬) ওডনেল মহোদয় যে পরিপূর্ণ উচ্ছাসময়ী ভাষায় তাঁহার প্রবন্ধের উপসংহারের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার সকল কথা এখানে উল্লেখ করা অসম্ভব। অনুবাদে তাঁহার ওজস্বিতা, সুপ্রকটিত স্বদেশানুরাগ ও সৌন্দর্য্য রক্ষাও সম্ভব নয়। তবু বিস্তর বাদ দিয়া তাঁহার কয়েকটা কথা উদ্ধৃত না করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতে পারিতেছি না। তিনি বলিতেছেন—"প্রাচীন পৌত্তলিক যুগেও আইরিশ-চিত্ত ধর্ম্মপ্রবণ, পবিত্র, শান্ত, পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং কি পার্থিব বা স্বর্গের রাজ্য উভয়েই একান্ত ভক্তিমান ছিল। পরার্থপরতা ও ত্যাগস্বীকারে প্রাচীন আইরিশ মন অনুপ্রাণিত ছিল। বর্ত্তমান যুগের অধর্ম্ম, নৈতিক হীনতা, স্বার্থপরতা ও ধনপূজার ভিতরে সেই প্রাচীন আইরিশ সরলতা, অকপটতা, ধর্ম্মানুরক্তি আইরিশ ভাষার সাহায্যে আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে;—অপর দিকে ইংরাজ-চিত্ত পার্থিব রাজ্য ও শক্তি অধিকারে মত্ত; উন্নততর, শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্য, যাহা মানবপ্রকৃতিকে আধ্যাত্মিকতা প্রদান করিতে পারে, সে বিষয়ে ইংরাজমন উদাসীন।" আইরিশ ওডনেলের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি আমাদের দেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য কিনা, তাহাও আমাদের চিন্তার বিষয়। যাহা হউক, এই অবস্থার ভিতরে আইরিশদিগের সঙ্কল্প কি? প্রবন্ধলেখক বলিতেছেন—"আমরা আমাদের সন্তানসন্ততিগণকে দ্বিভাষী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা, আর সামাজিক আমোদ প্রমোদ, অনুশীলন এবং আত্মার উন্নতির জন্য আইরিশ ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে।"

আমরা বলি "তথাস্তু"। যে জাতি আপন ভাষাকে পরিত্যাগ করে, সে জাতির আর জাতিত্ব থাকে না; প্রাচীন গৌরবগাথা, কীর্ত্তি ও বহুশতাব্দীব্যাপী সাধনার ফল হইতে প্রাণটা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে, সেই জাতির লোক, বিজয়িনী সভ্যতার সর্ব্বতোমুখী আক্রমণের ভিতরে আপনাদিগকে নিতান্তই আত্মমর্য্যাদাবিহীন ভিখারীর মত দেখে। তখন পদলেহন ও চাটুবাদ মাথার মণি করিয়া, নব সভ্যতার মধ্যে আত্ম-বিক্রয় পূর্ব্বক জাতীয় জীবনকে অতি বিকৃত করিয়া তোলে। আইরিশগণ বিরাট জাতীয়তার মন্দিরে দণ্ডায়মান হইয়া জাতীয় ভাষা উদ্ধাররূপ যে পবিত্র সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা সফল হউক। ইহাঁদিগের এই মহাব্রতের প্রতি সজাগ নেত্রে চাহিয়া, আমরা প্রত্যেকে নিজকে একবার জিজ্ঞাসা করি· জাতীয় ভাষার উন্নতিকল্পে কিছু করিবার আমাদের কি অধিকার বা অবকাশ নাই? আমাদের জাতীয় ভাষার পূত মন্ত্রে স্বপ্রদেশে ও প্রবাসে কি সকলগুলি বাঙ্গালী-প্রাণ ধ্বনিত হইয়া উঠিবে না?

শ্রীসত্যানন্দ দাস।

সেকেন্দ্রা।

এই খানে মোগলের মুকুট-রতন
শায়িত শান্তির মাঝে; পথিক সুজন
নেহারিয়া এ সমাধি ভক্তিপ্লুত মনে
সম্ভ্রমে নোয়ায় শির; হৃদয়-গগনে
ভাসে তার কত ছবি, কত পুণ্য কথা,
কত বরষের হায় কত শত ব্যথা!
মনে পড়ে অতীতের দিল্লী-দরবার,
মোগলের শত হর্ম্ম্য সুষমা-আগার!
মনে পড়ে, এই পথে এমনি সময়ে
বীর-যোদ্ধা অগণন উৎফুল্ল হৃদয়ে
চলি' যেত অবিরাম; আর আজি হায়!
ভাঙ্গিতে এ নীরবতা ঝিল্লী ভয় পায়!
যে জন শায়িত হেথা অন্তিম-শয্যায়,
কত রাজা মহারাজ তাঁহারি সভায়

অবিরত কলতানে কহিত কাহিনী,
কত বীর-আস্ফালনে কাঁপিত মেদিনী ;
কত কবি ঝঙ্কারিয়া সুমধুর তান,
নিয়ত তুষিত কত মহাজন-প্রাণ !
সেই সভামাঝে নিত্য ফায়েজী-ফজল,
বীরবল, তোদরমল, অমাত্য সকল,
প্রকৃতিপুঞ্জের হিতে দিবসে নিশায়,
সমদর্শী সম্রাটের সঙ্গে থাকি, হায় !
কত নীতি শুভকরী করিত রচনা,
প্রজাহিতে নৃপহিত করিয়া কামনা।
মোস্‌লেম-হিন্দুরে বাঁধি প্রেমের বন্ধনে,
প্রতিষ্ঠিত একক্ষেত্রে অভিন্ন-পরাণে
চেয়েছিল দেখিবারে যেই মহাজন,
সেকেন্দ্রা তাঁহার অস্থি করিছে ধারণ !—
আজি যুগযুগান্তরে সেই দুই জাতি
কি দ্রোহ কি কলহেতে রহিয়াছে মাতি !
যদি কোন শুভদিনে, বিধির বিধানে,
এই দুই মহাজাতি মিশে প্রাণে প্রাণে,
সেকেন্দ্রা, তোমার এই নীরব শ্মশান,
সেদিন ভারতে হবে মহাতীর্থস্থান !

শ্রীসৈয়দ এমদাদ আলী।

বঙ্গের বাহিরে বঙ্গ-সাহিত্য।

এলাহাবাদ—১৮৯১ সালের লোকগণনায় জানা গিয়াছিল, এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা ২১৫৯। গত দশ বৎসরে অনেক বাড়িয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমাজ ও বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন সম্বন্ধে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে রাজধানী এলাহাবাদ প্রধান স্থান অধিকার করে। তীর্থ-রাজ বলিয়া ইহার যেমন পৌরাণিক খ্যাতি আছে, ইহা এ অঞ্চলবাসী বাঙ্গালীদের মাতৃভাষানুশীলনের তেমনি পীঠস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কর্ণেলগঞ্জ বঙ্গসাহিত্যোৎ-সাহিনী সভা ও বান্ধব সমিতি, প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্যমন্দির, দারাগঞ্জ বঙ্গীয় সাময়িকসাহিত্যসম্মিলনী এবং প্রবাসী-কার্য্যালয় তাহার কেন্দ্রস্বরূপ।

বঙ্গসাহিত্যোৎসাহিনী সভা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুম-দার মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহারই উদ্যোগে এবং রায় ক্ষেত্রচন্দ্র আদিত্য বাহাদুর ও বাবু মতিলাল কর প্রমুখ শিক্ষিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যে ১২৮৪ সালের ১১ই ভাদ্র তারিখ হইতে ইহার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথম প্রথম ৭০।৮০ জন গ্রাহক হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর মধ্যে সভার বেশ উন্নতি হইল। কিন্তু প্রতি ষ্ঠাতা স্থানান্তরে গমন করায় এবং সাধারণের সহানুভূতির অভাবে সভার অবনতি হইতে লাগিল। এমন কি অনেক হীনচরিত্র ব্যক্তি গ্রাহক হইয়া প্রায় ২৫০ খানি ভাল গ্রন্থ আত্মসাৎ করিল। এই সময়ে কর্ণেলগঞ্জে বান্ধব-সমিতি নাম্নী একটা বাঙ্গালা রচনা ও তর্কসভা ছিল। সভার সম্পাদক মহাশয় ১২৯৯ সালের পৌষ মাসে পুস্তকালয়টি সমিতির হস্তে অর্পণ করিলেন। এই সময় হইতে সভা ও সমিতি এক হইয়া গেল এবং ইহার কার্য্যভার সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মিত্র বি, এ, মহাশয়ের হস্তে পতিত হইল। এই সাহিত্যানুরাগী যুব-কের অসামান্য যত্নে ও উদ্যমে সভা পুনর্জ্জীবন লাভ করিল এবং অল্পকালেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট বাঙ্গালা পুস্তকালয়ে পরিণত হইল। এই পুস্তকালয়ে এক্ষণে ৯১৯ খানি পুস্তক আছে; এবং দারগার দপ্তর, নব্যভারত, প্রবাসী, বামাবোধিনী, সঞ্জীবনী, সাহিত্য এবং হিতবাদী এই কয়খানি সংবাদ ও সাময়িক পত্র রক্ষিত হইতেছে। কয়েক বৎসর হইতে কিন্তু ইহার উন্ন-তির লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। সাধারণের আর সেরূপ অনুরাগ নাই। ইহার মাসিক আয় এক্ষণে ৬৲ টাকার অধিক হয় না। তন্মধ্যে বাটী ভাড়ায় অর্দ্ধেক যায়। ব্যাঙ্কে ৫০৲ টাকার একখানি কাগজ আছে। বৎসরে ৪৲ করিয়া তাহা হইতে সুদ আইসে। বান্ধব-সমিতি প্রকৃত পক্ষে লোপ পাইয়াছে। সভারও অবস্থা ক্রমে খারাপ হইয়া আসিতেছে। তবে সুযোগ্য সম্পাদক অধর বাবু এলাহাবাদে থাকিতে, ইহার বিশেষ কোন অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু একজনের উপর নির্ভর করিয়া এরূপ একটী অনুষ্ঠান স্থায়ী হইতে পারে না। কর্ণেল-গঞ্জে উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অভাব নাই। তাঁহাদের নিকট আমাদের সানুনয় প্রার্থনা, আজ ২৩ বৎসর যাহা সগৌরবে চলিয়া আসিয়াছে, বাঙ্গালী জন-সাধারণের হিতকারী সেই জাতীয় কীর্ত্তি সামান্য উপেক্ষায় বিলুপ্ত না হয়।

প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্যমন্দির শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মুখো-পাধ্যায়, বি, এ, শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য ও লেখক

কর্ত্তৃক, শ্রীযুক্ত নিতাইচরণ মিত্র, সার্জ্জন লেফ্‌টেনেণ্ট রায় মহেন্দ্রনাথ ওহ্‌দেদার বাহাদুর, ডাক্তার এস্ পি রায় এম,বি, এম, আর, সি পি, এম আর, সি, এস এবং শ্রীযুক্ত সত্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম,এ, বি,এল, এম আর, এইচ্, এস, মহোদয়গণের তত্ত্বাবধানে ১৩০৩ সালের ১লা বৈশাখ প্রতিষ্ঠিত হয়। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ স্থানীয় উচ্চপদস্থ এবং শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট মন্দির বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ইহার মাসিক আয় এক্ষণে ২০৲ হইতে ২৮৲ টাকা পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছে। পুস্তকসংখ্যা সহস্রের কিঞ্চিৎ অধিক উঠিয়াছে এবং নব্যভারত, প্রতিবাসী, প্রদীপ, প্রবাসী, প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী, বসুমতী, ঠাকুরদার্পণ, ভারতী, মুকুল, সঞ্জীবনী, সাহিত্য, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, হিতবাদী এবং হিন্দু পত্রিকা এই কয়খানি সংবাদ ও সাময়িক পত্র রক্ষিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এই শ্রেণীর বিবিধ পুরাতন বিলুপ্ত পত্রিকা এবং শব্দকল্পদ্রুম, বিশ্বকোষ, ও নানাবিধ বাঙ্গালা অভিধান সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে বাঙ্গালা পুস্তকালয়ের মধ্যে সাহিত্যমন্দির সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। মন্দিরের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার স্থায়ী সভাপতি কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন এম, এ। ইহার সুযোগ্য সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত নীলমাধব সেন গুপ্ত এবং কার্য্যাধ্যক্ষ বাবু গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহার স্তম্ভস্বরূপ। মন্দিরের সংশ্লিষ্ট একটী সাহিত্যসভা সংস্থাপিত হইয়াছে। "প্রবাসী"-সম্পাদক এবং কায়স্থকলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, তাহার স্থায়ী সভাপতি, প্রেমচাঁদরায়চাঁদ বৃত্তিধারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, এল, এল, ডি, সাধারণ সম্পাদক এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, মন্দির ও সভার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন। মন্দির এবং সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ পুস্তকালয়টির জন্য একটী বাটী নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছেন। স্থানীয় ধনী ব্যক্তিগণ সাহায্য করিলে চেষ্টা ফলবতী হইবে সন্দেহ নাই।

দারাগঞ্জ বঙ্গীয়সাময়িকসাহিত্যসম্মিলনটী একবৎসর হইল শ্রীযুক্ত সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য বি, এ, এবং শ্রীযুক্ত নীলরতন মল্লিক প্রমুখ ভদ্রলোকগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১৯শে শ্রাবণ রবিবার ইহার প্রথম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ভক্তিবিকম্পিত কণ্ঠে নিম্নমুদ্রিত 'আবাহন' শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করেন।

আবাহন।

১

বন্ধুগণ ! আজি দূর প্রয়াগ-প্রবাসে
কেন মোরা সম্মিলিত, কিসের কারণ ?
কোন্ রত্ন লভিবারে, কি ধনের আশে,
মুক্ত আজি উৎসাহের পুণ্য প্রস্রবণ ?
বল বল বন্ধুগণ, আজি কার লাগি
কাঁপিছে সহস্র মত্ত হৃদয়ের তার,
শত সুপ্ততান তায় উঠিয়াছে জাগি,
সহস্র তরঙ্গভঙ্গে অজস্র ঝঙ্কার ?
বল কেন হৃদয়ের ভীষণ শ্মশানে
নাহি আজ পোড়া অস্থি ভস্ম চিতাধূম !
ফুটন্ত চম্পকে পাখী মত্ত কেন গানে
গাছে গাছে ডালে ডালে সহস্র কুসুম ?
কোন্ চন্দ্র হেরি আজি চিত্তপারাবার
উথলি উঠিছে বেগে, বল, সবাকার।

২

এ নহে বিলাস ভোগ সুখের আহ্বান,—
এ নহে উৎসব পর্ব্ব মিছা নিমন্ত্রণ,
ক্ষণিক সুখের আশা ইন্দ্রিয়ের টান,
শুধু বাহ্য ঔজ্জ্বল্যের পাপ প্রলোভন।
নাহি হেথা পুষ্পমালা দীপ মনোহর
আতর গোলাপ পান আতসের বাজি !
নর্ত্তকীর অঙ্গভঙ্গি, তীব্র কণ্ঠ স্বর,
দীপরশ্মিবিস্ফুরিত মণিমুক্তারাজি !
স্বার্থসুরা পান করি অবশ হরষে
এ নহে ঘুমের ঘোরে সুখের স্বপন,
বিবেকের কণ্ঠরবে, প্রেমের পরশে
এ যে সত্য—মহাসত্য—ধ্রুব জাগরণ !
মোহনিদ্রা পরিহরি বহুকাল পরে
এ জাগা মায়ের মুখ দেখিবার তরে !

৩

অনাদৃতা উপেক্ষিতা ধাত্রী মাতৃভাষা—
আনন্দের উল্লাসের নহে এ মিলন ;
প্রতিজ্ঞায় বাঁধি বুক যজ্ঞস্থলে আসা,
জীবনের পুণ্য ব্রত করিতে গ্রহণ !
এ মিলন অতি দৃঢ় কঠোর বন্ধনে,
পরস্পরে সাক্ষী রাখি, বাঁধিতে হৃদয়,

করিব জননীসেবা কায়বাক্যমনে,
গাহিব জীবনপথে জননীর জয়।
মাতৃ অনাদর-পাপ প্রায়শ্চিত্ত তরে
আজি এই আমাদের মিলন বিধান;
অনুতপ্ত চিত্তে সব এস অকাতরে
মাতৃপদে সর্ব্বস্বার্থ করি বলিদান!
অনুতাপ-অশ্রুজলে এস দেখি হায়,
মাতৃ উপেক্ষার কালি ধোয়া যদি যায়!

৪

যে মায়ের বক্ষ হ'তে পীযূষের ধারা
পূত জাহ্নবীর সম ঝরে অনিবার!
চরাচর বিশ্ব, সৃষ্টি, গ্রহ, চন্দ্র, তারা,
যার সাথে বিজড়িত নিখিল সংসার!
জীবন-প্রভাতে যার শব্দ উচ্চারিয়া,
রাঙ্গারবিকরজালে করি আবাহন,
জীবনমধ্যাহ্নে যার মন্ত্র হুঙ্কারিয়া,
যুঝি রণে—কভু করি বিরলে রোদন—
আবার সায়াহ্নে ঘোর ঝটিকার পরে
জীবন-তরণী যবে ধীরে ভেসে যায়,
নির্ভরের পাল তুলি যে ভাষার সুরে
আত্মাকর্ণধার বসি মুক্তকণ্ঠে গায়!
সে ভাষা—সে স্নেহময়ী জননীর পদে
এস সঁপি সবে মিলি ভক্তি-কোকনদে।

৫

বঙ্গভাষা তুমি মাগো! চির স্নেহবতী,
শোকে শান্তি, রোগে স্বাস্থ্য, বিপদে অভয়া!
ক্ষুধিতের অন্নজল, অগতির গতি,
পাপিচিত্ত উদ্ধারিতে সতত সদয়া!
বঙ্গভাষা! ধরাতে মা, তুমি কল্পলতা
দীন হীন বঙ্গবাসী-কুটীর-প্রাঙ্গণে!
বিচিত্রবরণ-ফল-পুষ্প-সুশোভিতা,
ঘুচে শ্রান্তি অবসাদ যার দরশনে!
ক্ষমা কর জননি গো! মোরা অভাজন,
ক্ষোভ, লজ্জা, অনুতাপে দহিছে হৃদয়!
চিনেও চিনি না তোমা, পূজিনি চরণ,
তব শান্তিময় ক্রোড় করিনি আশ্রয়!
ক্ষমাময়ি, ক্ষেমঙ্করি, উজলি পরাণে,
দেখা দেমা, দেখা দেমা, অবোধ সন্তানে।

৬

বন্ধুগণ! ওই দেখ মুক্ত চিদাকাশে
জ্যোতির লহরীলীলা দিগন্তপ্রসার,
ওই শুন কাণ পাতি, মহান্ উল্লাসে
বাজিছে মোহন বীণা, কাঁপিছে সেতার!
ওই দেখ, সিতশতদলের মাঝে
বাণীরূপা মাতৃভাষা কমল-আসনা;
বিমল মরাল শোভে চরণের কাছে—
শ্বেততর কান্তি লাভে বুঝিবা বাসনা!
ওই শুন, দেবীকণ্ঠস্বরসুধাধারা
ছুটেছে ভাসায়ে বিশ্ব গগনপ্রাঙ্গণ

প্রেম, শান্তি ক্ষমা, দয়া জলদেবী পারা
সে উজল শব্দস্রোতে করে সন্তরণ,
অলক্ষ্যে শ্রবণপথে পশিয়ে হৃদয়,
নির্জীব কঠোর প্রাণে করে রসময়।

৭

এখনো কি বন্ধুগণ! দেখিবে না মারে?
এখনো কি জড়তায় রহিবে ঘুমিয়া?
আপনি জননী এসে আমাদের দ্বারে
ডাকিছেন, দুই বাহু স্নেহে প্রসারিয়া!
দেখ চেয়ে চারি দিকে বরষার জলে
স্নান করি, শুষ্ক ভূমি উঠিছে জাগিয়া;
পথে ঘাটে আঙ্গিনায় দগ্ধ মরুস্থলে,
স্নিগ্ধপ্রাণ দূর্ব্বা-বধূ দেখিছে চাহিয়া।
শুধু কি মোদের প্রাণ এ হেন সময়ে
ভিজিবে না? রবে শুষ্ক নীরস কঠিন?
প্রেমে ভরা, হাস্যময়ী বসুধা-হৃদয়ে
শুধু কি আমরা রব কঠোর মলিন!
না না না, প্রসারি বাহু মা দাঁড়ায়ে দ্বারে,
স্থিরচিত্তে গৃহে বসি কে থাকিতে পারে?

৮

চিরকাল ধ্যান করি জ্ঞানী যোগিজন
ক্ষণ তরে দেখা যাঁর পায় কি না পায়!
সে দেবতা উপস্থিত আজি বন্ধুগণ!
ঘুমায়ে থেকোনা এবে মোহের ছায়ায়!
এস আজি সবে মিলি সম কণ্ঠস্বরে
মহাশক্তি মাতৃমন্ত্র করি উচ্চারণ!
এস সবে উথলিত পুণ্যপ্রেমভরে
মাতৃসেবা মহাব্রত করি হে গ্রহণ!
এস শত বিকশিত হৃদয়কুসুমে
করি হে উৎসর্গ আজি জন্মভূমি পায়!
সমস্ত জীবন কিরে কেটে যাবে ঘুমে?
পলে পলে দিনে দিনে আয়ু চলে যায়;
উৎসাহচন্দনমাখা তরুণ জীবন
জননীর পদে এস করি সমর্পণ!

৯

আজিকার এই দিন মোদের জীবনে
হউক উজ্জ্বলতম—মধুর অক্ষয়!
যে সুরে হৃদয়বীণা—আজি শুভক্ষণে
বেজেছে, সে সুর যেন চিরকাল রয়!
আজিকার পুণ্যব্রত যেন গো ঈশ্বরি!
জন্মে জন্মে, যুগে যুগে, হয় উদ্‌যাপন।
যে পথ ধরিনু আজ সবে সাক্ষী করি
চিরকাল তাহে যেন করি বিচরণ!
অবিশ্বাসী হয়ে যেন নাহি ফেলি কভু,
যে ভার হৃদয়ে আজি মা দিলেন তুলি।
জীবন যদিও যায়—এ জীবনে তবু—
মার কথা মার গুণ যেন নাহি ভুলি!
এস বন্ধুগণ আজি জিনি শোকভয়
সমকণ্ঠে গাই সবে জননীর জয়!

১০

বন্ধুগণ! কোন্ দিব্য সুবর্ণশৃঙ্খলে
বাঁধা আছি মোরা সবে বল প্রাণে প্রাণে!
কোন্ সাধনার গুণে, কোন্ মন্ত্রবলে
প্রেমপূর্ণ হৃদে আসি মিলিনু এখানে?
কোন্ তুষ্ট দুর্ব্বাসার প্রীতিপূর্ণ বরে
মুহূর্ত্তে ভুলেছি হিংসা পাপ সমুদয়;
কার প্রেমে আশীর্ব্বাদ লভিবার তরে
দাঁড়ায়েছি ভক্তিভরে পাতিয়ে হৃদয়?
বঙ্গভাষা! মাগো আজ তোর পাদমূলে
মিলেছি কাতর দুঃখী দরিদ্র সন্তান;
লও গো দীনের পূজা হের মুখ তুলে,
তব প্রতি প্রেম ভক্তি কর ভিক্ষা দান!
আজি মোরা, জননি গো, তোর কাছে আসি,
বুঝেছি বাঙ্গালী নহে প্রয়াগে প্রবাসী।

দারাগঞ্জের ন্যায় বাঙ্গালীবিরল পল্লীতে বঙ্গসাহিত্য-
ম্মিলনীর সৃষ্টিকরিয়া প্রতিষ্ঠাতাগণ সাধারণের ধন্য-
াদার্হ হইয়াছেন। সম্মিলনীর বিশেষত্ব এই যে ইহাতে
কেবলমাত্র বাঙ্গালা সংবাদ ও সাময়িক পত্র রক্ষিত হয়।
র্ত্তমানে সর্ব্বশুদ্ধ ১৫খানি পত্র রক্ষিত হইতেছে।

এলাহাবাদবাসী বাঙ্গালা গ্রন্থকারগণ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন, এম, এ—অশোকগুচ্ছ, উর্ম্মিলা
াব্য, নির্ঝরিণী, ফুলবালা।

শ্রীনীলমাধব সেনগুপ্ত—সরল কবিরাজীশিক্ষা।

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র—অপচয় ও উন্নতি।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

মজঃফরপুর। মজঃফরপুরের জজ আদালতের উকীল
শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"গত
লা শ্রাবণ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মানার্থ
ানীয় মুখার্জ্জির সেমিনারিতে একটি সভা আহূত হয়।
সেই সভায় এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের পক্ষ
ইতে কবিবরকে একখানি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়।
* বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবির প্রতি প্রবাসী বাঙ্গালীর
অকৃত্রিম ভক্তি ও আন্তরিক শ্রদ্ধার বিষয় পাঠ করিলে
'প্রবাসী"র পাঠকগণ প্রীত হইবেন। মজঃফরপুরে
একটি সাহিত্যসভা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার প্রধান
উদ্যোগিগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—শ্রীযুক্ত বরদা-
কান্ত রায়, এম, বি; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় কাব্যতীর্থ
কবিরাজ; শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ভট্টাচার্য্য, বি, এ, এবং
শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেব, বি, এ।"

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আমরা গত সংখ্যায় "ভারতবর্ষের শিল্প "নামক
প্রবন্ধে আমাদের পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি যে, বিখ্যাত
ভাস্কর ম্হাত্রেকে তাঁহার শিল্পশিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য
ইউরোপ পাঠাইবার চেষ্টা হইতেছে। যাতায়াত এবং
ইউরোপে তিন বৎসর থাকিয়া শিক্ষালাভার্থ আনুমানিক
বার হাজার টাকার প্রয়োজন। এই টাকা সংগ্রহ করি-
বার জন্য বোম্বাইয়ের কয়েকজন বিখ্যাত লোক একটী
নিবেদন পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। ম্হাত্রে মহাশয়
আমাদিগকে উহার কয়েক খণ্ড পাঠাইয়া দিয়াছেন। উহা
বিজ্ঞাপন স্তম্ভে মুদ্রিত হইল। আমরা আমাদের পাঠক
পাঠিকাগণকে যথাসাধ্য চাঁদা দিতে অনুরোধ করিতেছি।
চাঁদা নিবেদন পত্রে লিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের নিকট পাঠাইতে
হইবে। আমাদের নিকট প্রেরিত হইলে আমরা 'প্রবা-
সী'তে তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিব এবং যথাস্থানে পাঠা-
ইয়া দিব। ম্হাত্রের শিল্পনৈপুণ্যের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

সম্প্রতি সর্ আণ্টনী ম্যাক্ডনেল এলাহাবাদের কলে-
জের হিন্দু ছাত্রগণের জন্য একটি বোর্ডিং গৃহের ভিত্তি
স্থাপন করিয়াছেন। উহা প্রধানতঃ মিওর কলেজের
ছাত্রগণের জন্য অভিপ্রেত হইলেও অপর ছাত্রেরাও
উহাতে থাকিতে পাইবে। ঘটনাটি স্থানীয় হইলেও ইহার
গুরুত্ব আছে। আমরা দেখিতেছি, যে, একদিকে যেমন
বঙ্গদেশ এপ্রদেশ অপেক্ষা শিক্ষায় অগ্রসর, তেমনি অপর
দিকে এপ্রদেশে ছাত্রগণের প্রকৃত শিক্ষার জন্য যেরূপ
চেষ্টা দেখা যাইতেছে, বঙ্গদেশে সেরূপ দেখা যাইতেছে
না। কেবল ছাত্রদত্ত বেতনের উপর নির্ভর করিলে যে
কখনও সুশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না, বাঙ্গলা দেশের
লোকেরা যেন তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না, তাহার
পর উপযুক্ত ব্যক্তির তত্বাবধানে ছাত্রাবাস না থাকিলে
যে কলিকাতার মত পাপপ্রলোভন পূর্ণ স্থানে ছাত্রদের

অধোগতি নিবারণ দুঃসাধ্য, তাহাও যেন বাঙ্গালীরা বুঝিতেছেন না। গবর্ণমেণ্ট ত নিয়ম করিলেন যে ছাত্রদিগকে তাহাদের অভিভাবকগণের অধীনে কিম্বা উপযুক্ত ছাত্রাবাসে থাকিতে হইবে। কিন্তু তেমন ছাত্রাবাস কোথায়? অবশ্য বৃহৎ ছাত্রাবাসেরও একটি বিপদ আছে। মানুষ দলবদ্ধ হইয়া বাস করিলে অনেক সময় দলের সমবেত ভাব, চিন্তা ও আদর্শ গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় অনুসরণ করে। এই জন্য যাহাতে ছাত্রাবাসে এই ভাব, চিন্তা ও আদর্শ উচ্চ হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা উচিত। এই বন্দোবস্তের প্রধান এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ একজন বিদ্বান্, উন্নতচরিত্র, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী, ও বিবেচক তত্ত্বাবধায়ক। এরূপ লোক পাওয়া কঠিন, কিন্তু না পাইলে ছাত্রাবাসের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, বরং কুফল ফলিতে পারে। এলাহাবাদে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা কার্য্যে প্রধান উদ্যোগী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সুন্দর লাল, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, প্রভৃতি। এই ছাত্রাবাসে ইহাদের ধর্ম্মশিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করিবার ইচ্ছা আছে। সর্ আণ্টনী ম্যাক্‌ডনেল এপ্রদেশে শিক্ষার উন্নতির জন্য যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, অন্য কোন শাসনকর্ত্তা সেরূপ করেন নাই। তিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই ছাত্রাবাসে কুড়ি হাজার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মিওর কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার সুবন্দোবস্তের জন্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। ইতিমধ্যেই বিস্তর টাকা খরচ হইয়াছে।

—•—

ধনশালিতা জাতীয় উন্নতি বা মহত্ত্বের প্রধান বা একমাত্র চিহ্ন নহে। কিন্তু দরিদ্র জাতির উন্নতির আশা কোথায়? বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে। এই জন্য আমাদিগকে ভারতবর্ষের ধনবৃদ্ধির চেষ্টা দেখিতে হইবে। তাহার প্রথম উপায় ঘরের ধন ঘরে রাখা। আমাদের গত সংখ্যায় জাপান-প্রবাসী শ্রীযুক্ত রমাকান্ত রায় লিখিয়াছিলেন:—"শিল্প বাণিজ্য ভিন্ন দেশের উন্নতির আশা বৃথা; বেশী চাই না, যদি দেশের ধন দেশে রাখিতে পার, তবেই যথেষ্ট; যদি পশ্চিমাভিমুখী অর্থনদীর প্রবল স্রোত রোধ করিতে পার, কৃতার্থ মনে করিও।" আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হাভেল সাহেব সম্প্রতি একটি বক্তৃতায় ঠিক এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, প্রথম হইতেই ভারতবর্ষীয় শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা ভ্রান্ত। ভারতবর্ষের বাজারগুলি বিদেশী দ্রব্যে দখল করিয়া বসিয়াছে। দেশী দ্রব্য দ্বারা বিদেশী দ্রব্যকে তাড়ান আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। জাপানীদের সহিত ভারতবাসীদের এখনও কোন প্রকার শিল্পবিষয়ক প্রতিযোগিতা বা ঈর্ষা জন্মে নাই। তথায় থাকিয়া শিল্প

Photo. by] শ্রীরমাকান্ত রায়। [Naoshi Imai

শিক্ষা করা অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য। এই জন্য যাহারা অন্য দেশে যাইতে পারেন না, তাঁহাদের জাপান যাওয়া কর্ত্তব্য। এই নূতন পথের প্রদর্শক শ্রীযুক্ত রমাকান্ত রায় ভারতবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, রমাকান্ত বাবু টোকিয়ো খনিজ বিদ্যা বিষয়ক কলেজের শেষ পরীক্ষায় বিশেষ খ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। পরীক্ষকগণ তাঁহার 'খনন' (mining)

সর্ আণ্টনা ম্যাক্‌ডনেল

Indian Press, Allahabad.

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়

INDIAN PRESS, ALLAHABAD.

এবং 'খনিজান্বেষণ' বিষয়ক প্রবন্ধদ্বয়ের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

আমাদের দেশে দয়ার অভাব নাই। কিন্তু অনেক সময় ইহা জীবনের সকল বিভাগে সমভাবে পরিলক্ষিত হয় না। হিন্দুস্থানে হিন্দু ও জৈনদিগের মধ্যে পিপীলিকা-দিগকে খাদ্যদানের রীতি প্রচলিত আছে। এপ্রদেশে অনেকের বিশ্বাস সহস্র পিপীলিকাকে ভোজ্য দানে সহস্র ব্রাহ্মণ ভোজনের ফল হয়। প্রাতে অপরাহ্নে পথের ধারে প্রায়ই কোন না কোন লোককে কিছু চিনি বা আটা লইয়া পিপীলিকার গর্ত্ত খুঁজিতে ও তাহার নিকটে উহা ছড়াইয়া দিতে দেখা যায়। কিন্তু ইহারাই হয়ত দ্বারে

ভিক্ষুক দেখিলে বিরক্ত হন, চাকর বাকরের সহিত কর্কশ ব্যবহার করেন, গৃহপালিত পশ্বাদির যত্ন করেন না। শেষোক্ত বিষয়ে বাঙ্গালীরা বোধ হয় এদেশের লোক অপেক্ষাও অধিক নিন্দার্হ। গোবধ মহাপাতক বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু অযত্নে ও অনাহারে যদি গোরু মারা যায়, তাহা হইলে তাহাতে নিষ্ঠুরতা বা পাপ হয়, কয়জন বাঙ্গালী কৃষক বা গৃহস্থ এরূপ মনে করেন? এই কারণে আমাদের দেশে গবাদির সংখ্যা কমিতেছে, তাহারা দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রকায় হইতেছে। গাভীরাও পূর্ব্বের মত অধিক পরিমাণে দুগ্ধ দেয় না। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের ইহাও একটি পরোক্ষ কারণ।

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে Annalen der Chemie নামক সুপ্রতিষ্ঠিত জর্ম্মান রাসায়নিক পত্রে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের পারদঘটিত গবেষণা ও আবিষ্ক্রিয়া সমূহের একটি বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে। এই পত্রের সম্পাদকগণ বিখ্যাত রাসায়নিক। তাঁহারা অধ্যাপক রায়ের গবেষণা ও আবিষ্ক্রিয়া সমূহের অপূর্ব্বত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

বরোদার মহারাজা শ্রীসয়াজীরাও গায়েকোয়াড় একজন আদর্শ দেশীয় নৃপতি কোন কোন বিষয়ে তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকেও পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছেন। তিনি গত বৎসর বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বারশত নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা আছে, ক্রমে ক্রমে পাশ্চাত্য অনেক সুসভ্য দেশের ন্যায় নিজ রাজ্যে সকল প্রজাকেই শিক্ষালাভ করিতে বাধ্য করিবেন, এবং বিনা-বেতনে সকল ছাত্র ও ছাত্রীকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবেন। তাঁহার রাজ্যে শিল্প শিক্ষার জন্য কলাভবন এবং সাধারণ উচ্চশিক্ষার সুবন্দোবস্ত আছে। মহারাণী বালিকাদের শিক্ষাদানে বদ্ধপরিকর। বরোদারাজ্যে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সাহায্যে একদিকে দরিদ্র কৃষকগণ চাষ বাস করিতে সমর্থ হইবে, অপর দিকে সুদখোর মহাজনদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে। সমাজসংস্কার কার্য্যেও মহারাজা ব্রতী হইয়াছেন। তিনি স্বরাজ্যে বিধবাবিবাহ আইন-সঙ্গত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা

এই কারখানায় উপযুক্ত ও সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় দেশীয় বিবিধ উদ্ভিজ্জাদি হইতে বহুল ঔষধাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের ঔষধাদি সমস্তই সদ্য প্রস্তুত সুতরাং বিলাতী আমদানী অপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ, সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, সুলভ এবং ভারতীয় লোকের ধাতু প্রকৃতির সম্পূর্ণ উপযোগী। আমাদের কারখানা দেশীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সাধারণের অনুগৃহীত, বিশ্বস্ত, পরিচিত এবং প্রশংসিত। পরীক্ষা করিয়া আমাদের গৌরব বর্দ্ধন করিবেন কি?

এসেন্স অব নিম

যাবতীয় রক্তবিকৃতির মহৌষধ। সালসার মত কঠিন নিয়ম নাই। বাত, ব্যথা, চর্ম্মরোগ, ফোড়া প্রভৃতি হইতে কঠিন পারদবিকৃতি পর্য্যন্ত সকল প্রকার রোগে সম্পূর্ণ ফলপ্রদ। মূল্য দুই টাকা।

এসেন্স অব অশোক

যাবতীয় কঠিন ও কষ্টকর স্ত্রীরোগের পরম ঔষধ মৃতবৎসা, গুল্ম প্রভৃতি দূর করিয়া নারীগণকে নীরোগ করে। ইহা সেবনে কোন কষ্ট বা অসুবিধা নাই। মূল্য দুই টাকা।

এসেন্স অব পেঁপে

অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি, কোষ্ঠকাঠিন্য, বুকজ্বালা, অম্লদোষ, প্লীহা প্রভৃতির পরীক্ষিত মহৌষধ। খাইতে বড়ই মুখপ্রিয়। বিলাতী "পেপ্‌সিনে"র মত জান্তব দ্রব্য মিশ্রিত নহে। মূল্য দুই টাকা।

এসেন্স অব অশ্বগন্ধা

মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, চিন্তা ও ধারণাশক্তিহানি, অবসাদ প্রভৃতির অমোঘ মহৌষধ। যাহাদের অত্যধিক মানসিক শ্রম করিতে হয়, ইহা তাঁহাদের নিত্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। মূল্য প্রতি শিশি দুই টাকা।

পত্র লিখিলেই ইংরাজী বা বাঙ্গালা বিস্তৃত মূল্যতালিকা পাঠাই। সমস্ত চিঠি পত্রই উল্লিখিত ঠিকানায় আমাকে লিখিবেন।

ম্যানেজার।

AN EARNEST APPEAL

ON BEHALF OF

A PROMISING INDIAN ARTIST

The one thought uppermost at present in the mind of educated Indians is the industrial revival of this country the bringing back of its ancient position in art and industry. To give practical effect to it in one subject there is now an excellent opportunity of which, it is hoped, full advantage will be taken. It is proposed to form a fund to carry out the suggestion of Sir George Birdwood and Mr. Greenwood, the Principal of Sir J. J. School of Art, to send to Europe Mr. G. K. MHATRE, whose genius in art has already produced "the most beautiful statue that was ever modelled in India," to enable him to learn the sculptor's art. He has been pronounced to be a genius by men most competent to judge in such matters. In the words of Mr. Greenwood, it must be "the pride and pleasure (of every Indian) to encourage so gifted a member of his own race." More than that, it is a duty which we owe to our motherland, because Mr. Mhatre's success would go far to remove the erroneous impression that Indians are wanting in originally and taste. We, therefore, earnestly appeal to all Indians and their sympathisers to subscribe liberally to the fund. Mr. Mhatre will have to spend three years in Europe and at a rough estimate the expenses are expected to about Rs. 12,000.

JANARDAN GOPAL MANTRI, J. P.,
Solicitor, High Court.
DAJI ABAJI KHARE, B. A., L. L. B.,
Vakil High Court.
T. K. GAJJAR, M. A., B. S. C.,
Techno, Chemical Laboratory, Girgaum, Bombay,
V. N. BHAJEKAR, F.R.C.S. (*Edin.*) D.P.H. (*Lond.*),
Angre's Wadi, Girgaum Black Road, Bombay.

P. S.—Gentlemen wishing to help the cause are requested to send there subscriptions to either of the undersigned at the addresses mentioned. The subscriptions will be duly acknowledged in public papers.

T. K. GAJJAR,
V. N. BHAJEKAR.

SANTINIKETAN PRIZE

OF

RUPEES THREE HUNDRED.

For the best "Life and Teachings of Maharshi Devendra Nath Tagore, Prodhan Acharya of the Brahmo Somaj" in Bengali offered by one of his humble and admiring disciples, to be read at the next Santiniketan anniversary to be held on the 7th Pous 1308 B. S., on the occasion of the anniversary of the initiation day of Maharshi.

A committee of the following gentlemen will award the prize in consultation with the giver :—

1. Babu Umesh Chandra Dutta, B. A.
2. Bhai Trailakshy Nath Sanyal.
3. Babu Jogindra Nath Bose (Deoghar).

The copy right will belong to the writer. The style must be simple, chaste and classic Bengali. The copies must reach the undersigned by the 5th Agrahyana 1308.

The committee will reserve to itself the power of expunging any portion that may seem to them objectionable, and of withholding the prize if the compositions do not come up to the mark.

All communications on the subject should be addressed to.

6, Dwarkanath Tagore's Lane,
Jorasanko, Calcutta.
25-6-01.

HEMENDRA NATH SINHA.

[Friendly papers kindly quote].

বুদ্বুদ।

BUDBUD.—(By Babu Bipin Behari Chakrabarty). This *brochuri* contains a collection of original poems. The poems bristle with original ideas and fine thoughts and show the refined taste of the author. We have perused some pieces with pleasure and we are sure the book will be read with great interest.—The *Bengalee*, 16-8-01.

সচিত্র সোণালী মলাট—মূল্য ১৲ টাকা।

প্রাপ্তি স্থান—কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ২০১, ২০৮।২ ও ২০৯নং বাড়ীর লাইব্রেরী সকল।

অশোকতরুতলে রাক্ষসীপরিবৃতা সীতা।

রাজা রবিবর্ম্মার এক খানি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব চিত্র হইতে।

INDIAN PRESS, ALLAHABAD.

প্রবাসী

[illegible]থম ভাগ। } আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩০৮। { ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখ্যা।

কোচিন ও ত্রিবাঙ্কোর।*

এই দুইটী করদ রাজ্য ভারতবর্ষের দক্ষিণপশ্চিম [illegible]গে অবস্থিত। বৃটিশ মালাবার (কালিকাট জেলা) [illegible]বং এই দুইটী রাজ্যের সমবেত নাম মালাবার। মালা-[illegible]রের পশ্চিমে সমুদ্র। বাঙ্গলা দেশ ও সমুদ্রের মাঝামাঝি [illegible]নে যেমন স্যাঁতসেঁতে অস্বাস্থ্যকর সুন্দরবন, মালাবারে [illegible]রূপ কোন ভূখণ্ড নাই। অথবা মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে [illegible]মন সমুদ্রের কিনারাতেই মহাদেশ (main-land), [illegible] নয়। মালাবারে সমুদ্রের কিনারায় [illegible] এক [illegible] দ্বীপের মত স্থলভাগ। এই স্থলভাগ [illegible] মহাদেশের (main-land) সহিত মিলিত আছে [illegible], কিন্তু [illegible] ইহাকে মহাদেশের অংশবিশেষ [illegible] স্থলভাগ ও মহাদেশ উভয়ের মধ্যে [illegible] ঝিল। ঝিলের ভিতর বহুসংখ্যক [illegible] 'ব্যাক্ ওয়াটার্' (back water [illegible])। উত্তরে তিরুর নামক স্থান [illegible] ত্রিবান্দ্রাম্ পর্য্যন্ত প্রায় ২৫০ মাইল উপ-[illegible] ব্যাক্ ওয়াটার্ আছে। সমুদ্র [illegible] মধ্যস্থিত লম্বা স্থলভাগ স্থানে [illegible] থাকাতে পূর্ব্বে এক ব্যাক্ [illegible] ব্যাক্ ওয়াটারে নৌকা করিয়া [illegible] এখন স্থানে স্থানে খাল কাটিয়া এবং দুই স্থানে দুইটী সুড়ঙ্গ (tunnel) করিয়া দেওয়াতে ত্রিবান্দ্রাম্ হইতে নৌকা করিয়া প্রায় ২৫০ মাইল দক্ষিণ দিকে যাওয়া যায়। ব্যাক্ওয়াটার্ সাধারণতঃ ২।৩ মাইল চওড়া। স্থানে স্থানে ৭।৮ মাইল চওড়াও আছে। বৃটিশ কোচিন সহরটী ব্যাক্ওয়াটার্ ও সমুদ্রের মধ্যস্থিত সরু স্থলভাগের উপর অবস্থিত। কোচিন হইতে মহাদেশে যাইতে হইলে সাড়ে তিন মাইল ব্যাক্ওয়াটার্ পার হইয়া যাইতে হয়। ব্যাক্ওয়াটার্ এবং সমুদ্রের মধ্যস্থিত স্থলের পরিসর কোন কোন স্থানে ২।৩ মাইল। অধিকাংশ স্থলেই ২।৩শত গজের বেশী নয়। দুই এক জায়গা এমনও দেখিয়াছি যে, সমুদ্রের বড় বড় ঢেউগুলি এই স্থল টুকুকে ডিঙ্গাইয়া আসিয়া ব্যাক্ওয়াটারে পড়িতেছে। এই সরু স্থলভাগে সাধারণতঃ ধীবরজাতীয় লোকের বাস। ইহাদের অধিকাংশই খৃষ্টীয়ান। এই খৃষ্টীয়ানেরা চাষ ও মজুরের কাজও করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির এদেশে বাস করিবার ক্ষমতা নাই। করিলে জাতিচ্যুত হইতে হয়।

পূর্ব্বে ধীবর প্রভৃতি নীচজাতীয় লোক ছাড়া অন্য কেহ এই স্থান দিয়া যাতায়াতও করিত না। মালাবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী গুলি পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণী হইতে আসিয়া এই ব্যাক্ওয়াটারে পতিত হয়। প্রত্যেক নদীর সমুদ্রে পড়িবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটী মুখ নাই। ব্যাক্-ওয়াটার্ ও সমুদ্রের সহিত সংলগ্ন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল বা নদী আছে। এই সব খাল দিয়া ব্যাক্ওয়াটারের

* [illegible] রায় [illegible]।

অতিরিক্ত জল যাইয়া সমুদ্রে পড়ে, আবার সমুদ্রের জোয়ারের জল ব্যাক্ওয়াটারে আসে।

হণ্টার সাহেব ওড়িষানামক পুস্তকে চিল্কা হ্রদ সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য লিখিয়াছেন, মালাবারের ব্যাক্ওয়াটার সম্বন্ধেও তাহা খাটে। এই ব্যাক্ওয়াটারের কিনারায়, ইহার মধ্যস্থ দ্বীপসমূহে এবং সমুদ্রের কিনারায় কেবল নারিকেলের বাগান। নারিকেল গাছ সম্বন্ধে এদেশীয় লোকের বিশ্বাস এই যে, মানুষের গলার আওয়াজ যতদূর পর্য্যন্ত যায়, ততদূর নারিকেল গাছ খুব ফলবান্ হয়। এই সংস্কারের জন্য নারিকেল বাগানের স্বত্বাধিকারিগণ গরীব ইতরজাতীয় লোকদিগকে বিনা করে নারিকেল বাগানে ঘর করিয়া থাকিতে দেয়। প্রজা নিজে যে সব বৃক্ষ উৎপাদন করিবে, তাহার ফল সে ভোগ করিবে, কিন্তু বাগানের অন্য কোন ফল লইলে দাম দিতে হয়। প্রজাকে উঠাইয়া দিতে হইলে তাহার ঘরের এবং রোপিত বৃক্ষের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এই সব গরীব লোক মাছ ধরিয়া অথবা নারিকেল গাছ হইতে তাড়ি বাহির করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অনেক স্ত্রীলোক নারিকেলের খোসা হইতে ছোবড়া বাহির করিয়া এবং ছোবড়া দ্বারা সরু সরু রশি তৈয়ার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ব্যাক্ওয়াটার্ ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার মধ্যে উচ্চ ভূখণ্ডে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতির বাস। পূর্ব্বে এই অংশের রাজপথে ইতর জাতীয় লোকের যাতায়াত করিবার ক্ষমতা ছিল না, এবং কতক পরিমাণে এখনও নাই। এখনও যদি কোন ইতরজাতীয় লোক এবং ব্রাহ্মণ বা নেয়ার একই সময় রাস্তায় উপস্থিত হয়, তাহাহইলে ইতরজাতীয় লোক রাস্তা ছাড়িয়া জঙ্গলে বা মাঠের ভিতর যাইতে বাধ্য। এই ভূমিখণ্ডের পশ্চিমে পাহাড় পর্ব্বত। এই সব পর্ব্বতে বহুসংখ্যক অসভ্য জাতির বাস। ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের পাহাড় পর্ব্বতেই এই সব বর্ব্বর অসভ্য জাতি আছে। ত্রিবাঙ্কোর এবং কোচিনের অসভ্য জাতি সকলও সেই সব জাতি সকলের অনুরূপ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মালাবারের নেয়ার এবং তিয়রদিগের ভিতর প্রচলিত জঘন্য বহুপত্যাত্মক বিবাহ ইহাদের কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই।

মালাবারের পাহাড়ে সেগুন গাছ জন্মে। অনেকে বলেন, ব্রহ্ম দেশের সেগুন কাঠের চাইতে মালাবারের সেগুন কাঠ ভাল। তাহার কারণ এই ব্রহ্ম দেশের সেগুনের গাছ হইতে তেল বাহির করিয়া লইয়া তাহা স্বতন্ত্র বিক্রয় করে। সুতরাং কাঠে যথেষ্ট তেল থাকে না। তেল থাকিলে কাঠ দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। মালাবারে সেগুন গাছ হইতে তেল বাহির করিবার নিয়ম নাই, সুতরাং এখানকার সেগুনে বেশী তেল থাকে এবং কাঠ দীর্ঘকালস্থায়ী হয়। সেগুন ব্যতীত এই সব পর্ব্বতে চা, কফি, বড় এলাচি, গোলমরিচ ও আদা যথেষ্ট জন্মে। এই সমস্ত জিনিষই বিদেশে রপ্তানী হয়। কোচিনের নারিকেল তেলের নাম বাঙ্গালীদের নিকট অজ্ঞাত নাই। নারিকেলের ছোবড়ার রশি, ছোবড়া, এবং তেলের খৈলও ইউরোপে রপ্তানী হয়। শুনিতে পাই, নারিকেল তৈলে সাবান এবং খৈল হইতে নারিকেল বিস্কুট তৈয়ারি হয়। এটী কোচিনের বাজার গুজব, সত্য কি না বলিতে পারি না।

কোচিনে ধান চাষ হয়। ত্রিবাঙ্কোরেও যথেষ্ট ধানের আবাদ হয়। কিন্তু এদেশে ধান দেশের লোকের প্রয়োজনের চাইতে কম জন্মায় সুতরাং ব্রহ্মদেশ, কলিকাতা এবং চট্টগ্রাম হইতে ধান ও চাউল আমদানী হয়।

বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকাগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, চট্টগ্রামের দেশী জাহাজ সময় সময় ধান চাউল লইয়া কোচিনে আসে। এই সব জাহাজের মালিক সারং প্রভৃতি সমস্তই চাটগেঁয়ে মুসলমান। চট্টগ্রামের দেশী জাহাজগুলি দেখিতে মন্দ নয়। ভাল ভাল জাহাজগুলি দূর হইতে দেখিতে বিলাতী জাহাজের (sailing vessels) মত দেখায়। মালাবার ও বম্বের লোকে যে সব নৌকা করিয়া সমুদ্রে ব্যবসা বাণিজ্য করে, তাহাকে ফতেমারি (Patimar) বলে। চাটগেঁয়ে জাহাজের কাছে ফতেমারি কিছুই নয়। [মালাবারে 'কাটামারান' বা মাছ ধরিবার ভেলার চলন আছে। সেগুলি দেখিতে ডোঙ্গার মত, কিন্তু বস্তুতঃ কয়েকখণ্ড হাল্কা কাঠ বাঁধিয়া প্রস্তুত করা হয়। এক প্রকার খুব লম্বা ছিপ চলিত আছে, তাহাকে 'সর্প-নৌকা' (serpent

boat) বলা হয়। রাজা বা দেওয়ানের মত বড় লোক বজরা করিয়া যখন জলপথে ভ্রমণ করেন, তখন দিকে দুটি সর্প-নৌকা যায়।]

কোচিনে দুই জাতীয় সওদাগর আছে। ইউরোপীয় ও দেশীয়। ইউরোপীয় সওদাগরগণ দেশীয় সওদাগরদের নিকট দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া ইউরোপে প্রেরণ করেন, এবং ইউরোপীয় দ্রব্যজাত দেশীয় সওদাগর দিগের নিকট বিক্রয় করেন। দেশীয় সওদাগরগণ প্রায় সমস্তই বম্বের মুসলমান বা ভাটীয়া বেনিয়া।

এখানে অনেকগুলি মিল আছে। কুইননে কাপড়ের কল (spinning and weaving mills), অন্যান্য স্থানে নারিকেল তেলের কল এবং নারিকেলের ছোবড়ার চট (coir matting) তৈয়ারি করিবার কল আছে। "চা"র বাক্স প্রভৃতির জন্য করাতের কল (sawing mill) একটা আছে। সম্প্রতি কোচিনে লোহা ঢালাই করিবার একটা কল (foundry) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মালাবার সম্বন্ধে প্রাচীন কিম্বদন্তী এই যে, পরশুরাম মাতৃহত্যা এবং ক্ষত্রিয়হত্যার পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া কোথায়ও ভূমি পাইলেন না। অবশেষে বরুণ দেবের নিকট কিছু ভূমি প্রার্থনা করিলেন। বরুণ পরশুরামকে সমুদ্রের দিকে পরশু নিক্ষেপ করিতে বলিলেন এবং সমুদ্রকে আজ্ঞা দিলেন যে যতদূর পরশু নিক্ষিপ্ত হইবে, তাঁহাকে ততদূর হইতে সরিয়া যাইতে হইবে। তদনুযায়ী সমুদ্র সরিয়া যাইয়া মালাবার প্রদেশ সৃষ্টি করিলেন। কথিত আছে, পরশুরাম একদল ব্রাহ্মণ সৃজন করিয়া তাহাদিগকে এই প্রদেশ দান করিলেন। এই ব্রাহ্মণদিগকে এ দেশে নাম্বুদ্রি বা নাম্বুরি ব্রাহ্মণ বলে। ডাক্তার ফ্রান্সিস্ ডে নামক ইংরেজ ইতিহাসলেখক অনুমান করেন, পরশুরাম অন্যান্য জাতি হইতে এই ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেন। কিন্তু এই অনুমান ঠিক বলিয়া মনে হয় না। মালাবারে নাম্বুরির ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক, সম্মানও যথেষ্ট। কোচিন ও ত্রিবাঙ্কোর রাজবাড়ীতে ক্রিয়াকলাপাদি উপলক্ষে নামবুরি যে সম্মান প্রাপ্ত হয়েন, মান্দ্রাজের কোন আমীর, আমেদারই তাহা প্রাপ্ত হন না।

কিছুদিন সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবার পর এই পরশুরামের নাম্বুরিগণ আত্মকলহ উপস্থিত করিলেন, এবং অবশেষে উপায়হীন হইয়া সকলে মিলিত হইয়া "চেরা" রাজ্যের রাজার শরণাপন্ন হইলেন। চেরা রাজ্য এই সময় (খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৭ অব্দে) দাক্ষিণাত্যে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ত্রিবাঙ্কোরের ইতিহাসলেখক চেরাকে ত্রিবাঙ্কোর বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। যাহা হউক চেরার রাজা নাম্বুরিদের দেশ শাসন করিবার জন্য একজন রাজপ্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। এই রাজপ্রতিনিধিদের সাধারণ নাম ছিল, "চেরামন পেরুমল" অর্থাৎ চেরার রাজপ্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিদের নিয়ম ছিল যে রাজকার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা হয় আত্মহত্যা করিবেন, না হয় সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবেন। সর্ব্বশেষ চেরামন পেরুমল রাজদ্রোহী হইয়া নিজে স্বাধীন রাজা হইলেন। ইহাতে চেরার রাজা কিষেন রাও সসৈন্যে আসিয়া পেরুমলকে যুদ্ধে হারাইয়া তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু এক বিশ্বাসঘাতক নাম্বুরি ব্রাহ্মণ কিষেন রাওকে হত্যা করিয়া পেরুমলকে পুনরায় রাজ্যাধিকার দান করিল। এই পেরুমল অবশেষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোচিনের রাজা ইঁহার ভাগিনেয়ের এবং ত্রিবাঙ্কোরের রাজা ইঁহারি পুত্রের বংশধর। কথিত আছে যে ইঁহার স্ত্রী শূদ্রজাতীয়া ছিলেন। তজ্জন্য ত্রিবাঙ্কোরের রাজবংশ শূদ্র বলিয়া বিখ্যাত।

শেষ পেরুমলের পরে মালাবারে কেবল ত্রিবাঙ্কোর ও কোচিন রাজ্য ছিল না, ইহা ছাড়া আরও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। ইহাদের মধ্যে যখন যে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি হইত, তিনি অপরকে পদদলিত করিতেন। যখন ইউরোপীয়েরা প্রথম ভারতবর্ষে আসেন, তখন কালিকাটের জমরিন বা সামুরি খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন। অবশেষে যখন টীপুর অধঃপতন হইয়া ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি হইল, তখন কেবল কোচিন ও ত্রিবাঙ্কোর স্বাধীন রহিল। অপর সমস্ত ছোট বড় রাজাদের রাজ্য কতক কোচিনের কতক ত্রিবাঙ্কোরের এবং অবশিষ্ট সমস্ত বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হইল। টীপু সুলতান ত্রিবাঙ্কোর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সময়ে লর্ড

কর্ণওয়ালিস মহীশুর আক্রমণ করায় টীপুকে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল।

ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষেরমধ্যে সর্ব্বপ্রথম মালাবার প্রদেশে আগমন করেন। ভাস্কো ডি গামা প্রথম কালিকাটে উপস্থিত হন। ভাস্কো ডি গামার সহিত কতকগুলি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী ছিল। ইহাদিগকে সঙ্গে আনিবার উদ্দেশ্য, দেশীয় লোক গুলি কিরূপ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য ইহাদিগকে তীরে নামাইয়া দিবেন। যদি মারা পড়ে ইহারাই মারা পড়িবে। ভাস্কো ডি গামা ইহাদের একজন কয়েদীকে কালিকাটে নামাইয়া দিলেন। দেশীয় লোক কেহই ইহার কথা বুঝিতে না পারিয়া ইহাকে টিউনিশ-নিবাসী এক মুসলমানের নিকট লইয়া গেল। এই মুসলমান বহুদিন স্পেনদেশে ছিল, স্প্যানিষ ভাষা জানিত এবং স্প্যানিয়ার্ড ও পর্ত্তুগিজদিগের আচার ব্যবহার সমস্তই পরিজ্ঞাত ছিল। সে ভাস্কো ডি গামার জাহাজের লোকটীকে দেখিয়াই পর্ত্তুগিজ বলিয়া চিনিতে পারিল এবং স্প্যানিষ ভাষায় এই সুমিষ্ট সম্বোধন করিল,— "D—L take thee! What brought you here?"

এই সময় বিদেশীয়দের মধ্যে মুসলমান জাতিই কেবল ভারতবর্ষে আসিবার রাস্তা জানিত। ইহারা আরব, মিসর এবং মরক্কো প্রভৃতি দেশ হইতে লোহিত সাগর এবং পারস্যোপসাগর দিয়া ভারতবর্ষে যাতায়াত করিত এবং ভারতবর্ষের বাণিজ্য দ্রব্য ইউরোপে বিক্রয় করিয়া প্রচুর লাভ করিত। ইউরোপীয়েরা বহুকাল হইতে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টায় ছিলেন। ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিতে যাইয়াই কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

টিউনিসনিবাসী এই মুসলমানকে দোভাষী করিয়া কালিকাটের লোক ভাস্কো ডি গামার জাহাজে গেল। এই মুসলমানের মুখে স্প্যানিষ ভাষা শুনিয়া ভাস্কো ডি গামার জাহাজের লোক সকল আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল। সর্ব্ব প্রথম ইউরোপীয়কেও ভারতবর্ষে আসিয়া আকার ইঙ্গিতে কথা বার্ত্তা কহিতে হয় নাই। ভাস্কো ডি গামাও দোভাষী পাইয়াছিলেন।

কালিকাটে মুসলমানদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। তাহারা দেখিল ভাস্কো ডি গামার উদ্দেশ্য বাণিজ্য। জাহাজে করিয়া ইউরোপে ভারতবর্ষের জিনিষ লইয়া গেলে মুসলমানদের ব্যবসা একবারে মাটী হইবে। সুতরাং ইহারা ভাস্কো ডি গামার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। ভাস্কো ডি গামা অত্যন্ত ক্রোধী, অসহিষ্ণু ও নিষ্ঠুর ছিলেন; সুতরাং কালিকাট হইতে ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে পর্ত্তুগিজরা কোচিনের রাজার অনুমতি পাইয়া কোচিনে প্রথমে কুঠি পরে দুর্গ প্রস্তুত করেন। ভাস্কো ডি গামা দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসিলে কোচিনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মালাবারে নানা সম্প্রদায়ের লোকের বাস। ইহার মধ্যে হিন্দুজাতিই জনসংখ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। খৃষ্টীয়ান জাতীয় লোকও মালাবারে কম নয়। প্রায় চতুর্থাংশ লোক খৃষ্টীয়ান। মুসলমানের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। এতদ্ব্যতীত ইহুদী জাতীয় লোকও অল্প পরিমাণে আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী লোকের ভিতরেই এমন অনেক নূতনত্ব আছে, যাহা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে নাই।

মালাবারের হিন্দুদের ভিতর নাম্বুরি ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিম্বদন্তী মতে পরশুরাম এই জাতিকে সৃষ্টি করেন। ডাক্তার ফ্রান্সিস্ ডে বিশ্বাস করেন যে নাম্বুরি এবং মালাবারের অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ প্রকৃত পক্ষে আর্য্য ব্রাহ্মণ নহে। ইতরজাতীয় লোকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ নাম গ্রহণ করিয়াছে। নাম্বুরী ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে এই অনুমান সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু কোঙ্কানি ব্রাহ্মণ নামক মালাবারের অপর এক ব্রাহ্মণ জাতি সম্বন্ধে এই অনুমানটী সত্য বলিয়া বোধ হয়। কোঙ্কানি ব্রাহ্মণেরা স্বর্ণকার ও তন্তুবায়ের ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। প্রবাদ এই যে ইহারা ধীবর জাতি হইতে উৎপন্ন। এখনও নাকি ইহাদের বিবাহের সময় বর কন্যা উভয়ে মিলিত হইয়া একটী গামলা হইতে ছোট একটী জাল দ্বারা মাছ ধরিয়া বিবাহ ব্যাপার সম্পূর্ণ করিয়া থাকে। আজকালকার কোঙ্কানি ব্রাহ্মণেরা এই প্রথাটীর প্রচলন থাকা স্বীকার করে না।

শুধু মালাবারে নয়, সমস্ত দাক্ষিণাত্যেই ব্রাহ্মণের আধিপত্য অত্যন্ত বেশী। হণ্টর সাহেবের মতে আর্য্যাবর্ত্তে জাতিভেদ প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেই আর্য্যেরা দাক্ষিণাত্যে

ত্রিবাঙ্কোড়ের মহারাজা।

INDIAN PRESS, ALLAHABAD.

কাটামারান।

By permission of Mr. J. B. D'Cruz, Photographer.

ত্রিবাঙ্কোড়ের একটি খালের দৃশ্য।

কালিকাটের জমরিন।

জমরিন-মহিষী।
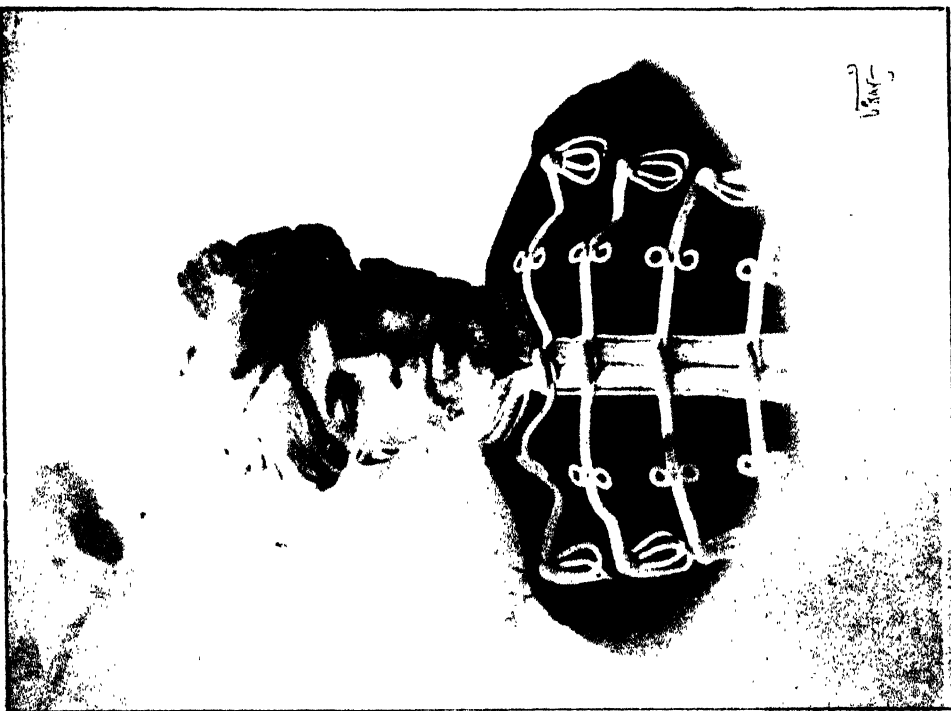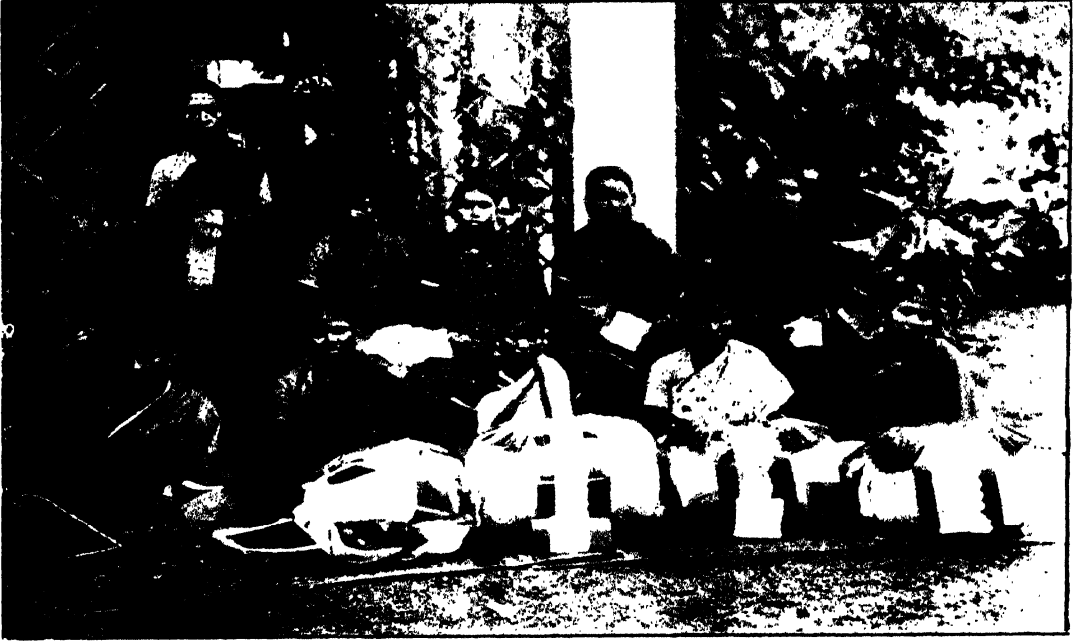
লেস্‌-বয়নে ব্যাপৃতা শানার খৃষ্টান নারীবৃন্দ

By permission of Mr. J. B. D' Cruz, Photographer.

খৃষ্টান মজুরেরা জল তুলিবার চাকায় কায করিতেছে।
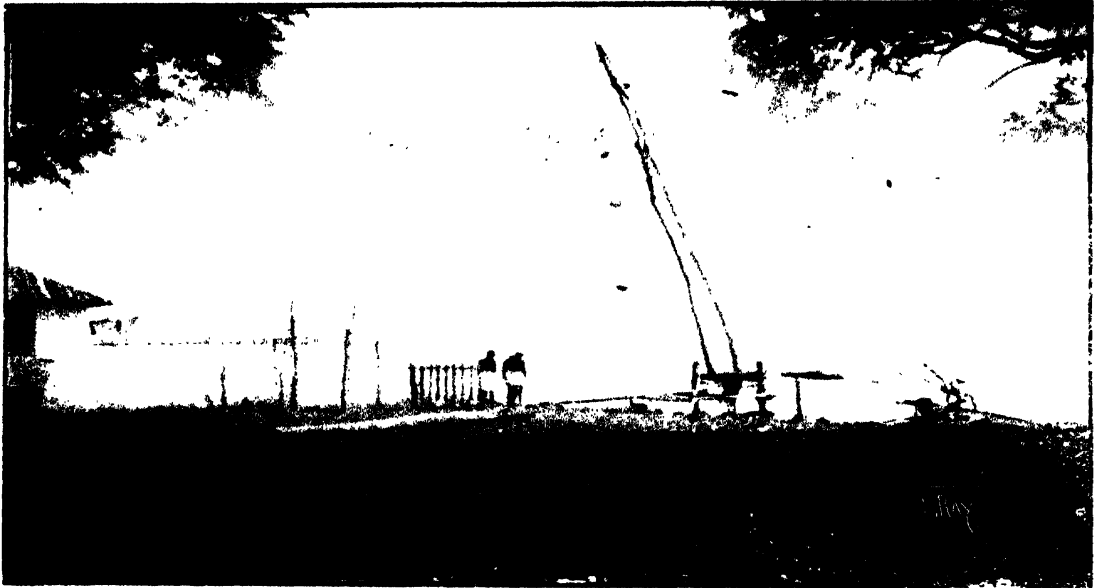
কোচিন ব্যাক্-ওয়াটারে মাছ ধরিবার জাল পাতা হইয়াছে।

ফোটোগ্রাফ লেখককৃত।

কোচিন ব্যাক্-ওয়াটারে মাছ ধরিবার জাল (উত্তোলিত)।

ফোটোগ্রাফ লেখককৃত।

INDIAN PRESS, ALLAHABAD.

ণাত্যে আসিয়াছিলেন। সুতরাং দাক্ষিণাত্যের সমস্ত আর্য্যেরাই ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য অথবা অপর কোন জাতীয় আর্য্য দাক্ষিণাত্যে নাই। সুতরাং দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত জাতীয় লোকই অনার্য্য শূদ্র। এই সব শূদ্রজাতীয় লোকের ভিতর কোন জাতীয় লোকই জলাচরণীয় নহে। ব্রাহ্মণেতর জাতিদের ভিতর দাক্ষিণাত্যে পিলে, মুদলিয়র, নাইডু, চেটী প্রভৃতি জাতি এবং মালাবারে নেয়ার জাতি অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইহারাও হিন্দুস্থান অথবা বঙ্গদেশের মালী, গোয়ালা, কাহার বা কুর্ম্মীর সমতুল্য নহে।

ব্রাহ্মণেতরজাতীয় লোকের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ পাচক হিন্দুস্থানে ও বঙ্গদেশে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে তাহা এক রকম নাই বলিলেই হয়। ব্রাহ্মণ পাচক খুব বড় লোকের বাড়ী আছে বটে, কিন্তু গরীবের পক্ষে ব্রাহ্মণ পাচক রাখা অসম্ভব। ব্রাহ্মণ পাচক যে ঘরে রান্না করিবে, সে ঘরে শূদ্র মনিব প্রবেশ করিতে তো পারিবেনই না, পরন্তু সে ঘরখানা ছুঁইতেও পারিবেন না। ব্রাহ্মণ পাচক রাখিলে, জল তুলিবার এবং মসলা পিশিবার জন্য ব্রাহ্মণ ভৃত্য রাখিতে হইবে। বঙ্গদেশের হাড়ি, ডোম, বাগদি প্রভৃতি জাতির সমতুল্য যে সব অনার্য্য জাতি দাক্ষিণাত্যে আছে, তাহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ দেখিলে রাজপথ ছাড়িয়া বহুদূর দিয়া যাতায়াত করিতে বাধ্য ছিল। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য প্রদেশ হইতে এই নিয়ম উঠিয়া যাইবার পরও ত্রিবাঙ্কোর এবং কোচিনে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, এখনও একবারে উঠিয়া গিয়াছে বলা যায় না।

বাঙ্গালী পরিব্রাজকদিগকে একটি পরামর্শ দিই। তাঁহারা যদি দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে আসেন, তাহা হইলে যেন কেহ শূদ্র বলিয়া পরিচয় না দেন; এবং বাঙ্গালী হিন্দু যেন এদেশের শূদ্রদিগের জল-স্পর্শ না করেন। বঙ্গদেশে কায়স্থ ও বৈদ্যকেও অনেক ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া থাকেন। বৈদ্য ও কায়স্থগণ যদি দাক্ষিণাত্যে আসিয়া শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা হইলে দেশের শুঁড়ি প্রভৃতি জাতির সমান বলিয়া গণ্য হইবেন। রমেশ বাবুর মতে আর্য্যদিগের প্রধান তিন জাতির ভিতর ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতি অত্যন্ত প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। বৈশ্য বলিয়া স্বতন্ত্র একটি জাতি রীতিমত গঠিত হয় নাই। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আর্য্যগণের সাধারণ নাম ছিল বৈশ্য। ব্যবসা ভেদে এই বৈশ্য জাতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তে ও বঙ্গদেশে যে সব জলাচরণীয় জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা তাহা হইলে এই বৈশ্য জাতি হইতে উৎপন্ন। কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্গোপ প্রভৃতি জাতি যে আর্য্যবংশসম্ভূত, তাহাতে সন্দেহ নাই, সুতরাং রমেশ বাবুর মত অত্যন্ত যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

মালাবারের ব্রাহ্মণেতর প্রধান জাতি "নেয়ার"। নেয়ার এবং শূদ্র কতকটা একার্থবাচক শব্দ। নেয়ার ব্যতীত অন্যান্য জাতিকে শূদ্র বলে না। তাহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম আছে। নেয়ার এবং অন্যান্য ইতর জাতির ভিতর বহুপত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত আছে। নেয়ার জাতির এই বিবাহপ্রথা এক অদ্ভুত জিনিষ। নেয়ার বালিকা বা নেয়ারচি বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ হয়। এই বিবাহ নামমাত্র বিবাহ। এই বিবাহে বর আসিয়া ক'নের গলায় তালি বান্ধিয়া দেয়। (তালি মানে locket)। এই সময় খুব ধুমধাম হয় এবং আত্মীয় স্বগণকে খাওয়ান হয়। এই তালিবন্ধনকারী ধর্ম্মতঃ বালিকার স্বামী হইল। কারণ তালিবন্ধনকারীর মৃত্যু হইলে বালিকাকে অশৌচ পালন করিতে হয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনে তালিবন্ধনকারীর সহিত বালিকার আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইচ্ছামত যে কোন পুরুষকে স্বামিত্বে বরণ করিতে পারে। বালিকা সর্ব্বদা নিজ বাড়ীতে থাকে, স্বামী স্ত্রীকে ভরণপোষণ করে না, বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে কাপড় চোপড় মাত্র উপহার প্রদান করে। একই সময়ে এক একটী নেয়ার স্ত্রীলোকের বহু-সংখ্যক স্বামী থাকিলে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। সমাজে তাহাতে কোন নিন্দা নাই।

নাম্বুরি ব্রাহ্মণদের ভিতর এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্যতীত অন্যান্য পুত্রগণ বিবাহ করিতে পারিবেন না। ইহার কারণ এই বলা যায় যে, নাম্বুরিদের জ্যেষ্ঠ

পুত্র ব্যতীত অন্যান্য সকলে নেয়ার স্ত্রীলোকদিগকে উপপত্নী স্বরূপ রাখিয়া থাকে। "উপপত্নী" কথাটী ঠিক্ নয়। কারণ এই বিবাহ ব্রাহ্মণদের মতে বিবাহ নয় বটে, কিন্তু নেয়ারদের চক্ষে ইহা দূষণীয় নয়। বরং অনেক নেয়ার পরিবারে এই রকম সংস্রব অত্যন্ত সম্মানের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। নেয়ারদের উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম সামাজিক নিয়মের অনুবর্ত্তী। কোন নেয়ারের সম্পত্তি তাহার পুত্রেরা প্রাপ্ত হয় না। নেয়ারদের ভিতর পিতৃত্ব নির্ণয় করাও সহজ নয়। সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ভাগিনেয়। কনিষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত থাকিলে সে-ই সম্পত্তির অধিকারী, তাহা না হইলে ভগ্নীর সন্তান। কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কোরের রাজ-পরিবারেও এই নিয়ম প্রচলিত। রাজার ভগ্নী "রাণী", রাজার স্ত্রীর কোন সম্মানই নাই।

ত্রিবাঙ্কোরের প্রধান রাণীর (রাজার বড় ভগ্নীর) এবং যুবরাজের (রাজার ভাগিনেয়ের) সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে। যুবরাজের স্ত্রী এবং সন্তানের ভরণপোষণ জন্য মহারাজা ১০০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। মহারাজার মৃত্যু হইয়া যুবরাজ জীবিত থাকিলে তিনিও মহারাজার স্ত্রীপরিবারের জন্য ইহার চাইতে বেশী কিছু দিতেন না। উচ্চ শ্রেণীর এবং শিক্ষিত নেয়ারদের ভিতর রেজিষ্টারী করিয়া বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু শিক্ষিত নেয়ারদের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

তিয়র জাতির ভিতর যে বহুপত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল এবং তিব্বতদেশীয় বিবাহের মত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিলে কনিষ্ঠ সকল ভাইয়েরই সেই স্ত্রীতে স্বত্ব বর্ত্তিয়া থাকে। নীলগিরির টোডা প্রভৃতি অসভ্য জাতির ভিতরও এই জাতীয় বিবাহ প্রচলিত আছে। তিয়রজাতীয় লোকের বিবাহ প্রথা তো শিথিলই, তাহাদের জাতিবিচারও এক রকম নাই। উত্তর মালাবারের তিয়রগণ ইউরোপীয়দিগকে নিজ নিজ কন্যাদিগকে উপপত্নীস্বরূপ প্রদান করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। উত্তর মালাবারের তিয়রগণ এই সব কারণে কতকটা ফিরিঙ্গিদের মত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের ভিতর অনেক লোক ইউরোপীয়দের মত খুব সুন্দর। তিয়র জাতির ভিন্ন ভিন্ন নাম। দক্ষিণ মালাবারে ইহাদের নাম "শানার", কোচিন ও ত্রিবাঙ্কোরে স্থানবিশেষে "তিয়র" স্থান বিশেষে "চৌগান"। দক্ষিণ মালাবারে এবং তিনেভেলিয় শানারগণ অধিক পরিমাণে খৃষ্টীয়ান হইয়াছে। এই শানারজাতীয় খৃষ্টীয় স্ত্রীলোকগণ অতি উৎকৃষ্ট লেস্ (Lace) প্রস্তুত করে। এই লেসের ইউরোপে খুব কাট্‌তি। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদিগের ভিতর নানা ইতর জাতিআছে, কিন্তু তাহাদিগকে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় না।

[মালাবারে রথ একটী প্রধান পর্ব্ব। আমাদের দেশে যেমন নানা পর্ব্বোপলক্ষে নানাবিধ সং বাহির হয়, মালাবারেও তেমনি।]

মালাবারে খৃষ্টীয় ৫৭ অব্দ হইতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। 'প্রেরিত' সেণ্ট টমাস্ সীরিয়া দেশ হইতে কতকগুলি সীরীয় প্রচারক সহ মালাবারে অবতীর্ণ হয়েন এবং মালাবারের বহুসংখ্যক লোককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইংলণ্ডে যখন খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রবেশ করে নাই, মালাবারের সীরীয় খৃষ্টীয়ানগণ তখন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত। এই সব খৃষ্টীয়ানদিগকে এখনও সীরীয় খৃষ্টীয়ান বলে। ইহারা বেশ সম্ভ্রান্ত লোক। ইহাদের অধিকাংশই উচ্চজাতীয় হিন্দু হইতে দীক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইউরোপীয়দের আমলেও বহুসংখ্যক ধীবর ও অন্যান্য নিম্নজাতীয় লোক খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। আজকাল মালাবারে বহুসংখ্যক খৃষ্টীয়ান ও ফিরিঙ্গির বাস। দিনেমার, পর্ত্তুগিজ এবং ইংরাজ, এই তিন জাতি হইতে ফিরিঙ্গিগণ উৎপন্ন হইয়াছে।

মালাবারের কোচিন ও ত্রিবাঙ্কোর কোন সময়েই মুসলমানের হস্তগত হয় নাই, সুতরাং এদেশে মুসলমানের তত প্রাধান্য নাই। কিন্তু বহু প্রাচীন কাল হইতে আরব দেশের সওদাগরগণ মালাবারে বাণিজ্য উপলক্ষে আসিয়া বাস করিত এবং তিয়র প্রভৃতি নীচ জাতীয় হিন্দু স্ত্রীলোকদিগকে বিবাহ করিত। এতদ্ব্যতীত তাহারা বহুসংখ্যক লোককে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিতও করিয়াছিল। আরব ও মালাবারীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন মুসলমান জাতি মোপ্লা বা মাপ্পা নামে অভিহিত। মাপ্পা শব্দটী অবজ্ঞাবাচক এবং মা=মাতা, পিল্লা=সন্তান অর্থাৎ মাতার সন্তান

-পিতা অজ্ঞাত) এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে যখন পাঠান ও মোগল মুসলমানগণ দাক্ষিণাত্যে আসিয়া এই আরবী-মালয়ালী মুসলমানদিগকে দেখিতে পায়, তথন ইহারাই নাকি এই অবজ্ঞাসূচক নামে এই মুসলমানদিগকে অভিহিত করিয়াছিল। ইহাদিগকে সাধারণতঃ লাব্বা বলে।

লাব্বা বা মাপ্লারা আরবদিগের নিকট হইতে ধর্ম্মান্ধতা বা গোঁড়ামি খুব পাইয়াছে। মাপ্লাদিগকে দমনে রাখিবার জন্য তাহাদের দেশে একটী বৃটিশ্ রেজিমেণ্ট নিযুক্ত আছে এবং একটী বিশেষ আইন পাশ হইয়াছে।

মাপ্লা ব্যতীত অন্যান্য যে সব মুসলমান এদেশে আছে, তাহারা হয় মোগল, না হয় পাঠান। আজকাল বম্বে এবং কচ্ছ দেশীয় বহু মুসলমান সওদাগরও এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া থাকে। এই সব মুসলমানদিগের মুখে এবং বম্বাইএর সব সওদাগরের মুখে হিন্দুস্থানী কথা শুনিয়া ভারতবর্ষে আছি বলিয়া মনে হয়। B. I. S. N. Co., এবং Asiatic Steam Navigation কোম্পানীর ষ্টীমারে বাঙ্গালী মুসলমান লস্কর এখানে সর্ব্বদা আসিয়া থাকে। সময় সময় চট্টগ্রামের সওদাগরগণ এবং চাটগেঁয়ে জাহাজ কোচিনে আসিয়া থাকে। গত এপ্রিল ও মে মাসে ৩।৪ খানা চাটগেয়ে জাহাজ এখানে আসিয়াছিল। অক্টোবর নভেম্বর মাসে আবার আসিবে।

কোচিনে দুই জাতীয় ইহুদী আছে—সাদা ও কালো। সাদা ইহুদীরা আসল ইহুদী। কালা ইহুদীরা নাকি পূর্ব্বে সাদা ইহুদীদের ক্রীত দাস ছিল এবং বলপ্রয়োগে ইহুদী ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এখন ইহারা স্বাধীন হইয়াছে। ইহারা সাদা ইহুদীদের গির্জ্জায় (Synagogue) উপাসনা করিতে অনুমতি পায় না—ইহাদের স্বতন্ত্র গির্জ্জা আছে?

আর্য্যাবর্ত্তের প্রচলিত ভাষা সমূহ সমস্তই সংস্কৃতের সহিত সম্পৃক্ত। হিন্দী, মারাটি, গুজরাঠী, বাঙ্গলা সমস্তই আর্য্যভাষা। দাক্ষিণাত্যের ভাষাসমূহ কিন্তু তাহা নহে। দাক্ষিণাত্যে অল্পসংখ্যক আর্য্যজাতি বহুসংখ্যক দ্রাবিড় জাতীয় লোকের ভিতর আসিয়া পড়াতে আর্য্যভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। দাক্ষিণাত্যের ভাষাগুলি, যথা—ক্যানারিজ (কর্ণাট দেশের বা কানাড়া দেশের), তেলেগু, তামিল, এবং মালয়ালাম, সমস্তই দ্রাবিড় ভাষা। এই সব ভাষার বর্ণমালা সংস্কৃত। তামিল ভাষায় "ক" কে বলে "কানা", গ কে "গানা"। মালয়ালাম ভাষায় অক্ষর "কা ইখ্‌খা, গা ইঘ্‌ঘা" ইত্যাদি। ইহা ছাড়া প্রত্যেক ভাষার প্রায় চতুর্থাংশ শব্দ সংস্কৃত। কিন্তু সমস্ত ভাষাই গঠন প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। দাক্ষিণাত্যে যে সব সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত আছে, তাহা প্রায় সমস্তই দ্বিতীয়ার একবচনে অর্থাৎ সকলের শেষেই "ম" বা অনুস্বার আছে, যথা—"মালয়ালাম্" "মীনম্" "পাত্রম্" "দেশম্" ইত্যাদি। বাঙ্গলা দেশে "অনুস্বার দিলেই যদি সংস্কৃত হয়" বলিয়া একটী গল্প প্রচলিত আছে। এদেশীয় লোকের মুখে অনেকগুলি সংস্কৃত শব্দ শুনিলেই আমার সেই গল্পটী মনে হয়।

'প্রবাসী'র পাঠকদিগের ভিতর যদি কোন মানবজাতিবিজ্ঞানবিদ্ থাকেন, তাহা হইলে তিনি মালাবারে অনেক নূতন জিনিষ পাইবেন। তিব্বতের বহুপত্যাত্মক বিবাহ, গারো ও থাসিয়াদের ভাগিনেয়ের উত্তরাধিকারিত্বের নিয়ম এবং মালাবারের নিয়মাদির সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয় ইহারা পূর্ব্বকালে একজাতীয় ছিল। বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে পারেন।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এবং দাক্ষিণাত্যেরও অন্যান্য অংশে হিন্দুর টিকি পশ্চাৎভাগে। ওড়িষা থেকে আরম্ভ করিয়া টিকিটীর আকৃতি ক্রমেই বড় হইয়া আসিয়াছে। মালাবারের টিকি আবার কপালের উপর। অনেকে এই টিকিটী কপালের উপর সুন্দর করিয়া বাঁধিয়া কৃষ্ণের মোহন চূড়ার অনুকরণ করেন।

ওড়িষাতে এবং দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্রই হুকায় করিয়া তামাক খাওয়ার তত চলন নাই। সকলেই প্রায় চুরুট খায়। ওড়িষার শালপাতার চুরুটের মত চুরুট কোচিনেও বিক্রয় হয়।

বাঙ্গালী এদেশে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন বাঙ্গালী সিভিল সার্জ্জন কোচিনে ছিলেন। সম্প্রতি গুজব উঠিয়াছিল যে একজন বাঙ্গালী সিভিলিয়ান কোচিনের রাজার দেওয়ান হইয়া আসিবেন। গুজবটী মিথ্যা বলিয়া মনে হয়।

হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীর গতি সর্ব্বত্র। এদেশেও সময় সময় শুনিতে পাই "জয় সীতারাম, জয় সীতারাম, ভুখা হায় বাবা"। বলা বাহুল্য পাঠান মুসলমান ছাড়া হিন্দুদের শতকরা ৯৯ জন "ভুকা হায়" কি তাহা বুঝিবে না। হিন্দীকে এদেশে বলে "মোছলমানী"। কারণ পাঠান মুসলমানেরা হিন্দী বা উর্দ্দূ বলে।

শ্রীসতীশচন্দ্র মৌলিক।

শর্করা-বিজ্ঞান।

দশম অধ্যায়।

ইক্ষু চাষের আয়-ব্যয়।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে এক্ষণে ইক্ষু চাষের আনুক্রমিক ব্যয়ের তালিকা দেওয়া যাইতে পারে। এই তালিকাতে চারি আনা হিসাবে মজুরের রোজ ধরা গেল।

আলু উঠাইবার পরে বিঘা প্রতি মৈ দিবার খরচ	৶০
দ্বি-পক্ষ লাঙ্গল দ্বারা জমি প্রস্তুত করা	।০
৩০০০ কলম খরিদ	৬৲
কলম গর্ত্তের মধ্যে সাজাইয়া চাপ্ দিবার খরচ	॥০
কলমকে মসলা খাওয়াইবার খরচ (অর্থাৎ, গেঁকো বিষ, ছাই, চূণ, হরিদ্রা চূর্ণ ও রেড়ির খোল মাখাইবার খরচ)	২৲
কলম বসাইবার খরচ (৮ জন মজুর)	২৲
৫ বার জল সেচনের খরচ (ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখে ৩ বার এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষে ২ বার)	৫৲
৫ মণ রেড়ির খোল	১০৲
হাণ্টার-হোর দ্বারা মাটি চাপাইবার পূর্ব্বে দুইবারে সার প্রয়োগের খরচ	২৲
দুইবার হাণ্টার-হো চালাইবার খরচ	॥০
একবার নিড়াইবার খরচ	১॥০
চারিবার হাতে চালান হো দ্বারা মাটি উস্কান	১৲
২০ জন লোক আক্ কাটিবার ও ঝুড়িবার জন্য	৫৲
আক্ মাড়াই করিবার জন্য ৬ দিবস একজন	১॥০
বলদ চালাইবার জন্য ৬ দিবস একজন	১॥০
দুই জোড়া বলদের ভাড়া (৬ দিবস)	২॥০
দুইজন লোক, রস জ্বাল দিবার জন্য (৬ দিবস)	৩৲
প্রথম দুই দিবসের জন্য জ্বালানী কাষ্ঠ	॥০
৩০টি কলসী	১॥০
খেইয়া দিনের ও এক জোড়া কড়ার ভাড়া (৬ দিবসের)	৭৲
জমি খাজ	২৲
	৫৫।৶০
উৎপন্ন ২০/ মণ গুড় ৩।০ হিসাবে	৭০৲

বিঘা প্রতি লাভ ১৪॥৶০ এবং জমির খাজানা বাদে কেবল ১২৲ টাকা মাত্র।

একাদশ অধ্যায়।

গুড় প্রস্তুত কার্য্যের উন্নতি।

ষ্টীম এঞ্জিন, হরিজণ্টাল রোলার-মিল, ভেকুয়াম্ প্যান, এ সমস্ত এদেশে প্রচলিত করা নিতান্ত ব্যয়সাধ্য বলিয়া দুরূহ। ধনী ব্যক্তি ইক্ষু চাষে হস্তার্পণ করিলে বিঘা প্রতি ১২।১৪ টাকার পরিবর্ত্তে ২০।২৫ টাকা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু এককালীন ২৫।৩০ হাজার টাকা মূলধন ব্যয় করা অনেক বিশ্বাস ও সাহসের কার্য্য। কৃষি ব্যবসায়ের উন্নতি কল্পে এ দেশের ধনী লোকের বিশ্বাস এখনও জন্মে নাই। মোটের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস, এদেশে চাষারা যাহা করিতেছে, তাহাই চরম। উহাদের সহিত প্রতিযোগীতায় ধনী ব্যক্তি কখনই লাভবান হইতে পারিবে না।

৩৬। চাষীরা অনুকরণ করিতে পারে, অথবা যে সকল মধ্যম শ্রেণীর লোক আজ কাল সহস্র মুদ্রা পুঁজির উপর নির্ভর করিয়া কৃষিকার্য্যে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হইতেছেন, সেই সকল লোক অনুসরণ করিতে পারেন, এরূপ কোন প্রণালী গুড় প্রস্তুত কার্য্যে প্রযোজ্য কিনা, ইহাই এখন বিবেচ্য।

৩৭। শিবপুর কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে এক অভিনব উপায়ে গুড় প্রস্তুত করিয়া ছাত্রদের দেখাইয়া দিয়াছি, কেমন করিয়া বর্ত্তমান প্রণালী হইতে অতি সামান্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন দ্বারা অতি সুন্দর ফল পাওয়া যায়। গুড়ের রংএর উন্নতি মাত্র লাভ করা, এ উপায়ের এক উদ্দেশ্য নহে। গুড়ের সার-ভাগ এই উপায় দ্বারা অনেক পরিমাণে বাড়িয়া থাকে; মাত্ অতি পরিষ্কার হয় ও কলসী ফুটা করিয়া দিলে অতি সহজে এক মাসেরও কম সময়ে সমস্ত মাত্‌টী নির্গত হইয়া যায়। কলসীর মধ্যে যে সারভাগ অবশিষ্ট থাকে, উহা বর্ষার সময়ও দুর্গন্ধ হইয়া যায় না। উহা রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেঁকিতে বা হাবান্-দিস্তায় কুটিয়া লইলে দানাদার চিনির ন্যায় ব্যবহার্য্য হইবে।

একটি মালাবারী সং।

By permission of Mr. J. B. D'Crus, Photographer.

পর্ব্বোপলক্ষে মালাবারী মিছিলে যোদ্ধার সং

By permission of Mr. J. B. D'Crus Photographer.

INDIAN PRESS, ALLAHABAD.

মালয়ালী মহিলা।

নাম্বুরি ব্রাহ্মণ।
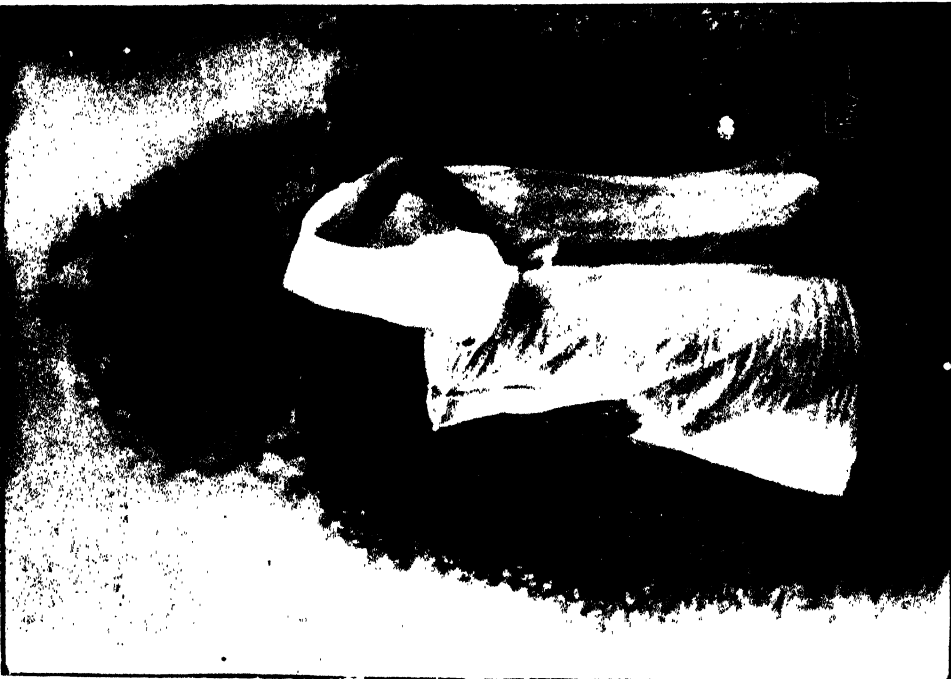
ত্রিবাঙ্কোড়ে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া নির্ম্মিত খাল

ফোটোগ্রাফ লেখককৃত।
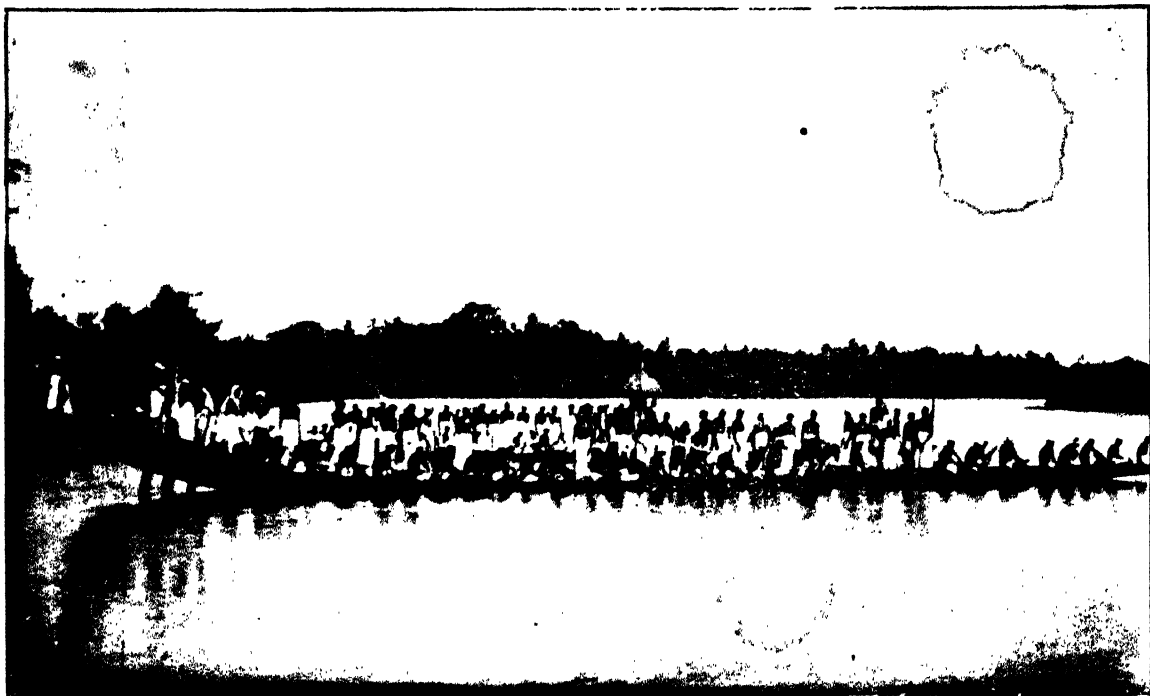
সর্প-নৌকা।

By permission of Mr J. B. D'Crus, Photographer.

দুটি মালয়ালী বালিকা।

Indian Press, Allahabad
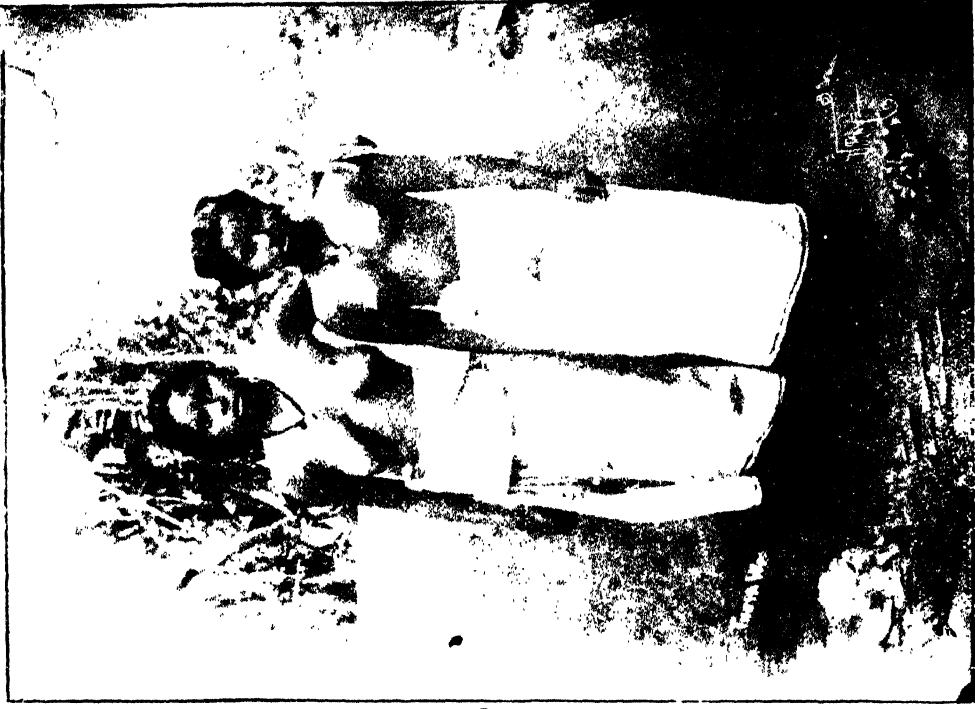
তিয়র স্ত্রীলোক।

য়। উহা সাধারণতঃ এদেশে চিনির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৩৮। বর্ণিতব্য উপায়ে যে গুড়, সার, মাত্ ও চিনি প্রস্তুত হয়, উহা সাধারণে যাহাতে দেখিতে পায়, এজন্য কলিকাতার যাদুঘরের ইকনমিক্যাল্ সেক্সনে ঐ সকলের নমুনা পাঠাইয়া দিয়াছি। এই উপায় অবলম্বনে কার্য্য করিলে এক মণ গুড় প্রস্তুত করিতে এক পয়সা মাত্র অধিক ব্যয় হয়, কিন্তু যে গুড় প্রস্তুত হইবে, উহার মূল্য মণ প্রতি ॥৹ আনা বা ১৲ টাকা অধিক পাওয়া যাইবে। এই অভিনব উপায়ে চিনি প্রস্তুত করিবার খরচ মণ প্রতি চারি আনা মাত্র।

৩৯। আক্ মাড়াই করিয়া যে রস বাহির হইবে, তাহা মৃত্তিকা বা এলুমিনিয়ম্ নির্ম্মিত বৃহদাকারের নাদের মধ্যে রাখিয়া কাল বিলম্ব না করিয়া ঐ নাদ চুলার উপর স্থাপিত করিয়া রস গরম করিতে হইবে। রস চুলার উপর চড়াইয়া দিয়াই উহার মধ্যে জল মিশ্রিত ফস্‌ফরিক এসিড্ মিশ্রিত করিয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক কেরোসিন টিনের রসের ওজন প্রায় অর্দ্ধ মণ হইয়া থাকে। যদি নাদের মধ্যে এককালীন ৪ টিন অর্থাৎ দুই মণ রস দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ রসের মধ্যে এক বোতল জলে ৪০ ফোঁটা ফস্‌ফরিক এসিড মিশ্রিত করিয়া ঐ জল ঢালিয়া দিতে হইবে। পরে তাপমান যন্ত্র ব্যবহার দ্বারা দেখিতে হইবে, উষ্ণতা ১৩০° (ফারেন্ হিট) পরিমাণ হইয়াছে কিনা। রস এই পরিমাণ উষ্ণ হইলেই, উহার মধ্যে চুণের জল ছিটাইতে হইবে। চুণের জল এইরূপে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। সদ্য দগ্ধ পাথরিয়া চুণ গুঁড়া করিয়া আঁটা বোতলের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। যত কেরোসিন্ টিন্ রস ব্যবহার করা হইবে, তত তোলা গুঁড়া চুণ বোতল হইতে লইয়া অন্য একটী বোতলে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধের ন্যায় পাতলা করিয়া লইতে হইবে। দুই তোলা চুণ একটী বোতলে রাখিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দশ মিনিট ধরিয়া আলোড়িত করিলেই দুগ্ধের ন্যায় পাতলা হইয়া যাইবে। রস ১৩০° ডিগ্রি উষ্ণতা প্রাপ্ত হইলেই উহার মধ্যে এই চুণের জল ধীরে ধীরে ছিটাইয়া দিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে লিট্‌মস্-পেপার নামক রঙ্গিন কাগজ খণ্ড ব্যবহার দ্বারা দেখিতে হইবে, যথেষ্ট পরিমাণ চুণ খাওয়ান হইয়াছে কিনা। নীল রংএর লিট্‌মস্-পেপার রসের মধ্যে দিলে দেখা যাইবে লাল হইয়া যাইতেছে। চুণ খাওয়াইতে খাওয়াইতে দেখা যাইবে, কাগজের নীল রং আর লাল হইতেছে না। অধিক চুণ পড়িয়া গেলে লাল রংএর লিট্‌মস্-পেপার পুনরায় নীল হইয়া যাইবে। এরূপ হওয়াও চলিবে না। নীল রংএর কাগজ ও লাল হইতেছে না এবং লাল রংএর কাগজও নীল হইতেছে না, যখন রসের এইরূপ অবস্থা হইবে, তখন বুঝিতে হইবে যথেষ্ট চুণ খাওয়ান হইয়াছে, অথচ অতিরিক্ত চুণ খাওয়ানও হয় নাই। আকের রস সাধারণতঃ কিছু অম্ল, মাড়াই করিবার পরে রস আরও অধিক অম্ল হইতে থাকে। অম্ল সংযোগে রস গুড়ে পরিণত হইবার সময় অল্প বিস্তর সার মাতে পরিণত হয়। চুণের দ্বারা অম্ল কাটাইয়া লইতে পারিলে অম্ল প্রযুক্ত সার হইতে যে মাত জন্মে, সেই মাত আর জন্মিতে পারে না। রস সমস্ত দিবস রাখিয়া টকাইয়া লইয়া পরে যদি জ্বাল দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ রস হইতে সমস্ত গুড়ই মাত বা চিটা হইয়া যায়; উহাতে সারভাগ কিছুই থাকে না। ফস্‌ফরিক এসিড্ অম্লরসযুক্ত হইলেও উহা মিশ্রিত করিবার কারণ সার মাত্ হইয়া যায় না। অন্য সকল অম্লের মিশ্রণ দ্বারা সার মাত হয়, কিন্তু ফস্‌ফরিক এসিড্ এই সাধারণ নিয়মের অনুগামী নহে। ফস্‌ফরিক এসিড্ মিশাইবার কারণ কোন ক্ষতি হয় না, অথচ উহা দ্বারা একটী উপকার পাওয়া যায়। রসের সহিত চুণ মিশাইবার কারণ রসের অম্লতা কাটিয়া যায়; এবং রসের মধ্যে যে সকল যবক্ষারযান ঘটিত জৈব পদার্থ (Albuminoids) নিহিত থাকে ঐ সকল চুণও উত্তাপ সহযোগে তরল রস হইতে পৃথক্ হইয়া কঠিন পদার্থের চূর্ণভাব ধারণ করে। চুণ এই দুই কার্য্য সাধিত করিয়া যে এককালীন চূর্ণ কঠিন পদার্থের সহিত পৃথক্ হইয়া কাটিয়া যায় এমত নহে। স্ফটিক রসের সহিত চুণের কিয়দংশ মিশ্রিত থাকে। কিন্তু রসের মধ্যে চুণের অংশ নিহিত থাকা বিধেয় নহে। ঈষৎ চুণ সংযোগেও গুড়ের ও চিনির রং কিছু ময়লা হয়। চুণ এককালীন

কাটাইয়া দিবার জন্য ফস্‌ফরিক এসিডের ব্যবহার। অধিক উত্তাপে অবশিষ্ট চুণের অংশ ফস্‌ফরিক এসিডের সহিত মিশিয়া একটী নিতান্ত কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। ইহার নাম ট্রাইকালসিক্ ফস্‌ফেট্। চুণ রসের অম্লতা কাটাইয়া দিল; চুণ রসের মধ্যে নিহিত জৈব পদার্থ গুলির সহিত মিশ্রিত হইয়া উহাদিগকে ধূলিবৎ করিয়া ফেলিল; এবং অবশিষ্ট চুণ ফস্‌ফরিক এসিডের সহিত মিশ্রিত হইয়া ধূলির ন্যায় হইয়া রসের নিম্নে পড়িয়া গেল। জৈব পদার্থগুলি দূর করিয়া দিবার কারণ গুড় ভবিষ্যতে পচিয়া দুর্গন্ধ হয় না; উহা বর্ষার সময়ও অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

৪০। চুণের জল ছিটাইবার সময়ও মধ্যে মধ্যে তাপমান যন্ত্রের ব্যবহার আবশ্যক। সমস্ত চুণের জল ১৩০° হইতে ১৬০° উত্তাপের মধ্যে মিশান আবশ্যক। বোতলে যতটুকু চুণের জল লওয়া হইয়াছে, সমস্তই যে মিশাইতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। লিট্‌মস্‌-পেপার ব্যবহার দ্বারা পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রথায় দেখিতে হইবে যথেষ্ট চুণ ব্যবহার হইয়াছে কি না? যথেষ্ট চুণ ব্যবহার যদি হইয়া থাকে, অর্থাৎ অম্ল ঠিক্ কাটিয়া গেলেই, চুলার জ্বাল বাড়াইয়া দিয়া ২০০ ডিগ্রি (ফারেন্‌হিট্) উত্তাপ পর্য্যন্ত নাদের রসের উত্তাপ বাড়ান আবশ্যক। ২০০ ডিগ্রি উত্তাপে আসিবামাত্র রসের উপরের গাদ্ আপনা হইতেই ফাটিয়া যাইবে, এবং অভ্যন্তরস্থ রস অতি নির্ম্মল হইয়া গিয়াছে দেখা যাইবে। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই রস চুলা হইতে নামাইয়া একটা উচ্চ স্থানে বসাইয়া রাখিতে হইবে এবং রসের উপরিস্থিত গাদ ছাঁকিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। দুই ঘণ্টা পরে সাইফন্ দ্বারা নির্ম্মল রসটা অন্য পাত্রে পৃথক্ করিয়া সর্ব্ব নিম্নস্থ গাদ্ সংযুক্ত রস ফ্লানেল খণ্ড সাহায্যে ছাঁকিয়া লইয়া, হাঁড়িতে বা এলুমিনিয়ম্‌এর ডেক্‌চিতে করিয়া ঐ পরিষ্কার রস হইতে গুড় প্রস্তুত করিতে হইবে। এই স্ফটিক্ রস হইতে অতি পরিষ্কার এবং সার-পূণ গুড় প্রস্তুত হইবে। গুড় প্রস্তুত সাধারণ নিয়মেই করিতে হইবে, অর্থাৎ রস ফাঁপিয়া উঠিলে ঝাঁজরি দ্বারা মধ্যে মধ্যে নাড়িয়া দেওয়া ছোট ফুট ধরিলে গুড়ের গন্ধ বাহির হইলে এবং ঝাঁজরি সংলগ্ন একফোঁটা গুড় অঙ্গুলিতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যখন দেখা যাইবে অঙ্গুলি দ্বয়ের মধ্যে অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণ গুড়ের তার বাঁধিতেছে এবং অঙ্গুলি-দ্বয়ের মধ্যে গুড়ের ফোঁটাটী চাপিয়া চাপিয়া ধরিতে ধরিতে উহা শুকাইয়া গিয়া, "মচ্-মচ্" শব্দ উহা হইতে বাহির হইতেছে এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে শ্বেতবর্ণ ধূলির আকারে (অর্থাৎ চিনিতে) পরিণত হইতেছে, তখনই জানিতে হইবে গুড় প্রস্তুত শেষ হইয়াছে। তখন কটাহ হাঁড়ি বা ডেক্‌চি গুলি হইতে গুড় একটা গাম্‌লায় ফেলিয়া, কাষ্ঠ খণ্ড দ্বারা দশ মিনিট ধরিয়া নাড়িয়া পরে উক্‌ড়িতে করিয়া কলসীর মধ্যে উঠাইয়া রাখিতে হইবে। গুড় জ্বাল দিবার সময় গাদ কাটিয়া ফেলিবার জন্য যে ঝাঁজরি ব্যবহার করা হয়, উহাও এলুমিনিয়মের হওয়া ভাল।

৪১। এক সপ্তাহ বা দশদিন গুড় কলসীর মধ্যে থাকিবার পরে কলসীর নিম্নে একটা ছিদ্র করিয়া দিয়া উহার নিম্নে কোন পাত্র রাখিয়া যে সামান্য পরিমাণ মাত গুড়ের মধ্যে আছে, উহা বাহির করিয়া লইতে হয়। উপরি উক্ত নিয়মে গুড় প্রস্তুত করিলে বালুকার ন্যায় গুড়ের দানা বাঁধিয়া যায়, এবং মাত অতি সহজে ও সত্বর বালুকাবৎ সার গুড়ের মধ্য দিয়া আসিয়া নিম্নস্থ পাত্রে পড়িয়া যায়। ২০ দিবস বা একমাস পরে কলসীগুলি ভাঙ্গিয়া চিনি সংগ্রহ করিয়া, ঐ চিনি বা চিনির দানা (Muscovado) সূর্য্যের উত্তাপে শুকাইয়া লইয়া হামান-দিস্তায় বা ঢেঁকিতে কুটিয়া কাশির চিনি আকারে পরিণত করিয়া লইয়া, ৭।৵ টাকা দরে অনায়াসে বিক্রয় করিতে পারা যায়।

৪২। যে মাত নিম্নস্থ পাত্রে সংগৃহীত হইবে, উহা অতি পরিষ্কার ও সুস্বাদ সামগ্রী। উহা বাজারে সাধারণতঃ যে মাত পাওয়া যায় তদপেক্ষা অধিক দরে বিক্রয় হইবে। এই মাত অনায়াসে রুটির সহিত আহার বা বা মুড়কি প্রভৃতি প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ চিনির কলের মাত অর্থাৎ চিটিয়া গুড়, তামাকের সহিত মিশ্রিত করা ছাড়া আর কোন কার্য্যে ব্যবহার হয় না।

৪৩। ঝাঁজি ব্যবহার দ্বারা আরও স্বচ্ছ চিনি

দোবরা চিনি)" প্রস্তুত হইতে পারে। উপরি উক্ত নিয়মে গুড় প্রস্তুত করিয়া, গুড়ের কলসীতে ফুটা করিয়া রাত বাহির করিয়া দিয়া, কলসী ভাঙ্গিয়া কলসীস্থিত সার গুড় পরিষ্কার জলে মিশাইয়া ফ্লানেল দ্বারা ছাঁকিয়া পুনরায় হাঁড়িতে, কড়াতে, অথবা এলুমিনিয়মের ডেক্‌চিতে করিয়া জ্বাল দিতে হয়। ঝাঁজরি দ্বারা গাদ্ মধ্যে মধ্যে উঠাইয়া ফেলিয়া, পূর্ব্ববৎ পরীক্ষা করিয়া যখন পাক্ ঠিক্ হইয়াছে বুঝা যাইবে, তখন নামাইয়া লইতে হইবে। একটী চৌবাচ্চার মধ্যে বাঁশের মাচান করিয়া ঐ মাচানের উপর মোটা কাপড় বিছাইয়া ঐ কাপড়ের উপর ১২ ইঞ্চি পরিমাণ পুরু করিয়া উক্ত দো-পাকের গুড় ঢালিয়া দিতে হয়। দুই দিন পরে ঐ গুড়ের উপর, শৈবাল ধৌত করিয়া মুছিয়া এক ইঞ্চি পুরু করিয়া বিছাইয়া দিতে হয়। শৈবাল বা শেয়ালা নানা জাতীয় আছে। যে শেয়ালা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার চিনি হয়, উহার নাম ভালিস্‌নেরিয়া ভার্টিসিলাটা (Vallis naria verticillata)। এই শেয়ালার পাতা রজ্জুবৎ লম্বা হয় বটে, কিন্তু ঝাঁজির ন্যায় ইহার পত্র সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম হয় না। ইহার পত্রগুলি পুরু এক ইঞ্চি লম্বা ও সিকি ইঞ্চি চওড়া। ঝাঁজি (Certophyllum Verticillatum) এবং পাটা শেয়ালা (Vallisnaria octandra) ব্যবহার দ্বারাও গুড় কিছু পরিষ্কার হয় ; কিন্তু ভালিস্‌নরিয়া ভার্টিসিলাটা দ্বারা যেরূপ পরিষ্কার চিনি হয়, পাটা-শেয়ালাও ঝাঁজি দ্বারা সেরূপ হয় না। শেয়ালা বিছাইয়া দিবার পর দিবস যদি দেখা যায়, উহা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে পরিষ্কার জল ছিটাইয়া দিয়া উহা সিক্ত রাখিতে হয়। দুই তিন দিন পরে যদি দেখা যায়, শেয়ালা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে বা পচিয়া যাইতেছে, তাহা হইলে উহা উঠাইয়া ফেলিয়া, যতটুকু চিনি পরিষ্কার হইয়াছে, উহা চাঁচিয়া লইয়া, পরে টাট্‌কা শেয়ালা পূর্ব্বের ন্যায় ভাল করিয়া ধৌত করিয়া মুছিয়া বিছাইয়া দিতে হয়। এইরূপ ৩।৪ বার করিলে সমস্ত ১২ ইঞ্চি পরিমাণ গুড়ই চিনি হইয়া যাইবে। মাচানের নিম্নে চৌবাচ্চায় যে তরল গুড় থাকিয়া যায়, উহা চিটিয়া গুড়—তামাকের সহিত মাখা ভিন্ন অন্য কার্য্যে উহা ব্যবহার হয় না। নির্দ্দিষ্ট উপায়ে গুড় প্রস্তুত করিয়া পরে আর একবার সার গুড় পাক দিয়া, শেয়ালা ব্যবহার দ্বারা উহা পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিলে, যে দো-বরা চিনি হইবে, উহা বিলাতী চিনি অপেক্ষা কিছুই অপরিষ্কার হইবে না। এক মণ গুড় হইতে এই চিনি ২০।২৫ সের পাওয়া যাইতে পারে। ইহার দাম মণ করা ১০৲ টাকা হইতে পারে। উপরি-উক্ত নিয়মে প্রস্তুত সার গুড়ের দাম ৬৷৭ টাকা হইতে পারে এবং এক পাকের চিনির দাম মণকরা ৭৷৮৲ টাকা হইতে পারে। সাধারণতঃ বাজারে যে গুড় বিক্রয় হয়, উহার দাম মণকরা ৪৲ টাকা। ফলতঃ দেখা যাইতেছে, কিছু যত্ন করিয়া নির্দ্দিষ্ট উপায়ে গুড় প্রস্তুত করিতে পারিলে অতি সামান্য ব্যয়াধিক্য দ্বারা বিঘা প্রতি ৩০৲ টাকারও অধিক লাভ করিতে পারা যায়। অৰ্দ্ধ সের ফস্‌ফরিক এসিডের (যাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·৫) দাম ১৷০ টাকা মাত্র। এই পরিমাণ ফস্‌ফরিক এসিড্ ব্যবহার দ্বারা ১০০/ মণেরও অধিক গুড় প্রস্তুত করিতে পারা যায়। চূণের ও লিট্‌মস্-পেপারের জন্য আরও সামান্য ব্যয় হইবে। থারমমিটার ও 'ক্লারিফাই' করিবার নাদ একবার ক্রয় করিয়া রাখিলে অনেক বৎসর চলিয়া যাইবে। অবশ্য যত্ন ও আয়োজনের আবশ্যক। কিন্তু যত্ন না করিয়া রত্ন আহরণ করা কখনই সম্ভবপর নহে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বিলাতী উপায়ে শর্করা প্রস্তুত।

৪৪। যে উপায়টি পূর্ব্ব অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট করা হইল, উহা এদেশের উচ্চ শ্রেণীর কৃষকগণ অনায়াসে অবলম্বন করিতে পারে। বস্তুতঃ ইহাদ্বারা দেশীয় নিয়মের অতি সামান্য ব্যতিক্রমই ঘটিবে। এ নিয়ম কৃষকদিগের শিখাইবার জন্য অধিক বেগ পাইতে হইবে না। বিলাতী নিয়ম বর্ণনা করায় বিশেষ লাভ নাই, কেননা লক্ষ টাকা মূলধন ব্যতীত বিলাতি নিয়মে চিনি প্রস্তুতের বন্দোবস্ত হইতে পারে না। ষ্টীম্ এঞ্জিন ও হরিজণ্টাল্-রোলার দ্বারা আক্ মাড়াইয়ের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আক্‌এর মধ্যে সাধারণতঃ শতকরা ৯০ ভাগ রস থাকে। এই

৯০ ভাগের ৮০।৮২ ভাগ কল এর দ্বারা বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে।
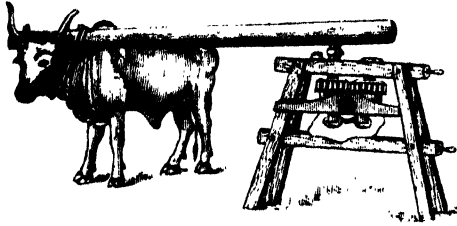
দুই রোলার্ বেহিয়া মিল।

৫৪। দুই রোলার বেহিয়া মিল দ্বারা কেবল ৫৮ ভাগমাত্র রস বাহির হয়; তিন রোলার বেহিয়া মিল্ দ্বারা ৬২।৬৫ ভাগ রস বাহির হইয়া আইসে। ষ্টীম্ হরিজন্টাল-রোলার দ্বারা ৭০।৭২ ভাগ রস বাহির হয়। আকগুলি চিরিয়া লইলে ৭৫ ভাগ রস বাহির হয়। আক্ চিরিবার কলও (Shredder) আছে।আবার আকের ছাল ছাড়াইয়া মাড়াই করিতে পারিলে ১০০ মণ ইক্ষুদণ্ড হইতে ৮০।৮২ মণ পর্যন্ত রস বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ফরস্ ডিকর্টিকেটর (Faure's Sugarcane Decorticator)ও হরিজণ্টাল মিল ব্যবহার দ্বারা ইক্ষুদণ্ড হইতে যে পরিমাণ রস বাহির হইয়া আইসে, এরূপ আর অন্য কোন উপায় দ্বারা হয় না। বড় বড় আবাদে এই কল ব্যবহার চলিতে পারে। দরিদ্র কৃষকদিগের পক্ষে এই কলের ব্যবহার অসম্ভব।

৫৬। বিলাতী উপায়ে এক্ষণে এককালীন ইক্ষুর রস হইতে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে গুড় হইতেই চিনি প্রস্তুত করা নিয়ম সাধারণ। এই উপায়ের বিশেষত্ব ভ্যাকুয়াম্ প্যানের মধ্যে ১৬০° ডিগ্রি মাত্র উত্তাপে রস জ্বাল দেওয়া। গরম জলের সহিত গুড় মিশাইয়া হাড়ের কয়লার ফিল্টার মধ্য দিয়া এই গুড়ের জল (অথবা ক্লারিফাই করা ইক্ষুর রস) পরিষ্কার করিয়া লইয়া, পরে ভ্যাকুয়াম্ প্যানে (অর্থাৎ বদ্ধ বায়ু-বিযুক্ত কটাহের মধ্যে) রস ১৬০° (ফারেন্) উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া চিনি প্রস্তুত করা সাহেবদের চিনির কারখানার নিয়ম। গুড় হইতে মাত্ বাহির করিয়া দিবার জন্য এবং শেষ প্রস্তুত চিনি হইতে গোল্ডেন্ সিরাপ (Golden Syrup) বাহির করিয়া দিবার জন্য সেন্‌ট্রিফিউগাল মিলের ব্যবহার প্রচলিত আছে। যাহা হউক, বিলাতী কলের বর্ণনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; কেননা এ দেশের লোকের দ্বারা বিলাতি নিয়মে যে চিনি প্রস্তুত কার্য্য সাধিত হইবে এরূপ সম্ভাবনা নিতান্ত কম। সাহেবেরা কাশিপুর ফ্যাক্‌টারি, রোজা ফ্যাক্টারি, সাজিহানপুর ফ্যাক্টারি, কানপুর ফ্যাক্টারি, প্রভৃতি কারখানায় বিলাতী নিয়মে চিনি প্রস্তুত অনেককাল ধরিয়াই করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা যদি এ দেশের কৃষকদের নিকট সারবান গুড় অথবা মাত্ বাদ দেওয়া গুড় অধিক পরিমাণে কিনিতে পান, তাহা হইলে তাঁহাদের জব-দ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে এইরূপ সার গুড়ের আমদানী করিতে হয় না, এবং এ দেশের কোটি কোটি টাকা বিলাতী চিনির আমদানীতেও ব্যয়িত হয় না। গুড় বা চিনি ও মাত্ প্রস্তুত করিয়া যদি কেহ লাভবান হয়েন, তাঁহাকে ভাবিতে হইবে না; আর পাঁচজন এই নিয়মে কার্য্য করিলেই তাঁহার লাভের অংশ কমিয়া যাইবে। বৎসরে ন্যূনকল্পে ৫০ লক্ষ মণ চিনি ও ৭।৮ লক্ষ মণ মাত্ মরিশস্ প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হইয়া থাকে। কোথায় চিনি বা মাত্ বিক্রয় হইবে এ বিষয়ে ভাবিতে হইবে না। চিনির ও মাতের বাজার নিতান্ত প্রশস্ত। সহস্রাধিক ভারতবর্ষীয় যুবক এই কার্য্যে অনায়াসেই অবতীর্ণ হইতে পারেন। প্রতিযোগিতার আশঙ্কা নিতান্ত কম। শিক্ষিত লোকদিগের দ্বারা ভাল উপায়ে ইক্ষুর চাষ ও গুড় প্রস্তুত হইলে অধিক পরিমাণে সারবান্ গুড় জন্মিবে। ইহাতে সাহেবদের চিনির কারখানারও উন্নতি হইবে, এবং তাঁহাদের সাহায্যেও আমাদের দেশের একটী শ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ের উন্নতি সাধিত হইবে। সামান্য বেতনের চাকরীর জন্য যাহারা এক্ষণে লালায়িত,তাঁহাদের কর্ত্তব্য চাষিদের সাহায্যে এই ব্যবসায়ের উন্নতি করিয়া নিজেদের স্বাধীন জীবিকার উপায় করা। স্বাধীন চিন্তা, যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক। কেরাণীগিরি করিতে 'আয়াস' আছে, মাথা ঘামান নাই, কিন্তু লাঞ্ছনা আছে, লাভ নাই।

সমাপ্ত।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

রাজার মৃত্যু।

[রাম-নির্ব্বাসনের ষষ্ঠ রজনীতে মহারাজা দশরথ রামের জন্য বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যার গৃহে প্রাণত্যাগ করেন।]

ষষ্ঠ রজনীতে নৃপ অতীব কাতর,
রামের প্রবল শোকে কণ্ঠাগতপ্রাণ ;
কাতরা কৌশল্যা রাণী, সশঙ্কমানসা,
সাধ্যমতে তুষে নৃপে প্রবোধ বচনে।
নীরব, নিস্তব্ধ সব, গভীরা যামিনী ;
নিশি জাগরণে ক্লান্ত ঘুমায় সকলে ;
কেবল কৌশল্যা জাগে বসি পতিপাশে,
বিনিদ্র কাতর চক্ষে, আকুলিত মনে।
সহসা উঠিল পুনঃ শোকের উচ্ছ্বাস
নৃপতির বক্ষোমাঝে ; ঝটিকার দিনে,
ঝঞ্ঝাবায়ু বহে যথা রহিয়া রহিয়া,
ভীষণ প্রবল বেগে, উলটি' পালটি'
বৃক্ষলতা, পুষ্প-ফল-পল্লব ছিঁড়িয়া।
আছাড়িয়া পড়ে ভূমে তেমতি নৃপতি
শোকের আবেগে ; হায়, কাঁদে মুক্ত রবে
"হা রাম, হা রাম" বলি ; কৌশল্যা মহিষী
তুলে ধরে নৃপবরে নিজ বক্ষোপরে,
উত্তপ্ত অশ্রুর ধারা বরষি নীরবে।
ক্ষণকাল পরে রাজা লভিয়া চেতন
বাষ্পাকুল নেত্রে বলে, "হা প্রিয়ে মহিষি !
বৃথা তব যত্ন চেষ্টা, বৃথা এ প্রয়াস ;
রাম-শোকে আর আমি বাঁচিব না, হায়,
হেরিব না এ জীবনে আর প্রাণাধিক
কমললোচন রামে, নয়নাভিরাম।
শুনিব না কর্ণে আর সুমধুর বাণী
রামের বদন হ'তে, বেণুরব সম।
রামশোকে প্রাণ মম বাহিরিবে আজি,
এ দেহ পঞ্জর ছাড়ি, কহিনু নিশ্চিত।
উদিল মানসে, দেবি, সহসা আমার,
ঋষি-অভিশাপ, হায়, কঠোর ভীষণ,
দুষ্কৃতির ফল মম, পূর্ব্ব অনুষ্ঠিত।
সেই অভিশাপ আজি ফলিবে নিশ্চিত,
কহি বিবরণ তার, শুন সবিস্তরে।
"বহু দিবসের কথা কহি, রাণি ! তোমা।
ছিনু যবে যুবরাজ গর্ব্বিত, উদ্দাম,
যৌবনের মদভরে, নিরঙ্কুশ, হায়,
মদমত্ত করী সম, তোমারে তখন
করিনি বিবাহ ; সদা কামের উন্মাদে
ফিরিতাম বনে বনে, মৃগের পশ্চাতে,
মৃগয়াতে রত মন। সেই পুরাকালে,
নিদাঘের অন্তে যবে একদা তপন
তাপিয়া ধরণীবক্ষ গেলা অস্তাচলে,
ছাইল করাল মেঘ আকাশমণ্ডল
সুপ্রসন্ন, দেবাসুর সংগ্রামের কালে,
অসুরবাহিনী যথা বৈজয়ন্ত ধাম
বেড়িলা ভীষণ দর্পে, ত্রাসিয়া অমরে !
আঁধারে আচ্ছন্ন দিক্, চমকে চপলা
মুহুর্মুহু, ভীমরূপে ঝলসি নয়ন।
বজ্রের নির্ঘোষে কাঁপে চকিতা ধরণী ;
সভায় আশ্রয়মুখে ছুটে হাম্বারবে
উর্দ্ধপুচ্ছা গাভী ; নীড়ে লীন বিহঙ্গম ;
রুদ্ধগৃহে নরনারী সশঙ্ক মানস !
ক্ষণপরে মহারব তুলিয়া ঝটিকা
বৃষ্টি বজ্রনাদ সহ, আসিলা সবেগে,
নোয়াইয়া তরুশির, শাখা আন্দোলিয়া।
মুষলের ধারে বৃষ্টি পড়ে অবিরাম।
চপলা চমকে ঘন, নিনাদে অশনি
ভীমরাবে, কর্ণে নাহি পশে অন্যরব।
মুহূর্ত্তে হইল পৃথ্বী যেন জলময়ী !
উথলি উঠিল বাপী, দীর্ঘী, সরোবর ;
ক্ষুদ্র গিরিনদীচয় স্ফীতবক্ষে ছুটে
কর্দ্দমাক্ত জল বহি, সরযূ সঙ্গমে,
মহোরগসম, যেন গৈরিকরঞ্জিত !
ধারাপাতে গিরিগাত্র হ'য়ে জলময়,
উচ্চতোয়রাশি সম শোভিলা অদূরে !
"থামিল বৃষ্টির ধারা পৃথ্বী শীতলিয়া।

মহানন্দে তুলে রব সারস দর্দ্দুর ;
নাচে শিখী পুচ্ছ মেলি', ছাড়ি কেকাধ্বনি ;
পক্ষ হ'তে ঝাড়ে জল করিয়া কাকলী
হৃষ্ট পাখী, আন্দোলিত বৃক্ষশাখা'পরে।
প্রথম প্রাবৃটে, সেই সুখময় কালে,
অতি পুলকিত চিতে, মৃগয়ালোলুপ,
বাহিরিনু গৃহ হ'তে ধরি ধনুঃশর,
নিশার সম্পাতে। মৃগ, মহিষ, শার্দ্দূল,
বরাহ, বারণ কিম্বা, সন্ধ্যাসমাগমে,
নদী তটে জলপান করিতে আসিলে,
বধিব তাহারে, হায়, এই আশা মনে।
অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর ছিনু, দেবি ! আমি—
শব্দবেধী খ্যাতি মম আছিল ভূতলে—
অস্পষ্ট নদীর তটে, অরণ্যের মাঝে,
স্পন্দহীন দাঁড়াইনু, শব্দের সন্ধানে।
সহসা অব্যক্ত ধ্বনি পশে শ্রুতিপথে ;
উৎকর্ণ হইয়া তাহা করিনু শ্রবণ—
কুম্ভপূরণের শব্দ, কর্ণে যেন লাগে—
উল্লাসে ভাবিনু আমি, নাদিছে বারণ
জলপান রত ; হায়, ভুজঙ্গভীষণ
যোজিয়া নিশিত শর ধনুকে তখনি
মোচিনু শব্দের প্রতি, গজবধ-আশে !
"কোথায় শুনিব, দেবি, গজের বৃংহিত,
জলদনির্ঘোষসম, মর্ম্মবিদ্ধবাণ,—
শুনিনু গো আচম্বিতে হাহাকার ধ্বনি
নরকণ্ঠবিনিঃসৃত ; সেই আর্ত্তনাদ
উঠিল গগনপথে, করি বিকম্পিত
স্তব্ধ সমীরণরাশি। ভয়েতে বিহ্বল,
দাঁড়াইনু স্থাণুসম, নিস্পন্দ, নিশ্চল ;
মুখে না সরিল বাণী, চলিল না পদ,
সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল ভয়ে, পড়িল খসিয়া
কর হ'তে ধনু, হায় ; অবশাঙ্গ যেন
উঠিল সে আর্ত্তনাদ গগন বিদারি
'হা পিতঃ, হা মাতঃ, দৌহে জানিলে না, হায়,
তোমাদের হতভাগ্য পুত্র হেথা মরে
বাণবিদ্ধ হ'য়ে ; হায়, পিপাসাকাতর
হেরিয়া দোঁহারে, আমি কুম্ভ ল'য়ে করে
আসিনু ভরিতে জল সরযূর তটে।
বনবাসী ঋষি আমি, কখনো কাহার
করি নাই হিংসা, কিম্বা কোন অপকার—
তবে কোন্ জন, হায়, কোন্ অপরাধে,
বধিলা পরাণ মম ; হায়, এক শরে
বধিলা এ তিন প্রাণী ; অন্ধ পিতামাতা,
পিপাসার্ত্ত, শুষ্ককণ্ঠ উদ্বিগ্নহৃদয়,
করিছে প্রতীক্ষা মম গৃহে আগমন
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ; হায়, না পাইয়া জল
তৃষ্ণায় ত্যজিবে প্রাণ ; কেবা মূল ফল
আহরিবে দোঁহাতরে ? মধুর বচন
শুনাইবে কেবা আর ? করিবে শুশ্রূষা
এ বৃদ্ধ বয়সে ? অতি অসহায় দোঁহে !'
"শুনি আর্ত্তনাদ সেই, কৌশল্যা মহিষি,
(আজিও শ্রবণে যেন ধ্বনিতেছে তাহা !)
লুপ্তপ্রায় হ'ল জ্ঞান ; চেতনা সম্বরি'
ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে হ'নু উপনীত
ঋষির কুমার যথা ঘোর যাতনায়
পতিত ভূতলে। আহা, জটাভার তার
কর্দ্দমাক্ত ; সর্ব্বদেহ রঞ্জিত শোণিতে ;
পার্শ্বে নিপতিত কুম্ভ, প্রসারিয়া দেহ
বাণবিদ্ধ পক্ষীসম করে ছট্‌ফট্ ;
কষ্টে ফেলে শ্বাস ; চক্ষু ঘূর্ণিত লোহিত।
হেরি মোরে ঋষি পুত্র কহিলা কাতরে
'মহারাজ কোন্ দোষে বধিলে আমারে ?
কি কার্য্য সাধিলে, হায়, নাশি বনবাসী
ঋষির কুমারে ; নাহি জান, নৃপবর,
একমাত্র শরে তুমি বধিয়াছ প্রাণ
জনকের, জননীর আর অভাগার !
অন্ধ তাঁরা ; শক্তিহীন বার্দ্ধক্যের ভারে ;
জল আশে আছে ব'সে পর্ণের কুটীরে
পিপাসার শুষ্ককণ্ঠ ; না জানেন তাঁরা
হতভাগ্য আমি হেথা মরি তব শরে।

জানিবেন তপোবলে ; জানিয়াই কিবা
করিবেন দোঁহে, হায়, অন্ধ গতিহীন।
অতএব, হে রাজন্, যাও ত্বরা করি
জনকজননী পাশে, এই পথ ধরি।
কহ গিয়া সত্য কথা, নিধন আমার
তব শরে ; মাগ ক্ষমা বিনীত বচনে।
কি জানি, আমার শোকে রোষবহ্নি জ্বলি'
করে নাশ তোমা, নৃপ, দাবানল যথা
নাশে বন ঘোর রবে, ভীষণ প্রকোপে।
কিন্তু, নৃপ, কর আগে বিশল্য আমারে ;
শোণিতপ্রবাহ, হায়, রুধিতেছে শর,
নদী বেগ রোধে যথা বালুময় বাঁধ।
উঠাইয়া লও শর, যন্ত্রণার শেষ
হউক অচিরে মম।'

"শুনিয়া মহিষি,
কাতর প্রার্থনা তার, হৃদয় আমার
শোকে, দুঃখে, ভয়ে, হায়, হ'ল অভিভূত।
ভাবিনু, বিশল্য আমি ঋষির কুমারে
করিলে, এখনি, আহা, ত্যজিবে সে প্রাণ—
বিষণ্ণ মানসে তাই রহিনু নীরব।
বুঝি মনোভাব মম কহিলা তাপস,
'ব্রহ্মহত্যা ভয় নাহি করহ রাজন্,
জনক আমার বৈশ্য, শূদ্রা মোর মাতা ;
দ্বিজাতি নহি গো আমি ; উৎপাটিত শর,
করহ অচিরে, শান্তি দাও মোরে, হায়।'

"শোকাহত মনে, দেবি, বিকম্পিত করে,
উপাড়িয়া শর আমি করিনু বাহির।
ছুটিল রুধির ধারা সবেগে অমনি,
নির্ঝরের ধারা সম, গিরিগাত্র হ'তে—
কাঁপিল সর্ব্বাঙ্গ তার ; ঘূর্ণিত নয়ন
উঠিল কপালে, হায় ; কষ্টে বহে শ্বাস ;
চাহিয়া আমার পানে কাতর নয়নে—
ত্যজিলা পরাণ, আহা, ঋষির কুমার।

"বিষাদে হৃদয় মম হ'ল জর্জ্জরিত ;
কাঁদিনু নীরবে কত নিজ পাপ স্মরি
নিস্তব্ধ সরযূতটে ; ক্ষণকাল পরে,
উঠিনু ভরিয়া কুম্ভ সরযূর জলে,
চলিনু সে পথ ধরি' কুটীরের দিকে।
হেরিনু কুটীর দ্বারে বসিয়া দম্পতি
লূনপক্ষ বিহঙ্গমদম্পতি সমান—
দুর্ব্বল, কাতর, ক্ষীণ অতি অসহায়—
কহিছে পুত্রের কথা আকুলিত মনে।
মনুষ্যের পদধ্বনি শুনি আচম্বিতে,
কহে বৃদ্ধ ঋষি, হায়, 'বাছারে আমার,
কি হেতু বিলম্ব এত বারি আনয়নে ?
তৃষায় কাতর মোরা ; জননী তোমার
ক্ষণতরে নহে স্থির চিন্তাসমাকুলা।
সরযূসলিলে, বাছা, উচিত কি ক্রীড়া ?
এস, এস, দাও জল, তৃষা কর দূর।
না করহ রোষ, বাছা, যদি মোরা, হায়,
অপ্রিয় বচন কভু ব'লে থাকি তোমা।
গতিহীন, চক্ষুহীন তব পিতা মাতা,
অগতির গতি তুমি ; অন্ধের নয়ন।
তোমাতে আসক্ত সদা আমাদের প্রাণ
নীরব কেন রে বাছা, নাহি কহ কথা ?
এস এস ক্রোড়ে মোর, জুড়াও হৃদয়।'
এতেক কহিয়া ঋষি বাহু প্রসারিলা।

"শুনি সে করুণবাণী, কৌশল্যা মহিষি,
বিদীর্ণ হইল হৃদি ঘোর পরিতাপে।
সংবরিয়া অতিকষ্টে হৃদয়-আবেগ,
কহিনু গদ্গদকণ্ঠে, বিনীত বচনে :—
'নহি পুত্র তব আমি, ওহে তপোধন,
ক্ষত্রকুলোদ্ভব নাম নৃপ দশরথ।
সাধুজনবিগর্হিত দুষ্কর্ম্ম ভীষণ
করিয়াছি অনুষ্ঠান, আজি এ সন্ধ্যায় ;
আসিয়াছি তাই আমি সন্তপ্তহৃদয়ে
চাহিবারে ক্ষমা হায়, তোমাদের কাছে।
অজ্ঞানতঃ কৃত পাপ ক্ষমহ আমার।'
এই বলি ধীরে ধীরে কহিলাম আমি
তাপসতনয়হত্যা, মম শরাঘাতে,

মহতী ভ্রান্তির বশে।
"শুনি মোর কথা
বজ্রাহতপ্রায় ঋষি হইলা নিশ্চল,
কহিলা না বাক্য কোন শোকবিগ্নমনে।
বহুক্ষণ পরে ফেলি' সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
কহিলা সজল নেত্রে কাতর বচনে :—
'মহারাজ, অপকর্ম্ম করিয়াছ যাহা,
না কহিতে যদি তুমি আপনার মুখে,
হইত শতধা চূর্ণ মস্তক তোমার
অভিশাপে মম ; হায়, মহেন্দ্রও যদি
করিত এহেন কর্ম্ম, হইত বিচ্যুত
আপনার পদ হ'তে। তনয় আমার
ব্রহ্মবাদী, তপোনিষ্ঠ, সরল হৃদয়,
পিতৃমাতৃপরায়ণ ছিলা সদা, হায়।
জ্ঞানতঃ বধিলে তারে হইতে নির্ম্মূল
আজি রঘুবংশ সহ। কি বলিব আর ?
ল'য়ে চল এবে দোঁহে, তনয় আমার
যথায় পতিত ভূমে, গতপ্রাণ হায়।'
এতেক কহিয়া দোঁহে কাঁদিলা নীরবে।
"ঋষিদম্পতির কর ধরি সাবধানে
ধীরে ধীরে চলিলাম সরযূর তটে।
উপনীত হ'য়ে তথা স্থবির দম্পতি
বিলপিলা কত, আহা, পরশিয়া তনু
গতপ্রাণ তনয়ের, রক্তাক্ত শীতল :—
'হা পুত্র ; কেনরে আজি নাহি কহ কথা ?
অকালে ত্যজিয়া দোঁহে কেনরে প্রয়াণ
করিলে সংসার হ'তে ? জান না কি তুমি,
বৃদ্ধ মোরা, চক্ষুহীন, অতি অসহায় ?
আর কে তুষিবে, হায়, মধুর বচনে ?
আহরিবে ফল মূল, পিপাসার জল ?
শুনাইবে বেদমন্ত্র পবিত্র প্রভাতে ?
দুঃখিনী জননী তোর কাঁদে কত হায়।
নাহি কি শুনিতে পাও রোদন তাঁহার ?
উঠ, বৎস, প্রাণধন, নয়নের মণি,
উঠ, উঠ, এস ক্রোড়ে, জুড়াও হৃদয়—
ক্ষমহ দোঁহারে, বাছা, অপ্রিয় বচন
যদি কভু ব'লে থাকি ? আসিবে না ক্রোড়ে ?
রহিবে পতিত ভূমে ? কহিবে না কথা ?
নিতান্তই যাবি কিরে যমের সদনে,
ত্যজিয়া দোঁহারে ? তবে বাছারে আমার,
ক্ষণেক দাঁড়াও, হায় সহযাত্রী তব
হইব আমরা। আর লইয়া কাহারে
থাকিব সংসার-ক্ষেত্রে, শূন্য, দুঃখময় ?
দাঁড়াও, দাঁড়াও, বাছা ; যেও না ত্যজিয়া,
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর সম ; যাইতেছি মোরা।'
"এইরূপে বিলপিয়া শোকার্ত্ত দম্পতি
চিতানলে দগ্ধ আহা করিলা তনয়ে।
পুত্রের সৎকার করি অন্ধ বৃদ্ধ ঋষি
কহিলা, 'বধহ প্রাণ দোঁহার, রাজন্।
কাহারে লইয়া আর থাকিব সংসারে—
সংসার শোকের গৃহ, চিতার অনল।
যে শরে হ'রেছ প্রাণ প্রিয় তনয়ের,
সেই শরে বধ তুমি জীবন দোঁহার।
বড় শোক দিলে, নৃপ, এ বৃদ্ধ বয়সে,
কহি তোমা তাই আজি অব্যর্থ বচনে—
আমাদেরি মত তুমি পাবে পুত্রশোক,
ত্যজিবে পরাণ, হায়, এইরূপ শোকে।
এতেক কহিয়া, দেবি, ধ্যানমগ্ন দোঁহে
প্রবেশিয়া চিতানলে ত্যজিলা পরাণ।
'পুরাতন সেই কথা, হা প্রিয়ে মহিষি,
উদিল মানসে আজি। কহি তোমা স্থির,
রামশোকে প্রাণ মম বাহিরিবে, হায়।
কোথা প্রিয় বাছা ধন, রাম রে আমার,
হেরিব না আর আমি মুখচন্দ্র তোর,
শুনিব না আর তোর মধুর বচন।
মহারণ্যে কোন্ স্থানে, কি কঠোর ক্লেশে,
ফলমূল খেয়ে, বাছা, জটাচীর ধরি
যাপিছ রে রাত্রিদিন, রাজপুত্র তুমি,
রাজভোগে চিরাভ্যস্ত ! সুকুমারী সীতা—
রাজার দুহিতা, আহা, রঘুকুলবধূ—

সৌমিত্রি সুধীর মোর,—হায় রে কেমনে
ভ্রমিছে তোমার সাথে, কত ক্লেশ সহি ?
ধিক্ মোর এ জীবনে, ধিক্ রাজ্যধনে,
ধিক্ দশরথ নামে, ধিক্ রঘুকুলে,
হা ধিক্, হা ধিক্, ধিক্, শত ধিক্ মোরে।"
এতেক কহিয়া রাজা ছিঁড়ি কেশপাশ,
প্রসারিয়া দুই বাহু, পড়িলা ভূতলে
ছিন্ন শালতরুসম। কৌশল্যা মহিষী
মুছিয়া অশ্রুর ধারা বস্ত্রের অঞ্চলে,
তুলিয়া ধরিলা নৃপে চেতনাবিহীন।
ক্রমে ঘোর নিশা আসি ছাইল সে পুরী—
সহসা হইল ধরা নিস্পন্দ, নীরব,—
অন্ধকার স্তূপে স্তূপে বেড়িল প্রাসাদ,
নিদ্রাদেবী ধীরে ধীরে হরিলা চেতন
জাগ্রত জীবের ; আহা, কৌশল্যা মহিষী
অচেতন নিদ্রাবেশে, আলুথালু কেশে,
ভূপতির শয্যাপাশে ; আর রাণী যত,
যে যথায় ছিলা, হায়, পড়িলা ঘুমা'য়ে
ভূতলশয্যায়।
সেই গভীর নিশীথে
হেরি নানা বিভীষিকা, "রাম রাম" মুখে,
মহারাজ দশরথ, অযোধ্যার পতি,
সবার অজ্ঞাতে, হায়, ত্যজিলা পরাণ।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

মেয়েলি সাহিত্য ও বারব্রত।

প্রাচীনকালে আমাদের নারী-সমাজে বারব্রত অর্চনা উপবাসের বাহুল্য ছিল। এখন আমরা পুরুষ জাতি ইংরাজী শিখিয়া সভ্য হইয়াছি, প্রাচীন রীতিনীতি আচার বিচারের বড় একটা ধার ধারি না। কিন্তু এখনও আমাদের রমণীজাতি ধর্ম্মকর্ম্মের আলোচনা অনুষ্ঠান একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। নগরাঞ্চলের কথা বলিতে পারি না, যেহেতু প্রাচীনকাল হইতে "নাগর" শব্দে বিলাসীকেই বুঝাইয়া থাকে ; কিন্তু পল্লীবাসিনী রমণীরা অদ্যাপি শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় বা মেয়েলি শাস্ত্রীয় বিবিধ ব্রত-নিয়ম অবলম্বনে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পরন্তু কাল পরিবর্ত্তনে দিন দিন এই প্রথার অন্যথা হইতেছে। প্রবাসী বাঙ্গালী রমণীগণ বহুদিন বিদেশ বাস বশতঃ হয়ত এই সকল বারব্রতের কথা অনেক পরিমাণে বিস্মৃত হইয়াছেন। আখ্যায়িকা-উপাখ্যান ও ছড়া কবিতার আলোচনা দ্বারা ধর্ম্মভাবের উদ্দীপন এবং স্ত্রী-জনোচিত সুশিক্ষা সম্পাদন ঐ সকল বারব্রতের উদ্দেশ্য। অধিকন্তু এই সমস্ত ছড়া বা কবিতা, কথা বা গাথা এবং আখ্যায়িকা বা উপাখ্যানের আবৃত্তি ও আলোচনায় আমাদের নিরক্ষর নারীসমাজে স্বাভাবিক সাহিত্যরসের সঞ্চার হইয়া থাকে।

এই কথা ও গাথাগুলি কোন পুরাকাল হইতে বংশ-পরম্পরায় জনশ্রুতিতে ভাসিয়া আসিয়া বর্ত্তমানকালে পৌঁছিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। প্রদেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন রমণীসমাজে এই গুলির কিছু কিছু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আমাদের অনক্ষর স্ত্রীসমাজে গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের প্রকৃতি কিরূপ তাহা বোধগম্য হইবে বলিয়া কথা ও গাথা, ছড়া ও আখ্যায়িকাগুলি যথাযথ ভাবেই সঙ্কলিত হইল।

অধিক ভূমিকার প্রয়োজন নাই। আমরা মধ্যে মধ্যে প্রবাসীর সহৃদয় পাঠকবর্গকে বঙ্গ-সমাজের মেয়েলি সাহিত্যের কিছু কিছু বিবরণ উপহার দিতে চেষ্টা করিব।

মঙ্গলচণ্ডী বা মঙ্গলবার ব্রত।*

মঙ্গলবারব্রত অনেক প্রকার। যথা—শাকভাত মঙ্গলবার, জয়মঙ্গলবার, বারমেসে মঙ্গলবার, সঙ্কট-মঙ্গলবার, রাস্তাঘাটের মঙ্গলবার, কুলুই মঙ্গলবার, হরিষ-মঙ্গলবার প্রভৃতি। আমরা ক্রমশঃ এই গুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিব।

---

* মৎ সঙ্কলিত "মেয়েলি ব্রত" পুস্তকে এই ব্রতের ঐতিবৃত্তিক ও পৌরাণিক বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকে যে সকল ছড়া ও কবিতা প্রকটিত হইয়াছে, এই প্রবন্ধোল্লিখিত ছড়াগুলি তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারের। অধিকন্তু এই প্রবন্ধে উপদেশপূর্ণ মেয়েলি গদ্যমূলক আখ্যায়িকাও বিনিবিষ্ট হইল। প্রবন্ধ-লেখক।

১। শাকভাত মঙ্গলবার।

এই ব্রত মাঘ মাসের প্রথম মঙ্গলবারে আরম্ভ করিতে হয়। আট গাছি দূর্ব্বা ও আটটা আলো ধান নখ দিয়া খুঁটিয়া চা'ল বাহির করিয়া একটুকু কাপাসের তুলা দিয়া অর্ঘ্য প্রস্তত করিতে হয়। ঘট প্রতিষ্ঠা করিয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিবেন। পূজার পরে কথা শুনিয়া ব্রতচারিণী জল খাইবেন। এই দিন কেবল শাক ভাত খাওয়ার নিয়ম। প্রথমবারে শাকভাত খাইতে হয় বলিয়া এই ব্রতকে 'শাকভাত' মঙ্গলবার বলে।

এই মাসের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ মঙ্গলবারে উপরি-উক্ত নিয়মে সমস্ত কার্য্য ও পূজা নির্ব্বাহ করিতে হয়। কেবল আহারের নিয়ম স্বতন্ত্র। যথা—দ্বিতীয় মঙ্গলবারে ঝালভাত, তৃতীয় মঙ্গলবারে ডা'ল ভাত ও চতুর্থ মঙ্গলবারে দধিভাত। ৪ দিনই এক বেলা আহারের নিয়ম, এবং কাহাকেও উচ্ছিষ্ট দিতে নাই। ভাত খাইয়া ৩ বার মুখে জল দিয়া গণ্ডূষ করিতে হয়।

প্রতি মঙ্গলবারে পূজার অর্ঘ্য তুলিয়া রাখিয়া চতুর্থ অর্থাৎ শেষ মঙ্গলবারে সমস্ত অর্ঘ্য জলে বিসর্জ্জন করিতে হয়। এই ব্রত যতদিন ইচ্ছা করা যাইতে পারে। আবার ইচ্ছামত ছাড়িয়া দেওয়ায় কোন বাধা নাই।

সুপারি হস্তে কথা শুনিয়া যিনি কথা বলেন, তাঁহাকে ঐ সুপারি প্রদান করিয়া প্রণাম করিতে হয়।

অথ কথা।

"উজানী নগরে রাজা বিক্রম বেহারী।
কালকেতু বেদবাণী পশুমুখে শুনি॥
কোকিলে করিছে রা অতি মনোহর
কুঞ্জের ভিতর।
বিয়ে ক'রে গেল সে, পুনর্ব্বার না এল
কেলি কদমের তলে।
'ছিলাম শিশু হ'লাম যুবতী'
কন্যা না খান না দান।
ত্রিপানিতে বসে কন্যা অষ্টপ্রহর তিপান॥
'কিসের লেগে কাঁদ কন্যা কিবা তোমার দুখ।'
'তোমারে বলিয়ে আমার কিবা হবে সুখ॥'
'আমারে বলিলে তোমার ঘুচাইব দুখ।
মাঘ মাস পেয়ে, পঞ্চমী তিথি পেয়ে,
পঞ্চ খণ্ডিকা দিয়ে, ঘটটী রাখগা কন্যা
মণ্ডল আঁকিয়ে।
পূজাটী করাও কন্যা ব্রাহ্মণের হাত দিয়ে
কথাটী শোনগা কন্যা একচিত্ত হ'য়ে
অনায়াসে পাবে পতি ঘরেতে বসিয়ে।'
শাকভাত খেয়ে কন্যা গণ্ডূষ কল্লেন পানি।
স্বামী আসিবেন সংবাদ পাইলেন তখনি॥
ঝালভাত খেয়ে কন্যা গণ্ডূষ কল্লেন পানি।
স্বামী আসবার দিনক্ষণ হইল তখনি॥
ডা'লভাত খেয়ে কন্যা গণ্ডূষ কল্লেন পানি।
স্বামী আসিবার নৌকা সাজালেন তখনি॥
দধিভাত খেয়ে কন্যা গণ্ডূষ কল্লেন পানি।
ধূ ধূ নগরে ডঙ্কা পড়িল তখনি॥
পাতের আগে ছিল ভাত ঠেলিয়ে ফেলিল।
ভদ্রা নামে দাসী ছিল কুড়িয়া খাইল॥
স্বামী আসি ভদ্রাকে কোলেতে করিল।
জয়া বিজয়া তারা শ্বেত চামরে বয়।
ভদ্রা নামের দাসী গিয়ে তাম্বূল যোগায়॥
একগুণ ছিল যে দুখ চতুর্গুণ হইল।
কন্যা না খান না দান।
ত্রিপানিতে বসে কন্যা অষ্টপ্রহর তিপান॥
'কিসের লেগে কাঁদ কন্যা কিবা তোমার দুখ।'
'তোমারে বলিলে আমার কিবা হবে সুখ।'
'আমারে বলিলে কন্যা ঘুচাইব দুখ॥
পুনর্ব্বার করোগা কন্যা এই মঙ্গলবার।
অনায়াসে পাবে পতি ঘরেতে বসিয়া।'
শাকভাত খেয়ে কন্যা গণ্ডূষ কল্লেন পানি।
ভদ্রা নামের দাসীকে রোগের সিজ্জন
হইল তখনি॥
ঝালভাত খেয়ে কন্যা গণ্ডূষ কল্লেন পানি।
ভদ্রা নামের দাসীকে বৈদ্য চিকিৎসা
করিল তখনি।
ডা'লভাত খেয়ে কন্যা গণ্ডূষ কল্লেন পানি।
ভদ্রা দাসীকে মেয়াদ হাঁকিল তখনি॥

দধিভাত খেয়ে কন্যা গণ্ডূষ কল্লেন পানি।
ভদ্রা নামের দাসী গেল যমের পাঠানী॥
সুবুদ্ধি ছিল রে রাজার কুবুদ্ধি হইল
উত্তরবাহিনী হয়ে বল্‌ছেন দেবী—
'ওটে মাগী চেড়ী
ভদ্রার হাতের মালা নিয়ে করোগা
তিন গণ্ডূষ পানি।'
কোথা পাবে জল কন্যা ভাবে মনে মনে।
গোখুরে * ছিল রে জল কল্লেন
তিন গণ্ডূষ পানি।
কুবুদ্ধি ছিল যে রাজার সুবুদ্ধি হইল,
'পরনারী নিয়ে কেন অনুদ্দেশী হব।
নিজ নারী নিয়ে কৈলাসে রহিব॥'
"বিধবায় কল্লে পরে স্বর্গপুরী যায়।
সধবায় কল্লে পরে পুত্র সন্তান পায়।
কুমারীতে কল্লে পরে স্বদৃষ্ট † বর পায়॥"
এই কথা শুনিয়া প্রণাম করিতে হয়।

২। বারমেসে মঙ্গলবার।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত বারমাস এই ব্রত করিতে ; এইজন্য ইহাকে "বারমেসে মঙ্গলবার" বলে। ান্য নিয়ম "শাকভাত মঙ্গলবারের" ন্যায়। ইহাতে গুলি প্রতি মঙ্গলবারে বিসর্জ্জন করিতে হয়। আহার বেলা, কিন্তু মাছভাত খাইতে পারে। কুমারী ও া ভিন্ন বিধবাগণ এই ব্রতের অধিকারিণী নহেন।

অথ কথা।

"সোণার মঙ্গলচণ্ডী কুমুদে কোলে কলা।
ব্রহ্মচিন্তিয়ে মায়ের হাতে জপ মালা॥
রক্তবস্ত্র পরিধান শিবের আলয়।
শিব সহিতে হেন বনে নামিলেন ভবানী।
হেন বনে তপিস্যা করেন মুনিগণ।
তাহাদিকে বর দিয়া যাইল কৈলাস ভুবন॥
এই ধ্যানে এই মূর্ত্তি যেবা নরে পোজে।
অবিশ্চি তাহার কাণ্ড সঙ্কটে স্তুতি॥

* গোষ্পদ। † সদৃশ।

সোণার মঙ্গলচণ্ডী কুমুদে কোলে কলা।
ব্রহ্মচিন্তিয়ে মায়ের হাতে জপমালা॥
রক্তবস্ত্র পরিধান হরের আলয়।
হর সম্ভাষিতে মায়ের নাম মহামায়া॥
দ্বিতীয় প্রহরে মায়ের নূতন যৌবন।
সোহাগের গোর মায়ের হাস্যবদন॥
সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধরূপ যেবা নরে পোজে।
অবিশ্চি তাহার কাণ্ড সঙ্কটে স্তুতি॥
আটমুটি ষোল কটি সোণার মঙ্গলচণ্ডী।
রূপার বালা—কেনে মঙ্গলচণ্ডী এত বেলা।
"হাস্‌তে খেলতে শাঁখায় সিন্দুর পরতে॥"
এই কথা বলিয়া প্রণাম করিতে হয়।

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

হীবরের রোজনাম্‌চা।

(১)

আমরা অনেকেই ছেলেবেলা বিষপ হীবরের সেই কবিতাটি পড়িয়াছি, যাহার গোড়াতেই আছে,

Our task is done. On Ganga's breast,
The Sun is sinking down to rest.
"সমাপ্ত মোদের কর্ম্ম। লভিতে বিশ্রাম,
জাহ্নবীর বক্ষে সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়।"

হীবর কলিকাতার লর্ড বিষপ ছিলেন। তিনি এদেশে থাকিবার সময় যে রোজনামচা লিখিয়াছিলেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তক হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশের সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সেইরূপ কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিব।

হীবর যে জাহাজে ভারতবর্ষ আসিতেছিলেন, তাহা সাগর দ্বীপের নিকট পৌছিলে প্রায় বেলা ১২টার সময় হিন্দু মাঝি দ্বারা চালিত কয়েকটি মৎস্য ও ফলপূর্ণ নৌকা তাঁহাদের নিকট আসিয়াছিল। নাবিকদিগকে দেখিয়া হীবর লিখিয়াছেন:—"তাহারা খর্ব্বাকৃতি, ...

কাল, কিন্তু সুগঠিত ও সুন্দর মুখাবয়ববিশিষ্ট"। তাহার পর আরও অনেকগুলি নৌকা তাঁহাদের নিকট আসিয়াছিল। তাহার একটিতে মস্‌লিনের পোষাকপরা একটি দেশী লোক ছিলেন। তিনি বেশ ইংরাজী বলিতে পারিতেন। তিনি বলিলেন, তিনি একজন 'সরকার', কাজের অনুসন্ধানে আসিয়াছেন; কেহ যদি বার্ষিক শতকরা বার টাকা সুদে টাকা ধার চান, ত তিনি দিতে পারেন। "আমরা যখন তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম, তখন একটা মুরগী জলে পড়িয়া গেল। তাঁহার নৌকার মাঝিরা কেহই মুরগীটাকে জল হইতে তুলিয়া দিতে রাজী হইল না; কিন্তু মুরগীটা ছুঁইতে সরকারের সেরূপ কোন আপত্তি দেখা গেল না। তিনি তাহা তুলিয়া দিলেন।"

"গোল আলু বঙ্গদেশে ক্রমশঃ প্রচুর পরিমাণে জন্মিতেছে ও পাওয়া যাইতেছে। অন্যত্র যেরূপ, তেমনি বাঙ্গলা দেশেও লোকে প্রথমতঃ গোল আলু ভালবাসিত না।" আমরা যখন ৺ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নিকট কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরাজী পড়িতাম, তখন তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম, যে, লোকে প্রথম প্রথম গোলআলুকে পোটেটোজ্ বলিত, তাহার পর বিলাতী আলু, তাহার পর গোলআলু এবং সর্ব্বশেষে আলু। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, প্রথম প্রথম নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরা গোলআলু খাইতেন না, দেবতার ভোগেও উহা দেওয়া হইত না।

"আজ প্রাতে আমাদের জাহাজের অধ্যক্ষ কয়েকটা সামান্য জিনিষ কিনিবার জন্য নিকটস্থ গ্রামের হাটে গিয়াছিলেন। কয়েক পয়সায় তাঁহার প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিয়া তিনি সমগ্র হাটের মধ্যে এক টাকার ভাঙ্গানি পান নাই। ইহা হইতেই দেশের দারিদ্র্য, এবং জিনিষগুলি কিরূপ সস্তা, বুঝা যাইবে।"

"আমার পত্নী তাহাদের [একটি গ্রামের অধিবাসীদের] একটি বাড়ী দেখিতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে বাড়ীর ভিতর যাইতে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। পরিশেষে এক বৃদ্ধ, বোধ হয় আমাদিগকে তাহার নিজের দ্বার হইতে তাড়াইবার জন্য, আমাদিগকে একটা ভাল বাড়ী দেখাইবে বলিল। আমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইতিপূর্ব্বে-দৃষ্ট কুটীরগুলি অপেক্ষা বড় একটি বাড়ীর নিকট গেলাম। কিন্তু তাহার উঠানে ঢুকিতে না ঢুকিতেই লোকেরা আসিয়া আমাদিগকে নির্ব্বন্ধসহকারে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিল।" এখন যদি বিষপপত্নী কোন বাঙ্গালীর অন্তঃপুর দেখিতে চান, তাহাহইলে তিনি বোধ হয় কোন আপত্তি করিবেন না!

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মধ্যে হীবরের বাসভবন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বাটীর আসবাব ও পরিচারকবর্গের বর্ণনার মধ্যে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। কলিকাতায় তখনও কেরোসীন তৈল ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয় নাই। বিষপের গৃহে নারিকেল তৈল পুড়িত। পরিচারকগণের মধ্যে 'সরকারে'র সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "লোকটি সুন্দর ও দীর্ঘাকৃতি, শ্বেত মস্‌লিন পরিচ্ছদপরিহিত। সে বেশ ইংরাজী বলিতে পারিত এবং একখানি বাঙ্গলা খবরের কাগজ সম্পাদন করিত।" পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি বোধ করি এই 'সরকার-সম্পাদক'টির পরিচয় দিতে সমর্থ হইবেন। এসব বিষয়ের তিনি খুব সন্ধান রাখেন।

কলিকাতার ময়দানে এবং দুর্গের মধ্যে তখন অনেক হাড়গিলা পক্ষী দেখা যাইত। তাহারা মানুষ দেখিলে সরিয়া যাইত না, বরং "আমাদিগকে প্রায় ধাক্কা দিয়া পথ হইতে সরাইয়া দিত।" কলিকাতা তখন অত্যন্ত দুর্গন্ধময় অপরিষ্কার সহর ছিল।

"হিন্দুদের মধ্যে নরহত্যা প্রায়ই ঘটে। অধিকাংশ খুনই ঈর্ষামূলক নারীবধ এবং অলঙ্কারের লোভে শিশুবধ। তিন মাসের মধ্যে বাঙ্গলা প্রদেশে যে ৩৬টী খুনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে ১৭টী গহনার লোভে শিশুবধ।"

তৎকালে গবর্ণর জেনারেল ও অন্যান্য বড় সাহেবেরা অনেক সময়ে হাতী চড়িয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেন। "হাতীর সম্বন্ধে একটি কথা শুনিয়া আমি বড় আমোদ পাইয়াছিলাম। হাতী যখন চলিতে থাকে, তখন একজন লোক তাহার পাশে পাশে হাঁটিয়া যাইতে থাকে এবং তাহাকে কোথায় পা ফেলিতে হইবে বলিয়া দেয়। কখনও বলে, 'সাবধান', কখনও বলে 'এখানে পা ফেলো না', কখনও বলে 'রাস্তাটা বড় উঁচুনীচু বা

াছ্‌লে' ইত্যাদি'। লোকে মনে করে যে হাতী এই মস্ত কথাই বুঝিতে পারে ও তদনুসারে কার্য্য করে।" াতী মাহুতের কিরূপ বাধ্য, হীবর তাহার একটি দৃষ্টান্ত য়াছেন। "অল্পদিন পূর্ব্বে একটি স্ত্রীলোক একজন াহুতকে অপমানসূচক কিছু কথা বলায়, সে স্ত্রীলোক-কে মারিয়া ফেলিবার জন্য হাতীকে সঙ্কেত করে। াতী তৎক্ষণাৎ তাহার আজ্ঞা পালন করে। আমাদের পাঁছিবার পূর্ব্বেই মাহুতের ফাঁসী হইয়া গিয়াছিল।"

"১৮ই নবেম্বর [১৮২৩]। আমার পত্নী বাবু রূপ-াল মল্লিক নামক একজন ধনী লোকের বাড়ীতে নাচ েখিতে গিয়াছিলেন। কলিকাতার খৃষ্টান ও মুসলমান াধিবাসীরা এই নাচগুলাকে হিন্দুদের দেবদেবীর পূজার ানুষঙ্গিক ব্যাপার মনে করে বলিয়া আমি নিজে যাই াই। বাস্তবিক কিন্তু অনেক নাচের সহিত পৌত্তলিক-ার কোন সম্পর্ক নাই। এই নাচটিও তদ্রূপ।" নাচটি ম্বন্ধে বিষপপত্নী অনেক কথা লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে কটি কথা এই যে, তাঁহাকে মশার কামড়ে অস্থির ইতে হইয়াছিল। নাচের মধ্যে তিনি কোন অশ্লীলতা েখিতে পান নাই। কিন্তু নাচ কিম্বা গান তাঁহার কিছুই াল লাগে নাই।

"আমার বারাকপুরে অবস্থিতির সময় হিন্দুদের একটি াচার দেখিয়াছিলাম, যাহার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। কটা শেয়াল ফাঁদে ধরা পড়িয়াছিল। লোকেরা তাহাকে ারিয়া ফেলিল এবং তাহার শরীর হইতে প্রাণবায়ু াহির হইয়া যাইবামাত্র হিন্দুগণ তাহার রক্তে নিজ নিজ াত ধুইবার জন্য দৌড়িয়া আসিল। আমি শুনিয়াছি, খনই তাহারা কোন বন্যজন্তু বধ করে বা তাহার বধ ান করে, তখনই এইরূপ আচারের অনুষ্ঠান করিয়া াকে।" আমরা বর্ত্তমান বা অতীতকালে এরূপ আচারের াস্তিত্বের বিষয় অবগত নহি। আমাদের কোন পাঠক এবিষয়ে কিছু জানেন কি?

"একদিন কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার ময় দুইটি চিতা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলাম। কটি একমাত্র শবের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, অপরটিতে খনি "সতীদাহ" হইয়া গিয়াছিল। শেষোক্ত উদ্দেশ্যে একটি প্রায় একহাত উঁচু বাঁশের মাচা প্রস্তুত হইয়াছিল। আমার ভৃত্যেরা আমায় বলিয়াছিল যে, মাচার উপর মৃতদেহটি এবং তাহার নীচে সতীর জীবিতদেহ স্থাপিত হইয়াছিল। সতীর দেহের চারিদিকে নানাপ্রকার দাহ্য পদার্থ রক্ষিত হইয়াছিল। এক্ষণে তথায় কেবল এক-রাশি জ্বলন্ত অঙ্গার দৃষ্ট হইতেছিল। তদ্ভিন্ন দুটী লম্বা বাঁশও ছিল। উদ্দেশ্য, বোধ হয়, সতী স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বশে পলায়নের চেষ্টা করিলে তাহাকে সবলে চিতাবদ্ধ করিয়া রাখা। মাচার উপর মোটা কাপাসবস্ত্রের গাঁট-রির মত কি একটা রহিয়াছে, বোধ হইল। তাহা হইতে ধূম ও বিকট দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল। আমার ভৃত্যেরা বলিল যে, ইহাই স্বামীর দেহ। স্ত্রীলোকটিকে ইচ্ছা-পূর্ব্বক নীচে স্থাপন করা হইয়াছিল এবং তাহার শরীর যাহাতে শীঘ্র পুড়িয়া যায়, তজ্জন্য তাহার শরীরে ঘি ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহারা আরও বলিল যে, তাহার শরীরের উপর বাঁশ চাপা দেওয়া হইয়াছিল। ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারিরা কিন্তু বলেন যে, সতীকে মাচার উপর তাহার স্বামীর পার্শ্বে শয়ন করান হয়, এবং তিনি স্বামীর দিকে মুখ রাখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। আমি কিন্তু এখানে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া অন্য প্রকার বিবরণ প্রাপ্ত হইলাম।"

"জানুয়ারী ১৫ [১৮২৪]। গত কল্য ডাক্তার মার্শ-ম্যানের সঙ্গে সতীদাহ সম্বন্ধে কথা হয়। তিনি বলেন যে, বঙ্গদেশ সম্বন্ধে তাঁহার যখন প্রথম অভিজ্ঞতা হয়, তখন অপেক্ষা গত কয়েক বৎসরে সতীদাহের সংখ্যা বাড়িয়াছে। তিনি বলেন, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা পূর্ব্বাপেক্ষা বিলাসী হইয়াছে। অনেক পরি-বারে ব্যয়সাধ্য ইউরোপীয় অভ্যাস ও ধরণধারণ বাড়ি-য়াছে। এই জন্য ঐসকল পরিবারে অভাব বৃদ্ধি হওয়ায় তাহারা বিধবা মাতা বা জ্ঞাতিদের বিধবা পত্নীগণের ভরণ পোষণের দায় এড়াইবার জন্য কোন প্রকারে তাহাদিগকে সরাইয়া ফেলিতে পারিলেই বাঁচে। তিনি আরও একটি কারণের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অনেক বৃদ্ধ তরুণীভার্য্যা বিবাহ করিয়া ঈর্ষাবশতঃ মর-ণের পরেও ভার্য্যার অধিকারী থাকিবার জন্য স্ত্রীকে

সহমৃতা হইবার জন্য আদেশ করিয়া যায়, কিম্বা নিজের উত্তরাধিকারীদিগকে বলিয়া যায় যে, যেন তাহারা তাহাকে সহমৃতা হইবার জন্য জেদ করে।"

"৭ই ফেব্রুয়ারী। অদ্য প্রাতে গবর্ণরের দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য কলিকাতা গিয়াছিলাম। ইহাতে কলিকাতার প্রধান প্রধান দেশী লোক, এবং দেশীয় রাজাদের "উকীল"দের উপস্থিত থাকিবার কথা। * * * আমরা এইরূপ আরও অনেক লোককে অতিক্রম করিয়া গেলাম, যাহারা কেবল দ্রুত নয়, অধিকন্তু সুন্দররূপে ইংরাজী বলিতে সমর্থ। ইহাঁদের মধ্যে আমরা বাবু রামচন্দ্র রায় ও তাঁহার চারি ভ্রাতাকে দেখিলাম। তাঁহারা সকলেই সুন্দর, পুষ্টদেহ, দীর্ঘকায় পুরুষ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শীঘ্রই কর্ম্মনাশা নদীর উপরে শেক্সপীয়র সাহেবের অন্যতম রজ্জুসেতু নির্ম্মাণ করিবেন।" ইহাঁদের বংশধরেরা এখন কোথায় বাস করেন?

কর্ম্মনাশার উপর এই সেতু নির্ম্মিত হইবার পর হীবর লেখেন যে, এই জনহিতকর কার্য্যের জন্য রামচন্দ্র স্বদেশবাসীদিগের অনুরাগভাজন হইবেন। ইহাতে যে কেবল লোকদের যাতায়াতের সুবিধা হইবে, তাহা নয়, তীর্থযাত্রীদিগের এক মহা উদ্বেগ নিবারিত হইবে। "এই নদীটির নামের 'অর্থ সৎকর্ম্ম' বিনাশকারী। পুরাকালে একজন তপস্বী তপস্যাবলে ইন্দ্রত্ব অপেক্ষাও উচ্চ স্থান লাভ করেন। কিন্তু শিব তাঁহাকে উর্দ্ধপদ ও অধোমুখ করিয়া স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু তাঁহার তপস্যার প্রভাবে অর্দ্ধ পথে আসিয়া ঠিক্ এই নদীটির উপর তিনি শূন্যে ঝুলিতে থাকেন। তাঁহার মুখনিসৃত নিষ্ঠীবন এই নদীর জলে পড়িয়া ইহাকে এরূপ অপবিত্র করিয়াছে, যে, কেহ যদি ইহাতে স্নান করে বা ইহা স্পর্শ করে, তাহা হইলে সে তাহার সমুদয় পুণ্যকর্ম্মের ফল হইতে বঞ্চিত হয়, অথচ পাপের সম্পূর্ণ ফলভাগী থাকিয়া যায়। অনেক সুবিখ্যাত তীর্থস্থানে যাইতে হইলে ইহা পার হইতে হয়। যে সকল ব্রাহ্মণকে ইহা পার হইতে হয়, তাঁহারা অত্যন্ত ভীত হন। তাঁহারা কখনও মানুষের কাঁধে চড়িয়া, কখনওবা নৌকা করিয়া ইহা পার হন। কিন্তু তৎকালে এক বিন্দু জলও ছিটাইয়া তাঁহাদের গায়ে লাগিলে তাঁহাদের নিরয়গমন ধ্রুব বলিয়া মনে করেন। কর্ম্মনাশাতীরবাসী নাবিকদের মনে এরূপ কোন কুসংস্কার নাই।"

"আমার অনুপস্থিতিকালে একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটিয়াছিল; আমার স্ত্রীর মুখে শুনিলাম। বাঙ্গালীদের চরিত্রে যে ভীরুতা আছে বলিয়া বোধ হয়, ঘটনাটি তাহারই একটি দৃষ্টান্ত। কোচম্যানেরা আমার সহিত কলিকাতা যাওয়ায় ঘোড়াগুলা অলসভাবে বসিয়াছিল। এই জন্য আমার স্ত্রী সহিসদিগকে ঘোড়াগুলাকে টহলাইয়া আনিতে বলেন। তাহাদের অনিচ্ছা বুঝিতে পারিয়া আমার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তাহারা ঘোড়াগুলাকে টহলাইতে ভয় পাইতেছে। তিনি জেদ করায়, তাহারা ঘোড়াগুলাকে আস্তাবল হইতে বাহিরে আনিল। কিন্তু তাহারা তাহাদের মাথা এরূপ করিয়া বাঁধিয়া আনিয়াছিল যে, জানোয়ারগুলা ভাল করিয়া নিশ্বাস ফেলিতে পারিতেছিল না। বাঁধন খুলিয়া দিতে বলায় তাহারা এরূপ আড়ষ্টভাবে ঘোড়াগুলাকে ধরিয়া রহিল যেন কয়েকটা বাঘকে ধরিয়া রহিয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু এই ঘোড়াগুলি বড়ই শান্ত এবং এই সহিসেরা আস্তাবলেই তাহাদের জীবন কাটাইয়াছে। আমি নানাসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, বাঙ্গালীরা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভীরু বলিয়া বিবেচিত হয়; এবং এই অখ্যাতিপ্রযুক্ত ও তাহারা খর্ব্বকায় বলিয়া, সিপাহীসৈন্যদলের জন্য বেহার ও আরও পশ্চিম হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হয়। অথচ যে ক্ষুদ্র সৈন্যদলের সাহায্যে ক্লাইব এরূপ বিস্ময়কর কার্য্য সাধন করেন, তাহা প্রধানতঃ বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত লোক দ্বারাই গঠিত হইয়াছিল। মানুষ শিক্ষা ও অবস্থার এমনই অধীন।" *

"বাঙ্গালা দেশে, অন্ততঃ এই অঞ্চলে (কলিকাতার অদূরবর্ত্তী টিটাগড় প্রভৃতি স্থানে) ধেনো জমির খাজনা সাধারণতঃ দুটাকা বিঘা; ফল ও তরিতরকারীর বাগানের খাজনা বিঘাপ্রতি পাঁচ টাকা। * * * এই

* "Yet that little army with which Clive did such wonders, was raised chiefly from Bengal. So much are all men the creatures of circumstance and training.
Heber's *Indian Journals*, Ch. IV.

অঞ্চলে বিঘাকরা পঞ্চাশ টাকা দামে জমি বিক্রী হয়; কিন্তু এদিকে সরকারী রাস্তা প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে জমির এত দাম ছিল না। সুতরাং রাস্তা হওয়ায় এখানকার ভূস্বামীদের খুব উপকার হইয়াছে।" বর্ত্তমান সময়ে এই সকল স্থানে জমির মূল্য ও খাজনা কিরূপ, জানিলে তুলনা করা যায়।

"চিৎপুর গ্রামের ('the Village of Chitpur') ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে আমরা দেশী ধরণের জমকাল পোষাক পরিহিত সিপাহীর মত একটি মানুষ দেখিলাম। আমার সঙ্গী বলিলেন যে, লোকটি তৎস্থানসমীপবাসী বাবু বুদ্দিনাথ রায়ের (Baboo Budinath Roy) একজন অনুচর। তাঁহার নানা প্রকার জন্তু ও পক্ষী পূর্ণ একটি বনিবাস আছে।" হীবরের রোজনামচার সম্পাদক পাদটীকায় লিখিতেছেন :—"তিনি (বৈদ্যনাথ রায়) পরে লর্ড আমহার্ষ্ট কর্ত্তৃক রাজা বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হন। কলিকাতার দেশীয় নারীগণের শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় স্কুল-['the Central School for the education of native females in Calcutta'] নির্ম্মাণ প্রধানতঃ তাঁহার বিশ হাজার সিক্কা টাকা দানের ফলেই হইয়াছে। অন্যান্য অনেক দাতব্য অনুষ্ঠানালয় বহু পরিমাণে তাঁহার বদান্যতার জন্য তাঁহার নিকট ঋণী।" এখানে কোন্ স্কুলটীর কথা বলা হইতেছে? বেথুন স্কুল ইহার অনেক বৎসর পরে স্থাপিত হইয়াছিল।

"মার্চ্চ ৮ [১৮২৪]। "আজ প্রাতঃকালে রাধাকান্ত দেব দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি একজন ঐশ্বর্য্যশালী লোকের পুত্র, এবং কলিকাতায় তাঁহার কিছু পদমর্য্যাদাও আছে। আমি এ পর্য্যন্ত এদেশে তাঁহার মত চটক্‌দার গাড়ী, রূপার আশাসোঁটা ও অনুচর দেখি নাই। তিনি সুন্দর মুখশ্রী ও শিষ্টাচারসম্পন্ন একজন যুবা পুরুষ, বেশ ইংরাজী বলিতে পারেন, এবং আমাদের অনেক সর্ব্বসাধারণের প্রিয় গ্রন্থকারের গ্রন্থ পড়িয়াছেন,—বিশেষতঃ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক গ্রন্থ। তিনি ইউরোপীয়দিগের সহিত খুব মেলামেশা করেন এবং স্বদেশবাসীদিগের শিক্ষাসাধনার্থ অতিশয় প্রশংসনীয় ভাবে প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা ইস্কুলসমিতির অবৈতনিক সম্পাদক এবং নিজেও প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী কতকগুলি বাঙ্গলা বহি প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সকল সত্ত্বেও, লোকের বিশ্বাস যে তিনি তাঁহার দেশের দেবতাদের ধর্ম্মে একজন গোড়া বিশ্বাসী,—শুনা যায় যে, আজিকালিকার ধনী বাবুদের মধ্যে যে অতি অল্পসংখ্যক সরল বিশ্বাসী আছে, তাহার ইনি একজন। লর্ড হেষ্টিংস্ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় তাঁহাকে ধন্যবাদপূর্ণ অভিনন্দনপত্র দিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের সম্মতি গ্রহণার্থ যখন সভা হয়, তখন রাধাকান্ত দেব এই সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে, 'পতির মৃতদেহের সহিত বিধবাদের সহমরণ রূপ প্রাচীন এবং শাস্ত্রসম্মত আচার সংরক্ষণ ও তৎপক্ষে উৎসাহ দান করিয়াছেন বলিয়া, লর্ড হেষ্টিংস্‌কে বিশেষরূপে ধন্যবাদ দেওয়া হউক।' এই সংশোধিত প্রস্তাব হরিমোহন ঠাকুর নামক আর একজন ধনী বাবু কর্ত্তৃক সমর্থিত হয়। এই প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। সভাস্থ সকলেই হিন্দু ছিলেন, কিন্তু সভার মত এই সংশোধিত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গিয়াছিল, কিন্তু এই ঘটনাটি হইতে রাধাকান্ত দেবের কুসংস্কারের 'চণ্ডতা' (warmth) বুঝা যায়। * * * তাঁহাকে ধর্ম্ম বিষয়ে কথা কহিতে অনিচ্ছুক মনে হইল না, বরং তিনি যে একজন চতুর তার্কিক তাঁহার এইরূপ জ্ঞান থাকায় এবং বিদেশীদের চক্ষে নিজ ধর্ম্মমত সমর্থন করিবার ঔৎসুক্য বশতঃ, বোধ হইল যে,, তিনি এই বিষয়ে কথোপকথন করিতে ভালই বাসেন। তিনি এই বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের সম্বন্ধে অনেক অযথার্থ কথা প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহাদের অনেক ক্রিয়াকলাপ বুঝিতে ইউরোপীয়গণের এবং এদেশবাসী ইতর লোকদের ভ্রম হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলিলেন, বিশেষ বিশেষ প্রকার খাদ্য আহার নিষেধ ও জাতিভেদ প্রথার আধ্যাত্মিক অর্থ আছে; এই নিয়মগুলি মিতাচার, দয়া, সংসারবিরাগ প্রভৃতি কর্ত্তব্যসমূহের নিত্য স্মারকরূপে অভিপ্রেত হইয়াছে। তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতির সৌন্দর্য্য সহজেই স্বীকার করিলেন, কিন্তু বলিলেন, উহা হিন্দুস্থানের লোকদের উপযোগী নহে; এবং আমাদের সুরাপান, ও গোরুর মত

দরকারী ও উৎকৃষ্ট জন্তুর মাংস ভক্ষণ, এদেশে কেবল যে বীভৎস হইবে তাহা নয়, অস্বাস্থ্যকরও হইবে। আমি বলিলাম, আমাদের মধ্যে যদি কাহারও গোমাংস ভাল না লাগে, তাহাকে উহা খাইতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। তিনি কিন্তু ঘাড় নাড়িলেন এবং বলিলেন যে, ভারতের ইতর লোকদিগকে গোমাংস খাইতে নিষেধ না করিলে তাহারা অনায়াসেই খাইবে।"

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে ধ্বন্যাত্মক * কবিতা।

ভয়, বিস্ময়, সুখ ও বেদনা প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য প্রকৃতি আমাদিগকে কতকগুলি শব্দ দিয়াছেন। সেই গুলিই মানব-ভাষার সূচনা। 'আহা,' 'উহু,' মানব-কণ্ঠের প্রথম ভাষা; ইহারা সহানুভূতি ও কৃপাপ্রার্থী হইয়া সর্ব্বপ্রথম বন্ধুর নিকট একের আবেদন জানাইয়াছিল। ইহারা ঐক্যের আদিমন্ত্র।

কিন্তু এই 'আহা,' 'উহু' ছাড়াও কতকগুলি শব্দ আছে, যাহা শুধু ধ্বন্যাত্মক; তাহারা কোন দ্রব্যবিশেষের গুণ কিংবা অবস্থা জ্ঞাপক। "ধক্‌ধক্ অগ্নি" বলিলে জ্বলন্ত ও উজ্জ্বল অগ্নিশিখার চিত্র চক্ষে ভাসিয়া উঠে। অথচ এই ধক্‌ধকের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা ঠিক বলা যায় না। অগ্নি যখন প্রবলভাবে জ্বলিয়া উঠে, তখন তাহার একটা শব্দ হয়, কিন্তু বোধ হয় 'দপ্ দপ্' শব্দই অগ্নির সেই ধ্বনিবাচক। 'ধক্ ধক্' বিশেষরূপে যেন অগ্নির ঔজ্জ্বল্যবাচক; সেই ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে 'ধক্ ধক্' যে কি কি কারণে এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হইল, তাহা বলা যায় না। কিন্তু এই হেতুশূন্য শব্দটি নিরর্থ হইয়াও একান্তরূপে সার্থক। শত কথায় যে কাহিনী ভালরূপে বর্ণনা করা যায় না, ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি অতি সংক্ষেপে অথচ অতি স্পষ্টরূপে বিশেষ্যের সেই গুণগুলিকে বুঝাইয়া দেয়।

কবিতায় এই সংক্ষিপ্ত অথচ মর্ম্মজ্ঞাপক ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলির অভিঘাতে অতি অল্প পরিসরের মধ্যে কোন অপূর্ব্ব ছবির অবতারণা করা যায়। কাব্য-সাহিত্যে উহারা মনের নহবৎ বাদ্য; কি বলিয়া যায়, তাহা যেন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যায় না, অথচ মন মোহিত করিয়া ফেলে। ইংরেজী সাহিত্যে ধ্বন্যাত্মক কবিতার সংখ্যা বেশী নহে, আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ কবি এডগার এলেন পো ধ্বন্যাত্মক কবিতা রচনার বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছেন, এবং তাঁহার "দাঁড়কাক" (The Raven) শীর্ষক কবিতাটি এই শ্রেণীর কবিতার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

আমাদের ভারতচন্দ্র রায় এই ধ্বন্যাত্মক কবিতা-রচকগণের শীর্ষস্থানীয়। ভারতচন্দ্রের অনেকগুলি কবিতা শুধু ধ্বনির তরঙ্গ তুলিয়া উন্মাদকর সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। যে কথার অর্থ নাই, যাহা পক্ষীর কাকলীর ন্যায় অস্পষ্ট, তাহা তদীয় রচনায় সেই কাকলীর ন্যায়ই মিষ্ট, এবং চারুগ্রথিত সুসংস্কৃত শব্দরাশি হইতেও অধিক সার্থক হইয়াছে। গঙ্গাতরঙ্গবর্ণনোপলক্ষে তিনি "ছলচ্ছল, টলট্টল, কলকল তরঙ্গা" এই ছত্রটির অবতারণা করিয়াছেন। তরঙ্গের এই তিনটি বিশেষণের একটিরও অর্থ অভিধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তথাপি এই তিনটি শব্দ যতদূর অর্থজ্ঞাপক হইয়াছে, ইহাদের পরিবর্ত্তে অন্য তিনটি উৎকৃষ্ট আভিধানিক শব্দ প্রয়োগ করিলেও সেরূপ হইত না। 'ছলচ্ছল'—জলের প্রবাহব্যঞ্জক, 'টলট্টল' জলের নির্ম্মলতা ব্যঞ্জক, এবং 'কলকল'—জলের নিক্বণব্যঞ্জক। "মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে। ভভম্ভম, ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে॥" প্রভৃতি কবিতাটিতে রৌদ্ররস যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেরূপ চিত্র সাহিত্য ক্ষেত্রে সুলভ নহে। অথচ ভারতচন্দ্র কোন গুণবিশেষের দীর্ঘ ব্যাখ্যা দ্বারা এই চিত্র উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা পান নাই; ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি অর্থহীন গুরুগম্ভীর স্বরে যেন মহাদেবের রুদ্রমূর্ত্তির এক বিশাল চিত্রপট অমর অক্ষরে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছে। "ধিয়া তা ধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।" এবং "ফণা ফণ্ ফণা ফণ্ ফণী ফন্ন গাজে।" প্রভৃতি শব্দের অট্টরোলে ভৈরবরস যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিয়াছে। এই ভাবের ধ্বন্যাত্মক শব্দের

* আমার কোন বন্ধু বঙ্গ 'ধ্বন্যাত্মক' শব্দটির পরিবর্ত্তে 'রবানুগ' কিংবা 'রাবানুগ' শব্দ এস্থলে অধিকতর প্রযুক্ত মনে করেন।

পর ভারতচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। প্রকৃত বির চক্ষুর ন্যায় শ্রুতিও তীক্ষ্ণ হওয়া প্রয়োজনীয়; ক্ষু দ্বারা যেরূপ জাগতিক সৌন্দর্য্য ও মহত্বের প্রতি- াব হৃদয়ে আয়ত্ত করিয়া লওয়া যায়, সময়বিশেষে শ্রুতি ারাও তাহাই করিতে হয়। মনে করুন যুদ্ধ বর্ণনা রিতে হইবে;—বন্দুক ও কামানের ধূম্র পটলে অন্ধ- ান সৈনিক মণ্ডলীর বিকট চীৎকার ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় মগ্র রণক্ষেত্রের কোন পরিষ্কার দৃশ্যের কল্পনা করা ষ্কবপর নহে। এখানে চক্ষু অপেক্ষা শ্রুতিই কবিকে বেশী সহায়তা করিবে। এখানে উপর্য্যুপরি শ্রুত ঘন- ার কোলাহলে এক অস্পষ্ট মহান ভাব স্পষ্ট হইয়া ড়ে। ভারতচন্দ্র রণক্ষেত্র বর্ণন করিতে যাইয়া ধ্বন্যাত্মক ব্দের সাহায্য গ্রহণ করিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, িম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয় পাঠ করিয়া পাঠক তাহার বিচার রিবেন।

"ধ্ ধ্ ধু ধু ধ্ নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম্ ভম্, দামামা দম দম্,
ঝনন্ ঝম ঝম্ ঝাঁজে॥
ক ড় নিশান ফর ফর, নিনাদ ধর ধর,
কামান গর গর গাজে।"

এই কয়েকটী ছত্রের প্রতি শব্দ খুঁজিয়া অর্থ পরি- হের চেষ্টা বিড়ম্বনা; যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে বারুদের ধূম ভেদ রিয়া প্রত্যেক সৈনিককে চিনিয়া লওয়া অসম্ভব। কিন্তু এই ছত্র কয়েকটিতে কোলাহল ও উদ্দীপনাময় রণক্ষেত্র যেন কোন যাদুকরের তুলিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

সৌন্দর্য্য এবং মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক কোন বিশাল দৃশ্য আভাস াত্রে দেখাইতে হয়। তন্ন তন্ন করিয়া হিমালয়ের প্রতি াদপ ও তরুপত্রের খোঁজ করিতে গেলে হিমালয়ের বিরাটত্ব উপলব্ধ হয় না। এইজন্য সঙ্কেতমাত্রে যত অল্প কথায় সেই সকল চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, ততই কবি বেশী কৃতকার্য্য হন। ঐ "ভূত" বলিয়া অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া পলাইয়া গেলে, সঙ্গিগণ সে দিকে না তাকাইয়া স্বীয় স্বীয় কল্পনা দ্বারা বিভীষিকা অঙ্কিত করিয়া ছুটিয়া পলায়। দৃশ্যটি দেখিলে হয়ত ততটা ভয়ের উদ্রেক হইত না। আমাদের মনে একটি অসীম রহ- স্যের ভাব সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে। সেই ভাবের এক প্রান্তে মৃদুহস্তে স্পর্শ করিলে সমগ্র আবেগ যেন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। গজকাটি লইয়া সৌন্দর্য্যের পরিমাণ করিতে গেলে সেই ভাবটির মর্ম্মে পীড়া প্রদান করা হয়। ধ্বন্যা- ত্মক শব্দসম্পদ কবির উপেক্ষণীয় নহে। উহা দ্বারা কবিগণ এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

প্রাচীন কবিগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতচন্দ্রের কাব্য গুলিকে আদর্শ করিয়া ধ্বন্যাত্মক কবিতা লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে জয়নারায়ণ সেনই বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অনুকরণকারিগণের মধ্যে যাঁহারা খুব বেশী কৃতী, তাঁহারাও মূলের ভাব-সঙ্গতি সর্ব্বত্র রক্ষা করিতে পারেন না। ভারতচন্দ্র ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বারা কবিতা রচনা করি- বেন বলিয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন না। তাঁহার শ্রুতি লেখ নীকে এই অপূর্ব্ব ভাণ্ডারের খোঁজ দেখাইয়াছিল, তাঁহার রচনাবলীতে স্বাভাবিক ভাবে ধ্বন্যাত্মক শব্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু জয়নারায়ণ ধ্বন্যাত্মক শব্দ দ্বারা কবিতা রচনা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার রচনায় উহা মধ্যে মধ্যে স্বভাবের সীমা অতিক্রম করিয়া কতকটা কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিনিচয় পাঠ করিলে কবিকে শব্দকুশলী ও সৌন্দর্য্যরসাভিজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।*

সভামধ্যে রত্ন সিংহাসনে নরপতি।
শিরে শ্বেতছত্র ইন্দু কুন্দ জিনি ভাতি॥
ফক ফক জ্বলে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্র ভালে।
মিস মিস মজ্ঞভস্ম ভুরু মধ্যে জ্বলে॥
জগমগ শিরে চীর রত্ন বাঁধা তাহে।
তর তর কাঁপে বক্র পাখীপাখা তাহে।
ঝক মক জুড়ী জোড়া সাজে কলেবরে।
দপ্ দপ জিনিয়া বদন সুধাকরে॥
চক মক সুবর্ণ কবচ জোড়া পরে।
ধক ধক হীরার ধুকধুকি শোভে উরে॥
টল টল্ মুকুতা কুণ্ডল কাণে দোলে।
চল চল্ গজমতি মালা দোলে গলে॥

*উদ্ধৃত অংশের সকল শব্দই যে কোন না কোন ধ্বনির অনুকরণে হইয়াছে, তাহা স্বীকার করা যায় না। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও "ধ্বন্যাত্মক" সংজ্ঞায় বাচ্য অনেকগুলি শব্দের মূল অর্থ খুঁজিয়া পান নাই,—"শাদা ধব্ ধব করে" বুঝাইতে তিনি লিখি- য়াছেন "শ্বেত পদার্থ আমাদের কল্পনাকর্ণে একরূপ অশব্দিত শব্দ করে।" অনেক স্থলে কল্পনা দ্বারাও এই বিষয়ের ব্যাখ্যা হয় না। সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৭ সন, ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কস্ কস্ কসা তাস পট্‌কা কটীতে।
ঝল্ ঝল্ ঝক্‌মকি স্বর্ণ ঝালরেতে॥
ডগমগ পঞ্চকন্যা চামর লইয়া।
ধীরে ধীরে দোলাইছে নহিয়া রহিয়া॥
ঝন্ ঝন্ লাগে কানে কঙ্কণের ধ্বনি।
চক্ মক্ চামরদণ্ডেতে জ্বলে চুণি॥
গল্ গল ভাটে যশ পড়িছে ডাকিয়া।
জয় জয় স্তুতি করে বন্দী বিরচিয়া॥
টলমল বসুন্ধরা কাঁপিছে প্রতাপে।
থর থর অমাত্য সকলে হেরি কাঁপে॥
মিট্ মিট্ নয়নেতে চাহে রাজা পানে।
ধুক্ ধুক্ বুক, বাক্য না সরে বদনে॥
ফিস্ ফিস্ করি কথা সভাসদে কয়।
ঝট্ ঝট্ উঠে যার পানে দৃষ্টি হয়॥
ছব্ ছব্ জলযন্ত্র সম্মুখেতে ছোটে।
বিন্দু বিন্দু বিন্দু হৈয়া পড়িছে নিকটে॥
ঠন্ ঠন বাজে ঘড়ী দেহুড়ী পরেতে।
ধুন্ ধুন্ ধুন্ বাদ্য বাজে নহবতে॥"

এই অংশ জয়নারায়ণ কৃত "হরিলীলা" নামক কাব্য হইতে উদ্ধৃত হইল। এই কাব্য ১৬৯৪ শাকে (১৭৭২খৃঃ বিরচিত হয়। এই কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী দেবী 'হরিলীলা' রচনায় খুল্লতাতকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। আনন্দময়ীও ধ্বন্যাত্মক কবিতা রচনায় সুনিপুণা ছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকটি ছত্র নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব। রমণীগণ কুম্ভ হইতে বরের অঙ্গে জল ঢালিতেছেন,—সেই দৃশ্য বর্ণনা করিয়া আনন্দময়ী লিখিয়াছেন, "সুহস্তে ঢালিছে সর্ব্ববারি রঙ্গে। ঝনত্ ঝনত্ গলত্ গলত্ পড়ে নীর অঙ্গে॥" রমণীগণ কৌতুক করাতে—"শুনি চাতুরী দম্পতি হেটমাথে। ঢলাঢল্ গলাগল্ সখী সর্ব্ব তাতে॥"

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

রাণী ভবানীর পত্র।

নবাব সিরাজুদ্দৌলা কিরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন, তদ্বিষয়ে অনেকের নিকটে অনেক প্রকারের অভিমতি শুনা গিয়াছে। কেহ তাঁহাকে নিষ্কলঙ্ক বা নিরপরাধ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কেহ বা তাঁহাকে অত্যাচারী শার্দ্দূল অথবা "নির্লজ্জ গৃধ্র" রূপে অঙ্কিত করিয়া ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়াছেন। সিরাজ যেরূপ চরিত্রেরই লোক হউন, তিনি যে অযোগ্য শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা বা স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতার দিকে তাঁহার যে আদৌ দৃষ্টি ছিল না, ইহা এক প্রকার ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত। সুন্দরী যুবতীর সতীত্বনাশ করিতে সিরাজের যে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা উপস্থিত হইত না, ইহা জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় প্রমাণ করা যাইতে পারে। অতি তরুণ বয়সে অর্থাৎ উনবিংশ বর্ষমাত্র বয়ঃক্রম কালে, অজাতশ্মশ্রু সিরাজ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বিকৃতমস্তিষ্ক সখা ও বিকৃতচরিত্র সহচর এবং মন্ত্রীদিগের কুপরামর্শে একাদশ মাসকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া অবশেষে এক আত্মীয়ের হস্তে নিহত হয়েন। তাঁহার এই স্বল্পকালব্যাপী শাসন সময়ে, ব্রাহ্মণী হইতে চণ্ডালী পর্য্যন্ত এবং সৈয়দ রমণী হইতে অতি নিম্নশ্রেণীর মুসলমানী পর্য্যন্ত যে কোনও সুন্দরী রমণীর তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতার উপরে হস্তক্ষেপ অথবা একেবারেই সতীত্বনাশ করিতে তিনি চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। এই একাদশমাসকালব্যাপী শাসনে যে সমস্ত অত্যাচার এবং যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়াছে, অনেকের একাদশবর্ষকালব্যাপী শাসনেও প্রায় তাহা ঘটে না। সিরাজের জন্মস্থানে এবং তাঁহার রাজধানীতে আমরা অনেক দিন বাস করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলাম; সিরাজ যে বিকৃত চরিত্রের লোক ছিলেন এবং তাঁহার নৈতিক বল বা নৈতিক সাহস যে কিছুমাত্র ছিল না, তদ্বিষয়ে অনেক অকাট্য প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। সে প্রমাণের উপরে তর্ক বা যুক্তি চলে না। পলাসী যুদ্ধের ক্ষুদ্র ইতিহাসের প্রণেতা বহুদর্শী মার্টিন সাহেব সিরাজ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তিনি বলেন,—"Seraj was a voluptuous tyrant; he wielded the sceptre to minister to his own pleasures" অর্থাৎ সিরাজ গৃধ্রপ্রকৃতির অত্যাচারী ছিলেন; তাঁহার নিজের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই তিনি রাজদণ্ড চালনা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কথাটি সত্য।

যাহারা সিরাজুদ্দৌলাকে নিরপরাধ বা নিষ্কলঙ্ক অথবা সতী স্ত্রীর মর্য্যাদারক্ষাকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, তাঁহারা অকাট্য সত্যের অবমাননা করেন, এবং স্ত্রীজাতির পরম শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। আমরা হিন্দু; রাজা বা রাজপ্রতিনিধির নামে অযথা অথবা মিথ্যা কলঙ্কারোপ করা আমরা হিন্দু শাস্ত্রমতে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলিয়া বিশ্বাস করি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, "নরাণাঞ্চ নরাধিপং" অর্থাৎ "আমি মনুষ্যদিগের মধ্যে নরাধিপতি।" এক সময়ে সিরাজ আমাদের রাজা ও শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রাজার চরিত্র, মহিমা ও গৌরবে প্রজার গৌরব হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সিরাজের চরিত্রের সমর্থন করিতে আমরা অসমর্থ। কারণ অসত্যের সমর্থন এবং সত্যের অপলাপ মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত।

যাহাই হউক, সিরাজের বৈচিত্র্যময়ী ভবলীলার সহিত একজন আদর্শ সতী এবং আদর্শ ব্রাহ্মণরমণীর জীবনের কতকগুলি ঘটনার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। সিরাজ যে বৎসর এবং যে মাসে জন্মগ্রহণ করেন, নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণের মাতা সুপ্রসিদ্ধা রাণী ভবানীর সেই বৎসরে এবং সেই মাসে জন্ম হয়। জুন মাসে সিরাজের জন্ম এবং জুন মাসে সিরাজের পলাসী ক্ষেত্রে পরাজয়; জুন মাসে রাণী ভবানীর জন্ম এবং ঐ মাসেই তাঁহার বৈধব্য-দশার সূত্রপাত। এইরূপ বহু সাদৃশ্য থাকিলেও সিরাজের এবং রাণী ভবানীর জীবনের উদ্দেশ্য ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রধাবিত ছিল; একের জীবনের উপাদান অন্যের জীবনের উপাদান হইতে স্বতন্ত্র ছিল। সিরাজের জন্ম শিখিবার জন্য, রাণী ভবানীর জন্ম শিখাইবার জন্য; সিরাজের জন্ম চালিত হইবার জন্য, রাণী ভবানীর জন্ম পরিচালিকা হইবার জন্য; সিরাজের জন্ম সংশোধিত হইবার জন্য, রাণী ভবানীর জন্ম সংশোধিকা হইবার জন্য; দুর্ব্বৃত্ত সিরাজের জন্মগ্রহণ পরের অমঙ্গলের জন্য, মহারাণী সতী ভবানীর জন্মগ্রহণ পরের উপকারার্থ স্বার্থত্যাগ করিবার জন্য। এইজন্যই জনৈক ইতিহাসকার লিখিয়াছিলেন :—

Seraj was born to be taught and Rani Bhowani was born to teach. * * Seraj was born to minister to his own pleasures, the noble Rani was born to sacrifice all her best interests at the sacred altar of her country's regeneration."

সিরাজ ও রাণী ভবানী একই সময়ের ও একই বয়সের লোক। কোনও সময়ে সিরাজুদ্দৌলাকে রাণী ভবানী একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অবিকল অনুলিপি দেওয়া গেল। ঐ পত্র পাঠে সিরাজের চরিত্র, রাণী ভবানীর সতীত্ব ও মহত্ত্ব এবং বাঙ্গালা ঐতিহাসিকদিগের ভুল স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। পত্রখানি এখনও বাঙ্গলা বা ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই; যে ঘটনা উপলক্ষে এই পত্র লিখিত ও প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণও এই সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হইল।

কোনও সময়ে কৈবর্ত্তজাতীয়া এক পরমাসুন্দরী যুবতী, নৌকাযোগে নবদ্বীপ হইতে পাটনা অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। এই সতী স্ত্রীলোকের স্বামী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নিকটে লালবাগ নামক স্থানে গঙ্গাবক্ষে রাজকীয় তরণী মধ্যে নবাব সিরাজুদ্দৌলা ঐ সময়ে সহচরবর্গকে লইয়া সুরাপান এবং আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকের নৌকা আসিয়া উপস্থিত হইলে, সুন্দরীর দিকে নবাবের দৃষ্টি পড়িল। প্রথমে প্রচুর অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া সুন্দরী যুবতীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু এরূপ অধর্ম্মজনক প্রস্তাবে সতী বা তাঁহার স্বামী এতদুভয়ের মধ্যে কাহারও সম্মতি না দেখিয়া শেষে বলপূর্ব্বক সতীত্বনাশের উপক্রম হইতে লাগিল। কিন্তু ঈশ্বরকৃপায় ঐ নৌকার আরোহিগণ সায়ংকালে নৌকা হইতে অবতরণপূর্ব্বক অতিশয় সংগোপনে আজিমগঞ্জ নামক স্থানে পলাইয়া যান। তথা হইতে স্বল্পকাল মধ্যে ঐ কৈবর্ত্ত স্ত্রীলোক নাটোরে গমন করেন। যে গ্রামে রাণী ভবানীর জন্ম হইয়াছিল, ঐ কৈবর্ত্ত যুবতীর সেই গ্রামে' জন্ম হয়। কৈবর্ত্ত স্ত্রীলোকের মুখে ঘটনাটি আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া রাণী ভবানী নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে অবিকল অনুলিপ্ত হইল।

পত্রখানি এই। ইহার ভাষা সে কালের বাঙ্গলা, এবং ইহাতে অনেক পারস্য শব্দ মিশ্রিত আছে।

"শাহ্-এ-জাহাঁ আমীর-উল্-উমরা নবাব সিরাজুদ্দৌলা খাঁ সাহেব বাহাদুর বা নিজ্‌দ্-এ-খাস্।

কাতিব্ ব দেহেন্দা ফিদ্‌বী (রাণী) ভবানী, কৌমিয়ৎ ব্রাহ্মণী, সকুনৎ নাটোর।

বঙ্গাধিপতি শাহ্-এ জাহাঁ নবাব সিরাজুদ্দৌলা খাঁ সাহেব বাহাদুরকে মালুম হয় যে, স্ত্রীলোকগণের সতীত্ব হইতেছে একটি মাটির হাড়ির তুল্য যাহাকে একবার ফাটাইয়া দিবায় আর মেরামত বা দোবারা গঠন হওনে কঠিন জানিবা। খণ্ড খণ্ড অংশ সমূচয় মেরামত হয় না, তাহা চূর্ণ হইবায় ধূলি মধ্যে পয়নালী ভিতর নিক্ষেপ করা যায়। স্ত্রীলোকের সতীত্ব আক্রমণে স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশ হইল আর যে আক্রমণ করিল তাহারও ধর্ম্ম যাইল আর অপযশ হইল আর রাজ্যনাশের উপায় আরম্ভ হইল জানিবা। আপনার মন্দ স্বভাব আর কামুক চরিত্র জন্য আপনি কুবেরের ভাণ্ডারের মত স্বর্ণ সমূহ খরচ জন্য স্বীকার আছেন, পরন্তু আপনার কামুক চরিত্র আর দুষ্ট প্রবৃত্তিমার্গ দলনের কারণে আমাদের অর্থ নাই। আমার মাথার কেশ থাকিতে প্রতিহিংসা লওনে কসুর করা যাইবেক না। আর এই প্রতিহিংসা হইতে বৈশ্বানর দেবের আবির্ভাব হইবা জানিবা, আর ঐ অগ্নি জ্বলিয়া উঠনে মুর্শিদাবাদের গঙ্গামাতার জল তাহার জ্যোতি নির্ব্বাণ করণে সক্ষম হইবা না। ঐ অগ্নি আপনাকে আর আপনার জীবন আর আপনার রাজ্য দাহ করিবা।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা ঐ পত্রের একটু নমুনা দিলাম। প্রায় ৮৫ বৎসর পূর্ব্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এই পত্রের পার্শি তর্জমা হইয়াছিল। আমরা তাহা দেখি নাই। একজন বঙ্গবাসী ঐ সমগ্র বাঙ্গলা পত্রখানির ইংরাজি অনুবাদ করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। অনুবাদটি আমরা যেমন পাইয়াছি, তাহাই ঠিক এই স্থলে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম। কেবল বাঙ্গলা পত্রখানি পাঠ করিলে ঐ পত্রের মাধুর্য্য এবং তেজ (spirit) বুঝা অনেকের পক্ষে কঠিন বোধ হইতে পারে; এই জন্য ইংরাজি অনুবাদটি আদ্যও দিতেছি।

(ইংরাজি অনুবাদ)

রাণী ভবানীর পত্র।

Be it known to you, Newab Serajudowla, that a woman's chastity is like an earthen vessel; once you break it, you break it for ever. The broken pieces are not mended but they are reduced to powder and thrown away into dust and dirt. An outrage on a woman's modesty is an outrage on the outrager's own character. An attempt by a king at outraging the modesty of a woman is an attempt at ruining the king himself and the kingdom itself. You can spend, O Newab, you can spend the treasury of Plutus (or কুবের ভাণ্ডার) to destroy the chastity of a woman and gratify your carnality; I have neither gold nor silver to spend with a view to purchase your ruin or to put a check to the commission of this heinous crime: but every hair that has been given to me by God on my head shall cry for vengeance and be it known to you, Newab Serajudowla, that this continued cry for vengeance will create and spread such a terrible wild fire of discontent throughout the country that the waves of the sacred waters of the Ganges at Murshidabad will fail to quench it out until the fire burns your kingdom and consumes your very existence. Remember, what became of mighty Ravana and his glorious Lanka; remember what became of them who outraged Droupadi; remember what became of Joolaykhan on account of the pious Yusuff's consort; if neither your Koran nor our Pooran can give you an idea of the value of a woman's chastity which is her noblest and holiest possession, then may it please God, O Newab, may it please the Father in Heaven to enable you to understand what a great insult will it be to the Newab himself—what a terrible shock will it be to his mind—if a man, whether a Hindoo or a Mahomedan, attempts at outraging the modesty of the great Newab's own wife. Will the Newab be pleased to tell me what His Highness will do unto the man for the outrage which the Newab does not like to be committed on his own wife?

এই অনুবাদ যখন আমার হস্তগত হয়, তখন একজন বন্ধু ইহা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই পত্রের মূল্য এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা।" অপর একজন বান্ধব বলেন, "কুবেরের ভাণ্ডারে যত ধন আছে, এই পত্রের মূল্য তদপেক্ষাও অধিক।" যাহা হউক, এই পত্র যখন সিরাজুদ্দৌলার সম্মুখে পঠিত হইয়াছিল, তখন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়

সিরাজ ইহা শুনিয়াছিলেন। প্রায় দশ মিনিটকাল মূক ভাব অবলম্বনের পর, সিরাজ বলিয়া উঠিয়াছিলেন :—"বজীর ! বজীর ! ইয়ে চিঠ্‌ঠি বনী আদম্‌সে আয়ী নেহি, ইয়ে চিঠ্‌ঠি কিসি ফেরেস্তা কি জানিব্‌ সে আয়ী হ্যায়" অর্থাৎ "মন্ত্রি ! মন্ত্রি ! এই পত্র কোনও মনুষ্যের প্রেরিত নহে, ইহা কোনও স্বর্গীয় দূতের নিকট হইতে আসিয়াছে।" শুনা যায়, এই পত্র পাঠের পরে কোনও সতী স্ত্রীলোকের প্রতি সিরাজ অত্যাচার করেন নাই।

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ভূতের বাবা।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় গত আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে 'উপকথা তত্ত্ব, শীর্ষক প্রবন্ধে বুঝাইয়া দিয়াছেন, যে একই প্রকার উপকথা একাধিক দেশে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার নানা উপকথা তুলনা করিয়া দেখিলে মানবপ্রকৃতির ভিত্তিভূত অনেক ধারণা ও বিশ্বাসে উপনীত হইতে পারা যায়। আমাদের দেশে প্রায় সকলেই 'ছাঁদনদড়ি গোদাবাড়ি'র গল্প ছেলেবেলা শুনিয়াছেন। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশেও ঐরূপ একটী গল্প প্রচলিত আছে। আমরা তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত করিতেছি।

একটী বৃদ্ধার পুত্র অত্যন্ত অকর্ম্মণ্য ও কর্ত্তব্যবিমুখ ছিল। তাহাকে সকলেই অকালকুষ্মাণ্ড বলিয়া ঘৃণা করিত। বৃদ্ধার এমন কিছু সঙ্গতি ছিল না যে, বহুকাল ধরিয়া সংসারযাত্রা সুখস্বচ্ছন্দে নির্ব্বাহ হইতে পারে, অথবা সে নিষ্কর্ম্মা পুত্রটার ভার চিরকাল বহন করিতে পারে। প্রতিবেশীদিগের বাড়ী বাড়ী আটা পিশিয়া অতি কষ্টেই তাহার দিনপাত হইত, কিন্তু তাহার পুত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াও উদরচিন্তায় একান্ত অমনোযোগী থাকিল। এক দিবস বৃদ্ধা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তাহাকে অনেক ভৎ-সনা করিয়া বলিল, "নিগোড়ে ! * তোর জ্বালায় আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিলাম। আমি এখন বুড়া হইলাম, বুড়া হাড়ে আর কত খাটিব ? আর আমি পিশিতে কুটিতে পারি না। তোর মত 'কপুত' † আর কাহারও হয় না। এখনও রোজগারের পন্থা দেখ্‌।" এই বলিয়া বৃদ্ধা আপনার বক্ষে ও গণ্ডদেশে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। বালককে সকলেই সর্ব্বদা সদুপদেশ দিত ; কিন্তু কেহ কখনও তাহাতে সুফল পায় নাই। বালককে যতই বুঝান হইত, সে ততই উত্তরোত্তর অবুঝ হইয়া উঠিত। কিন্তু সকলই ভগবানের ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত 'পক্ষীও পর মারে না' ‡ এবং চন্দ্রসূর্য্যও আপনাপন গন্তব্য পথ ছাড়িতে পারেন না। আজ তাঁহারই মহিমাগুণে মাতার ক্রন্দন শুনিয়া বালকের মন ভিজিল। সে সকাতরে বলিল, "আম্মা ! আচ্ছা, আমি 'কামাই' § করিতে যাইব, কিন্তু পথের সম্বল স্বরূপ আমাকে কিছু খাবার দাও।" বৃদ্ধা মনে মনে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া চারিখানি বাজরার রুটি একটা রুমালে বাঁধিয়া বালকের সম্মুখে রাখিল। বালক রুটি লইয়া অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত শূন্যমনে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

যাইতে যাইতে বালক অনেক পথ চলিয়া গেল। কয়েক ক্রোশ অতিক্রম করিয়া এক প্রান্তর মধ্যে প্রকাণ্ড এক ইন্দারা দেখিতে পাইয়া বালস্বভাবসুলভ কৌতুকপ্রিয়তাবশতঃ ইন্দারার চারি পাড়ে চারিখানি রুটি রাখিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—

একৃকো খাঁউ, দোকো খাঁউ,
তিনকো খাঁউ, কি চারোঁকো খা যাঁউ ?

অর্থাৎ একটা খাই, দুইটা খাই, তিনটা খাই, অথবা চারিটাই খাইয়া ফেলি ?

ঐ ইন্দারার মধ্যে চারিজন ভূত অতি প্রাচীনকাল হইতে বাস করিত। বালকের কথা শ্রবণ করিয়া তাহারা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল, এবং ভাবিতে লাগিল এই লোকটা আমাদের সন্ধান কি প্রকারে পাইল ; দেখিতেছি, এ আমাদের অপেক্ষাও অধিক বলশালী। কিন্তু যখন বার বার তিনবার বালক চীৎকারপূর্ব্বক ঐ একই কথা বলিল, তখন আর সন্দেহ থাকিল না এবং ভূত-

---

* গোঁড়—পদ। নি+গোড়—পদহীন।

† কুপুত অথবা কুপুত্র।

‡ পক্ষীও পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক কোথাও যায় না।

§ অর্থোপার্জ্জন।

চতুষ্টয় ভীত হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিল যে, এক্ষণে কি করা উচিত। তাহাদের মধ্যে একজন অত্যন্ত সাহসী ছিল। সে কূপের ভিতর হইতে বলিল, "মহাশয়! আপনি কাহাকে খাইতে চাহিতেছেন?" বালক নির্ভীক-চিত্তে উত্তর দিল, "রোটচাঁদকে!" বালক রুটিকে পরিহাসচ্ছলে রোটচাঁদ বলিয়াছিল। কিন্তু সেই প্রশ্নকারী ভূতটারও নাম "রোটচাঁদ" ছিল। সে ভয়ে একেবারে আড়ষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা! দোহাই তোমার, আমাদিগকে রক্ষা কর; আমাদিগকে খাইও না; আমরা চারিজনেই তোমাকে চারিটী বস্তু ভেট দিতেছি।" তখন চারিজন ভূতই ভয়ে ভয়ে কূপ হইতে বাহির হইয়া

বালককে চারিটী জিনিষ দিল। একজন একটী ছাগল দিয়া বলিল, "আজ্ঞামাত্রে এই বকরি তোমার সম্মুখে আশর্ফি (মোহর) বমন করিবে।" দ্বিতীয় ভূত বলিল, "আমার এই লোটাটী (ঘটিটী) গ্রহণ কর; ইহার মহৎ গুণ এই যে, তুমি ইচ্ছামত অপর্য্যাপ্ত সুন্দর সুন্দর খাদ্যদ্রব্য ইহা হইতে ঢালিয়া লইতে পারিবে।" তৃতীয় ভূতটী একগাছি দড়ি দিয়া বলিল, "তোমার হুকুম পাইলেই দড়ি যাহাকে বলিবে, তাহাকে আচ্ছা করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে।" এইরূপে চতুর্থ ভূতের নিকট বালক একটী লাঠি পাইল। লাঠিও আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র দমাদম শত্রুর পিঠে আপন্যর অমোঘ বিক্রম প্রকাশ করিতে পারিত।

বালক এই সকল আশ্চর্য্য বস্তু লাভ করিয়া মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইল এবং ভাবিতে লাগিল রোজগারের বর্ত্তনিটত দেখিতেছি বড়ই ভাল হইয়াছে; এখন দেখা যাউক অদৃষ্টে আরও কি কি লাভ হয়। এই চারিজন উল্লুও ত দেখিতেছি আমার জালে বেশ বদ্ধ হইয়াছে। এখন চল, বাটী ফিরিয়া গিয়া আয়েস করা যাউক। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে ভূতগণকে বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা! তোমরা খুব সাবধানে থাকিও, দেখিও কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার করিও না, নতুবা আমি আসিয়া তোমাদিগকে আস্ত গিলিয়া ফেলিব।" ভূতগণও আসন্ন বিপদ হইতে এত অল্পে নিষ্কৃতি পাইয়া তৎক্ষণাৎ কূপমধ্যে নিমগ্ন হইল।

তখন বালক হৃষ্টমনে রুটিগুলি ভক্ষণ করিয়া পুনরায় গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। কিন্তু ভ্রমবশতঃ পথ ভুলিয়া হঠাৎ অপর এক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। সেস্থান তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, এবং সেখানে তাহার এমন কোন বন্ধুবান্ধব ছিল না যে, সেদিনকার মত তাহার নিকট আশ্রয় লাভ করিতে পারে। আমাদের বঙ্গদেশে পর্য্যটকগণ অপরিচিত গ্রামে যাইলে তথাকার কোন অধিবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কারণ সমগ্র বঙ্গদেশে রীতিমত পান্থনিবাস, বোধ হয়, কোথায়ও নাই। উত্তর-পশ্চিমের নিয়ম কিন্তু স্বতন্ত্র প্রকারের। এদেশে অনেক স্থলে ধনী লোকে এক একটী সুন্দর পান্থনিবাস (বা ধর্ম্মশালা) নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। নতুবা প্রায় সর্ব্বত্রই সরাই আছে। সরাইগুলি মুসলমানগণ দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং সরাইস্বামীকে ভাটিয়ারা কহে। ভাটিয়ারা কিঞ্চিৎ দক্ষিণা গ্রহণানন্তর পথিকের থাকিবার জন্য একখানি ঘর, একটী জীর্ণ মলিন তৈলাক্ত খাটিয়া ও সুবিধামত অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করিয়া দেয়; এবং পথিক মুসলমান হইলে তাহাকে গোস্ত [মাংস] রুটিও রাঁধিয়া খাওয়ায়। কিন্তু ভাটিয়ারা অপেক্ষা তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী ভাটিয়ারী মহোদয়ার প্রাধান্যটাই প্রায় সকল সরাইয়ে কিছু অধিক

মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। গৃহপ্রাঙ্গণাদি পরিষ্কার রাখা, মুসলমান যাত্রীদিগের জন্য রন্ধন করা, স্বামীমহাশয়কে বঞ্চিত করিয়া দৈনিক আয়ের অধিকাংশ আত্মসাৎ করা, প্রতিবেশিনীদিগের সহিত অবিরাম কলহে রত থাকিয়া কর্কশকণ্ঠের কঠোর ঝঙ্কারে পরিশ্রান্ত পথক্লিষ্ট যাত্রিগণের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহনশীলতার পরিচয় লওয়া ইত্যাদি অনেক কার্য্য এই সরাইলক্ষ্মীর নিত্যনৈমিত্তিক অবশ্যকর্ত্তব্য।

যাহা হউক, ভূতবিজয়ী বালক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আশ্রয় গ্রহণাভিলাষে সেই গ্রামের সরাইয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। বালকের বেশ মলিন ও দীনদুঃখীদের মত ছিল, সুতরাং সরাইস্বামিনী মনে করিল যে, তাহার নিকট অধিক লাভের আশা নাই। এই জন্য তাহাকে তাচ্ছিল্যের সহিত একটী অতি সামান্য ও অপরিষ্কার কুঠরিতে লইয়া গেল। বালক আজন্ম দারিদ্র্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়াছিল। আর একদিন মাত্র পূর্ব্বে এই কুঠরি কেন, ইহা অপেক্ষাও হীনতর কোন স্থানেও রাত্রিযাপন করিতে পাইলে সে আপনাকে সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিত। কিন্তু সম্পদের এমনি মহিমা যে, ভাটিয়ারীপ্রদর্শিত ক্ষুদ্র মলিন প্রকোষ্ঠ তাহার পছন্দ হইল না। ভাটিয়ারীর সহিত সরাইপ্রাঙ্গণ মধ্যে আসিতে আসিতে সে কয়েকটী সুন্দর প্রকোষ্ঠ দেখিয়াছিল। তাহা দেখিয়া আর তাহার এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। তাহার মুখ্য কারণ, বোধ হয়, এক্ষণে বালক আর দারিদ্র্যভয়ে ভীত ছিল না। সত্য বটে,

বঢ়ত বঢ়ত সম্পতি-সলিল মনসরোজ বঢ়ি জায়।
ঘটত ঘটত ফিরি না ঘটে বরু সমূল কুম্ভিলায়॥ *

কিন্তু সরাইস্বামিনী বালকের সম্পত্তির কথা অবগত ছিল না। এজন্য তাহার প্রস্তাব শ্রবণমাত্র ব্যঙ্গের স্বরে বলিয়া উঠিল, "আরে, আরে, গাদাহিয়া (গর্দ্দভী) দেখিতেছি ইরাকীকে (আরবী ঘোটককে) লাথি মারিতে উদ্যত হইয়াছে।" কিন্তু বালকও ছাড়িবার পাত্র নহে, সে কোন মতে এই সামান্য গৃহে থাকিতে চাহিল না, এবং বলিতে লাগিল "যদ্যপি আমি তোমার ভাড়া কৌড়ি কৌড়ি চুকাইয়া দিতে না পারি, তাহা হইলে আমার এই বকরি ও লোটা তুমি কাড়িয়া লইও।"

তাহাদের কলহ শুনিয়া সরাইশুদ্ধ সমস্ত লোক জমিয়া খুব ভীড় হইয়া গেল, এবং নানাজনে নানা কথা বলিয়া বালককে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু বালক সকলকেই একই উত্তর দিল, "বচা! সম্ভলে রহনা, ইস্‌কা কসর্ নিকাল্ লুঙ্গা"—অর্থাৎ "বেটা! সাবধানে থাকিস্, ইহার উচিত প্রতিফল দিব।" অনন্তর দুই একজন লোক মধ্যস্থ হইয়া বালক ও ভাঠিয়ারীর ঝগড়া আপোশে মিটাইয়া দিল এবং ভাটিয়ারীকে এই বুঝাইয়া ক্ষান্ত করিল, যে, বিবি! তোমার ত ভাড়া পাইলেই হইল, বালক ভাড়া না দিতে পারিলে যখন লোটা বকরি দিয়া দেনা পরিশোধ করিবে বলিতেছে, তখন আর তোমার ভয় কেন? অগত্যা বালকেরই জয় হইল।

তখন ভাটিয়ারী পুনরায় তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, "হজরৎ! বড় ঘরে ত আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলে, এখন পেট ভরিবে কি দিয়া?" বালক উত্তর দিল, "সে জন্য তোমার চিন্তিত হইবার আবশ্যক নাই। আমার নিকট সমস্ত প্রস্তুত আছে।" কিন্তু ভাঠিয়ারী দেখিল যে, তাহার নিকট কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য নাই, সুতরাং পুনরায় একটা উচ্চ মাত্রার বিদ্রূপ করিতে উদ্যত হইল। এমন সময় বালক বলিল—

বকরি! বকরি! খা লে বর্ফি,
উগল্ তো দে মুঝে আশর্ফি। *

ইহা শ্রবণমাত্র ছাগল এক রাশি মোহর উদ্গীরণ করিল। তখন বালক পুনরায় বলিল—

লোটা প্যারা অভী নিকাল্। †
ভাঁত ভাঁত খানেকে থাল্।

* সম্পত্তিরূপ সলিলের বৃদ্ধির সহিত মনরূপ সরোজও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সম্পত্তি হ্রাস হইলেও মন আর হ্রাস হয় না, বরং নষ্ট হইয়া যায়! যেমন জল হ্রাস হইলে সরোজ (মৃণাল) আর ছোট হয় না, বরং সমূলে নষ্ট হইয়া যায়।

* হে বকরি! তুমি বর্ফি খাও। আমাকে মোহর উদ্গীরণ করিয়া দাও ত।

প্রথম চরণের বিশেষ কোন অর্থ হয় না। বোধ হয় কেবলমাত্র ছন্দের মিল রক্ষার্থ রচিত হইয়া থাকিবে।

† হে লোটা! তুমি আমার প্রিয় বস্তু। নানাবিধ খাদ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ [illegible]

তৎক্ষণাৎ লোটার ভিতর হইতে কয়েকটি থালিপূর্ণ নানাবিধ সুন্দর খাদ্যদ্রব্য সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বালক হৃষ্টমনে ভোজন করিয়া ভাটিয়ারীকে অবশিষ্ট সমস্ত দ্রব্য সরাইয়া লইতে বলিল। কিন্তু ভাটিয়ারী এখন বিদ্রূপ করা একেবারে বিস্মৃত হইয়া অগাধ বিস্ময়-সাগরে "ডুব্‌কি মারিতে" লাগিল।

ভাটিয়ারী বালকের কাণ্ড দেখিয়া প্রথমতঃ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাহার মনে দুরভিসন্ধি উপস্থিত হইল। গভীর রাত্রে ধীরে ধীরে উঠিয়া বালকের প্রকোষ্ঠ হইতে সে ছাগল ও লোটা হরণ করিয়া কোন স্থানে লুকাইয়া রাখিল এবং তৎপরিবর্ত্তে আর একটি ছাগল ও লোটা সেখানে রাখিয়া দিল।

বালক প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সরাইবাসী সকল লোকের সম্মুখে একটা মোহর ভাড়াস্বরূপ ফেলিয়া দিয়া ছাগল, লোটা, দড়ি ও বাড়ি লইয়া প্রস্থান করিল। কিয়দ্দূর গমনানন্তর একটি ইন্দারার নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে স্নান করিয়া পূর্ব্বদিনের মত ছাগল ও লোটাকে আহ্বান পূর্ব্বক বারম্বার মোহর ও ত আর সে গুণ নাই; সুতরাং বালকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না। সে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল যে, ইহা সেই 'চুড়েল' ভাটিয়ারীর কার্য্য। আচ্ছা তাহাকে ইহার প্রতিফল দিতে হইবে, এইরূপ ভাবিয়া সে পুনরায় দ্রুতপদে সরাইয়ে ফিরিয়া আসিল।

ভাটিয়ারীকে বালক প্রথমে অনেক মিনতিপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "আমার বকরি লোটা ফিরাইয়া দাও" কিন্তু ভাটিয়ারীর মুখের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে এরূপ সাধ্য ভূতলে কলিকাতার মৎস্যবিক্রেত্রী ভিন্ন বোধ হয় আর কাহারও নাই। পুনরায় বিস্তর লোক একত্রিত হইয়া গেল, পুনরায় সকলে দীনবেশ বালককেই মহা দুষ্ট ও "বকবাদী" [বাচাল] বলিতে লাগিল। কিন্তু তখন বালক উচ্চৈঃস্বরে সকলকে ডাকিয়া বলিল, "ভাই সকল! তোমরা সকলে আমাকেই দোষ দিতেছ; এক্ষণে তোমরা সাবধান থাকিও। দেখ আমি কিরূপ কৌশলে আমার চোরাই মাল উদ্ধার করিয়া লইতেছি।" এইরূপ বলিয়া সে হস্তস্থিত রজ্জুকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিল,

কান ছোড় কন্‌পট্টি মারী।
বাঁধরি রস্‌সী! তেরী পারী। *

রস্‌সী তৎক্ষণাৎ নাগপাশবৎ দেহবিস্তারপূর্ব্বক সরাই-স্থিত সকল মনুষ্যকে বেষ্টন করিয়া তাহাদের হস্তপদ ও সর্ব্বাঙ্গ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ফেলিল।

তখন হস্তে দণ্ড লইয়া বালক কহিল,

কান ছোড় কনপট্টি মারী।
মাররে সোঁটে তেরী পারী। †

অবিলম্বে সকল লোকের পিঠে দমাদম্ লাঠি পড়িতে লাগিল এবং ভাটিয়ারী ভীত হইয়া বলিল "এই মুয়া (মৃত মনুষ্য [অথবা মুখপোড়া]) মানুষ, না ভূত?" বালক তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "জবান সাম্‌লে কথা কহিস্ না; জানিস্ না যে আমি "ভূতের বাবা।"

অনন্তর খুব লাঞ্ছিত হইয়া ভাটিয়ারীপ্রমুখ সকলেই ভূতের বাবার পদে বারম্বার প্রণাম করিতে এবং মিনতি-পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "বাবা! দোহাই তোমার, আমরা তোমাকে চিনিতে পারি নাই। আমাদের ছাড়িয়া দেও।" ভাটিয়ারী বলিল, "ঐ দেখ ওখানে তোমার বকরি ও লোটা আছে। উহা তুমি পুনরায় লও ও আমাদের "পিণ্ড" ‡ ছাড়।" তখন বালক আপনার হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারপূর্ব্বক সকলকে নিষ্কৃতি দিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগত হইল।

* * * *

এখন বুড়ীকে আর পায় কে। সে আর "পিশ্‌না কুটনা" করে না, আর তাহাকে লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়া পুত্রের নিন্দা শুনিয়া দুঃখিত হইতে হয় না। এখন সে নিত্য লাড্ডু পেড়া ভোজন করে এবং তাহার পুত্র রাজার ঠাটে সুন্দর জামাজোড়া পরিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করে। বৃদ্ধার ঐশ্বর্য্যের আর সীমা নাই।

* কর্ণ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণমূলে আঘাত করিলাম। হে রজ্জু, এইবার তোমার পালা, তুমি বন্ধন কর।

প্রথম চরণ বোধ হয় কেবল ছন্দের মিল রক্ষার্থে রচিত হইয়া থাকিবে, নতুবা এস্থলে ইহার কোন বিশেষ অর্থ হয় না।

† কর্ণ পরিত্যাগ করিয়া কর্ণমূলে আঘাত করিলাম। হে লাঠি এইবার তোমার পালা, তুমি মার।

‡ অর্থাৎ আমাদিগকে রেহাই দাও।

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে বৃদ্ধা একদিন বলিল, "বেটা! রামজীর কৃপায় আমাদের এখন আর কিছুই অভাব নাই। আমার আরও একটি আরমান (আকাঙ্ক্ষা) আছে। তাহাও পূর্ণ করিয়া দাও।" পুত্র উত্তর দিল, "আম্মা! তুমি যাহা কহিবে, তাহাই করিব, অন্যথা করিব না; বল, এখন তোমার কি ইচ্ছা হইয়াছে।" সে বলিল, "আমার একান্ত ইচ্ছা এই যে একবার 'কথা' করাই এবং তদুপলক্ষে দেশস্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করি।" বালক বলিল, "তাহার আর আশ্চর্য্য কি? আমি নাপিতকে বলিয়া দিতেছি, সে এখনি সহরশুদ্ধ ছোট বড় সকলের বাড়ি গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে।" উত্তরপশ্চিমে নাপিতই সকল কার্য্যোপলক্ষে বাটি বাটি গিয়া দ্বারদেশ হইতে চীৎকারপূর্ব্বক নিমন্ত্রণ ঘোষণা করিয়া আইসে। বালক স্বয়ং পুরোহিতকে সত্যনারায়ণের কথার আয়োজন করিতে বলিয়া আসিল এবং তন্নিমিত্ত ব্যয়নির্ব্বাহার্থে মাতার সম্মুখে সারাদিন বকরি দ্বারায় আশর্ফি বমন করাইল। পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যার পর যথাসময়ে সকল লোক একত্রিত হইল, খুব ঘোরঘটা করিয়া সত্যনারায়ণের 'কথা' সমাধা হইল, এবং নিমন্ত্রিত সকলে 'পঞ্জিরী' [নারায়ণের প্রসাদ, ঘৃত চিনি ইত্যাদিসংযুক্ত শুষ্ক আটা ভাজা ভোজ্যবিশেষ] ও চরণামৃত সেবন করিয়া, বৃহৎ রাজপথের দুই পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত পাত্তল (পাতা) পাতিয়া ভোজনে বসিয়া গেল। পশ্চিমে বৃহৎ ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে রাজপথের উভয়পার্শ্বে বসিয়া খাইবার রীতি আছে। ভোজটাও খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। বালক প্রত্যেক লোকের পাতে স্বহস্তে লোটা হইতে রাশি রাশি মিষ্টান্ন ঢালিয়া দিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তি মাত্রেরই আশ্চর্য্যের সীমা রহিল না। ভোজনান্তে ব্রাহ্মণগণ এক এক মোহর দক্ষিণা পাইলেন।

এরূপ ঘটা করিয়া কেহ কখনও 'কথা' করাইতে পারে নাই। স্বয়ং দেশের রাজাও পারিতেন কি না সন্দেহ। এরূপ আশ্চর্য্য সংবাদ বহুকাল পর্য্যন্ত চাপা থাকে না, অবিলম্বে রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা শুনিবামাত্র সিপাহী শাস্ত্রী পাঠাইয়া দিলেন যে, বালককে

আমায় নিকট লইয়া আইস। কিন্তু তাহার এখন মেজাজ দেখে কে! সে রাজসিপাহীকেও আর ভয় করে না। সিপাহীদিগকে ধমক দিয়া বলিল, "যাও, যাও, ঢের ঢের রাজা দেখিয়াছি। আমি কেন রাজার নিকট যাইতে গেলাম। তাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি স্বয়ং আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করুন।" সিপাহিগণ বালকের ধৃষ্টতা দেখিয়া তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাকে পূর্ব্ববৎ অচল দেখিয়া যথাযথ সংবাদ রাজ-সকাশে জ্ঞাত করাইল। রাজার ভারি রাগ হইল। তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্যসামন্ত পাঠাইয়া আজ্ঞা দিলেন যে, এখনি সেই ধৃষ্ট বালককে বাঁধিয়া আন। কিন্তু ফল ঠিক বিপরীত হইল। বালককে কেহ বাঁধিতে পারিল না, বরং সমস্ত সৈন্য ভৌতিক রজ্জু দ্বারা বদ্ধ হইয়া দণ্ডাঘাতে ঘোর যন্ত্রণা সহিতে লাগিল। রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, স্বয়ং অপরাপর ফৌজ লইয়া বালক সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বলিলেন। বালক কিন্তু কথায় কথায় ঘোর ঝগড়া বাধাইয়া রাজা ও তাঁহার দলবল সকলকে বাঁধিয়া ফেলিল। রাজা মহা বিভ্রাটে পড়িয়া গেলেন। বালকের ক্রোধ কোন মতে শান্ত করিতে পারিলেন না। শেষে তাহাকে অর্দ্ধেক রাজ্যদান এবং আপন কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম হইলেন।

আমার কথাটি ফুরালো, ইত্যাদি।

শ্রীগিরিজাকুমার ঘোষ।

বঙ্গের বাহিরে বঙ্গসাহিত্য।

কাণপুর—১৮৯১ সালের লোকগণনায় জানা গিয়াছিল, এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা ৪৮৪। "বঙ্গসাহিত্য-সমাজ" নামে এখানে একটী ক্ষুদ্র বাঙ্গালা পুস্তকাগার আছে। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে ৺ ক্ষেত্রকান্ত দাস একটি ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার সংশ্লিষ্ট একটী পুস্তকালয় ছিল। ১৮৯৪ সালে প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর সহিত সভা ও পুস্তকালয় লুপ্ত হইয়া যায়। ১৮৯৬ সালে স্থানীয় "Criterion Fraternity" সম্প্রদায়ের সাহায্যে "স্বর্ণকুমারী লাইব্রেরী" নামে একটী নূতন পুস্তকালয় খোলা হয়। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী মহোদয়া স্বরচিত পুস্তকগুলি দান করিয়া ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কেবল স্ত্রীলোকদিগের জন্যই ইহার স্থাপনা হয়। সাধারণের সহানুভূতির অভাবে পুস্তকালয়টি স্থায়ী হইল না। ইহার কার্য্যপরিচালিকা শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী মহোদয়া স্থানান্তরে গমন করার কয়েক মাস পরেই ইহা বন্ধ হইয়া গেল। এক বৎসর পরে উক্ত Fraternity কতিপয় উদ্যমশীল ব্যক্তির সহযোগে একটী সাধারণ বাঙ্গালা পুস্তকালয় স্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্থানীয় সুশিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সাহায্যে একটী সাহিত্যসভা গঠিত করিলেন; এবং ১৮৯৭ সালের আগষ্ট মাসে ৫৬ খানি পুস্তক লইয়া সাহিত্যসমাজের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই পুস্তকালয়ে এক্ষণে ৫৬৯ খণ্ড বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে ৩০২ খণ্ড উপন্যাস ও নাটক, ১০১ খণ্ড কবিতা পুস্তক এবং অবশিষ্ট ধর্ম্ম, ইতিহাস, জীবনচরিত ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক। তালিকায় অভিধানের কোন উল্লেখ নাই। বঙ্গসাহিত্যসমাজের সম্পাদক মহাশয়ের পত্রে প্রকাশ যে, ৪০ জন গ্রাহক কর্ত্তৃক এক বৎসরে ১১৩৮ খানি নাটক এবং উপন্যাস পঠিত হইয়াছে এবং সেই সময়ের মধ্যে সেই সংখ্যক গ্রাহক ৫৫ খানি জীবনচরিত, ২৬ খানি ইতিহাস, ২২ খানি ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ৭ খানি মাত্র বিজ্ঞান-পুস্তক পাঠ করিয়াছেন! পাঠকগণের এইরূপ পঠন-প্রবৃত্তি নূতন নহে। প্রবাসের সর্ব্বত্রই উপন্যাস, নাটক ও প্রহসনের পাঠক অধিক। প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণ নিরবচ্ছিন্ন বাঙ্গালা উপন্যাস প্রহসনাদি পাঠ করায় মাতৃভাষা বিস্মৃত না হইতে পারেন, কিন্তু তদ্দ্বারা সাহিত্যচর্চ্চার অমৃতময় ফললাভে বঞ্চিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব যাহাতে বঙ্গসাহিত্যসমাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এম. বি. ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, এল. এম্. এস্., উকীল শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বন্দোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্রয়াগচন্দ্র মিত্র, বি. এ., বি. এল., সমাজের পৃষ্ঠপোষক। ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বসু, এল্. এম্. এস্. এবং শ্রীযুক্ত

সুরেন্দ্রনাথ সেন, এল্. এম্. এস্. সম্পাদকদ্বয় এবং শ্রীযুক্ত তেজচন্দ্র সান্ন্যাল তত্ত্বাবধায়ক। প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় সমাজের শীর্ষস্থানীয় গণ্যমান্য বঙ্গসন্তানগণ বঙ্গসাহিত্য-সভা কিম্বা পুস্তকালয় প্রভৃতির সংশ্রবে আসিতে কুণ্ঠা বোধ করেন। অথচ তাঁহাদের সহানুভূতির অভাবে ঐ সকল অনুষ্ঠান স্থায়ী এবং উন্নত হয় না। কানপুরপ্রবাসী উপরোক্ত উচ্চপদস্থ কৃতীব্যক্তিগণ বঙ্গসাহিত্যসমাজে যোগদান করিয়া ভবিষ্যদ্‌বংশীয়গণের আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন।

কাশী—১৮৯১ সালের সেন্সস অনুসারে এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা ৬৬৮১। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বারাণসীই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালীর প্রথম স্থায়ী প্রবাস। এই স্থলেই প্রথমে মাতৃভাষাচর্চ্চার উপায় অবলম্বিত হয়। ১২৭২ সালে * এখানে বঙ্গসাহিত্যসমাজ নামে একটী বাঙ্গালা পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। স্বনামখ্যাত ৬ প্রমদাদাস মিত্র মহোদয় প্রমুখ অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তির পোষকতায় সমাজের কার্য্য গৌরবের সহিত চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে আর উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না। পুস্তকালয়ের মুদ্রিত তালিকায় দেখা যায়, এ পর্য্যন্ত পুস্তকালয়ের গ্রন্থ সংখ্যা এক সহস্রের ঊর্দ্ধে উঠে নাই। অনুবীক্ষণ, আর্য্যদর্শন, রামধনু, বান্ধব, বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধিনী, শিল্প ও কৃষিপত্রিকা প্রভৃতি অনেকগুলি পুরাতন সাময়িক পত্রিকা পুস্তকালয়ের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছে। ভারতী, সাহিত্য ও বামাবোধিনী প্রভৃতি আরও কয়েক খানি প্রচলিত পত্রিকাও রক্ষিত হইতেছে। পুস্তকালয়ের আয় সন্তোষজনক নহে। এই পুস্তকালয় সম্বন্ধে অন্যান্য সংবাদ বারান্তরে লিখিত হইবে; এবং এ স্থানের বাঙ্গালা পত্রিকার সম্পাদক এবং গ্রন্থকারগণের নামও তৎসঙ্গে প্রকাশিত হইবে। উপস্থিত দুইজন বর্ত্তমান গ্রন্থকারের নাম প্রদত্ত হইল।

শ্রীহরকুমার ভট্টাচার্য্য—শঙ্করাচার্য্য নাটক।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসু—কবিতাকলাপ।

* উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যার বাৎসরিক শাসনবিবরণীতে প্রকাশ, যে ১৮৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সমাজের পুস্তকের তালিকায় "১২৭২ সালে সংস্থাপিত" লিখিত আছে।

গোরক্ষপুর।—১৮৯১ সালের সেন্সস্ মতে এখানে ৩২৩ জন বাঙ্গালীর বাস। দশ বৎসরে অনেক বৃদ্ধি হইয়া থাকিবে। এখানে দুইটি বাঙ্গালা পুস্তকাগার আছে। একটীর নাম "বিদ্যাসাগর লাইব্রেরী", অপরটির নাম "Friends Literary Club"। প্রথমটি জাফরাবাজারে, দ্বিতীয় পুস্তকাগার আলিনগরে অবস্থিত। "বিদ্যাসাগর লাইব্রেরীর" স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং বাঙ্গালা সংস্কৃত-হিন্দী পাঠশালা আছে; পুস্তকালয়টি তাহারই সংশ্লিষ্ট এবং স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্যে শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ১৮৯০ সালে স্থাপিত। ইহার বিশেষ বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। "Friends Literary Club" প্রয়াগ-বঙ্গসাহিত্যমন্দিরের ভূতপূর্ব্ব পুস্তকাধ্যক্ষ, মাতৃভাষানুরাগী শ্রীযুক্ত ভবতারণ ঘোষ এবং "ক্লবের" বর্ত্তমান কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা ১৮৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে প্রায় ৩০০ শত বাঙ্গালা এবং প্রায় ২০০ ইংরাজী পুস্তক আছে। চাঁদা এবং এককালীন দান লইয়া ইহার ১৫।১৬ টাকা মাসিক আয় হয়। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি, পুস্তকালয়টির আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না। ৩।৪ বৎসরে বাঙ্গালা পুস্তকের সংখ্যা ৩০০ শতের অধিক না হওয়া উন্নতির লক্ষণ নহে। শুনা যায়, তন্মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থ ও পত্রিকা গ্রন্থকার ও সম্পাদকগণের নিকট হইতে বিনামূল্যে এবং অর্দ্ধ মূল্যে প্রাপ্ত। গোরক্ষপুরের ন্যায় স্থানে মাসিক ১৫।১৬ টাকা স্থায়ী আয় অবশ্য আশাপ্রদ বলিতে হইবে। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহানুভূতি পাইলে ইহা শীঘ্রই উন্নতিলাভ করিতে পারে। ইংরাজী নামের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা নাম দিলে পুস্তকালয়টি জাতীয় অনুষ্ঠানের নিদর্শন স্বরূপ অবস্থান করিবে।

নাইনিতাল—প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ বৎসরের প্রায় অর্দ্ধেক সময় এই স্থানে অতিবাহিত করেন। তাঁহাদের দপ্তরের সহিত অনেক বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর আগমন হয়, কয়েকজনকে কার্য্যোপলক্ষে বারমাসই পাহাড়ে থাকিতে হয়। ইতিপূর্ব্বে এখানে বাঙ্গালীগণ মাতৃভাষার অনুশীলন করিবার সুযোগ

প্রাপ্ত হয়েন নাই। "শৈলসাহিত্যসমিতি" নামে একটী বাঙ্গালা পুস্তকাগার স্থাপিত হওয়ায় এক্ষণে সেই সুবিধা হইয়াছে। ১৮৯৯ সালের ১লা জুলাই তারিখে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্থানীয় "জুবিলী স্কুলের" প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তির বিশেষ যত্নে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহারই মধ্যে ৩০০ শত বাঙ্গালা গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। সমিতির প্রথম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রয়াগ-বঙ্গসাহিত্যমন্দিরের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "জাতীয় সাহিত্য" শীর্ষক একটী অতি উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। উহাতে সাহিত্যের স্বরূপ ও তাহার উপাদান, বাঙ্গালীর মাতৃভাষার প্রতি আদর ও অনাদর, বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চায় বাঙ্গালীর মঙ্গল এবং তাহার অভাবে কি অমঙ্গল এবং প্রবাসীর মাতৃভাষা চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা, প্রভৃতি বিষয় অতি সরল এবং সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছিল। এ অঞ্চলে বঙ্গসাহিত্য চর্চ্চার ইহাই প্রারম্ভ।

রাওঅলপিণ্ডি পঞ্জাব—১৮৯১ সালের সেন্সস্‌-মতে এখানে ৩৫৪ জন বাঙ্গালীর বাস। এখানে দুইটি বাঙ্গালা পুস্তকালয় আছে; কিন্তু দুইটিতেই বাঙ্গালা এবং ইংরাজী এই উভয় ভাষার পুস্তকই রক্ষিত হয়। রাওঅল পিণ্ডি ক্যান্টনমেণ্টে স্থিত পুস্তকালয়টির নাম "প্রো-বোনো-পাব্লিকো লাইব্রেরী"। ইহাতে প্রায় ৫০০ বাঙ্গালা পুস্তক আছে এবং ভারতী, সাহিত্য, প্রদীপ, জন্মভূমি, দারোগার দপ্তর (মাসিক), মহিলাবান্ধব, অনুসন্ধান (পাক্ষিক), প্রতিবাসী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী ও হিতবাদী (সাপ্তাহিক), এই কয়খানি পত্রিকা রক্ষিত হইতেছে। ১৮৯৫ সালের ১লা এপ্রেল তারিখে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। স্থানীয় অধিকাংশ বাঙ্গালী ইহার গ্রাহক হইয়াছেন। বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি ঘোষ ইহার প্রতিষ্ঠাতা। পুস্তকালয়ের আয় মাসিক ২৪৲।২৫৲ টাকা। "কালীবাড়ী রীডিং রুম" বলিয়া এখানে আর একটী পুস্তকালয় ঠিক্ এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৯৫ সালের এপ্রেল মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পুস্তকালয়েও উভয় ভাষার পুস্তক রক্ষিত হয়। ইহার মাসিক আয় ১৮৲।১৫৲টাকা; ইংরাজী সাহিত্যের চর্চ্চা অতীব প্রয়োজনীয়, কিন্তু রাওঅল-পিণ্ডিতে "পপুলার লাইব্রেরী" ও মিউনিসিপাল সাধারণ লাইব্রেরী নামে দুইটী স্বতন্ত্র ইংরাজী পুস্তকালয় এবং "প্রোবোনো পাবলিক লাইব্রেরী" নামধেয় ইঙ্গ-বঙ্গ পুস্তকালয় থাকিতে বাঙ্গালীর জাতীয় অনুষ্ঠান কালী-বাড়ীতে ইংরাজী পুস্তকের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিলাম না। তাহার পর ১৪।১৫ টাকা মাসিক আয়ের ভিতর হইতে ইংরাজী পুস্তক ক্রয় করিয়া পুস্তকালয়ের বাঙ্গালা বিভাগের উন্নতি করা এক প্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার যদ্যপি পুস্তকালয়ের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালা বিভাগের প্রতি লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষীয়গণের বিশেষ লক্ষ রাখিতে হইবে। রায় সাহেব ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ৺ ক্ষেত্রমোহন মুখো-পাধ্যায় প্রমুখ স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার প্রতিষ্ঠা কল্পে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। পুস্তকালয় দুটীর বাঙ্গালা নাম দিলে ভাল হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

আগ্রা বঙ্গ-সাহিত্যসমিতি ও পুস্তকালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা একটি স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। পুস্তকরক্ষা ব্যতীত গৃহটির দ্বারা অন্য উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইবে। মোগলস্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয় আগ্রাতেই পাওয়া যায়। এই জন্য অন্যজাতীয় পর্য্যটকের ন্যায় বাঙ্গালী অনেক পর্যাটকও আগ্রা দেখিতে যান। কিন্তু অনেকে সরাইয়ে থাকিয়া অসুবিধাগ্রস্ত হন। নিরা-শ্রয় সম্বলহীন অনেক বাঙ্গালীও পশ্চিমের অন্যান্য বড় সহরের ন্যায় আগ্রাতেও উপস্থিত হন। লাইব্রেরী গৃহে পর্য্যটক ও এই শ্রেণীর লোকে দুই চারিদিন যাহাতে থাকিতে পারেন, সভার এরূপ বন্দোবস্ত করিবারও ইচ্ছা আছে। আগ্রায় বাঙ্গালীর সংখ্যা কম। তাহার অধি-কাংশই অল্প বেতনভোগী কেরাণী। গৃহ নির্ম্মাণে আনু-মানিক ৫০০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। এত টাকা আগ্রা হইতে উঠিবার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য সভা প্রবাসী ও বঙ্গদেশবাসী প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট সাহায্য প্রার্থী।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কিম্বা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বেণীকান্ত দত্ত মহাশয়ের নিকট আগ্রায় টাকা কড়ি পাঠাইতে হইবে। যাহারা অন্যূন ২৫৲ টাকা দিবেন, লাইব্রেরী-গৃহের দেওয়ালে তাঁহাদের নাম লেখা থাকিবে।

প্রবাসী বাঙ্গলা গ্রন্থকার ও সম্পাদক।

ভাগলপুর—শ্রীহরেন্দ্রলাল রায়, এম. এ., বি. এল.; 'নব-প্রভা'র সম্পাদক।

সম্বলপুর—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি. এল.; 'সুগ-পূজা', 'বিদ্রূপ ও বিকল্প' প্রভৃতি। শ্রীসরোজকুমারী দেবী; 'হাসি ও অশ্রু', 'অশোকা'।

হোসঙ্গাবাদ—শ্রীহরিদাস ঘোষ, এম.এ., বি.এল.; 'বীণা'।

শ্রীহট্ট শ্রীহেমন্তকুমারী চৌধুরী; 'অন্তঃপুর' সম্পাদিকা।

[আমরা আমাদের প্রবাসী পাঠক ও বন্ধুগণকে এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া নিজ নিজ সহরের সাহিত্যিক বৃত্তান্ত আমাদিগকে প্রেরণ করেন। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা কখনই সমুদয় স্থানের সাহিত্যিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে পারিব না। 'প্রবাসী'-সম্পাদক।]

প্রাচীন মানব।

মানব-জীবনের আত্মবৃত্তান্ত জানিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? ইতিহাস একটা আধুনিক জিনিষ; আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞান কয়েক হাজার বৎসরের অধিককাল ব্যাপী নহে। তাহার পূর্ব্বে মানুষ ছিল কিনা, আর যদি ছিল, তাহার বিষয় আমরা কিছু জানিতে পারি কিনা, এই দুই প্রশ্ন মনে স্বতঃই উদিত হয়। কারণ, মানুষের, মানুষের বিষয় জানিবার ইচ্ছা, স্বাভাবিক। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, মানুষ বেশী কিছু আজও জানিতে পারে নাই। আমি মানুষের আত্মজ্ঞানের কথা বলিতেছি না। যদিও প্রাচীন শিক্ষকেরা উপদেশ দিতেন, know thyself (আপনাকে চিন,) এবং হয়ত মনেও করিতেন যে, মানুষের আত্মজ্ঞান তত আয়াসসাধ্য নহে, কিন্তু কৈ মানুষের শরীর, আত্মা ও মন লইয়া ত কতকাল ধরিয়া তর্ক চলিতেছে, মনীষিগণ কতই গবেষণা করিয়াছেন, কেহ ত অদ্যাবধি সর্ব্ববাদিসম্মত কোন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। অথচ প্রকৃতির কত প্রচ্ছন্ন তত্ত্ব আমরা আবিষ্কার করিয়াছি। একজন বিলাতী পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানে সেকালের দেবদেবীর দেবত্ব পর্য্যন্ত অপহরণ করিয়াছে। এই মনে করুন, ইন্দ্রের বজ্রকে তারে বাঁধিয়া ফেলা হইয়াছে, তড়িৎ আজ আমাদের ভৃত্য, সংবাদ বহে, আরও কত কি করে। সেইরূপ সূর্য্যদেবকে বাক্সে পুরিয়া, তাঁহার, আমাদের ও যাহার চাই, তাহারই প্রতিকৃতি আমরা তুলিয়া লইতেছি। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতাপের বেশী উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বিজ্ঞান এত প্রতাপশালী হইয়াছে বলিয়াই এটা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হয় যে, আদ্যমানবসৃষ্টির সংবাদ, আদিম মানবজীবনের বার্ত্তা, আমরা এখনও কিছু জানি না। তবে আমাদের জ্ঞান যে প্রত্যহ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আদিম মানুষের বিষয় আমরা কিছু জানি না সত্য, কিন্তু প্রাচীন, অতি প্রাচীন, মানুষের বিষয় অনেক কথা আমরা ইদানীং শিখিয়াছি। তত বেশী দিনের কথা নহে, তৎসাময়িক পণ্ডিতমণ্ডলীর অগ্রণী ডাক্তার স্যামুয়েল জন্‌সন্ বলিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে প্রাচীন ঐতিহাসিকেরা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার বেশী আর কিছু জানিবার নাই, জানা যাইতেও পারে না। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, সেই সময়েই তাঁহার প্রিয় নিবাস লণ্ডন সহরে মৃত্তিকাতলে প্রত্নতত্ত্বের কত উপাদান বিদ্যমান ছিল। স্লোয়ান যাদুঘরে একটি প্রস্তরখণ্ড সংরক্ষিত ছিল, যাহার বিষয় সম্যক্ আলোচিত হইলে অতি প্রাচীন মানবজীবনের অনেক বার্ত্তা জানিতে পারা যাইত। এটা ত নিশ্চয়ই স্থির হইতে পারিত যে, ইংলণ্ডের ইতিহাস ব্রিটন্ ও ড্রুইড্‌গণের আগমন অথবা সীজরের অভিদ্রব হইতে আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু তখন পণ্ডিতদের কোথায় এ জ্ঞান হইয়াছিল যে, এক সামান্য শিলাখণ্ডের সহিত মানবের ইতিহাস অদ্ভুতরূপে বিজড়িত থাকিতে পারে? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মানব-তত্ত্বনামধেয় মনোহর

বিজ্ঞানের অনুশীলন এই ৫০।৬০ বৎসর হইতেছে। পৃথিবী অতি প্রাচীনকালে সৃষ্ট হইয়াছিল; তাহার পর কত কোটী কোটী বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহা বর্ত্তমান ভূতত্ত্ববিদেরা বলিতে পারেন। মানবজীবনের বিকাশও যে যুগযুগান্তর পূর্ব্বে হইয়াছিল, মানুষও যে পরমেশ্বরের একটি অতি প্রাচীন সৃষ্টি, এটিও একটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্য।

অধ্যাপক টাইলর সমগ্র মানবজাতিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা বন্য (Savage), অসভ্য (Barbaric) এবং সভ্য (civilised) ; * মানবের প্রথম অবস্থা বন্য। বন্য মানুষ চাষ করিতে শিখে নাই, জন্তু পোষমানাইতে শিখে নাই। সে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়, বন্যপশু মারিয়া কিম্বা বনজ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আহার করে, ঝোপের ভিতর বা বৃক্ষতলে শয়ন করে। বন্য মানুষের এমন কোন নির্দ্দিষ্ট আবাস স্থান নাই, যাহাকে তাহার গৃহ বলা যাইতে পারে। শীতপ্রধান দেশে এ অবস্থার মানব কোন এক স্থানে বেশী দিন থাকিতে পারে না, কারণ সেখানে তাহারা সমস্ত বৎসর আহারদ্রব্য পায় না। ক্রান্তিবলয় মধ্যস্থিত জঙ্গলে অবশ্য খাদ্যসামগ্রী প্রচুর, ; কতকগুলি পরিবার একস্থানে কিছুকাল ধরিয়া থাকিলে তত কষ্ট নাই। বন্য অবস্থায় মানুষের নিভর বেশীভাগ শিকারের উপর; কিছু শিকার করিতে পারিলেই খাইতে পাইবে, নতুবা অনশনে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু শিকার সকল সময়ে জুটে না, মনুষ্যকে জীবনধারণের জন্য অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে হয়। সভ্যতার প্রথম সোপান বোধ হয় পোষ্য জন্তু সংগ্রহ করা। মেষ কিম্বা গাভী পুষিতে পারিলে অনেক রকম সুবিধা হয়, আর খাবারের ভাবনা তত থাকে না। কিন্তু কোন রূপ জন্তু রাখিতে হইলেই তাহার খাবারেরও বন্দোবস্ত করিতে হয়। মেষ বা গাভীর চরিবার জন্য মাঠ চাই, ঘাস চাই, ইত্যাদি। কাযেই মানব এই সব জন্তু পুষিলে আর যেখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না, এক জায়গায় স্থির হইয়া বসে। আর মাঠের সন্নিকটে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট অবাসস্থান হইলেই যে, মানুষ ক্রমশঃ কৃষিবিদ্যা শিখিবে, সেটা বিচিত্র কি? জঙ্গলী শিকারি মানুষ জন্তু পোষ মানিলেই বা জমী চষিতে আরম্ভ করিলেই যে সভ্য হইয়া পড়ে, তাহা নহে, তাহারা তখনও ঘোর অসভ্য; কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে তাহারা মানবজীবনের দ্বিতীয়স্তরে পঁহুছিয়াছে, তাহারা উন্নতির মার্গে চলিয়াছে। শিকারি মানব কৃষি হইলেই তাহার খাদ্যদ্রব্যের জন্য আর বড় ভাবনা থাকে না। সে এক ফসলে উৎপন্ন শস্যাদি অন্য ফসল পর্য্যন্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারে। কাজেই সে শীঘ্র আবাসভূমি পরিত্যাগ করেনা। ক্রমশঃ দুই চারিটি কুটীরের স্থানে গ্রাম বা পল্লী হইয়া পড়ে, এবং সেই পল্লীনিবাসীদের দিন দিন নৈতিক ও ও সামাজিক উন্নতি হইতে থাকে। এইরূপে সমাজের, শাসনের এবং রাজতন্ত্রের অঙ্কুরোদ্গম হয়। তখন আমরা মানবজীবনের তৃতীয়স্তরে উপনীত হই, মানব জাতিকে সভ্যদশাপন্ন দেখিতে পাই। পৃথিবী পর্য্যবেক্ষণ করিলে আজ বিংশ শতাব্দীতে আমরা তিন রকমেই মানব দেখিতে পাইব। আমেরিকা কিম্বা অষ্ট্রেলিয়ায় যাইবার প্রয়োজন নাই, সিংহল দ্বীপেই জঙ্গলী মানুষ আছে—তাহাদিগকে ভেড্ডা বলে; ছোটনাগপুরের সাঁওতাল অসভ্য, আর—আমরা সভ্য।

অদ্য আমি প্রাগৈতিহাসিক (Prehistoric) সময়ের মানবজীবন সম্বন্ধে যে সকল আবিষ্কার হইয়াছে, তাহার বিষয়ে কিছু বলিব। এটা বলা বাহুল্য যে,আদিম মানবসম্বন্ধে আমরা এখনও কিছু জানি না, কখনও কিছু জানিতে পারিব কি না, সন্দেহ। ডারবিন (Darwin) প্রমুখ বৈজ্ঞানিকেরা আদিম মানবের কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সাধারণ দেহতত্ত্ববিদ্যা হইতে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে সে ছবি বহুলাংশে সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। ক্লড বিরচিত আদিমমানবেতিহাস নামক পুস্তকে এইরূপ একটি ছবি মুদ্রিত আছে।

আমরা আদিম মানবের বিষয় কিছুই জানিতে পারি নাই সত্য, কিন্তু প্রাচীন মানবের সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছি। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এক ফরাসী পণ্ডিত (Boucher de Perthes) প্রকাশ করেন যে, পিকার্ডির অন্তঃপাতী আবেভীল্ নগরপ্রান্তে সোম্‌নদীর তটে কতক-

* Tylor, Anthropology p. 24.

গুলি প্রস্তরখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে, যাহাতে মানুষের কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। সোম্‌নদী যে উপত্যকার ভিতর দিয়া প্রবাহিত, সেখানে কতকগুলি গর্ত্তে এই সকল প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়। সেগুলি চক্‌মকি পাথরের টুকরা, কিন্তু প্রত্যেকটি এমন করিয়া ভাঙ্গা যে তাহা একটা বিশেষ আকৃতি ধারণ করিয়াছে, অস্ত্ররূপে ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে। এই সকল শিলাখণ্ডের সন্নিকটে সেইরূপই মৃত্তিকা ও বালুকায় প্রোথিত অতিকায় হস্তী, অতিকায়গণ্ডার, এবং অন্যান্য লুপ্ত জন্তুর অস্থি পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়া পর্থ্‌ সাহেব স্থির করেন যে, ঐ সকল শিলাস্ত্র অতিকায় হস্তীর সমসাময়িক মানবে প্রস্তুত করিয়া থাকিবে। এই বিষয় লইয়া অনেক তর্ক ও বাদানুবাদ হয়; কারণ পণ্ডিতমণ্ডলী স্বভাবতঃ নূতন আবিষ্কার বিষয়ে অবিশ্বাসী হইয়া থাকেন। প্রায় বিংশতি বৎসর পরে প্রত্নতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ববিদেরা সোম্‌নদীতট পুনঃ পরীক্ষা করিয়া পর্থ্‌ সাহেবের সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য করেন।

পর্থ্‌ সাহেবের আবিষ্কারের পূর্ণ অর্থ বুঝিবার জন্য কতকগুলি তথ্য জানা দরকার। প্রথম, পূর্ব্বে, বহুকাল পূর্ব্বে, পৃথিবীতে এরূপ নানা জন্তু ছিল, যাহাদিগকে এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ভূতত্ত্ববিদেরা গভীর গবেষণা দ্বারা অনেকটা স্থির করিয়াছেন যে, কতকাল পূর্ব্বে কোন্ জন্তু পৃথিবীর কোন্ অংশে পাওয়া যাইত। এই জন্য, কোন স্থানে কোনও জন্তুর কঙ্কাল প্রাপ্ত হইলে আমরা কতকাল পূর্ব্বের ভূস্তর পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, তাহা স্থূলতঃ নির্ণয় করিতে পারি। এই মনে করুন, এটা স্থির যে, অতিকায় হস্তী তুষারযুগের একটি বৃহৎ লোমশ জন্তু। তখন পৃথিবীর অধিকাংশ বরফে আচ্ছন্ন ছিল, আকাশ জলীয় বাষ্প পূর্ণ ছিল, মধ্য য়ুরোপে চরিষ্ণুনীহারপুঞ্জ (glacier) বিদ্যমান ছিল। পৃথিবীজীবনে এই তুষারযুগ প্রায় ৮০,০০০ বৎসর হইল শেষ হইয়াছে, ২,৪০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে বোধ হয় আরম্ভ হইয়াছিল। ক্রমশঃ যখন শীত কমিয়া গেল, হিমরাশি উত্তরের দিকে সরিয়া গেল, তখন শীতপ্রিয় জন্তু সকলও উত্তরে চলিয়া গেল। কোন সময় ছিল, যখন (rein-deer) রেন্-হরিণ ফ্রান্সে বিচরণ করিত। এখন সে হরিণ গ্রীণ্‌লণ্ড ও ল্যাপ্‌লণ্ডের দক্ষিণে পাওয়া যায় না। এ সকল কতদিনের কথা, যদি জিজ্ঞাসা করেন, ত ঠিক উত্তর হয় ত, কোন বৈজ্ঞানিকই দিতে পারিবেন না। তবে, তাহার পর যে লক্ষাধিক বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় কথা যাহা জানা উচিত, তাহা এই যে নদীগর্ভ কালে গভীরতর হইয়া যায়। বিস্তৃত নদীতটে ক্রমশঃ জলের গতিহীনতাবশতঃ চড়া পড়িয়া আসে, স্থল জাগিয়া উঠে, জল নামিয়া যায়। কোন সময় ছিল, যখন য়ুরোপে উত্তরসাগর ও ইংলিশ প্রণালীর স্থানে এক প্রকাণ্ড নদী প্রবাহিত ছিল, এবং তাহার শাখাসরিৎ রাইন, এল্‌ব্‌, টেম্‌স, হম্বর, টাইন্ প্রভৃতি সেই অম্বুরাশির মধ্যে নিজ সলিলকর অর্পণ করিত। ক্রমশঃ নদীগুলি সঙ্কীর্ণতর কিন্তু গভীরতর হইয়া পড়িল, এবং তাহাদের তটে সেই কালের জীব জন্তুর অবশেষ অনেক ন্যস্ত হইয়া রহিল। সময়ে এই ভূমির উপর শিলা, বালুকা প্রভৃতি বস্তুর আচ্ছাদন পড়িল। সেই জন্য খানিকটা খনন না করিলে জীবাবশেষ (fossil) প্রভৃতি সেকালের চিহ্ন পাওয়া যায় না। প্রায় ৮॥০ হাত জমী খুঁড়িয়া সোমনদীর উপত্যকায় চকমকির অস্ত্র ও অতিকায় হস্তীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। এই স্থান কিন্তু আবার সোমের আধুনিক গর্ভ হইতে অনেক উচ্চ, কোন অংশেই ৩০ হস্তের কম উচ্চ নহে, অংশবিশেষে ৫০ হাতও হইতে পারে। এখন হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, নদীগর্ভ আধ হাত গভীরতর হইতে ১৮০০ বৎসর হইতে ১১৭০০বৎসর লাগে। পাঠক সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন যে, কত শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বের পার্থিব জীবনাবশেষ এই সোম্‌তীরে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শুধু সোম্‌তীরে নয়, পৃথিবীর অনেক স্থানে এইরূপ মানব চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। একবার যখন পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারিলেন যে, এই চকমকি খণ্ডগুলি প্রাচীন মানবের অস্ত্রসমূহ, তখন তাঁহারা অনেক স্থানেই এইরূপ মানব চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। পূর্ব্বে লোকে এইরূপ শিলাখণ্ডের মর্য্যাদা বুঝিত না, তাহারা উহা পাইলে কখন কখন সঞ্চয় করিয়া রাখিত। অশিক্ষিতেরা হয়ত পূজা

করিত, কিম্বা "ঔষধ" বলিয়া ধারণ করিত, কিম্বা "বজ্র" মনে করিয়া তুলিয়া রাখিত। কিন্তু এখন পৃথিবীর প্রায় সব ভাগেই এইরূপ চকমকি প্রভৃতির অস্ত্র মাটীর নীচে পাওয়া গিয়াছে। অনেক আধুনিক অসভ্য জাতির ব্যবহৃত প্রস্তরাস্ত্রের সহিত তুলনা করিলে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে, এই শিলাখণ্ডগুলিও নরহস্তনির্ম্মিত অস্ত্র। ভারতবর্ষের পূর্ব্বোপকূলে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেও এইরূপ শিলাখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশে তুষারযুগের পূর্ব্বকালীন (Pliocene) ভূস্তর হইতে এইরূপ শিলাখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।

সার জন এভানস তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক "Ancient Stone Implements"এ বলিয়াছেন যে, নদী ও সমুদ্রতটে প্রাপ্ত এইরূপ চকমকির অস্ত্রসমূহ তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারে—

(১) শিলাফলক—এ গুলি বোধ হয় ছুরি কিম্বা বাণরূপে ব্যবহৃত হইত ;

(২) নিশিত শিলাখণ্ড—এ গুলি সম্ভবতঃ বর্চ্ছার অগ্রভাগরূপে ব্যবহৃত হইত ; এবং

(৩) ডিম্বাকার শিলাখণ্ড—এ গুলির চতুর্দ্দিকেই ধার আছে। চকমকি প্রস্তর বেশ শক্ত হয়, কিন্তু কোন কঠিন গোলাকার বস্তু দ্বারা বুঝিয়া ঘা মারিতে পারিলে ইহা হইতে সহজেই অনেক চাকলা উঠিয়া যায়। এইরূপ চাকলা উঠা চকমকিপিণ্ড অনেক পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন অস্ত্রনির্ম্মাতাদিগের কৌশল যাহাতে সহজে উপলব্ধি হয়, এইজন্য এভান্‌স সাহেব তাঁহার পুস্তকে একটি চিত্র দিয়াছেন, যাহাতে এক চকমকি পিণ্ডের উপর চাকলা সাজাইয়া দেখান হইয়াছে। যে দেশে চকমকি প্রস্তর বিরল অথবা দুষ্প্রাপ্য, সে দেশে অন্য প্রস্তর ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত, যথা, quartz, jasper, hornblende, প্রভৃতি।

এইরূপ অস্ত্রশস্ত্র নদী ও সমুদ্রতট ব্যতীত পর্ব্বতগুহাতেও পাওয়া গিয়াছে। এই গুহাগুলি সেকালে বাসস্থানের জন্য ব্যবহৃত হইত, আর বোধ হয় অনেকের অন্তিম বাসস্থানও হইত। অনেক গুহাতলে খুঁড়িলে পুরাতন জীবজন্তুর চিহ্ন পাওয়া যায় ; এক স্তরের নীচে হয়ত আরও পুরাতন আর এক স্তর আছে। এইরূপে এক গুহাতেই নানাকালের চিহ্ন পাওয়া যাইতে পারে। আমরা এক্ষণে যে সময়ের মানবজীবনের বিষয় আলোচনা করিতেছি, তাহার চিহ্ন নিম্নতর স্তরেই পাওয়া যায়। অতিকায় হস্তী, গুহাবাসী ভল্লুক, রেন-হরিণ প্রভৃতির কঙ্কালাবশেষের পাশেই বা তাহাতে বিদ্ধ চকমকি-অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহা ব্যতীত হাড়ের টেকো ও ছুঁচের আকারের অস্ত্র, নানারূপে চিত্রিত অস্থিখণ্ড পশুদন্তনির্ম্মিত ছিন্ন হার, এবং মনুষ্যকপাল ও অন্যান্য অস্থিও পাওয়া গিয়াছে। নেমর অন্তঃপাতী স্পাই গ্রামে একটি গুহায় দুইটি নরাস্থিপঞ্জর পাওয়া গিয়াছে।

আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, কতকগুলি গুহার উদ্ধতমস্তরে পুরাকালের নানারূপ অবশেষ পাওয়া যায়, কিন্তু এগুলি তত পুরাতন নহে। এই স্তরে অতিকায় হস্তীর কঙ্কাল পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু কোন কোন লুপ্ত শ্বাপদের কঙ্কাল পাওয়া যায়। আর ইহাদের সঙ্গে যে প্রস্তর বা অস্থিনির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া যায়, তাহা দেখিলেই বুঝা যায় যে তাহাদের নির্ম্মাতা মানব পূর্ব্বাপেক্ষা খানিকটা উন্নত হইয়াছে এই অস্ত্রগুলি পূর্ব্বের চকমকি খণ্ড অপেক্ষা অনেক পরিষ্কার, শুধু একখানা পাথরে আর একখানা পাথর ঠুকিয়া কিম্বা চাপ দিয়া প্রস্তুত হয় নাই ; এ অস্ত্রগুলিকে যত্নের সহিত চাঁচা এবং ছোলা হইয়াছে, অন্য পাথরের উপর ঘসিয়া ধারাল করা হইয়াছে। তখনকার এবং এখনকার অসভ্য জীবনে যে বিশেষ প্রভেদ নাই, ইহা তাহাদের শিল্পনৈপুণ্য তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। আদিম নিউজিলণ্ডবাসীরা আজও যে কুঠার ব্যবহার করে, তাহার সহিত সেই প্রাচীন তুষারযুগের প্রস্তরাস্ত্রধারি-নরনির্ম্মিত কুঠারের তুলনা করিলে একথার সত্যতা অনুভূত হইবে। কিন্তু এই সেকাল, এই তুষারযুগ, ঐতিহাসিক সময়ের অনেক পূর্ব্বে ; ভূতত্ত্ববিদেরা এই কালকে ভূজীবনের চতুর্থযুগ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই সময়ে মধ্য য়ুরোপ হইতে হিমানী ও তুহিনপুঞ্জ অপসারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও শীত যথেষ্ট বিদ্যমান ছিল, ফ্রান্সে রেন-হরিণ পাওয়া যাইত। তাহার পর কত সহস্র বৎসর অতীত হইয়া

গিয়াছে, কালক্রমে পৃথিবীতে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তখনও মানব তাম্র, লৌহাদি কোন ধাতুই প্রাপ্ত হয় নাই; তখনও প্রস্তর, অস্থি এবং কাষ্ঠই তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্য উপকরণ নির্ম্মাণের উপাদান ছিল।

গুহা ব্যতীত অন্য দুই স্থানে এই চতুর্থ যুগের বিবিধ প্রকার চিত্তাকর্ষক অবশেষ পাওয়া গিয়াছে। সমুদ্রোপকূলে স্থানে স্থানে এক একটা স্তূপ আছে, যাহাকে ইংরাজিতে Kitchen-middens বলে। লোকে পূর্ব্বে এই স্তূপগুলিকে নৈসর্গিক মনে করিত। কিন্তু পরীক্ষানন্তর প্রমাণ হইয়াছে যে, এগুলি জঞ্জালের স্তূপ বা আঁস্তাকুড় মাত্র এবং প্রত্নতত্ত্ববিদের পক্ষে নিতান্ত চিত্তহারী। ডেন্‌মার্কে এইরূপ যে স্তূপ আছে, তাহার কোন কোনটী ১০০০ ফুট লম্বা ও ৩০০ ফুট চৌড়া। এই স্তূপের মধ্যে নানাবিধ বস্তু পাওয়া গিয়াছে। যথা, হরিণ, কুক্কুর ও অন্যান্য বর্ত্তমান পশুর অস্থিপঞ্জর, হংস প্রভৃতি নানা প্রকার পক্ষীর ও বহুবিধ মৎস্যের হাড় বা কাঁটা এবং শামুকাদি সামুদ্রিক জীবের রাশি রাশি খোলা। ইহা ব্যতীত প্রস্তর, কাষ্ঠ ও অস্থিনির্ম্মিত নানাপ্রকার উপকরণ এবং কিছু মৃৎপাত্রও পাওয়া গিয়াছে। এই সকল দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই স্তূপগুলি এক একটি উপনিবেশের শ্মশান স্বরূপ; এবং ঐ স্থানবাসীরা মৎস্য ধরিয়া এবং হরিণাদি জন্তু শিকার করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। কুক্কুর ব্যতীত অন্য কোনরূপ পোষ্য জন্তুর কঙ্কাল পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, এই উপনিবেশীরা শিকারিজীবন সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া তখনও পশুপালক জীবন প্রাপ্ত হয় নাই।

আর এক স্থানে এই প্রাগৈতিহাসিক কালের অবশেষ পাওয়া গিয়াছে। সে স্থান সুইট্‌জরলণ্ডের কতকগুলি হ্রদ। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে জ্যুরিক্ হ্রদের জল অনেকটা শুকাইয়া যায়, মস্ত চড়া পড়ে। এই স্থান পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা হইলে দেখা গেল যে, মাটীর খানিকটা নীচে নানারূপ গাছের বড় বড় ডাল ও গুঁড়ি সরু করিয়া পোতা রহিয়াছে। তাহারই নিকট অনেক পোড়া কাঠ এবং পাথর বা হাড়ের অস্ত্রশস্ত্র ও সচরাচর ব্যবহৃত মাটীর বাসনও পাওয়া যায়। ডাক্তার কেলর্ এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করেন। এখন প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, পুরাকালে লোকে এই হ্রদের উপর ঘর বাঁধিয়া থাকিত। লম্বা লম্বা কাঠ পুতিয়া জলের উপর কুটীর নির্ম্মিত হইত, যেমন এখনও অনেক স্থানে—আমাদের ভারতবর্ষেই—হয়। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, এইরূপ জলনিবাস সুইট্‌জরলণ্ডে ১৬০টী, ফ্রান্সে ৩২টী, ইটালিতে ৩৬টী, অষ্টীয়ায় ১১টী এবং জর্ম্মনিতে ৪৬টী ছিল। পরে কোন সময়ে সবগুলিই অগ্নিদাহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এ কুটীরগুলি সব সমসাময়িক নহে; তাহাদের অবশেষ পর্য্যবেক্ষণে অনুমিত হয় যে, কতকগুলি প্রস্তরযুগের, কিন্তু বেশী ভাগ তদপেক্ষা আধুনিক। কতকগুলিতে প্রস্তর, অস্থি, শিং প্রভৃতি নির্ম্মিত বস্তু পাওয়া যায়, কিন্তু কোন রূপ ধাতব অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া যায় না। অন্য কুটীরগুলির অধিবাসীরা বোধ হয় তাম্র এবং পিত্তল ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল, কিন্তু লৌহ, অভাববশতঃ, বোধ হয়, অলঙ্কার ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যবহারে প্রযুক্ত হইত না।

এই ত গেল সেই সব স্থানের কথা যেখানে প্রাচীন মানবজীবনের অবশেষ পাওয়া গিয়াছে। সেই সব অবশেষ দেখিয়া সে কালের মানুষের বিষয়ে কি কি ন্যায্য অনুমান করা যাইতে পারে, তাহা এক্ষণে আলোচনা করা যাউক।

প্রথম, তাহাদের বাহ্য আকৃতির বিষয়। কতকগুলি গুহাতে অতি প্রাচীন মানবের অস্থিপঞ্জর কিম্বা কঙ্কালাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, সত্য, কিন্তু তাহা এত অল্প যে শুধু সেইগুলি দেখিয়া কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় না। মনুষ্যকঙ্কাল এত অল্প পাওয়া যাইবার কারণ এই যে, মানুষের হাড় স্বভাবতঃ ছোট এবং সরু; শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় বা শ্বাপদে খাইয়া ফেলে। ইহাও মনে রাখা উচিত যে, ঐ প্রাগৈতিহাসিক সময়ে মনুষ্যসংখ্যা অন্য জন্তুর সংখ্যার তুলনায় খুব অল্প ছিল। বর্ত্তমানকালেও মৃগয়াজীবী বন্য মানবের অধিষ্ঠানভূত দেশসমূহে ৭৫১টি অপর জন্তুর মধ্যে একটি মাত্র মানুষ পাওয়া যায়। কিন্তু অল্প যাহা নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়াই বৈজ্ঞানিকেরা সেকালের মানবাকৃতির একটা

চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তবে তাহার উপর বেশী নির্ভর করা যাইতে পারে না; যেহেতু সেই কঙ্কাল-দর্শনে প্রমাণ হয় যে, সে সময়ে সমগ্র যুরোপে একজাতীয় লোক বাস করিত না, তাহাদের গঠনে কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়। কোন জাতীয় মানবের মাথা দৈর্ঘ্যে বেশী হয়, কাহারও প্রস্থে। যথা, কাফরীর মাথা লম্বায় বেশী, আমাদের পরিসরে। এখন, দুই রকমেরই মাথা অতি প্রাচীন ভূস্তরে পাওয়া গিয়াছে। কোন্ জাতি প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিল, বলা সহজ নয়। তবে স্পাইএ যে অস্থি-পঞ্জর পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে, প্রাচীন মানব খুব বলিষ্ঠকায় হইত, কিন্তু ৫ ফুটের বেশী লম্বা হইত না। তাহাদের পায়ের হাড় চৌড়া, উরুর হাড় গরিলার মত বাঁকা, মাথাটা লম্বা, কপাল নীচু এবং উপর দিকে ঢালু, ভ্রু উঁচু, নাক চেপ্টা, কাণ সরু, চোয়াল বড় ও মুখমণ্ডলের উদ্ধদেশ অপেক্ষা উভয় পার্শ্বে অধিক চৌড়া (prognathous), সামনের দাঁত বড় ও সচল আর চিবুক খুব ছোট হইত। বিখ্যাত ফরাসী মানবতত্ত্ববিদ্ কাতরফাজ্ মনে করেন যে, প্রাচীন মানবের চোয়ালটা বাঁদরের মত prognathous হইত, আর তাহাদের রং হলদে এবং চুল লাল হইত।* জর্মান পণ্ডিত হেকেলের মত এই যে আদিম মানব অনেকটা কাফরীদের মত হইত; তাহাদের রং কাল, চুল পশমের মত মোটা ও কোঁকড়ান। এ দুই মতই কিন্তু অনুমান মাত্র।

দ্বিতীয়, প্রাচীন মানবের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা। আমরা যে সময়ের বিষয় আলোচনা করিতেছি, তাহা ঐতিহাসিক কালের অনেক পূর্ব্বে। সেই জন্য বর্ত্তমান বা আধুনিক কোন নরজাতিবিশেষের সম্বন্ধে যেরূপে আমরা জ্ঞান লাভ করিতে পারি, তাহা এস্থলে সম্ভব নহে। পণ্ডিতেরা কেবল অনুমান দ্বারা অতীতের তামসী যবনিকা কিয়ৎ পরিমাণে উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই অনুমানের ভিত্তি দুইটী: প্রথম, প্রাচীন-মানবের রচিত উপকরণাদি; দ্বিতীয়, সেইরূপ অবস্থাপন্ন আধুনিক বন্য বা অসভ্য জাতির আচার ব্যবহার। তাহাদের রচিত দ্রব্য আবার দ্বিবিধ, প্রস্তরাদি নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্র ইত্যাদি, এবং অস্থি কিম্বা শৃঙ্গোপরি খোদিত চিত্রাবলী। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, অতি প্রাচীন মানব শিকারি অবস্থা অতিক্রম করিতে পারে নাই। নানারূপ ভীষণ শ্বাপদের সহিত যুদ্ধ করিয়া মানব তখন কোনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে অতিকায় হস্তী মারিত, গুহা-ভল্লুক মারিত, বৃহৎ হরিণ মারিত; এবং জঞ্জালস্তূপে প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্যের যে সকল অস্থি পাওয়া গিয়াছে, তাহা দর্শনে বোধ হয়, যে, ক্রমশঃ সে নৌকা তৈয়ার করিয়া জলপথেও যাত্রা করিতে শিখিয়াছিল। ইহা কিন্তু পরে হয়। অস্ত্রশস্ত্রের আকৃতি ও গঠনে শিল্পনৈপুণ্যের তারতম্য হইতে বেশ বুঝা যায় যে, যদিও এই পুরাতন মানুষেরা প্রস্তরযুগ অতিক্রম করে নাই (অর্থাৎ পিত্তল লৌহাদির ব্যবহার শিখে নাই), তথাপি তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীর পরে হইয়াছিল, এবং তাহারা তাহাদের কৃত প্রস্তর, অস্থি ও কাষ্ঠনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রের গঠনে অধিক বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পনৈপুণ্যের প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে। প্রাচীন মানবেতিহাসের এই দুই বিভাগকে লর্ড এভ্‌বরি পূর্ব্ব প্রস্তরযুগ এবং উত্তর প্রস্তরযুগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফরাসী পণ্ডিতেরা 'ভাঙ্গা পাথর' ও 'চাঁচা পাথরে'র প্রভেদ করেন। প্রস্তরযুগের এই দুই বিভাগের মধ্যে অনেক কালের ব্যবধান দৃষ্ট হয়। যে গুহাতে দুই রকমেরই অবশেষ পাওয়া গিয়াছে, সেখানে দেখা গিয়াছে যে, ঐ দুই স্তরের মধ্যে এক খুব পুরু প্রস্তরের স্তর বিদ্যমান আছে। এই শেষোক্ত স্তর এত পুরু হইতে সহস্র সহস্র বৎসর লাগিয়া থাকিবে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, পূর্ব্ব প্রস্তরযুগের অন্তে পশ্চিম যুরোপে মানবজাতি উঠিয়া যায়, পরে আবার এসিয়া ও পূর্ব্ব যুরোপহইতে একটু বেশী সভ্য জাতি আসিয়া ফ্রান্স, জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশে এবং ডেনমার্কের সমুদ্রতটে উপনিবেশ স্থাপন করে।

পূর্ব্ব প্রস্তরযুগে মানব পর্ব্বতগুহায়, শৈলতলে বা নদীতটে বাস করিত। শেষোক্ত স্থান, শিকারের সুবিধা হইত বলিয়া, বোধ হয়, মনোনীত হয়। এই যুগের

* *The Human Species*, P. 242.

লোক চাষ করিতে শিখে নাই, গরু প্রভৃতি জন্তু পুষিতে শিখে নাই, মাটীর পাত্র তৈয়ার করিতেও শিখে নাই। হয় অস্ত্র দ্বারা কিম্বা গর্ত্তে ফেলিয়া পশুবধ তাহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। পশুর মাংস হয়ত তাহারা কাঁচা খাইত। কিন্তু তাহাদের অস্ত্র প্রভৃতির সহিত কয়লা ও দগ্ধ প্রস্তরখণ্ড পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রতীতি জন্মে যে, প্রাচীন মানব অগ্নির গুণ একেবারে অনবগত ছিল না। একজন জর্ম্মণ পণ্ডিত * বলিয়াছেন যে মনুষ্যই একমাত্র অগ্নিপ্রজ্বালক জন্তু। অগ্নিই সকল উচ্চ সভ্যতার মূল। অগ্নির সাহায্যে খাদ্যসামগ্রী পাক হয়, অরণ্যানী পরিষ্কৃত হয়, বৃক্ষকাণ্ড হইতে নৌকা (সাল্‌তি) প্রস্তুত হয়, যুদ্ধের জন্য বর্শা তৈয়ার হয়, জলনিবাসের জন্য কাষ্ঠস্তম্ভাগ্র সূক্ষ্ম করা হয়। অগ্নিতে শীতের কষ্ট নিবৃত্ত করে, গৃহমধ্যে আরাম আনিয়া দেয়, অগ্নি দেখিয়া বন্য জন্তু পলায়, অগ্নিসংযোগে লৌহাদি ধাতু নমনশীল হয়। অগ্নি জ্বালিবার উপায় শিখাও শক্ত নহে। আমাদের দেশে আজও হোমের সময় পুরোহিতেরা কাষ্ঠ সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপাদন করেন। প্রাচীন মানবও নিশ্চয়ই সংঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়, এ তথ্য আবিষ্কার করিয়া থাকিবে। নিজের দুখানা হাত ঘসিলেই গরম বোধ করিয়া থাকিবে, আর পাথরে পাথর ঠুকিবার সময় কিম্বা পাথরে গর্ত্ত করিবার চেষ্টায় অথবা বৃক্ষশাখার সংঘর্ষণে অগ্নির আবির্ভাব দেখিয়া থাকিবে। তবে অবশ্য তাহারা আমাদের মত রাঁধিতে শিখে নাই। তাহারা হয় মাংস আগুনে ঝল্‌সাইয়া খাইত, নয় আমেরিকার কোন কোন আধুনিক অসভ্যজাতির ন্যায় জলের মধ্যে তপ্ত প্রস্তর ফেলিয়া জল গরম করিয়া তাহাতে মাংস সিদ্ধ করিয়া লইত। মানববাসের প্রাচীন অবশেষের মধ্যে জন্তুদের লম্বা হাড়গুলি মধ্যদেশে বিদীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে বোধ হয় যে অস্থির মজ্জা প্রাচীন মানবের একটা প্রিয় খাদ্য ছিল। পেরিগর্ডের গুহায় রেন-হরিণের শৃঙ্গ নির্ম্মিত এক রকম চামচ পাওয়া গিয়াছে, যাহা হয়ত হাড়ের ভিতরের শাঁস বাহির করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। কোন কোন গুহায় মানুষের হাড়ও এইরূপ মাঝখানে চেরা কিম্বা পোড়ান পাওয়া গিয়াছে। উহা দৃষ্টে বোধ হয় যে প্রাচীন মানব নরমাংসও ভক্ষণ করিত। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই, কারণ এখনও অনেক অসভ্যজাতিতে তাহা করে। জন্তু মারিয়া প্রাচীন মানবেরা তাহাদের চর্ম্ম আচ্ছাদনের জন্য ব্যবহার করিত। প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা তাহার ভিতর মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত করিত, পরে পেশী বা শিরা পাকাইয়া চর্ম্মখণ্ড সেলাই করিত। ছবি দর্শনে বোধ হয় তাহারা হাতে চামড়ার দস্তানা পরিত। হাড়ের ছুচ পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে প্রাচীন মানব সেলাই করিতে শিখিয়াছিল। হরিণের শিং বোধ হয় জলপানের জন্য ব্যবহৃত হইত। এই শৃঙ্গে নানারূপ চিত্রও তাহারা খোদিত করিতে শিখিয়াছিল। সেই পূর্ব্ব প্রস্তরযুগের মানব হস্তিদন্তেও সুন্দর ছবি আঁকিতে শিখিয়াছিল। একটি অতিকায় হস্তীর এইরূপ হস্তিদন্তে খোদিত চিত্র অনেক পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে লোমপর্য্যন্ত পরিষ্কার চিত্রিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত পশুদন্ত গহনার জন্যও ব্যবহৃত হইত। দন্তের মধ্যে ছিদ্র করিয়া হার তৈয়ার হইত। মানব সকলস্থানেই অলঙ্কার প্রিয়; অসভ্য মানবের ত কথাই নাই। * বস্ত্র পরিধানেরও মূল উদ্দেশ্য শরীরাচ্ছাদন অপেক্ষা শরীরশোভনই বেশী বোধ হয়। সেইজন্য প্রাগৈতিহাসিক গুহায় যদি ছিন্ন দন্তের হার বা কৃষ্ণপ্রস্তরের বোতাম পাওয়া যায়, তাহাহইলে তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। এই সময়ের মানবজীবনের সহিত গ্রীন্‌লণ্ডের এস্কিমো জীবনের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ক্লড্‌ সাহেব জাপানের ইয়েজোদ্বীপবাসী অয়নুজাতির সহিত অতি প্রাচীন মানবের তুলনা করিয়াছেন। †

উত্তরপ্রস্তরযুগে আসিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষ পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র বেশী পরিষ্কার, তাহারা দুই একটা জন্তু পোষ মানাইয়াছে। (সুইট্‌জরলণ্ডের হ্রদবাসীরা বোধ হয় কুকুর, শূকর, গরু, মেষ ও ছাগ পোষ মানাইয়াছিল; ঘোড়াও এই সময়ে

* M. Hoernes, *Primitive Man*, p. 11.

* Ratzel. *History of Mankind*, Vol. I. p 99

† Clodd, *Story of Primitive Man*, p. 71.

পোষ্য জন্তু হইয়া হইয়া পড়ে), তাহারা মৃত্তিকার বাসনও অগ্নিতাপে প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। অধ্যাপক জলি বলেন যে প্রাচীন মানবের মনে বাসন তৈয়ারি করিবার জন্য মৃত্তিকার উপযোগিতা অনেক সামান্য জিনিষ দেখিয়া উদয় হইয়া থাকিতে পারে। যথা উনানে পোড়া বা রৌদ্রে উত্তপ্ত কর্দ্দমপিণ্ড, অথবা ভিজামাটীতে ঘোড়ার খুরের দাগ। * টাইলর সাহেবের মতে লোকে পুরাকালে কাষ্ঠ কিম্বা বেত্রনির্ম্মিত পাত্র অগ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাতে কর্দ্দমপ্রলেপ দিত। হঠাৎ আগুন ধরিয়া গেলে তাহারা দেখিত যে কাষ্ঠ বা বেত নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কর্দ্দমের আবরণ পুড়িয়া বেশ শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহারা কর্দ্দমের পাত্র তৈয়ার করিয়া তাহাকে আগুনে পোড়াইতে শিখিল। † এইরূপে কুম্ভকারের বিদ্যা আবিষ্কৃত হইল। উত্তরপ্রস্তরযুগের লোকেরা, মাটীর পাত্র তৈয়ার করিতে শিখিয়াছিল, নখ বা কাটি দিয়া তাহাতে নানারূপ চিত্রও আঁকিত, কিন্তু কুমারের চাক আবিষ্কৃত করিতে পারে নাই। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মনে করেন, ইহারা ভূমিকর্ষণ করিতেও শিখিয়াছিল। শস্য চূর্ণ করিবার উপযোগী প্রস্তরখণ্ড স্থানে স্থানে পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য যখন লৌহাদি ধাতু আবিষ্কৃত হইল, এবং মানব কৃষিব্যবসায়ী হইয়া সেগুলি ব্যবহার করিতে শিখিল, তখন সে অনেক বর্ত্তমান অসভ্যজাতির সমকক্ষ হইয়া পড়িল। তাহার বিবরণ প্রাচীনমানববিষয়ক প্রবন্ধে লিখিবার প্রয়োজন নাই।

প্রস্তরযুগবাসী মানবের মনোবৃত্তি সমুচ্চয়ের বিষয় আমরা বড় কিছু জানিনা। আধুনিক অসভ্য জাতিদের দেখিয়া তাহাদের মানসিক বিকাশ বা সামাজিক নীতি ও আচার সংস্কারের সম্বন্ধে কিছু অনুমান করিতে পারি মাত্র। এটা নিশ্চয় যে সেই পুরাতন মানুষের মনোবৃত্তি সকল উগ্র ছিল, তাহার ইন্দ্রিয় সকল বশে ছিল না। Cromagnonএ একটা স্ত্রী-কপাল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে একটা মস্ত ছিদ্র; কোন কঠিন অস্ত্রাঘাতে হইয়া থাকিবে। প্রাচীন মানবের মানসিক বিকাশ, ছোট শিশুর যাহা হয়, তাহা অপেক্ষা বোধ হয় বেশী হয় নাই, কারণ সেকাল নরজীবনের বাল্যাবস্থা। তবে তাহাকে আপন বুদ্ধিবলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইত বলিয়া চতুর সে নিশ্চয়ই হইত। ফরাসী পণ্ডিত লার্তে (যিনি প্রাচীন নরকে, শতবর্ষ পূর্ব্বে সাইবিরিয়া নিবাসী চুক্‌চী জাতির সহিত তুলনা করিয়াছেন) বলেন, সেই পুরাকালে মানব কতকটা সমাজ গঠনও করিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস যে সরন্ধ্র যে হরিণশৃঙ্গ সকল পাওয়া গিয়াছে, সে গুলি তৎকালে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির পদসূচক দণ্ডস্বরূপে (wands of office) ব্যবহৃত হইত। ইহা খুবই সম্ভব যে অতি প্রাচীন মানব নিজের বউটী ছেলেটী ব্যতিরেকে অন্য কাহারও ভাবনা ভাবিত না, বরং হয়ত শত্রুময় দেখিত। কিন্তু সমাজ সর্ব্বত্রই পরিবাররূপ ভিত্তির উপর গঠিত হইয়াছে।

পণ্ডিতেরা বলেন কোন মানব একেবারে ধর্ম্মভাবহীন হয় না। কিন্তু এই অতি প্রাচীন কালে মানব তাহার সাথীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিরূপে সম্পাদন করিত, তাহা পর্য্যন্ত আমরা জানি না। জানিলে হয়ত তাহাদের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু অনুমান করিতে পারিতাম। উত্তর প্রস্তরযুগে মৃতদেহ দাহ করা হইত, কিম্বা গুহা বা প্রস্তরস্তূপের নীচে নিক্ষেপ করা হইত। মৃত দেহকে শোয়াইয়া কিম্বা বসাইয়া রাখা হইত, এবং তাহার ব্যবহারের দ্রব্যসকল তাহার পাশে রাখিয়া দেওয়া হইত। হয়ত সমাধিস্থলে নরবলিও হইত। এতদ্দর্শনে বোধ হয় যে তখন এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যে, মানুষ মরিলেই সব ফুরায় না, তাহার পরলোকবাসের জন্য আয়োজন করা প্রয়োজন। এ জীবনের পর আর এক জীবন আছে। প্রস্তরচৈত্যের যে উল্লেখ করিলাম, এ প্রথা এখনও উঠিয়া যায় নাই। ইহা নানাপ্রকারের হয়—শুধু একখানি উচ্চ প্রস্তর (menhir) হইতে পারে, কিম্বা ৪ খানা প্রস্তরের উপর একখানি সংস্থাপিত (dolmen) হইতে পারে, কিম্বা বহুপ্রস্তরবেষ্টিত একটি বৃত্তাকার সমাধি (cromlech) নির্ম্মিত হইতে পারে। ভারতবর্ষে সব রকমই দেখিতে পাওয়া যায়। আসামপ্রদেশে খাসিয়ারা এখনও সমাধি প্রস্তর স্থাপন করিয়া মৃতের সংকার করে। বিলাতের Stonehengeএর কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। দক্ষিণ

* Joly, *Man before Metals*, p. 310.

† Tylor, *Anthropology*, p. 274.

ভারতবর্ষে ঐরূপ একটী প্রস্তরপরিবৃত সমাধি আছে; তাহার চিত্র লর্ড এভ্‌বরি তাঁহার "Origin of Civilisation" পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে যে, যদিও প্রাচীন মানব আমাদের অপেক্ষা সভ্যতার অনেক নিম্নতরস্তরে অবস্থিত ছিল, তথাপি সে যে দেহ ও বুদ্ধি-বৃত্তি, সকল বিষয়েই নরপদবাচ্য ছিল, তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাদ্‌শাহী আখ্যানমালা।

পারস্যের অধিপতি প্রথম শাহ্‌ আব্বাস্‌ একজন কীর্ত্তিমান্‌ রাজা ছিলেন। কথিত আছে, প্রশংসাসূচক "শাবাস্‌" কথাটি তাঁহারই নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই শাহ্‌ আব্বাস্‌ মোগল সম্রাট শাহ্‌ জাহানের দরবারে একজন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। পারস্য রাজদূত এবং শাহ্‌ জাহানের পরস্পর ব্যবহার সম্বন্ধে ফরাসী পর্য্যটক বের্ণিয়ে নিম্নলিখিত আখ্যানগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ আখ্যানের সাহায্যে আমরা পুরাকালের ইতিহাসের উজ্জ্বল জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিতে পারি।

মোগল দরবারে রাজদূতগণকে মাথা নোয়াইয়া ক্রমান্বয়ে কপালে ও মাটীতে হাত রাখিয়া সম্রাটকে তিনবার সেলাম করিতে হইত। পারস্যদূত ঔদ্ধত্যবশতঃ এইরূপ সেলাম করিতে রাজী না হওয়ায়, শাহ্‌ জাহান তাঁহাকে তর্কযুক্তি ও নরম কথায় এই প্রকারে সেলাম করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন; কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ায় পরিশেষে এই কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি আমখাসে প্রবেশ করিবার সিংহদ্বার বন্ধ করিয়া কেবল তন্মধ্যস্থ ক্ষুদ্র দ্বার (wicket) খুলিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন। এই ক্ষুদ্র দ্বারটি এত নীচু ছিল যে, তাহার ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে, দরবারী রীতি অনুসারে সেলাম করিবার সময় যতটা মাথা নোয়াইতে হয়, তদপেক্ষা অধিক মাথা নোয়ান ভিন্ন উপায় ছিল না। শাহ্‌ জাহান ভাবিয়াছিলেন যে, আমখাসে আসিবার সময় পারস্যদূতকে অগত্যা মাথা নোয়াইতে হইবে। সুতরাং তিনি পরে ইহা বলিবার সুযোগ পাইবেন যে, দরবারের রীতি অনুসারে সেলাম করিতে হইলে যতটা মাথা নোয়াইতে হয়, দূত তাঁহার হুজুরে হাজির হইবার সময় তদপেক্ষাও অধিক মাথা নোয়াইয়াছিলেন। কিন্তু গর্ব্বিত সুচতুর পারস্যদূত সম্রাটের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহার দিকে পেছন ফিরাইয়া ক্ষুদ্রদ্বারে প্রবেশ করিলেন। শাহ্‌ জাহান নিজ কৌশল ব্যর্থ হইল দেখিয়া সরোষে কহিলেন, "আঃ বদ্‌ বকৃত্‌ [হতভাগা]! তুই কি মনে করিয়াছিলি, তুই তোর মত গাধাদের আস্তাবলে ঢুকিতেছিস্‌?" পারস্যদূত বলিলেন, "হাঁ, আমি তাহাই মনে করিয়াছিলাম। এরূপ দ্বার দিয়া ঢুকিতে হইলে, গাধা ভিন্ন আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি বলিয়া কে মনে করিতে পারে?"

অন্য এক সময় শাহ্‌ জাহান দূতের কোন অশিষ্ট উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন:—"আঃ বদ্‌ বকৃত্‌! শাহ্‌ আব্বাসের দরবারে কোন ভদ্রলোক নাই কি, যে তিনি এরূপ একজন আহাম্মককে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন?" দূত উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমার বাদ্‌শাহের দরবার আমা অপেক্ষা বহুগুণে শিষ্ট ও নানাবিদ্যায় পারদর্শী লোকে পূর্ণ; কিন্তু শাহ্‌ আব্বাস্‌, যেরূপ রাজা, তাহার উপযুক্ত দূত প্রেরণ করেন।"

একদিন শাহ্‌ জাহান দূতকে আহারে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে অপ্রতিভ ও বিরক্ত করিবার জন্য একটা ছুতো খুঁজিতেছিলেন। দূতকে অনেকগুলা হাড় হইতে মাংস চাঁচিয়া পুঁছিয়া খাইতে দেখিয়া শাহ্‌ জাহান বলিলেন, "এল্‌চী জী (দূত মহাশয়), কুকুরের জন্য কিছু রাখ্‌বেন না দেখ্‌চি; তারা কি খাবে?" দূত তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "খিচুড়ী।" শাহ্‌ জাহান তখন তাঁহার প্রিয় খাদ্য খিচুড়ী ভোজনে ব্যাপৃত ছিলেন!

শাহ্‌ জাহান একদিন দূতকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি পারস্য-রাজধানী ইস্পাহানের তুলনায়, তৎকালে যে নূতন দিল্লী সম্রাটের আদেশে নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহার বিষয়ে কি মনে করেন। দূত বলিলেন, "বিল্লা, বিল্লা (আল্লার দিব্য)! আপনার দিল্লীর ধূলার সহিত

ইস্পাহানের তুলনা হয় না।" সম্রাট ভাবিলেন যে, দূত ভারী প্রশংসা করিল ; কিন্তু বস্তুতঃ দূত দিল্লীর অসহ্য ধূলার উল্লেখ করিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন।

মোগল সম্রাট একদিন খুব জেদ করিয়া দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হিন্দুস্থান ও পারস্যের সম্রাটের মধ্যে কাহার ক্ষমতা অধিক ? দূত উত্তর করিলেন, "ভারতবর্ষের রাজা পূর্ণিমার চন্দ্রের মত ; পারস্যের রাজা শুক্লা দ্বিতীয়া বা তৃতীয়ার চন্দ্রের সদৃশ।" এই উত্তরে সম্রাট বড় খুসী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, দূতের কথার গূঢ় অর্থ এই যে, পূর্ণিমার চাঁদ ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে, কিন্তু শুক্লা দ্বিতীয়া তৃতীয়ার চাঁদ বাড়িতে থাকে, তখন বড় ক্ষুব্ধ হইলেন।

শাহ্ জাহানের সম্বন্ধে বের্ণিয়ে আরও অনেকগুলি আখ্যান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এখানে আমরা দুইটির উল্লেখ করিব। তৎকালে সম্রাটের কোন কর্ম্মচারীর মৃত্যু হইলে সম্রাট আপনাকে তাহার উত্তরাধিকারী জ্ঞান করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেন। নেকনাম্ খাঁ শাহ্ জাহানের একজন প্রসিদ্ধ উমরা ছিলেন এবং চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর নানা উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ঘৃণিত প্রথাটির জন্য অনেক প্রধান প্রধান উমরা বিধবা পত্নীরা একেবারে নিঃসম্বল ও সহায়হীন হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের পুত্রগণ অন্য কোন উমরার অধীনে সামান্য সিপাহীর পদগ্রহণ করিতে বাধ্য হন বলিয়া, নেকনাম্ খাঁ উহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি নিজ মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া আপনার সমুদয় ধন গোপনে দুঃখিনী বিধবা প্রভৃতিকে বিলাইয়া দিলেন। তাহার পর সমুদয় সিন্দুক পুরাতন লোহা, হাড়, ছেঁড়া জুতা ও ন্যাকড়ায় পূর্ণ করিলেন। তদনন্তর সিন্দুকগুলিতে চাবী দিয়া মোহর করিয়া বলিলেন, "এই গুলির মধ্যস্থ সম্পত্তির একমাত্র মালিক বাদশাহ।'' নেকনাম্ খাঁর মৃত্যুর পর সেগুলি সম্রাটের নিকট নীত হইল। তিনি তখন দরবারে ছিলেন, এবং লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সমুদয় উমরার সম্মুখেই সিন্দুকগুলি খুলিতে হুকুম দিলেন। তাঁহার নৈরাশ্য ও বিরক্তি অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে; তিনি হঠাৎ সিংহাসন হইতে উঠিয়া দরবারকক্ষ হইতে চলিয়া গেলেন।

শাহ্ জাহানের রাজত্বকালে রাজসরকারে নিযুক্ত একজন ধনী বেনিয়ার মৃত্যু হয়। সে বড় সুদখোর ছিল। তাহার মৃত্যুর পর তাহার অমিতব্যয়ী ও দুশ্চরিত্র পুত্র তাহার সঞ্চিত ধনের কিয়দংশ নিজ মাতার নিকট চাহিল। মাতা দিতে না চাওয়ায় সে শাহ্ জাহানকে গিয়া নিজ পিতৃত্যক্ত বিষয়ের প্রকৃত পরিমাণ (প্রায় ৫ লক্ষ টাকা) বলিয়া দিল। সম্রাট তখনই বৃদ্ধা মহিলাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং দরবারস্থ সমুদয় উমরার সম্মুখে তাঁহাকে বলিলেন, "আমাকে এখনই এক লক্ষ টাকা পাঠাইয়া দাও এবং তোমার ছেলেকে পঞ্চাশ হাজার দাও।" এই কড়া হুকুম জারি করিয়া তিনি ভৃত্যবর্গকে বৃদ্ধাকে দরবারগৃহ হইতে বাহির করিয়া দিতে বলিলেন। এই প্রকার আকস্মিক হুকুমে বিস্মিত হইয়া, এবং পুত্রকে কেন টাকা দেন নাই তাহা বলিবার সুযোগ না পাইয়া রূঢ়তার সহিত দরবার হইতে নিষ্কাশিত হওয়ায় অপমানিত বোধ করিয়াও সাহসিনী বৃদ্ধা নিজ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হারান নাই। তিনি ভৃত্যদের সহিত যুঝাযুঝি করিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন যে, সম্রাটের নিকট তাঁহার আরও কিছু গোপনীয় কথা প্রকাশ করিবার আছে। সম্রাট শুনিতে পাইয়া বলিলেন, "উহার কি বলিবার আছে, বলিতে দাও।" বৃদ্ধা বলিলেন, "ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন ! আমার পুত্র যে তাহার পিতার সম্পত্তিতে দাবী করিতেছে, তাহা বোধ হয় অকারণ নহে। কেন না সে আমাদের পুত্র, এবং সুতরাং আমাদের উত্তরাধিকারী। কিন্তু আমি দীনভাবে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি যে, আমার মৃত স্বামী ও আপনার মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল যে আপনি এক লক্ষ টাকা চাহিতেছেন।" সম্রাট এই কথা শুনিয়া এত খুসি হইলেন যে হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি হুকুম দিলেন যে বিধবা যেন তাহার স্বামীর সম্পত্তি নিরুপদ্রবে ভোগ করিতে পান।

ফর্গুসন সাহেব স্বীয় স্থাপত্যসম্বন্ধীয় সচিত্র পুস্তকের একস্থানে দাক্ষিণাত্যের রোজা নামক স্থানে সম্রাট আওরংজেবের সমাধিমন্দিরের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন।—

"Strange to say, the sacred Tulsee tree of the Hindus has taken root in a crevice of the brickwork and is flourishing there, as if in derision of the most bigoted persecutor the Hindus ever experienced. (p. 439, Ed. 1855),

ইহার তাৎপর্য্য এই,—"আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহার ইঁটের গাঁথুনীর ফাটালে, যেন হিন্দুদের ঘোরতম নির্য্যাতকের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনার্থ ই, তাহাদের পবিত্র তুলসী গাছ শিকড় গাড়িয়াছে, এবং সতেজে বৃদ্ধি পাইতেছে।" আমরা কিন্তু ইহার অন্তবিধ রূপক অর্থ কল্পনা করিতে ভাল বাসি। আমরা বলি, এখন হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষ ভুলিয়া যাইবার সময় আসিয়াছে। আওরঙ্গজেবের মত হিন্দুপীড়কের সমাধি-মন্দিরে তুলসীবৃক্ষের নৈসর্গিক জন্ম আমরা হিন্দু মুসলমানের পরস্পর সদ্ব্যবহারের পূর্ব্বাভাস বলিয়া কল্পনা করিতে পারিলে সুখী হই। আওরঙ্গজেবের অনেক দোষ থাকিলেও তিনি নানা রাজোচিতগুণে ভূষিত ছিলেন। সেইগুলি বুঝিবার এখন সময় আসিয়াছে। একবার তাঁহার একজন প্রধান উমরা তাঁহার সাক্ষাতে এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, অবিরাম পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য, এবং হয়ত মানসিক বল নষ্ট হইতে পারে। সম্রাট যেন এই উমরার কথা শুনেন নাই এইরূপ ভাণ করিয়া আর একজন উমরার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন—

"আপনাদের মত বিদ্বান্ লোকদের মধ্যে, বিপদ আপদের সময় রাজার কর্ত্তব্য বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। সে সময়ে নিজ যত্নাধীন প্রজাবর্গের রক্ষার জন্য প্রাণপণ করা, এমন কি তরবারি হস্তে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করা রাজার কর্ত্তব্য। তথাপি এই সাধুমহোদয় আমাকে বুঝাইতে চান, যে সাধারণের হিতের জন্য আমার কোন আগ্রহ বা উদ্বেগ হওয়া উচিত নয়, তদর্থে উপায় উদ্ভাবন জন্য আমার একটি রাত্রিতেও বিনিদ্র হওয়া উচিত নয়, এবং কোন নীচ ইন্দ্রিয়সুখ হইতে একদিনের জন্যও অবসর লওয়া উচিত নয়। তাঁহার মতে, কিসে শারীরিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে, এবং প্রধানতঃ কি প্রকারে আমার আয়েস ও সুখভোগ বৃদ্ধি হয়, তচ্চিন্তা দ্বারাই আমার চালিত হওয়া উচিত। নিঃসন্দেহ তিনি চান যে আমি কোন উজীরকে এই বিশাল সাম্রাজ্যশাসনের ভার ছাড়িয়া দিই। তিনি বোধ হয় বিবেচনা করিতেছেন না যে আমি রাজার পুত্র হইয়া জন্মিয়াছি; এবং সিংহাসনের উপর স্থাপিত হইয়াছি। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে বিধাতা আমাকে সংসারে পাঠাইয়াছেন, নিজের জন্য জীবনধারণ ও পরিশ্রম করিবার নিমিত্ত নহে, পরন্তু অপরের জন্য; বুঝিতে হইবে যে, আমার সুখ যে পরিমাণে আমার প্রজাদের সুখের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, কেবল সেই পরিমাণেই তদ্বিষয়ে আমার চিন্তা করা উচিত। প্রজাদের সমৃদ্ধি ও শান্তিসুখ ভোগ কিসে ঘটিতে পারে, তাহার উপায় চিন্তা করা আমার কর্ত্তব্য। কেবল মাত্র রাষ্ট্ররক্ষা, রাজার প্রভুত্ব রক্ষা, এবং ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্তই প্রজাদের সমৃদ্ধি ও শান্তি বলিদান করা যাইতে পারে। এই লোকটা যেরূপ জড়তার সমর্থন করিতেছে, তাহার কুফল দেখিতে পাইতেছে না, অন্যের উপর ন্যস্ত ক্ষমতার কুফল বিষয়ে সে অজ্ঞ। আমাদের মহাকবি সাদি অকারণে বলেন নাই, 'হে রাজগণ; রাজপদ ত্যাগ কর, ত্যাগ কর, যদি তোমরা নিজেদের রাজ্য নিজেই শাসন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না থাক।' যান, আপনার বন্ধুকে বলুন, যে, যদি তিনি আমার প্রশংসা চান, তাহা হইলে তাঁহার উপর যে কাজের ভার দেওয়া হইয়াছে, তাহা যেন ভাল করিয়া করেন; কিন্তু সাবধান, তিনি যেন আর কখনও রাজার গ্রহণের সম্পূর্ণ অনুপযোগী এরূপ পরামর্শ আমাকে অযাচিত ভাবে না দেন। হায়, স্বভাবতই আমাদের আরাম ও ইন্দ্রিয়সুখ অন্বেষণের প্রবৃত্তি যথেষ্ট আছে; এরূপ উপযাচক পরামর্শদাতার প্রয়োজন নাই। আমাদের পত্নীরাও বিলাস ও আরামের কুসুমসমাচ্ছন্ন পথে বিচরণ করিতে নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করিবেন।"

বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালা অভিধান।

আজি কালি ভাষাতত্ত্ব লইয়া যেরূপ আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে মনে হয়, বঙ্গভাষার নিখুঁত জন্মকোষ্ঠী এইবার প্রস্তুত হইবে। এমন কি অনেকে বঙ্গভাষার সূতিকাগারের পর্য্যন্ত সন্ধান দিতেছেন। তাঁহাদের কথায় এরূপ বুঝায় যে, কোন সময়ে কতকগুলি বাঙ্গালী মিলিত হইয়া পরামর্শমত যেন সংস্কৃত ভাষাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বঙ্গভাষায় সৃষ্টি করিয়াছেন! ঠিক এই কথাগুলি স্পষ্টাক্ষরে না লিখিলেও তাঁহারা এমন মন্তব্য প্রকাশ করেন, এবং এমন সকল উদাহরণ প্রদান করেন যে, বোধ হয় যেন তাঁহারা উহাই বলিতে চাহেন। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা ভারতীয় চলিত ভাষাগুলির অন্যতম। সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার যে সম্বন্ধ, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী, পার্ব্বতীয়, পঞ্জাবী প্রভৃতি বহুসংখ্যক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতির চলিত ভাষার সেই সম্বন্ধ। সকলগুলিই সংস্কৃতবহুল। তবে কি ঐগুলি মৃত ভাষাটির ভস্মরাশি হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে? যেন তাহাই হইল, সংস্কৃতই যেন এগুলির জননী। কিন্তু ভারতে কি আদি কাল হইতে কেবল নিছক আর্য্যজাতির বাস; অনার্য্য বলিয়া, আদিমনিবাসী বলিয়া কোন জাতি ছিল না? তাহাদের কি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা ছিল না? না, তাহারা তাহাদের ভাষার সহিত সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে? আমাদের বিশ্বাস আর্য্য অনার্য্যের সংমিশ্রণে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালার ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছে মাত্র। আমরা মুসলমানের রাজত্বকালে রাজপুরুষদিগের সহিত যত মিশিতে পারিয়াছিলাম, ইংরাজশাসনে রাজপুরুষগণের সহিত তত মিশিতে পারিতেছি না। এই অল্পকালের মধ্যে এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের ব্যবধান সত্ত্বেও অনেক ইংরাজি শব্দ বঙ্গভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে; এবং অপেক্ষাকৃত অধিককালব্যাপী মুসলমানশাসনে শত শত আরবী পারসী শব্দ বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছে। এই হিসাবে বঙ্গভাষা যে সংস্কৃত ভাষার বিশাল উদরে ডুবিয়া যায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য! যুগযুগান্তরব্যাপী আর্য্যসংস্পর্শে ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন আদিম বা মূল ভাষাগুলি যে সংস্কৃতবহুল হইয়া উঠিবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? এই সূত্রে আমাদের মনে আর একটা সন্দেহের উদয় হয়, এবং সেই সন্দেহ হইতে যেন বাঙ্গালা হিন্দী প্রভৃতি চলিত ভাষার স্বাতন্ত্র্যের অন্য প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে সন্দেহের মূল্য যতটুকু, ইহাকে আমরা ততটুকুই দিতে চাই। সন্দেহটি এই যে, হয়ত সংস্কৃত ভারতে কখনই সাধারণের কথিত সুতরাং জীবন্ত ভাষা ছিল না। পূর্ব্বে যেন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় থাকিয়া এক্ষণে মৃত ভাষায় পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সে সংস্কৃতে কথোপকথন, হাস্যকৌতুক, বিবাদবিসম্বাদ, সুখদুঃখজ্ঞাপন করিত না—চিঠিপত্র লিখিত না। মান্ধাতার আমলে কি ছিল কে জানে। কিন্তু প্রাচীন আর্য্যলেখকবর্গের কাব্যনাটকাদিতে স্ত্রীলোক বালক এবং সামান্য জনগণে প্রাকৃত পৈশাচিক প্রভৃতি অপভাষায় কথা কহিতেছে দেখা যায়, আর রাজা পাণ্ডিত প্রভৃতি সুশিক্ষিতগণের ভাষা সংস্কৃত। সহজ বুদ্ধিতে বলে সাধারণের সহিত বাক্যালাপ করিতে, বালক ও স্ত্রীলোকদিগকে বুঝাইতে সুধীগণেরও অপভাষা প্রয়োগের আবশ্যক হইত। এবং সংস্কৃত যে সাধারণের কথিত ভাষা ছিল, ইহা বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শন না করিয়া বলা যায় না। সংস্কৃতের আবার অন্য নাম দেবভাষা। দেবতার ভাষা যাহার তাহার মুখ দিয়া অনর্গল বাহির হওয়া ত সোজা কথা নহে! সেই জন্যই মনে হয় এই দেবভাষা—বহুকাল হইতে গ্রন্থগত হইয়া কল্পতরুর ন্যায় সমুন্নত শিরে সকলের পূজ্য হইয়া অবস্থান করিতেছেন। আর বাঙ্গালা, হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ভাষাগুলি তাহার লাগাল না পাইয়া কল্পতরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সাধ্য ও আবশ্যক মত পত্র পুষ্প ফল আহরণ করিয়া নিজ নিজ অঙ্গ পুষ্ট করিতেছে মাত্র। সংস্কৃতকে শ্রুতিমধুর জননী আখ্যা না দিয়া বঙ্গভাষার পূজনীয়া ধাত্রী বলিলে অধিক সঙ্গত বোধ হয়। আমরা বলি, ভারতীয় ভিন্ন ভিন্ন চলিত ভাষার ন্যায় বঙ্গভাষা সংস্কৃতবহুল বিবিধ বৈদেশিকশব্দপুষ্ট একটী মূলভাষা। খাস আর্য্যাবর্ত্তে তাহার জন্ম হয় নাই, বঙ্গদেশেই তাহার জন্ম হইয়াছে। বঙ্গভাষার জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় ভুলবিশ্বাসের জন্যই হউক আর দেবভাষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ বশতঃই হউক

বাঙ্গালীর প্রণীত খাঁটি বাঙ্গালা অভিধান এ পর্য্যন্ত একখানিও দেখা গেল না। বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করিবার উপযুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর এক্ষণে অভাব নাই; বর্ত্তমানে ভাষারও দৈন্য অনেকটা ঘুচিয়া গিয়াছে। এই পরিভাষার যুগে যে অভাবটুকু ছিল, তাহাও দূর হইতে চলিল। যে সকল শব্দ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং সাময়িকপত্রে ও পুস্তকের পৃষ্ঠায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে, তৎসমুদয় এবং তদ্ব্যতীত, রুচিসঙ্গত জীবন্তভাব-বোধক শত শত শব্দ, ভাষায় যাহার ব্যবহার আছে, কিন্তু গ্রন্থগত হয় নাই, সে সমুদয় অভিধানে স্থান পাইল না অথচ কোন কোন অভিধানের সংস্করণের পর সংস্করণ বাহির হইয়া গেল! আমাদের লিখিত এবং কথিত ভাষায় যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে, ইহাও তাহার অন্যতম কারণ। সকল জাতিরই লিখিত এবং কথিত ভাষায় প্রভেদ আছে এবং সকল জাতির অভিধানই পাঁচ ফুলে সাজী, কিন্তু বাঙ্গলার ন্যায় এমন সৃষ্টিছাড়া বৈষম্য অন্যত্র বিরল। রীতি, শব্দ এবং ভাববৈচিত্র্যই ভাষার ঐশ্বর্য্য। অধিক বাঁধাবাঁধিতে ভাষা পঙ্গু হইয়া পড়ে। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ বর্জ্জন করিয়া কেবল সংস্কৃত শব্দে ভাষার কলেবর পুষ্ট করিলে তাহার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইবে না। প্রকৃতিবাদ, শব্দদিধীতি, শব্দাম্বুধি, প্রকৃতি বিবেক প্রভৃতি অভিধান বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে; কিন্তু ইহারা সংস্কৃত-বাঙ্গালা অভিধানের নামান্তর মাত্র। বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত বাচস্পত্য বা শব্দকল্পদ্রুম থাকিলে ঐ গুলির তত প্রয়োজন হয় না। বাঙ্গালা অভিধানে সংস্কৃত শব্দ থাকিবে না, এ কথা আমরা বলি না। বরং অধিকন্তু, অত্র, সম্যক্‌, বশতঃ, ফলতঃ, স্বতঃ, পরতঃ, ভূয়ঃ, ইতস্ততঃ, স্বয়ং, সুতরাং, বহুধা, শতধা, বহুল, আদৌ, ইতি, ইত্যাদি, এবং প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে ব্যবহৃত অথ, অথকিং, অলমিতি প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা অভিধানে স্থান না পাইলে অভিধান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। কারণ এ শব্দ গুলির ব্যবহার আছে। ইংরাজীতে খাঁটি বাঙ্গালার মত খাঁটি স্যাক্সন ব্যতীত অনেক লাটিন, ফরাসী, জর্ম্মন আদি শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে দোষ হয় না। ইংরাজী সাহিত্যে তাহাদের বহুল প্রচলন আছে। বাঙ্গালা অভিধান সম্বন্ধে একথা খাটে না। "অবহিত্থ," "অভিক্ষ্যা," "অর্জ্জুকা," "অতিবেল" "অবিতথ," "এতাবান," "জরী," "এধিত," "মিথ," "নন্দথু," "কিমু," "কিমুত," "কথমপি," "কদা," "এতর্হি," "দোগ্ধা," "দেহভৃৎ," "বিধ্বক," "সমন্তাৎ," "বৃংহ" প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ বঙ্গভাষায় কস্মিন্‌ কালেও ব্যবহৃত হয় না, অথচ অভিধানে স্থান পাইয়াছে; এবং তাহাদের প্রয়োগস্থল স্বরূপ সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা হইতে পংক্তিবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া বাঙ্গালা শব্দের প্রয়োগ প্রদর্শন বিশ্বকোষে দেখা গেল। কিন্তু বিশ্বকোষ প্রস্তাবিত অভিধানশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে। কোন প্রকারে অভিধানের কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া অনাবশ্যক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের পরিবর্ত্তে নিত্যব্যবহৃত শব্দ সকল অভিধানভুক্ত করিলে বাঙ্গালা শব্দশাস্ত্র পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে, সাধারণেরও কাজে লাগিবে। হালি, হায়া, হক, রগ, রদ, মগজ, কয়েদ, কবুল, উশুল, মাশুল, তলপ, সরফরাজী, আমানত প্রভৃতিকে 'যাবনিক' শব্দ বলিয়া অগ্রাহ্য না করিয়া তাহাদের প্রয়োগ দেখাইবার জন্য আদালতের কাগজ পত্র, প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ এবং আইন কানুনের অনুবাদ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত উদাহরণ অভিধান সকলে সন্নিবিষ্ট করা আবশ্যক।

উজন, উঠন, উটন, উড়কুড়, ঘর, ঘুম, চক, ভুঁই, ভুল, মই, মোট, মোটা, যেখান, যো, হেলা, হঠাৎ, লতান, কটকিনা প্রভৃতি প্রকৃতিবাদে আছে। তবে দেশজ বলিয়া এক আধটি প্রতিশব্দ এবং কচিৎ কোনটির উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াই অভিধানকার ক্ষান্ত হইয়াছেন। ঐ গুলির উৎপত্তি নির্ণয়, এবং উহারা কোন কোন অর্থে প্রযুক্ত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদান করা আবশ্যক। সেইরূপ ——

টনকনড়া, ঠাউরে পড়া, ধুকড়িঝাড়া, হ্যাপায়পড়া, ঠোকরঝাড়া, ফেকোপাড়া, হাসিলকরা, ডঙ্কামারা, চানকে লওয়া, বর্গমানা, ঠগবাছা, হাই বোঝা, খাই বোঝা, লম্বা দেওয়া, পাড়িমারা, ওতপাতা, চাপুগোনা, গলায় গাঁথা, ঘরকরা, কল্লাকরা, জলকরা, ছোঁ দেওয়া, বিষঝাড়া, নাকে কাঁদা, মাথা খাওয়া, চক্ষু বুজা, পটল তোলা, পথে বসা, পাকওঠা, এঁড়েলাগা, পেঁকেবসা, পাপা তোলা, ঘাড়ে পেলা, ঘুঘু দেখা, আঁতকেউঠা, ঝকি পোয়ান, তাক্‌ লাগান, কাণ ভাঙ্গান, ছায়া মাড়ান, পথ্যরে পড়া, ডওয়াডঙ্গি করা, ডুমুরফুল হওয়া, সরিষা বা ধুতুরা ফুল দেখা;

বেচাপটে, হাত্তেনথে ল্যাজে-গোবরে, রেথে-ঢেকে, জোয়ে-জায়ে, টেনে-বুনে, ঠারে-ঠোরে, শটে পটে, আধ-কামাবে, হাতে-হেতুড়ে, ডানপিটে, নেড়ুড়ে, ঘুমকাতুরে, হকচকিয়ে, ভয়তরাসে উচুনিদ কুড়ে, হবধুরে, পাকজেড়ে, টেংরাগেঁটে, আকালকেঁড়ে, ভদরকুঁড়ে, মিচকে-পোড়া, নোলাদাগা, হাবলা, এঁয়েঞ্চাকড়া, স্থালনেলে, মুখচোরা, কথা বেচড়া, বুড়োহাবড়া, জড়ভরত, হবুথবু, চাঙ্গাহটকা, উঁতেকর্ত্তালে, দিকধাড়িড়ি, গদাইনস্করি, মোটুসকি, ঢেঁটেঁটেংরা, ডোকলা, শাঁকের করাত, চকরাকাণা, ধামধুম্বো, স্যাড়া স্যাতাজোবড়া, খানপুটে, মারকুটে, গালকুটে, ইসিকুটে, হিংসকুটে, তিতকুটে, বিষবটে ;

ধুলধাকড়ি, সইস্যাঙাতি, ডলডবানি, ধুকপুকুনি, টুগবুগুনি, রাতবিরাত, মামার ভাত, ডপরচাল, হদ্দমুদ্দো, উড়োভাষা, নাকপঁচাণী, পোকাবাচুনি, মুখকামটা, দাঁতেরবাড়ি, শেয়ালমুরুব্বি, স্যাড়াগিন্নি, মামদোবাজী, পুনুকেশরু, হড়মাকড়মা, ধিঙ্গিরপদ, ব্রহ্মভাঙ্গা, শক্তঘসি, কিরখুঁটি, খিরকুচ, তুলকালাম, জোনাগুতি, সন্ধান-সলুক, কানাঘুষা, কয়ের গোড়া, হরির গুড়া, নাস্তানাবুদ, ধস্তাধস্তি, সাঁপুড়ি, সাদালুতি, ভাঙ্গাঢোল, আবাথাবা, থাতামুতো, তাগবাগ, হাকডাক, টুমটাম, আড়াআড়ি, মাথাঝাড়া, উপলেম্পর, উত্তমমধ্যম, গোটমণ্ডল, কেওকেটা, টালমাটাল, হাবুডুবু, সরাসরি, খরহরি, মথবিরা, ডেও চাকনা, বাসদেবী, গন্তিগরাস, হিমসীম, ঘাঁতগোঁত, ডগমগ, সগবগ, ইস্পিস্, আনচান্, হালচালু, ভ্যাবাচাকা, কসকসানি, আকুলিবিকুলি, ডমুঝুমু, নকড়া ছকড়া, তুলারাম-খেলারাম, অন্ধি-সন্ধি, টো-টো, হেঁ-চে, রৈ রৈ, হা—মা—কা, তা—না—না—না, দা দা দে দৈ, ঢাক-ঢাক-গুড় গুড় ;

প্রভৃতির অর্থ ও প্রয়োগ অভিধানে থাকা চাই। বিশ্বকোষে অনেকগুলির আছে।

এক শ্রেণীর শব্দ আছে যাহাদের সংস্কৃত অর্থ অভিধানে পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলি বাঙ্গলায় কোন অর্থে প্রযুক্ত, তাহা নাই। যথা

অভিধানে "ত" অর্থে—চৌ, বৃষ, অমৃত, পুচ্ছ, পুণ্য ;

"গো" অর্থে—বৃষ, চন্দ্র, সূর্য্য, স্বর্গ, দৃষ্টি, বাণ, জল, কেশ, কিরণ, বজ্র, ধেনু, বাক্য, বাগীশ্বরী, পৃথিবী ; প্রভৃতি আছে।

কিন্তু "তাই ত", "না গেলে ত হবে না", "তুমি কে গো", "না গো না", "মা গো !" ইত্যাদির "ত" ও "গো"র অর্থ নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, বাঙ্গলা অভিধান সম্বন্ধে কি কি আবশ্যক।

(১) যাহা বাঙ্গলা নহে এবং কস্মিন্‌কালে বাঙ্গলায় যাহার ব্যবহার হয় না, তাহা বর্জ্জন করা।

(২) যে সকল শব্দ দলিলদস্তাবেজ, সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদিতে পাওয়া যায়, অথচ অভিধানে নাই, সে সকল অভিধানভুক্ত করা।

(৩) যে সকল শব্দ কথোপকথনে নিত্য ব্যবহৃত, অথচ সাহিত্যে স্থান পায় নাই, শ্লীলতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অভিধানে তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ করা।

(৪) ২৪ পরগণা, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, রাজসাহী প্রভৃতি স্থানের প্রাদেশিকতার অশুদ্ধতা নির্দ্দেশ করিয়া শুদ্ধ বর্ণবিন্যাস এবং উচ্চারণ প্রকটিত করা। বঙ্গভাষায় যেরূপ জীবনীশক্তির সঞ্চার হইতেছে, তাহাতে অনতিদূর ভবিষ্যতে বঙ্গের লিখিত এবং কথিত ভাষার বর্ত্তমান বৈষম্য অনেকটা ঘুচিয়া যাইবে। ইহা অবশ্যপ্রার্থনীয় হইলেও কথিত ভাষার প্রাদেশিকতার সংমিশ্রণে লিখিত ভাষার বিকার প্রাপ্তি কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে।

(৫) এক জেলায় প্রচলিত অনেক শব্দ অন্য জেলার অনেকে বুঝেন না ; সেগুলির সংগ্রহ ও অর্থনির্দ্দেশ।

(৬) স্থানবিশেষে একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ হয় এবং একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় ; সেগুলি নির্দ্ধারণ করা।

(৭) প্রত্যেক শব্দের উৎপত্তি, ভিন্ন ভিন্ন অর্থ এবং বঙ্গভাষায় তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা। এ সম্বন্ধে ডাক্তার জনসনের পুরাতন বৃহৎ অভিধান যে প্রণালীতে প্রণীত হইয়াছিল, সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে ভাল হয়।

(৮) দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক শব্দ অভিধানভুক্ত করা। অধুনা, পারিভাষিক শব্দ কিরূপ হওয়া আবশ্যক, তাহা লইয়া যখন বিশিষ্টব্যক্তিগণের মধ্যে আলোচনা হইতেছে, তখন এ বিষয়ে আমাদিগের অনধিকার চর্চ্চা ধৃষ্টতামাত্র। তবে এ সম্বন্ধে এইটুকু বুঝি যে, রাসায়নিক ভৌগোলিক বা অন্যবিধ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রণয়ন করিতে, সংস্কৃতই হউক, ইংরাজীই হউক আর বাঙ্গলাই হউক, যে ভাষার সাহায্যে শব্দগুলি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য, সহজোচ্চার্য্য এবং শ্রুতিসুখকর হয়, তাহারই সাহায্য গ্রহণ করিলে সাধারণের শিক্ষার পক্ষে সুবিধা হইতে পারে। অন্যথা পরিভাষা প্রণয়নের খাতিরে এবং বৈদেশিক শব্দ ভাবান্তরিত করিবার ঝোঁকে মূলভাষার স্বল্পাক্ষর ও সুখোচ্চার্য্য শব্দগুলির পরিবর্ত্তে আড়ম্বরযুক্ত দুরুচ্চার্য্য এবং কষ্টবোধ্য কতকগুলি নূতন কথার সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন বুঝি না।

(৯) প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থসমূহে বর্ত্তমানে অপ্রচলিত যে সকল শব্দ পাওয়া যায়, সেই সকল শব্দের সন্নিবেশ ও ব্যাখ্যা।

বাঙ্গলা অভিধান সম্বন্ধে সকল কথা বলা হয় নাই। শাব্দিক অভিধান ব্যতীত বাঙ্গলায় আর একখানি অভিধানের প্রয়োজন আছে। ইংরাজীতে যেমন idiom, allusion ও proverbএর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভিধান আছে, বাঙ্গলায় যদি এমন একখানি অভিধান হয়, যাহাতে ঐ তিনটীই থাকে, তাহা হইলে বিশ্বকোষ, পূর্ব্বপ্রস্তাবিত অভিধান এবং এই খানি লইয়া বঙ্গীয় শব্দশাস্ত্র একরূপ সম্পূর্ণ হয়।

"রাম না হ'তে রামায়ণ,"—"না রাম না গঙ্গা" "রক্তবীজের বংশ," "ঘরের শত্রু বিভীষণ" প্রভৃতি Allusion এর কোটায় এবং পরের মুখে ঝাল খাওয়া, সাপের হাসি বেদেয় চেনে, গায়ে মানে না আপনি মোড়ল, পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা, সাতহাটের কাণা-কড়ি, প্রভৃতি Proverbএর কোটায় রাখা চলে। কিন্তু বাঙ্গলায় এই দুট এমনি সংমিলিত হইয়াছে যে, উভয়কেই এক প্রবচনের তালিকায় রাখিলে দোষ হয় না। তাহার পর আসিতেছে idiom বা ভাষাপদ্ধতি। ইহার আবশ্যকতা আমরা তত অনুভব করি না। কিন্তু বাঙ্গালা অভিধান শুদ্ধ বাঙ্গালীর জন্য নহে। প্রচলিত অভিধানই যাহাদের অনুবাদের সম্বল, এমন বঙ্গসাহিত্যপাঠক বৈদেশিক a flock of sheep মানে ভ্যাড়ার গোছা বা গাদা না লিখিলেও "ভ্যাড়ার ঝাঁক" এবং a swarm of bees এর মানে "মৌমাছির থোলো" না লিখিলেও "মৌমাছির পাল", কিম্বা "বালকের দলে"র পরিবর্ত্তে "বালকের ঝাঁক" লিখিয়া বসিতে পারেন। তাঁহারাই আবার a swarm of sheep ও a flock of bees শুনিলে হাসিয়া উঠিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুবাদবিভ্রাট এখনও চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই উহার উল্লেখ করা গেল। বাঙ্গালায় এমন অনেক ক্রিয়াপদ আছে, যাহা বৈদেশিকের ধাঁধা লাগাইয়া দেয়। আসিয়া যায়, উঠিয়া পড়ে, দাঁড়াইয়া পড়ে, লিখিয়া বসে, বলিয়া বসে, করিয়া বসে, কাঁদিয়া ফেলে, ধরিয়া বসে, ইত্যাদির যায়, পড়ে, বসে, ফেলে প্রভৃতির আবশ্যকতা এবং মর্ম্মগ্রহণ করিতে তাঁহাদের কষ্ট হয়। সুতরাং পরিমাণ, সংখ্যা, গতি, অঙ্গভঙ্গি, জীবজন্তুর ডাক, বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবস্থা প্রভৃতি জ্ঞাপক শব্দের যথাযথ প্রয়োগ প্রদর্শন করা আবশ্যক। চক্ষু ভোঁ ভোঁ করে বলিলে ভুল হইবে; বলিতে হইবে চক্ষু টন্ টন্ করে বা জ্বালা করে, কাণ ভোঁ ভোঁ করে, মাথা বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরে, মাথা কট্ কট্ করে, দাঁত কন্ কন্ করে, বুক দুদ্দুড় করে, বুক ধড়ফড় করে, গলা শাঁই শাঁই করে, ঘংঘং বা ঘড়ঘড় করে, পিঠ চচ্চড় করে, কোমর কট্‌কট্ করে, বুকে পিঠে সাঁটিয়া ধরে। হাত পা কামড়ায়, গতর খাটে, পেট চলে, মাথা ঘামে, চোখ ঠিকরে যায়, কাণে তালা ধরে, নাক ঝাঁজিয়ে যায়, জিহ্বা আড়ষ্ট হয়, হাত পা কালাইয়া যায়, শরীর পাত হয় বা পাকাইয়া যায়। লোকে বুক পুরিয়া, পেট ভরিয়া, আশা মিটাইয়া এবং কুঁচকিকণ্ঠা ঠাসিয়া খায়। পা বাড়ায়, চোখ রাঙ্গায়, চোখ ঠারে, চোখ কপালে তুলে, ঠোঁট ফুলায়, গাল ফুলায়, নাক তুলে, দাঁত দেখায়, হাত-ছানি দেয়, উছট খায়, গা তুলে, টাউরে পড়ে, হামা দেয়, গুড়ি মারে, উপুড় হয়, উলোট খায়, উল্টে পড়ে, ঝাঁপাই-ঝোড়ে, এই সকলের প্রয়োগ না জানিয়া কাত ফেরে, উপুড় খায়, ইত্যাদি বলা আশ্চর্য্য নহে। অধিক হাঁটাহাটি করিয়া "পায়ের সুতা ছিঁড়িয়া যায়" বকিতে বকিতে মুখে "ধুলা বাটিয়া যায়"। সাংসারিক কষ্টে লোকের "হাড় কালা হওয়া" বা "নাকে নলছেঁচার" কথা শুনা যায়। দৃঢ়তার সহিত অধিকক্ষণ কোন কিছুর আশায় বসিয়া থাকিলে লোকে বলে "তষ্টি দিয়া আছে"। তৃষ্ণায় প্রাণ "টা টা" করিতেছে বলিলে তৃষ্ণাতুরের অবস্থা বেশ বুঝা যায়। ভয়ানক শীত লাগিয়াছে বলিবার অপেক্ষা শীতে দাঁতে দাঁতে বা ঠোঁটে ঠোঁটে লাগিতেছে, শীতে "গায়ে কাঁটা দিয়াছে" বলিলে শীতার্ত্তের অবস্থা কেমন বুঝা যায়। এই সকল বাক্য ভাষার এমন জীবন্তভাব সম্পাদন করে এবং শ্রোতা বা পাঠকের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে বর্ণিত বস্তু বা বিষয়ের এমন হুবহু চিত্র অঙ্কিত করে যে বিশেষ দক্ষতার সহিত রাশি রাশি কথা সাজাইয়াও ঠিক ঐ ভাব আনা যায় না। বাহুল্যভয়ে এ সম্বন্ধে অধিক লিখিলাম

না। কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সুধীমণ্ডলী যখন স্বতন্ত্র শব্দসমিতি গঠিত করিয়া বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করিতেছেন, তখন এ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে আশা আছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

কুমীরা পোকা।

এ জগতের কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, সৃষ্টবস্তু মাত্রেই আমাদিগকে অশেষবিধ শিক্ষা দান করিতে সক্ষম। এজগতে ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিবার বস্তু কিছুই নাই। যাহাকে আজ সামান্য বলিয়া পদদলিত করিতেছি, কল্য আবার তাহারই মধ্য দিয়া স্রষ্টার আশ্চর্য্য নৈপুণ্য এবং কৌশল দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। আমরা সংসারে থাকিয়া সর্ব্বদা যে সমস্ত বস্তু দেখিতেছি, অভিনিবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে তাহাদেরই মধ্যে যে কত বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যায়, অদ্য তাহারই একটা সামান্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে।

অদ্য আমরা যাহার নামে প্রস্তাবের নামকরণ করিয়াছি, সে একটি ক্ষুদ্র পতঙ্গ। আমাদের দেশে তাহাকে কুমীরা পোকা, কুমরা পোকা, ইত্যাদি নামেই ডাকা হয়, অন্য দেশে তাহার অন্য কোন অভিধা আছে কি না, প্রাণিবিদ্যাতেই বা ইহাদিগকে কি বলা হয়, তাহা আমি জানি না, জানিবার সুবিধাও আপাততঃ নাই। ঐ পতঙ্গ আকৃতিতে বোল্‌তা বা ভীমরুলের ন্যায়। গায়ের রং ঠিক ভীমরুলের গায়ের রংএর মত ঘোর পাটল। ইহারা ষট্‌পদ। পশ্চাতের পদদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী লম্বা, সম্মুখের পদদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। পক্ষ দুই খানি খুব পাতলা, এবং বেশী চওড়া নহে। মুখ বোলতা ভীমরুল প্রভৃতির মুখের ন্যায়। মুখে একটি হুলের মত যন্ত্র আছে, তাহা ইচ্ছামত বাহির করিতে বা লুকায়িত করিতে পারে। মস্তকের দুই পার্শ্বে দুইটি সরু লম্বা শুঁড়ের মত আছে, ইহাদের স্পর্শানুভবশক্তি খুব প্রখর। এই পতঙ্গগুলিকে মৌমাছি এবং ভীমরুল প্রভৃতির ন্যায় দল বাঁধিয়া থাকিতে দেখা যায় না,প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে বিচরণ করিয়া থাকে।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস ইহাদের অপত্য জননের সময়। ইহাদের স্ত্রী পুংজাতি নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। মাদৃশ অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে তাহা সাধ্যাতীত। পতঙ্গের ন্যায় ইহারাও অণ্ডজ। আমার শয়নগৃহস্থ আমার ট্রাঙ্কটি এবং আমার ক্যাস বাক্‌সটির উপর ইহাদের কিছু প্রীতির আধিক্য দেখিতেছি। কারণ গৃহমধ্যে আরও অনেক বস্তু ও স্থান থাকিলেও ইহারা আমার ঐ দুইটি বস্তুর প্রতিই একান্ত আসক্ত; তাহাদের গাত্রে স্বীয় নীড় নির্ম্মাণ করিতে একান্ত যত্নশীল। আমি ক্যাষ বাক্সের গাত্র হইতে দুই তিন বার তাহাদের বাসা ভাঙ্গিয়া দিয়াছি। কিন্তু তথাপি ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারা আবার সেই খানেই বাসা বাঁধিয়াছে। শেষে আমি আর তাহা ভাঙ্গিয়া দেই নাই। তাহারা আমার ট্রাঙ্কটির গাত্রেও দুই তিন স্থলে দুই তিনটি বাসা করিয়াছে। এইরূপ আমার স্বগৃহমধ্যে ইহাদের বাসা হওয়ায় ইহাদের বিষয় পর্য্যবেক্ষণের অনেক সুবিধা হইয়াছে। আমি নিকটেই বসিয়া কার্য্য করিতেছি, অথবা অর্দ্ধ হস্ত ব্যবধানে থাকিয়া পতঙ্গের কার্য্য দেখিতেছি। সে নিঃশঙ্কচিত্তে স্বীয় নীড়নির্ম্মাণে ব্যাপৃত আছে, আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না। স্বীয় কার্য্যে এইরূপ সম্পূর্ণ মনোনিবেশ আমাদের একটা শিক্ষণীয় বিষয় বটে। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি যেন বেশী দূরগামিনী বলিয়া বোধ হয় না, কারণ উড়িয়া আসিয়া নিজ বাসার সমীপস্থ হইয়াও তাহা যেন তাহাকে খুজিয়া লইতে হয়; বোল্‌তা প্রভৃতির ন্যায় একদম্ বাসায় উপনীত হইতে পারে না। আমি কয়েক বার অতি সন্তর্পণে তাহার সন্নিকটে অঙ্গুলী, কলম প্রভৃতি চালনা করিয়াছি, কিন্তু তাহা সে দেখিতে পায় নাই। তবে বাসা প্রস্তুত করিবার সময় ইহাদিগকে বিরক্ত করিলে যেন ইহারা বড়ই চটিয়া যায়। একদিন আমি ইহাদের একটির বাসা নির্ম্মাণ কালে নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলাম। আমার অবস্থানে তাহার অভ্যস্ত আগমনপথ রুদ্ধ হইয়াছিল, এই অপরাধে সে আমার সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বোঁ, বোঁ করিয়া ঝগড়া করিয়াছিল; এবং আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া আমাকে ভয় দেখাইয়াছিল। তবে সৌভাগ্যের বিষয় যে ভীতিপ্রদর্শন ব্যতীত আমার কোনরূপ অনিষ্ট করে নাই। তাহা হই-

তেই আমার বোধ হয় ইহারা বোল্‌তা, মৌমাছি ভীমরুল প্রভৃতির ন্যায় উগ্র প্রকৃতির নহে, বেশ শান্ত প্রকৃতি। যখন বোঁ, বোঁ, করিয়া আমার চারিদিকে ঘুরিতেছিল, তখনও সে ধ্বনি ক্রোধব্যঞ্জক নহে, তাহা যেন কাতরতা-ব্যঞ্জক। আমি তাহাই বুঝিয়া সরিয়া গেলাম; পতঙ্গ স্বীয় বাসস্থান নির্ম্মাণ কার্য্যে নিবিষ্ট হইল।

ইহাদের নীড়নির্ম্মাণকৌশলটি প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বাক্‌স দ্বয়েই ইহারা ৫।৬ বার নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকবারেই ইহারা এমন স্থান নির্ব্বাচিত করিয়াছে, যে স্থানে সমতলের সহিত একটু উচ্চস্থান আছে। বাক্‌সের গায়ে যে সব স্থানে বিটু তোলা আছে, সেই সব স্থানেই ইহারা নীড় নির্ম্মাণ করে। কেবলমাত্র সমতল স্থানে কখনই নির্ম্মাণ করে না। বোধ হয় এইরূপ একটু উচ্চস্থানে বাসা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করায় তাহাদের কিছু সুবিধা হয়। শুধু এবার বলিয়া নহে, আমি অন্যান্য বারও অন্য অন্য স্থানে দেওয়ালে, কি দেওয়ালে, কি সিন্দুকের গায়ে যেখানেই ইহাদিগকে বাসা নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়াছি, কোন স্থানেই এই উচ্চনীচ স্থান নির্ব্বাচনের ব্যতিক্রম দেখি নাই।

ইহারা মৃত্তিকা দ্বারা বাসা নির্ম্মাণ করে। মৃত্তিকার সহিত অন্য কিছু মিশ্রিত করে কি না, তাহা জানি না। তবে ইহাদের বাসার মৃত্তিকা বড় কঠিন; জল লাগিলেও তাহা গলিয়া যায় না। বাসা ভাঙ্গিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে অতি সূক্ষ্ম মৃত্তিকাচূর্ণ এবং তৎসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক চূর্ণও দেখা যায়। বাসাগুলি শুষ্ক হইলে তাহার রং স্বাভাবিক মৃত্তিকার রংএর ন্যায় অথবা তদপেক্ষা ঈষৎ লাল আভাযুক্ত হয়। বাসাগুলি প্রায় সকলই একই ধরণের এবং একই রংএর।

প্রথমে স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া ইহারা বড় মটরের ন্যায় একটি করিয়া মৃত্তিকা-বটিকা বহির্দ্দেশ হইতে সম্মুখস্থ পদদ্বয় এবং মুখসাহায্যে বহন করিয়া আনে। এই মৃৎবটিকাগুলি খুব সিক্ত থাকে। ইহারা স্বীয় মুখ হইতে কোন রস বাহির করিয়া তদ্দ্বারা মৃত্তিকা সিক্ত করে অথবা সিক্তস্থান হইতেই মৃত্তিকা সংগ্রহ করে, ঠিক বলিতে পারি না। অনেকবার ইহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও সে বিষয় নির্ণয় করিতে সক্ষম হই নাই। তবে আমার বোধ হয় যে, ইহারা মুখনিঃসৃত রসবিশেষের সাহায্যেই মৃত্তিকাকে ইচ্ছামত তরল করিয়া লয় এবং ঐ রসের মিশ্রণ বশতঃ মৃত্তিকাগুলি অত কঠিন হইয়া থাকে। আমার ইহা অনুমান করিবার বিশেষ কারণ এই যে যখন বাসার স্থানবিশেষে উহারা মৃত্তিকা লেপন বা স্থাপন করিয়া যায়, ঠিক তৎপরমুহূর্ত্তে আমি বাসার দিকে তাকাইয়া দেখিয়াছি যে, তাহার স্থানে স্থানে তরল ধারা বহিয়া গিয়াছে। অত তরল মৃত্তিকা কখন বটিকাকারে পরিণত হইতে পারে না; তাই বোধ হয় যে ইহারা মুখরস দ্বারা মৃত্তিকাকে তরল করিতে পারে।

প্রথমেই মৃত্তিকা আনিয়া নির্ব্বাচিত স্থানের উচ্চপ্রদেশে সেই মৃত্তিকা স্থাপন করিয়া সম্মুখস্থ পদদ্বয় এবং মুখের হুলের সাহায্যে তাহা বিস্তৃত করিয়া দেয়, তারপর আবার মৃত্তিকা আনিয়া তাহার পার্শ্বে স্থাপিত করে। এইরূপে এক ইঞ্চি কি দেড় ইঞ্চি পরিমিত দীর্ঘ এবং প্রায় এক ইঞ্চি প্রশস্ত একটি স্থান মৃত্তিকার গণ্ডী দ্বারা আবদ্ধ করে, এবং তার উপরে ক্রমশঃ মৃত্তিকাস্তর আশ্চর্য্য কৌশলে এবং নৈপুণ্যের সহিত স্থাপন করিতে করিতে একটি গম্বুজের আকারে স্বীয় বাসা প্রস্তুত করে। এই বাসার উচ্চতা অৰ্দ্ধ ইঞ্চি বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। বাসা নির্ম্মাণকালে তাহাতে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র রাখিয়া চারিদিকে মৃত্তিকাস্তর স্থাপন করিতে থাকে। সেই ছিদ্র অতি ক্ষুদ্র। একটি মটর তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ছিদ্রটি সাধারণতঃ মধ্যস্থলে অথবা একটু ঊর্দ্ধ দিকেই রাখা হয় এবং সেই ছিদ্রের মুখটির চারিধারে খুব পাতলা করিয়া মাটির পাত লাগাইয়া দেওয়া হয়। কুম্ভকারগণ কুলালচক্রে স্থাপিত মৃত্তিকা হইতে ঘট প্রস্তুতকালে যেমন প্রথমে খুব সরু ছিদ্র রাখিয়া শেষে তাহা বিস্তৃত করিয়া ঘট মুখ নির্ম্মাণ করে ইহারাও ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহাদের সেই কারুকার্য্য, সেই ক্ষিপ্রকারিতা লিখিয়া বুঝান, এ ক্ষীণা লেখনীর সাধ্য নহে। ক্রমে খিলান গম্বুজের মত বাসা প্রস্তুত হইতে থাকে, আর ইহারা তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া কোথায় বেশী মাটি

প’ড়িল, কোথায় কম রহিয়াছে, তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া বেড়ায় এবং আবশ্যক মত অপসরণ বা পরিপূরণ করিয়া থাকে।

বাসা যখন খিলান করা, তখন তাহার অভ্যন্তরে যে খোলা ফাঁকা জায়গা আছে, তাহা বুঝিতেই পারা যায়। খিলানের মৃত্তিকার স্তরের বেধ ⅛ ইঞ্চি বা ঐরূপ হইবে। বাসা নির্ম্মাণ কার্য্য ইহারা একাকীই করিয়া থাকে এবং তাহা স্ত্রী পতঙ্গই করে বলিয়া আমার ধারণা। এই-রূপে বাসা নির্ম্মাণ ১ দিন বা ২ দিনের মধ্যেই শেষ হয়। তখন ঐ ছিদ্রপথে পতঙ্গ স্বীয় পুচ্ছদেশ প্রবিষ্ট করাইয়া তাহা চতুর্দ্দিকে বুলাইয়া মধ্যস্থলটি বেশ পরিষ্কার করিয়া ফেলে; তারপর কিছুকাল ঐ ভাবেই সম্পূর্ণ নিস্পন্দ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এই নিস্পন্দ অবস্থানের ভাব দেখিয়া আমার বোধ হয় যে, সে সময় পতঙ্গ ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে, কিন্তু সে এই অবস্থায় থাকিবার পর চলিয়া গেলে আমি বাসার মধ্যে যতদূর সম্ভব বিশেষ ভাবে দৃষ্টি করিয়াও ডিম্বের কোনও চিহ্ন দেখি নাই; তবে বাসার ছিদ্র পথ ভিন্ন দেখিবার আর উপায় ছিল না; আর হয়ত সে ডিম্ব এত ক্ষুদ্র যে, তাহা যন্ত্র সাহায্য ভিন্ন দেখা যায় না।

যাহা হউক এইরূপ অবস্থার পর দুই তিন দিন আর মক্ষিকার কোন সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে বাসাটি শুষ্ক খট্‌খটে হইয়া যায়; তারপর মক্ষিকাকে আবার দেখা যায়। তখন তাহার শিকারী বেশ। জীবিত একটি ক্ষুদ্র কীট অতি সন্তর্পণে পদ সাহায্যে বহন করিয়া বাসার সমীপে উপস্থিত হয়, এবং সেই জীবিত কীটটিকে আশ্চর্য্য কৌশলে বাসার মধ্যে স্থাপিত করে। এইরূপে তিন চারিটি জীবিত কীট আনয়ন পূর্ব্বক তাহার বাসার মধ্যে স্থাপন করে; তৎপরে আবার মৃত্তিকা আনয়ন পূর্ব্বক ছিদ্রপথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিয়া তাহার উপরে এবং চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকাস্তর বিন্যাসপূর্ব্বক বাসার মধ্যস্থিত কীট কয়টির জীবন্ত সমাধি বিধান করিয়া চলিয়া যায়। এই সব কীটের মধ্যে একজাতীয় কীট ধূসরবর্ণ, এবং অন্য জাতীয় হরিদ্বর্ণ। এই সব কীটগুলির হস্তপদ কিছুই নাই, সরীসৃপ জাতীয়, দেহের সহিত দুই দিকে কয়েকটী করিয়া একটু উচ্চ কণ্টকবৎ উপ অঙ্গ আছে, তদ্দ্বারা গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়। মুখের দিকেও এইরূপ চারিটি উপাঙ্গ আছে। এই কীট গুলি শস্যক্ষেত্রে, বৃক্ষপত্র, সব্জী বাগান প্রভৃতিতে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় জাতীয় কীটই আকৃতিতে এক প্রকার, কেবল বর্ণগত পার্থক্য। লম্বে ইহারা ন্যূনাধিক এক ইঞ্চি করিয়া হইয়া থাকে। যে কয়টি বাসা আমি অনুসন্ধান করিয়াছি, সেই কয়টিতেই দুই জাতীয় কীট দেখিয়াছি। ধূসর জাতীয় কীট একটি এবং হরিৎ বর্ণের কীট দুইটি বা তিনটি দেখিয়াছি।

কুমীরা পোকা কি অপরাধে এই কীট গুলির এইরূপ জীবন্ত সমাধির ব্যবস্থা করে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে আমাদের বোধ হয় যে, এইরূপ জীবিত কীটের পূতি দেহের সহিত কুমীরা পোকার জন্মের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে; ইহাদের ডিম্ব এইরূপ দুই জাতীয় কীটের পূতি দেহের রসেই পুষ্ট হয় এবং ক্রমে তাহা প্রস্ফুটিত হয়। এই জন্যই স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে কুমীরা পোকা এই সব কীটের প্রাণনাশ করে। সন্তান উদ্দেশ্যে নরবলি দেওয়া নাকি আজ কালও শুনা যায়। সুতরাং কুমীরার এইরূপ কীটসমাধির মধ্যে বিশেষ বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

কুমীরা কীটগুলিকে সমাহিত করিয়া চলিয়া গেলে আমি ছুরী দ্বারা অতি সন্তর্পণে বাসার মুখ খুলিয়া কীট-গুলিকে বাহির করিয়া দেখিয়াছি। তাহারা তখনও জীবিত আছে, কিন্তু তাহাদের গাত্রে ডিম্বের কোন চিহ্ন পাই নাই। অপর আর একটি বাসা এইরূপ বদ্ধ হইবার ৪।৫ দিন পর খুলিয়া দেখিয়াছি যে, কীটগুলি মরিয়া তাল পাকাইয়া আছে, এবং তাহাদের একটির গাত্রের উপর একটি সরু বালাম চাউলের অর্দ্ধাংশের মত একটি ডিম্ব টল টল করিতেছে। ইহাতেই বোধ হয় যে, কীট-দেহ পচিতে আরম্ভ হইলে ডিম্বও পুষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। কুমীরা এই সব কীট বাসায় স্থাপিত করিয়া তাহাদের গাত্রেই ডিম্ব উৎসৃষ্ট করে, কিংবা বাসা নির্ম্মাণ শেষে যে সময় তন্মধ্যে পুচ্ছ প্রবিষ্ট করাইয়া নিস্পন্দ থাকে, তখনই ডিম্ব প্রসব করে, তাহা ঠিক ধরিতে পারে নাই। তবে আমার নিকট শেষোক্ত অনুমানই ঠিক বলিয়া

বোধ হয়, কারণ তাহার তাৎকালিক অবস্থায় সহিত প্রসবাবস্থার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কুমীরা পোকার ডিম্ব এইরূপ রুদ্ধ নীড়ে বায়ু এবং আলোকের সম্পর্ক রহিত হইয়া দ্বিবিধ কীটের দেহোপাদানে পরিপুষ্ট হইতে থাকে এবং কালক্রমে তাহা পরিস্ফুট হইলে কুমীরা পোকার সন্ততিগণ অন্ধকারের মুখ দর্শন করে। শেষে তাহারা স্ববলে নীড়ে ছিদ্র করিয়া আলোক ও বায়ুতে বাহির হয়।

কুমীরা বাসাতে ডিম্ব উৎসেক করিয়াই চলিয়া যায়। আর আর কার্য্য প্রকৃতির আশ্চর্য্য কৌশলেই সম্পাদিত হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। এই পতঙ্গ এককালে কতগুলি ডিম্ব প্রসব করে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না; এখনও তাহা নির্ণয় করিতে পারি নাই। যাহাহউক পৃথিবীতে কতভাবে কত প্রকারেই যে জীবপ্রবাহ উৎপন্ন এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সামান্য পতঙ্গের বাসগৃহনির্ম্মাণকৌশল, তাহার ডিম্ব উৎসেক প্রণালী এবং সেই ডিম্বের পরিপুষ্টির উপায়, সকলই যেন অদ্ভুত।

কাচ পোকা নামে যে সবুজ বর্ণের এক প্রকার পতঙ্গ আছে, তাহাদের সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, তাহারা যে কোন কীটকেই আক্রমণ করুক, স্বনীড়ে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রে স্বজাতিতে অর্থাৎ কাচপোকার আকারে পরিণত করে; কুমীরার সম্বন্ধেও সেই প্রবাদ শুনা যায়। এই প্রবাদের মূলে যে গভীর সত্য আছে, এবং কাচপোকার প্রবাদের মূলও যে এই প্রকার, তাহা বোধ হয় এই সামান্য প্রস্তাব পাঠ করিয়া পাঠকগণের কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি হইবে, এবং এই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী প্রবাদবাক্যের সত্যতাও প্রকটিত হইবে যে;—

"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই,
পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।"

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

বিহু।

প্রকৃতির লীলাভূমি আসাম যে শুধুই রমণীয় তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন, বিহগকলকাকলীমুখরিত কুঞ্জভূমি তাহা নহে। এই প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গদেশীয় পরিব্রাজকের দৃষ্টিপথে এমন অনেকগুলি রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার পতিত হয়, যাহা এদেশে দেখিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি আমাদের চক্ষে বিশেষ কৌতুকাবহ বলিয়া বোধ হয়। অদ্য তাহাদের মধ্যে একটীর বিবৃতি করিব।

আসামের উত্তর অংশে লক্ষীমপুর প্রভৃতি জেলায় বিহুর বেশী জাঁকজমক দেখিতে পাওয়া যায়। বিহু কি?—ইহা অবিবাহিতা ও অবিবাহিত আসামীদিগের নৃত্যোৎসব। ইহার উদ্দেশ্য অনেকটা ইংরাজি court-ship এর সদৃশ। অর্থাৎ আসামীগণ এই স্থান হইতেই তাহাদের পতিপত্নী নির্ব্বাচন করিয়া লয়। বিহু—এই শব্দটী সংস্কৃত 'বিবাহ' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আসামী ভাষায় 'বিবাহ' কে 'বিহা' কহে—তাহা হইতেই এই উৎসবের নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই উৎসবক্ষেত্রে বিবাহিত বা বিবাহিতা স্ত্রীপুরুষের গমন করা নিষিদ্ধ। শুধু আসামীদিগের বৃদ্ধ পুরোহিত ও তাঁহার পত্নী তথায় উপস্থিত থাকিতে পারেন। আমি দিব্রুগড় হইতে তিন ক্রোশ দূরে রিহাবাটী বলিয়া কোনও স্থানে এই উৎসব সন্দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য অবিবাহিত বলিয়াই এই দর্শন লাভ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল; নচেৎ যাইতে পারিতাম না। আমার সাহেবী পোষাক দেখিয়া প্রথমে সকলে উৎসবক্ষেত্র হইতে পলায়নপর হইয়াছিল। পরিশেষে বৃদ্ধ পুরোহিত মহাশয় (যিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় তথায় লইয়া গিয়াছিলেন) সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, আমি বাঙ্গালী ও ভদ্রলোক ও অবিবাহিত। সুতরাং আমা হইতে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। ইহার পরে আমার উপস্থিতিতে আর কেহ কোনও আপত্তি করিল না।

বিহুর উৎসব বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রে সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রত্যেক গ্রামেই একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসামী বালকবালিকাগণ সমবেত হয়। আমি যে স্থানে গিয়া-

ছিলাম, তথায় দেখিলাম একটী প্রশস্ত ক্ষেত্রে তিন চারিটি সুবৃহৎ সামিয়ানা খাটান হইয়াছে ও স্থানটীকে ঝাড়-লণ্ঠনে সুশোভিত করা হইয়াছে। নানাবিধ লতাপুষ্প সংগ্রহ করিয়া উৎসবক্ষেত্রটীকে একটী কুঞ্জভূমির ন্যায় সাজান হইয়াছে। তাহার এক প্রান্তে সুবর্ণসিংহাসনোপরি শালগ্রাম-শিলা প্রতিষ্ঠিত। তাহার সম্মুখে ও উভয় পার্শ্বে আসামী বালকবালিকাগণ সমবেত হইয়াছে। দু একজন প্রৌঢ় বয়স্ক দেখিলাম;—জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তাঁহারা সকলেই অবিবাহিত; তাই এস্থলে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মধ্যস্থলে যাত্রার আসরের ন্যায় খানিকটা জায়গা নর্ত্তক ও নর্ত্তকীগণের জন্য রাখা হইয়াছে। সকলেই উৎকৃষ্ট বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া উৎসবক্ষেত্রের শোভাবর্দ্ধন করিতে আসিয়াছে। উৎসব ক্ষেত্রে অনেকেই ক্রীড়নক, তাম্বূল, ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। তাহারা কিন্তু সকলেই বালক।

প্রথমেই শালগ্রামের পূজা আরম্ভ হইল। পূজার পর হোম। হোম শেষ হইলে পুরোহিত মহাশয় হোমের ভস্ম লইয়া তাহাতে ঘৃত সংযুক্ত করিয়া নর্ত্তক ও নর্ত্তকীদের কপালে একটী করিয়া ফোঁটা পরাইয়া দিলেন। এই ফোঁটা পারিলে আসরে অবতীর্ণ হওয়া যায় না।

বালকবালিকা সকলে একত্র হইয়া এখানে নৃত্য করে না। প্রথমে বালকবালিকাদল আসরে অবতীর্ণ হইল। দুইজন করিয়া চারি পাঁচ জোড়া বালিকা আসরের মধ্যে আসিয়া প্রথমে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের সকলেরই বয়স ১০।১২ বৎসরের মধ্যে। দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই তাহাদিগকে ফুলের মালা প্রভৃতি উপহার দিতে লাগিলেন। তাহারা সেগুলি ধন্যবাদের সহিত গ্রহণ করিয়া গলদেশে ধারণ করিল।

এইরূপে প্রায় ৪।৫টি দল আসিয়া তাহাদের নৃত্য-নৈপুণ্য প্রকাশ করিল। ইহাদের নাচ অপরের চক্ষে কেমন লাগিয়াছিল বলিতে পারি না—কিন্তু আমার বেশ লাগিয়াছিল। নৃত্যের আমি কোনও কালেই পক্ষপাতী নহি। বিশেষতঃ আমাদের দেশের। উহাতে একটা অসভ্যতার element মিশ্রিত আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কিন্তু এই আসামী বালিকাগণের মধ্যে আমি এমন একটা সারল্যের ভাব দেখিলাম, যাহাতে তাহাদের নৃত্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

যাহা হউক বালিকাগণের নাচ শেষ হইয়া গেলে বালক ও যুবকের দল নৃত্য করিতে আসিল। ইহাদের বয়স ১৬ হইতে ২০র মধ্যে। বালিকাদিগের ন্যায় ইহারা দুইজন দুইজন করিয়া নৃত্য করে না—সকলের হাত ধরাধরি করিয়া গোল হইয়া নাচে। ইংরাজি 'roundel' নাচের সহিত ইহাদের নাচের অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

ইহাদের নাচ শেষ হইলে নর্ত্তকনর্ত্তকী সকলে মিলিয়া কয়েকটী গান করিল। তাহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না। যদিও আসামী ভাষার সহিত নিতান্ত অপরিচিত ছিলাম না, তথাপি তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও বোধগম্য হইল না। একে অস্পষ্ট উচ্চারণ, তাহাতে আবার সকলে সমস্বরে চীৎকার করিতেছে; বুঝিতে না পারা বিচিত্র নহে। তবে সুর গুলি নিতান্ত মন্দ লাগিল না। তাহার কারণ আর কিছুই নহে—সেগুলি প্রায় আমাদের বাঙ্গলা সুরেরই অনুরূপ। পুরোহিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, উহারা সকলে দেবতার স্তোত্র গাহিতেছে।

ইহার পরে সকলে ভক্তিভরে নারায়ণশিলাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। পুরোহিত মহাশয়ের মুখে শুনিলাম, পতিপত্নী মনোনয়ন হইয়া গিয়াছে। এখন সকলে গিয়া তাহাদের পিতামাতার নিকট তাহাদের মনোনীত পতি বা পত্নীর নাম করিবে। পিতামাতাও যাহাতে সেই পাত্র বা পাত্রীর সহিত বিবাহ হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিবেন।

এস্থলে একটী কথা বক্তব্য আছে। যদিও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বালক ও বালিকা উভয়েরই পত্নী অথবা পতি নির্ব্বাচন করিবার তুল্য ক্ষমতা আছে, তথাপি প্রায় দেখা যায় যে, বালিকারাই পতি নির্ব্বাচন করিয়া থাকে; মনোনীত বালক অথবা যুবক তাহাতে প্রায়ই দ্বিরুক্তি করে না। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, আসামে পুরুষা-

পেক্ষা স্ত্রীলোকই অধিক শ্রমশীলা ও বুদ্ধিমতী। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বোধ হয় ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আসামে অধিকাংশ কার্য্যই স্ত্রীলোক দ্বারা সম্পন্ন হয় এড়ি ও মুগা কাপড় স্ত্রীলোকেই প্রস্তুত করিয়া থাকে। পুরুষেরা কেবল বসিয়া থাকে মাত্র। এরূপ স্থলে স্বামী-নির্ব্বাচন কার্য্যটীও যে স্ত্রীলোকে করিবে, তাহা বিচিত্র নহে।

যদি কোনও পাত্রী তাহার পতি মনোনয়ন করিলে সেই মনোনীত পতি তাহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে উভয়কেই আগামী বৎসরের বিহুর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। কিন্তু এরূপ ঘটনা প্রায়ই বিরল। তবে এ প্রকার দেখা যায় যে, হয়তো দুইটি বালিকা একটি বালককেই তাহাদের পতি বলিয়া নির্ব্বাচিত করিল—এরূপ স্থলে যে কন্যার পিতা অধিক টাকা দিতে সমর্থ হইবে, তাহারই সহিত সেই ভাগ্যবান যুবক উদ্বাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইবে। বলা বাহুল্য আসামেও আমাদের দেশের ন্যায় ছেলে বিক্রয় করা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তবে উহা আমাদের দেশের ন্যায় এত ভয়ানক নহে। বোধ হয় তথায় ইংরাজি শিক্ষা প্রচারের স্বল্পতাই তাহার প্রধান কারণ।

আসামীরা তাহাদের পুত্রকন্যাদিগকে বিহুতে নাচিতে পাঠান গৌরবের বিষয় মনে করে। যদিও আসামে 'আপোসে' বিবাহ করাও প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহাদের মতে সে প্রকার বিবাহ তাদৃশ প্রশস্ত নহে। দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহগুলিই প্রায় 'আপোসে' সম্পন্ন হইয়া থাকে।

আসামীদের মধ্যে আশীর্ব্বাদ করিবার একটী রীতি প্রচলিত আছে। তাহার মর্ম্ম এই "বিহুর ফোঁটা কপালে ধারণ করিয়া মনোনীত পতিলাভ করিয়া সুখী হও।"

পুরোহিত মহাশয়ের মুখে শুনিলাম যে বিহুর উৎসবে পূর্ব্বে যেরূপ ধুম হইত, আজ কাল আর সেরূপ হয় না। ইহার পরে গৌহাটীতে একবার বিহুর উৎসব দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে রিহাবাটীর ন্যায় ধুম দেখি নাই।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বি. এ।

মৎস্য পুরাণ।

বিচক্ষণ পাঠকগণ ইহা হইতে ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন।

১। মৎস্য পুরাণ, একখানি শৈব পুরাণ। ইহার প্রথমে শিব ও মৎস্যরূপী বিষ্ণুর বন্দনা আছে। নৈমিষারণ্যবাসী শৌনকাদি ঋষিগণের প্রশ্নে সূত এই পুরাণ বর্ণনা করেন। শৌনক প্রাচীন ভারতের একজন প্রসিদ্ধ ঋষি। শৌনকের দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞসভায় অধিকাংশ পুরাণ পঠিত ও ঋষিগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল। শৌনক এক ঋষি বংশের নাম; নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের একটী সভা ছিল; তাহাতে অনুমোদিত না হইলে কোন মত সাধারণের শ্রদ্ধাই হইত না; এরূপ স্বীকার না করিলে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির অর্থ-সঙ্গতি হয় না। নৈমিষারণ্য আর্য্যসভ্যতার কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। জ্ঞানী গৃহস্থগণ বানপ্রস্থ অবলম্বন পূর্ব্বক এই প্রদেশে বাস করিতেন, এবং পরস্পরের সহায়তায় জ্ঞান ও ধর্ম্ম বৃদ্ধি করিতেন। এই জন্য নৈমিষারণ্য প্রদেশে অনবরত যজ্ঞানুষ্ঠান হইত এবং যজ্ঞীয় সভা কখনও পণ্ডিতের অভাবে পরিক্ষীণ হইত না। শৌনকবংশীয় ঋষিগণের তত্ত্বাবধানে সেই সকল সভা পরিচালিত হইত। এরূপ অর্থ করিলে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না; পুরাণ গুলিরও সম্মান রক্ষা হয়।

২। প্রলয়ের পূর্ব্বে সার্দ্ধশতবর্ষ অনাবৃষ্টি হয়। অনন্তর সঙ্কর্ষণের মুখানল (পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ অগ্নি) ঔর্ব্বানল (বাড়বানল) ও ভবের ললাটবহ্নি দ্বারা সমস্ত জগৎ দগ্ধ হইয়া যায়।

৩। অনন্তর সপ্তপ্রকার বারিদ—সংবর্ত্তক, ভীমনাদ, দ্রোণ, চণ্ড, বলাহক, বিদ্যুৎপতাক, ও শোণ জলবর্ষণ দ্বারা সমুদায় পৃথিবীকে জলমগ্ন করে।

৪। মার্কণ্ডেয় মুনি ও নর্ম্মদা নদী, এই জলপ্লাবনে রক্ষা পান। নর্ম্মদার রক্ষা করার উদ্দেশ্য কি? পুরাণকার কি নর্ম্মদা প্রদেশের লোক?

৫। আদিতে জন্ম হেতু আদিত্য এবং ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের পঠন হেতু ব্রহ্মা নাম হয়। আদিত্য আদি ভূতত্বাৎ ব্রহ্মা ব্রহ্মপঠনভৃৎ। (২য় অধ্যায়)।

৬। সৃষ্টির আদিতে জগৎ যেন একটী মৃত অণ্ড ছিল মনে কর। তাহা হইতে সূর্য্যের উৎপত্তি হয়। এই জন্য সূর্য্যের এক নাম মার্ত্তণ্ড।

৭। মৎস্য পুরাণ পুরাণশাস্ত্রকে বেদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন। লিখিত আছে, পুরাণের শ্লোক সংখ্যা শতকোটি। শ্লোক সংখ্যা কি শব্দ সংখ্যা ?

৮। মৎস্য পুরাণ, সৃষ্টিপ্রকরণে কপিল দেবের সাংখ্য দর্শনের মত উদ্ধৃত করিয়া জীবাত্মা ও ঈশ্বর ধরিয়া ষড়্‌বিংশতিতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরাণকারগণ, দার্শনিক ঋষিগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিরীশ্বরবাদ গ্রহণ করেন নাই।

৯। তপশ্চারী ব্রহ্মার অর্দ্ধ শরীর হইতে একটী পুরুষ এবং অপরার্দ্ধ হইতে একটী নারীর জন্ম হয়। নারীর নাম শতরূপা। গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী শতরূপার ভিন্ন ভিন্ন নাম।

১০। মৎস্যরূপী ভগবান্ বলিয়াছেন, বৈবস্বত মন্বন্তরে রাম নামে মর্ত্ত্য ও তাঁহার ভ্রাতা মৎসত্ত্ববলাশ্রিত হইবে। এই পুরাণ রচনার সময় রামকৃষ্ণ এখনকার ন্যায় পরমেশ্বরপদে আরোপিত হন নাই।

১১। ব্রহ্মা কামকে বলিয়াছেন, তুমি দ্বারকাতে রাম-ভ্রাতার আত্মজ হইয়া জন্মিবে, অনন্তর ভরতবংশান্তে বৎসনৃপাত্মজ হইয়া আভূতসংপ্লব (প্রলয়কাল পর্য্যন্ত) বিদ্যাধরাধিপত্য লাভ করিবে। বৎসনৃপাত্মজ কে ?

১২। ব্রহ্মা শতরূপাকে বিবাহ করিয়া তাহাতে বামদেব ও সনৎকুমারের জন্মদান করেন। বামদেবের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, চরণ হইতে শূদ্র ও ও উরু হইতে বৈশ্যের জন্ম হয়। বামদেব ব্রহ্মার আদেশে ভয়ঙ্কর সৃষ্টি হইতে বিরত হন, তদবধি বামদেবের এক নাম স্থাণু হইয়াছে।

১৩। দশ প্রচেতা, মনুর বংশে উৎপন্ন হন। প্রচেতাদের বংশে দক্ষের জন্ম হয়। দক্ষের বংশে অনেক ম্লেচ্ছের জন্ম হয়।

১৪। সূর্য্য ও চন্দ্র বংশের পূর্ব্বে মনু, প্রচেতা ও দক্ষবংশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এই সকল রাজ্যের পরিণামে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয়দের বৃহৎ বৃহৎ রাজ্যের উদ্ভব হয়।

১৫। দক্ষ, প্রথমতঃ হর্য্যশ্বনামে সহস্র পুত্রের জন্মদান করেন। তাঁহারা প্রজা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলে নারদ তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা অগ্রে পৃথিবীর পরিমাণ জানিয়া আইস, পরে প্রজা সৃষ্টি করিও। তাঁহারা পৃথিবীর পরিমাণ জানিবার জন্য বাহির হইলেন কিন্তু ফিরিলেন না। অনন্তর দক্ষ শবল নামে অন্য সহস্র পুত্রের সৃষ্টি করিলেন। এবারও নারদ তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা পৃথিবীর পরিমাণ জানিয়া আইস ও ভ্রাতাদের অনুসন্ধান কর। তাঁহারা তদর্থে বাহির হইলেন, কিন্তু আর ফিরিলেন না। এইরূপে পৃথিবীতে প্রজা বিস্তৃত হইল। তদবধি নিয়ম হইল যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের অন্বেষণে যাইবে না, গেলে ভাল ফল হইবে না। এই পৌরাণিক উপাখ্যানের মূলে কোন ঐতিহাসিক তথ্য লুকাইয়া আছে। বোধ হয় ইহা আদিম আর্য্যস্থান হইতে আর্য্যগণের ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপনের কোন ঐতিহাসিক স্মৃতি।

১৬। বাণের সহস্র বাহু ছিল। বাণ ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহস্রবাহুত্ব ক্ষমতার পরিচায়ক মাত্র। বাণ মালব দেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে আধিপত্য করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, বাণ গড়োয়াল রাজ্যের পর্ব্বতময় স্থানে আধিপত্য করিতেন। বাণ উজ্জয়িনীর মহাকাল শিবের প্রতিষ্ঠাতা; যদুবংশীয়দের আনর্ত্তরাজ্যে উপনিবেশ স্থাপনকালে বাধা দিতে গিয়া তাড়িত হন।

১৭। দৈত্যের সংখ্যা ৭৭ কোটি, দানবের সংখ্যা ষষ্টি সহস্র। দানব এত কম কেন ?

১৮। ঋষিশাপে বিনষ্ট বেণের মথ্যমান কলেবর হইতে ম্লেচ্ছ জাতির জন্ম হয়। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, দক্ষ হইতে অনেক ম্লেচ্ছের জন্ম হয়। বোধ হয় কোন কোন আর্য্যসম্প্রদায় অতি প্রাচীন কালেই আর্য্যসমাজ হইতে দুরাচরণের জন্য তাড়িত হইয়া ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

১৯। বেণ, একজন অসাধারণ পুরুষ। তাঁহার সময়ে সঙ্কর বর্ণের সৃষ্টি হয়। চিরাচরিত ব্যবহারের লোপ করিতে যাইয়া তিনি ঋষিগণ কর্ত্তৃক নিহত হন।

২০। ত্বষ্টা, সূর্য্যকে ভ্রমিতে আরোপিত করিয়া তাঁহার

তেজঃশাতন করেন। কেবল পদযুগলের তেজঃশাতন করেন নাই। শাতিত সূর্য্য মনোহর হইলেন, কিন্তু তাঁহার পদ যুগল, দুষ্প্রেক্ষ্য রহিল। এই জন্য সূর্য্যমূর্ত্তিতে পদ-যুগল দেওয়া হয় না।

২১। সূর্য্যকে ছাটিয়া যাহারা বাচিয়া ছিল, তাহা হইতে শিবের ত্রিশূল, বিষ্ণুর চক্র ও ইন্দ্রের বজ্র হইল। অর্থ কি ?

২২। তপতী বা তাপ্তী নদী সূর্য্যের কন্যা। যমুনাও সূর্য্যের কন্যা। কিছু কারণ আছে কি ?

২৩। পূর্ব্বকালে অযোধ্যার দক্ষিণাংশকে গৌড় বলিত। শ্রাবস্তী নগর সেই গৌড়ের রাজধানী ছিল বাঙ্গালার গৌড় কি এই গৌড়ের অভিষ্যন্দবমন ? শ্রাবস্তশ্চ মহাতেজা বৎসকস্তৎ সুতোঽভবৎ। নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তী গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ। (১২ অ)।

২৪। ইক্ষ্বাকুবংশবর্ণনায় দেখিতে পাই, অজের পর দীর্ঘবাহু ও অজপাল নামে দুইজন রাজা রাজত্ব করেন। তৎপর দশরথ রাজা হন। সূর্য্যবংশ নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া কোশলরাজ্যে রাজত্ব করিত। প্রধান শাখা অবশ্য অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু সামন্ত রাজগণ কখনও কখনও প্রাধান্য লাভ করিতেন। কখন কখন শ্রাবস্তী, সাকেত প্রভৃতি নগরের প্রাধান্য হইত। এই জন্য পুরাণ গুলির মধ্যে সূর্য্য-বংশ বর্ণনায় দুই একজন অতিরিক্ত রাজার নাম দৃষ্ট হয়।

২৫। নিষধরাজ নল, কোশলরাজ ঋতুপর্ণের সম-সাময়িক। ঋতুপর্ণ রামের চতুর্দ্দশ পুরুষ পূর্ব্বতন।

২৬। রাজা শ্রুতায়ু (রামের পর পঞ্চদশ রাজা) ভারতযুদ্ধে নিহত হন। মহাভারতে ইক্ষ্বাকু বংশীয় বৃহদ্-বলের নাম আছে। হয়ত, কোশল রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে শ্রুতায়ু ও বৃহদ্বল আধিপত্য করিতেন। উভয়েই ভারত যুদ্ধে নিহত হন।

২৭। মৎস্য পুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে একশত আটটি শক্তিতীর্থের নাম আছে। এই ১০৮টীর মধ্যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যস্থ পাটলাদেবীর স্থানের উল্লেখ আছে, এই পাটলা চণ্ডীই বর্ত্তমান পাতাল চণ্ডী।

২৮। বদরীপ্রায় দ্বীপে বাস করিতেন বলিয়া ব্যাসের এক নাম বাদরায়ণ ও দ্বৈপায়ন।

২৯। শুকদেবের স্ত্রীর নাম পীরবী। শুকদেবের কন্যার সহ পঞ্চালাধিপতি অনথের বিবাহ হয়। শুকের কন্যার নাম কৃত্বী। সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মদত্ত, শুকদেবের দৌহিত্র। ব্রহ্মদত্ত দেবল ঋষির কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শুকদেবের সম্বন্ধে কোন কোন পুরাণে অদ্ভুত অদ্ভুত বর্ণনা আছে। কোন কোন পুরাণে প্রকৃত কথা আছে। যে পুরাণে সঙ্গত বর্ণনা আছে, আমরা তাহার কথাই মানিব। হরিবংশে আছে, শুকদেব পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লেখা পড়া শিখেন নাই, পিতার তিরস্কারে বিদ্যা শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। তিনি দুই বিবাহ করেন, ও তাঁহার ছুটী পুত্র হয়। কন্যার সহ পঞ্চাল রাজের বিবাহ দেন, কিন্তু আমাদের দেশের লোকের প্রাচীন রাজা ও ঋষিগণের সম্বন্ধে অদ্ভুত ধারণা। বশিষ্ঠ ঋষি রামের যজ্ঞ সমারোহে দাসীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া যজ্ঞীয় দ্রব্য অপহরণ করেন, নারদ রাধা রাধা বলিয়া পাগল, অভিমন্যু মরণ কালে কত কান্নাই কান্দিতেছে, এই সকল দৃশ্য দেখিয়া যাহারা বাহবা দেয় তাহারা বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি ঋষির মহত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না ; সিংহ শিশু অভিমন্যু যে কি পদার্থে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাও বুঝিতে পারে না। শুকদেব উদর হইতে পড়ি-য়াই সংসার ত্যাগ করিলেন, এই বর্ণনা পাঠ করিতে তাহাদেরই ভাল লাগে। আমরা বলি, যখন শাস্ত্রের মধ্যে সত্য কথাও পাইতেছি, তখন অসত্য কথা মানিব কেন ?

৩০। এবং সা ভক্ষিতা ধেনুঃ সপ্তভিস্তৈস্তপোধনৈঃ।
বৈদিকং বলমাশ্রিত্য ক্রূরে কর্ম্মণি নির্ভরাঃ॥

২০ অধ্যায়।

গর্গশিষ্য সপ্ত কৌশিক পুত্র, বুভুক্ষিত হইয়া শ্রাদ্ধ কার্য্যে গুরুর কপিলা বধ করে। পুরাণকার বলিতেছেন, উহারা বৈদিক বল আশ্রয় করিয়া গো বধ করিয়াছিল। বৈদিক কালে যে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত ছিল, ইহা তাহার একটী প্রমাণ।

৩১। ব্রহ্মদত্তের এক মন্ত্রীর নাম সুবালক। ইহার অপর নাম পাঞ্চাল। ইনি কামশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। কামবিষয়ক গানকে পূর্ব্বে পাঞ্চালিকা বলা হইত। এই পাঞ্চালিকা শব্দের অপভ্রংশে বাঙ্গালায় পাঁচালী শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

৩২। বুধ প্রথমতঃ হস্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন।

৩৩। চন্দ্রবংশজাত রাজপুত্রগণ ইন্দ্রকে যজ্ঞভাগে বঞ্চিত করেন। বৃহস্পতি তাঁহাদের মোহনার্থ বেদমার্গ-বহিস্কৃত জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। রাজপুত্রগণ জৈন-মতাবলম্বী হইয়া অধার্ম্মিক হইলে, ইন্দ্র তাঁহাদের বিনাশ করেন। ক্ষত্রিয় জাতির মধ্য হইতেই বৌদ্ধমত ও জৈন মতের উৎপত্তি হয়।

৩৪। মৎস্য পুরাণের মধ্যে কৃষ্ণের ষট্ সহোদরের নাম আছে। রাজ্য লইয়া কংসের সহ বসুদেবের মনো-মালিন্য হয়। আপনার বংশে শূরসেন-রাজ্য সংক্রামিত হয়, বসুদেবের এইরূপ বাসনা ছিল। কংস ছয় ভাগি-নেয়ের প্রাণনাশ করিয়া ভগিনীপতি ও ভগিনীকে কারা-রুদ্ধ করেন। কংসের বৃত্তান্ত, অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আছে।

৩৫। যদুবংশ ১০১ কুলে বিভক্ত ছিল।

৩৬। বৈবস্বত মন্বন্তরে যজ্ঞের প্রবর্ত্তন হয়।

৩৭। দ্রুহ্যর বংশে পাণ্ড্য, কেরল, চোল ও কর্ণের জন্ম হয়। ইহারা স্ব স্ব নামে জনপদ স্থাপন করে। কর্ণ-স্থাপিত জনপদের নাম কর্ণাট। চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ কর্ত্তৃক পাণ্ড্য, চোল, কেরল ও কর্ণাট রাজ্য স্থাপিত হই-য়াছে, ইহা জানা যাইতেছে।

৩৮। আরট্ট দেশের ঘোড়ার প্রশংসা আছে। আরট্ট দেশ পঞ্জাবসীমান্তস্থ কোন দেশ।

৩৯। কর্ণ অঙ্গের বংশে উৎপন্ন। রাজা সত্যকর্ম্মার সূত অধিরথ, কর্ণকে পালন করেন। তজ্জন্য কর্ণকে সূত-পুত্র বলা হইয়াছে।

৪০। গর্গ, ভরদ্বাজ ও মৌদ্গল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের ক্ষত্রিয়বৃত্তি ছিল।

৪১। পুরুবংশের বিস্তর ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

৪২। গৌতমপুত্র শতানন্দ। শতানন্দের পুত্র শত-ধৃতি। শতধৃতির পুত্রকন্যা কৃপ কৃপী। কৃপাচার্য্যকে শর-দ্বান্ ঋষির পুত্রও বলা হইয়াছে।

৪৩। শান্তনু রাজা একজন অদ্বিতীয় চিকিৎসক ছিলেন। তিনি যাহাকে কর দ্বারা স্পর্শ করিতেন সে আপনাকে রোগমুক্ত মনে করিত। শান্তনু মহাভিষক্ পদবী লাভ করেন।

৪৪। জনমেজয়ের পুত্র শতানীক এক অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। শতানীকের পুত্র অধিসোম-কৃষ্ণের রাজত্ব কালে এই পুরাণ প্রণীত হয়। এই কথা বলার পর পুরাণ, ভবিষ্যৎ ঘটনার বর্ণনা আরম্ভ করিয়া-ছেন। অধিকাংশ পুরাণেই এই রীতি অনুসৃত হইয়াছে। বৈদিক কালে পুরাণ নামে কতকগুলি উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। বেদব্যাস, সে গুলি সঙ্কলন করিয়া চতুর্লক্ষ শ্লোকাত্মক এক পুরাণসংহিতা রচনা করিয়া শিষ্য প্রশিষ্যগণের মধ্যে ইহার পঠনপাঠনা বিভক্ত করিয়া-ছেন। এই পুরাণগুলি অতি প্রাচীন, তজ্জন্য ইহাতে আর্ষ প্রয়োগের এত আধিক্য দৃষ্ট হয়। এখন যে সকল পুরাণ আমরা দেখিতে পাই, তাহা অনেক সংস্করণের পর আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভবিষ্য ঘটনা বর্ণনার পূর্ব্বেই পুরাণগুলি আপনাদের রচনার সময় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্য ঘটনা বর্ণনা যে পরবর্ত্তী সংযোজনমাত্র, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

বাঙ্গালীজাতি ও ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট।

ইংরেজরাজত্ব প্রতিষ্ঠাদ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষ নানা-প্রকারে উপকৃত হইয়াছে। কিন্তু চিন্তা করিলে প্রতীয়-মান হয় যে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের নিকট বাঙ্গালীজাতি যত ঋণী, ভারতের অন্য কোন জাতিই তত নহে। শান্তি-শিক্ষা প্রভৃতি ইংরেজ রাজত্বের সুফলে সমুদয় ভারত-বাসীই সমভাবে অধিকারী। কিন্তু বিধাতার বিধানে যে সকল ঘটনাদ্বারা এদেশে ইংরেজ অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়,

তাহাদের অপূর্ব্ব সমবায়ে বঙ্গদেশ অনন্যপ্রদেশভোগ্য কতকগুলি সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বাঙ্গালীজাতি বিশেষ গৌরবজনক কোন পদচিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে নাই। আমরা যে আর্য্যদিগের সন্তান বলিয়া সময়ে অসময়ে তারস্বরে চীৎকার করিয়া আসি, সেই আর্য্যদিগের সহিত বাঙ্গলার সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অধিকন্তু বাঙ্গালী জাতির অতি অল্পাংশই আর্য্যশোণিতে দাবী করিতে পারে। আর্য্যাধিকারের পর হইতে ভারতের গৌরব ও ইতিহাসের আরম্ভ। আর্য্যগণ অতি ধীর পদক্ষেপে সিন্ধুতট হইতে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে অগ্রসর হন। বাঙ্গলা ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত; তাই এদেশে আর্য্যাধিকার অতি বিলম্বে স্থাপিত হয়, এবং আর্য্য প্রতিভাও যেন মগধ পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়াই স্তিমিত হইয়া পড়ে। বেদ, উপনিষৎ, সাহিত্য, দর্শন, সংহিতা, জ্যোতিষ প্রভৃতি যাহা লইয়া আমরা স্ফীতবক্ষে সদর্প হুঙ্কারে বিদেশীয়দিগের প্রতি অবজ্ঞা বর্ষণ করি, সে সব অতি অল্প পরিমাণেই বঙ্গদেশের গৌরবের কারণ। অতি প্রাচীনকালে ভারতের যেসকল পুণ্যভূমির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে বঙ্গদেশের বিশেষ কোন যশোগীতি নাই। মধ্যযুগে পঞ্জাব, সিন্ধু, রাজপুতানা, মালব, কান্যকুব্জ, মগধ, গুজরাত ও দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থান ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে নানা অভিনয়ে ব্যাপৃত ছিল। সেই সব যুগের ভারতবর্ষ হইতে বঙ্গদেশকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিলেও ইতিহাসের অনুভূতব্য কোন ইতর বিশেষ হইবে না। পাল ও সেন রাজাদের সময়ে বঙ্গদেশ ক্ষণকালের জন্য জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিয়াছিল মাত্র। গৌড়, তাম্রলিপ্ত, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি প্রাচীন ঐশ্বর্য্যশালী নগরের অস্তিত্ব সত্ত্বেও বঙ্গদেশ কখনও ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে নাই। বাহুবলের লীলাপ্রসঙ্গেও বাঙ্গালীদের বিশেষ কোন কীর্ত্তি নাই। মোগলরাজত্বে বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সহিত অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠ ভাবে গ্রথিত হয়। সে সময়ে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি শিল্পপ্রধান সমৃদ্ধিশালী নগরেরও উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু মুসলমান আমলে পশ্চিম ভারতের অধিবাসিগণ যে অক্ষয়কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার সম্মুখে তদানীন্তন বাঙ্গালীদের মুখ নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। বাঙ্গালীদিগের গৌরবের একমাত্র উপকরণ বিদ্যাবিষয়ক। বঙ্গের কয়েকজন ধুরন্ধর সন্তানের উদ্যমে নবদ্বীপ এক অপূর্ব্ব সারস্বতকুঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। সুতীক্ষ্মনীষাসম্পন্ন রঘুনাথ শিরোমণির ন্যায় দার্শনিক বঙ্গভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অন্যান্য অনেক পণ্ডিতেরও নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু এসকলও আধুনিক। বিশেষতঃ নবদ্বীপের উন্নতির সময়ে বিদ্যাবিষয়েও বাঙ্গালীরা অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের অপেক্ষা উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছিল কি না, ঠিক বলিতে পারি না।

কিন্তু ইংরেজরাজত্বে বাঙ্গলার অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপরীতভাবাপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন ভারত হইতে বাঙ্গলাকে বাদ দেওয়া যায়; কিন্তু ইংরেজরাজত্বে বাঙ্গলার ইতিহাস 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' আখ্যা পাইতে পারে। ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে ভারতবর্ষ এখন বাঙ্গলার অনুগমন করিতেছে। পরাজিত জাতির রাজনীতি নাই বলিলেই চলে। তথাপি রাজসেবায় বাঙ্গালীরা ভারতের সর্ব্বোচ্চ আসনে উপবিষ্ট; এবং রাজনীতির সমালোচনা ও সংস্কারের চেষ্টায় অন্য প্রদেশ সকল বাঙ্গালীদের নেতৃত্ব মানিয়া চলিতেছে। শিক্ষা ও সভ্যতায় বাঙ্গলা এখন ভারতের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক মানবপ্রেমিক মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গমাতার ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়াছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীযুগল অধ্যাপক বসু ও রায় উদ্ভাবনক্ষমা প্রতিভা প্রদর্শন করিয়া ইয়ুরোপীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর সম্মানভাজন হইয়াছেন। ভারতসাহিত্যোদ্যানে বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিকশিত। মধুসূদনের ন্যায় অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন কবি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাশালী চিত্রকর যে সাহিত্যকে নানা রত্নরাজিতে ভূষিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই গৌরবের সামগ্রী। ঘটনাচক্রের অভাবনীয় আবর্ত্তনে সিপাহী যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী যোদ্ধা বাঙ্গালী সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস।

এতদ্ব্যতীত, পরমহংস রামকৃষ্ণদেব, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল, দ্বারকানাথ মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এবং জীবিত ও মৃত আরো বহু কৃতকর্ম্মা পুরুষ বাঙ্গালীজাতিকে সম্মানিত ও সম্মানার্হ করিয়াছেন। ইঁহাদের কৃতিত্বে এখন বাঙ্গালীজাতি পৃথিবীর নিকট পরিচিত হইয়াছে। সত্য বটে, ইংরেজরাজত্বে প্রেমাবতার চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম্মসংস্থাপক অথবা নবদ্বীপের প্রাচীন নৈয়ায়িকদের ন্যায় দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেন নাই; কিন্তু বিগত শতাব্দীতে বঙ্গদেশে যেসকল প্রতিভাশালী লোকের জন্ম হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকে পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের শ্রেষ্ঠ লোকদিগের সমকক্ষ। ইংরেজরাজত্বে ভারতের অন্য কোন প্রদেশই এরূপ প্রতিভাবিকাশে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। পার্সীদিগের স্বাভাবিক প্রবণতা ও পশ্চিমোপকূলের প্রাকৃতিক সুবিধা বশতঃ বোম্বাই প্রদেশ শিল্পবাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছে; তথাপি ধনবত্তায় রত্নপ্রসূ বাঙ্গলাই ভারতে প্রথমস্থানীয়। বিশেষতঃ অধুনা শিল্পবাণিজ্যে বাঙ্গালী যুবকদিগের দৃষ্টি যে ভাবে আকৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় সেবিষয়ে শীঘ্রই বাঙ্গলায় নবযুগের প্রবর্ত্তন হইবে। এই সকল চিন্তা করিয়া মনে হয়, অন্যান্য প্রদেশ সম্বন্ধে যাহাই হউক, ইংরেজরাজত্বে বাঙ্গালীজাতির ক্রমোন্নতিই হইতেছে, এবং ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীদের নিকট যত কৃতজ্ঞতার পাত্র, ভারতবর্ষের অন্য কোন জাতির নিকট তত নহে।

এস্থলে এ কথাও বক্তব্য যে, বাঙ্গালী জাতির স্বাভাবিক প্রতিভা না থাকিলে কখনও এই উন্নতি সম্ভব হইত না। দেড় শত বৎসরে অসভ্যকে সুসভ্য করা যায় না; ক্ষীণমস্তিষ্ক বর্ব্বরকে সুশিক্ষিত তীক্ষ্ণধী নাগরিকে পরিণত করা যায় না। সাঁওতালেরা এখনও সেই অসভ্য সাঁওতালই আছে। ফলতঃ ইতিপূর্ব্বে আর্য্যবংশীয় উচ্চশ্রেণীস্থ বাঙ্গালীরা শক্তি সংগ্রহ করিতেছিলেন; নিম্নশ্রেণীস্থ অনেকেও তাঁহাদের সভ্যতার অধীনে দীর্ঘকাল বাস-নিবন্ধন অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ঘটনাক্রমে বাঙ্গালীদের কতকগুলি বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়া সেই শক্তি-বিকাশের অবসর দিয়াছেন; তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে অজ্ঞাতপূর্ব্ব বাঙ্গালী জাতি ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ইংরেজরাজত্বে বাঙ্গালীদিগের অনন্যসাধারণ সুবিধাগুলি কি, এখন একে একে তাহারই উল্লেখ করিব।

প্রথমতঃ, ইংরেজের অধীনেই বঙ্গবাসিগণ জাতিত্ব লাভ করিয়াছে। শিখ, রাজপুত, মারাঠা প্রভৃতি জাতি ইংরেজাধিকারের পূর্ব্বেই ন্যূনাধিক পরিমাণে জাতিত্বের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু বাঙ্গালীর অদৃষ্টে তাহা ঘটে নাই। বঙ্গবাসিগণ চিরকালই বহুধাবিচ্ছিন্ন জনসমষ্টি মাত্র। রাজনৈতিক ভাবে সমগ্র বাঙ্গলা কখনও একীভূত হয় নাই। মুসলমানদিগের আধিপত্যও সম্যক প্রসার লাভ করে নাই। পূর্ব্বে ও উত্তরে সুবিস্তৃত ত্রিপুরা ও কুচবিহার রাজ্য চিরকাল আপনাদের অক্ষুণ্ণতা রক্ষা করিয়াছে। আরাকান রাজ্যও পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কতকাংশ আত্মসাৎ করিয়া রাখিয়াছিল। তদ্ব্যতীত বাঙ্গলার নানা অংশে তেজোদৃপ্ত স্বাধীন ও অর্দ্ধস্বাধীন ভূস্বামিগণ নিরন্তর বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া মুসলমান সুবাদারদিগকে উত্তেজিত করিতেন। শোণিত বা সমাজবন্ধন বিষয়ে উত্তরে কোচ্, গারো, ম্যাচ্ প্রভৃতি, পূর্ব্বে টিপরা, কুকি প্রভৃতি, চট্টগ্রাম অঞ্চলে মগ, পশ্চিমে সাঁওতাল এবং বাঙ্গলার নানস্থানবিহারী অস্থায়িনিবাস বেদিয়া ও বমুয়া প্রভৃতির সহিত ব্রাহ্মণ বৈদ্যাদির যত প্রভেদ, ইয়ুরোপের কোন দুই জাতির মধ্যে তত পার্থক্য নাই। ইহাদের ভাষা, ধর্ম্ম প্রভৃতিও বহু পরিমাণে বিভিন্ন ছিল। এখনও ইহারা মিশিয়া যায় নাই; কিন্তু ইংরেজরাজই সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলায় একচ্ছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; এবং তাহারই ফলে উক্ত সমস্ত অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতি উন্নত হিন্দুদিগের সভ্যতা গ্রহণ করিতেছে, এবং তাহাদের সহিত এক সুবৃহৎ জাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। আইন, ভাষা, শিক্ষা প্রভৃতির সাম্যসাধন দ্বারা ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলার এই এক বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। এ বিষয়ে শিখ, রাজপুত, মারাঠা প্রভৃতি জাতি ইংরেজের নিকট এতদূর ঋণী নহে।

ইংরেজরাজত্বে বাঙ্গলার দ্বিতীয় বিশেষ লাভ বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা। বাঙ্গলার কখনও বাহুবল ছিল না। আমি এমন কথা বলি না যে, বাঙ্গলার লোক কখনও যুদ্ধ করিতে জানিত না। ব্যক্তিগতভাবে প্রাচীন বাঙ্গালীগণ সাহস ও যুদ্ধকৌশল প্রদর্শন করিতে পারিত, তাহা আমরা জানি। কিন্তু জাতীয়শক্তি একতাসাপেক্ষ। বাঙ্গলার সেই একতা ও জাতীয় ভাব কখনও পরিস্ফুট হয় নাই; তাই বাঙ্গালী চিরকাল বিদেশীয় শত্রুর নিকট নতমস্তক হইয়াছে। সত্য বটে, বাঙ্গলায় সীতারাম ও প্রতাপাদিত্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দ সিংহ, রণজিৎ বা শিবাজীর ন্যায় তাঁহাদের সাধনা সিদ্ধ হয় নাই। তাই যে সঞ্জীবনীমন্ত্রবলে শিখ ও মহারাষ্ট্রীয়েরা অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল, বাঙ্গলায় তাহার একান্ত অভাববশতঃ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কখনও স্বদেশরক্ষার শক্তি সুবিকশিত হয় নাই। আজ বীরসিংহ শিখ ও মারাঠগণ দুর্ভিক্ষে উপবাসে প্রাণত্যাগ করিতেছে; অথচ দুর্ব্বলবাহু বাঙ্গালীগণ অপেক্ষাকৃত স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। যদি ইংরেজের ন্যায় প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজার শাসন না থাকিত এবং পূর্ব্বের ন্যায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশসমূহ পরস্পরকে শত্রুভাবেই দেখিত, তবে গত দুই ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময়ে শিখ ও মারাঠাদিগকে ভারতের শস্যভাণ্ডার বাঙ্গলার দ্বারদেশে ভীমবলে মুহুর্মুহুঃ আঘাত করিতে দেখিতাম, ইহা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বলা যাইতে পারে। মোগলরাজত্বের অবসানে সে অঙ্কের অভিনয়ও আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ব্বে আরকানরাজ, সমুদ্রে পর্টুগীজগণ এবং পশ্চিমে জয়োন্মত্ত মারাঠাগণ বাঙ্গালীদিগকে কতই না বিপদাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। বস্তুতঃ শিখ, রাজপুত, মারাঠা প্রভৃতি জাতির এশিয়ার অন্যান্য জাতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সামর্থ্য ছিল; কিন্তু আমাদের সেই সামর্থ্য ছিল না। আর বহিঃশত্রু হইতে আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে যে কোন প্রকার সুখসম্পদ্ বা উন্নতির আশা থাকে না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তাই ইংরেজ গবর্ণমেন্ট আমাদিগকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ইংরেজ রাজত্বে বাঙ্গলার অনন্যসাধারণ তৃতীয় লাভ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। বাঙ্গলার বাহিরেও দুই এক স্থানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে বটে; কিন্তু সে সব স্থানের পরিমাণ অতি সামান্য। মোটের উপর বাঙ্গলা ব্যতীত সমস্ত ভারতবর্ষের জমিদার গবর্ণমেণ্ট, এবং খাজনা চিরবর্দ্ধনশীল। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস বাঙ্গলায় ভূমির রাজস্বের চিরস্থায়ী পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে অপরিমেয় কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের ধনের ইদানীন্তন উপকরণ একমাত্র ভূমি। শ্রমজীবিসংখ্যার বাহুল্য সত্ত্বেও মূলধন অভাবে উৎপন্ন ধনের পরিমাণ অতি সামান্য। মূলধনসাপেক্ষ শিল্পবাণিজ্য ভারতবাসীর হস্তে নাই বলিলেই চলে। যে সকল শিল্প অল্প মূলধন সাধ্য, সেগুলিও ইয়ুরোপীয় বিজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জীবন্মৃত হইয়া আছে। কাজেই এই ত্রিশ কোটি লোক এখন একমাত্র ভারতভূমির অতুলনীয় উর্ব্বরতার বলে কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষা করিয়া আছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের সীমান্তনীতি ও তদ্বৎ লোচনাভিভাবক অন্যান্য আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্যকলাপ শ্রমশীল কৃষকের দুই বাহুর উপরেই নির্ভর করিতেছে। ভারতের সুবৃহৎ নগর ও বিলাসিবাঞ্ছিত মর্ম্মরনির্ম্মিত সুশোভন অট্টালিকাসমূহও কৃষিক্ষেত্র হইতে অপহৃত অর্থেরই পরিণতি। এদেশে উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যশালী যে সব শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদেরও আয়ের প্রত্যেক পাই প্রত্যক্ষ বা গৌণ ভাবে কৃষকগণই উৎপন্ন করিতেছে। যে দেশ এরূপ অনন্যগতি, তথায় কৃষির আয়ের প্রত্যেক কপর্দ্দক পর্য্যন্ত অতি মূল্যবান্। তত্রত্য ভূমির রাজস্ব স্বরূপে ক্ষেত্রজাত দ্রব্য যদি ক্রমবর্দ্ধিত হারে লোকের হস্তচ্যুত হয়, তবে জাতীয় দুঃখের পরিমাণ ক্রমে গুরু হইতে গুরুতর না হইয়া থাকিতে পারে না। তাই বাঙ্গলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। সভ্যতাসঙ্গত সমুদয় কার্য্যই অর্থসাপেক্ষ। শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, যাহাই হউক না কেন, গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইয়া কিঞ্চিৎ সঞ্চয় না হইলে ইহার কিছুরই অস্তিত্ব সম্ভবে না। বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রজা-

দের হাতে যৎকিঞ্চিৎ বাঁচিয়া যায়; তাহার দরুণই বঙ্গদেশে দ্রুতবেগে শিক্ষাবিস্তার ও অন্যান্য নানাবিধ উন্নতি হইতেছে। কিন্তু ভারতের অপরাপর প্রদেশে ভূমির রাজস্বের চিরবর্দ্ধনশীলতাবশতঃ প্রজাদের কপর্দ্দকও সঞ্চয় হয় না। তাই আজ দুর্ভিক্ষের ভীষণ বদনব্যাদানে তত্তৎস্থানের অধিবাসিগণ শিহরিয়া উঠিতেছে। ইহাই ইংরেজ-রাজত্বে বাঙ্গলার অন্যান্য প্রদেশ হইতে অবস্থা বৈপরীত্যের প্রধান কারণ। লর্ড কর্ণওয়ালিসের কৃপায় আমরা অধিকতর বীর্য্যবান্ ভারতবাসীদের অপেক্ষা সুখস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছি।

ইংরেজরাজত্বে বাঙ্গালীজাতির চতুর্থ বিশেষ লাভ বঙ্গদেশে রাজধানী প্রতিষ্ঠা। পাটলীপুত্র দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল বটে; কিন্তু তাহাও মগধে, নিজ বাঙ্গলায় নহে। ইংরেজেরাই বঙ্গদেশকে রাজলক্ষ্মীর অধিষ্ঠানভূমি করিয়াছেন। সকল দেশেই রাজধানী প্রতিভা ও ধনের কেন্দ্রস্থল। দেশের সর্ব্বাংশ হইতে অর্থ শোষণ করিয়া রাজধানী স্বীয় শোভা সম্বর্দ্ধন করে; এবং দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ রাজধানীকেই আপনাদের জীবনের রঙ্গভূমিরূপে আশ্রয় করেন। তাই রাজধানী ও তন্নিকটবর্ত্তী ভূভাগ শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতিতে অন্য সকল স্থান হইতে উন্নত হয়। তথাকার অধিবাসীদিগের সুবিধা ও সুযোগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মুসলমান রাজত্বে সমগ্র ভারতের প্রকৃতিপুঞ্জের শ্রমার্জ্জিত অর্থ দ্বারা দিল্লী ও আগরা নগরী অমরাবতীর শ্রীধারণ করিয়াছিল। এক তাজমহল বাঙ্গলার কত রক্ত শোষণ করিয়াছে, কে বলিতে পারে? তৎপূর্ব্বেও বঙ্গদেশ কখনও ভারতের রাজমাতা হইতে পারে নাই। উজ্জয়িনী, পাটলীপুত্র, কান্যকুব্জ প্রভৃতি মহানগরী সকল স্বস্ব সৌভাগ্যসময়ে ভারতের রাজমুকুট ধারণে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেণ্টই কলিকাতার প্রতিষ্ঠা করিয়া বাঙ্গলার অদৃষ্টস্রোত পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। সত্য বটে, বৈদেশিক রাজার আধুনিক রাজধানী কলিকাতা কোনমতেই পূর্ব্বকালের রাজধানীগুলির সহিত তুলিত হইতে পারে না। তথাপি কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের স্থিতি যে নানাপ্রকারে বাঙ্গালীজাতির উপকার করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ। যদি কখনও কলিকাতা হইতে স্থায়িভাবে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়, তবে আমাদের নিতান্ত দুর্দ্দৈব বলিতে হইবে।

বাঙ্গালীজাতি ইংরেজের নিকট অনন্যপ্রদেশলব্ধ যে উপকারগুলি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আলোচিত হইল। কিন্তু একটী বিষয়ে আমরা অন্য প্রদেশবাসীদের অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে ভীরু কাপুরুষ করিয়াছেন। একতাজনিত বাহুবল বাঙ্গালীর ছিল না বটে, কিন্তু বাঙ্গালীর মহাস্ত্র লাঠী ছিল; এবং তাহারই বলে ব্যক্তিগত জীবনে বাঙ্গালীর শৌর্য্যবীর্য্যের অভাব ছিল না। আজকালকার ঐতিহাসিক গবেষণা হইতে এতৎ সম্বন্ধে আমরা অনেক তথ্য অবগত হইতেছি। কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে এখন এমন ছাঁচে ঢালিয়াছেন যে, যুদ্ধের নামে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; এবং আমরা কাপুরুষের জাতি বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠিত হই না। বাঙ্গালীজাতির এই হৃতবীর্য্যতা বাঙ্গলায় ইংরেজ শাসনের সর্ব্বপ্রধান কলঙ্ক।

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে ভারতের অন্যান্য জাতি হইতে বাঙ্গালীজাতির সহিত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন; এবং মোটের উপর ভারতবর্ষে ইংরেজরাজত্ব দ্বারা বাঙ্গালীরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকৃত হইয়াছে।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেব মামলেদার।

এই মহাত্মার প্রকৃত নাম যশোবন্ত মহাদেব ভোসেকর। ইনি দেবতার ন্যায় পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতেন বলিয়া আপামর সাধারণে ইঁহাকে দেব মামলেদার বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। বাঙ্গলা দেশে সব্-ডেপুটি-কালেক্টর যেরূপ পদ, দাক্ষিণাত্যে মামলেদার তাহার অনুরূপ। ইঁহার পিতার নাম মহাদেব ঢুণ্ডো এবং মাতার নাম হরিবাঈ ছিল। তাঁহাদের উভয়েরই ধর্ম্মে মতি ছিল। পরহিতসাধনে তাঁহারা অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন। দাক্ষিণাত্যের শোলাপুর জেলায়

পত্যরপুর তালুকের অন্তর্গত ভোসে গ্রামে মহাদেবের বাসস্থান। ইনি ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন। হরিবাঈ যখন পুনা নগরে তাঁহার পিতৃগৃহে ছিলেন, সেই সময় যশোবন্তের জন্ম হয়। ১৭৩৭শকের (১৮১৫ খৃষ্টাব্দের) ভাদ্র মাসে ইনি ভূমিষ্ঠ হয়েন।

চারি বৎসর বয়সে যশোবন্ত তাঁহার সমবয়স্কদের সহিত খেলা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার হৃদয় করুণারসে পূর্ণ ছিল। সমবয়স্কদের মধ্যে যদি কেহ কোন প্রকার আঘাত পাইত, তিনি যত্নের সহিত তাহার শুশ্রূষা করিতেন। সাত বৎসর বয়সে তাঁহাতে দেবভক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি প্রতিদিন স্নান করিয়া পূজার ঘরে বসিতেন এবং তাঁহার পিতা ও মাতা কি প্রণালীতে পূজা করেন, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক দেখিতেন। পূজা শেষ হইলে দেবতার চরণামৃত ও প্রসাদ লইয়া ঘরের বাহির হইতেন। ভোজনের পর বয়স্যদের সহিত খেলা করিবার সময় যশোবন্ত কোন শিলার উপরে ফুল ও জল দান করিতেন, এবং অন্যান্য বালকদের লইয়া সেই শিলাটীর সমক্ষে বিঠ্ঠল *, বিঠ্ঠল বলিয়া করতালি দিতেন এবং মহা আনন্দে নৃত্য করিতেন। অষ্টম বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার ভাবী উন্নতির আভাস দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ যত্ন ছিল। তাঁহার হৃদয় যেমন দয়াতে পূর্ণ ছিল, তাঁহার আত্মাও সেইরূপ সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার বয়স্যদের মধ্যে কাহারও কোন দ্রব্যের অভাব হইলে তিনি সাধ্যমত তাহা পূর্ণ করিতেন। মহাদেব ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার পুত্রকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহা গোপন করিতেন না এবং স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন যে, কষ্ট পাইতেছিল বলিয়া তিনি তাহাদের সাহায্য করিয়াছেন। যশোবন্ত তাঁহার পিতামাতার বড় বাধ্য ছিলেন। তিনি আগ্রহের সহিত তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিতেন। তাঁহার কোন বয়স্য তাঁহাকে গালি দিলে কিম্বা প্রহার করিলে তিনি তাহার প্রতিহিংসা করিতেন না। স্থিরভাবে সমুদয় সহ্য করিতেন, এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার পিতামাতাকেও কোন কথা বলিতেন না। তাঁহার এই সকল অসাধারণ কার্য্য কখন কখন তাঁহার প্রতিবেশিগণ জানিতে পারিতেন। তাঁহারা বালকটীর ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইতেন, এবং তিনি যে ভবিষ্যতে একজন মহাপুরুষ হইবেন, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার যজ্ঞোপবীত সংস্কার হইয়াছিল। এখন হইতে তিনি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম সকল নিয়মপূর্ব্বক করিতে- লাগিলেন। একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে, তিনি লেখাপড়ায় অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার পর বৎসর তাঁহার বিবাহ হয়। এই সময় হইতে যশোবন্ত তাঁহার পিতাকে বিষয়কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি অল্পকাল মধ্যেই হিসাব আদি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইলেন। তদনন্তর তাঁহার মাতুল তাঁহাকে লইয়া কোপন নামক গ্রামে গমন করিলেন, এবং তাঁহার চেষ্টায় তিনি তথাকার মামলেদারের কার্য্যালয়ে দশ টাকা বেতনে কারকুনের পদে নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৬ বৎসর। যশোবন্ত দক্ষতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার বেতনও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে তিনি ৮০৲ টাকা বেতনে চাল্লিসগাও তালুকের মামলেদারের পদ পাইলেন। এই পদে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ১৭৫৲ টাকা বেতনে, একওল নামক তালুকে গমন করিলেন। এখানে তিনি চারি বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

যশোবন্ত রাওয়ের সদ্‌গুণ সকল এই স্থানে সম্পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। তাঁহার ধীরতা, নম্রতা, পরদুঃখ-কাতরতা, উদারতা, সদাচার, ঈশ্বরনিষ্ঠা এবং বৈরাগ্য দেখিয়া আপামরসাধারণে তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিত। তিনি সকলের সহিত সদালাপ করিতেন। কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন না। তিনি যেমন একদিকে লোকের প্রিয় হইয়াছিলেন, অন্যদিকে গবর্ণমেণ্টও তাঁহার প্রতি তেমনই সন্তুষ্ট ছিলেন। যশোবন্ত রাও লোভশূন্য ও পক্ষপাতশূন্য হইয়া অতি দক্ষতার সহিত মামলেদারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি রাজপুরুষগণকে বিশেষ রূপে

* দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণ বিঠ্ঠল নামে অভিহিত।

সাহায্য করাতে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

আমড়নের তালুকে অবস্থিতিকালে তাঁহার ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার গুণগ্রামে সকলে আবদ্ধ হইল। বিশেষতঃ তাঁহার দয়াগুণ সকলকে মুগ্ধ করিল। কোন ব্যক্তির কষ্ট দেখিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। সাধ্যমত তাহার দুঃখ দূর করিতেন। তাঁহার স্ত্রী সুন্দরবাঈও নানা গুণে ভূষিতা ছিলেন। তিনি যথার্থই যশোবন্ত রাওয়ের সহধর্ম্মিণীর কার্য্য করিতেন। অতিথি সৎকারে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। যশোবন্ত রাও লোককে অকাতরে অন্নদান করিতেন। শাস্ত্র এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ দলে দলে তাঁহার বাটীতে আগমন করিত। তিনি অতি যত্নের সহিত সকলকে অভ্যাগনা করিতেন এবং তাঁহার স্ত্রী অন্নপূর্ণার ন্যায় তাহাদিগকে অন্ন বিতরণ করিতেন। তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ ৭০।৭৫ জন লোক ভোজন করিত। এত লোকের ভোজনের ব্যবস্থা করা তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে সহজ ছিল না। সুতরাং যশোবন্ত রাওকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এই সময় হইতে তিনি লোকের কাছে সমধিক সম্মান পাইতে লাগিলেন। সকলে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতে লাগিল এবং তিনি "দেব মামলেদার" আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

ইহলোকে কেহ সম্পূর্ণরূপে সুখী হইতে পারে না। এমন দেখা গিয়াছে যে, যিনি অপরের হিতব্রতে জীবন যাপন করেন, মধুর সম্ভাষণে সকলকে পরিতুষ্ট করেন এবং ভগবানের আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন, তিনিও দুষ্ট লোকের চক্রান্তে পড়িয়া দুঃখভোগ করিয়া থাকেন। যশোবন্ত রাও দুষ্ট লোকের চক্রান্তে পড়িতেন। অপরের হিতসাধন যাঁহার জীবনের একটী প্রধান ব্রত ছিল, যাঁহার কাছে শত্রুমিত্র ভেদ ছিল না, যিনি অনিষ্টকারীর উপকার করিতেন, এবং যিনি শত্রুকেও মিত্র করিয়া লইতেন, তাঁহার বিরুদ্ধে লোকের চক্রান্ত বিস্ময়জনক বলিতে হইবে। কিন্তু মন্দ লোকের স্বভাব অতি বিচিত্র। স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিবার জন্য তাহারা না করিতে পারে, এমন কার্য্যই নাই। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি লোক যশোবন্ত রাওয়ের নামে এই বলিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিল যে, তিনি সমস্ত দিনই লোকজনকে সম্ভাষণ ও তাহাদের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার বিষয়কার্য্যে ত্রুটী হইয়া থাকে। বোধ হয়, তাঁহার অধীনস্থ উৎকোচগ্রাহী কর্ম্মচারিগণ তাঁহার বিপক্ষে আবেদন করিয়াছিল। এই আবেদনের ফলে যশোবন্ত রাও কর্ম্মচ্যুত হইলেন। তিনি নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে কিছু লেখেন নাই। কিছু দিন পরে কমিশনর সাহেব জানিতে পারিলেন যে, যশোবন্ত রাও নির্দ্দোষী। তখন তিনি তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্ব পদে সংস্থাপিত করিলেন। ইহার পর তিনি কয়েকটী তালুকে মামলেদারের কার্য্য করিয়াছিলেন। যেখানে অবস্থিতি করিতেন, সেই স্থানেই পরহিতসাধনে সময় অতিবাহিত করিতেন। সাহাদাতে অবস্থিতিকালে একে একে তাঁহার মাতা ও পিতা স্বর্গারোহণ করিলেন। এই দুইটী ঘটনা তাঁহাকে অতিশয় মুহ্যমান করিল। যশোবন্ত রাও তাঁহার পিতা ও মাতাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। কার্য্যালয়ে কিম্বা অপর কোন স্থানে গমন করিবার পূর্ব্বে অথবা কোন বিশেষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় তিনি তাঁহাদের চরণ বন্দন করতঃ অনুমতি গ্রহণ করিতেন।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে যশোবন্ত রাও সাটানা নামক তালুকে গমন করিলেন। এখানে অবস্থিতিকালে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে এ প্রকার ব্যাপ্ত হইল যে, দূরদেশ হইতে লোকে তাঁহাকে দর্শনার্থ আগমন করিতে লাগিল। অনেকে তাঁহাকে নৈবেদ্যসহ ধনরত্ন দিত। তিনি নৈবেদ্যগুলি গ্রহণ করিয়া তাহা দীন ব্যক্তিগণকে দিতেন, কিন্তু ধনরত্ন প্রত্যর্পণ করিয়া তাহা সৎপাত্রে দান করিতে বলিতেন। পরে তাহাদিগকে নানাপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করিতেন। এখানকার অধিবাসিগণও তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তিনি যে পথ দিয়া কার্য্যালয়ে গমন করিতেন, সে পথটী অতি পরিচ্ছন্ন থাকিত। গৃহস্থগণ আপন আপন বাটীর সম্মুখ পরিষ্কার করিয়া রাখিত এবং রমণীগণ যত্নসহকারে আলিপনা দিত। তিনি যখন সন্ধ্যার সময়ে কার্য্যালয় হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেন, সে সময়ে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হইত। গৃহস্থগণ নিজ নিজ গৃহের সম্মুখ আলোকমালায় সজ্জিত করিত।

এই সময়ে মহারাজা সিন্ধিয়ার নিমন্ত্রণে যশোবন্ত রাও বোম্বাই নগরে গমন করিয়াছিলেন। মহারাজার অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কয়েক দিনের অবকাশ দিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া তিনি একজন ধনী ব্যক্তির বাটীতে অবস্থিতি করিলেন। বিশ্রামের পর রাজদর্শনে গমন করিলেন। মহারাজা তাঁহাকে বিশেষরূপে অভ্যর্থনা করিয়া, রত্নখচিত ভূষণ, ৫০০৲ টাকা এবং ফল ও মিষ্টান্ন তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, এবং তাঁহার সহিত সদালাপ করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষে, মহারাজা বলিলেন যে, তিনি অবগত হইয়াছেন যে, যশোবন্ত রাও সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। তিনি এই ঋণ পরিশোধ করিবেন, এবং যাহাতে রাও সাহেব অন্যান্য সৎকার্য্য করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এই সকল কথা শুনিয়া যশোবন্ত রাও আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং তজ্জন্য তিনি মহারাজাকে ধন্যবাদ দিলেন। পরে বিনয়সহকারে বলিলেন যে, তিনি গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়া থাকেন, সুতরাং মহারাজার প্রদত্ত ভূষণ ও টাকা এবং অন্যান্য সাহায্য তিনি গ্রহণ করিতে পারেন না। তদনন্তর, উভয়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক আলাপ করিলেন। এই উপলক্ষে মহারাজা, যশোবন্ত রাওয়ের সম্মানের জন্য মহা সমারোহ করিয়াছিলেন। তিনি পাঁচ দিন নগরের লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া ফল ও মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন। গান ও বাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতগণকে বিদায় দিয়াছিলেন। ষষ্ঠ দিবসে মহারাজা রাও সাহেবকে লইয়া নাসিক পর্য্যন্ত গমন করিলেন। এখানকার ষ্টেশন হইতে যশোবন্ত রাও, মহারাজার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সাটানায় প্রত্যাগমন করিলেন।

যশোবন্ত রাও, আর এক সময়ে খ্যাতনামা নানা শঙ্কর শেঠের নিমন্ত্রণে বোম্বাইয়ে গমন করিয়াছিলেন। এবারেও তিনি শেঠজী এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট সমাদর পাইয়াছিলেন। এখান হইতে অনুরুদ্ধ হইয়া, তিনি পুনা নগরে গমন করিলেন। এখানেও তাঁহার যথেষ্ট সমাদর হইল। সাহেব ও বিবিগণ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিলেন। অধিক কি বলিব, বোম্বাইয়ের গবর্ণর মহোদয় (Sir Wm. Robert Seymour Fitzerald) যশোবন্ত রাওকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার বাটীতে লইয়া গেলেন, এবং এই উপলক্ষে পুনার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও নিমন্ত্রিত হইলেন। গবর্ণর মহোদয় রাও সাহেবকে উচ্চ আসনে বসিতে বলিলেন। যশোবন্ত রাও ইহাতে লজ্জিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি সামান্য ব্যক্তি, এ আসন তাহার শোভা পায় না। গবর্ণর মহোদয় বলিলেন যে, তিনি এখন তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের একজন কর্ম্মচারী বলিয়া সমাদর করিতেছেন না, তিনি নিজগুণে দেশপূজ্য হইয়াছেন। অতএব এরূপ ব্যক্তিকে যথোচিত সমাদর করা তাঁহার কর্ত্তব্য। ইহা শুনিয়া যশোবন্ত রাও সেই আসনে উপবেশন করিলেন। পরে গবর্ণর মহোদয় স্বহস্তে যশোবন্ত রাওয়ের গলদেশে পুষ্পহার পরাইয়া দিলেন, এবং আতর গোলাপ প্রদান করিলেন। যশোবন্ত রাও গবর্ণর মহোদয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। ইহার পর সভ্যগণসহ সদালাপের পর সভাভঙ্গ হইল। পুনাতে কয়েক দিন থাকিয়া যশোবন্ত রাও সাটানায় প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুদিন পরে কমিশনর সাহেব সাটানায় আগমন করিলেন। যশোবন্ত রাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। লোক দলে দলে রাও সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কমিশনর সাহেব স্থানীয় কলেক্টরের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন। জনতা দেখিয়া তিনি বিস্ময়ান্বিত হইলেন, এবং কলেক্টর সাহেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার প্রত্যুত্তরে কলেক্টর সাহেব বলিলেন যে, যশোবন্ত রাওকে লোকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য এত লোকের সমাগম হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া কমিশনর সাহেব বলিলেন যে, এ অবস্থায় যশোবন্ত রাওয়ের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। অতএব তাঁহাকে কার্য্য হইতে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। কমিশনর সাহেবের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইল, এবং যশোবন্ত রাও ১৮৭৩খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস হইতে কার্য্য হইতে অবসর লইয়া, পেন্‌শন ভোগ করিতে লাগিলেন।

বিষয়কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া, যশোবন্ত রাও মনের আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এখন তিনি ভগবানের আরাধনায় এবং পরোপকারে তাঁহার পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার ভাব অতি উদার ছিল। তাঁহার পরহিতসাধন কোন সম্প্রদায় কিম্বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান, তিনি সকলজাতীর সহায়হীন ব্যক্তির শুশ্রূষা করিতেন। দেবমন্দিরে, ধর্ম্মশালায় এবং মস্‌জিদে গমন করা তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্য ছিল। তথায় যে সকল ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি থাকিত, তিনি তাহাদের সেবা করিতেন।

জি, আই, পি, রেলওয়ের মান্‌মাদ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে যশোবন্ত রাও অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোকে দলে দলে এখানে আগমন করিতে লাগিল, এবং তাঁহার সম্মানার্থ উৎসব হইতে লাগিল। একদা ইন্দোরের মহারাজা, তুকোজি রাও হোলকার তীর্থ দর্শন জন্য জিজুরিতে গমন করিতেছিলেন। যাইতে যাইতে যশোবন্ত রাওয়ের মান্‌মাদের নিকটে অবস্থিতের কথা শুনিয়া তিনি বাষ্পীয় শকট হইতে অবতরণ করিলেন, এবং তথায় তিনদিন অবস্থিতি করিয়া রাও সাহেবের সহিত সদালাপ করিলেন। পরে, যশোবন্ত রাওকে, ইন্দোরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া মহারাজা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর তাঁহার ভ্রাতার অনুরোধে, যশোবন্ত রাও তাঁহার আবাসস্থান সঙ্গমনেরে কিছুকাল অবস্থিতি করিলেন। এই গ্রামটী প্রোরা এবং মহাতুঙ্গী নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের উপর অবস্থিত, এবং অনেকগুলি উদ্যানে সুশোভিত। যশোবন্ত রাও এখানে মনের আনন্দে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কি বড় কি ছোট, সকলেই তাঁহার সহিত সদালাপ করিয়া আনন্দ লাভ করিত। তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে যে বৃত্তি পাইতেন, তাহার দ্বারা তাঁহার সাংসারিক ব্যয় মাত্র নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু, যিনি এতকাল অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান এবং রোগীকে ঔষধ ও পথ্য দান করিয়াছেন, এবং অভ্যাগতদিগের সৎকারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তিনি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? বর্ত্তমান অবস্থাতেও তিনি এই সকল সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া এবং পাছে তিনি ঋণজালে আবদ্ধ হয়েন, এই আশঙ্কা করিয়া গ্রামবাসিগণ এই ব্যবস্থা করিল যে, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি তাঁহার এক একদিনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে। এই গ্রামে অবস্থিতিকালে, যশোবন্ত রাও প্রত্যহ বালাজির মন্দিরে গমন করিতেন। তিনি যে পথ দিয়া যাইতেন, গ্রামবাসিগণ সেই পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিত। তাঁহার সম্মানার্থে তাহারা স্ব স্ব বাটীর সম্মুখে বাঙ্গুলি* দিত এবং ধূপ জ্বালিয়া রাখিত। রজনীতে দীপমালা পথের অন্ধকার দূর করিত। কথিত আছে যে, এখানে অবস্থিতিকালে তাঁহার প্রদত্ত তীর্থোদক পান করিয়া কয়েকজন পীড়িত ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। লোকের যশোবন্ত রাওয়ের প্রতি এত ভক্তি ছিল যে, তাঁহা দ্বারা দেবালয় প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করাইয়া তাহারা তৃপ্তি লাভ করিত।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। লোকের কষ্টের একশেষ হইল। আহার অভাবে অনেকে হাহাকার করিতে লাগিল। কেহ কেহ মৃত্যুগ্রাসেও পতিত হইল। এই সময়ে যশোবন্তরাও বীরের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। কি প্রকারে দীন ব্যক্তিগণের জীবন রক্ষা হইবে, এই চিন্তা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। তিনি মুক্তহস্তে অন্নদান করিতে লাগিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার সহধর্ম্মিণী অন্নপূর্ণার ন্যায়, লোককে অন্ন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। যত অন্ন বিতরিত হইতে লাগিল, তত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া যশোবন্তরাও নিজ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রী প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর ন্যায়, তাঁহার অঙ্গের আভরণ ও অন্যান্য দ্রব্য বিক্রয়ার্থ তাঁহার স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। এই সমুদয় হইতে তিনি যে অর্থ পাইলেন, তাহার দ্বারা শস্য ক্রয় করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিগণের দুঃখ দূর করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ টাকা আর কত দিন থাকে? অনন্যোপায় হইয়া

---

* বাঙ্গুলি এক প্রকার আলিপনা। পিতলের এক প্রকার যন্ত্র, নানাপ্রকার রঙের গুঁড়ায় পূর্ণ করিয়া, ঘুরাইলে তাহার ছিদ্র সকল হইতে গুঁড়া বাহির হইয়া উত্তম আলিপনা হয়।

তিনি নানা স্থানে বড় লোকদের পত্র লিখিয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাঁহার প্রতি সকলের ভক্তি ছিল। সুতরাং তাঁহার কাছে যথেষ্ট টাকা আসিতে লাগিল, এবং তিনিও মনের আনন্দে আতুরদিগের দুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে একটা বৎসর অতিবাহিত হইল। ইহার পর দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইল।

ইহার পর যশোবন্তরাও, সপরিবারে মান্মাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, মহারাজা তুকোজিরাও হোলকার তাঁহাকে ইন্দোরে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। যশোবন্তরাওয়ের ইচ্ছা যে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট সময় স্বাধীন ভাবে অতিবাহিত করেন। এ জন্য তিনি মহারাজার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। কিন্তু মহারাজা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। যশোবন্তরাওয়ের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে নানা তীর্থ দর্শন করিয়া মহারাজা, যশোবন্তরাওয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহাকে তাঁহার সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। রাও সাহেব, এবার মহারাজার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ইন্দোরে প্রত্যাগমন করিয়া মহারাজা, যশোবন্তরাওয়ের জন্য একটা উত্তম অট্টালিকা নির্দ্দিষ্ট করিলেন, এবং তাঁহার সাংসারিক ও ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয়ের জন্য মাসিক বৃত্তি স্থির করিয়া দিলেন। মহারাজা এবং তাঁহার পরিজনগণ প্রতিদিন যশোবন্তরাওকে দর্শন করিতেন। এখানে অবস্থিতিকালে নানাস্থানের লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত। তিনি সকলের সহিত সদালাপ করিতেন। লোকে তাঁহাকে যে দর্শনী দিত, তিনি তাহা দীন ব্যক্তিগণকে বিতরণ করিতেন। উল্লিখিত দুর্ভিক্ষের সময় যশোবন্তরাওয়ের কয়েক সহস্র টাকা দেনা হইয়াছিল। মহারাজার মাতাঠাকুরাণী তাহা পরিশোধ করিয়াছিলেন।

ইন্দোরে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া যশোবন্তরাও খাণ্ডোয়া ও পুনা হইয়া ত্র্যম্বক নামক স্থানে গমন করিলেন। এখানে অবস্থিতিকালে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁহার আবাসগৃহের দেয়ালে ঠেস দিয়া বিষ্ণুনাম জপ করিতেছিলেন। এমন সময় দেয়ালটা পড়িয়া গেল। ইহাতে তাঁহার দেহে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। সে সময়ে, চিকিৎসার দ্বারা তিনি আরাম হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার শরীর অপটু হইয়া গেল। তখন হইতে তিনি আর উত্তমরূপে বাক্য উচ্চারণ করিতে পারিতেন না, এবং তাঁহার স্মরণশক্তিরও হ্রাস লক্ষিত হইয়াছিল। যশোবন্তরাওয়ের ইচ্ছা হইল যে, তাঁহার অবশিষ্ট জীবন নাসিকে অতিবাহিত করেন, এবং এই জন্য তিনি তথায় গমন করিলেন। এখানে তিন বৎসর অবস্থিতির পর যশোবন্তরাও জরাক্রান্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার শরীরের অবস্থা মন্দ হইতে লাগিল। রীতিমত চিকিৎসার ব্যবস্থা হইল বটে, কিন্তু তাহা হইতে কোন ফল দর্শিল না। অবশেষে তাঁহার বাক্ রোধ হইল। যশোবন্তরাওয়ের চরম দিন আগতপ্রায় বুঝিয়া, তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার সমক্ষে বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করিতে লাগিলেন, এবং হরিদাস * কর্তৃক হরিসংকীর্ত্তন ও শাস্ত্রী দ্বারা ভগবদ্গীতা পাঠের ব্যবস্থা করা হইল। এইরূপে হরিকথা ও বিষ্ণুনাম শুনিতে শুনিতে তিনি অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশীতে, ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

যশোবন্তরাওয়ের পরলোক গমনের সংবাদ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। নানাস্থান হইতে লোক আসিয়া সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহার মৃতদেহ শ্মশান ভূমিতে লইয়া গেল। তথায় সংকীর্ত্তনাদি হইল। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ সমাধারপর, স্থানীয় গণ্যমান্য লোক একত্রিত হইয়া, যশোবন্তরাওয়ের একটা স্থায়ী স্মরণচিহ্ন স্থাপনের ব্যবস্থা করিলেন।

আমরা যশোবন্ত রাওয়ের জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। এখন তাঁহার পবিত্র জীবনের কয়েকটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিব। যখন তিনি নাসিক জেলার অন্তর্গত এরণ্ডোল নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেন; তখন একজন পথিক সস্ত্রীক তাঁহার গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিল। স্ত্রীলোকটীর পবিত্র † বস্ত্র ছিল না

* দাক্ষিণাত্যে "কথক," হরিদাস নামে অভিহিত।

† দাক্ষিণাত্যে ভোজন করিবার সময় পট্টবস্ত্র পরিধান করা বিধেয়, এবং তাহার অভাবে আর্দ্র বসন পরা বিহিত।

বলিয়া তিনি ভোজন করিবার পূর্ব্বে, একখানি আর্দ্র বসন পরিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ইহা অবগত হইয়া, যশোবন্ত রাও তাঁহাকে একখানি নূতন পট্টবস্ত্র দান করিলেন। যশোবন্ত রাওয়ের পরোপকারে এত অধিক অর্থ ব্যয় হইত যে, তাঁহার বেতন হইতে তাহা সংকুলান হইত না। এই নিমিত্ত তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এবিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর হইলে, রাও সাহেবের ঋণ সম্বন্ধে তদন্ত হইল। যে যে ব্যক্তির নিকট হইতে তিনি অর্থ লইয়াছিলেন, সেই সেই ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্ট হইতে পত্র লেখা হইল। ইহার প্রত্যুত্তরে তাঁহারা লিখিলেন যে, যে টাকা তাঁহারা যশোবন্ত রাওকে দিয়াছিলেন, তাহা সংকার্য্যে ব্যয় হইয়াছে। তাঁহারা সে টাকা পুনরায় পাইবার প্রত্যাশা করেন না। এবম্প্রকার প্রত্যুত্তর পাইয়া গবর্ণমেণ্ট নিরস্ত হইলেন। রাও সাহেবের মান্‌মাদে অবস্থিতিকালে একজন মহাজন আসিয়া তাঁহার চরণে দুই সহস্র টাকা অর্পণ করিয়া বলিল যে, সে দেবতার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, তাহার পুত্র-সন্তান জন্মিলে সে, দেবমামলেদারকে এই টাকা প্রদান করিবে। রাও সাহেব, মহাজনকে বলিলেন যে, আপনাতে আর আমাতে কোন প্রভেদ নাই। অতএব এ টাকা আমি লইতে পারি না। আপনি ইহা কোন সংকার্য্যে ব্যয় করন। একদা যশোবন্ত রাও তাঁহার কার্য্যস্থলে গমন করিতেছেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর, এবং সূর্য্যের কিরণ অতিশয় প্রখর। এমন সময়ে, একজন ফকীর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, মহারাজ! পা জ্বলিয়া যাইতেছে। ইহা শুনিয়া, যশোবন্ত রাও তাঁহার পায়ের জুতা ফকীরকে দিয়া আপনি শূন্যপদে গমন করিলেন। এই প্রকার দয়ার কার্য্য তাঁহার অনেক ছিল। প্রতিদিন কাছারী হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি দেবালয় মসজিদ এবং ধর্ম্মশালা সকল দেখিয়া আসিতেন। আতুরদিগের দুঃখ দূর করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, তৃষ্ণাতুরকে জলদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান এবং পীড়িতকে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিতেন। এমন কি, যদ্যপি দেখিতেন যে কোন মৃত ব্যক্তির সংকার হইতেছে না, তিনি তাহারও ব্যবস্থা ও তৎপক্ষে সাহায্য করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিতেন।

তাঁহার দয়ার কার্য্য কেবল মনুষ্যে আবদ্ধ ছিল না। পশুদিগের ক্লেশ দেখিলেও তিনি ব্যথিত হইতেন। একদা ভ্রমণ করিতে করিতে যশোবন্ত রাও দেখিলেন যে, একটী গর্দ্দভ পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাহার জন্য একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, এবং তাহার শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, গর্দ্দভটী রক্ষা পাইল না। তাহার মৃত্যুর লক্ষণ দেখিয়া, তিনি তাহার মুখে গঙ্গাজল দিলেন, এবং সে জীবন ত্যাগ করিলে, তিনি তাহার দেহ ভূমিতে প্রোথিত করিলেন।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশসেবা।

"যে কয়টী উচ্চ ভাব মানবের ধারণাশক্তির অধিগম্য, তন্মধ্যে (ধর্ম্মভাবের পর) স্বদেশপ্রীতি এবং স্বজাতিপ্রীতি যে সর্ব্বোচ্চ এবং মহত্তম, ইহা নিঃসংশয়।" যে মহাপুরুষ স্বদেশের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এই মহাবাক্য, পরাক্রান্ত ইটালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, উনবিংশ শতাব্দীর রাজনীতি-বিশারদগণের শিরোমণি সেই কাউণ্ট কাভূরের উক্তি। উক্তিটী আপাতদৃষ্টিতে স্বদেশপ্রেমিকের ভাবোচ্ছ্বাসরূপে প্রতীত হইলেও ইহার অভ্যন্তরে অতি গূঢ় সত্য নিহিত আছে। আমরা এই উক্তিটীকে সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া স্বদেশপ্রেমের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ভাবরাজ্যে স্বদেশপ্রেমের স্থান যদি ধর্ম্মভাবেরই নিম্নে হয়, তবে যে সকল বিশেষগুণ ধর্ম্মভাবকে সর্ব্বোচ্চ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কোন কোনটীর ইহাতে বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। বস্তুতঃ মানবচরিত্রের উপর এই উভয় ভাবের ক্রিয়া তুলনায় পর্য্যালোচনা করিলে উভয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে দয়াবৃত্তির বিকাশ প্রথমোল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণবের ভাষায় ধর্ম্মভাবের প্রথমোন্মেষ "নামেরুচি, জীবে দয়া।" স্বদেশপ্রেমের প্রাণও দয়া। তবে উভয় প্রকারের দয়ায় প্রভেদ এই, স্বদেশপ্রেমিকের দয়া স্বদেশীয়গণের মধ্যে আবদ্ধ; ধার্ম্মিকের

দয়া বিশোদর। দ্বিতীয়—চিত্তশুদ্ধি। ধর্ম্মভাবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নীচ বৃত্তিগুলির দমন হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হইতে থাকে। স্বদেশপ্রেমের বিকাশেও ঐরূপ চিত্তশুদ্ধির আরম্ভ হয়। চিত্তের মলিনতার এবং নীচতার প্রধান আশ্রয় স্বার্থপরতা। প্রকৃত স্বদেশপ্রেমের অঙ্কুরোদ্গমেই স্বার্থপরতা নির্ম্মূল হয়। মানবচরিত্রের উৎকর্ষসাধনে স্বদেশপ্রেম ধর্ম্মভাবেরই পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য।

চরিত্রের উৎকর্ষেই মানবজীবনের সফলতা। ধর্ম্ম মানবচরিত্রের চরমোৎকর্ষসাধক। চরিত্রের চরমোৎকর্ষ জীবনের পরম লক্ষ্য। সুতরাং ধর্ম্ম জীবনের পরম সাধন। কিন্তু ধর্ম্মভাব কি সহজ অথবা সর্ব্বজনসাধ্য? এ প্রশ্নের প্রচলিত উত্তর যাহাই হউক, "নামে রুচি" অতি অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যেই লক্ষিত হয়। ভারতের অনেক প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টাও একথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণমুখে কথিত হইয়াছে ;

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাংবেত্তি তত্বতঃ॥" ॥ ৭ ॥

চৈতন্যচরিতামৃতেও কথিত হইয়াছে ;—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥"

চরিত্রের উৎকর্ষসাধনের জন্য শুধু ধর্ম্মভাবের মুখাপেক্ষী হইতে হইলে এই জড়বিজ্ঞানের প্রবলতার দিনে "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু" কেন, দশ সহস্রেষু ও "কশ্চিৎ" সে কল্যাণময় প্রভাবের অধীন হইতে পারে কি না, সন্দেহ। পুরুষপরম্পরাগত অভ্যাস এবং সংস্কারনিবন্ধন মানুষকে অনেক সময় অনেক সদনুষ্ঠানে নিরত এবং অসদনুষ্ঠান হইতে বিরত দেখা যায়। কিন্তু তেমন অভ্যাস এবং সংস্কার চিত্তোৎকর্ষের নিদর্শন নহে। উহা স্বভাবসিদ্ধ। উহার দ্বারা চরিত্রোৎকর্ষ সাধিত হয় না। হিন্দুজাতির স্বাভাবিক সুনীতিনিষ্ঠা অনেকটা জন্মান্তর এবং কর্ম্মফলে বিশ্বাসমূলক। কিন্তু এই সকল সংস্কার ধর্ম্মভাবের উদ্দীপক হইলেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে না।

ধর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা জীবনের সফলতাসম্পাদন কার্য্যতঃ অত্যল্পসংখ্যক মানবের সাধ্যায়ত্ত, এ কথা স্বীকার করিলে যদি অন্য কোন সহজসাধ্য ভাবের প্রভাবে সেই উদ্দেশ্য আংশিকরূপেও সাধিত হওয়া সম্ভব হয়, তবে সেই ভাবের সম্যগনুশীলন কি ব্যক্তিমাত্রেরই—জাতিমাত্রেরই অবশ্যকর্ত্তব্য নহে? মানবচরিত্রের উপর স্বদেশপ্রেমের কি আশ্চর্য্য প্রভাব, পাশ্চাত্যসমাজ তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। হিন্দুচরিত্রের তুলনায় ইউরোপীয় চরিত্রে ধর্ম্মের প্রভাব যে অপেক্ষাকৃত ন্যূন, ইহা বোধ হয় সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু স্বদেশপ্রেমের প্রণোদনায় ইউরোপে যে সকল মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার তুলনা কোথায়? ধর্ম্মভাব কয়জন হিন্দুকে প্রকৃত ত্যাগী করিতে পারিতেছে? স্বদেশপ্রেমে উন্মত্ত সমগ্র বুয়রজাতি আজ সর্ব্বত্যাগী। আমার বিশ্বাস বর্ত্তমানযুগে ইউরোপীয় জনসাধারণ নৈতিক উন্নতির জন্য খৃষ্টধর্ম্মের নিকট যত না ঋণী, স্বদেশপ্রেমের নিকট ঋণী ততোধিক।

এইরূপে স্বদেশপ্রেমিকের আত্মপক্ষ হইতে (subjective view) দেখিতে গেলে দেখা যায়, মানবচরিত্রের—মানবচিত্তের উন্নয়নে স্বদেশপ্রেম কত কার্য্যকর। অনাত্মপক্ষ হইতে (objective view) দেখিতে গেলে সমাজের উপর স্বদেশপ্রেমের কল্যাণময় প্রভাবের তুলনাই হয় না। ধর্ম্মনিষ্ঠের পরহিতৈষণা একটা গৌণকর্ত্তব্য। স্বদেশপ্রেমিকের পরহিতৈষণাই মুখ্যব্রত। আর সর্ব্বজনহিতৈষণা (philanthropy)—সেত পূর্ণবিকশিত স্বদেশপ্রেমেরই নামান্তর। সমগ্র পৃথিবীকে যিনি স্বদেশ বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারই স্বদেশপ্রেমের নাম সর্ব্বজনহিতৈষণা।

মহাত্মা কাভুরের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চিত্তবৃত্তিনিচয় মধ্যে স্বদেশপ্রেমের স্থান নির্দ্দেশ করিতে যত্ন করিলাম। এখন, আলোচ্য স্বদেশপ্রেম পদার্থটী কি? পাঠকগণ হয়ত মনে করিবেন, এরূপ আলোচনা অনাবশ্যক। স্বদেশের হিতসাধনের বাসনার নাম স্বদেশপ্রেম, এ কথা কে না জানে? কিন্তু বর্ত্তমানকালের রাজনৈতিক আন্দোলনের সমালোচকগণ যেরূপ ভাষা প্রয়োগ করেন, তাহাতে বোধ হয়, স্বদেশপ্রেমের প্রকৃত তাৎপর্য্য সর্ব্বত্র বিদিত নহে। স্বদেশপ্রেম অথবা স্বদেশহিতৈষণা ইংরাজি "পেট্রিওটিজ্‌ম্" কথার বঙ্গানুবাদ। দেশের কিরূপ হিতানুষ্ঠান

"পেট্রিওটিজম্"এর বিষয় সেটী পরিষ্কাররূপে না জানা থাকাতেই যত বাদানুবাদ।

মনুষ্যের হিতাহিত দুইরূপ; পারত্রিক এবং ঐহিক। পারত্রিক হিতসাধন ধর্ম্মোপদেষ্টার কার্য্য। যে প্রচারক স্বদেশের কল্যাণকল্পে ধর্ম্মপ্রচার করেন, তিনি সর্ব্বোচ্চ-শ্রেণীর স্বদেশসেবক সন্দেহ নাই। কিন্তু ধর্ম্মপ্রচার ঈশ্বর-ভক্তিপ্রণোদিত এবং ধর্ম্মসাধনার অঙ্গ। উহা স্বদেশপ্রেম নহে। স্বদেশপ্রেমের বিষয় স্বদেশীয়গণের ঐহিক হিত। ঐহিকরূপ হিতের মধ্যেও আবার দেশকালপাত্র সম্পর্কে সাধারণ জনহিতৈষণা বা দানশীলতার সহিত স্বদেশহিতৈ-ষণার পার্থক্য আছে। কোন শ্রেণীবিশেষের (যথা কুষ্ঠ-রোগী) বা স্থানবিশেষের হিতার্থে অনুষ্ঠান স্বদেশপ্রেমি-কের স্বদেশসেবা নহে। কিম্বা সমগ্রদেশময় কোন একটা সাময়িক অমঙ্গলের সাময়িক প্রতিবিধানও (যথা, উপস্থিত দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য দান) স্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক নহে। কিন্তু যিনি দেশময় কৃষিজীবিগণের জন্য ঋণভাণ্ডার (agricultural banks) স্থাপনের উদ্যোগ করেন, তাঁহাকে আমরা স্বদেশপ্রেমিক বলিব। স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণসাধনই স্বদেশপ্রেমিকের ব্রত। আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষার বিস্তার, স্বাধীনতার অন্যায্য প্রতিবন্ধকের উন্মোচন এবং ন্যায্য স্বাধীনতার উৎকর্ষসাধনের দ্বারা দেশের স্থায়ী কল্যাণসাধিত হয়। স্বদেশহিতনিষ্ঠগণ এই সকল উদ্দেশ্যসাধনেই জীবন উৎসর্গ করেন।

অভীপ্সিত উদ্দেশ্যসাধনার্থ অবলম্বিত উপায় বিষয়েও অন্যান্য জনহিতকর মনোবৃত্তির সহিত স্বদেশপ্রেমের বিশেষ প্রভেদ বিদ্যমান। ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যক্তি সমষ্টি বিশেষের শক্তির পরিচালন দ্বারা এইরূপ বিরাট উদ্দেশ্য সম্যক্ সাধিত হইতে পারে না। স্বদেশসেবক স্বীয় ব্রতানুষ্ঠানের জন্য রাজশক্তির আশ্রয় লইয়া থাকেন। গঠনের দোষবশতঃ যে দেশের শাসনযন্ত্র জনহিতের অন্তরায় হয়, সে দেশের যিনি সেবক, তাঁহার প্রথমে কর্ত্তব্য শাসনযন্ত্রের সংস্কার সাধন। ভূমণ্ডলে যে সকল প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই স্বদেশের শাসনযন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তনে অথবা আংশিক সংস্কার সাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে দেখা যায়।

স্বদেশের হিতসাধনের জন্য রাজশক্তির আশ্রয় লওয়া সঙ্গত কিনা এবং কতটা সঙ্গত, এই প্রশ্ন লইয়া বহুদিন যাবৎ ইউরোপে ঘোর বাদানুবাদ চলিতেছে। ইহার উত্তর দিতে যাইয়া রাজনীতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ দুই বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এক সম্প্র-দায় রাজতন্ত্রবাদী। রাজতন্ত্রবাদীর মতে প্রজাপুঞ্জের অহিতমাত্রেরই প্রতিবিধানে এবং হিতমাত্রেরই অনুষ্ঠানে রাজশক্তির বিনিয়োগ আবশ্যক। এইরূপ মতবাদী অনেকে রাজশক্তি প্রয়োগ করতঃ উচ্চ নীচ ধনী দরিদ্র প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীভেদ ভাঙ্গিয়া চূরিয়া একেবারে সাম্য স্থাপন করিতে চাহেন। কেহ রাজ্যের ধনসম্পত্তি রাজশক্তির সম্পূর্ণ করতলগত করিয়া জনসাধারণকে যথাপ্রয়োজন বৃত্তিভোগী করিতে চাহেন। অপর সম্প্রদায় স্বাতন্ত্র্যবাদী। স্বাতন্ত্র্যবাদী প্রজার হিতাহিতে রাজার হস্তক্ষেপ আবশ্যক মনে করেন না। বিশেষ কোন অহিতের প্রতিকার ভিন্ন অন্য কোন ব্যাপারে রাজশক্তির বিনিয়োগ একেবারে অসঙ্গত মনে করেন। এই সম্প্রদায়ের কেহ কেহ জনসমাজে রাজশক্তির প্রয়োজনীয়তা আদৌ স্বীকার করেন না। কিন্তু যে সকল মহাপুরুষ সভ্যরাজ্যসমূহের নিয়ন্তা, তাঁহাদের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, বলপ্রয়োগে সাম্যস্থাপন অথবা অবাধ স্বাতন্ত্র্য, ইহার কোন মতেরই তাঁহারা পোষকতা করেন না। তাঁহাদের প্রজানীতির মূলসূত্র, উন্নতির সুযোগ বিষয়ে সাম্যস্থাপন; আপামর সাধারণের জন্য উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করণ। এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজশক্তিই তাঁহাদের অবলম্বন। স্বদেশপ্রেমিকের স্বদেশসেবা রাজশক্তিপরতন্ত্র। রাজশক্তিপরতন্ত্র বলিয়াই যে দেশের জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবের অভাব, সে দেশে স্বদেশপ্রেমের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি প্রাচ্যজাতি রাজনৈতিক ভাব—প্রজাসাধারণের রাজ-নৈতিক অধিকার—সম্পর্কে চির অনভিজ্ঞ। পাশ্চাত্য জগতে মানুষের সংজ্ঞা "রাষ্ট্রীয় জীব"। হিন্দুর অভিধানে মানুষের সংজ্ঞা কর্ম্মফলভোগী জীব। পাশ্চাত্যজনগণের সংস্কার, রাজনীতি দ্বারা মানুষের সুখদুঃখ অনেকাংশে নিয়-মিত হইতে পারে। হিন্দুর সংস্কার সুখদুঃখ কর্ম্মফলমূলক।

রাজশক্তির পরিচালন দ্বারা মানুষের দুঃখরাশির আংশিক নিবৃত্তি হইতে পারে—রাজশক্তি কর্ম্মবন্ধনরজ্জু কথঞ্চিৎ শিথিল করিতে পারে—একথা অদৃষ্টবাদী হিন্দুর কল্পনারও দুরধিগম্য। প্রজার হিতার্থে রাজশক্তি পরিচালিত হয়। তৎসম্পর্কে প্রজার কোনরূপ অধিকার থাকার ভাব হিন্দুর মনে উদিত হইবে কেমনে? তাই ভারতের অতীত ইতিহাসে স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত বিরল।

এইরূপ সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে রাজপুত এবং মহারাষ্ট্র ইতিহাস নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু রাজপুত জাতির ইতিহাসে স্বদেশরক্ষার্থ আত্মোৎসর্গের যেসকল মহান্ দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়, তাহার নাম স্বদেশপ্রেম না রাখিয়া রাজভক্তি রাখাই সঙ্গত। তবে ভারতবাসী অন্যান্য জাতির ইতিহাসের তুলনায় মহারাষ্ট্র ইতিহাসের বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে। মহারাষ্ট্র জাতির হিন্দুসাম্রাজ্য সংস্থাপনের মহোদ্যম রাজভক্তি অথবা রাজবংশে অনুরক্তিমূলক নহে। সূচনার যুগেই শিবাজীর ন্যায় নেতা শত্রুর হস্তগত হইলেও মহারাষ্ট্রীয়গণ নিরুদ্যম হয়েন নাই। মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়ের প্রাণ কাভুরের idea of nationality বা জাতীয় ভাব। * মহারাষ্ট্রযোদ্ধা ব্যক্তিবিশেষের অথবা বংশবিশেষের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিতেন না; জাতীয় প্রভাব এবং জাতীয় গৌরব বিস্তারের মহান্ আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিত। স্বজাতিপ্রেম মহারাষ্ট্রশক্তির ভিত্তিভূমি। স্বজাতিপ্রেম স্বদেশপ্রেমেরই নামান্তর। বর্ত্তমান ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজ্যসমূহে জাতীয় প্রভাবের বিস্তারের বাসনাই স্বদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা বলিয়া পরিগণিত। কয়েক বৎসর হইল, ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যপ্রসারী সম্প্রদায়ের (Imperialists) নেতা জোসেফ চেম্বার্লেন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকট স্বদেশপ্রেমের এইরূপ ব্যাখ্যাই প্রকটন করেন। কিন্তু বাহিরে স্বদেশের প্রভাব বিস্তার স্বদেশপ্রেমের একটী অঙ্গ হইলেও বহিরঙ্গ মাত্র। দেশের আভ্যন্তরীণ কল্যাণ সাধনই স্বদেশপ্রেমের প্রাণ। স্বদেশের আভ্যন্তরীণ হিতসাধনই স্বদেশনিষ্ঠের মুখ্য কর্ত্তব্য। যে জাতি প্রজাপুঞ্জের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং মানবের সুখদুঃখ কর্ম্মপাশবদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করেন, সে জাতির মধ্যে স্বদেশসেবার ক্ষেত্র অতি সঙ্কীর্ণ এবং স্বদেশপ্রেমের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ অসম্ভব। মহারাষ্ট্রে স্বদেশপ্রেমের বহিরঙ্গ মাত্র উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ হইলে মহারাষ্ট্র-সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইত না।

ব্রিটিষ জাতির সংস্পর্শে ভারতের এই মহান্ কলঙ্ক অপনোদিত হইবার উদ্যোগ হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতবাসীর হৃদয়ে রাজনৈতিক ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছে। উদার ব্রিটিষরাজ ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এই ভাবের পরিপোষণ করিতেছেন। শিক্ষিত ভারতসন্তান রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য ঘোর আন্দোলনে ব্যাপৃত। ভারতীয় হৃদয় স্বদেশপ্রেমের অনুশীলনের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। অনুশীলনের সুযোগেরও অসদ্ভাব নাই। কংগ্রেসে, কনফারেন্সে, সংবাদপত্রে, বক্তৃতামঞ্চে, কিসে দেশের কল্যাণ সাধিত হয়, মনস্বিগণ তাহারই আলোচনা করিতেছেন। স্বয়ং ভারতসম্রাটের প্রতিনিধি আন্দোলনকারিগণের প্রার্থনা কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ বিবেচনার বিষয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।* যে মহাভাবের দ্বারা ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলন অনুপ্রাণিত, তাহা যে উপহাস অথবা উপেক্ষার বিষয় নয়, পরন্ত অতি উচ্চ অঙ্গের সাধনসামগ্রী, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহাই প্রতিপাদন করিতে যত্ন করিলাম।

ভীমভৈ বা নূতন অলেখ ধর্ম্ম।

সুদূর ওড়িষার জঙ্গলের পরপারে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত সোনপুর ফিউডেটরি রাজ্যের প্রান্তভাগে একজন নিরক্ষর কন্দজাতীয় কৃষক একটী নূতন ধর্ম্মের স্থাপনা করিয়াছে। এই কৃষকের নাম ভীমভৈ, এবং ইহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের নাম অলেখ ধর্ম্ম।

* এই বিষয়টী মৃত মহাত্মা রাণাডে প্রণীত "মহারাষ্ট্র ইতিহাসের" উপক্রমণিকায় অতি সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

* বোম্বাই মিউনিসিপালিটির অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে লর্ড কার্জ্জনের বক্তৃতা। নবেম্বর, ১৯০০।

ভীমভৈ কখনও লেখাপড়া শিখে নাই এবং আঠার উনিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত একজন কৃষকের গৃহে গরু চরাইত এবং চাসের সহায়তা করিত। তাহার পর কুম্ভপটিয়া নামে একটা অলেখ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের সহিত ইহার পরিচয় হয়। এই সম্প্রদায়ের এবং ইহাদের ধর্ম্মের বিশেষ বিবরণ পরে লিখিতেছি। কিছুদিন পরে কুম্ভপটিয়া সম্প্রদায়ের অলেখ ধর্ম্মের ভিত্তির উপর ভীমভৈ নূতন অলেখ ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছিল। যখন ভীমভৈ প্রথম ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হয়, তখন সে অন্ধ। আট বৎসর হইল ভীমভৈর মৃত্যু হইয়াছে। ইহার ধর্ম্মমত ও প্রচারপ্রণালী প্রভৃতির কথা বলিবার পূর্ব্বে কুম্ভপটিয়াদিগের একটু পরিচয় দিবার প্রয়োজনীয়তা দেখিতেছি।

সমগ্র উৎকল দেশ একদিন বৌদ্ধভিক্ষুপরিপ্লুত ছিল। সে বহুদিনের কথা। হিন্দু রাজাগণ যখন উৎকলক্ষেত্রে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন এবং নবাগত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং করণজাতীয়েরা সর্ব্বত্র বৈদিক আচার এবং অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিলেন, তখন বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ, পর্ব্বতগুহায়, বনপ্রদেশে, এবং অনার্য্যজাতীয় গ্রামমধ্যে, আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিত। কুশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোকের হস্তে পড়িয়া বৌদ্ধভিক্ষুদিগের প্রচারিত ধর্ম্ম অনেকটা বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধভিক্ষুদিগের তিরোধানের পর অতি বিকৃতভাবে অনার্য্যধর্ম্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া নীচজাতির মধ্যে স্থানে স্থানে যে সকল ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল, অলেখ ধর্ম্ম তাহারই একটি। ঢেঙ্কানাল নামক একটি উড়িয়া করদরাজ্যে এই অলেখ ধর্ম্ম প্রথম নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধর্ম্মের প্রথম গুরু নিজে বল্কল পরিধান করিতেন এবং শিষ্যদিগকেও "কুম্ভপট" অর্থাৎ বৃক্ষবল্কল পরিধান করাইতেন। এই জন্য এই সম্প্রদায়ের নাম কুম্ভপটিয়া। ইহাদিগের ধর্ম্ম যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতি, তাহা ইহাদিগের শূন্যপূজা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ১৮৯৫ সালের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গদেশের কোন কোন নীচজাতীয় লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত, এই শূন্যপূজা হইতে তাহাদিগের "ধর্ম্মপূজা" যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতি, তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে ইহাদিগকে নিরাকার ব্রহ্মোপাসক বলিয়াই মনে হয়। পূজার মন্ত্রের কথাগুলি অন্য অবস্থার সহিত মিলাইয়া না লইয়া, আমি নিজে ঐ প্রকার ভ্রমে পড়িয়াছিলাম। ১৩০১ সালের ২১শে পৌষ তারিখের এড়ুকেশন গেজেটে ধর্ম্মের যে ধ্যান উদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা এই—

> যস্যান্তো নাদি মধ্যং নচ করচরণৌ নাস্তিকায়ো ন নাদঃ
> নাকারো নৈবরূপং নচভয় মরণং নাস্তি জন্মানি যস্য
> যোগীন্দ্রৈ ধ্যানগম্যং সকলজনময়ং সর্ব্বলোকৈক নাথং
> তত্ত্বং তচ্চ নিরঞ্জনং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং।

কুম্ভপটিয়াদিগের ভজনে উল্লিখিতরূপ সকল কথাই দেখিতে পাওয়া যায়, অথচ তাহারা যে ব্রহ্মোপাসক নহে, তাহা তাহাদিগের অন্যান্য অনুষ্ঠান দেখিলে জানিতে পারা যায়। কিন্তু কুম্ভপটিয়াদিগের ধর্ম্মের সে সকল পরিচয় দিতে গেলে উদ্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনায় অযথা বিলম্ব হইবে।

ভীমভৈ কুম্ভপটিয়াদিগের নিকট দীক্ষিত হইয়া পরিশেষে একটু মার্জ্জিত ও উন্নততর ভাবে নূতন অলেখ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। ভীমভৈ মূর্খ হইলেও বড় প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিল। সে কখনও ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য অন্য স্থানে গমন করে নাই। নিজের গ্রামে আসন পাতিয়া বসিয়া থাকিত এবং শিষ্যেরা তাহার উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিত। বহু দূরদেশ হইতে অনেক পুরুষ রমণী আসিয়া ইহার শিষ্য হইয়াছিল। আমি জানি, কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, জাতিভেদাদি পরিত্যাগ করিয়া ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এখনও জীবিত আছেন। ১৮৮৬ সালে আমি যখন প্রথম সোনপুর যাই, তখন অন্ধ ভীমভৈর প্রভাব ও মাহাত্ম্যের কথা দেশবাসী সকলেই কীর্ত্তন করিত। ভীমভৈ নিজের মনে মনে রচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ ভজন গাহিত, এবং শিষ্যেরা অতি দ্রুতভাবে তাহা লিপিবদ্ধ করিত। তাহার উপদেশ এবং ভজনগুলির কিছু নমুনা তুলিতেছি। এগুলি ওড়িয়া ভাষায় রচিত হইলেও একটু অভিনিবেশ করিয়া পড়িলে অনায়াসেই অর্থবোধ হইবে। এজন্য অনুবাদ দিলাম না।

> অনুমান বুদ্ধি থিলে জলকু পিইলা
> নহিলে সে জল থাই তৃষার্ত্তে মরিলা।

সেহি ভলি মধী পরে অছি নিজ নাম ;
নাম নাম বোলি প্রাণী হোউথান্তি ভ্রম।
সত্যটি শুকল অটে মিথ্যা পদ কলা,
কলিয়া নুহন্তি প্রভু অটন্তি ধবলা।
শুণিণ সে নিরাকার মনে গদ গদ ;
ততক্ষণে নমিলে শ্রীগুরু পদ্মপাদ।
ব্রহ্ম নিজ স্থানক যে কুটিয়ে উহাড়
তাহাঙ্ক ভকতি সে যে সবু ঠারু বড়।

এই কয়েকটী ছত্র পড়িয়াই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, এই অন্ধ চামার ধর্ম্ম, কুম্ভপটিয়ার শূন্যমূর্ত্তির পূজা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্রহ্মস্বরূপ এবং ব্রহ্মদর্শন বিষয়ে ভূরি ভূরি রচনা আছে। আমি এখানে একটি উদ্ধৃত করিতেছি।

উঠ শূন্য শিখরে ; ভেট অলেখপুরে ;
খট সেবা ভকতি মুকতি হে।
বিদ্যুৎ-ঝটক কান্তি, জাজল্যময় জ্যোতি,
অরূপ রূপ ব্রহ্ম মুরতি হে।
সদাকাল অতিথি, নাহি দিবস রাতি,
থয়রে কাঁহি নাহি রহন্তি হে।
সর্ব্ব ঠাবরে ছন্তি, কাঁহিরেন লাগন্তি,
চিতকু দেই কর ভকতি হে।
রজ বীজ নুহন্তি, পবনে ন উড়ন্তি,
নাহি গন্ধ প্রকট, বিকৃতি হে।
ভণিলে ভীমকন্দ, সে যে পূর্ণ আনন্দ,
পাদবিন্দর পদ করুছি হে।

প্রাচীন অলেখধর্ম্মেও জাতিভেদ ছিল না ; ভীমভৈর ধর্ম্মেও জাতিভেদ নাই। এই ধর্ম্মযাজনে স্ত্রীপুরুষ তুল্যরূপে অধিকারী এবং সকলেই সমভাবে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রাচীন অলেখধর্ম্মে বল্কলবাস বিহিত ছিল ; এখনও কুম্ভপটিয়াগণ কৌপীন বা লেঙ্গট মাত্র পরিধান করে। কিন্তু নূতন অলেখধর্ম্মে এ সকল কঠোর নিয়ম নাই, তবে গৈরিকবাস প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে মাত্র। প্রাচীন অলেখধর্ম্ম সন্ন্যাসপ্রধান ছিল ; কিন্তু ভীমভৈর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, সকল গৃহস্থ ব্যক্তিই গ্রহণ করিতে পারে। ভীমভৈ নিজে গৃহী ছিল এবং নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের পরেও তাহার পুত্রকন্যাদি হইয়াছে।

ভীমভৈর জীবদ্দশায় তাহার সহস্রাধিক শিষ্য ছিল। তাহার মৃত্যুর পরেও যে শিষ্যসংখ্যা তত কমিয়াছে, তাহা মনে হইল না। কিন্তু সে প্রভাব আর নাই। ১৮৮৬ সালে যাহা দেখিয়াছিলাম, এবং এখন যাহা দেখিলাম, তাহাতে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হইল। এখন ভীমভৈর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে বিকৃতি উপস্থিত হইয়াছে, ইহাও স্পষ্টতঃ বুঝিলাম।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মোহান্তে।

আমারে যাইতে দাও আপনার কাজে।
বাধিও না বার বার তুলিয়া সলাজে
সতৃষ্ণ নয়ন দুটী এ মুখের পানে।
তুমিত জাননা তাহা কি শক্তি সে হানে
পশিয়া হৃদয়ে মোর ;—পরাণ বিহ্বল
সাধিয়া পরিতে চাহে মোহের শৃঙ্খল।
তুমি শুধু নহ মোর সাধনার ধন ;
জগতের শত কার্য্য করিতে সাধন
আমারে ডাকিছে সবে। কোন্ মোহ বশে
কর্ম্ম-হীন বন্দী রব তব প্রেম-পাশে
চিরতরে ! মুছি ফেল সজল নয়ন ;
সোৎসাহে যাই গো চলি, বিমুক্তবন্ধন
প্রবাহের মত ; সঞ্চিত আবেগ ভরে
প্লাবি' বিশ্ব, উপজিব অনন্তের দ্বারে।

অশ্রু।

মধুর ঝঙ্কারে যবে, হৃদয়ে বসন্ত জাগে,
ঢল্ ঢল্ ঢালে সুধা, প্রেম-ইন্দু গগনে !
শীতল সলজ্জ স্নিগ্ধ, উষার অরুণ রাগে
বিবশ বিভোর চিত, ডোবে সুখ-স্বপনে !
সরল শিশির মাথা, ফুটন্ত ফুলের বাসে
মিশে যবে দিশে হারা, ভোলে প্রাণ আপনা,
বারেক মারিয়ে উঁকি, নয়নের একপাশে,
কি বলে সে বিন্দু, নাথ ! তুমি কি তা জান না ?
চমকে চপলা ঘন, বহে চণ্ড ঝঞ্ঝাবাত,
তোলপাড় করে প্রাণ, শত ঘোর প্রলয়ে !
মুহূর্ত্তে সহস্র ভীম বিপদের বজ্রাঘাত,
চূর্ণ বিচূর্ণিত বুঝি, করে ক্ষুদ্র হৃদয়ে !

রুদ্ধকণ্ঠ মুমূর্ষুর মুখভঙ্গি মাঝে হেরি,
ভীষণ ভয়াল রুদ্রে. লুপ্ত হয় চেতনা!
নিস্পন্দ নয়ন মাঝে, ভয়েতে আধেক ঝরি
কি বলে সে বিন্দু, নাথ! তুমি কি তা জান না?
ঘোর অমা নিশীথিনী, নীরব শ্মশান মাঝে,
সর সর বৃক্ষপত্রে বায়ু যায় বহিয়া!
স্মৃতির ভগন ঘাটে, একাকী নিরাশা কাঁদে,
"সে ত আর আসিবে না, সে যে গেছে চলিয়া!"
আকাশে নিবেছে তারা, জাহ্নবী শুকায়ে গেছে,
পড়ে আছে ভস্মরাশি, চিরদগ্ধ বাসনা।
গভীর আঁধার মাঝে, ভাসাইয়ে ভাঙ্গা বুকে,
কি বলে সে তপ্ত ধারা, তুমি কি তা জান না?
অপদার্থ হেয় বলে, সবাই দিয়েছে ফেলে,
কেঁদে কেঁদে মরে গেলে দেখেনা ত চাহিয়া!
মৃতপ্রায়, ভগ্ন, ক্ষীণ, চলিয়াছি নিশি দিন,
নিরাশ, উদ্দেশ্যহীন, কালস্রোতে ভাসিয়া!
উপেক্ষার অট্টহাসি, ঘৃণা ব্যঙ্গ বিষরাশি
মর্ম্মে মর্ম্মে দহে আসি প্রেম, স্নেহ, কামনা!
হিয়ার বিষম তাপে, শুকায়ে নয়ন মাঝে,
কি বলে সে বিন্দু, নাথ! তুমি কি তা জান না?
ঊর্দ্ধ ঊর্দ্ধতর দেশে উড়িয়া চলেছে পাখী,
স্বর্ণবর্ণ পাখা মেলি, নীল স্বচ্ছ বাতাসে।
পৃথিবীতে প্রেম স্নেহ, দিল না তাহারে কেহ;
দেখিবে সে, মনসাধ, মিটে কিনা আকাশে!
সহসা ভাবিল শূন্য উজল উজল দিশি
কোটী নেত্র তারে হেরি, ঢালে প্রেম জোছনা!
উথলিয়া পূর্ণ হৃদি, ঝরিছে অনন্ত মাঝে;
কি বলে সে বিন্দু, নাথ! তুমি কি তা জান না?

শ্রীজ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

উৎকৃষ্ট ধর্ম্মমতও বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে কালসহকারে অতি অপকৃষ্ট ও বীভৎস আচারের সহিত জড়িত হইতে পারে। সুতরাং তৎসঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মমতের বিশুদ্ধতাও লোপ পায়। সকলেই জানেন, তিব্বতীয়রা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু তাহাদের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন না থাকায় তদ্দেশে নানাবিধ কুৎসিত ও বীভৎস আচার ও প্রথা প্রচলিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা ল্যাণ্ডর সাহেববর্ণিত তাহাদের মৃতদেহ সৎকারের বৃত্তান্ত নিম্নে সংকলন করিয়া দিতেছি।

তিব্বতে ইন্ধন বড় দুষ্প্রাপ্য। এই জন্য শবদাহ করিবার প্রথা সাধারণতঃ প্রচলিত দেখা যায় না। কেবল লামা (ধর্ম্মযাজক) ও ধনী ব্যক্তিদের শবই দগ্ধ হয়। মৃতদেহটিকে দুভাঁজ করিয়া চামড়াতে মুড়িয়া সেলাই করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়াই অধিকতর প্রচলিত। কিন্তু সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রথাই অনুসৃত হইয়া থাকে।

মৃতদেহ কোন পর্ব্বতের উপর লইয়া যাওয়া হয়; তথায় লামাগণ কতকগুলি মন্ত্র ও প্রার্থনার আবৃত্তি করে। তাহার পর শবের সঙ্গের লোকেরা উহাকে সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়া কিয়দ্দূরে গিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। তখন কাক ও কুকুরে শবটাকে টুকরা টুকরা করিয়া খাইতে থাকে। যদি কেবল পক্ষীতেই শবটার অধিকাংশ খাইয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহা মৃত ব্যক্তি ও তাহার পরিবারবর্গের পক্ষে শুভচিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হয়; কারণ, লামারা বলে যে, মৃতব্যক্তি জীবদ্দশায় পাপ করিয়া থাকিলেই কুকুর ও বন্য জন্তুগণ তাহার দেহ খাইতে আসে। যাহাই হউক, সকলে ঔৎসুক্যের সহিত শবটা প্রায় নিঃশেষরূপে ভক্ষিত হইবার সময় প্রতীক্ষা করিতে থাকে। উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া লামা এবং অপর লোকেরা তাহাদের "প্রার্থনাচক্র" ঘুরাইতে ঘুরাইতে এবং "ওঁ মণিপদ্মে হুং" মন্ত্র জপিতে জপিতে শবের নিকট উপস্থিত হয়। তাহার পর তাহারা বাম হইতে দক্ষিণে আবার সাতবার তাহার চারিদিকে ঘুরে। তাহার পর মৃতব্যক্তির আত্মীয়েরা শবের চারিদিকে উপবেশন করে। লামাগণ শবের নিকটে বসিয়া তাহাদের ছোরা দ্বারা অবশিষ্ট মাংস টুকরা টুকরা করিয়া কাটে। উপস্থিত সর্ব্বপ্রধান লামা প্রথম গ্রাস ভোজন করে। তাহার পর প্রার্থনা আবৃত্তি করিয়া অন্য লামারা শবমাংস ভোজন করে। তদনন্তর যে পর্য্যন্ত পরিষ্কার ও শুষ্ক হাড়গুলা মাত্র বাকী না থাকে, ততক্ষণ সমবেত আত্মীয়বন্ধুগণ অতিশয় আগ্র-

মাসিকসাহিত্য-সমালোচনা

Indian Press, Allahabad.

হের সহিত কঙ্কাল হইতে মাংস চাঁচিয়া পুঁছিয়া খাইতে থাকে। এই বীভৎস আচারের মূলগত বিশ্বাস এই যে, যদি কেহ কোন মৃত ব্যক্তির এক টুকরা মাংস খায়, তাহা হইলে তাহার প্রেতাত্মা কখনও ভক্ষকের কোন অনিষ্ট করিবে না। যখন পক্ষী ও কুক্কুরগণ কোন শব ভক্ষণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না, তখন উহা তিব্বতীয়গণ-কর্ত্তৃক নিজেদের ভক্ষণোপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়।

কোন মড়কে কাহারও মৃত্যু হইলে, পক্ষী বা কুক্কুরে দুর্গন্ধময় গলিত শবের নিকটেও না গেলে, একদল লামা প্রচলিত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া শবের চারিদিকে উপবেশনপূর্ব্বক উহা ভক্ষণ করিতে থাকে। মাংস নিঃশেষ না করিয়া তাহারা উঠে না। আত্মীয়বন্ধুরা লামাদের চেয়ে অধিক বিজ্ঞ এবং অপেক্ষাকৃত কম পশুভাবাপন্ন। তাহারা মনে করে, আমিষাশী ইতর প্রাণীতে কাহারও শব ভক্ষণ না করিলে সে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের ক্রোধভাজন এবং পাপী। লামারা ভিন্ন আর কে তাহার প্রতি ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিতে পারে? অতএব, লামাদেরই তাহার শব ভোজন করা উচিত! এই আচারটির পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান করিবার জন্য যথেষ্টসংখ্যক লামা পাওয়া না গেলে, জ্ঞাতিরা শবের এক এক গ্রাস খাইয়া উহাকে কোন শৈলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসে। তদনন্তর কোন না কোন জীবজন্তু বা কাল উহাকে কঙ্কালাবশেষ করিয়া ফেলে।

লামারা বড় "রক্তপিপাসু"। তাহারা বলে, রক্ত তাহাদের শক্তি, প্রতিভা ও তেজ বৃদ্ধি করে। অবিষাক্ত ক্ষত চুষিবার সময় তাহারা রক্তটা পান করে। কোন কোন সময়ে রক্তপান করিবার জন্যই অপরের দেহে ক্ষত উৎপাদন করা হয়। মানুষের মাথার খুলির নির্ম্মিত পানপাত্র সমুদয় মঠেই দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন এইরূপ বাটী পূর্ণ করিয়া লামারা রক্তপান করে।

এই সকল তিব্বতীয় আচারের সহিত তান্ত্রিক ও অঘোরপন্থী আচারাদির ঐতিহাসিক সম্বন্ধনির্ণয়, বোধ করি অবাধ্য নহে।

——:*:——

আমরা বর্ত্তমান যুগলসংখ্যায় সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর রাজা রবিবর্ম্মার অঙ্কিত একখানি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব চিত্রের অনুলিপি প্রকাশিত করিলাম। লঙ্কাদ্বীপে অশোকবনে সীতা রাক্ষসীপরিবৃতা হইয়া বসিয়া আছেন। ইহাই চিত্রের বিষয়। কি পুরাতন, কি নূতন, রবিবর্ম্মার কোন চিত্রই কেহ তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন প্রকারে প্রকাশিত করিতে পারে না। আমরা ভবিষ্যতে তাঁহার আরও কয়েকখানি চিত্র পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

——:*:——

লক্ষ্ণৌ হইতে বাবু প্রিয়নাথ সান্যাল লিখিয়াছেন:—

"বেনারসের সুপ্রসিদ্ধ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গবিহারী চক্রবর্ত্তী ১৮৯৮খৃঃ Chakravarty Free Institution নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত;—যথা, ব্যায়াম, পুস্তকালয়, ঔষধালয়, সঙ্গীত এবং সাহিত্য। সমিতির সমগ্র ব্যয় শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গবিহারী চক্রবর্ত্তী নিজে বহন করেন। অন্য কাহারও নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা হয় না। পুস্তকাগারে বাঙ্গালা ও ইংরাজী পুস্তকের সংখ্যা ৫৫০। বিলাতী ও দেশী কাগজ অন্যূন ১০ খানি আসে। ভূতপূর্ব্ব সুপারিন্‌টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়র কর্ণেল পুলফোর্ড সাহেব প্রথমে এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক হন। ব্যায়ামবিভাগের আশাতীত উন্নতি দেখিয়া তিনি পরম প্রীত হন ও কথাপ্রসঙ্গে জেনারেল জেনিংস্ সাহেবের নিকট বাঙ্গালীদিগের শ্লাঘা করিলে সামরিক বিভাগের ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ চক্রবর্ত্তীসমিতির ব্যায়াম দর্শনেচ্ছু হইয়া পত্র লিখেন। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গবিহারী চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রকৃষ্ণ বসু সামরিক ব্যায়ামশালায় যাইয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এই বিষয় ইউনাইটেড সার্‌ভিস্ ক্লাবে আলোচিত হইলে অনেক উচ্চপদস্থ সাহেব ব্যায়ামদর্শনাভিলাষী হইয়া পত্র দ্বারা চক্রবর্ত্তী সমিতিকে সম্মানিত করেন। ইঞ্জিনিয়র অফিসের সম্মুখে ব্যায়ামকৌশল প্রদর্শিত হয় ও সাহেবগণ তাহাতে প্রীতিলাভ করিয়া ভূয়ঃ প্রশংসা করেন। ঔষধালয়ে দরিদ্র লোকদিগকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিনামূল্যে বিতরিত হয়। প্রায় ৩০।৪০ জন রোগী প্রত্যহ ঔষধ লইয়া থাকে। সঙ্গীত বিভাগ, সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মী-

কান্ত ভট্টাচার্য্য মহোদয় দ্বয়ের বিশেষ যত্নে প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। সাহিত্যবিভাগে পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ ভক্তিতীর্থ দুইটা ও বাবু নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, একটী ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত বাবু ললিত কুমার রায়ের ও কতিপয় সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির উদ্যমে বর্ত্তমান বৎসরে সাহিত্য বিভাগের বিংশতি সাপ্তাহিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। Chakravarty Free Institution এর সভ্য সংখ্যা ৭০ জন ও পৃষ্ঠপোষক ইঞ্জিনিয়রবর্গ। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্গবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় যেরূপ লোকদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিকল্পে ব্রতী আছেন, অন্যান্য কৃতবিদ্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এইরূপ রত থাকিলে জাতীয় উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এতদ্ব্যতীত লক্ষ্ণৌ সহরে Primary Girls' School ও বান্ধবসমিতি আছে। বিদ্যালয়টি ১৮৯৮ খৃ: স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালীদিগের বালকবালিকাগণ মিশনরি স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিত। জাতীয় বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা বোধ করাতে শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল রায়, শ্রীমার্কণ্ডেয় প্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীবিশ্বনাথ সেন, শ্রীযদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিদ্যালয় সংস্থাপনে বদ্ধপরিকর হন ও তাঁহাদিগের উদ্যম ও পরিশ্রমের ফলে বিদ্যালয় সংগঠিত হয়। লক্ষ্ণৌ সহরের বাঙ্গালীবর্গের পোষকতায় বিদ্যালয়টী পরিচালিত হইতেছে। ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা অনূ্যন ৬০জন। বান্ধবসমিতি বালকদিগের দ্বারায় গঠিত ও পরিচালিত। উহাতে প্রবন্ধাদি পঠিত হয় ও কতিপয় বাঙ্গালা সংবাদপত্রও আসে।"

——:•:——

লাহোর হইতে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন—"ভারতবর্ষ ও সিংহলে সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটী সরকারী মেডিকেল কলেজ আছে; যথা,—কলিকাতায় একটী, বম্বে একটী, মান্দ্রাজে একটী, লাহোরে একটী ও সিংহল দ্বীপে একটী। বম্বে গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজ ব্যতীত অন্যান্য সকল মেডিকেল কলেজগুলিতে প্রবেশ করিতে হইলে এফ, এ কিম্বা তৎসমতুল্য পরীক্ষায়—(পাঞ্জাব ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমীডিয়েট্ পরীক্ষায়) উত্তীর্ণ হইতে হয়। এখনও বম্বে গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজ যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রবেশ করিবার নিয়ম প্রচলিত আছে। পূর্ব্বে লাহোর মেডিকেল কলেজেও উক্ত নিয়ম প্রচলিত থাকায় এখানে অনেক বাঙ্গালী ছাত্র আসিয়া চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। শিক্ষাভিলাষী, অভিভাবকবিহীন, সুদূরপঞ্চনদপ্রদেশপ্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রগণের মধ্যে একতা ও সদ্ভাব সংস্থাপন নিমিত্ত এখানকার মেডিকেল কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ, এম,এ (যিনি এখন ইংলণ্ডে অধ্যয়ন করিতেছেন), ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এল, এম, এস মহোদয়গণ "ইউনিয়ন ক্লাব্" (Union club) নামে একটী ছাত্র-সভা সংস্থাপন করেন। সেই সভাটী বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজ অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। উক্ত সমিতিটী শুধু বাঙ্গালী মেডিকেল ছাত্রগণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। এই ক্লাবে প্রতি সপ্তাহে বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটী করিয়া ইংরেজী রচনা পাঠ করা বা বক্তৃতা করা হয়। বাৎসরিক উৎসবোপলক্ষে কলেজের অধ্যাপক, ছাত্র ও স্থানীয় বাঙ্গালী মহোদয়গণকে আমন্ত্রণ করা হয়। সঙ্গীত, বিজ্ঞানচর্চ্চা, প্রীতিভোজন প্রভৃতি আমোদে বাৎসরিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই ক্লাবে "প্রবাসী," "বেঙ্গলী," "ইণ্ডিয়ান ল্যানসেট্", প্রভৃতি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাদি লওয়া হয়। এখানকার বাঙ্গালী মেডিকেল ছাত্রগণের একতা ও সদ্ভাব দেখিয়া বাঙ্গালীবিদ্বেষী বিলাতী অধ্যাপকগণও প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ এক কপর্দ্দকও গ্রহণ না করিয়া অকাতর শ্রম সহকারে স্থানীয় বাঙ্গালীদিগের চিকিৎসাদি করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা সৎকার কার্য্যেও কম সহায়তা করেন না। বাস্তবিক, এখানকার বাঙ্গালী মেডিকেল ছাত্রগণের স্বদেশবাৎসল্য, চরিত্রবল, পরোপকারে একাগ্রতা ও সৎসাহস দেশবিদেশস্থিত বাঙ্গালীগণের অনুকরণীয়। কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, এফ,এ বা তৎসমতুল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করিবার নিয়ম হওয়ায়, বাঙ্গালীদ্বেষী সাহেব অধ্যাপকগণের তাড়নায় এবং বাঙ্গালীদিগের প্রতি এখানকার

সরকার বাহাদুরের বিশেষ ঔদাসীন্যে এখানে আজ কাল মাত্র দু একটা বাঙ্গালী ছেলে ভর্ত্তি হইতেছেন। সুতরাং দিন দিন বাঙ্গালী ছাত্রসংখ্যা হ্রাস হইতেছে। এ বৎসর কলেজ হইতে ৪ জন বাঙ্গালী ছাত্র এল. এম. এস ও এম. বি. উপাধি লাভ করিয়াছেন।"

আব্রাহাম স্তঃ মোয়াভ্র্ (Abraham de Moivre) অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত গণিত বেত্তা। ইনি ফরাসীজাতীয় হইলেও ইংলণ্ডেই বাস করিতেন, এবং ইংরাজী ভাষায় তাঁহার পুস্তকাদি লিখিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যু অত্যন্ত বিস্ময়কর। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ভৃত্যকে আদেশ দেন যে, সেই দিন হইতে প্রত্যহ তিনি পূর্ব্বদিন অপেক্ষা ১৫ মিনিট অধিক ঘুমাইবেন এবং নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে যেন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করা না হয়। যে দিন তিনি ২৪ ঘণ্টা অধিক ঘুমাইলেন, সেই দিন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে গিয়া তাঁহার ভৃত্য দেখিল যে, প্রভু পরলোক গমন করিয়াছেন। এই অদ্ভুত ঘটনাটী মনস্তত্ত্ববিদ্‌দিগের একটী ভাবিবার বিষয়।

ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম অধ্যায়ের ৪৭শ প্রতিজ্ঞার চিত্রকে গ্রীক গণিতবেত্তা ও দার্শনিক প্লেটো (Plato) তাঁহার State নামক গ্রন্থে 'বৈবাহিক চিত্র' এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। আরবদেশীয় গণিতবেত্তাগণ ইহাকে 'নবোঢ়া-পত্নী-চিত্র' বলিয়াছেন *। আরবা নামটী যে গ্রীক্ নামের সংস্কারমাত্র তাহা সহজেই বুঝা যায়। কারণ আরবীয়েরা গ্রীক্ এবং হিন্দুদিগের নিকট অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। গ্রীক্-ইতিহাসবেত্তা প্লুটার্ক বলেন, প্লেটো এই নাম পিথাগোরাস্‌এর নিকট পাইয়াছিলেন। পিথাগোরাস্ সমকোণী ত্রিভুজের লম্বকে পুং-রেখা, ভূমিকে স্ত্রী-রেখা এবং কর্ণকে সন্তান-রেখা কহিয়াছেন। অল্‌মান্ (Allman) নামক একজন ইংরাজ সম্প্রতি একখানি বহু-গবেষণাপূর্ণ গ্রীক্ জ্যামিতির ইতিহাস লিখিয়াছেন। তিনি এই বিচিত্র নামকরণের একটী বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্যামিতির সৃষ্টিকর্ত্তা ঈজিপ্টের পুরোহিত-গণই সমকোণী ত্রিভুজের ভুজত্রয়কে প্রথম এই সকল নামে অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, ঈজিপ্টের প্রাচীন পুরোহিতগণের গ্রন্থে দেখা যায় যে, একটী বস্তু অার দুইটী বস্তু হইতে উৎপন্ন হইলে, ইঁহারা শেষোক্ত বস্তুদ্বয়কে জনক ও জননী এবং পূর্ব্বোক্ত বস্তুকে সন্তান বলিতেন। সমকোণী ত্রিভুজের ভুজত্রয়ের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রগুলির পরস্পরের সহিত এইরূপ সম্পর্ক। কারণ, কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের বর্গফল, অপর দুইটী ক্ষেত্রের বর্গফলের সমষ্টির সমান। সুতরাং পুরোহিতগণের নামকরণ প্রণালী অনুসারে কর্ণস্থিত বর্গক্ষেত্র সন্তান-ক্ষেত্র এবং অপর দুইটা স্ত্রী এবং পুরুষ-ক্ষেত্র হইবে। আবার বর্গক্ষেত্রের বর্গফল উহার ভুজ-পরিমাণের বর্গ, সুতরাং সমকোণী ত্রিভুজের তিনটী ভুজেরও পরোক্ষভাবে উৎপাদক-উৎপন্ন সম্পর্ক। এই জন্য কর্ণ সন্তান-রেখা এবং অপর ভুজদ্বয় স্ত্রী এবং পুরুষরেখা নামে অভিহিত।

* "The Arabs call the 47th proposition of the 1st book of Euclid 'the figure of the bride', I do not know why"—E. Strachey's *Bija Ganita*, p. 54.

শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

প্রবাসী] রাজা রবিবর্ম্মা। [Indian Press.

প্রবাসী

প্রথম ভাগ। } অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩০৮। { ৮ম ও ৯ম সংখ্যা

কবিতা।

এই বুঝি কাননের কাণে কাণে কথা,
পত্রে পত্রে, অস্ফুট মর্ম্মরে !
এই বুঝি তটিনীর কুলু কুলু গান
তটপাশে অতি মৃদুস্বরে !

এই বুঝি ভ্রমরের গুঞ্জরণস্তুতি
ঘিরে ঘিরে কমল-চরণ !
এই বুঝি বাঁশরীর করুণ মিনতি,
ধ্বনিময় মর্ম্মের বেদন !

এই বুঝি লেখা থাকে অরুণ রেখায়,
পূর্ব্বাচলে উষার উরসে !
এই বুঝি মৃদু হাসে প্রস্ফুট কুসুমে
প্রভাতের চুম্বন পরশে !

এই বুঝি তৃণপুঞ্জে শ্যামাঙ্গে ধরার
রোমাঞ্চিত অপূর্ব্ব পুলক !
এই বুঝি সৌন্দর্য্যের চিত্ত-মুগ্ধকর
মোহময় মধুর কুহক !

এই বুঝি কুসুমের গোপন বারতা
গন্ধরূপে সমীরে সঞ্চরে !
এই বুঝি নিঃশবদে জোছনা-প্লাবনে,
ভেসে যায় দিক্ দিগন্তরে !

এই বুঝি নিশীথের নীলিম সভায়
শত শত তারা বালিকার
স্বর্ণবীণাতন্ত্রীগুলি কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ঐকতানে করিছে প্রচার !

এই বুঝি চণ্ড রবে ঝটিকার বায়ু
কহে উচ্চে জগৎসকাশে !
এই বুঝি কল্লোলিত গভীর ক্রন্দনে
অশ্রুময় লবণাম্বুরাশে !

এই বুঝি মানসের প্রেম-মন্ত্রবল,
নত যাহে নিখিল প্রতাপ !
স্বরগের সুধাধারা সিঞ্চিয়া জীবনে
স্নিগ্ধ করে সকল সন্তাপ !

যুগযুগান্তর ধরি বিচিত্র মায়ায়
চলিছে যে অনন্ত কাহিনী,
এই বুঝি সেই কথা কবিতা-আকারে,
মূর্ত্তিমতী বিশ্বের রাগিণী !

তরী।

ভেসে এল তরী মোর উষালোকে ধীরে,
শান্ত নদীনীরে,
অজ্ঞাত রহস্যময়ী ধরা রাজে তীরে।

কুয়াসার ঘের তুলি দেখাইল রবি,
তার শ্যামচ্ছবি,
বন, মাঠ পথ গৃহ, অভিনব সবি।

অরুণ কিরণে সেই নয়নের আগে
কি সুষমা জাগে!
যাহা দেখি তাই যেন কত ভাল লাগে।

ধীরে তরী ভেসে চলে আশার হিল্লোলে;
অস্ফুট কল্লোলে
কি সঙ্গীত গাহে সে যে কি আনন্দে দোলে!

কূলে কূলে কুতূহলী আঁখি চাহে কত;
স্বপনের মত
কত মুখ, সুখ, দুখ, পিছে হয় গত।

ক্রমে বেলা বেড়ে ওঠে বায়ু বহে বেগে,
ঢেউ ওঠে জেগে,
মাঝে মাঝে ঢাকে রবি ভাঙাভাঙা মেঘে।

তরঙ্গ আছাড়ি পড়ে কাঁদি' কলস্বরে,
ভগ্ন বালুচরে;
উলটিতে চাহে তরী খর বায়ুভরে।

কে তাহে তুলিয়া দিল শুভ্র সুখ-পাল
সুমধ্যাহ্ন কাল,
দাঁড়াইল হাসিমুখে ধরি শুধু হাল!

স্রোতোমুখে লীলাভরে চলিল তরণী;
শ্যামল-বরণী,
পাশে পাশে সহযাত্রী সুন্দরী ধরণী।

ঘাটে ঘাটে ঘটনার কত বিচিত্রতা!
হাটের জনতা;
কেনা, বেচা, কোথাও বা শ্মশান-শূন্যতা।

প্রসন্ন আকাশ কভু অনুকূল বায়,
তরী বহে যায়
নাবিক মঙ্গলগান মধুতানে গায়!

সঘন গগন কভু উতরোল বায়,
হু হু ক'রে ধায়
উঠে' প'ড়ে' তরঙ্গেতে তরী বহে যায়।

সায়াহ্ন সুবর্ণজালে তরুচূড়া ঘিরে,
চাষী গৃহে ফিরে,
সোণার ধানের বোঝা বহি লয়ে শিরে।

জানিনা ভিড়াব তরী কোন সিন্ধুকূলে,
কার সৌধমূলে,
কি বাণিজ্যে আসিয়াছি গিয়াছি যে ভুলে।

অনন্তের কালো নীরে পড়িব যখন,
কে জানে তখন
বুঝিব কি, কি নিয়েছি কি দিয়ে কখন?

"নৈবেদ্য"।

রক্ত তাম্র কুণ্ড করে, স্বর্গের সোপানস্তরে
সদ্যস্নাতা উষা উঠে পূজিতে যাঁহায়,
ভরিয়া শ্যামল সাজি, লয়ে অর্ঘ্য পুষ্পরাজি
মন্দির-প্রাঙ্গণে যাঁর ধরা শোভা পায়!

মধ্যাহ্ন কি দিব্য জ্ঞানে, দীপ্তালোক-ব্যাপ্ত প্রাণে,
যাঁহার স্বরূপ করে প্রত্যক্ষ অন্তরে,
সন্ধ্যা সেবিকার সম, রত্নদীপ মনোরম,
দিবসান্তে রাখে যাঁর পাদপীঠ পরে!

অগণ্য নক্ষত্র জ্বালা মাথায় আরতি ডালা,
আসি নিশি নিত্য যাঁর নিস্তবধ ঘরে,
ঝিল্লি-গুঞ্জরণ স্বরে, বেদমন্ত্র পাঠ করে,
মুক্তকেশ অন্ধকার হ'তে হিম ঝরে;

যুগযুগান্তর ধ'রে' কত আয়োজন ক'রে'
প্রকৃতি পূজিছে যাঁরে বিবিধ বিধানে;
ছয় ঋতু বহি' ভার আনিতেছে উপচার,
তবুও আকুল হৃদি তৃপ্তি নাহি মানে!

কবি সেই দেব তরে সাজায়েছে থরে, থরে,
এ নব নৈবেদ্য, খুলি' ভাবের ভাণ্ডার!
বিচিত্র কৌষিকবাসা, লহ অয়ি মাতৃভাষা!
ভরি' ছন্দোস্বর্ণথালা সন্নিধানে তাঁর;

দেবতার দৃষ্টিপাতে পবিত্র প্রসাদ হাতে,
ফিরে এস ভাগ্যবতী, আপন আলয়,
বিশ্ববাসী-দ্বারদেশে, যাচকের সম এসে,
মেগে লবে সে অমৃত প্রেমশান্তিময়!

রামচন্দ্রের বিরহ।

রামচন্দ্র হিন্দুস্থানবাসীর আদর্শ পুরুষ। রামের ন্যায় পুত্র, রামের ন্যায় ভ্রাতা, রামের ন্যায় স্বামী, রামের ন্যায় রাজা,—হিন্দুস্থানে ইহাই শুভার্থীর চরম কামনা।

এই বিশাল ভারতবর্ষে 'রাম' নাম ঐক্যের অমোঘ মন্ত্র। মারাঠা, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, রাজপুত, এই নামোচ্চারণের সঙ্গে ভক্তি ও প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবেন। এখনও প্রাতরুত্থানকালে শতশত কণ্ঠে রামনাম উচ্চারিত হয়। এখনও শতশত মুমূর্ষু ব্যক্তি রামনাম উচ্চারণ করিয়া মৃত্যুযন্ত্রণা ভুলিয়া যায়। রামের প্রতি এই প্রীতি, হিন্দুজাতির চরিত্রকে একদা একনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণতার পুণ্য উপাদানে গঠন করিয়াছিল।

উনষোড়শ বর্ষ বয়সে রামচন্দ্র "চলকপালকুণ্ডলা" তাড়কাকে বধ করিয়া তপোবনের শান্তি অব্যাহত করেন, ধনুর্জ্যারোপণে কর্কশ-পাণি প্রবীণ কিন্তু বিফলকাম রাজন্যবর্গের সম্মুখে বিরাট হরধনু ভঙ্গ করেন এবং ক্ষত্রিয়বধে নিরত দুর্দ্ধর্ষ পরশুরামকে পরাস্ত করিয়া দণ্ডবিধান করেন। এইরূপে শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন রামচন্দ্র অনতিক্রান্তকৈশোরেই ভুবনবিজয়ী প্রতাপের পূর্ব্বাভাস প্রদান করেন। কিন্তু হিন্দুস্থান শারীরিক বলের সম্মান করিলেও তাহার পূজা করে না। বৃত্র, হিরণ্যকশিপু, গয়াসুর, কংস এদেশে পূজা পায় নাই।

রাজপদে অভিষেকোদ্যত রামের বনে যাইতে হইবে। চন্দনচর্চ্চিত অভিষেকস্নানোজ্জ্বল প্রফুল্লকান্তি রামচন্দ্র সহসা শুনিলেন, তাঁহার পৈত্রিক সিংহাসনে স্থান নাই, কাঙ্গালের বেশে বনে জঙ্গলে জীবনের শ্রেষ্ঠভাগ অতিবাহিত করিতে হইবে। তিনি কৈকেয়ীকে বলিলেন, "একথা একটা বেশী কি? দেবি, আমি ত পিতার আদেশে বিষ ভক্ষণ করিতে পারি, অনলে প্রবেশ করিতে পারি; কিন্তু আজ পিতা আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় অভিনন্দন করিতেছেন না কেন? তিনি ভূতলে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া মলিনভাবে অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন কেন? এ দৃশ্য আমার সহ্য হয় না।" পুত্র এবং পিতার এই দুইখানি চিত্র জগতের কোন শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের তুলিতে অঙ্কিত হইয়া থাকিবার যোগ্য।

যিনি প্রফুল্লমনে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন, তিনি প্রফুল্লমনে বনে চলিলেন। বিচিত্রকুসুমশোভী বহুমঞ্জরীশালী নগরাজী, কচিৎ বেণীকৃতজল, কচিৎ আবর্ত্তশোভী গঙ্গাধারা, নানাপুষ্পরজোধ্বস্ত পার্ব্বত্য আকাশ—এই সরস প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে রামচন্দ্র চলিলেন; তিনি মণির মুকুট ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যের কিরীট মাথায় ধারণ করিয়া বনবাসী হইলেন। ভরত তাঁহার মুকুটবিহীন রাজশ্রীর প্রভা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন, অধ্বশ্রমজনিত একটি স্বেদবিন্দুও তাঁহার শ্রীমুখপঙ্কজ ম্লান করে নাই।

রাম চলিয়া গেলেন; বিমলিন অযোধ্যাপুরীর চিত্র শোকে সকরুণ হইয়া উঠিল। সে দিন—"পুত্রং প্রথমজং লব্ধা জননী নাভ্যনন্দত"।

বনবাসিগণ অনভ্যস্তবনশ্রম সত্যভাষী পুরুষশ্রেষ্ঠের রূপসুধা পান করিয়া সুখী হইল। দর্ভাঙ্কুরনির্ব্যপেক্ষ মৃগযূথ করুণ নয়নে ধনুষ্পাণি রামমূর্ত্তি দেখিতে লাগিল—তাহারা ভয় করিল না।

কিন্তু তথাপি আশঙ্কা হইতে পারে, বুঝিবা কবির হস্তে রামচরিত্র কতকটা নীরসভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে ভয়ঙ্করী রাক্ষসীকে বধ করিতে হইবে, রামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া প্রস্তুত। খুব সমারোহের সহিত রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ চলিল রাম অভিষেকের জন্য স্নান করিয়া প্রস্তুত। নিয়তির বিধান অন্যরূপ হইল সিংহাসনে তাঁহার স্থান নাই, চতুর্দ্দশ বৎসর কাল পশুগণের সঙ্গে জঙ্গলে বাস করিতে হইবে, রাজতক্তটি ছোট ভাইকে ছাড়িয়া দিতে হইবে; রাম অম্লানমুখে তাহাতেই সম্মত। এ রাম কেমন? কাষ্ঠপুত্তলিকার মত নন কি? দেবভাব যদি অতি বেশী হইয়া পড়ে, শোক দুঃখ প্রভৃতি মনুষ্য-সুলভ ভাব যদি কাহারও চরিত্রকে একেবারেই স্পর্শ করিতে না পারে, তবে সে চরিত্র যেন আমাদের সহানুভূতি হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়ে।

এরূপ ব্যক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ অবশ্যই করিবেন, কিন্তু তাঁহার ভালবাসার দাবী অল্প। তিনি আমাদিগকে মোহিত করিয়া লইয়া যাইতে পারেন কি? আমরা সংসারের মানুষ, ভাল মন্দ ভাবের মধ্যে একটু সংঘর্ষ, চিত্তের ক্ষোভ ও শান্তি, এই সকল না পাইলে, অর্থাৎ আমাদের মত কতকটা না দেখিলে যেন ঠিক আমাদের মনের মত হয় না।

সীতা বিরহে রামচরিত্রে এই মনুষ্য-সুলভ কোমলতার বিকাশ পাইয়াছে। উপর্য্যুপরি বিপৎপাতে যে রামচন্দ্র শাল্মলীতরুর ন্যায় অনড় ছিলেন, বিরহক্লিষ্ট হইয়া সেই রাম সহসা আমাদিগের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার স্বর্গীয় চরিত্র কতকটা পার্থিব ভাব ধারণ করিয়াছিল। এই স্থানে বাল্মীকির মহাকাব্যের প্রকৃত বিকাশ পাইয়াছে। "গচ্ছন্তং দণ্ডকারণ্যং যা মামনুজগামহ। ক সা মৈথিলী লক্ষ্মণ" —সহসা শান্ত সুগম্ভীর রামের কণ্ঠে এই সকরুণ কম্পন, কাব্যের ভাবী সৌন্দর্য্যের পূর্ব্বাভাস। তিনি যে রাজ্য হারাইয়া দুঃখিত, একথা ত একদিনও বলেন নাই। এই মহা আশাধ্বংসে তাঁহাকে কোনরূপ ক্ষোভিত করিয়াছিল কি না, ইহা জানিতে পাঠক উৎকণ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু রাম ত একটিবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াও হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য জানান নাই। সরলচিত্ত লক্ষ্মণ যে দিন "হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকেয্যাসক্তমানসম্" বলিয়া ধনুর্হস্তে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল, কৌশল্যা যেদিন রাজা দশরথকে কামাতুর বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন; নিতান্ত নির্লিপ্ত যোগীর ন্যায় রামচন্দ্র সেইদিন বিক্ষোভকম্পিত রাজগৃহে শান্তি ও নীতির বাণী আবৃত্তি করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ কেন সেই "মহোদধিমিবাকম্পা," "সত্যসন্ধ," "মহেন্দ্রসদৃশ" ব্যক্তি প্রাকৃতভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন? "রাজ্যভ্রষ্টস্য দীনস্য দণ্ডকান্ পরিধাবতঃ। ক সা দুঃখসহায়া মে বৈদেহী তনুমধ্যমা।" এই রাজ্যনাশে যে তিনি দুঃখিত ছিলেন, আজ তাহা জানা গেল; আজ তিনি নিজমুখে স্বীকার করিলেন তিনি "দীন, ভগ্নমনোরথ"। আজ তিনি নিজকে "হৃতরাজ্য বিবাসিত" বলিয়া আক্ষেপ করিলেন। শুধু ইহাই নহে। আজ তাঁহার চিত্তে মলিন ভাবগুলি জাগিয়া উঠিয়াছে, সীতাহরণে—"সকামা কৈকেয়ী সুখিতা সা ভবিষ্যতি" বলিয়া তিনি এ সম্বন্ধে নিরপরাধিনী রাজ্ঞীর প্রতি কটূক্তি করিতে লাগিলেন। এই স্থানে আমরা হাঁপ ছাড়িয়া একটু মনুষ্যসুলভ গুণ-দোষের সমাহার দেখিতে পাই। গভীর অন্যায় সহ্য করিলে গভীর দুঃখে মহৎ ব্যক্তিরও চিত্তে একটুকু মলিনতা প্রবেশ করিতে পারে। তাহা না হইলে স্বভাবের উৰ্দ্ধে এক দারুনির্ম্মিত মূর্ত্তি গঠন করিয়া রাখিলে তিনি পুরোহিতের মন্ত্রপূত ফুলচন্দন পাইতে পারিতেন, কিন্তু মানবজাতি তাঁহাকে বুঝিতে পারিত না।

এই বিরহ-অধ্যায়গুলিতে দেখা যায়, রাম কর্ত্তব্যপালনের জন্য একটি নীতিযন্ত্রের অবতার নহেন। তিনি কোমলতার আধারস্বরূপ। "বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদূনি কুসুমাদপি" কবির এই সূত্র রামচরিত্রে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত।

এই বিরহ-চিত্র গিরিনদীর উপান্তে পম্পাসরোবরের সুদৃশ্য তটভূমিতে স্থাপিত হওয়া বড়ই সুন্দর হইয়াছে। বসন্তকালে বিচিত্র বিহঙ্গকণ্ঠোত্থিত সঙ্গীত সীতাবিরহে রামের শোক উদ্দীপন করিয়াছিল, তাঁহার নিকট "পুষ্পবাস দুঃসহ" হইয়াছিল। শিখিনীকুল অনুরাগভরে শিখিদিগের অনুগমন করিতেছিল। রাবণ যদি সীতাকে হরণ না করিত, তবে তিনিও সেই ভাবে রামের অনুসরণ করিতেন। পম্পাতীরবর্ত্তী তরুরাজীর বৃন্তচ্যুত বিবিধ কুসুমপুঞ্জ "নিষ্ফলানি ভবন্তি মে" বলিয়া রামচন্দ্র অশ্রুপূর্ণনেত্রে সেই শোভান্বিত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখিতেছিলেন; সেই ছবির করুণরসাত্মক সৌন্দর্য্যে পবিত্র দাম্পত্যপ্রেমের কথা রামায়ণে মনোজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। সীতাকে না পাইয়া রামের ব্যাকুলতা যেমন স্বাভাবিক, তেমনই কবিত্বপূর্ণ। "সুকুমারীচ বালা নিত্যঞ্চ দুঃখভাগিনী", যদি আশ্রমে যাইয়া তাঁহাকে না দেখিতে পাই, যদি সীতা আবার অভ্যস্ত হাস্যের সহিত অভিনন্দন না করেন, তবে এ জীবন ধারণ করিব না। এইরূপ নানা আশঙ্কা করিতে করিতে ক্ষুধা, শ্রম ও পিপাসায় শুষ্কমুখ রামচন্দ্র পর্ণশালার দিকে ছুটিলেন। কিন্তু "দদর্শ পর্ণশালাঞ্চ সীতয়া রহিতং তদা। শ্রিয়া বিরহিতাং ধ্বস্তাং হেমন্তে পদ্মিনীমিব"। বৃক্ষগুলি যেন অশ্রুসিক্ত, মৃগযূথ ও পক্ষিবৃন্দ যেন ম্লান, সত্য সত্যই যেন বনের লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছেন। তখন সহসা রাম "শোকরক্তেক্ষণ-শ্রীমান্ উন্মত্ত ইব লক্ষ্যতে"।

মুনিশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র এস্থলে উন্মাদগ্রস্ত। এই উন্মত্ততার মত সুন্দর কল্পনা কাব্যসাহিত্যে একমাত্র বৈষ্ণব পদেই সুলভ। কদম্ববনানুরাগিনীর সংবাদ কদম্ববৃক্ষ অবশ্যই কিছু জানেন, তজ্জন্য রাম ছুটিয়া কদম্ববৃক্ষকে আলিঙ্গন করিতে করিতে ব্যস্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন, অশোকের নিকট শোকাপনোদনের প্রার্থী হইয়া কাতরকণ্ঠে মিনতি করিতেছেন। কর্ণিকার পুষ্প পাইলে সীতা তদ্দ্বারা কর্ণভূষণ প্রস্তুত করিতেন, এজন্য কর্ণিকার বনের নিকট যাইয়া রামচন্দ্র কত কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন! সহসা সুখকণ্টকিতদেহে রামচন্দ্র এক বৃক্ষের নিম্নদেশ লক্ষ্য করিয়া প্রলাপের ন্যায় বলিতে লাগিলেন,"প্রিয়ে! তুমি কোথায় যাইতেছ? তোমার পদ্মচক্ষুর প্রান্তদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া, পরিহাসশীলে! বৃক্ষের অন্তরালে কোথায় যাইতেছ? একবার একটুকু দাঁড়াও। তোমার কি আমার প্রতি করুণা নাই? এই তপোবনভূমি পরিহাসের স্থান নহে" বারংবার গোদাবরীতীরে যাইয়া খুঁজিতেছেন, লক্ষ্মণকে গোদাবরী তীরে বারংবার পাঠাইতেছেন, এক একবার নিরাশ হইয়া—"দীন শোকসমাবিষ্ট মুহূর্তং বিহ্বলোঽভবৎ"। "বিহ্বলিত সর্ব্বাঙ্গোগতবুদ্ধি বিচেতনঃ" হইয়া পড়িতেছেন। এই কি সেই রাম, যিনি রাজ্যশোক, পিতৃশোক—সমস্ত অটল বীরপুরুষের ন্যায় সহ্য করিয়াছিলেন? আদর্শ পুরুষের এ কি অধঃপতন! স্বর্গের হিসাবে যাহাই হউক না কেন, মনুষ্যত্বের হিসাবে আমরা এস্থলে লাভ ভিন্ন ক্ষতির কোন আশঙ্কা করি না। এই বিরহকাণ্ডগুলিতে যে অপূর্ব্ব কাব্যকলা লতাইয়া উঠিয়াছে, তাহা যুগযুগান্তরের জন্য বাল্মীকির রামায়ণকে অমর করিয়া রাখিবে।

শোভাময়ী প্রকৃতির প্রান্তে এই ভ্রান্তিময় আত্মবিস্মৃতিপূর্ণ প্রলাপবাক্য, ছায়াময়ী সীতামূর্ত্তি কল্পনা করিয়া সহসা কদম্বকোরকবৎ কণ্টকিত শরীরে আনন্দপ্রকাশ, আমাদিগকে আর একটি লোকশ্রেষ্ঠের চিত্র মনে করাইয়া দেয়। তিনিও রামচন্দ্রের ন্যায় বাঙ্গালীর পূজ্য। তিনি বন দেখিয়া বৃন্দাবন ভ্রম করিতেন, তিনিও ব্যাকুলভাবে বৃক্ষগুলিকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বাঞ্ছিতের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহারও পার্শ্বে অনুচর লক্ষ্মণের ন্যায় গদাধর মুরারি প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সেই স্বর্গীয় স্বপ্নবিহ্বলতায় মুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত।

উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতে করিতে যখন রামচন্দ্র স্বীয় হস্তের অর্পিত সীতার অঙ্গভূষণ কুসুমরাশির দর্শন পাইলেন, তখন সাশ্রুনেত্রে সেই ভূলুণ্ঠিত কুসুমগুলিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

"মন্যে সূর্য্যশ্চ বায়ুশ্চ মেদিনীচ যশস্বিনী
অভিরক্ষন্ত পুষ্পানি প্রকুর্ব্বন্তো মমপ্রিয়ং।"

খুঁজিতে খুঁজিতে সহসা দুই ভাই দেখিতে পাইলেন, ভগ্ন রথ ও ভগ্ন ধনু পড়িয়া আছে। রাক্ষসের বৃহৎ পদাঙ্ক ও রক্তাক্ত ভূমি দেখিয়া রাম অনুমান করিলেন, রাক্ষসকর্ত্তৃক সীতা ভক্ষিত হইয়াছেন। তখন অশ্রুসিক্ত চক্ষু সহসা তাম্রাভ হইয়া উঠিল, স্ফুরমান-ওষ্ঠসংপুট রাম যুগান্তের অগ্নির ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; লক্ষ্মণের হস্ত হইতে সবলে ধনু গ্রহণ করিয়া পৃষ্ঠাবলম্বী জটাভার বন্ধন করিতে করিতে বলিলেন—"ন ধর্ম্মস্ত্রায়তে সীতাং হ্রিয়মানাং মহাবনে";—এই অনীশ্বর সংসার তিনি স্বীয় বাণাগ্নি দ্বারা পুড়াইয়া ফেলিবেন। এই ক্রোধে ভাবী রাক্ষসধ্বংসের পূর্ব্বাভাস দৃষ্ট হয়। লক্ষ্মণের বিনয়বাক্যে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রামচন্দ্র পুনরায় বালকের ন্যায় অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। সহসা ক্ষতজার্দ্র মুমূর্ষু জটায়ুকে দেখিয়া রাম মনে করিলেন, "অনেন কিল বৈদেহী ভক্ষিতা নাত্র সংশয়ঃ।" তখনই বিরাট ধনুতে জ্যা আরোপিত হইয়া লক্ষ্য স্থির হইল। এ অবস্থায় সফেন রুধির উদ্গিরণ করিতে করিতে দীনবাক্যে জটায়ু বলিতে লাগিলেন—"হে আয়ুষ্মন, তুমি যাহাকে এই বনে বনে মহৌষধির ন্যায় অন্বেষণ করিতেছ, সেই সীতা এবং আমার প্রাণ উভয়ই রাবণ হরণ করিয়াছে।" "—আমি রাক্ষসকর্ত্তৃক পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছি, আমাকে তোমার আর হনন করা উচিত নহে"।

এই অসম্ভাবিত বার্ত্তায় ক্রোধোদ্দীপিত রামচন্দ্র বৃহদ্ধনু ত্যাগ করিয়া গৃধ্রাজকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন,"—সেই চন্দ্রমুখী সীতা মনোহর করুণবাক্যে সে সময় কি বলিয়াছিলেন, তোমার মৃত্যুর কথা—আমাকে বল"। ইহার উত্তরে জটায়ু অতি সংক্ষেপে রাবণের পরিচয় দিলেন। কিন্তু কৃতাঞ্জলিপুটে রামচন্দ্র গৃধ্রকে,—"হে তাত, আর একবার বল, যদি বলিবার শক্তি থাকে," প্রভৃতি বলিতেছিলেন, ইতিমধ্যে জটায়ুর চক্ষু ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল,—

"পুত্রো বিশ্রবসঃ সাক্ষাৎ ভ্রাতা বৈশ্রবণস্যচ।

ইত্যুক্ত্বা দুর্লভান্ প্রাণান্ মুমোচ পতগেশ্বরঃ।"

এই সময়ে রাম ধনু ফেলিয়া গৃধ্ররাজের পদতলে অবলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

"রাজা দশরথঃ শ্রীমান্ যথা মম মহাযশঃ।

পূজনীয়শ্চ মান্যশ্চ তথায়ং পতগেশ্বরঃ॥

সীতাহরণজং দুঃখং ন মে সৌম্য তথা গতম্।

যথা বিনাশো গৃধ্রস্য মৎকৃতেচ পরন্তপ॥"

এই সকল অংশে রামচরিত্র পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে। পূর্ব্বাধ্যায়ে ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য-নীতির আবরণে যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে যে সকল দুঃখকথা একান্ত গোপন ভাবে বিরাজ করিতেছিল,- এই বিরহোপলক্ষে সেই সমস্ত কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল কথা তিনি সুনীতি ও বৈরাগ্যের আচ্ছাদনে ঢাকা দিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা, "সীতাবিয়োগাৎ পুনরভ্যুদীর্ণং। কাষ্ঠৈরিবাগ্নিঃ সহসোপদীপ্তঃ।" কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের অবতার রামচন্দ্রকে এখানে বাল্মীকি মানবীয় শ্রীসম্পন্ন করিয়া আমাদের সম্পূর্ণ বোধগম্য করিয়াছেন। এখানে তাঁহার ক্রোধ, তাঁহার চিত্তবেদনার কম্পন আমাদের হৃদয়তন্ত্রী স্পর্শ করিয়া বাজিয়া উঠে। এস্থলে বিরাট ঐশ্বর্য্যশালী রামচরিত্রকে আমরা আপনার জনের ন্যায় ভালবাসা প্রদান করিতে পারি।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে রাম-সুগ্রীব মিলন করুণরসের উৎসস্বরূপ। সে সময়ে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে লইয়া বড়ই বিপন্ন। তিনি মুহুর্মুহু অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছেন, পাখীর স্বরে উতলা হইয়া কি বলিতেছেন, কুসুমগন্ধে সীতার আভাস পাইয়া উদ্ভ্রান্ত হইতেছেন, কখনও মুগ্ধভাবে ভূতলে পড়িয়া নিশ্চলতা অবলম্বন করিতেছেন; এই ব্যাকুল প্রেমোন্মাদকে লইয়া লক্ষ্মণ অতিশয় ভীত ও ব্যতিব্যস্ত,—তিনি সুগ্রীবের দূতের নিকট যে বিনীত আবেদন জানাইলেন, তাহা মর্ম্মস্পর্শী কাতরতাসূচক। সে অংশ পাঠকালে কোন্ পাঠক অশ্রু সংবরণ করিতে পারিবেন?

বালী সুগ্রীবের স্ত্রী হরণ করিয়াছে, শুনিয়া রামচন্দ্র মনে করিলেন, স্ত্রীহরণতুল্য পাপ আর জগতে কিছু হইতে পারে না। তখনই অগ্নিসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে ভাবেই হউক বালীকে বধ করিবেন। এ সম্বন্ধে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে যাহা কিছু অভিযোগ হইতে পারে, তাহ বাল্মীকি তারা ও বালীর মুখে প্রচার করিয়াছেন। অথচ রামকে ঐ ভাবে বালীহনন ব্যাপারে লিপ্ত করাইয়া তাঁহার চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখিয়াছেন। স্ত্রীহরণকষ্টাতুর সুগ্রীব স্বভাবতই রামচন্দ্রের প্রিয়তম সুহৃদ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এ বন্ধুত্বের ভিত্তি আর কিছু নহে।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ষড়ঋতুর বর্ণনা ও তদুপলক্ষে রামচন্দ্রের বিরহগাথা চিরমধুময় সৌন্দর্য্যের স্বপ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ষাকালে,

"ক্বচিৎ প্রকাশম্ ক্বচিদপ্রকাশম্,

ক্বচিৎ ক্বচিৎ পর্ব্বত সন্নিরুদ্ধম্,

মহার্ণবসদৃশ আকাশমণ্ডল দেখিয়া "নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজা" সীতার বাষ্পবিধৃত মুখপঙ্কজ রামের স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিত। নবাম্বুধারাহৃতকেশর পদ্ম পরিত্যাগ করিয়া সকেশর কদম্বপুষ্পের লোভে অলিকুল উড়িয়া পড়িত, রামচন্দ্র তাহা দেখিয়া "মনসা জগাম প্রিয়াং"। গতবিদ্যুদ্‌বলাহক আকাশ শরৎকালে প্রসন্নভাব ধারণ করিল, বিরহকাতর রামচন্দ্র কত মধুর ও দুঃখপূর্ণ কথায় বিলাপ করিলেন। কাঞ্চন এবং কাশকুসুম প্রস্ফুটিত হইল; সীতা এ সকল দেখিয়া কি ভাবে জীবন ধারণ করিবেন? বাপীতীর ও কাননপথে যিনি নিত্যসঙ্গিনী ছিলেন, অদ্য তাঁহাকে ছাড়া

"সরাংসি সরিতোবাপি কাননানি বনানিচ।

তং বিনা মৃগশাবাক্ষীং চরন্নাদ্য সুখংলভে"॥

অসনা সপ্তপর্ণ, এবং কোবিদার পুষ্প শরৎকালে গিরি-উপান্তে প্রস্ফুটিত হইয়া রামকে উদ্ভ্রান্ত এবং চঞ্চল করিয়া তুলিল। বন্ধুজীবের রক্তরাগ সীতার রক্তিম অধরের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল। "চত্বারো বার্ষিকা মাসা গতা বর্ষশতোপমাঃ"- কিষ্কিন্ধ্যাবাসের এই চারিটি মাস রামচন্দ্রের নিকট শত বর্ষের ন্যায় কাটিয়াছিল। সুগ্রীবের অবহেলা দেখিয়া তিনি লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন,

"প্রিয়াবিহীনে দুঃখার্ত্তে হৃতরাজ্যে বিবাসিতে।

কৃপাং ন কুরুতে রাজা সুগ্রীবো ময়ি লক্ষ্মণ।

অনাথো হৃতরাজ্যোঽয়ং রাবণেনচ ধর্ষিতঃ।

রামায়ণের এই বহুঅধ্যায়ব্যাপী রামবিরহের সৌন্দর্য্যের আভাস সংক্ষেপে প্রদান করা দুষ্কর। পাঠক একবার

মূলগ্রন্থখানি পড়িবেন। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন তুলসীদাস কৃত্তিবাস প্রভৃতি প্রাদেশিক কবিগণ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা রামায়ণের সূচীমাত্র। উপাখ্যানভাগ জানিতে হইলে, অমর কবির কবিত্ব উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা থাকিলে, মূল পাঠ একান্ত আবশ্যক। ঝিনুকের জলে সমুদ্রের যতটুকু আভাস পাওয়া যায়, অনুবাদগুলি হইতে আদি কাব্যের তদপেক্ষা বেশী নিদর্শন পাওয়া যাইবার কথা নহে।

বিরহের একটি শেষ চিত্র দেখাইয়া নিরস্ত হইব। হনুমান সীতার মণি আনিয়া রামকে উপহার দিলেন; রাম সেই দুর্লভ অভিজ্ঞানটি বাষ্পপূর্ণচক্ষে হস্তে লইয়া বলিলেন, "বৎসের স্নেহে যেরূপ আপনাআপনি ধেনুর পয়ঃ নিস্রুত হয়, এই মণিশ্রেষ্ঠের দর্শনে আমার চিত্ত সেইরূপ হইতেছে"। ব্যাকুলভাবে মণিটি বক্ষের ভিতর লুকাইয়া রাখিলেন এবং অবিরত অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "রোগী যেরূপ ঔষধে বাঁচিয়া উঠে, সীতার কথা শুনিয়া আমার চিত্ত সেইরূপ নবজীবন পাইল। মধুর বাক্যে মৈথিলী কি কি বলিলেন, হনুমান সেই কর্ণের অমৃত কথা বল; দুঃখ হইতে দুঃখান্তরে পতিত হইয়া সীতা কি ভাবে জীবন ধারণ করিতেছেন"?

এই বিরহগাথা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলে শুধু রামচরিত্রের পূর্ণ বিকাশ ইহাতে লক্ষিত হইবে এরূপ নহে, ইহার বিবিধ কবিত্বপূর্ণ বর্ণনাগুলিতে কালিদাসাদি কবিগণ কোন্ ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছিলেন, উত্তরচরিতের বিলাপাত্মক স্বর্গীয় প্রেমকথা কোন্ মূল গীতির প্রতিধ্বনিস্বরূপ হইয়া এত সুন্দর হইয়াছে, তাহাও পরিষ্কার জানা যাইবে।

এই সকল অধ্যায়ে বাল্মীকি উপজাতি ছন্দে ঋতু বর্ণনা করিয়াছেন। সেই ঋতুবর্ণনাগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই পরিদৃষ্ট হয়, আদি কবির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কালিদাসের ঋতুসংহার লিখিত। এই বিরহগাথায় যে অপূর্ব্ব কবিত্ব উচ্ছ্বসিত হইয়াছে, তাহা করুণরসে অভিষিঞ্চিত হইয়া পরম পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। কালিদাসের সৌন্দর্য্যবর্ণনা তুলিতে অঙ্কিত চিত্রপটের ন্যায়, শুধু চক্ষুর উপভোগযোগ্য; কিন্তু বাল্মীকির প্রকৃতিবর্ণনা ছত্রে ছত্রে অনুরাগ-ও-প্রেমকথা-কম্পিত হইয়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই প্রকৃতিবর্ণনা পড়িতে পড়িতে অনেকস্থলে আমাদের চিত্তে অব্যক্ত বেদনার ভাব উথলিয়া উঠে, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয় এবং নির্ব্বাসিত, প্রেমিকশ্রেষ্ঠ, বিরহী রাজকুমারের সকরুণ বিলাপরাশি মর্ম্মস্পর্শ করিয়া চিত্তকে একান্তরূপ দ্রবীভূত করিয়া ফেলে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

মেয়েলি সাহিত্য ও বারব্রত।

৩। জয় মঙ্গলবার।

এই ব্রত কেবল জৈষ্ঠমাসের প্রথম মঙ্গলবারে আরম্ভ করিয়া এইমাসের সমস্ত মঙ্গলবারে করিতে হয়। ১৭টি যবের চাল, ১৭গাছি দূর্ব্বা, ১৭টি কাঁটালপাতা দিয়া দুই প্রস্থ অর্ঘ্য করিতে হয়। পুরোহিতের দ্বারা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করাইয়া পূজান্তে অর্ঘ্য জলে বিসর্জ্জন করিবার নিয়ম। আহারের নিয়ম অন্যান্য মঙ্গলবারের ন্যায়। সুপারিহস্তে কথা শুনিতে হয়। যতদিন ইচ্ছা এই ব্রত করিতে পারা যায়। সধবা বিধবা সকলে এই ব্রতের অধিকারী। কথা এইরূপ—

"জয় জয় জয় মাগো জয় মা পার্ব্বতী,
জয় মঙ্গলবারের কথা কন শুভঙ্করী।"

"এক ছিল বেণে সদাগর, তার ছিল সাত বেটা। মা মঙ্গলচণ্ডী ছলনা করিয়া পা'কমারা [পাখিমারা] বেশে বেণে সদাগরের বাড়ী ভিক্ষা করতে গেলেন। যখন সদাগরের স্ত্রী ভিক্ষা দিতে এল, তখন পা'কমারা সেজে মা মঙ্গলচণ্ডী বল্লেন, বেটা-আঁটকুড়ির ঠিঁয়ে ভিক্ষে নিই, তবু বেটি-আঁটকুড়ির* ঠিঁয়ে নিনা। তখন সে চলে গেল, গোষাঘরে গিয়ে খিল দিল। বড় বেটা বাড়ী এসে মাকে দেখ্‌তে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, মা কোথায়? তখন কর্ত্তা বল্লেন, তিনি গোষাঘরে। পুত্র আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেসা করিল, কেন? তখন কর্ত্তা বল্লেন, এক পা'কমারা এসে বলে গেছে, বেটি-আঁটকুড়ির কাছে ভিক্ষা নোবনা। তখন পুত্র বলিল, "সে কোন্‌দিকে গেল।" 'গাঁয়ের উত্তরদিকে

*যে স্ত্রীলোকের গর্ভে কন্যা জন্মে নাই, তাহাকে মেয়েলী ভাষায় "বেটি আঁটকুড়ী" বলে।

গাছতলায় গিয়েছে"। পুত্র অনুসন্ধানে তাঁর নিকটে গেল এবং জিজ্ঞাসা করে বলিল, কিরূপে আমার মায়ের কন্যা হবে। তিনি উত্তর করিলেন, আমি ওষুদ দিলে তাহা খেলেই কন্যা হবে। এই ওষুদ খেয়ে কন্যা হো'লে আমি এসে নাম রেখে যাব। আজ থেকে তোমার মাকে জয়মঙ্গলবার করতে বলগা। ওষুদ নিয়ে খাওয়ান হলে কন্যা হোলো। সেই পা'কমারা অন্নপ্রাশনের সময় এসে কন্যার নাম 'জয়াবতী' রেখে গেল। তার মাকে মঙ্গলবার করতে নিষেধ করে, জয়াবতীকে করতে বলে গেল। জয়াবতী মঙ্গলবার করতে লাগ্‌ল। একদিন সদাগরকে তাহার স্ত্রী বলিল, যার ঘরে একটি ছেলে থাকবে তার ঘরে আমার একটি মেয়ের বিয়ে দিব।

আর এক দেশের একটি সদাগরের একটি ছেলে ছিল, তার সঙ্গে জয়াবতীর বিয়ে হো'ল। সেই ছেলের নাম "জয়ধর"।

ঠিক কুসুমডিঙ্গার * দিনে মঙ্গলবার পড়্‌ল। জয়াবতী সকালে উঠে মঙ্গলবারের আয়োজন করতে লাগ্‌ল। জয়ধর বল্‌লেন "জয়াবতী ও কি হবে?" "আমি মায়ের পেটেথেকে মঙ্গলবার করি, আজ মঙ্গলবার, তাই আজও মঙ্গলবার করব।" জয়ধর বল্লেন, "ও কল্লে কি হয়?"

"জয়াবতী বল্লেন—

"হারালে পায় ম'লে পায়

যা মনে ক'রে করে তাই জয়যুক্ত হয়।"

জয়ধর কহিল, "ও মঙ্গলবার করতে হবে না। আজ আমাদের নিয়মে মাছভাত খেতে হয়।" জয়াবতী কিছুতেই একথা নামেনে মঙ্গলবার পালন করলেন।

"জয়ধর বিয়ে করে নিয়ে যেতে যেতে জয়াবতীকে আপনার কাপড় পরালেন, আর গহনা সকল বাটায় পুরে কাপড় জড়িয়ে বড়দহে ফেলে দিলেন, আর বল্লেন কেমন করে মঙ্গলচণ্ডীর কৃপায় গহনাগুলি পাও দেখ্‌ব। সকলে বল্‌তে লাগ্‌ল বউকে কিছু দেয় নাই, সব নিয়েছে।

জয়ধরের মা বেটাকে বল্লেন, 'বাবা কোন্ দহে মাছ ধরবে? বেটা বল্লে বউকে জিজ্ঞাসা করগা। তিনি বল্লেন ক'নে বউ কি জানে? ছেলে বল্লে, যা জানে সেই জানে। বউকে জিজ্ঞাসা করলে বউ বল্লে, বড়দহে।

বড়দহে খেয়াদিতে একটা বড় "রাঘববোয়াল" উঠ্‌ল। সকলে বল্লে, এত বড় মাছ কে কুট্‌বে। বেটা বল্লে বউকে সুধাওগা। বউ বল্লে আমি কুট্‌ব। ১৭টা পেতে, ১৭টা বঁটি দাও, একটি নির্জ্জন ঘর দাও, তাতে যেন কেউ না আসে। মা বল্লেন, বাবা, বৌ-ভোজ কে রাঁধবে? সেই সময় বউ সেই ঘর থেকে গহনা ও কাপড় পরে বাহিরে এল। সেই রাঘববোয়ালের পেটেই গহনা কাপড় সব ছিল।

সকলে দেখলে বউএর গায়ে কিছু ছিল না; কোথাথেকে গহনা পেলে? শ্বশুর গিয়ে ছটি পায়ে পড়্‌তে লাগ্‌লেন আর বল্লেন, মা তুমি কে?—আমি কিছু জানিনা—আমি মায়ের পেটে হতে জয়মঙ্গলবার করি, আমি কি জানি, মা মঙ্গলচণ্ডী জানেন। আপনি শ্বশুর হয়ে কেন পায়ে পড়েন। জয়াবতী শাশুড়ীকে বল্লেন, আমাকে ১৭টি কাটি, ১৭টি হাঁড়ি, ১৭টি উনন, ১৭টি বিঁড়ে, ১৭টি নুড়ো দাও, আমিই বৌ-ভোজ রাঁধ্‌ব। জয়াবতী ভোজ রাঁধলেন। পঞ্চগ্রামের সদাগর খেতে বসেছে। শ্বশুর বল্লেন কে পরিবেশন করবে? তখন বউ বল্লে আমি করবো। আমাকে ১৭ খানি থালা দাও। যে আঙ্গিনায় শ্বশুর যান, দেখেন সেই আঙ্গিনাতেই বউ পরিবেশন কর্চ্চেন। তিনি বার বার জয়াবতীর পায়ে পড়তে যান, আর বলেন, বউ মা, কে মা তুমি বল। জয়াবতী বল্লেন, তুমি শ্বশুর, আমি বউ, আমি কিছু জানিনে। মায়ের পেটে থেকে মঙ্গলবার করি, সব মা মঙ্গলচণ্ডী জানেন।

এখন জয়াবতীর স্বামী বল্লেন, আমি বাণিজ্যে যাব। তিনি বাণিজ্যে গিয়ে প্রায় ৩ বচ্ছর এলেন না। সেখানে একটি বিয়ে ক'রে বউ নিয়ে বাড়ী আস্‌ছিলেন। পথে তাঁরা আস্‌ছিলেন, এমন সময় বাড়ীতে জয়াবতী মঙ্গলবারের আয়োজন করছিলেন। এমন সময় তার সতীনকে মা মঙ্গলচণ্ডী শঙ্খচীলের রূপ ধ'রে নৌকা থেকে জলে ঠেলে ফেলে দিলেন। কিছু দিন পরে জয়াবতীর পুত্রসন্তান হ'ল। জয়াবতী আপনার মঙ্গলবারের উৎযোগ কর্চ্চেন, এমন সময় জয়ধর তাঁর ছেলেকে ৭ খণ্ড ক'রে কেটে ৭ জায়গায় দূরে ফেলে দিলেন। তখন মা মঙ্গলচণ্ডী মনে করলেন, বেটা বড় জ্বালাচ্চে। তখন তিনি শঙ্খচীল হ'য়ে

*কুশণ্ডিকা।

রাজা রাজবর্ম্মা।

মাংসগুলি কুড়িয়ে অমৃতকুণ্ডের জল দিয়ে ছেলেকে বাঁচালেন।

"একদিন জয়াবতী বল্লেন, দাসী, ছেলেকে তেলকাজল দাও। ঝি বল্লে, ছেলে কৈ? "খুঁজে দেখ কোথা আছে"। দাসী খুঁজে ছেলে পেলে। জয়াবতী জিজ্ঞেসা করলেন, দাসী ছেলে পেয়েছ? দাসী বল্লে, হাঁ। সে দিন জয়ধর দেখ্‌লে, আজও ত ছেলে পেলে। পর মঙ্গলবারে জয়াবতী ব্রতের উদ্‌যোগ কর্চ্চেন, এমন সময় জয়ধর ছেলেকে নিয়ে কামারের আগুনশালে ফেলে দিলেন। অমনি মা মঙ্গলচণ্ডী কোলে করে নিলেন। তখন জয়াবতী দাসীকে বল্লেন, ছেলেকে তেলকাজল দাও। দাসী আবার বল্লে, ছেলে কৈ? "দেখ ছেলে আছে।" দাসী ছেলে দেখ্‌তে পেলে। জয়ধর দেখ্‌লেন, এবারেও ছেলেকে পেলে। পর মঙ্গলবারে যখন জয়াবতী আবার মঙ্গলবারের উদ্‌যোগ করছিলেন, সেই সময়ে দুটি ষাঁড়ে লড়াই করছিল। জয়ধর ছেলেকে সেই ষাঁড়ের পা-তলায় ফেলে দিলেন। দাসীকে আবার জয়াবতী ছেলের তেলকাজল দিতে বল্লে, দাসী বল্ল, ছেলে কৈ? —"দেখ কোথাও থাক্‌বে"। দাসী ছেলেকে দেখ্‌তে পেয়ে কোলে নিলে।

জয়ধর তখন দেখ্‌লেন, এবারেও ত ছেলে ম'লো না। আর দেখ্‌লেন যে,—

"হওয়া সতীন ম'লো,
হারালে পেলে, ম'লে পেলে।"

"এ মঙ্গলবার যে করে, যে বলে, যে শুনে, সবারই জয়াবতীর মত হয়।

"মা আস্‌ছেন হুঁকৃতে ধুঁকৃতে,
নির্দ্ধনীকে ধন দিতে,
কুঁড়েকে গতর দিতে,
অন্ধকে চো'খ দিতে,
বন্দীগণ খালাস করতে,
দূরের মানুষ নিকটে আনতে॥"

প্রণামের মন্ত্র।

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমস্তুতে॥"

শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।

রাজা রবিবর্ম্মা।

সুবিখ্যাত চিত্রকর রাজা রবিবর্ম্মা ত্রিবাঙ্কোড়ের একটী প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত। পুরুষানুক্রমে তাঁহাদের পরিবারের সহিত ত্রিবাঙ্কোড়ের রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ত্রিবান্দ্রাম্‌ সহরের নিকটবর্ত্তী কিলিমানুর নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা বিপদের সময় যুদ্ধে ত্রিবাঙ্কোড়ের মহারাজের সাহায্য করিয়া এই বিস্তৃত গ্রাম নিজের জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তদবধি রবিবর্ম্মার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ এই সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন। "পূর্ব্বপুরুষ," "পরিবার," প্রভৃতি কথা এই প্রবন্ধে ত্রিবাঙ্কোড়ে প্রচলিত অর্থে বুঝিতে হইবে। তথায় ভাগিনেয় মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে, পুত্র পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নহে। সুতরাং পূর্ব্বপুরুষ বলিতে মাতুলের মাতুল, তস্য মাতুল ইত্যাদি, এইরূপ বুঝিতে হইবে। পরিবার বলিতে মাতুল, তাঁহার ভগিনী, ভগিনীর সন্তান, ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। পরিবার বা বাড়ীর কর্ত্তা বলিলে মাতুলের উল্লেখ করা হইতেছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

রবিবর্ম্মারা তিন ভাই ও এক ভগিনী। রবিবর্ম্মা সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ইঁহারা ভাই বোন সকলেই স্বভাবশিল্পী। ইঁহাদের মাতা উমা অম্বা বাঈ একজন সুশিক্ষিতা ও মার্জ্জিত-স্বভাবা মহিলা ছিলেন। তিনি কবিতা লিখিয়া ত্রিবাঙ্কোড় অঞ্চলে কবিযশ লাভ করিয়াছিলেন। রবিবর্ম্মার বাল্যকালে ত্রিবাঙ্কোড়ে ইংরাজী শিক্ষার চলন ছিল না। তাৎকালিক রীতি অনুসারে তিনি স্বপরিবারের সংস্কৃত-শিক্ষকের নিকট ব্যাকরণ শিখিয়া রামায়ণ-মহাভারতাদি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বাল্যে ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি লাভ করা অপেক্ষা নিজ প্রাসাদের দেওয়ালে ও মেজেয় খড়ি বা কয়লা দিয়া দেবদেবীর মূর্ত্তি আঁকিতেই বেশী ভাল বাসিতেন। শিল্পবিষয়িনী প্রতিভার এবম্বিধ বাল্য অভিব্যক্তি তাঁহার পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সকলেই একটা অসহ্য বিরক্তিজনক ব্যাপার মনে করিতেন। কেবল বাড়ীর কর্ত্তা তাঁহার মাতুল রাজা রাজবর্ম্মা সেরূপ মনে করিতেন না। রাজবর্ম্মা অসামান্যপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার

বিবিধ গুণের মধ্যে চিত্রাঙ্কণনৈপুণ্য অন্যতম ছিল। তিনি নিজ চিত্তবিনোদনার্থ চিত্র আঁকিতেন, এবং তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির সাহায্যে, যাহা কিছু আঁকিতেন, সমস্তই জীবন্ত ও সত্যানুরূপ করিয়া তুলিতেন। রাজবর্ম্মা ভাগিনেয়ের ক্রমবর্দ্ধনশীল চিত্রাঙ্কণানুরাগ দেখিয়া অতিশয় প্রীতিলাভ করিতেন, এবং সেই অনুরাগ বদ্ধমূল করিবার জন্য তাঁহাকে যথাসাধ্য উৎসাহ দিতেন। রবিবর্ম্মা রেখাঙ্কনে (drawing) অনেকদূর অগ্রসর হইলে পর তাঁহার মাতুল তাঁহাকে জলমিশ্রিত বর্ণে (water colours) চিত্র আঁকিতে শিক্ষা দেন। তৎকালে ভারতবর্ষের সেই সুদূর প্রদেশে ইউরোপীয় রং ও তুলি পাওয়া যাইত না। রাজা রাজবর্ম্মা নিজেই সমুদয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতেন। এখানে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে তিনি জীবনের শেষভাগ নানাবিধ রং আবিষ্কার ও প্রস্তুতকরণ কার্য্যে যাপন করেন, এবং এই কার্য্যে সফলপ্রযত্নও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার পরীক্ষার বিষয়গুলিতে ব্যাপৃত থাকিবার লোক না থাকায় তাঁহার মৃত্যুর সহিত তাঁহার কার্য্যেরও অবসান হইয়াছে। কারণ রবিবর্ম্মা প্রাপ্তবয়স্ক ও শিল্পনিপুণ হইতে না হইতেই ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে বিলাতী চিত্রাঙ্কণের উপাদান ও সাধনসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে লাগিল।

ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে রবিবর্ম্মা মাতুলের সহিত ত্রিবাঙ্কোড়ের রাজধানী ত্রিবান্দ্রাম্ গমন করেন। মাতুলমহাশয় রবিবর্ম্মার অঙ্কিত কয়েকখানি ছবি তদানীন্তন মহারাজকে উপহার দেন। মহারাজ এই উপঢৌকন পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন। সে সময়ে চিত্রবিদ্যা ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোকের পক্ষে অপমানকর বৃত্তি বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত মহারাজ সাধারণমতাবলম্বী ছিলেন না। তিনি বালকের কার্য্যে তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইলেন এবং রাজোচিত বদান্যতার সহিত তাহার পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদাতা হইলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ষোল বৎসর বয়সে রবিবর্ম্মা ত্রিবাঙ্কোড়ের পরলোকগতা জ্যেষ্ঠা রাণীর কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ত্রিবাঙ্কোড়ে উত্তরাধিকারস্বত্ব মাতৃকুলাবলম্বী। সুতরাং ত্রিবাঙ্কোড়ের জ্যেষ্ঠা রাণী অর্থে মহারাজার ভগিনীদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠা তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে। তাঁহার ভগিনীরাই জ্যেষ্ঠা রাণী, কনিষ্ঠা রাণী এইরূপ নামে অভিহিতা, এবং তাঁহারাই রাণীর সমুদয় সম্মান পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের পুত্রেরাই সিংহাসনের অধিকারী। মহারাজের স্ত্রী পুত্রেরা পদমর্য্যাদা বা উত্তরাধিকার বিষয়ে গণনার মধ্যে আসেন না। বর্ত্তমান মহারাজের সহোদরা ভগিনী ছিল না। এইজন্য রাজ্যের উত্তরাধিকারী লাভার্থ তিনি দুইজন দত্তক ভগিনী লইয়াছিলেন। ইঁহারাই বড়রাণী ও ছোটরাণী। বড়রাণী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান, ছোটরাণীর প্রায় আট বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র ছিল। ত্রিবাঙ্কোড়ের চলিত রীতি অনুসারে প্রথম পুত্রকে এলিয়া রাজা বা যুবরাজ এবং দ্বিতীয়কে প্রথম রাজকুমার বলা হইত। বাঁচিয়া থাকিলে এলিয়া-রাজাই বর্ত্তমান মহারাজের পর মহারাজ হইতেন, কিন্তু সম্প্রতি উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে। এই কুমারদ্বয় রবিবর্ম্মার এক মাসতুতো ভাইএর ঔরস সন্তান ছিলেন। বংশপরম্পরাক্রমে রবিবর্ম্মার মাতুল তস্য মাতুল বা তাঁহাদের পরিবারের লোক, ত্রিবাঙ্কোড়ের মহারাজাদের জন্মদাতা পিতা। যাহাহউক, বর্ত্তমান মহারাজের উভয় ভাগিনেয়েরই মৃত্যু হওয়ায় ত্রিবাঙ্কোড়ের সিংহাসন উত্তরাধিকারিশূন্য হয়। লর্ড কার্জ্জনের অনুমত্যনুসারে কিছুদিন হইল রবিবর্ম্মার দুইটি দৌহিত্রী মহারাজকর্ত্তৃক বড়রাণী ও ছোটরাণীর পদে অভিষিক্তা হইয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই বালিকা মাত্র। ইঁহারা প্রাপ্তবয়স্কা হইয়া পুত্রবতী হইলে ইঁহাদের কোন না কোন পুত্র বর্ত্তমান মহারাজের পর মহারাজ হইবেন।

১৮৬৮খৃষ্টাব্দে থিওডোর জানসেন (Theodore Jansen) নামক একজন ইংরাজ চিত্রকর ত্রিবাঙ্কোড় দরবারে উপস্থিত হন। তদানীন্তন মহারাজা নিজ এবং নিজ পরিবারের অন্যান্য সকল ব্যক্তির চিত্র আঁকাইবার জন্য এই শিল্পীকে আনাইয়াছিলেন। ইঁহার আগমনকাল হইতে রবিবর্ম্মার প্রতিভা নূতন পথে ধাবিত হইতে আরম্ভ হয়। জানসেন সাহেবের মেজাজটা গরম ছিল, এবং তিনি যখন চিত্র আঁকিতেন, তখন কাহাকেও নিকটে থাকিতে দিতেন না। কিন্তু মহারাজের সদয় মধ্যস্থতায় রবিবর্ম্মা তাঁহার কাজ লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তৈলবর্ণের সাহায্যে যে কিরূপ চমৎকার ফল পাওয়া যায়, রবিবর্ম্মা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন,

এবং অতঃপর তৈল-চিত্রকর হইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি তৈল-চিত্র আঁকিবার সমুদয় সরঞ্জাম আনাইলেন এবং জানসেনের চিত্রগুলিকে আদর্শ করিয়া প্রাণ দিয়া খাটিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি মহারাজা ও মহারাণীর ছবি আঁকিলেন, এবং কয়েকটী কল্পনাপ্রসূত চিত্রও আঁকিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড হোবার্টের উৎসাহে মান্দ্রাজে একটি ললিতকলা-প্রদর্শনী হয়। ত্রিবাঙ্কোড়ের মহারাজা তত্রত্য বৃটিশ রেসিডেণ্টের ইচ্ছানুসারে রবিবর্ম্মার দুটি চিত্র এই প্রদর্শনীতে প্রদর্শনার্থ প্রেরণ করেন। শিল্পী নিজেও প্রদর্শনী দেখিতে যান। রবিবর্ম্মা একটি চিত্রের জন্য গবর্ণরপ্রদত্ত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। চিত্রটির বিষয়, "একটি নেয়ার মহিলা মল্লিকাফুলের মালা দিয়া কবরী বিভূষিত করিতেছেন।" এই চিত্রটি দর্শকগণের এত ভাল লাগিয়াছিল, যে কিছুদিন ধরিয়া সহরের যেখানে সেখানে ইহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল। লর্ড হোবার্ট রবিবর্ম্মাকে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি শিল্পীর চিত্রগুলির বিশেষ প্রশংসা করেন, এবং তাঁহাকে অধ্যবসায়বলে যশোলাভ করিতে উৎসাহিত করেন। রবিবর্ম্মা ত্রিবান্দ্রামে ফিরিয়া আসিলে পর মহারাজা মান্দ্রাজে তাঁহার কৃতকার্য্যতায় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে উচ্চ সম্মান এবং বহু মূল্যবান্ উপহার প্রদান করেন। গবর্ণরের স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত এই চিত্রটি পরে ভীয়েনার অন্তর্জাতিক মহাপ্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়। তথা হইতে শিল্পী একখানি প্রশংসাপত্র ও পদক প্রাপ্ত হন। পরবৎসর, অর্থাৎ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, রবিবর্ম্মা মান্দ্রাজ শিল্পপ্রদর্শনীতে "এক তামিল মহিলা সরবৎ (একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র) বাজাইতেছেন," এতদ্বিষয়ক চিত্রের জন্য স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। যখন বর্ত্তমান ভারতসম্রাট যুবরাজরূপে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারত দর্শন করিতে আসেন, তখন ত্রিবাঙ্কোড়ের মহারাজা তাঁহাকে রবিবর্ম্মার কৃত উক্ত চিত্র ও আরও দুই খানি চিত্র উপহার দেন। যুবরাজ উক্ত চিত্রত্রয়ের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে ইউরোপে শিক্ষালাভ করেন নাই এরূপ একজন শিল্পীর পক্ষে সে গুলি অতিশয় প্রশংসার্হ। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মান্দ্রাজ প্রদর্শনীতে রবিবর্ম্মা "শকুন্তলা-পত্রলেখন" প্রেরণ করেন। পুনর্ব্বার রবিবর্ম্মা প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন এবং মান্দ্রাজের তদানীন্তন গবর্ণর ডিউক অব্ বকিংহাম উহা অবিলম্বে ক্রয় করেন। তৎকাল পর্য্যন্ত কোন ভারতবর্ষীয় শিল্পী প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বর্ণিত নায়ক নায়িকা বা ঘটনাবলীর তৈলচিত্র প্রস্তুত করেন নাই। রবিবর্ম্মার সংস্কৃত শিক্ষা এখন তাঁহার কাজে লাগিল। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে নিজ অভিরুচি অনুসারে চিত্রের বিষয় নির্ব্বাচন করিতে লাগিলেন। তিনি অতঃপর বাস্তব ব্যক্তিবিশেষের আলেখ্য (Portraits) এবং অন্যবিধ চিত্র, উভয় প্রকার চিত্রই আঁকিতে লাগিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি, মান্দ্রাজগবর্ণমেণ্টহাউসে রক্ষিত হইবার জন্য ডিউক অব বকিংহামকে দেখিয়া তাঁহার একটি চিত্র আঁকিবার বরাত পাইলেন। এই ছবিখানি রবিবর্ম্মার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছবির মধ্যে একখানি। ইহার পার্শ্বে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট হাউসে নামজাদা ইউরোপীয় চিত্রকরগণের অঙ্কিত যে সকল ছবি টাঙ্গান আছে, তাহাদের সহিত তুলনায় ইহা ভাল বই মন্দ মনে হয় না। ডিউক অব্ বকিংহাম রবিবর্ম্মার ক্ষিপ্রকারিতায় বিশেষ চমৎকৃত হন, এবং একবার এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে যদিও তিনি (ডিউক্) একজন বিখ্যাত ইউরোপীয় চিত্রকরের সম্মুখে আঠার আঠার বার বসিয়াছিলেন, তথাপি তিনি রবিবর্ম্মার চিত্রিত ছবির অর্দ্ধেক পরিমাণেও সত্যানুরূপ ছবি আঁকিতে সমর্থ হন নাই।

মান্দ্রাজ হইতে রবিবর্ম্মার প্রত্যাবর্ত্তনের এক কি দুইমাস পরে ত্রিবাঙ্কোড়ের মহারাজার মৃত্যু হয়। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা মহারাজা হন। তিনি বর্ত্তমান মহারাজার অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজত্ব করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। নূতন মহারাজের অভিলাষানুসারে রবিবর্ম্মা "সীতার পরীক্ষা" নামক বৃহৎ চিত্র অঙ্কিত করেন। এই চিত্রে, সীতার চরিত্রে দোষারোপ হওয়ায় তাঁহার জননী ধরিত্রী তাঁহাকে লইয়া অন্তর্হিত হইতেছেন, এই বিষয়টি অঙ্কিত হইয়াছে। বড়োদা রাজ্যের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী সর তাঞ্জোর মাধব রাও তখন ত্রিবাঙ্কোড় দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি এই চিত্রটি দেখিয়া এতই প্রীত হন যে উহা মহারাজা গায়কোবাড়ের জন্য ক্রয় করেন এবং নিজের জন্য, একটি নেয়ার বালিকা বেহালায় সুর বাঁধিতেছে, রবিবর্ম্মাকৃত এতদ্বিষয়ক সুন্দর চিত্রখানি

খরিদ করেন। মাধবরাও শেষোক্ত চিত্রটি ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের পুনা শিল্পপ্রদর্শনীতে প্রদর্শন করেন। গায়কোবাড়ের স্বর্ণপদক এই চিত্রটির জন্য প্রদত্ত হয় এবং ইহার প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বোম্বাইএর গবর্ণর সর্ জেম্‌স্ ফর্গুসন এই ছবিটি দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হন, কিন্তু উহা সর্ টি মাধব রাওএর সম্পত্তি বলিয়া শিল্পীকে উহার একটি প্রতিলিপি আঁকিতে আদেশ করেন। রবিবর্ম্মা উহা আঁকিয়া স্বয়ং গবর্ণরকে উপহার দেন। সর জেম্‌স রবিবর্ম্মার শিল্পনৈপুণ্যের গুণগ্রাহিতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে ইংলণ্ডের রাজপরিবারের ফোটোগ্রাফ সমন্বিত একখানি বহুমূল্য এলবাম্ উপহার দেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রবিবর্ম্মা নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা সী· রাজা রাজবর্ম্মাকে সঙ্গে লইয়া মহারাজা গায়কোবাড়ের অভিষেক উপলক্ষে তৎকর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বড়োদা গমন করেন। বড়োদার দরবারে চারিমাস অবস্থিতিকালে তিনি গায়কোবাড় রাজপরিবারের সকলের চিত্র অঙ্কিত করেন। তিনি এই সময় রাজা সর্ টি মাধবরাও এবং বৃটিষ রেসিডেণ্ট মেলভিল সাহেবেরও ছবি আঁকেন।* অতঃপর তিনি ভবনগরের মহারাজার আমন্ত্রণে তাঁহার রাজধানীতে গিয়া তাঁহার জন্য কতকগুলি ছবি আঁকিয়া দেন। ভবনগর হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি গুরুতর শোক পান। চিত্রবিদ্যায় তাঁহার বাল্যশিক্ষক তাঁহার ভক্তিভাজন মাতুল মহাশয়ের এই সময়ে মৃত্যু হয়। এই মহাত্মা জীবনের শেষভাগ পরম ভাগবতের ন্যায় যাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার শিক্ষা ও উৎসাহ ব্যতিরেকে রবিবর্ম্মা রবিবর্ম্মা হইতে পারিতেন না।

ইহার পর রবিবর্ম্মা মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব নৃপতি সর চমরাজেন্দ্র ওদায়ারের নিমন্ত্রণে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মহীশূর যাত্রা করেন। ইনি সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার একান্ত অনুরাগী ছিলেন। রবিবর্ম্মা তিনমাস মহীশূরে থাকিয়া মহারাজা ও তাঁহার সন্তানগণের আলেখ্য অঙ্কিত করেন। মহারাজা অন্যান্য উপহারের মধ্যে, শিল্পীকে, ত্রিবাঙ্কোড়ের অভিজাতবর্গের মধ্যে তাঁহার উচ্চ মর্যাদার উপযুক্ত সম্মান রক্ষার্থে, দুইটি সুন্দর হস্তী প্রদান করেন।

রবিবর্ম্মা কলিকাতার অন্তর্জাতিক প্রদর্শনী এবং লণ্ডনের ভারতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রদর্শনীতে রৌপ্যপদক ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। এই সময় তাঁহার জননীদেবী দেহত্যাগ করেন। তিনি শোকাচ্ছন্নহৃদয়ে ব্রতাবলম্বী হইয়া কিলিমানুরস্থ নিজ প্রাসাদে একবৎসর কাল যাপন করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজা গায়কোবাড় নীলগিরি শৈলে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিতে আগমন করেন। এই সময় তিনি রবিবর্ম্মাকে বড়োদাস্থিত নিজ নূতন প্রাসাদ ভূষিত করিবার জন্য একটি বৃহৎ ফরমাইশ দেন। তাহা রামায়ণ ও মহাভারতের চৌদ্দটি সুনির্ব্বাচিত দৃশ্যের চিত্রাঙ্কন। এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে রবিবর্ম্মা উত্তর ভারতবর্ষে ভ্রমণ করা আবশ্যক মনে করেন। উদ্দেশ্য, প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি বা চিত্রাদি হইতে হিন্দু রাজা ও রাণীগণের পরিচ্ছদের সম্যগনুশীলন। কিন্তু তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। বহুশতাব্দীব্যাপী মুসলমানপ্রাধান্যকালে তাঁহার উদ্দেশ্যসম্পৃক্ত খাটা হিন্দু যাহা কিছু ছিল, সমুদয়ই উত্তর ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক জাতি, উপজাতি এবং কোন কোন প্রদেশে, প্রত্যেক বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার আছে। এইজন্য রবিবর্ম্মা বুঝিতে পারেন যে সকল শ্রেণীর লোককে সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে এরূপ একটি সাধারণ পরিচ্ছদ আবিষ্কার করা বড় কঠিন। উত্তর ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া রবিবর্ম্মা মালব, রাজপুতানা, দিল্লী আগ্রা, লাহোর, বারাণসী, এলাহাবাদ, কলিকাতা, ও অন্যান্য স্থান দর্শন করেন। কলিকাতায় তিনি বিজয়নগরমের ভূতপূর্ব্ব মহারাজার অতিথি ছিলেন। মহারাজা রবিবর্ম্মার একজন 'ভক্ত' বন্ধু ছিলেন।

উত্তরভারত ভ্রমণ পরিসমাপ্তির পর রবিবর্ম্মা গৃহে প্রত্যাগত হইয়া গায়কোবাড়ের ফরমাইশী কাজে হাত দেন, এবং দুই বৎসরের মধ্যে ছবি চৌদ্দখানি সমাপ্ত করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের শেষে তৎসমুদয় সঙ্গে লইয়া বড়োদা গমন করেন। চিত্রগুলি কয়েকদিনের জন্য প্রকাশ্যস্থানে প্রদর্শিত হয়। তাহা দেখিবার জন্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সকল দিক হইতে দলে দলে লোকের সমাগম হয়। কিছুদিন বড়োদায় একটা

* মেলভিল সাহেব মহ্লার রাও গায়কোবাড়ের নির্ব্বাসনের পর বড়োদার শাসনপ্রণালীর সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্য্যে নেতৃত্ব করেন।

রবিবর্ম্মার "শকুন্তলা-পত্রলেখন"।

[Indian Press, Allahabad.

হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ, ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যদ্বয় হইতে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া এই সর্ব্বপ্রথম কেম্বিসের উপর এরূপ জীবিতবৎ ও হৃদয়স্পর্শী তৈলচিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে এইসকল চিত্রের হাজার হাজার ফোটোগ্রাফ বিক্রীত হইয়াছিল। এই ছবিগুলি সর্ব্বসাধারণের এইরূপ প্রীতিলাভ করায় রবিবর্ম্মা নিজব্যয়ে বোম্বাইএ একটি লিথোগ্রাফিক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য, স্বকীয় চিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে নানা বর্ণে মুদ্রিত করিয়া, তৎসমুদয়কে সাধারণ জনগণের সুপ্রাপ্য করা। এই প্রকারে তিনি তাঁহার স্বজাতীয় লোকদিগের মনে শিল্পানুরাগ জন্মাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তাহাদের সুপরিচিত পৌরাণিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয়ের চিত্র যেমন তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে, এমন আর কিছুতে পারিবে না। তাঁহার এই উদ্যম আশাতীত সফলতা লাভ করিয়াছে। আজ হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র গৃহে গৃহে তাঁহার চিত্র সকল সাদরে রক্ষিত হইতেছে, এবং ছোট বড় সকল শ্রেণীর লোকের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রেস হইতে রবিবর্ম্মার প্রায় একশত ছবি নানাবর্ণে মুদ্রিত হইয়াছে। তাঁহার অনেক উৎকৃষ্ট চিত্রের ফোটোগ্রাফ লওয়া বা লিথোগ্রাফ করা সুসাধ্য না হওয়ায় এখনও তৎসমুদয়ের প্রতিলিপি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তাঁহার যে সকল ছবি বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় সেগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট নহে। তাঁহার অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ছবি বিক্রীত হইয়া ত্রিবাঙ্কোড়ের বাহিরে চলিয়া যাওয়ায় আর তাহাদের ফোটোগ্রাফ পাইবারও উপায় নাই। তাঁহার আধুনিক অনেক শ্রেষ্ঠ ছবির এ পর্য্যন্ত কোন প্রতিলিপি মুদ্রিত হয় নাই। নানা বর্ণে রঞ্জিত চিত্রের ফোটোগ্রাফ হইতে মূল চিত্রের সৌন্দর্য্যের আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তাহা হইতে শিল্পীর প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় রবিবর্ম্মার কয়েকখানি আলেখ্য হইতে হাফ্‌টোন ছবি প্রস্তুত করাইয়া প্রকাশ করিলাম। "বিরাট রাজার সভায় দ্রৌপদী" নামক চিত্রখানি এখন ত্রিবাঙ্কোড়ের মহারাজার সম্পত্তি। শিল্পী মহাশয় উহা 'প্রবাসীর' জন্য ফোটোগ্রাফ করাইয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই চিত্রে দ্রৌপদী, কীচক, ভীম, প্রভৃতিকে চিনিয়া লওয়া সহজ। "রাজা রুক্মাঙ্গদ ও মোহিনী" নামক চিত্রখানির একটু সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দেওয়া আবশ্যক। রুক্মাঙ্গদের দুই রাণী। ছোটরাণী ভ্রষ্টা ও ক্রূরপ্রকৃতি। রাজা তাহার যে কোন প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন; সে একবার সুযোগ বুঝিয়া এই বর মাগিয়া বসিল যে তিনি হয় বড়রাণীর গর্ভজাত স্বীয় একমাত্র পুত্রকে বধ করুন, নতুবা তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত খাদ্য আহার করিয়া একাদশীর উপবাস ভঙ্গ করুন। রাজা সত্যসংকল্প ছিলেন। একাদশীর দিনে আহার করাকেও তিনি মহাপাপ মনে করিতেন। তাঁহার পুত্র তাঁহাকে এই মহাপাপের ভাগী না হইয়া বরং নিজ মস্তকচ্ছেদ করিতে অনুরোধ করিতেছে। বড়রাণী এক বৃদ্ধা পরিচারিকার ক্রোড়ে মূর্চ্ছা গিয়াছেন। রাজা উভয় সঙ্কটে পড়িয়া তরবারিহস্তে ঊর্দ্ধনেত্রে ভগবানকে ডাকিতেছেন। মোহিনী পাষাণীর ন্যায় তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে অঙ্গীকার পালনের জন্য জিদ করিতেছে। রাজপ্রাসাদস্থ দেবমন্দিরে এই মর্ম্মভেদী দৃশ্যের অভিনয় হইতেছে। 'দময়ন্তী ও হংস' চিত্রে দময়ন্তী হংসমুখে নলরাজার প্রেরিত প্রেমবার্ত্তা তদগতচিত্তে শুনিতেছেন। অবশিষ্ট চিত্রখানিতে কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে পত্র লিখিতেছেন। উভয় পার্শ্বে সখী প্রিয়ংবদা ও অনসূয়া আসীনা। অদূরে এক মৃগশিশু।

ভারতবর্ষীয় লোকদিগের জীবনব্যাপারসম্বন্ধীয় দশখানি চিত্র আঁকিয়া রবিবর্ম্মা সিকাগো অন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি দুইটি পদক ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। আমেরিকার কয়েকখানি প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে এই চিত্রগুলি প্রশংসিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন শিল্পপ্রদর্শনীতে ছবি পাঠাইয়া রবিবর্ম্মা যে সকল পদক, মুদ্রাপুরস্কার এবং সসম্মান উল্লেখ লাভ করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের দীর্ঘ তালিকা দেওয়া সুসাধ্য নহে; ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি যেখানে যেখানে ছবি পাঠাইয়াছেন, সর্ব্বত্রই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

বোম্বাইএ ছাপাখানা স্থাপন করিবার পর হইতে তিনি বৎসরের কিয়দংশ ত্রিবাঙ্কোড়ে এবং কিয়দংশ বোম্বাইএ যাপন করেন। তিনি বোম্বাই ও মান্দ্রাজের অধিকাংশ বিখ্যাত ও রাজদত্তউপাধিধারী ব্যক্তিদের ছবি আঁকিয়া-

ছেন। বর্ত্তমান বৎসরের প্রারম্ভে তিনি উদয়পুরের মহারাণা কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন। মহারাণা নিজের, এবং নিজ দরবারে রক্ষিত পুরাতন চিত্র হইতে সর্ব্বাপেক্ষা যশস্বী নিজ চারিজন পূর্ব্বপুরুষের চিত্র আঁকাইবার জন্য শিল্পীকে ডাকিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় স্বদেশপ্রেমিক রাজপুতানার গৌরবরবি বীরকুলারাধ্য মহারাণা প্রতাপসিংহ একজন। রবিবর্ম্মা উদয়পুরের মনোহর দৃশ্যে মোহিত হন। তাঁহার ভ্রাতা রাজা রাজবর্ম্মা অনেকগুলি দৃশ্যের সুন্দর আলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন। রবিবর্ম্মার এই কনিষ্ঠ সহোদর সম্বন্ধে কিছু না বলিলে শিল্পী মহোদয়ের এই সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত অঙ্গহীন থাকিয়া যাইবে। ইনি নিজ অগ্রজের নিত্যসহচর ও সহকারী। ইনিও অগ্রজের মত বাল্যকালেই সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যায় নিজ স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং ইংরাজী সাহিত্যাদির অনুশীলন হইতে যেটুকু অবকাশ করিয়া লইতে পারিতেন, তাহা সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার অনুশীলনে নিয়োগ করিতেন। তিনি বেশ প্রতিভাশালী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে তিনি বরাবর প্রথমস্থান অধিকার করেন। পূর্ব্বোক্ত এলিয়া রাজা ও প্রথম রাজকুমার তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। পাঠদশান্তে তিনি নিজ অগ্রজের বৃত্ত অবলম্বন করেন। রবিবর্ম্মা দেখিলেন যে একজন ইউরোপীয় শিল্পীর নিকট রংফলান প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা পাইলে তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা উপকৃত হইবেন। এইজন্য তাঁহারা ফ্রাঙ্ক ব্রুকস্ নামক একজন নবাতন্ত্রের নিপুণ চিত্রকরকে শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অনেক শিক্ষালাভ করেন। রবিবর্ম্মা প্রধানতঃ মানসী মূর্ত্তি চিত্রণে সিদ্ধহস্ত। তদীয় ইউরোপীয় শিক্ষকের পরিচালনায় তাঁহার ভ্রাতা রাজা রাজবর্ম্মার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও বাস্তব মনুষ্যালেখ্য অঙ্কণে অসাধারণ ক্ষমতা বিকশিত হইয়াছে। তিনি মান্দ্রাজ ও বোম্বাইএর শিল্পপ্রদর্শনীতে অনেকগুলি পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। উভয় ভ্রাতাই এই বলিয়া বড় দুঃখ করেন যে ত্রিবাঙ্কোড়ের কঠিন সামাজিক নিয়ম নিবন্ধন তাঁহারা ইউরোপীয় প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্র পরিদর্শন ও তথায় গিয়া শিক্ষা লাভরূপ সুবিধা হইতে বঞ্চিত। কিয়ৎপরিমাণে এই অসুবিধার প্রতীকার করিবার জন্য তাঁহারা সুবিখ্যাত ইউরোপীয় চিত্রকরদিগের প্রস্তুত বহুমূল্য অনেকচিত্র ক্রয় করিয়া কিলিমানুরে স্বীয় শিল্পাগার সুসজ্জিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে শিল্পের উন্নতি ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ওয়াকীব্‌হাল থাকিবার জন্য তাঁহারা ইংরাজী ও ইউরোপীয় নানা ভাষায় প্রকাশিত অধিকাংশ শিল্পবিষয়ক সাময়িক পত্র লইয়া থাকেন।

ভারতবাসিগণের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা ও মানসিক উন্নতির পথে যাহারা পথপ্রদর্শক, তাঁহাদের মধ্যে রবিবর্ম্মাকে কোন্ স্থান দেওয়া উচিত, তাহা নির্ণয় করিবার ভার ভবিষ্যদ্বংশাবলীর উপর। আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিব না। ভারতে মহা মহা কবি, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ, স্থপতি ও সঙ্গীতবিশারদ অনেক জন্মিয়াছেন, কিন্তু এই রত্নপ্রসূ পুণ্যভূমির উপযুক্ত একজনও চিত্রকর জন্মগ্রহণ করেন নাই। রবিবর্ম্মা এই অভাব পূরণ করিয়াছেন কি না, আমরা বলিতে অসমর্থ। বস্তুতঃ অধুনাতন যুগে চিত্রবিদ্যারূপ মহতী কলার এরূপ অবনতি ও দুর্গতি হইয়াছিল যে ইহার পুনরুজ্জীবন অতিশয় মন্থরভাবে সম্পাদিত হইত, যদি রবিবর্ম্মা স্বকীয় প্রতিভাবলে ইহাকে সাধারণের সম্মুখে গৌরবান্বিত করিয়া না তুলিতেন। ভারতবর্ষীয় চিত্রবিদ্যার ইতিহাস যদি কখন লিখিত হয়, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তিনি আধুনিক যুগে ইহার জন্মদাতা বলিয়া পূজিত হইবেন।

রবিবর্ম্মা নম্র মৃদু এবং ধীর প্রকৃতির লোক। তিনি দয়ালু ও দানশীল। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করিতে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। তিনি যখন চিত্রাঙ্কণ করেন না, বা চিত্রের বিষয় চিন্তনে ব্যাপৃত থাকেন না, তখন সর্ব্বদাই হয় ইংরাজী জ্ঞানবৃদ্ধির চেষ্টা করেন (কারণ তিনি অনেক অধিক বয়সে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন), নতুবা কোন প্রিয় সংস্কৃত কাব্য অধ্যয়ন করেন। তিনি যশোগর্ব্বিত নহেন। বরং তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেন যে যতই তাঁহার জ্ঞান বাড়িতেছে ততই তিনি উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন, যে মানবচক্ষু হইতে লুক্কায়িত প্রকৃতির মহারহস্য সমূহের অতি অল্পই তাঁহার জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

মুদ্রণ-স্বত্ব।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই ক্ষুদ্র নগরী বেকন্স্‌ফীল্‌ডে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। সেইস্থানে বিলাতের বিখ্যাত

বক্তা, নীতিজ্ঞ এবং সুলেখক এড্‌মণ্ড বর্কের কবর আছে। এতকাল পরে সেখানকার লোকেরা তাঁহার একটি স্মৃতিচিহ্ন তাহার প্রিয় নিবাসগ্রামে সংস্থাপিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। তাহারা মনস্থ করিয়াছে যে বেকনস্‌ফীল্‌ড্‌ ধর্ম্মমন্দিরে বর্কের নামে একটি প্রস্তরফলক স্থাপিত করিবে। এই স্মারক-পট্ট প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা আজ অনাবৃত করা হইবে; এবং এই শুভকার্য্য করিতে আসিবেন ইংলণ্ডের উন্নতিশীলদলের ভূতপূর্ব্ব নেতা ও সচিব লর্ড রোজবরি। লর্ড রোজবরির বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ, রাজনীতিবিদ্যাতেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট। অনেক সাহিত্যসেবী অনেক সমাজের নেতা, সেস্থলে সমবেত হইয়াছেন। সকলেই শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া আছেন, যে লর্ড রোজবরির মত রাজনীতিনিপুণ বক্তা সেই শতবর্ষ পূর্ব্বের অদ্বিতীয় বাগ্মী ও তাত্ত্বিকের বিষয় কি বলেন। বেদির সন্নিকটে এক টেবিলে ইংলণ্ডের প্রধান দৈনিক পত্রগুলির লেখকেরা বসিয়াছে। তাহারা কৃত-সঙ্কল্প যে লর্ড রোজবরির রসনা হইতে যাহা কিছু নিঃসৃত হইবে, সমস্ত সঙ্কেতলেখনের সাহায্যে লিখিয়া লইবে। টাইম্‌স্‌ ডেলিনিউস্‌, ষ্টাণ্ডার্ড, প্রভৃতি সকল সম্বাদপত্রেরই লোক সে সভায় উপস্থিত।

কিছুক্ষণ পরে চতুর্দ্দিকে একটা কলরব হইল; লর্ড রোজবরি আসিয়া পহুঁছিলেন। যথাকালে ধর্ম্মমন্দির মধ্যে স্মারকপট্ট আবরণোন্মুক্ত হইল। লর্ড মহাশয় চমৎকার বক্তৃতা করিলেন। এড্‌মণ্ড্‌ বর্কের পদবিন্যাসের সৌন্দর্য্য, সরস্বতীনিষ্যন্দের তেজ, গবেষণার গভীরতা, এ সকল সামান্যসমালোচককৃত চর্ব্বিতচর্ব্বণের বিষয় এই নূতন বক্তা কিছু বলিলেন না। কিন্তু তিনি সেই মহাত্মার দৈনিক 'আটপৌরে' জীবনের একটি জলন্ত ছবি আঁকিয়া তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিলেন। সে বক্তৃতার সম্যক্‌ বিবরণ দেওয়া আমার ক্ষুদ্র লেখনীর কর্ম্ম নহে। যাঁহাদের কৌতূহল অধিক, যাঁহারা উচ্চ সাহিত্যে আদরবান্‌, তাঁহারা ১১ই তারিখের একখণ্ড "টাইম্‌স্‌" কিনিয়া পড়িবেন; তাঁহাদের কুতূহল চরিতার্থ হইবে।

কয়েকখানা কাগজে লর্ড মহাশয়ের বক্তৃতা মুদ্রিত হইল। সাহেব সকালে চা পানের সময় ও বিকালে কফি সেবনকালে সেগুলি দেখিলেন। কিন্তু টাইম্‌সের মত রিপোর্ট কাহারও হয় নাই, টাইম্‌সের লোকই তাঁহার প্রত্যেক কথা নির্ভুলরূপে লিখিয়া লইতে পারিয়াছিল। লর্ড রোজ-বরি কয়েকটি বিবরণের মধ্যে টাইম্‌সে মুদ্রিত রিপোর্টটি পছন্দ করিলেন, এবং নিজের বক্তৃতাসংগ্রহ পুস্তকে সেই বিবরণটি নির্ভুল বলিয়া কাটিয়া রাখিলেন। লর্ড রোজবরি লেখা বক্তৃতা পাঠ করেন না। তবে তাঁহার একটি খাতা (album) আছে, সম্বাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার বক্তৃতার বিবরণী কাটিয়া তাহাতে লাগাইয়া রাখা হয়; সেই বিবরণীগুলি লর্ডমহাশয় পাঠ করিয়া দেখেন এবং যদি তাহাতে কিছু ভুল থাকে ত সংশোধন করিয়া রাখেন।

কিছুদিন পরে লেন(Lane)নামক জনৈক পুস্তক-প্রকাশক লর্ড রোজবরির বক্তৃতা সকল সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি লর্ড মহাশয়ের নিকট আবেদন করিয়া এই সদনুষ্ঠানে তাঁহার অনুমতি লাভ করিলেন, এবং মুদ্রণকালে "প্রুফ" সংশোধন করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত খাতাখানি দেখিবারও অনুজ্ঞা পাইলেন। লেন্‌ সাহেব সম্বাদ-পত্রে প্রকাশিত বিবরণী হইতেই লর্ড রোজবরির বক্তৃতা সংগ্রহ করিলেন। প্রত্যেক বক্তৃতার পূর্ব্বে একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকাও লিখিলেন। টাইম্‌স্‌ হইতে পাঁচটি বক্তৃতা মুদ্রিত হইল। লর্ড মহাশয়ের খাতার সহিত মিলাইয়া লওয়া হইল। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ক-বিষয়ক বক্তৃতাটি টাইম্‌সে নির্ভুল বাহির হইয়াছিল; বক্তা তাহাতে সংশোধন করিবার কিছু পান নাই। বরং শেক্স্‌-পীয়র্‌ হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিবার সময় লর্ড রোজবরি একটি ভুল করিয়াছিলেন, টাইম্‌সে বচনটি তেমনই ভুলই ছাপিয়াছিল। লেন্‌ সাহেব পুনর্মুদ্রণের সময় সে ভুলটা শোধরাইয়া লইলেন। লেন্‌ সাহেবের পুস্তকের নাম হইল, "Appreciations and Addresses of Lord Rosebery."

পুস্তক বাহির হইবামাত্র টাইম্‌সের অধ্যক্ষেরা দেখিলেন, পাঁচটি বক্তৃতা প্রায় অবিকল তাঁহাদের মুদ্রিত রিপোর্ট-সমূহ হইতে ছাপিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই বিবরণগুলি সংগ্রহ করিতে তাঁহাদের বড় অল্প ব্যয় হয় নাই। টাইম্‌স্‌ অনেক খরচ করিয়া সকল সময় কয়েকটি খুব উপযুক্ত রেখা-শব্দাভিজ্ঞানবিদ্যাবিৎ লেখক রাখেন। তাঁহারা শুধু সঙ্কেত লেখা (short hand) লিখিতে পারেন তাহা নয়, তাঁহারা

বেশ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত। কাজেই বক্তৃতার অর্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং নির্ভুল সমস্ত লিখিয়া লইতে পারেন। টাইমসের বিবরণী সেইজন্য সম্পূর্ণ ও নির্ভুল হয়। সেগুলির আদরও বিলাতে যথেষ্ট। এরূপ উৎকৃষ্ট ও ব্যয়সাধ্য রিপোর্ট পাঁচটি লেন্ সাহেব বিনা অনুমতিতে এবং কোনরূপ ঋণ স্বীকার না করিয়া মুদ্রিত করায় টাইম্স্ পত্রের স্বত্বাধিকারী বিরক্ত হইলেন,এবং কাউন্সিলির মত গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডের "সুপ্রীম্ কোর্টে" "চান্সরি" বিভাগে মোকদ্দমা রুজু করিলেন। রেখাশব্দাভিজ্ঞানবিৎ লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। তাহাদের সহিত টাইম্সের বন্দোবস্ত এইরূপ যে তাঁহারা বেতনের বিনিময়ে তাঁহাদের লেখা বিক্রয় করিবেন। সে লেখায় আর তাঁহাদের স্বত্ব থাকিবে না; সেগুলি টাইম্সের সম্পত্তি হইবে। সেইজন্য টাইম্স্-স্বত্বাধিকারী দাবি করিলেন, "আমার জিনিষ প্রতিবাদী লেন্ চুরি করিয়া ছাপাইয়াছে; আদালত হুকুম করুন যে ঐ পুস্তক ও যেন আর ছাপিতে বা বেচিতে না পায়।"

বক্তৃতাগুলি যে টাইম্স্ হইতে সঙ্কলিত সে বিষয়ে কোন কথা নাই। বিবরণীগুলি যে টাইম্সের সম্পত্তি তাহাও লেনকে স্বীকার করিতে হইল। আইনের বিষয়েও তর্ক হইতে পারে না। আমি একখানা বই লিখিলে আমার অনুমতি বা সম্মতি ব্যতীত সে বই ছাপিবার আপনার অধিকার নাই। তবে লেন্ সাহেব সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি বলিলেন, "আমি টাইম্স্ হইতে বক্তৃতা লইয়াছি সত্য, কিন্তু ও বক্তৃতা ত টাইম্সের নয় বক্তৃতা লর্ড রোজ্‌বরির। আমি লর্ড রোজ্‌বরির অনুমতি লইয়া ছাপিয়াছি। টাইম্স্ বারণ করিবার কে?" তুমুল সংগ্রাম বাধিল; বড় বড় কাউন্সিলিরা বড় বড় বক্তৃতা করিলেন, বড় বড় জজেরা বড় বড় রায় লিখিলেন, পরস্পরের মত খণ্ডন করিলেন। অবশেষে তিন আদালত লড়িয়া "হাউস অব্ লর্ড্সে" গিয়া টাইম্স্ জিতিলেন। মীমাংসা হইল যে বক্তৃতা এবং বক্তৃতার "রিপোর্ট," দুটি বিভিন্ন জিনিষ। সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মনোগত ভাবে একা লর্ড রোজ্‌বরিরই স্বত্ব ছিল। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যখন তিনি মনের কথাগুলি প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহার সে স্বত্ব গেল। যাহারা কথাগুলিকে ধরিয়া লিখিয়া লইতে পারিল, তাহাদেরই তখন লর্ড রোজ্‌বরির বক্তৃতা প্রকাশ করিবার অধিকার হইল। সত্য যে সমস্ত বক্তৃতাটি লর্ড রোজ্‌বরির কপোলকল্পিত, প্রত্যেক বাক্য তাঁহার রসনানির্গত, সঙ্কেতলেখক একটি কথাও বাড়ায় নাই, বদলায় নাই, কেবল কিছু কাগজ ও কালি খরচ করিয়াছে মাত্র; কান দিয়া শুনিয়াছে, হাত দিয়া লিখিয়াছে; কিন্তু লিখিয়াছে ত সেই প্রথমে। লর্ড রোজ্‌বরির কোনরূপ স্মারকপুস্তক বা পাণ্ডুলিপি ছিল না। কাজেই সেই সঙ্কেতলেখকই সেই বক্তৃতার প্রথম লেখক। সেই লিখিত বক্তৃতা তাহারই রচনা, তাহারই সম্পত্তি; সে লেখা দেখিয়া আর কাহারও তাহার নকল করিবার বা ছাপিবার অধিকার নাই; এমন কি লর্ড রোজ্‌বরি স্বয়ং যদি ঐ রিপোর্ট নির্ভুল দেখিয়া পুস্তকাকারে বাহির করেন, তিনি চোর—এরূপ দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবারিত হইবেন, এরূপ অপরাধের জন্য দণ্ডিত হইবেন। বৃথা বিরেল্, Q. C, তর্ক করিলেন, বৃথা লিণ্ড্লিপ্রমুখ আপীল আদালত রায় লিখিলেন, বৃথা লর্ড রবার্টসন মত প্রকাশ করিলেন যে সঙ্কেতলেখককে "গ্রন্থকার" (author) বলা যাইতে পারে না, পরের বক্তৃতা লিখিয়া লওয়া মৌলিক রচনা নহে, সঙ্কেতলেখক একটি সজীব "ফোনোগ্রাফ্" বিশেষ,—যেমন ঐ শব্দযন্ত্রকে তন্মধ্যে কথিত কথার বক্তা বা স্বত্বাধিকারী বলা যাইতে পারে না, সেইরূপ সঙ্কেতলেখককেও তাহার লিখিত বক্তৃতার রচয়িতা বা স্বত্বাধিকারী বলা যাইতে পারে না,—মুদ্রণস্বত্ব আইন (Copyright Act) মৌলিক রচনা রক্ষা করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, বক্তার মুখ হইতে বক্তৃতা ছিনাইয়া লইয়া দ্রুতলেখনীধারী কোন কেরাণীবিশেষের উপকারের জন্য হয় নাই। লর্ড চান্সেলর জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কোন ব্যক্তি যে অপর কাহারও পরিশ্রম, কৌশল ও মূলধন বাজেয়াপ্ত করে, ইহা একেবারেই আইনসঙ্গত নহে।" লর্ড ডেভী (Davey) বলিলেন, "আমি বীজ বপন করিব এবং তুমি শস্য কাটিয়া খাইবে, এ কেমন কথা? লিখিল টাইম্সের লোক; তুমি লেন্ কোথাকার কে যে তাহার পরিশ্রমের ফলটা অম্লানবদনে আত্মসাৎ কর?"

পাঠক এতক্ষণে বোধ হয় বুঝিলেন যে মুদ্রণস্বত্ব জিনিষটি

রবিবর্ম্মার "রাজা রুক্মাঙ্গদ ও মোহিনী"।

[Indian Press, Allahabad,

কি প্রকার। মুদ্রণস্বত্বের অর্থ কোন পুস্তকের নকল প্রকাশ করিবার অনন্যভুক্ত অধিকার। পুস্তকের অর্থ প্রায় সকল প্রকার লিখিত বা চিত্রিত বস্তু, বিজ্ঞাপনমুদ্রিত একপাতা কাগজ হইতে সুবৃহৎ বহুসংখ্যায় প্রকাশিত গ্রন্থ পর্য্যন্ত। ছাপিবার এই অনন্যসাধারণ অধিকার একটি নির্দ্দিষ্টকালব্যাপী, এবং কেবল লেখক বা রচয়িতার (author)সম্পত্তিবিশেষ। আমি একখানা বই লিখিলে সেই বই বহুসংখ্যক মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিবার অধিকার প্রথমতঃ কেবল আমারই আছে। আমি যদি সেই স্বত্ব কাহাকেও দান বা বিক্রয় করি, আমার স্থলে স্বত্বাধিকারী হইয়া সেই লোক আমার পুস্তক ছাপিতে বা ছাপাইতে পারে। নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইয়া গেলে আমার স্বত্ব আর অনন্যসাধারণ থাকে না, সকলেই সে পুস্তক স্বেচ্ছায় ছাপিতে ও প্রকাশ করিতে পারে। এই মনে করুন কবি ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী সকলেই ছাপিতেছে, কিন্তু হেমবাবুর গ্রন্থাবলী কবিবরের প্রকাশক ব্যতিরেকে অন্য কাহারও ছাপিবার অধিকার নাই।

এই মুদ্রণস্বত্বটি একটি নূতন রকমের সম্পত্তি, একটি আধুনিক সৃষ্টি। পুরাকালে পুঁথি পাইলেই লোকে নকল করিয়া রাখিত। গ্রন্থকারের কোন স্বত্বের বিপর্য্যয় হইল, এটা কেহ ভাবিত না। পুস্তক প্রচারের জন্যই লেখা হয়। পাঁচ জন পড়িবে, সুখ্যাতি করিবে, সকল গ্রন্থকারেরই এই বাসনা। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে গ্রন্থরচনা একটি ব্যবসার মধ্যে পরিগণিত হইত না। বর্ত্তমান কালের লেখকদের মত তখনকার লোক বড় একটা বই বেচিয়া খাইত না। পরে যখন বুধজনেরা এ বিষয়ে চিন্তা করিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হইল। দার্শনিকেরা বলিলেন যে মস্তিষ্ক একটি আমাদের অঙ্গের মধ্যে; আমার হাতের তৈয়ারি জিনিষ যেমন আমার—যেমন একমাত্র আমিই তাহার ফলভোগ করিবার অধিকারী—তেমনই আমার মস্তিষ্কপ্রসূত গদ্য বা পদ্য আমারই জিনিষ, তাহাতে আর কাহারও স্বত্ব নাই। আমি দান বা বিক্রয় না করিলে তাহা চিরকাল আমারই সম্পত্তি থাকিবে, আমার উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি ব্যতীত কেহ তাহাতে কোনরূপ দখল দিতে পারিবে না। সমাজনীতিবেত্তারা কিন্তু বলিবেন, যে সকল কর্ম্ম সাধারণের উপকারের জন্য, তাহার ফল সকলকে ভোগ করিতে দেওয়া উচিত। তৎসমুদয়ের উৎকর্ষ প্রভাবে সকলেই উন্নত ও গৌরবান্বিত হয়, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু মুদ্রণস্বত্বের ব্যবস্থা এইসকল আলোচনার ফলে হয় নাই। সর্ব্বপ্রথম ইংলণ্ডে এই বিষয়ে আইন হয়। সে আজ ১৯২ বৎসরের কথা। যদিও শুনা যায় যে এই বিধি মূলে বিখ্যাত লেখক সুইফ্‌টের (Swift) রচনা কিন্তু ইহা গ্রন্থকারদিগের যত্নে ততটা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, যত পুস্তকবিক্রেতাদিগের চেষ্টায়। সকল লেখকই নিজের বই প্রকাশ করিতে চান; যদি পুস্তক প্রচারই না হইল, যদি কেহই তাহা না পড়িল, তবে লেখক বেচারি শুধু মুদ্রণস্বত্ব লইয়া করিবে কি? এই মুদ্রণস্বত্বের সৃষ্টি দুইটা জিনিস হইতে হইয়াছে। প্রথম, Press Censorship। সেকালে না দেখিয়া শুনিয়া পুস্তক ছাপিতে প্রায় দেওয়া হইত না। সাধারণতঃ এ কার্য্যের ভার ধর্ম্মযাজকদের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। তাঁহাদের কর্ম্ম ছিল ছিদ্রান্বেষণ করা; তাঁহাদিগকে স্থির করিতে হইত যে কোন পুস্তকে ধর্ম্মের বা রাজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু আছে কি না। তাঁহারা অনুমোদন করিলে এবং আজ্ঞা দিলে পর পুস্তক প্রকাশিত হইত। * রাজাও বিশেষ পুস্তক ছাপিবার আদেশ বিশেষ কোনও ব্যক্তিকে কখনও কখনও দিতেন।* এইরূপে শুধু যে একশ্রেণীর authorised বা অনুমতিপ্রাপ্ত পুস্তকের সৃষ্টি হইল তাহা নহে, পুস্তকের বাজারে একাধিকারেরও (monopoly) সৃষ্টি হইল। এই একাধিকার হইতে মুদ্রণস্বত্ব বিস্তর দূর নহে। দ্বিতীয় কারণ, পুস্তকবিক্রেতাদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। পুস্তকবিক্রেতাদিগের সাহায্যে পুস্তক প্রকাশিত হইত। পুস্তকবিক্রেতারা আবার অনেক সময়ে লেখকের নিকট হইতে পুস্তক ক্রয় করিয়া লইতেন। পাঠকের মনে থাকিতে পারে এইরূপে পুস্তকবিক্রেতা সিমনস্ কবিগুরু মিল্টনকে দশ† পাউণ্ড দিয়া "প্যারাডাইস্ লষ্ট" মহাকাব্য ক্রয় করিয়াছিলেন। লণ্ডনের পুস্তকবিক্রেতাদের আবার একটা সংঘাত (Guild) ছিল। সেই দলের বাহিরের লোকে যাহাতে পুস্তক ছাপিতে না পারে, সে বিষয়ে তাহারা বড় সতর্ক ছিল। বিশেষ করিয়া

*পাঠকের বোধ হয় Milton's *Areopagitica* স্মরণ আছে।
† তিনি পরে মিল্টনপত্নীকে আরও ৮ পাউণ্ড দিয়াছিলেন।

যে সকল পুস্তক সেই দলের কোনও লোক একবার ছাপিয়াছে, তাহাতে তাহারই একাধিকার স্থির করা হইত, আর কাহাকেও তাহা ছাপিতে দেওয়া হইত না। Stationers' Company একটি খাতা (Register) রাখিতেন। তাহাতে পুস্তকের নাম না লিখাইলে পুস্তকে স্বত্ব উৎপন্ন হইত না। কিন্তু নাম পুস্তকবিক্রেতা না হইলে লিখাইতে পারিত না। কাজেই গ্রন্থকার যদি ইচ্ছা করিতেন যে তাঁহার পুস্তক যে সে না ছাপিতে পায়, তাহা হইলে তাঁহার কোন পুস্তকবিক্রেতাকে বহি বিক্রয় করিয়া দেওয়া ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না।

লণ্ডন-পুস্তকবিক্রেতাসমাজ কিন্তু আভ্যন্তরীণ অনেক নিয়ম করিয়াও বাহিরের প্রকাশকদিগকে নিরস্ত করিতে পারিত না। তাই তাহারা চেষ্টা করিয়া রাজ্ঞী এনের রাজ্যশাসনের অষ্টম বর্ষে জগতে প্রথম মুদ্রণস্বত্বসংক্রান্ত আইন প্রচার করাইল। এই আইনে প্রথম 'স্বত্বাধিকারী'র সহিত 'গ্রন্থকার' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।* কিন্তু নূতন পুস্তক সম্বন্ধে ইহা দ্বারা এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় যে কোন পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হইবার পর ১৪বৎসর গ্রন্থকার ব্যতীত আর কেহ তাহা মুদ্রিত করিতে পারিবে না। তবে যদি ১৪বৎসর অতীত হইবার পরও গ্রন্থকার জীবিত থাকেন তাহা হইলে আরও ১৪ বৎসর একমাত্র তাঁহারই ঐগ্রন্থ প্রচারের স্বত্ব রক্ষিত হইবে। পাঠক দেখিবেন যে যদিও গ্রন্থকারের স্বত্ব এই আইনে স্বীকৃত হইল, কিন্তু এই স্বত্বকে একটি নির্দ্দিষ্টকালের সীমামধ্যে আবদ্ধ করা হইল। এইরূপ বিধি যদি প্রকল্পিত না হইত তাহা হইলে বোধ হয় দার্শনিকদিগের প্রাগুল্লিখিত গ্রন্থকারের চিরন্তন স্বত্ব সংক্রান্ত মত আদালতেও গ্রাহ্য হইত। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বিচারপতি লর্ড ম্যানস্‌ফীল্‌ডের এইরূপ মত ত ছিলই ; আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর Law Reports পড়িলে জানিতে পারা যায় যে যখন বিলাতী কবি টম্‌সনের গ্রন্থাবলী লইয়া দুই প্রকাশকের মধ্যে ঝগ্‌ড়া হইয়া মামলা "হাউস অব লর্ড্‌স্‌" অবধি গিয়াছিল, তখন ইংলণ্ডের জজসমূহের মত লওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহারা প্রায় সকলেই গ্রন্থকারের চিরন্তন স্বত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু ১১জনের মধ্যে ৬ জন এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে রাজ্ঞী এনের আইন অনুসারে এই স্বত্ব ২৮বৎসরের পর লোপ পাইয়া থাকে। "হাউস অব লর্ডসে" এই মত গ্রাহ্য হওয়াতে চিরন্তন স্বত্বের তর্ক বিলাতে আর কখন উঠে নাই।*

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রবিপ্লবের ঘোর দুর্যোগের মধ্যে ফরাসীদেশে জগতের দ্বিতীয় মুদ্রণস্বত্ব আইন প্রচারিত হয়। M. Lakanal বলেন যে প্রতিভাশালী লেখকের এমনি অদৃষ্ট যে নীরবে পরিশ্রম করিয়া তিনি যেই এমন একখানি পুস্তক প্রচার করেন যে তাহারদ্বারা মানবজ্ঞানের সীমা বাড়িয়া যায়, অমনি সাহিত্যদস্যুরা সেই পুস্তকখানি গ্রাস করে, এবং লেখক অনন্ত দুঃখসাগর উত্তীর্ণ না হইয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারেন না ; তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদির ত কষ্টের পরিসীমা নাই! এই ফরাসী আইনের উদ্দেশ্য পুস্তকে লেখকের স্বত্ব রক্ষা করা। কেবলমাত্র লেখক সমস্ত জীবন নিজের পুস্তক প্রকাশিত করিতে পারিবেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধিগণের দশ বৎসর পর্য্যন্ত ঐরূপ অধিকার থাকিবে, ইহাতে এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

ক্রমে ক্রমে য়ুরোপে অন্যান্য দেশেও মুদ্রণস্বত্ব আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। স্পেনে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে, ইটালিতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এবং জর্ম্মনিতে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এ বিষয়ে ব্যবস্থা হয়। ইংলণ্ডে ১৮৪২ সালে রাজ্ঞী এনের আইনের স্থানে নূতন একটী আইন† প্রকল্পিত হয়। এই আইনের কতকগুলি বিধি ভারতবর্ষে পাঁচ বৎসর পরে Act No. XX

* The preamble recites that printers, booksellers and other persons were frequently in the habit of printing, reprinting, and publishing "books and other writings without the consent of the *authors or proprietors* of such books and writings, to their very great detriment, and too often to the ruin of them and their families. For preventing, therefore, such practices for the future, and for the encouragement of learned men to compose and write useful books, it is enacted" &c. 'স্বত্বাধিকারী' প্রায় পুস্তকবিক্রেতা হইত।

* মুদ্রণস্বত্ব আইনের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার স্থান এ পত্রিকা নহে। যাঁহারা সরল ভাষায় আরও কিছু খবর চান, তাঁহারা Birrell's Seven Lactures on the Law and History of Copy right in Books পড়িবেন।

† 5 and 6 Victoria, C 45.

of 1847 রূপে প্রবর্ত্তিত করা হয়। বিলাতে এবং ভারতে এখনও এইটী মুদ্রণস্বত্ব সম্বন্ধে প্রধান আইন।* ইহার মুখবন্ধ দৃষ্টে বুঝা যায় যে ব্যবস্থাপকেরা মনুষ্যের পক্ষে নিত্য উপকারী উচ্চ সাহিত্যকে উৎসাহিত ও বর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যেই এই আইন প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু এই আইন এমন সব জিনিসের বিষয়ে প্রয়োগ করা হইয়াছে, যাহাকে কোন রূপে 'সাহিত্য' পদবাচ্য করা যায় না। বিজ্ঞাপন, ফিরিস্ত, "ডাইরেক্টরী", "টাইম্ টেবল্", সকলের বিষয়েই মামলা মোকদ্দমা হইয়াছে, এবং তাহাদের প্রথম রচয়িতা বা সঙ্কলয়িতাকে 'গ্রন্থকার' (author) নামে অভিহিত করিয়া হাকিমেরা সাহায্য করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে ইংলণ্ডের সর্ব্বোচ্চ আদালত "হাউস্ অব্ লর্ড্স্" হইতে স্থির হইয়া গিয়াছে যে, যে ব্যক্তি কাহারও বক্তৃতা লিখিয়া লয়, সেও 'গ্রন্থকার'। অবশ্য যাহার সঙ্কলনে কিছু মানসিক পরিশ্রম হইয়াছে সে পুস্তক বা পত্র ত নিশ্চয়ই সাহিত্যচোরের হস্ত হইতে রক্ষিত হইবে। মনে করুন, আমি পাঁচ জন পুরাতন কবির গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া তাঁহাদের কতকগুলি উৎকৃষ্ট রচনা মনোনয়ন করিয়া মুদ্রিত করিলাম। সেই কবিরা পুরাতন, সকলেই তাঁহাদের লেখা ছাপিতে পারে। কিন্তু তা বলিয়া আপনি আমার পুস্তকখানি দেখিয়া, আমার পছন্দের কবিতাগুলি ছাপিয়া, আর একটা পাঁচফুলের সাজি সাধারণের সমক্ষে ধরিতে পারেন না। আপনার নিজের মানসিক পরিশ্রম চাই, নিজের মস্তিষ্ক পরিচালন আবশ্যক। আমার পুস্তক আপনি দেখিতে পারেন, সেইরূপ আর এক খান পুস্তকও লিখিতে পারেন; তবে আদালতে মামলা আসিলে আপনাকে দেখাইতে হইবে যে আপনি স্বকীয় চিন্তাশক্তির এতদূর চালনা করিয়াছেন যে আপনার পুস্তক একেবারে মৌলিকত্ববিহীন হয় নাই।

মুদ্রণস্বত্ব আজকাল বিলাতে ও ভারতে ৪২ বৎসর থাকে, অর্থাৎ কোন পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হইবার পর, ৭২বৎসর পর্য্যন্ত গ্রন্থকার বা তাঁহার লোক ব্যতীত অপর কেহ তাহা ছাপিতে পারে না। তবে যদি গ্রন্থকার জীবিত থাকিতে থাকিতেই ৪২ বৎসর কাটিয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার এই স্বত্বটী মারা যায় না, তাঁহার মৃত্যুর পর আরও ৭ বৎসর চলে। ফলে মুদ্রণস্বত্ব ৪২ বৎসরের কম কখনই থাকে না, লেখক দীর্ঘজীবী হইলে বেশী দিনও চলিতে পারে। কিন্তু পুস্তকের প্রথম সংস্করণের তারিখ হইতে সময় গণনা করায় একটা দোষ হয়। অনেক পুস্তকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সংস্করণ বর্দ্ধিত বা পরিবর্ত্তিত হয়; সেগুলির প্রথম সংস্করণের তারিখ হইতে ৪২ বৎসর হইয়া গেলেও পরের সংস্করণ সম্বন্ধে স্বত্ব ফুরায় না। ফলে, অনেক সময় বাজে দোকানদারেরা গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর নানাভুলপ্রস্খলিত প্রথম সংস্করণ ছাপিয়া বাজারে বেচিতে আরম্ভ করিয়া দেয়; অথচ হয়ত সেই সকল ভ্রম তিনি অনেক দিন পূর্ব্বে তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত অন্য সংস্করণে সংশোধিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে গ্রন্থকারের অপযশ হয়, পুস্তকক্রেতারা প্রতারিত হয়।* এইরূপ গোলমাল হয় বলিয়া অন্যান্য দেশে গ্রন্থকারের জীবদ্দশার অন্ত হইতে গণনা আরম্ভ করা হয়। যথা ফ্রান্সে এই স্বত্ব গ্রন্থকারের সমস্ত জীবন এবং তাঁহার পর আরও ৫০ বৎসর থাকে, স্পেনে আরও ৮০ বৎসর, জর্ম্মনিতে আরও ৩০ বৎসর থাকে।

পূর্ব্বে গ্রন্থকারেরা অনন্তকালব্যাপী এইরূপ স্বত্বের দাবী করিতেন। কিন্তু অনন্ত কাল ধরিয়া পঠিত হইতে পারে, এরূপ পুস্তক জগতে অতীব বিরল। পৃথিবীতে শেক্সপীয়র বা কালিদাস কটা জন্মায়? বেশী ভাগ পুস্তকই এই রকম যে আজ আপনি পড়িয়া হয়ত 'আহা মরি!' করিতেছেন, কিন্তু দশ বৎসর পরে লোকে তাহার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইবে। এ কথা আজ কাল সকল গ্রন্থকারে না বুঝুন, কিন্তু পুস্তকপ্রকাশকেরা বুঝিয়াছে। তাই এখন অনন্তকালব্যাপী স্বত্বের দাবী ছাড়িয়া দিয়া সমগ্র ভূমণ্ডলব্যাপী স্বত্বের দাবী হইতেছে। এই মনে করুন, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ইংলণ্ডের অধীন নহে, অথচ সেখানের লোকেরা অধিকাংশই ইংরাজবংশীয় এবং প্রায় সকলেই ইংরাজীতে সুশিক্ষিত। এখন, ইংলণ্ডে একখানি ভাল বই বাহির হইলেই, কিছু দিন পূর্ব্বে অমনি আমেরিকায় তাহার একটা বা অধিক

* ভারতবর্ষে মুদ্রণযন্ত্রালয় ও সম্বাদপত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে আর একটি আইন ১৮৬৭ সালে প্রবর্ত্তিত হয়।

* এইরূপ একখানা Hallam's Middle Ages নূতন ছাপা প্রাচীন সংস্করণ কিনিয়া Herbert Spencer ঠকিয়াছিলেন। *Various Fragments, P. 58.*

সুলভ সংস্করণ বাহির হইত, এবং সে বইটীর সে দেশে অনেক কাটতি হইলেও, বিলাতী সংস্করণটা প্রায় একেবারেই বিক্রয় হইত না। বিলাতী লেখকের ভারি লোকসান হইত। পূর্ব্বে আমেরিকায় রস্কিন প্রভৃতি অনেক প্রথিতযশা লেখকের গ্রন্থাবলীর এইরূপ সুলভ সংস্করণ পাওয়া যাইত। এখন কিন্তু এরূপ গোলযোগ মিটাইবার জন্য অনেক বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে Convention of Berne করিয়া International copyright অর্থাৎ অন্তর্জ্জাতিক মুদ্রণস্বত্বেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এখন আর ফ্রান্স কিম্বা জর্ম্মনিতে কোন পুস্তক প্রকাশিত হইলে সে সে ইংলণ্ডে উহা কিম্বা উহার একটা অনুবাদ মুদ্রিত করিতে পারে না।

পাঠকেরা স্মরণ রাখিবেন যে মুদ্রণস্বত্ব একটি ব্যবস্থাকল্পিত স্বত্ব; ইহা রাজার আদেশে সৃষ্ট হইয়াছে এবং নানারূপ নৈসর্গিক স্বত্ব' হইতে বিভিন্ন পদার্থ। এই মনে করুন, আমার চিন্তা ও মনোভাব যে আমার সম্পত্তি, তাহাতে যে আমার স্বত্ব আছে, তাহা সকল বিচারালয়েই বোধ হয় স্বীকৃত হইবে। আমি ইচ্ছা করিলে সেগুলি প্রকাশ না করিতে পারি, আমি ইচ্ছা করিলে সেগুলি এরূপ সত্ত্বে প্রকাশ করিতে পারি যে অন্য কেহ প্রকাশ করিতে না পায়। অধ্যাপক কেয়ার্ড গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নীতিশাস্ত্র পড়াইতেন, নিজের ছাত্রদিগকে ঐ বিষয়ে উৎকৃষ্ট বক্তৃতা শুনাইতেন। একজন তাঁহার বিনা অনুমতিতে সেই সকল বক্তৃতার টিপ্পনী ও ভাবার্থ প্রকাশিত করে। মোকদ্দমা হইলে "হাউস অব্ লর্ড্স" বিচার করিলেন যে যখন অধ্যাপক মহাশয় জনসাধারণের সমক্ষে নিজের গবেষণা প্রচার করেন নাই, তখন কাহারও অধিকার নাই যে তাঁহার "ক্লাসে" পঠিত বক্তৃতা তাঁহার অনুমতি বিনা মুদ্রিত বা প্রকাশিত করে। অধ্যাপক কেয়ার্ডের এই স্বত্ব কিন্তু মুদ্রণস্বত্ব নহে, ইহা বরং গুপ্তস্বত্ব। এইরূপ আমি যদি কোন বন্ধুকে চিঠি লিখি ত তাঁহার কি অন্য কাহারও অধিকার নাই যে আমার সম্মতি বিনা সেই চিঠি প্রকাশ করেন। মুদ্রণস্বত্বের জন্য copy অর্থাৎ প্রতিলিপি বা পুস্তক চাই। সেই লিখিত বস্তুটি বার বার নকল বা মুদ্রিত করিবার অধিকারের নাম মুদ্রণস্বত্ব। আপনার মনের ভাব কাগজে লেখা চাই। লিখিলে রাজাতন্ত্র একটা নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত আপনার লেখা আর কাহাকেও ছাপিতে বা চুরি করিতে দিবে না।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুম্ভীর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যিনি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা কাশীশ্বর বিশ্বনাথ, তাঁহারই মঙ্গলময়ী মূর্ত্তিকে মানস-পুষ্প-বিল্বদলে পূজা করিয়া আমার নিজ জীবনকাহিনীর আরম্ভ করি। তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমার শব্দগুলি জয়যুক্ত হউক্।

আমার তখন বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর মাত্র। সংসারে বীতরাগ হইয়া, গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিয়া, জীবন্মুক্তির অমৃতফল আস্বাদন করিবার অহেতুকী বাসনায় গুরুদেবের আশ্রমে বাস করিতেছি। গীতা কণ্ঠস্থ করিয়াছি। শাঙ্কর ভাষ্য দীপ্ত অনুরাগে পাঠ করিতেছি।

অহো! সেই সুখের দিনগুলি! এখনও সেই ব্রহ্মচর্য্যের কথা মনে পড়িলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠি। সেই সুখময়ী স্মৃতির ধ্যানে এখনও এচিত্ত-মরুভূমিতে সুপ্ত আনন্দ-ফল্গু কলবাহিনী কল্লোলিনী হইয়া তর্ তর্ শব্দে প্রবাহিত হইতে থাকে।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

এই অতুলনীয় শ্লোকের ভাবাবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া কুশাসনে বসিয়া সেই একমাত্র শরণ্য, একমাত্র বরেণ্যের শরণাগত হইতাম। কি সুখেরই দিন গিয়াছে! সন্ধ্যাকালে আমাদের আশ্রমে কাঁসর, শঙ্খ বাজিয়া উঠিত। আর আমরা সকল শিষ্যেরা মিলিয়া মিশিয়া আশ্রমশোভী মন্দিরের শিবমূর্ত্তির সম্মুখে নাচিয়া নাচিয়া আরতি করিতাম। আর সেই মহিম্ন স্তোত্র পাঠ!

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একদিন রাজাঘাটে বসিয়া গঙ্গার শোভা দেখিতেছি ও মহর্ষিবাল্মীকিবিরচিত "মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধাশৃঙ্গার হারাবলি" আনন্দগদ্গদ-কণ্ঠে আবৃত্তি করিতেছি;—কি চমৎকার শব্দ-ঝঙ্কার! এমনটি বুঝি কোন ভাষায় কোন কবিতায় নাই!

"উত্তাল তমাল-শালসরল-ব্যালোল বল্লী-লতাচ্ছন্নং।
সূর্য্যাকরপ্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলম্॥
গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধকিন্নরবধূতুঙ্গস্তনাস্ফালিতং।
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গংজলং নির্ম্মলম্॥
গাঙ্গংবারি মনোহারি মুরারিচরণচ্যুতম্।
ত্রিপুরারিশিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্॥
পাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি দূরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদরজোবিহারি গাঙ্গংপুনাতু সততং
শুভকারিবারি॥"

এমন সময়ে আমার গুরুদেব—

যস্যাঙ্গংজননীগণৈ যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈ।
যস্মিন্ পাহদৃগণ্ডসন্নিপতিতে তৈঃ শ্বস্যতে শ্রীহরিঃ॥
স্বাঙ্কে ন্যস্য তদীদৃশংবপুরহো স্বীকিয়তে পৌরুষং।
ত্বং তাবৎ করুণাপরায়ণপরা মাতাসি ভাগীরথি॥"

দরাপগ্রথিত এই গঙ্গাষ্টক সুমধুর উচ্চকণ্ঠে গাহিতে গাহিতে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গুরুদেব সহাস্যে বলিলেন, "তোমার সন্ন্যাসজীবন সমাপ্ত হইয়াছে। তোমাকে গৃহাশ্রমে ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

আমি সবিস্ময়ে বলিলাম, "সে কি গুরুদেব? আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব? তাহাও কি সম্ভব? আমার জীবন্মুক্তি অতি নিকট"।

গুরুদেব সহাস্যে উত্তর করিলেন, "দিল্লি বহুৎ দূর;—'অনেকজন্মসংসিদ্ধে স্ততো যাতি পরাংগতিং।' বৎস, প্রারব্ধ বলবান্; ভবিতব্যতার কাছে কাহার দর্প খাটিতে পারে? স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নিয়তির অধীন।—তোমাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতেই হইবে;—তোমার শুভ-বিবাহ নিকটবর্ত্তী।"

আমি দুই কর্ণে দুই অঙ্গুলি দিয়া সবিস্ময়ে বলিলাম, "বি—বা—হ!"

"হাঁ বৎস, আশ্চর্য্য হইও না। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইবে, বল?"

এই বলিয়া গুরুদেব আমাকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বাক্‌শূন্য করিয়া হাসিতে হাসিতে সে স্থান হইতে দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি সেই প্রাতঃকালে স্নানার্থে গঙ্গাতীরে আসিয়াছিলাম। স্নানের পূর্ব্বে অন্যমনে গঙ্গার শোভা দেখিতেছিলাম ও গঙ্গার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলাম। গুরুদেবের কথা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। একি সংবাদ দিলে, গুরুদেব? সন্ন্যাসীর আবার বিবাহ!

আমি তৎক্ষণাৎ স্নান করিবার জন্য জলে নামিবার অভিপ্রায়ে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিলাম। কে যেন আমার চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য সবলে মুদ্রিত করিয়া দিল। সেই একটা মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখিলাম, আমি যেন কোন মনোহর সুন্দর হর্ম্ম্যের ভিতর আছি। একটা কৃত্রিম নির্ঝর অপূর্ব্ব ইন্দ্রধনুবর্ণ সৃজন করিয়া উর্দ্ধে ছুটিতেছে। চৌবাচ্চায় লাল নীল বিবিধ বর্ণের ক্ষুদ্র মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে। একরাশ সুন্দরী যুবতী কলহাস্যে হাসিতেছে। যুবতী দলের মনচোরা হাসিতে রঞ্জিত হইয়া কপোলমণ্ডলে অপূর্ব্ব ব্রীড়ার সৃষ্টি হইয়াছে। একটী সুন্দরী হাসিয়া আমার গলায় মালা দিল ও বলিল, "হে সন্ন্যাসি, তোমাতে আমাতে বিবাহ"।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সেই অপরূপ মুহূর্ত্তটী জলবুদ্বুদের মত মিলাইয়া গেল। আমি চক্ষু খুলিয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিলাম, "একি ছলনা গুরুদেব!—কেন এ মায়ার বিচিত্র চিত্র সৃষ্টি!" তীরে বসিয়া পড়িলাম। অঞ্জলিতে গঙ্গাজল লইয়া দুই চক্ষু ধৌত করিলাম। মনে মনে গুরুমন্ত্র জপ করিলাম। হরিহরের নামমালা জপ করিলাম। পশ্চাৎ হইতে কে একজন পরিচিত কণ্ঠে ডাকিল,—"নরেন, তুমি এখানে! এ কি? সন্ন্যাসী হ'লে কবে?"

আমি প্রশ্নকারীর দিকে তাকাইয়া দেখিলাম—আমারই গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গঙ্গাস্নানে আসিয়া-

চেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী ও তাঁহাদের একমাত্র কন্যা মোক্ষদা। আমি মোক্ষদার দিকে তাকাইয়া চিত্রার্পিত হইয়া পড়িলাম। কি আশ্চর্য্য!—আমি এইমাত্র চক্ষু বুজিয়া হর্ম্ম্যের ভিতর, কৃত্রিম ফোয়ারার পাশে যাহাকে দেখিয়াছিলাম, সে তো এই সুন্দরী যুবতী মোক্ষদা। মোক্ষদা আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিতেছে। তাহার অধর স্ফুরিত হইতেছে। সে যেন এখনও বলিতেছে,—"হে সন্ন্যাসি! তোমাতে আমাতে বিবাহ"।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমার মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। এ কি হাসি! এ কি রূপ! এ কি কমনীয় কান্তি! আমার চিত্তবিকার জন্মিল। হে ব্রাহ্মণকুমার, নরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, তোমার শিক্ষা কোথায়? হে সন্ন্যাসি, তোমার সংযম কোথায়? গুরুদেব! গুরুদেব! আমার এ দুর্দ্দশা কেন হইল? আমি উন্মত্তপ্রায় হইলাম। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আমার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল। আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

"বাবা নরেন্, ওকে চিনতে পাচ্চ না, ওযে আমাদের মোক্ষদা। ও যখন ছোট্টটী, ওকে তুমি সন্দেশ দিতে; আর ও খুসি হ'য়ে তোমাকে বলত, 'নরেন দা, তুমি খুব ভাল লোক, আমি তোমাকে বে কোরবো।' সে কথা নিয়ে এখনও আমরা কত আমোদ করি। কি কোরবো বাবা— আমাদেরও খুব ইচ্ছে ছিল, তোমার বাপ মায়েরও খুব ইচ্ছে ছিল যে তোমাতে আর মোক্ষদাতে বে হয়। আহা বেশ মানাতো! আমরাও সুখী হ'তাম। তা পোড়া অদেষ্টে না থাক্‌লে এমন সোন্দর—রূপে গুণে আলো করা জামাই কোথেকে পাব? রাশিতে গণেতে মিল্‌লো না। ভাল ভাল ভট্‌চায্‌রা বল্‌লে এ বিয়ে হ'লে বর কনে, কেউ সুখী হবে না।' কাজেই বিয়ে হোলো না। এমন পোড়া মেয়ের ভাগ্যি! এত জায়গায় সম্বন্ধ হোলো—কারুর সঙ্গে গণে মিল্‌লো না। আর এঁরও কেমন জিদ্—গণে না মিল্‌লে বিয়ে দেবেন না। সিষ্টিছাড়া হিঁদুয়ানি। কাজেই মেয়ে ডাগর হ'য়ে উঠ্‌লো। অনেক নাস্তানাবুদ হ'য়ে, অনেক খোঁজের পর, কাশীতে একটি পাত্তর জুটেছে—গণেতেও মিল্‌চে। কি করি বাবা? বরের বাপ মারা কোট্ কোরে বোস্‌লো—অত দূর দেশে গিয়ে বে দেব না। আর মেয়ে মস্ত হয়ে পোড়্‌লো। এই সেটের পোনেরোয় পড়েচে। কাজেই আমাদের কাশীতে আস্‌তে হোলো। ছেলেটি মন্দ নয়। মোক্ষদাকে ওরা পছন্দ কোরেচে। মোক্ষদাকে আশীর্ব্বাদ কোরতে ওরা শিগ্‌গির আস্‌বে। এই ফাল্গুন মাসেই বিয়ে হবে। কিন্তু একি বাপু? এই কি তোমার উচিত? বুড়ো বাপ্ মাকে কাঁদিয়ে সন্ন্যাসী কেন হোলে? ঘরে ফিরে যাও। ঘরে বোসে কি ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না?"

আমি কম্পিতকণ্ঠে অন্যমনে বলিলাম, "বিশ্বনাথের ইচ্ছে।" এই বলিয়া নদীতে নামিয়া গভীর জলে ব্যাকুল-ভাবে ঝাঁপ দিয়া সাঁতার দিতে লাগিলাম।

আমি তখন মাঝগঙ্গায়। দূর হইতে দেখিলাম, মুখুয্যে-দম্পতি ও তাঁহার কন্যা স্নানার্থে জলে নামিয়াছেন। মোক্ষদা সানন্দে নির্ভয়ে জলে ডুব্ দিতেছে। কন্যার পিতা মাতা সহাস্যে কন্যার জলক্রীড়া দেখিতেছেন!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"কুম্ভীর—কুম্ভীর—মেয়েটীকে কুম্ভীরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।" তীরে ও জলে স্নানার্থী ও স্নানকারীরা হাহাকার করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দুই জন লোক মড়া কান্না কান্দিয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ সকলেই নিস্তব্ধ হইল। ঘাটে যেন মধ্য রাত্রির নিশুতি আসিল। তাহার পর আবার গণ্ডগোল। "ভয় নেই—ভয় নেই—ঐ দেখ—ঐ লোকটি, তোমাদের মেয়েকে টেনে আনচে।" আমি মোক্ষদাকে মধ্যগঙ্গা হইতে টানিয়া তীরে আনিয়া তুলিলাম।

"জয় সাধু মহারাজ কি জয়! ধন্য হঁয় মহারাজ"। অনেকেই আমার পদধূলি গ্রহণ করিল। "সাধু কা প্রতাপ হয়। দাঁত নহি বয়ঠায়া—লড়্‌কীকা কপ্‌ড়া খিঁচা থা। বড়িয়ার ভাগ্ গয়া।"

মোক্ষদা ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিল। পিতা মাতা বাষ্পাকুললোচনে কন্যার কণ্ঠ ধরিয়া সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিলেন। মুখুয্যেগৃহিণী ভর্ত্তার দিকে তাকাইয়া অনু-যোগের স্বরে বলিলেন, "রেখে দেও তোমার রাশ আর গণ। নরেনই আমাদের জামাই হবে। বাবা নরেন্—

তুমি সন্ন্যাসীর বেশ ছেড়ে ঘরে চল—তুমিই আমার জামাই।"

আনন্দ মুখুয্যে মহাশয় আমাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বাবা নরেন, তুমি নিজ প্রাণকে তুচ্ছ কোরে আমার কন্যাকে রক্ষে ক'রেচ, এ ঋণ কখনই শোধ হবার নয়। বিশ্বনাথ তোমার কল্যাণ করুন।"

মোক্ষদার মাতা সরোষে বলিলেন, "রেখে দাও তোমার হিঁদুয়ানি—আমি যদি যথার্থ ব্রাহ্মণের কন্যা হই, এই নরেনই আমার জামাই হবে।"

মুখুয্যে মহাশয় ধীরে বলিলেন, "আমি বাক্যদান কোরেচি। তবে এখনও আশীর্ব্বাদ হয় নি। ওরা যদি না দেয়, তা হ'লে আমি গঙ্গাকে সাক্ষী রেখে বল্‌চি, নরেনের হস্তে কন্যা সম্প্রদান কোরবো।"

মুখুয্যেগৃহিণী সহাস্যে বলিলেন, "আর নরেনের বাপ্‌ মার তো সম্পূর্ণই ইচ্ছে ছিল। এখন আমরা যদি নরেনকে সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তা হোলে ওর বাপ মা ব'ত্তে যাবে, আর বল্‌বা মাত্তর আমাদের বেয়াই বেয়ান হবে। কেমন নরেন, তুমি আমাদের জামাই হ'তে রাজি আছ?"

আমি সহাস্যে নিরুত্তর। তীরে দুই তিন জন বাঙ্গালী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল। তাহারা কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "মৌনং সম্মতিলক্ষণং।—বিশ্বেশ্বর! বিশ্বেশ্বর! মধুসূদন! মধুসূদন! এ কলির সাধু কাশীধামে কেন?" আমি সভয়ে ও লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া নগরের দিকে ছুটিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কাশীবাসী পাত্রের পিতা তো বিবাহ দিতে অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। সে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভব কোথায়? আমার তিন রাত্রি চক্ষে নিদ্রা আসিল না। কাল তাহারা মোক্ষদাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবে। বিশ্বনাথ হে রক্ষা কর—দেব, তোমারই ভরসা।

রাত্রির প্রথম যামে, যে বাড়ীতে মুখুয্যেদম্পতি বাস করিতেছিলেন তাহারই অন্তর্গত উদ্যানে আমি মোক্ষদার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমি অতি মৃদুস্বরে বলিলাম, "মোক্ষদা তুমি আমাকে বিয়ে কোরবে?" মোক্ষদা নিরুত্তর। আমি আবার অতি মৃদুস্বরে বলিলাম "মোক্ষদা, বিয়ে হলে আমরা দুই জনেই সুখী হব।" মোক্ষদা নিরুত্তর। আমি মোক্ষদার হাত ধরিয়া বলিলাম, "প্রিয়ে, তোমাকে আমি বড়ই ভালবাসি।"

সেই সময়ে জীর্ণ পত্ররাশির উপর অতি মৃদু অস্ফুট পদধ্বনি হইল। আমি অতি মৃদুস্বরে বলিলাম, "ও কিছুই নয়—বোধ করি কাঠবিড়ালিগুলো লাফালাফি করচে।" মোক্ষদা হাত ছাড়াইয়া অন্তঃপুরের দিকে পলাইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কাশীর পাত্রের সহিত মোক্ষদার বিবাহ হইল না। মেয়ে ভারী ডাগর! পিতা মাতার একান্ত ইচ্ছা থাকিতেও পাত্র বাঁকিয়া বসিল। এই উপলক্ষে ঝগড়া করিয়া পাত্র রাওলপিণ্ডিতে পলাইয়া গেল।

আমরা দেশে ফিরিয়া গেলাম। বলা বাহুল্য আমাকে সংসারাশ্রমে পুনরায় পাইয়া, বাবার আর মার প্রাণে আহ্লাদ ধরে না। বাবা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌। মোক্ষদার সহিত আমার বিবাহ মহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। আমার সহপাঠীরা সহাস্যে বলিল "হে সন্ন্যাসি, মোক্ষদার সহিত তোমার বিবাহ হইল। সে শীঘ্রই অতি লোভনীয় মোক্ষরূপ অমৃতফল তোমার হস্তে অর্পণ করিবে। যোগবাশিষ্ঠের মোক্ষপর্ব্বে Honeymoon অধ্যায়টি মন দিয়া পড়িও।" আমি সানন্দে বলিলাম, "নিশ্চয়"!

নবম পরিচ্ছেদ।

আমাদের একটী সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট পুত্র হইল। আমরা আদর করিয়া তাহাকে "ভোদা" বলিয়া ডাকিতাম। দুইটী বছর সে আমার সঙ্গের সাথী ছিল। আমিও তাহার সঙ্গের সাথী ছিলাম। আমি কাছে না থাকিলে তাহার কিছুই মনঃপূত হইত না। সে কাছে না থাকিলে, লবণ না পড়িলে ব্যঞ্জন যেমন বিস্বাদ হয়, তেমনি সুখ, সাধ, বিশ্বের সকল স্পৃহনীয় সামগ্রী 'আলুনি' বোধ হইত। সে হরবোলার মত, কপোতের বকম্‌ বকম্‌, কোকিলের কুহু কুহু ধ্বনি, কাকাতুয়ার রঙ্গপূর্ণ গালি—সকল প্রকারেরই বুলি

বলিত। আমি মোহিত হইয়া, তন্ময় হইয়া শুনিতাম। আমি তাহার কাছে ঘুমপাড়ানিয়া গান গাহিতাম—

(প্রথম গান)

এ গালেতে চুমো, ও গালেতে চুমো ;
ঘুমা যাদু ঘুমো, ঘুমা মাণিক ঘুমো।
অন্ধকার-দানার ঘাড়ে বাদুড়েরা চ'ড়ে, নাড়্চে নিজের ডানা।
হেথা নাইক তাদের আনাগোনা, আনাগোনা, আনাগোনা।
ঘুমা আমার চাঁদের কোণা,
ঘুমা আমার মাণিক ধোনা।
এ গালেতে চুমো, ও গালেতে চুমো ;
ঘুমা যাদু ঘুমো, ঘুমা মাণিক ঘুমো।
পাঁচঠেঙ্গো, দশঠেঙ্গো মাকোড়্শা—
হাড়গোড়্ ভাঙ্গা দ কোরে
ঝাঁটা মেরে দূর কোরে,
ঝি তারে তাড়িয়ে দিয়েছে।
সে গো ছাদে গিয়ে, ছাদে গিয়ে, ছাদে গিয়ে গো,
বুন্চে নতুন বাসা ;
আর পাড়্চে ডিম, ডুমো ডুমো ডুমো ডুমো ডুমো ডুমো।
ঘুমা যাদু ঘুমো, ঘুমা মাণিক ঘুমো।

(দ্বিতীয় গান)

ঘুম পাড়ানিয়া মাসি পিসি
এস গো !
চুপি চুপি ধীরে এসে,
যাদুর শিয়রে ঘেঁসে,
বোস গো !
ভোম্রার ডাকের মতন,
তোমার ও মোহনিয়া সুর !
ঝিঁঝিঁদের ডাকের মতন,
বাজে তব চরণে নুপুর !
কপোতের বকমের মত,
রেশমের বুননের মত,
গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ করি,
ঘুমের মোহন গণ্ডী বিরচন করি,
থাক বসি, সারা নিশি,
ঘুম পাড়ানিয়া মাসি, পিসি !

এ গান দুটী ক্ষুদ্র শিশু মোহিত হইয়া, তন্ময় হইয়া, শুনিত। শনৈশ্চরের মনে হিংসার উদয় হইল। শনৈশ্চর-পত্নী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। ভোঁদার মৃত্যু হইল। আমি লক্ষীছাড়া হইলাম, আমি জ্ঞান বুদ্ধি হারাইলাম। দুই বৎসর, উন্মত্ত হইয়া, বাক্‌শূন্য হইয়া, অন্ধ কাল-দৈত্যের তিমিরপূর্ণ কারাগৃহে পড়িয়া রহিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

ঘোর কষ্ট ! ঘোর কষ্ট ! দারুণ যন্ত্রণা ! দারুণ যন্ত্রণা ! বিস্তর পাপ না করিলে লোকে পাগল হয় না। আমি দুই বৎসর হাড়ভাজা ভোগ ভুগিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। তাহার পর দয়াময়—যিনি নরকের কীটকেও ঘৃণা করেন না—সদয় হইলেন। ঘোর নিবিড় তিমিরে প্রদীপের আলোক আসিলে, অন্ধকার যেমন ধীরে ধীরে সরিয়া যায়, উন্মত্ততার অন্ধকারে জ্ঞানের দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিল, আর চিত্তের বৈকল্য ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। বলা বাহুল্য, আমার গৃহদেবতা মোক্ষদা এই দুইটী বৎসর প্রাণপণে আমার সেবা করিয়াছিল।

আমি সন্ন্যাসীর ব্রত ভঙ্গ করিয়া গৃহস্থ সংসারী হইয়াছি, বিধাতা সেই পাপেরই কি দণ্ড বিধান করিলেন ? সে তো লঘু পাপ। আমি গুরুতর, গুরুতম পাপের পাপী। আমি মহাপাপী—মহাপাপী। সে পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে ?

এক দিন সন্ধ্যার পর ছাদে বসিয়া আছি, মোক্ষদা আমার মাথায় বাতাস করিতেছে। বিশ্ববিপ্লাবিনী জ্যোৎস্নায় ছাদ ভরিয়া গিয়াছে। আমি চন্দ্রমণ্ডলের দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম ; তাহার পর, আমার মনে কিছু শান্তি আসিল। আমি মোক্ষদার দিকে সাগ্রহে তাকাইয়া বলিলাম, "প্রিয়তমে, তুমি কি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কোরবে ?" মোক্ষদা সহাস্যে বলিল, "নাথ, দাসীর কাছে কখনও কি স্বামী অপরাধী হয় ?" আমি বলিলাম, "তোমাকে আলিঙ্গন কোরবার জন্যে আমিই কুমীরের মত সেই কাশীর রাজাঘাটে তোমার পা ধ'রে টেনেছিলাম। কাশীর পাত্র-টীকে আমিই স্বমুখে ব'লেছিলাম, 'মোক্ষদা আমার সহিত

রবিবর্ম্মার "বিরাটরাজসভায় পাঞ্চালী"

Indian Press, Allahabad

নষ্টা।' সেই কাশীর গৃহের বাগানে সে দিন পাতার খস্‌খসানি হয় নি, কাটবিড়ালিও ছিল না;—কাশীর পাত্রটীর মন সন্দেহে পূর্ণ করবার জন্য আমিই তাকে লুকিয়ে তোমার আমার অবৈধ' সম্বন্ধ দেখিয়ে তাকে প্রতারিত কোরেছিলাম। আমি মানুষ নই—আমি অসদাচরণে কুমীর।" মোক্ষদা আমাকে নিজ বাহুযুগে আবদ্ধ করিয়া বলিল, "তুমি কুমীর নও—তুমি খেজুর।" আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বহুক্ষণ ইষ্টদেবতার আরাধনা করিলাম। প্রাণে অপূর্ব্ব শান্তি আসিল।

হীবরের রোজনামচা।

(২)

"[মার্কণ্ডেয় পুরাণের অংশবিশেষের] অনুবাদক একজন মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণ। করমণ্ডল উপকূলবাসী দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট লোকদের জন্য চাঁদা আদায় করিবার নিমিত্ত ইনি এখন কলিকাতায় রহিয়াছেন। সে দিন তিনি এই উদ্দেশ্যে আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি ধনী ভারতবাসীদের এক সভা আহ্বান করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঘটনা এরূপ অসাধারণ যে, যে যে ইউরোপীয় ব্যক্তি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কোন ভারতবাসীই বেশী চাঁদা দেয় নাই; কিন্তু তাহাদের মধ্যে এই প্রকার বদান্যতার ভাবের উদ্রেক একটা নূতন জিনিষ এরূপ কাজে খৃষ্টানেরা আনন্দের সহিত ভারতবাসীদের সহযোগিতা করিতে এবং এমন কি নিজেদের টাকা তাহাদের হাতে বিতরণের জন্য ন্যস্ত করিতেও প্রস্তুত; যদি কেবল ইহা দেখাইবার জন্যও হয়, তাহা হইলেও আমি আপনাকে চাঁদা দিতে বাধ্য মনে করিলাম। কিন্তু চাঁদাদাতাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বদান্য একজনের (ব্যোমনন্দন (?) ঠাকুরের) সহিত কথা কহিয়া দেখিলাম যে আমি তাঁহাদিগকে যতটা বিশ্বাস করি, তাঁহারা পরস্পরকে ততটা বিশ্বাস করেন না। তিনি বলিলেন, "রামস্বামী পণ্ডিত খুব ভাল লোক হইতে পারেন, কিন্তু, চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত সমস্ত টাকা যাহাতে পামার কোম্পানীর হাউসে আমানত থাকে এবং মান্দ্রাজে তত্রত্য ইংরাজসমিতি দ্বারা বিতরিত হয়, আমি সভায় তদ্রূপ বন্দোবস্ত করাইয়া লইয়াছি। আমি মান্দ্রাজী পণ্ডিতদিগকে জানি না; কিন্তু ইহা জানি যে ইউরোপীয় ভদ্রলোকদের সুখ্যাতিনাশের ভয় আছে।"

হীবরের রোজনামচায় চড়কপূজার একটি বর্ণনা আছে। পাদটীকায় রোজনামচার সম্পাদিকা হীবরপত্নী লিখিয়াছেন যে তাঁহাদের মসালচী জিহ্বাতে একটা ছোট বর্শা বিদ্ধ করিয়া অন্যান্য ভৃত্যদের নিকট ভিক্ষা মাগিয়া বেড়াইতেছিল। "এই লোকটাকে আফিং প্রয়োগ দ্বারা জড়ভাবাপন্ন করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল। চড়কের সময় শরীরের যে অঙ্গ বর্শাবিদ্ধ করা হইত, তাহার উপর অনেক পূর্ব্ব হইতে আফিং মালিস করা হইত। এই প্রকারে উক্ত অঙ্গ অসাড় হইয়া যাইত।"

"২১শে এপ্রিল। আজ আমার প্রিয় হ্যারিয়েটের জলাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম। * * * তার পর আমাদের বাড়ীতে একটা জাঁকাল মধ্যাহ্নভোজ ও সান্ধ্য সম্মিলন হইয়াছিল। তাহাতে লর্ড ও লেডী আমহার্ষ্ট এবং কলিকাতাস্থ আমাদের সমস্ত পরিচিত [ইউরোপীয়] লোক উপস্থিত ছিলেন। সায়ংসম্মিলনে আমি কয়েকজন ধনী নেটিভ্‌কেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। তাঁহারা এইরূপ খাতিরে বড় খুসি হইয়াছিলেন। কারণ, ইহার পূর্ব্বে কোন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় তাঁহাদের কাহাকেও এরূপ সম্মান দেখান নাই। 'আপনাদের সম্মিলনগুলির চিত্তাকর্ষকতা মহিলাদের উপস্থিতিতে কত বাড়িয়া যায়,' হরিমোহন ঠাকুর এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করায়, আমি এই কথা তাঁহার মনে পড়াইয়া দিলাম, যে, সমাজে স্ত্রীলোকদের মিলামিশা একটি প্রাচীন হিন্দুপ্রথা; উহা কেবল মুসলমানবিজয়বশতঃ রহিত হইয়া যায়। তিনি হাসিয়া আমার কথায় সায় দিলেন, কিন্তু বলিলেন, 'এখন আর পূর্ব্বপ্রথা অবলম্বন করিবার সময় নাই।' রাধাকান্ত দেব আমাদের কথা শুনিতে পাইয়া অধিকতর গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'ইহা অতিশয় সত্য যে আমরা মুসলমানদের শাসনকাল পর্য্যন্ত আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতাম না। কিন্তু আমরা তাহাদিগকে ইউরোপীয়দিগের মত স্বাধীনতা দিবার পূর্ব্বে তাহাদের অধিকতর শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক।' আমি এই বাবুগণকে প্রধান বিচারপতির সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়ায় তাঁহারা অতিশয় সুখী হইলেন। কিন্তু তাঁহারা

বিদায় লইবার পূর্ব্বে আমার স্ত্রী দেশী প্রথা অনুসারে তাঁহাদিগকে পান, গোলাপজল ও গোলাপী আতর দেওয়ায়, বোধ হয়, তাঁহারা অধিকতর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন"।

হীবর সাহেব চুঁচুড়ার নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে দেখিতে পান যে একটা ফাঁসীকাঠ হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ দুজন মৃত মানুষ

বিশপ হীবর।

ঝুলিতেছে। তাঁহার সেরাংকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে দুই বৎসর পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলে ডাকাইতি ও নরহত্যা করায় লোক দুটার ফাঁসী হইয়াছিল। ইহা হইতে এই তথ্যটি জানা যাইতেছে যে তৎকালে এইরূপ অপরাধীদিগের প্রাণদণ্ড হইবার পরও দুর্ব্বৃত্ত লোকদের মনে ভয় সঞ্চার নিমিত্ত তাহাদের মৃতদেহ বহুকাল ঝুলাইয়া রাখা হইত। সুখের বিষয় এখন এই বীভৎস বিধি আর প্রচলিত নাই।

হীবর প্রসঙ্গক্রমে অন্যত্র লিখিয়াছেন যে তাঁহার হিন্দু ভৃত্যগণের একবেলা আহার করিতে জনপ্রতি এক পয়সা খরচ হইত। তাহারা ভাত, তরকারী ও আনারস খাইত। এক পয়সায় পূর্ণ দুই অঞ্জলি ছোট মাছ পাওয়া যাইত।

হীবর কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইতেছিলেন। রাণাঘাট পার হইয়া তিনি শিবনিবাসী বা শিবনিবাস নামক স্থানে উপস্থিত হন। সেখানে ভগ্নপ্রায় এক প্রাসাদে তিনি নবাব

সিরাজুদ্দৌলার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৌত্র রাজা "ওমিচাঁদ" এবং ওমিচাঁদের দুই পুত্রের সাক্ষাৎ পান। সেকালের প্রথামত তাঁহাদের কথাবার্ত্তা পারসী ভাষাতেই হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র কুমারদ্বয় কৈশোর অতিক্রম করে নাই। কিন্তু তাহারাও উর্দ্দু ও পারসীতে দ্রুত কথা কহিতে পারিয়াছিল। হীবর লিখিয়াছেন, যে তাহারা উর্দ্দু অপেক্ষা পারসীতে কথা কহিতেই অধিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছিল। হীবর যখন রাজা ওমিচাঁদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন রাজা কেবল ধুতি পরিয়া খোলা গায়ে বসিয়াছিলেন। তাঁহার ললাট চন্দন ও স্বর্ণপত্রভূষিত ছিল। তাঁহার পুত্রদ্বয়ও কেবল ধুতি পরিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহারা হীবরের নৌকায় তাঁহার সহিত প্রতিসাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল, তখন সূক্ষ্ম মস্‌লিনের পোষাক এবং কিংখাপের পাগড়ি পরিয়া গিয়াছিল।

কদমপুর নামক একটা যায়গায় জেলেরা তাঁহার নৌকায় একটি রুই মাছ লইয়া আসিয়াছিল। মাছটি ওজনে ১০।১২ সের ছিল। জেলেরা অনেক দর দস্তর করিয়া মাছটি বার আনায় বিক্রয় করিয়া গিয়াছিল।

টিটিবানিয়া (Titybania) নামক গ্রামের নিকটে বসিয়া হীবর লিখিয়াছেন —"এ অঞ্চলের পল্লীবাসীরা বর্দ্ধিষ্ণু এবং নিজ নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট ; যদিও, অবশ্য, তাহাদের অতিশয় সমৃদ্ধিশালী অবস্থা ইংলণ্ডে ঘোরতর দারিদ্র্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।" যাঁহারা মনে করেন যে বৃটিশ শাসনে ভারতবাসী প্রজাপুঞ্জের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইয়াছে, তাঁহারা বিষপ হীবরের এই নিরপেক্ষ মন্তব্যটি মনে রাখিবেন। এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার পর বিষপ হীবর লিখিতেছেন—"There are surprisingly few beggars in Bengal" আমাদের বোধ হয় ইহা হইতে কেবল এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা অতি অল্পেই সন্তুষ্ট।

কুমারখালির নিকটে হীবর নয় দশটি সুন্দর বৃহৎ পোষা উদ্বিড়াল লম্বা দড়ি দিয়া নদীতীরে প্রোথিত বাঁশের খোঁটায় বদ্ধ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাহাদের কয়েকটা জলে সাঁতার দিয়া বেড়াইতেছিল, কয়েকটা অর্দ্ধেক জলে ও অর্দ্ধেক ডাঙ্গায় শুইয়াছিল, কয়েকটা বা রোদ পোহাইতেছিল। তিনি অবগত হন যে কুমারখালি অঞ্চলের অধিকাংশ ধীবরই উদ্বিড়াল পোষে। তাহারা মাছ ধরায় জেলেদের বিশেষ সাহায্য করে ;—কখনও মাছের ঝাঁক তাড়াইয়া জালের মধ্যে আনিয়া ফেলে, কখন বা বড় বড় মাছ মুখে করিয়া আনিয়া দেয়। "আমার ধারণা যে যে সকল জন্তুকে আমরা যাতনা দিয়া মারিয়া ফেলি, যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার করিলে তাহারা আমাদের অনেক সুখ ও সুবিধার কারণ হইতে পারে। এই ক্ষেত্রে হিন্দুরা উদ্বিড়ালশিকারী ইংরাজ ভদ্রলোকগণ অপেক্ষা অধিকতর সুরুচি ও সদ্বিবেচনার পরিচয় দিয়াছে"।

হীবরের সময় পূর্ব্ববঙ্গে পান খুচরা দরে পয়সায় ১৫টা বিক্রী হইত। চাউলের মূল্য সের প্রতি দেড় পয়সা আন্দাজ ছিল।

তাঁহার সময় একবার মগদিগের ঢাকা আক্রমণ করিবার ভীতিজনক গুজব রটিয়াছিল।

বিষপ হীবরের রোজ্‌নাম্‌চা অতিশয় চিত্তাকর্ষক এবং নানা জ্ঞাতব্য কথায় পূর্ণ। আমরা উহা হইতে সংক্ষেপে দু একটি বিষয় সঙ্কলন করিলাম মাত্র। আমাদের প্রবন্ধ হইতে পাঠকেরা এই পুস্তকখানির কতটুকু আভাস পাইবেন বলিতে পারি না। গ্রন্থখানি আটাইশ অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে আমরা কেবল প্রথম সাত অধ্যায় হইতে কয়েকটী বিষয় সংগ্রহ করিয়াছি। ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া লেখক ফরিদপুর, ভগবানগোলা, গৌড়, রাজমহল, বগলিপুর, সীতাকুণ্ড, মুঙ্গের, পাটনা, বাঁকিপুর, দানাপুর, ছাপরা, বক্সার, গাজিপুর, সৈয়দপুর, বনারস, চুনার, এলাহাবাদ, ফতেপুর, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, শাহজাহানপুর, ফতেগঞ্জ, বেরেলী, ভীমতাল, আলমোরা, মোরাদাবাদ মীরাট, দিল্লী, বৃন্দাবন, মথুরা, আগ্রা, সেকেন্দ্রা, ভরতপুর, জয়পুর, আজমীর, চিতোর, নীমচ, প্রতাপগড়, বড়োদা, ব্রোচ, সুরাট, সালসেট, বেসীন, বোম্বাই, পুনা, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন।

গিলগিট ও গিলগিটী।

"প্রবাসী" প্রবাসী-বাঙ্গালীর পত্র। সুতরাং "প্রবাসী"তে প্রবাসী-বাঙ্গালীর লিখিতে ইচ্ছা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রবাসী বাঙ্গালীর বাঙ্গালা জ্ঞানের

যে কতদূর দৌড়, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। "কিন্তু" বলিবার সময় অনেকের মুখ হইতে "লেকিন" কিম্বা "মগর" বাহির হইয়া পড়ে। ইহাতে প্রবাসী-বাঙ্গালীর কোন দোষ আছে কি না, তাহা অবশ্যই তাঁহারা বলিতে পারেন। আমিও 'লেকিন' বা 'মগরের' ভিতরের এক জন। সুতরাং এ প্রবন্ধে যাঁহারা সাহিত্য-সুধা পান করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা বিফলমনোরথ হইবেন। তবে, যাঁহারা মধ্য এশিয়ার ক্রোড়স্থিত হিমালয় ও হিন্দুকুশ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনসমাজে এক প্রকার অজ্ঞাত ও অগম্য একটি ক্ষুদ্র উপত্যকার পুরাতন ইতিবৃত্ত পাঠ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের অভিলাষ কতক পরিমাণে পূর্ণ হইলেও হইতে পারে।

মূল বিষয়ে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমার বন্ধুপ্রবর শ্রীযুক্ত মুনসী গোলাম মহম্মদ সাহেব গিলগিটের যে সকল পুরাতন ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যবহার করিতে আমাকে সম্পূর্ণ অনুমতি দেওয়ায় এই প্রবন্ধ লিখিতে আমার শ্রমের অনেক লাঘব হইয়াছে।

(১)
ভৌগোলিক ও সাধারণ বিবরণ।

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যে গিলগিটের অস্তিত্ব সাধারণ মনুষ্য-সমাজে অজ্ঞাত ছিল, সম্প্রতি হুনজা-নাগার, চিলাস এবং চিত্রাল, এই তিনটী প্রধান অভিযান হওয়ায় এবং তজ্জন্য সংবাদ-পত্রাদি মহলে বিশেষ হুলুস্থূল পড়ায়, তাহার অস্তিত্ব অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন। তথাপি আমার বিশ্বাস, আমার স্বদেশবাসীদের ভিতর এখনও অনেক লোক আছেন, যাঁহারা গিলগিটের নাম শুনিলে ভূচিত্রের সাহায্য লইতে ইচ্ছা করিবেন। সেই জন্য সংক্ষেপে নিম্নে কিছু ভৌগোলিক ও সাধারণ বিবরণ দিতেছি।

গিলগিট* কাশ্মীরের মহারাজার রাজ্যান্তর্ভুক্ত। এই উপত্যকা কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের উত্তর-পশ্চিম দিকে, ২২৮ মাইল দূরে অবস্থিত, এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৮০০ ফুট উচ্চ। এই ২২৮ মাইল ১৬টি পড়াও বা stage এ বিভক্ত। ইহার উত্তরে, হুনজা এবং নাগার নামক দুইটী ক্ষুদ্র করদ রাজ্য, পশ্চিমে, পনিয়াল এবং ইয়াসিন; দক্ষিণে, চিলাস ও কাশ্মীর এবং পূর্ব্বে,স্কর্দ্দু। গিলগিট জেলা, বজিল গিরিবর্ত্ম (Burzil Pass) হইতে আরম্ভ হইয়া, এস্তোর (Astor), সিন্ধু এবং গিলগিট নামক তিনটী নদীর উপরিস্থিত স্থান লইয়া শেরোট নামক গ্রামে শেষ হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও অনেক গুলি নিকটবর্ত্তী নালা এবং উপত্যকা আছে, যথা কমরি, পড়িসিং, সাই, বাগরোট, নোমল ইত্যাদি, যাহা গিলগিটের অন্তর্গত।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের মহারাজার ফৌজ ইয়াসিনের মেহ্‌তর* গৌহার আমানের নিকট হইতে গিলগিট প্রথম দখল করে। সেকন্দর খাঁ ও তাহার ভ্রাতা করিম খাঁরই ন্যায়ানুসারে গিলগিটের শাসনকর্ত্তা হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু গৌহার আমান তাহাদিগকে কোন প্রকারে প্রবঞ্চনা করিয়া গিলগিট দখল করিয়া বসে। গৌহার আমান দ্বারা প্রতারিত হইয়া করিম খাঁ কাশ্মীরের মহারাজার সাহায্য-প্রার্থী হইয়া কাশ্মীরে গমন করেন। মহারাজা, জেনেরাল সৈয়দ নাথে শাহকে বহুসংখ্যক সৈন্যের সহিত গিলগিটে প্রেরণ করেন। যখন ইহা প্রচার হইল যে কাশ্মীররাজ গিলগিট দখল করিবার জন্য অসংখ্য সৈন্য পাঠাইয়াছেন, তখন গৌহার আমান গিলগিট ছাড়িয়া ইয়াসিনে পলায়ন করিল। সুতরাং মহারাজার সৈন্যগণকে কোন প্রকার বাধা পাইতে হইল না। তাহারা এক বিন্দুও রক্তপাত না করিয়া গিলগিট দখল করিয়া বসিল।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে গিলগিটে ব্রিটিশ এজেন্সি স্থাপিত হয়। ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ পলিটিক্যাল এজেণ্ট (যিনি কাশ্মীরের রেসিডেণ্টের অধস্তন কর্ম্মচারী) এবং কাশ্মীরের মহারাজার পক্ষ হইতে উজীর-ই-ওজারৎ (Wazir-i-wazarat) নামক ভারতবর্ষের মাজিষ্ট্রেট্ কলেক্টর এবং সেশন জজের সমান ক্ষমতাপ্রাপ্ত জনৈক কর্ম্মচারী গিলগিটে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই জেলার উপর প্রভুত্ব ছাড়া এই কর্ম্মচারিদ্বয়ের, পার্শ্ববর্ত্তী হুনজা, নাগার, পনিয়াল, ইয়াসিন, ইস্‌কুমান এবং চিলাস†

* এ প্রদেশের কথিত ভাষায় গিলগিটকে "গিলিট" বলিয়া থাকে।

* ইয়াসিন এবং চিত্রালের শাসনকর্ত্তারা মেহ্‌তর (Mehtar) নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

† চিলাস প্রকৃত প্রস্তাবে একটি রাজ্য নহে। এখানে কোন রাজা নাই। এখানে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত।

প্রভৃতি কাশ্মীরের মিত্ররাজ্যের সহিত রাজনৈতিক সম্বন্ধ আছে।

কাশ্মীরের মহারাজার কয়েকটি পল্টন গিলগিট এজেন্সিতে থাকে। এখানে খাদ্যসামগ্রী অপ্রচুর বলিয়া অধিকাংশ দ্রব্য গবর্ণমেণ্টের কমিসরিয়েট্‌ বিভাগের মারফৎ কাশ্মীর ও ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া থাকে।

শ্রীনগর হইতে গিলগিট পর্য্যন্ত একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা আছে। রাস্তাটি হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া কৃষ্ণগঙ্গা প্রভৃতি নদীর পার্শ্ব দিয়া এবং গুরেজ্‌ উপত্যকার উপর দিয়া দুই শতাধিক মাইল অতিক্রম করিয়া গিলগিটে পৌঁছিয়াছে। কোথাও বহু সহস্র ফুট উর্দ্ধে পর্ব্বতের চূড়ার উপর চড়িতে হয়, আবার তথা হইতে ক্রমে ক্রমে নামিয়া নদী বা নালার তীরে পৌঁছিতে হয়। কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া কএকটা 'পড়াও' বা stage বেশ মনোরম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণী যেন আকাশ ভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং নানারূপ স্বভাবজাত বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, প্রকৃতির শোভা বৃদ্ধি এবং জগদীশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। আবার রাস্তার নিম্নেই খর-প্রবাহিতা পার্ব্বতীয়া ক্ষুদ্র নদী গোঁ গোঁ করিয়া গভীর নাদে গর্ভনিহিত বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের সহিত ঘাত প্রতিঘাতে চঞ্চল তরঙ্গে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। গিলগিটের নিম্নবর্ত্তী কএকটি 'পড়াও'এর দৃশ্য তেমন ভাল নহে। এখানকার পাহাড়ের উপর কোন প্রকার বৃক্ষাদি এমন কি তৃণ পর্য্যন্ত জন্মে না। কোন কোন স্থান মরুভূমির ন্যায় ধূ ধূ করিতেছে। রাস্তার মধ্যে দুইটি সু-উচ্চ পাস্‌ বা গিরিসঙ্কট আছে,—যথা ত্রাগ্‌বাল এবং বরজ্বিল। ত্রাগ্‌বাল সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১১৯০০ ফুট উচ্চ এবং বরজ্বিল ১৩৬০০ ফুট উচ্চ।

কাশ্মীর হইতে গিলগিটে আসিতে হইলে এই রাস্তায় অশ্বপৃষ্ঠে আসিতে হয়। যাঁহারা অশ্বারোহণে অনভ্যস্ত, তাঁহাদিগকে 'পড়াও, পড়াও' (stage by stage) আসিতে হয় এবং শ্রীনগর হইতে ১৪।১৫ দিন সময় লাগে। অশ্বারোহণে অভ্যস্ত হইলে ৫ হইতে ১০ দিনের মধ্যে পৌঁছান যায়। গিলগিটের রাস্তা সর্ব্বসাধারণের জন্য খোলা নহে। রাস্তাটী বৎসরের মধ্যে ৫ মাস খোলা থাকে। সেই সময়ে লোক জন যাতায়াত করিতে পারে। বাকী ৭ মাস ত্রাগবাল এবং বর্জিল পাস্‌দ্বয়ের উপর অতিরিক্ত বরফ পড়ায় রাস্তা বন্ধ হইয়া যায়। সে সময়ে যাতায়াত করা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল ও কষ্টকর। ডাক এবং টেলিগ্রাফের কার্য্য কোন প্রকারে চলিয়া থাকে।

গিলগিট ও গিলগিট এজেন্সির সমস্ত লোকই মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী। প্রায় তিন শতাব্দী পূর্ব্বে ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল এবং তৎপূর্ব্বে অবশ্যই আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ছিল। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে শের শাহ প্রভৃতি স্কর্দু্র রাজারা গিলগিট বিজয় করেন, ও গিলগিটীদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। গিলগিটীরা যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল তাহার প্রমাণস্বরূপ এখনও এখানে কএক স্থানে বুদ্ধদেবের প্রস্তরমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। তদ্ভিন্ন ইহাদের বর্ত্তমান কয়েকটি আচার ব্যবহারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ইহারা আর্য্যবংশোদ্ভূত।

গিলগিটীরা সাধারণতঃ "ভুট্টা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহারা প্রায় সকলেই কৃষক, শ্রমজীবী ও দরিদ্র। অনেকেই ২।১ বিঘা জমির চাষ করিয়া আপনার এবং পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা বড়ই কর্ম্মিষ্ঠা। কৃষিকার্য্যের অধিকাংশই স্ত্রীলোকের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। এখানে বৃষ্টি অতি অল্প হয়। নালা বা ঝরণা হইতে পয়নালী কাটিয়া জল আনিয়া সেই জলে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে; পানীয় জলও এই পয়নালী হইতে লইতে হয়। বৎসরের মধ্যে ছয় মাস কাল এখানে দারুণ শীত পড়ে। উক্ত সময়ে কৃষিকার্য্য বন্ধ থাকে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি হইতে ১৫ই মে পর্য্যন্ত গিলগিটে বসন্তকাল। এদেশে বসন্ত ঋতু অতীব মনোরম। ৫।৬ মাস দারুণ শীতের পর এই নাতিশীত নাতিগ্রীষ্ম সময়টী যেন মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করে। আবার, বৃক্ষাদিতে নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া সমস্ত উপত্যকাটিকে যেন স্বর্গীয় দৃশ্যে পরিণত করে। তুৎ এবং আঙ্গুর ছাড়া, বাদাম, খোবানি ইত্যাদি আর সমুদয় ফলবৃক্ষেই অতি মনোহর বিবিধ রংএর ফুল ফুটিয়া থাকে। অনেকেই বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন যে কাশ্মীরে গোলাপ বহুভাবে জন্মিয়া থাকে। গিলগিটেও তাই। যে দিকে দেখা যায়, সেই দিকেই গোলাপ ফুল বা অন্য কোন লোচনানন্দদায়ক মনোহর ফুল। গিলগিটের

অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও বসন্ত কালটি উপভোগ করিবার আশায় এখানে থাকিতে ইচ্ছা করে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যাঁহারা চিরকাল বাস করেন, তাঁহারা অনেক সময় নিত্যসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া প্রকৃতিদেবীর অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য অনুভব করেন না। গিলগিটের মত স্থানে থাকিলে এই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইবার সুযোগ ঘটে। গিলগিটীরা অন্যান্য জাতির ন্যায় অতিশয় ফুল ভালবাসে।

গিলগিটীরা বড়ই অশ্বপ্রিয়। যতই দরিদ্র হউক না কেন প্রায় সকলের ঘরেই অন্ততঃ একটি ঘোড়াও আছে। অশ্বারোহণে ইহারা দিবারাত্রি চলিলেও ক্লান্তি বোধ করে না। অশ্বারোহণে ইহাদিগের জিন কিম্বা লাগামের বিশেষ আবশ্যক হয় না। অথচ ইহারা এত দ্রুত অশ্বকে চালিত করে যে বিদেশী লোকদিগকে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাহাদের অশ্বারোহণের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। অল্পবয়স্ক বালকগুলি যে প্রকার দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া থাকে, তাহা যিনি দেখিবেন তিনিই বিস্মিত হইবেন। এপ্রদেশে পাহাড়ের উপর এমন অনেক খারাপ রাস্তা আছে যেখানে অনভ্যস্ত লোক অতি কষ্টে পদব্রজে চলিতে পারে—অশ্বারোহণের কথা মনে হইলেও হৃৎকম্প হয়; কিন্তু সেখানেও গিলগিটীরা অবলীলাক্রমে অশ্বারোহণে চলিয়া থাকে।

গিলগিটীরা পোলো (Polo) খেলিতে অতিশয় মজবুত। পোলো তাহাদের অতিশয় প্রিয় এবং জাতীয় ক্রীড়া। ইহারা যেরূপ দুঃসাহসের সহিত এবং মরিয়া হইয়া পোলো খেলিয়া থাকে, তাহা পৃথিবীর অন্য কোন অংশের লোকে যে করিতে পারে, তাহা ধারণা করা যায় না। যথাস্থানে এবিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইবে।

গিলগিটে আঙ্গুর, বাদাম, নাশপাতি, খোবানি, শেব, আড়ু (peach), তুত (mulberry) ইত্যাদি নানারূপ সুস্বাদু ফল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। মে মাসের ১৫ই তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়া সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত নানাবিধ ফল এখানে জন্মিয়া থাকে। এই সময়ে গিলগিটীরা অধিকাংশ দিনই ফলাহার করিয়া থাকে। তাহারা কএক প্রকার ফল; যথা তুত, খোবানি ইত্যাদি, শুষ্ক করিয়া শীতকালের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। আবার কোন কোন স্থানে আঙ্গুর, নাশপাতি প্রভৃতি ফল জমির মধ্যে পুতিয়া রাখে। তাহাতে ফলগুলি অনেকদিন পর্য্যন্ত তাজা থাকে। শীতকালে সময়ে সময়ে তাহা উঠাইয়া ব্যবহার করে। ফলের সময়ে গোরু, গাধা, ছাগল, এমন কি কুকুর পর্য্যন্ত ফলাহারী হইয়া উঠে।

যদিও গিলগিটীরা পাকা মুসলমান হইয়া উঠিয়াছে, এবং কাফেরকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখে, তথাপি এখানে গোহত্যা হয় না। তাহার কারণ, প্রথম, ইহা হিন্দু রাজার রাজ্যান্তর্ভূত;* দ্বিতীয়, গিলগিটীরা অল্পদিন হইল বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। সেই জন্য বোধ হয় তাহারা এখনও আপনাদের পূর্ব্ব ধর্ম্মের সৌরভ একেবারে ভুলিতে পারে নাই। এখনও গিলগিটীদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা কুক্কুটমাংস আহার করা দূরে থাকুক, কুক্কুট ঘরে পালন করাও ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করে।

গিলগিটীরা বড়ই নির্ব্বিরোধী। হঠাৎ কাহারও সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিতে চায় না। তাহাদিগকে প্রভুভক্তও বলা যাইতে পারে।

ইহাদের কথিত ভাষা বিকৃত; কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক কথা আছে যাহা বিকৃত সংস্কৃত বলিয়া প্রতীত হয়। ইহা হইতে বুঝা যায় যে কোন সময়ে এখানে প্রাকৃতক ভাষা প্রচলিত ছিল। সুতরাং গিলগিটীরা যে আর্য্যবংশোদ্ভূত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যেমন কাশ্মীরের কথিত ভাষা (dialect) লিখিবার কোন স্বতন্ত্র অক্ষর নাই, সেইরূপ গিলগিটের ভাষাও লিখিত ভাষা নয়। কাশ্মীরীদের কোন বিষয় লিখিতে হইলে পারসী ভাষার সাহায্য লইতে হয়, গিলগিটেও তদ্রূপ। কিন্তু কাশ্মীরের কথিত ভাষার সহিত গিলগিটের ভাষার কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। গিলগিটের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে প্রকার ভাষার পরিবর্ত্তন হয়, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। খাস্ গিলগিটে যে

*কাশ্মীরের মহারাজার রাজত্বের মধ্যে গোহত্যা করা একটি গুরুতর অপরাধ। গোহত্যাকারীকে নরহত্যার নিম্নতম দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কথিত আছে যে কিছু কাল পূর্ব্বে কাশ্মীরের ভিতর গোহত্যা হইলে, হত্যাকারীকে নরহত্যার দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত, অর্থাৎ তাহার জীবনদণ্ড হইত।

ভাষা কথিত হয়, গিলগিট হইতে ৪০।৫০ মাইল দূরে তাহার সহিত বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয়; এমন কি উভয় স্থানের এমন অনেক লোক আছে যাহারা পরস্পরের ভাষা একেবারে বুঝিতে পারে না। যদিও এশিয়ার সমস্ত দেশেই এই প্রকার ভাষার প্রভেদ দেখা যায় এবং ভারতবর্ষের এক প্রদেশের ভাষা অন্য প্রদেশে বিদেশীয় (Foreign) বলিয়া বোধ হয়, এমন কি এক প্রদেশের এক জেলার ভাষা সেই প্রদেশের অন্য জেলার ভাষা হইতে বহু পরিমাণে ভিন্ন বলিয়া লক্ষিত হয়, কিন্তু গিলগিটে অতি অল্প দূর ব্যবধানে যেরূপ ভাষার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায় এরূপ বোধ হয় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

গিলগিটে কয়েকটি নদী এবং নালা আছে, যাহা হইতে স্বর্ণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সিন্ধু, গিলগিট হুনজা ও বাগরোট এই চারিটী নদীই প্রধান। বাগরোটের সোনা ভাল বলিয়া পরিচিত। স্বর্ণ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় না—কেহ যেন লঙ্কা' মনে না করেন। স্বর্ণ ধৌত করিবার জন্য কাশ্মীর দরবার হইতে লাইসেন্স দেওয়া হয়।

গিলগিটীরা আপনাদিগের পরিধেয় বস্ত্র আপনারাই প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহারা মেষ এবং ছাগলোমে পট্টু প্রভৃতি শীতের কাপড় তৈয়ার করে। গ্রীষ্মকালের বস্ত্রের জন্য এখানে কার্পাস তুলার চাষ হয়। তাহারা প্রথমে চরখায় সূতা কাটিয়া তাহার পর কাপড় তৈয়ার করে। আমাদের দেশের তন্তুবায়েরা যে প্রথায় কাপড় প্রস্তুত করিয়া থাকে, এখানেও প্রায় সেই প্রথায়ই কাপড় তৈয়ার হয়, তবে এখানে কাপড় বড়ই মোটা (Rough) হয়। চিত্রল এবং ইয়াসিন প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের পট্টু অপেক্ষাকৃত ভাল।

গিলগিটীদের পোষাকে নূতনত্ব আছে। সাধারণতঃ হাঁটুর নীচে অর্দ্ধহস্ত পর্য্যন্ত লম্বিত একটা ঢিলা পায়জামা, গলা হইতে পা পর্য্যন্ত লম্বা একটা চোগা, এবং একটি টুপি; ইহাই তাহাদের পরিধেয়। পায়জামাটি প্রায়ই ঠাণ্ডা কাপড়ের (cottoon cloth) হইয়া থাকে। চোগা এবং টুপি পট্টুর হয়, কিন্তু গ্রীষ্মকালে শীতের চোগার নমুনা অনুযায়ী ঠাণ্ডা কাপড়ের চোগাও কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া থাকে। চোগাকে এখানে "সুক্কা" বলে। চোগার আস্তিন হাত অপেক্ষা প্রায় এক ফুট লম্বা হইয়া থাকে। কাজ কর্ম্ম করিবার সময় লম্বা অংশটুকু গুটাইয়া রাখিতে হয়। চিত্রাল ইয়াসিন, হুনজা প্রভৃতি স্থানে বেশ ভাল চোগা তৈয়ার হইয়া থাকে। এমন কি ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যেও অনেকে এই চোগা শীতকালে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। টুপিটী এক বিচিত্র বস্তু। ইহাকে একটি বালিশের খোল বলিয়া ভ্রম হয়। পরিবার সময় নীচে (lower end) হইতে গুটাইয়া গুটাইয়া কপালের চতুষ্পার্শ্বে কাণের উপর এবং রগের নীচে দিয়া একটী মোটা দড়ীর ন্যায় করিয়া রাখিতে হয়। এই টুপিও কোন কোন স্থানে ভাল তৈয়ার হইয়া থাকে এবং ভদ্রলোকেরাও কেহ কেহ সখ করিয়া কখন কখন পরিয়া থাকেন। আজকাল ইয়ারকন্দ এবং কাসগার হইতে রুশিয়ার নানা রংএর ছিট কাপড়ের আমদানি হওয়াতে অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন অনেক গিলগিটী সেই সব কাপড় পরিধান করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে। গিলগিটীদের পাদুকাকে 'পব্বু' বলে। কাঁচা চামড়ার মোজা তৈয়ার করিলে যেরূপ আকার হয়, 'পব্বু'র আকারও তদ্রূপ। অপেক্ষাকৃত সুশ্রী 'পব্বু'ও তৈয়ার হইয়া থাকে। তাহা রাজারা বা সঙ্গতিপন্ন লোকেরা ব্যবহার করে। 'পব্বু' বরফের উপর চলিবার পক্ষে ভাল। 'পব্বু' ছাড়া আর এক প্রকার পাদুকা এখানে প্রচলিত আছে। তাহাকে 'খেউটা' বলে। ইহা 'মারখোর' (এক প্রকার বন্য ছাগ) কিম্বা অন্য কোন প্রকার ছাগ বা মেষের শুষ্ক কাঁচা চামড়ায় তৈয়ার হইয়া থাকে। 'মারখোরের' চামড়ায় যে 'খেউটা' তৈয়ার হয় তাহাই ভাল এবং মজবুত বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রত্যেকটা প্রায় ১ গজ লম্বা ও এক ফুট চৌড়া, এরূপ চারিটি চামড়া পায়ে জড়াইতে হয়; এবং প্রায় তিন গজ লম্বা একটি চামড়ার সূতা দিয়া উহা পায়ের সঙ্গে জড়াইয়া বাঁধিলেই 'খেউটা' পরা হইল। 'খেউটা' দেখিতে অতি কদাকার, কিন্তু পাহাড়ের উপর চড়িবার পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী এবং নিরাপদ।

স্ত্রীলোকদিগের পোষাক একটা পায়জামা, একটা লম্বা কোর্ত্তা, একটা টুপি এবং পায়ে পব্বু। স্ত্রীলোকেরা রঙ্গীন কাপড় কিছু অধিক পছন্দ করে, এবং প্রায়ই রুশীয় ছিটে তাহাদের পোষাক তৈয়ার হয়। পায়জামাটী প্রায় পঞ্জাবী স্ত্রীলোকদিগের পায়জামার নমুনায় তৈয়ার হয়। কোর্ত্তাটী

এ প্রদেশের চোগা বা 'সুকার' ন্যায়। তবে ইহা চোগার ন্যায় সম্মুখে চেরা থাকে না। গলার নীচে ২।৩টী বোতাম কিম্বা সুতার দ্বারা বন্ধ করা থাকে; নিম্নে বা দুই পার্শ্বে শেলাই করা। চোগার ন্যায় এই কোর্ত্তাও হাঁটুর নীচে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত লম্বা এবং আস্তিন দুইটিও তদনুরূপ। টুপিটী পুরুষদিগের টুপির ন্যায় নহে। ইহা সাধারণতঃ রুশীয় ছিটে তৈয়ার হয়। মাথার মাপে এই ছিট গোলাকার করিয়া সেলাই করিয়া লইলেই স্ত্রীলোকদিগের টুপি হইল। পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের 'পক্ল'তে কোন প্রভেদ নাই। চোগার উপর স্ত্রীলোকেরা একখানি চাদরও ব্যবহার করিয়া থাকে। এই চাদর দ্বারা মস্তক এবং শরীরের কিয়দংশ আচ্ছাদন করিয়া রাখে। ইহাতে স্ত্রীজনসুলভ লজ্জা নিবারণ অতি উত্তম এবং সম্যক্‌রূপে হইয়া থাকে। ইহাদের ভিতর অবরোধপ্রথার তত কড়াকড়ি নাই, সুতরং ইহারা ঘোমটা দিয়া লজ্জার মাত্রা বৃদ্ধি করে না। এখানকার স্ত্রীলোকেরা প্রায়শই সুন্দরী, কিন্তু দরিদ্র বলিয়া পুরুষের ন্যায় অতি মলিন, অপরিষ্কার এবং অপরিচ্ছন্নভাবে থাকে। বাঙ্গালির চক্ষে গিলগিটী স্ত্রীলোকদিগের পোষাক, বিচিত্র বলিয়া বোধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে যদি একটু ভাবিয়া দেখা যায় তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে বলিতে হইবে যে অসভ্য গিলগিটী স্ত্রীলোকদিগের পোষাক সভ্য বাঙ্গালি স্ত্রীলোকদিগের পোষাক অপেক্ষা সহস্রগুণে উন্নত।

অন্যান্য দেশের মত এখানকার স্ত্রীলোকেরাও অলঙ্কার পরিয়া থাকে। অলঙ্কারগুলি স্বর্ণ, রৌপ্য এবং পিত্তলের নির্ম্মিত। শেষ দুইটী ধাতুই অধিক ব্যবহৃত হয়। যাহারা অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন, তাহারাই স্বর্ণের অলঙ্কার ব্যবহার করিতে পারে। এখানকার অলঙ্কারের সহিত হিন্দুদিগের অলঙ্কারের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেযদিও 'সভ্যতার' স্রোতের মুখে অন্যান্য অনেক দ্রব্যের সহিত পুরাকালীন অলঙ্কারগুলিও ভাসিয়া গিয়াছে, এবং যদিও কোন ভদ্রলোকের ঘর হইতে এই প্রকার কোন অলঙ্কার বাহির হইলে তাহাকে পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের ভিতর একটী করিয়া দেখা হয়, কিন্তু উত্তর-ভারতবর্ষে সৌভাগ্যক্রমে সভ্যতার স্রোতের এখনও তত বেয়াড়া তেজ হয় নাই। এখনও পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে পুরাকালীন নমুনা বা ধরণের অলঙ্কারই প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই সব অলঙ্কারের সহিত গিলগিটের অলঙ্কারের অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে গিলগিটীদিগের সহিত কোন না কোন সময়ে হিন্দুদিগের অবশ্যই সম্বন্ধ ছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে এ প্রদেশের নদীগুলি অত্যন্ত খরপ্রবাহিনী। কিন্তু তাই বলিয়া কি নদীর এক পার হইতে অন্য পারে যাওয়া যায় না? যায়। নদীর উপর পুল তৈয়ার হয়। কাঠের বা লোহার পুল নহে। দড়ীর পুল। তাহাকে এখানে "ঝুলা" বলে এবং ইংরাজীতে Rope Bridge বলে। "ঝুলা" প্রস্তুত করিতে গিলগিটীদের অনেক পরিশ্রম করিতে হয় এবং অনেক ইঞ্জিনীয়ারিং বুদ্ধিও খাটাইতে হয়। উভয় পার্শ্বে প্রস্তরমালা (Solid rocks) থাকাতে যেখানে নদী কিছু সংকীর্ণ হইয়া চলিয়াছে, সাধারণতঃ এমন স্থানেই ঝুলা তৈয়ার করা হয়। ৫টি খুব মোটা গাছের ছালের দড়ী হইতে "ঝুলা" তৈয়ার হয়। প্রথমে ৩টি দড়ী পাশাপাশি রাখে এবং একের সহিত অন্যকে অপেক্ষাকৃত শরু দড়ী দ্বারা বাঁধিয়া বা বুনিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর এই ৩টি একত্রে গ্রথিত দড়ী নদীর এক তীরের পাহাড় হইতে অন্য তীরের পাহাড় পর্য্যন্ত বিছাইয়া দেওয়া হয়। উভয় পার্শ্বে প্রায় ৫।৭ ফুট উচ্চ ২টি দেয়াল তৈয়ার করিয়া ইহার উপর ২টি গাছের গুঁড়ি রাখে। এই গুঁড়ির উপর দিয়া দড়ীগুলিকে টানিয়া নীচে আর একটি গুঁড়ির সহিত উত্তম রূপে বাঁধি। তাহার উপর প্রস্তরের দেয়াল উঠাইয়া পুতিয়া ফেলে। ইহাতে দড়ীগুলি বেশ টানা টানা থাকে এবং খুলিয়া যাইবার ভয় থাকে না। ৩টি দড়া একত্র থাকাতে প্রায় ১ ফুট বা তদধিক প্রশস্ত হয়। তাহার উপর দিয়া চলিতে হয়। অন্য ২টি দড়ী নীচের ৩টি দড়ার উভয় পার্শ্বে প্রায় এক গজ উচ্চে নদীর এক পার হইতে অন্য পারে উক্ত প্রকারেই পাথরের দেয়ালের নীচে পুতিয়া দেওয়া হয়। এই ২টি দড়ী দুই হস্তে ধরিয়া চলিতে হয়। নীচের দড়ীগুলির সহিত উভয় পার্শ্বের উপরের দড়ী ২টি ২।৩ গজ অন্তর পাতলা দড়ী দ্বারা বাঁধা থাকে। ইহাতে পার্শ্বের দড়ী ২টি অধিক হেলিতে দুলিতে পারে না। আবার পার্শ্বের দড়ী ২টি যাহাতে পার্শ্বেই থাকে, পরস্পরের

রবিবর্ম্মার "দময়ন্তী ও হংস"।

প্রবাসী] [Indian Press, Allahabad.

মধ্যস্থ ব্যবধান সংকীর্ণ করিয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া না যায়, সেই জন্য মধ্যে মধ্যে বৃক্ষের শাখা উপযুক্ত পরিমাণে কাটিয়া এক হইতে অন্য দড়ীতে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। চলিবার সময় এই শাখাগুলিকে ডিঙ্গাইয়া চলিতে হয়। ঝুলাতে চলিবার সময় সাহসের (nerve) বিশেষ আবশ্যক হয়। অন্ততঃ প্রথমবার চলিবার সময় সাহসীলোককেও কিছু শঙ্কিত হইতে হয়। সাবধানে চলিতে পারিলে ঝুলা অন্যান্য পুলের ন্যায় নিরাপদ। কিন্তু যখন ইহার মধ্যস্থলে আসিয়া প্রায় ৫০।৬০ ফুট নীচে নদীর তরঙ্গচঞ্চল স্রোত চক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার গোঁ গোঁ রব কর্ণে প্রবেশ করে, আবার মধ্যস্থলে ঝুলা কিছু দুলিয়াও থাকে তখন সাহসী ব্যক্তির বুকও প্রথম বারে দুর দুর করিতে থাকে। ঝুলার উপর ২।৩ বার চলিলে ভয় ভাঙ্গিয়া যায়। এ প্রদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা 'ঝুলার' উপর অবলীলাক্রমে চলিয়া থাকে। দিনেও চলে, রাত্রেও চলে, আবার ১—১॥ মণ বোঝা পৃষ্ঠের উপর উঠাইয়াও চলে। তাহারা যেমন রাস্তায় চলে, সেইরূপ 'ঝুলার' উপর চলে। 'ঝুলা' এতই মজবুত হয় যে একেবারে ৫।৭ জন লোক অনায়াসে চলিতে পারে। যিনি 'ঝুলায়' চলিতে ভীত, অথচ নদীর পারে যাইতে চান, তাঁহাকে এদেশীয় ২।৪ জন লোক সঙ্গে লইয়া 'ঝুলা' পার করাইয়া দেয়। ২।১ জন সম্মুখে, ২।১ জন পশ্চাতে; ভীত ব্যক্তি মধ্যে থাকিয়া বৈতরণীর পারে চলিয়া যান।

"ঝুলা" ব্যতীত নদী পার হইবার আর একটা উপায় আছে। তাহাকে এখানে "জালা" বলে ও ইংরাজীতে Raft বলে; এবং বাঙ্গালা ভাষায় বোধ হয় "ভেলা" বলা যাইতে পারে। "জালা" কোন কোন স্থানে তৈয়ার হইয়া থাকে, সকল স্থানে নহে। ৪টী বা ৬টী মহিষের কিম্বা গরুর সম্পূর্ণ চামড়ায় জালা তৈয়ার হয়। চামড়াগুলিকে প্রথমে মসকের মত শেলাই করিয়া একদিকে একটু খুলিয়া রাখে। যদি চামড়া রৌদ্রে থাকিয়া কিম্বা অনেকদিন পর্য্যন্ত ব্যবহারে না আসায় কঠিন হইয়া যায়, তবে তাহাকে জলে ভিজাইয়া নরম করিতে হয়। নরম হইলে চামড়ার খোলা মুখটীতে ফঁ দিয়া 'ফুটবলের' ন্যায় ফুলাইয়া লইয়া মুখটা বেশ করিয়া বাঁধিয়া দেয়। এই প্রকারে সমস্ত চামড়াগুলি ফুলাইয়া লইয়া এবং তাহাদের মুখগুলি বাঁধিয়া দিয়া উপরে একটী কাষ্ঠের কাঠামো বা কোন স্থানে 'চারপাই' বা খাট বাঁধিয়া দেয়। উক্ত কাঠামো বা খাটের ৪ কোণে ৪টী চামড়া বা মসক বাঁধিতে হয়। কোন কোন স্থানে দুই পার্শ্বেও দুইটী মসক বাঁধিয়া থাকে। এইরূপে "জালা" তৈয়ার হইলে পর ইহাকে নদীবক্ষে ভাসাইয়া দেয় এবং ২।১ জন লোক দাঁড় বাহিয়া নদীর উপর চালিত করে। "জালার" উপর ৫।৬ জন লোকের বসিবার স্থান থাকে। 'জালা' নদীর সকল স্থানে চলিতে পারে না। যেখানে নদী অপেক্ষাকৃত স্থির এবং উভয় পার্শ্বে পাহাড় থাকাতে যেখানে নদীকে সঙ্কীর্ণ হইয়া দ্রুতবেগে চলিতে হয় নাই, সেইখানেই 'জালা' চলিতে পারে। কোন কোন ক্ষুদ্র উপত্যকার নীচে নদী অতি ধীর ভাবে চলাতে ৩।৪ মাইল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে 'জালা' চলিতে পারে। 'জালা' বিপরীত স্রোতে চলিতে পারে না। অপেক্ষাকৃত স্থির নদীতে চালিত হইলে 'জালা' নৌকার ন্যায় নিরাপদ, এবং যদিও ইহা কদর্য্যভাবে তৈয়ার হয় এবং দেখিতেও কদর্য্য, তথাপি 'জালায়' ভ্রমণ করা বিশেষ আনন্দজনক।

গিলগিট শিকারের জন্য প্রসিদ্ধ। মারখোর ("সর্পভুক্") আইবেক্স (একপ্রকার বন্য হরিণ), উড়িয়াল (একপ্রকার বন্য মেষ) এবং ভল্লুক, এই কয়েকটী জন্তুই এখানে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। মারখোরের ও আইবেক্সের সিং অতিশয় সুন্দর। তজ্জন্যই ইহাদের শিকার শিকারিজগতে অতিশয় প্রিয়। এখানে লাইসেন্স লইয়া শিকার করিতে হয়। সর্ব্বসাধারণে, অবাধে শিকার করিতে পারে না। গিলগিটীরা বলে যে যিনি মারখোরের মাংস জীবনে একবার খাইবেন, সর্পদংশনে তাঁহার কখনও মৃত্যু হইবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র হালদার।

চন্দ্রনাথ।

(১)

কোন্ দূর-লুপ্ত যুগে, ওহে যোগিবর!
হে প্রেমিক! সতী-দেহ বহি' প্রেয়সীর
স্কন্ধে স্বীয়, শিরে ধরি' জটা সন্ন্যাসীর,

ভ্রমিলে ভুবন ; শোকে উদাস-অন্তর
ভ্রমিলে ভারত-ময় ! পর্ব্বত, প্রান্তর,
মরুভূমি, উপত্যকা, অরণ্য, তটিনী !—
নারিলে ত্যজিতে, দেব ! মৃতা প্রণয়িণী !
কত দেশে দেহ-খণ্ড পড়ি' অতঃপর
পবিত্রিল ধরাধাম ; হ'ল পীঠস্থান
সুপবিত্র প্রেম-তীর্থ !—স্মৃতি আজো তা'র—
—সতীদেহ ত্যাগ আর সন্ন্যাস তোমার—
ভরি' রহে তীর্থকুল, পুণ্য করে দান !

'চন্দ্রনাথে' আসি' আজি, হে চন্দ্রশেখর !
অমর এ প্রেম-ধামে, ধন্য এ অন্তর !

(২)

যোগ্য পীঠস্থান তব,—হে অনন্ত প্রেম !
জীবস্থিতি মূল হেতু, আনন্দ-আকর !—
শেখর-শ্রেণীর এই সমুচ্চ শিখর,
প্রকৃতির ক্রীড়াশৈল !—মণিরত্ন হেম,—
সংসার-ঐশ্বর্য্য-ধূলি—দূরে তেয়াগিয়া,
নিলে তুমি প্রণয়ের পবিত্র আশ্রম,
নিবৃত্তি-সোপান উচ্চ !—বিষয়ের ভ্রম
ঘুচা'বার এইস্থান !—বিরহে জাগিয়া,
অনন্তের আরাধনে, দাবদগ্ধ প্রাণ
জুড়াবার, হেথা আছে যোগ্য নিকেতন !—
শান্ত লোকালয় নিম্নে,—তরু কুঞ্জবন,
অদূরে বারিধি-বেলা,—মর্ত্ত্য-অবসান !

সকলের উচ্চ প্রেম, সর্ব্বোচ্চ শিখরে
তীর্থরূপে করে বাস হেথা চিরতরে।

প্রবাস-কুসুম।

হৃদি-বনে চয়ন করিয়া
রাশি রাশি ক্ষুদ্র বনফুল,
গাঁথি তাহা হৃদয়ের ডোরে, ধুয়ে তাহা নয়নের লোরে,
সাজায়েছি এক গাছি মালা—
কোথায় কোথায় অলিকুল ?

এ নহেরে লাজুক মল্লিকা,—
অস্ফুট প্রেমের ছায়া ছবি ;
এ নহেরে গর্ব্বিত গোলাপ,—
ফুলকুলে সৌরভের রবি ;
এ নহেরে হসিত করবী,—
অতি উগ্র প্রণয়ে আকুল ;
এ সুধুরে কালিমাজড়িত
ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র বনফুল !

যে দেশে ফুটেছে এরা বহেনি তথায়
মধুর মলয় !—
প্রভাতী শিশিরকণা উষার ছায়ায়
রচেনি এদের করে মুকুতা-বলয় ।—
শ্যামল নীরদরাশি, অধরে বিজলী-হাসি,
ধোয় নাই এদের কালিমা । -
দোয়েল, পাপিয়া, পিক, কুঞ্জে নাই চারিদিক,
গাইয়া অপ্সর-কণ্ঠে এদের মহিমা !

এরা শুধু ফুটিয়াছে
প্রাণের দুঃখের বাতে ;
হৃদয়ের গভীর নিশ্বাসে !—
ক্ষণিক শিশির নয়,
টল টল অশ্রুজল
এদের বদনে সদা ভাসে !—
নিশ্বাস বাতাস লেগে উর্ম্মি যত উঠে জেগে
হৃদয়ের শোণিতের স্রোতে ;
ধমনীর তালে তালে
ধায় সব ঢেউগুলি
মরিতে এদের চরণেতে !—
কি ঘোর ঝঙ্কার দিয়ে
স্মৃতির বাঁশরি উঠে
হৃদি-বন করিয়া আকুল ;
যেন কি মন্ত্রের গুণে
জাগিয়া উঠে গো এরা,
ফুটিয়া উঠে গো বনফুল !—

এ ফুলের মালা গাঁথি,
লইয়া আপন করে,
প্রবাসের বন-পথে রয়েছি দাঁড়ায়;
কেহ কি নিকটে আসি, দেখিবে না মালাগাছি;
ফুলগুলি ঝরিবে কি হায়!—
এত শোণিতের স্রোত,
এত নয়নের জল,
বিফল হইবে শুধু মোর?
হৃদয়ের গীত গান, হয়ে যাবে অবসান?
জীবন-নিশীথ হবে ভোর?
এ ফুলে নাহি কি তবে
সৌরভের এক কণা,
নাহি এক বিন্দু পরিমল?
এতে কি নাহিরে তবে
সৌন্দর্য্যের আধ হাসি,
সরল সরম ঢল ঢল?
হেরিলে এ ফুলগুলি
পড়ে না কি হৃদোপরি
প্রেমময় শান্তিময় ছায়া?
হেরিলে এ ফুল রাশি,
প্রাণে নাহি মনে হয়,
নন্দনের স্বপনের মায়া?
দেখিলে এদের হাসি,
সুখে কি পুরে না প্রাণ
সুখ স্বপ্ন হ'য়ে যায় ভুল?
তবে এ শুকায় যাক্,
ঝ'রে যাক, ম'রে যাক!
কি কাজ ডাকিয়া অলিকুল?

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

মোতিয়া।

(প্রকরণিকা।)

নাটিকা এবং প্রকরণিকা সাধারণতঃ সমানলক্ষণযুক্ত হইলেও উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। এই জন্য "মোতিয়া" প্রকরণিকা নামে অভিহিত হইল। প্রাচীনেরা দৃশ্যকাব্যের যে সকল প্রভেদ দেখাইয়াছেন, এবং তদনুসারে যে প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ইংরাজীর অনুকরণে নূতন নাম সৃষ্টি করা সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যদি নূতন সৃষ্ট কাব্য প্রাচীন লক্ষণাদির সহিত মিলাইতে না পারা যায়, তাহা হইলে নূতন নাম দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু অন্যথা Lyrical Drama, Melodrama প্রভৃতি ইংরাজী শব্দের তরজমা করিতে চেষ্টা করা প্রবাদ এবং সঙ্গতি বিরুদ্ধ।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ—	স্ত্রীগণ—
যোগেশ বাবু	সরোজিনী
সুরেশ বাবু	মনোরমা
বিনয় বাবু	মোতিয়া
এন মুখার্জ্জি	বামা ও বিন্দি দাসী
রামা ভৃত্য	

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[যোগেশ বাবুর পাঠাগার]

যোগেশ—এ চিঠিখানার জবাব দিতে হইলে মন্ত্রী ঠাকুরাণীর পরামর্শ চাই! খবরের কাগজগুলি পড়া হয়নি; তাহার উপর আবার ১০।১২ খানা চিঠি জমিয়াছে (চিঠিগুলি হস্তে গ্রহণ)।

[সরোজিনীর প্রবেশ।

উপস্থিতেয়ং কল্যাণী। Hang it. (চিঠিগুলি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া এস, অনেক কাজের কথা আছে।

সরোজিনী—আমাকে ব্যাং ব'লে গালি দিলে নাকি?

যোগেশ—প্রায় কাছাকাছি।

সরোজিনী—তবে পুকুর বলিয়াছ।

যোগেশ—হঁা, তোমাকে বলেছি জ্ঞানবাপী, সৌন্দর্য্যের সরোবর এবং প্রেমের ডোবা।

সরো—বাহবা, এবারে যে কবিতা খুলে গেল! হেম বাবুর ত এখন কলম প্রায় বন্ধ; তুমি কবিতা লেখনা কেন?

যোগেশ—পারি ; কিন্তু চরণ মেলেনা।

সরো (পার্শ্বস্থিত চেয়ারে বসিয়া নিজের পা দেখাইয়া। এমন দুখানি থাকতে ও জিনিষটা দুর্লভ হ'ল কেন ?

যোগেশ—ও দুখানি ত ক্রমাগত এ ঘর ও ঘর করে বেড়াচ্চে ; দর্শন পাই কই ? এই এলাহাবাদের চিঠিখানার কি জবাব লিখিব, ভাবছি।

সরো—দেখি (পত্র লইয়া পাঠ)। তাইত ! বোনটিকে দেশে রেখে বিনয় বাবু তবে সস্ত্রীক বিলাত যাচ্ছেন ? এদেশে অসুখ বিসুখ হলে লোকে পশ্চিমে যায় ; ওঁরা পশ্চিম মুলুক থেকে বিলাত যাচ্চেন। এবারে মনোরমা মিসেস্ বোনার্জ্জি হয়ে আস্‌বেন দেখ্‌ছি। ঠাকুরুণের গাউনপরা রূপ দেখ্‌তে সাধ হচ্চে।

যোগেশ—তুমি কেন নিজেই গাউন পরে আয়নায় ছবি দেখিয়া সাধ মিটাও না ?

সরো—তুমিত বিলাত যাও নি !

যোগেশ তোমার ভাইটিও বিলাত থেকে এন্ মুখার্জ্জি হয়ে আস্‌চেন ; তুমি কেন সেই সম্পর্কে মিস্ মুখার্জ্জি হওনা ?

সরো—(যোগেশের গাল টিপিয়া দিয়া) অনেক দিন মার খাওনি—না ?

যোগেশ—সত্যি, আজ কাল কাহারও দূর সম্পর্কের কেহ বিলাত গেলেও লোকে সাহেব সাজে। অমর বাবুর শালার পিস্‌তুত ভাই বিলাত গিয়াছিলেন বলিয়া, অমর বাবু মিষ্টার রে হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

সরো—তা মরুকগে। এখন তুমি কি জবাব দিবে ? মোতিয়াকে এখানে আনায় ক্ষতি কি ?

যোগেশ—সে ইংরাজী স্কুলে লেখা পড়া করেছে ; গান বাজনা শিখেছে ; হয়ত ইংরাজী চাল্ চলন হয়েছে। এখানে সুখে থাকিবে কি ?

সরো—তা বল্‌তে পারিবেনা। ওদের বংশে ওসব দোষ নাই। মোতিয়া বিবিআনার ধার ধারেনা। গান গায় বটে ; কিন্তু ঠিক যেন পাখীর মত। সদাই প্রফুল্ল। অমন মেয়ে দেখিনি। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[যোগেশ বাবুর গৃহপ্রাঙ্গণ]

রামা—ও বামা, উনি কে ? বাবুর নাকি বোন্ হন্ ?

বামা—কোথাকার বোন্ ? বন্ধুর বোন্। ত্রিকুলে কেউ নেই, তাই এখানে এসে পড়ে মরেছে।

রামা—তোর যেমন কথা ! ওরা শুনেছি খুব বড় মানুষ।

বামা—বড় মানুষ না ছাই। বড় মানুষ হ'লে নাকি অত বড় মেয়ে আইবুড় থাকে ! ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছিল—তা যেমন কত্তা তেমনি ঠাকুরুণ। যিনিই আসেন, তিনিই কুটুম !

রামা—কুলীনের ঘরে অমন বড় মেয়ে ঢের থাকে। গরিব হলে কি অমন চেহারা হয় ?

বামা—হাঁরে হাঁ ; আদর করে ঘি ঢাল্‌লে পোড়া কাঠেও রূপ বেরোয়। তেল টুকু না পেয়ে আমাদের গায়ে খড়ি উড়ে গেল।

রামা—(হাসিয়া) উনি এখানেই থাক্‌বেন নাকি ?

বামা—থাক্‌বেনা ত যাবে কোথা ? পথে পথে বেড়ান সুখ, না ঠ্যাঙ্গের উপর ঠ্যাং দিয়ে খাওয়া দাওয়া সুখ ? আমাদের কপাল মন্দ, তাই গতোর খাটিয়ে খাই।

রামা—তোমার তো কাজের মধ্যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ঘর পাহারা দেওয়া !

বামা—তুইত আমার কোন কাজই দেখ্‌তে পাস নি। অকম্মার সর্দ্দার ! সুধু তামাক সাজিস, আর গোঁপে তা দিয়ে বেড়াস্। আমায় বলা হচ্চে, আমি রাত দিনই ঘুমুই ! অলপ্পেয়ে মিন্‌সে। তুই কবে দেখেছিলি, আমি ঘুমুচ্ছিলুম ?

রামা—ষাট্, তুমি ঘুমুবে কেন ? লোকে মিথ্যা করে রটায়।

বামা—লোকের মুখে আগুন। তারা চোখের মাথা খেয়েছে। (কাঁদিয়া) আমি কাজ কম্ম করিনে ? ভোরে ভোরে উঠ্‌ছি, তাড়াতাড়ি নেয়ে খেয়ে নিচ্চি। বাবু না থাক্‌লেই রোজ খিলটিল বন্ধ করে ঘর পাহারা দিতে হয়। মা ঠাকুরুণের কাছে বসে থাক্‌তে হয়, শুতে হয়। বিন্দি মাগী কাজ কম্ম করেনা। গলা ফাটিয়ে ডেকে ডেকে সারা হই, তবে একটু তেষ্টার জল এনে দেয়। এ বেটী মাগীর কম্ম। দেখ্‌ছি সে কেমন বাপের বেটি। [প্রস্থান।

রামা—যাই, ছোট বাবুর ফুল বাগানটা দেখে আসি। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[সরোজিনীর বসিবার ঘর]

সরোজিনী—ও মোতিয়া ! ওগো বেলি—চামেলি—গোলাপ—টগর—

[মোতিয়ার প্রবেশ।

মোতিয়া----একেবারে বলে ফেল্লেই ত হ'ত, "ও আমার ফুলের বাগান", নয়ত "ও আমার ফুলের সাজি"।

সরোজিনী----ফুলের সাজিই বটে। তোর যে রূপ।

মোতিয়া----আমার প্রাণে বসন্তের হাওয়া দিয়াছে। --দেখনি, শুক্‌না গাছগুলিও নূতন পাতা উঠ্‌লে কেমন কচি গাছ বলে মনে হয়?

সরো----মোতিয়ার কি নূতন পাপ্‌ড়ি হচ্চে?

মোতিয়া---- [গান]

আঈ বাহার অভী ফুলতি হ্যায় মোতিয়া।
বহত পবন ঘন কাঁপত ছতিয়া।
ময় হুঁ মশ্‌গুল মেরী আপনি স্বরভি মে;
দেখি স্বরত মেরী গাওয়ত পাপিহ্‌বা।

সরো----তোর গান শুনলে উড়্‌তে ইচ্ছা করে।

মোতিয়া----ভাগ্গিস উড়তে পারনা; নহিলে দাদা বাবু অমন ডানাকাটা পরী কোথায় পেতেন?

[যোগেশ বাবুর প্রবেশ।

যোগেশ----এই যে মোতিয়া, তোমার চিঠি আছে! (চিঠি প্রদান করিয়া) তোমার দাদা এডেন্‌ থেকে লিখেছেন। এত দিনে বিলাত পৌঁচেছেন।

(মোতিয়ার চিঠি পাঠ)

সরো----সব ভাল ত?

মোতিয়া----হাসিয়া। হাঁ; খুব পথের বর্ণনা করেছেন। দাদা এবারে দেশে ফিরলেই কবি হয়ে উঠবেন।

(সরোজিনীর হস্তে চিঠি প্রদান)

যোগেশ----আমাকে যে চিঠি লিখেছেন, তাতেও খুব সমুদ্রের বর্ণনা আছে। এই দেখ (চিঠি প্রদান)। তোমরা দাঁড়িয়ে রহিলে কেন? বস, আমি যাই। [প্রস্থান।

সরোজিনী----চল, আমরাও ছাতে যাই। সেখানে গিয়ে তোমার দাদার কবিত্ব দেখা যাক্। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[অপরাহ্ণ----পুষ্পোদ্যান]

সুরেশ----কোন কাজে মন লাগ্‌ছেনা। ওঁরা নদী দেখ্‌তে গেছেন; এই পথেই ফিরবেন। নদীর ধারে গেলে বৌদিদি কিছু মনে কত্তে পারেন। এখানেই বসে থাকি। বেলা গেল----এখনও ফিরচেন না কেন? ঐ গাড়ী এল।

[সরোজিনী ও মোতিয়ার প্রবেশ।

সরো----এই যে ঠাকুরপো। একা একা কি হচ্চে? আমরা নদী দেখে এলাম; খুব জল বেড়েছে।

সুরেশ----এখানে বসুন না, বেশ হাওয়া দিচ্চে।

সরো----মোতিয়া এইখানে বস।

(সকলের উপবেশন)

ঠাকুরপো, মোতিয়ার গান শুনেছ? মোতিয়া, পাহাড়ে নদীর কি গান গাইবে বলেছিলে----গাও না?

মোতিয়া----(ব্রীড়া প্রকাশ করিয়া) সেটা খুব ভাল গান নয়।

সরো----ভাল মন্দ আমরা জানি----তুমি গাও।

মোতিয়া----(সুরেশের দিকে চাহিয়া, পরে অন্য দিকে একটু মুখ ফিরাইয়া) [গান]

বহে যা, বহে যা তটিনী!
সুধু হাসিয়ে সুধু নাচিয়ে সুধু গাইয়ে তটিনী!
কানন-গগন-ছবি বুকে করিয়া,
শিলা-চরণ-তল ধরিয়া,
সুধু পুলকে সুধু আলোকে প্রাণ ভরিয়া তটিনী!
যত রোগ শোক পরিতাপ
যত জ্বালা যত ব্যথা অভিশাপ
আছে ছেয়ে ধরণী;
তরঙ্গে বহিয়া উকূল ছাইয়া
সব ধুয়ে লয়ে যা, তটিনী!

সুরেশ----(স্বগত)

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্‌
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিনোঽপি জন্তুঃ
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধ পূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি।

সরো----কি ঠাকুরপো, একেবারে স্তম্ভিত হলে যে?

সুরেশ----এমন মিষ্ট গান কখনও শুনি নাই।

(মোতিয়া লজ্জাবনতমুখী)

সরো----শুন্‌লে মোতিয়া? আচ্ছা আর এক দিন মোতিয়া তোমাকে গান শুনাবে। এখন যাই।

[সরোজিনী ও মোতিয়ার প্রস্থান।

সুরেশ এই আসনটিতে মাথা রাখিয়া একটু বিশ্রাম করি। (মোতিয়া কর্তৃক পরিত্যক্ত আসনে মাথা রাখিয়া উপবেশন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) ভগবন্ মন্মথ, কৃতস্তে কুসুমায়ুধস্য সতীস্তেক্ষ্যামেতৎ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[মোতিয়ার শয়নকক্ষ]

মোতিয়া এখনও তিনটে বাজেনি; সাড়ে তিনটার সময় আজ বাগানে যাইবার কথা। কোন রকমে সময়টা কেটে গেলে বাঁচি। ওঁদের বাড়ীতে আছি, তাই যত্ন করেন। সত্য সত্য ভাল বাসেন কি? গান শুনিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন; সেটা হয়ত ভদ্রতা। আজ ওর গোলাপ বাগানে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব। এখন সময় কাটাই কি করে? একটা গান গাই।

[গান]

আমি যাবনা যাবনা কুসুমকুঞ্জে স্বজনা লো!
সেথা ফুলের গন্ধে মোহে আনন্দে
হারাইয়ে ফেলি পরাণি লো।
উদাসিয়ে মন বহে সমীরণ
বিহগের গানে আকুল হই;
তাহে ফুটায়ে মধুর জোছনা বিধুর
হেসে হেসে আসে রজনী লো।
নব নব আশা প্রেমের লালসা
ফুটিয়া উঠিছে পরাণে সই।
তাই হয় ভয় অবশ হৃদয়
হারাবে কোথা, না জানি লো।

ওই কে আস্ছে বুঝি। (এক খানা পুস্তক লইয়া পড়িবার ছল করিয়া উপবেশন)

[সরোজিনীর প্রবেশ।

(পুস্তক রাখিয়া) এস।

সরোজিনী - আজ গোলাপ বাগান দেখতে যেতে হবে মনে নাই?

মোতিয়া -- এখনি যাবে?

সরো - তোমার কিছু কাজ আছে নাকি?

মোতিয়া না, চল যাই।

সরো - আমি বল্‌তে এলাম, যে তুমি বেলা থাক্‌তে থাক্‌তে ঠাকুরপোর সঙ্গে যাও; আমরা অল্প একটু পরেই যাচ্ছি। কি বল?

মোতিয়া (ঈষৎ কম্পিতকণ্ঠে) তোমরা কিন্তু শীঘ্রই এস।

সরো - হাঁ; তবে চল।

মোতিয়া - (স্বগত) অবশ হৃদয়, হারাবে কোথা, না জানি লো।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[সুরেশ বাবুর গোলাপ বাগান]

মোতিয়া—আমি এত বড় গোলাপ কখন দেখিনি। আপনি নিজে হাতেই সব কাজ করেন?

সুরেশ—না, তবে অনেকটা খাটি। (স্বগত) একবার ত একটা ফুল দিয়াছি; আবার কি ছলে করস্পর্শ করিব? ঐ লাল ফুলটি তুলিয়া আনি। (ফুল তুলিয়া) এটি ছোট, কিন্তু গন্ধ বড় চমৎকার। (হস্তে ফুল প্রদান)

মোতিয়া—(স্বগত) একি ফুলের গন্ধ, না, প্রাণের গন্ধ? সৌরভে সর্ব্বাঙ্গ ভরে গেল।

সুরেশ—বৃষ্টি আস্‌ছে দু এক ফোঁটা পড়্‌ছে। ঐ কুঞ্জের আশ্রয়ে গিয়ে দাঁড়াই। (উভয়ের কুঞ্জতলে গমন)

মোতিয়া----এ বৃষ্টিতে ওঁরা আস্‌তে পারবেন কি?

সুরেশ----ছাতা নিয়ে চাকরেরা নিশ্চয়ই আস্‌বে।

মোতিয়া---(স্বগত) প্রেমের কুঞ্জ সাজাইয়া, যদি দুই জনে একসঙ্গে থাকিতে পারিতাম!

সুরেশ----আপনার এখানে একাকী ভাল লাগ্‌ছে না।

মোতিয়া----কেন, আপনি ত আছেন?

সুরেশ—(স্বগত) মনের কথা বলা বড় দুঃসাধ্য। কোন আভাস দিতেও ভয় হচ্চে, কি জানি যদি অসন্তুষ্ট হন্? (প্রকাশে) আপনি এসেছেন বলে, আমরা সকলেই বড় আনন্দে আছি।

মোতিয়া----(স্বগত) সকলে? কেবলই ভদ্রতা! (প্রকাশে) সেটা আপনাদের স্নেহের ফলে।

সুরেশ----আপনি যখন চলিয়া যাইবেন, তখন আর আমাদের কথা মনে রাখিবেন কি?

মোতিয়া----আমি কি এতই অকৃতজ্ঞ, যে আপনাদের এত স্নেহ বিস্মৃত হব?

সুরেশ----তা নয়, আমি বল্‌ছিলাম যে, তু—ম্ (অর্দ্ধোক্তি) আপনি চলে গেলে আমাদের বড় কষ্ট হবে।

মোতিয়া----(নম্রমুখে গোলাপের বোঁটা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে) আমাকে তুমি বলিবেন।

[যোগেশ বাবু এবং সরোজিনীর প্রবেশ।

সুরেশ--বৃষ্টি দু এক ফোঁটা পড়েই বন্ধ হয়েছে। ঐ যে দাদারা এসেছেন।

(উভয়ে অগ্রসর হওন)

যোগেশ--দুচার ফোঁটা বৃষ্টির ভয়েই পালিয়েছিলে ?

সরোজিনী---চল গোলাপের ঐ দিক্‌টা দিয়ে ঘুরে যাই। মোতিয়া, গোলাপ বাগানটি কেমন ?

(সকলে চলিতে চলিতে)

মোতিয়া --খুব ভাল। আমার ইচ্ছা করে, নিজে হাতে ঐ রকম বাগান করি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[যোগেশ বাবুর পাঠাগার]

সরোজিনী --বিলাত ফিরে এলে লোক খুব বেহায়া হয়।

যোগেশ ---(হাসিয়া) কেন বল দেখি।

সরো--দাদা আমাকে বল্‌ছিল যে তার নাকি মোতিয়াকে দেখে প্রেম জন্মেছে। ছি, ছি, কি করে বল্লে !

যোগেশ---বাঃ, দুদিনের মধ্যেই নগেন একটা প্রেম ঘটিয়ে বসেছে ? বিলাতে মা বাপের সাম্‌নেও প্রণয়িপ্রণয়িনীর প্রেমের ব্যাখ্যা চলে।

সরো---পোড়া কপাল বিলাতের।

যোগেশ---এখন যদি সত্য সত্যই একটা ঘটকালি করে উঠ্‌তে পার, মন্দ কি ? মেয়েটিকে ত পার কত্তে হবে ? নগেন্‌ও বিলাত ফেরৎ; মোতিয়ার দাদার কোন প্রকার অসম্মতির কারণ নাই। আমি বরং চিঠি লিখে জান্‌ছি।

সরো---তুমি আগে থেকে চিঠি লিখো না। আমি মোতিয়ার মন বুঝে নিই; ওত আর কচি খুকী নয় !

যোগেশ---মন হবে গো, মন হবে।

সরো---তখন দাদা ওর হাত ধরে বেড়াতে যাবে বল্লে; আর মোতিয়া একেবারে পালিয়ে ঘরে দোর দিলে ! দাদা কি বেহায়া !

যোগেশ-- বাড়াবাড়ি বটে।

(নেপথ্যে May I come in ?)

নগেন এসেছে। এসনা ? আবার অনুমতি চাওয়া কেন ?

[এন মুখাৰ্জ্জির প্রবেশ।

এন মুখাৰ্জ্জি---Good evening, Mr Chatterjee. Good evening, my dear sister.

সরোজিনী----মাগো, একি ভঙ্গী ! বাঙ্গলায় কথা কইতে পার না ? এক বাড়ীতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অভিবাদনই চলেছে ?

যোগেশ----তা যাগ্‌গে। কেমন হে নগেন, এখানটা কেমন লাগ্‌ছে ?

এন মুখাৰ্জ্জি---Simply charming.

সরো-- ফের ইংরাজি বল্লে,দাদা ?

এন মুখাৰ্জ্জি---ঐ বালিকা মোতিয়া আমার আত্মাকে বন্দী করেছে।

[সরোজিনীর প্রস্থান।

কিছু লাজুক আছে; চায করা সমাজে পড়্‌লে সুধ্‌রে যাবে।

যোগেশ---চল বাহিরে যাই। তোমার প্রেমের চাষের বিষয়ে কিছু বলিবার আছে। বেশী বাড়াবাড়ি করিও না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[মোতিয়ার শয়ন কক্ষ]

সরোজিনী---আমি দাদাকে নিশ্চয় বলিব, তোমাকে ওরকম বিরক্ত না করে। কিন্তু চিরকাল কুমারী থাক্‌বে, সে আবার কি রকম কথা ?

মোতিয়া---(স্বগত) যিনি আমাকে এত ভালবাসেন, তাঁহাকে কি করে বলিব যে তাঁর ভাইকে বিবাহ করিতে পারি না ? কি বলিয়া আপত্তি করিব ? নকল সাহেবি-আনা এবং অশিষ্টাচার ? সে কথা বলিলে হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। বলিবেন, যে ওটা উপরের দিক্‌; দুদিনে সুধ্‌রে যাবে। আর কিসের আপত্তি ? টাকা কড়ি আছে; লেখা পড়া না জানিলেও বিলাত ফেরৎ। আর বিদ্যার কথা লইয়া কথা কহিবার আমি কে ? কিন্তু আসল কথাটা ? না, প্রাণ গেলেও তাহা বলিতে পারিব না।

সরোজিনী---চুপ করে রইলে যে ?

মোতিয়া—আমি দিন কতক ভেবে নি ; তোমার পায়ে পড়ি, রাগ করিও না।

সরো—ছি! রাগ কর্ব্বো কেন? ভাল কথাই ত ; তবে আমার অনুরোধ রহিল যে আদপে বিবাহ করিব না,এ পণ করিও না।

মোতিয়া—(স্বগত) সুরেশ! তুমি কি আমাকে ভালবাস?

সরো—যাক্ ভাই ; এখন একটা গান গাও।

মোতিয়া—বৃষ্টি হচ্চে, একটা বৃষ্টির গান গাই?

সরো—তুমি কি উপস্থিত কবি নাকি? সময় দেখে গান রচনা করে গাও নাকি?

মোতিয়া—(স্বগত) সুরেশ, তুমি আমার সঙ্গীতের উৎস। (প্রকাশে) গান না শুনিয়াই এত ব্যাখ্যা?

[গান]

ঢালগো ঢালগো ধারা, ওহে নবজলধর।
নিদাঘে তাপিত ধরা আজি শীতল কর।
স্নেহে গড়ি প্রেমে ভরি, বরষি শীতল বারি,
ফুটাও কুসুমবনে ,ছুটাও প্রেমনির্ঝর।

সরো—তোমার গান প্রতিদিন নূতন নূতন বোধ হয়।

মোতিয়া—আমাকে ভালবাস বলিয়া।

সরো—দাদাকে একদিন একটা গান শুনাও না? আমরা সকলে সেখানে থাকিব ; ক্ষতি কি?

(মোতিয়া নীরব)

সরো—(স্বগত) ওঁর সাম্‌নে গান গায় ; ঠাকুরপোর সাম্‌নে গায় ; কিন্তু দাদাকে লজ্জা করে। এ লজ্জাটা হয়ত অনুরাগের লক্ষণ। দাদার বেহায়াপনা এবং বাড়াবাড়িতে সব মাটি হচ্ছে দেখ্‌ছি। বিলাতের মুখে আগুন।

মোতিয়া—তোমারত বেশ গলা। ২।৪ দিন যা গান শিখেছ, তাতেই বেশ শিখেছ ; ভাল করে শেখনা কেন?

সরো—গলা ত ছাই! তবে আজ বরং একটু শিখি। বৃষ্টির দিন কেউ কোথাও নাই। দরজা বন্ধ করে দাও।

[দরজা বন্ধ করণ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[গৃহের বারান্দায়]

সুরেশ—মোতিয়া, তুমি বিষণ্ণ কেন?

মোতিয়া—(স্বগত) তুমি যদি তা জানিতে! (প্রকাশে) শরীর ভাল নাই।

সুরেশ—তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই।

মোতিয়া—(স্বগত) প্রাণ খুলিয়া প্রাণটা দেখাইতে ইচ্ছা করে ; একটা কথা জিজ্ঞাসার জন্য অনুমতি! (প্রকাশে) কি কথা?

সুরেশ—সাহেবের সঙ্গে নাকি তোমার বিবাহ?

মোতিয়া—(স্বগত) এইবার মরিলাম।

সুরেশ—তুমিও শুনিলাম সম্মত দিয়েছ?

মোতিয়া—(স্বগত) আমাকে কে রক্ষা করিবে?

সুরেশ—তা হ'লে সত্য কথা?

মোতিয়া—দিদি খুব পীড়াপীড়ি কচ্চেন।

সুরেশ—তুমিও মত দিয়াছ?

মোতিয়া—আমি হাঁ কি না কিছুই বলি নাই।

সুরেশ—মৌন থাকিলেই সম্মতি জানা যায়।

মোতিয়া—(স্বগত) হায়, শরীর দেখা যায়, মন দেখা যায় না।

সুরেশ—দাদা বিলাতে পত্র লিখেছেন যে বিবাহে তোমরা দুজনেই রাজি।

মোতিয়া—(কম্পিতকণ্ঠে) আপনি কি বলেন?

সুরেশ—আমার এ বিষয়ে কথা কহিবার অধিকার কি? এতটা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সেইটাই অন্যায় হইয়াছে।

(গমনোদ্যত)

মোতিয়া— স্বগত জগদীশ্বর এখন আমায় একবার বাক্‌শক্তি দাও! (প্রকাশে) একটি কথা—

সুরেশ—(ফিরিয়া) কি?

[অদূরে এন্ মুখার্জির প্রবেশ।

এন্ মুখার্জি—By Gad! Are you here?

[মোতিয়ার বেগে প্রস্থান।

সুরেশ—তোমরা কি বিলাতে কেবল নীচসংসর্গে বাস করিতে?

এন্ মু—What do you mean? Swearing is always allowed in familiar circles.

সুরেশ—ইংরাজীত জাননা ; অথচ ঐ ভাষায় কি কথা না কহিলেই নয়?

এন্ মু—You insult me, Sures. My education was not on the banks of the Hoogli. I came to speak Queen English before my Queen.

সুরেশ—(হো হো করিয়া হাসিয়া) তোমার ইংরাজির পিণ্ডদানে চীনেবাজারের ইংরাজির ভূত উদ্ধার লাভ করিবে।

এন্ মুখার্জি—What! (আস্তিন গুটাইয়া দণ্ডায়মান)

সুরেশ—(বিদ্রূপ করিয়া) মারামারি কর্ব্বে নাকি? এসনা? বিলাতে কত গরু খেয়েছ দেখা যাক্।

এন মু আমি তোমার সঙ্গে ঝগ্ড়া কোত্তে আসিনি। এস আমরা শেকহাণ্ড করি।

সুরেশ—পালাও, আর জ্যাঠামি করিও না।

[বিরক্তি সহকারে প্রস্থান।

এন-মু—সুরেশ আমাকে অপমান কল্লে; কিন্তু মোতিয়া এখানে ছিল না। দি গাল্ ইজ্ অফুলি শাই। কোথা গেল? [প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[যোগেশ বাবুর বৈঠকখানা]

যোগেশ—(হাসিয়া) কি সুরেশ, সাহেবের সঙ্গে নাকি ঝগ্ড়া হয়েছে?

এন-মুখার্জি—না, না; কিসের ঝগ্ড়া? উনি ইংরাজি কথা বেয়ার কত্তে পারেন না; তা আমি বাঙ্গলাতেই কথা কইব।

যোগেশ—তা হলে সুরেশ আর তুমি একসঙ্গেই কলিকাতা যাও না?

এন্-মু—অত্যন্ত আনন্দসহকারে।

সুরেশ—আমি এখন কলিকাতা যাব না; শরীর তেমন ভাল নাই।

যোগেশ—তোমার চেহারা একটু খারাপ হয়েছে বটে। হয়েছে কি?

সুরেশ—ভাল ঘুম হয় না; মাথা ধরা আছেই।

যোগেশ—(উৎকণ্ঠিতভাবে) সেত ভাল কথা নয়। রামা!

(রামার প্রবেশ)

যা, ডাক্তার বাবুকে খবর দে; শীঘ্রই যেন আসেন।

[রামার প্রস্থান।

এন্-মু—উনি অত্যন্ত পড়েন; ওঁর ঘরে কেবল বই ছড়ান। ফিলজফি আর সায়েন্স—ওসব পড়্লে কেবল মাথা ধরে—কিন্তু পে করে না।

যোগেশ সত্যসত্যই তুমি বেশী পড়িও না।

সুরেশ—বেশী পড়া আমার কখনও অভ্যাস নাই।

এন্-মু আজি সকাল বেলাওত কি একটা—"It once might have been" বলিয়া চেঁচিয়ে পড়্ছিলে।

যোগেশ—(সস্নেহে) কি পড়্ছিলে সুরেশ?

সুরেশ ব্রাউনিংএর একটা কবিতা, Youth and Art.

যোগেশ—হাঁ, ও কবিতাটা আমি একদিন পড়েছিলাম; ভাবটা তেমন বুঝিতে পারিলাম না। কবিতাটার তাৎপর্য্য কি?

সুরেশ একটি ছেলে মুরদ্ গড়িত।

এন্-মু সে আবার কি?

যোগেশ—(হাসিয়া) Sculptor ছিল।

এন্-মু ওঃ, আমি দেখ্ছি।

সুরেশ (কম্পিতকণ্ঠে) আর একটি মেয়ে খুব গান গাহিত।

এন্-মু—ঠিক মোতিয়ার মত?

যোগেশ—(গায়ে হাত দিয়া) একটু থাম।

সুরেশ তাদের পরস্পরের প্রতি বড়ই অনুরাগ হইয়াছিল; কিন্তু সাংসারিক বিজ্ঞতার বশবর্ত্তী হইয়া তারা দুজনেই অন্যত্র বিবাহিত হয়। কবি দেখাইয়াছেন যে তাহাদের সাংসারিক সম্পদ যথেষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু দুজনার জীবনই যেন ব্যর্থ হইয়া গেল।

এন্-মু ভাল বুঝিলাম না।

সুরেশ—(হাসিয়া) They failed in life, though they succeeded in the world.

এন্-মু—সেণ্টিমেণ্ট! ইহাতে লোকের খুব ক্ষতি হয়।

সুরেশ সাহেব, তুমি কবিতা পড়?

এন্-মু ফুঃ! উহাতে কোন লাভ নাই।

সুরেশ তুমি কংগ্রেসের সভ্য নয়?

এন্-মু অবশ্য।

সুরেশ তোমাকে একটা ইংরাজী নাম দিতে ইচ্ছা আছে।

এন্-মু কি নাম?

সুরেশ—Mr. Lofty.

এন্-মু ও কিরকম নাম?

সুরেশ যাঁদের খুব উঁচু পায়া হয়, তাঁদের পক্ষে ঐ নামটি খুব লাগসই।

যোগেশ—নগেন,তোমাকে একবার বাড়ীর ভিতর যেতে হবে। এখন চল।

এন-মু এ অঞ্চলের মোকদ্দমাগুলি আমি যাতে পাই, সে চেষ্টা দেখো ; আমি ঢের আমোদের বই কিনেছি।

যোগেশ সুরেশ, তুমি বাড়াতেই থেকো ; ডাক্তার বাবু শীঘ্রই আসবেন। [সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

[অন্তঃপুর]

সরোজিনী মোতিয়া, এবার তুমি আপনার লোক হতে চল্লে।

মোতিয়া এতদিন তাহলে পর ভাবিতে ?

সরো না ভাই, তুমি কার ঘরে পড়িতে, কে জানিত। তোমার দাদা চিঠি লিখেছেন যে তোমার সঙ্গে দাদার বিবাহ হলে তিনি খুব খুসী হবেন। বিনয় বাবু শীঘ্রই দেশে ফিরিবেন। তুমি তাঁদের চিঠি পাওনি ?

মোতিয়া পেয়েছি। (স্বগত) জগদীশ্বর আমাকে রক্ষা কর।

সরো তোমাকে পেয়ে অবধি, আর ছাড়িতে মন হচ্ছিল না ; এবার পরমেশ্বর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

(মোতিয়া নিরুত্তর)

তোমার আর প্রফুল্লতা নাই কেন মোতিয়া ? কথায় কথায় হাসিতে, গান গাহিতে।

মোতিয়া এখন একটু একটু করে বড় হচ্চি, তাই বুদ্ধি ঘন হয়ে আসছে।

সরো তোমার দাদার জন্যে ভাবচ? তিনি ত ভাল আছেন ; মনোরমারও অসুখ আর নাই। শীঘ্রই তাঁরা দেশে ফিরিবেন।

মোতিয়া (স্বগত) প্রভু, অনাথিনীকে রক্ষা কর ; এত কাঁদিলাম, একবার কথা কহিবার শক্তি দিলে না ?

সরো অমন ধারা চুপ করে থেকো না। বরং একটা গান গাও। দেখ কেমন চমৎকার চাঁদ উঠেছে ; এমন সময় মোতিয়ার প্রফুল্লতা নাই ?

মোতিয়া—এই শরৎকালে একটা ভিখারিনীর বর্ষার গান শুনিবে?

সরো যা খুসী গাও। তোমার সব গানই আমার ভাল লাগে।

মোতিয়া [গান]

আশ্রয় চাহে অনাথিনী বালিকা, খোল খোল দুয়ার।
ঘন গুরু গরজনে গগনে জলদ নাদে।
অশনি বরষে বুঝি, ভয়ে যে পরাণ কাঁদে ;
চমকে চপলা ধাঁধি নয়ন আমার।
শীতল পবন বহে, কাঁপে তনু থর থর,
দয়াময়ি মাগো, দীনে দয়া কর,
ভিজিল বসন লাগি বরষা-আসার।
সবে বলে আশ্রয় নাহিক আমার ঘরে,
কোথা যাব, কোথা যাব, বল আমারে ;
করুণা নাহি কি ভবে ? কঠিন সংসার !

সরোজিনী (স্বগত) জলভরা চোকে একি রকম গান ? মোতিয়ার কোন বিশেষ দুঃখের কারণ ঘটে নাই ত ? এখন পীড়াপীড়ি করিব না। অবসর বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিব। আগে যাহা মনে আসিত, খুলিয়া বলিত। বিবাহে আপত্তি নাই ত ? তা হলে কি বলিত না।

মোতিয়া গান ভাল লাগিল না বুঝি ?

সরো—মোতিয়া, তোমার মনের ভিতর প্রবেশ কত্তে পাচ্চি নে ; তোমার মুখ বড় বিষণ্ণ। কি হয়েছে মোতিয়া ?

মোতিয়া (স্বগত) বলিয়া ফেলিনা কেন ? না বলিতে পারিব না। (প্রকাশে) কিছু নয় ; বছরের যেমন ছয় ঋতু থাকে, মানুষেরও তেমন আছে বোধ হয়। আমার এখন বর্ষা। দুদিন পরেই শরৎকাল হবে।

সরোজিনী (স্বগত) বিনয় বাবুর চিঠির কথা দাদাকে এখন লিখিয়া কাজ নাই। (প্রকাশে, মুখে হাতদিয়া) এমন চাঁদ যে আকাশে, সে দেশে কি বর্ষাকাল আছে ?

মোতিয়া আমার রূপ দেখে তুমিই বেশী মুগ্ধ, তুমিই আমাকে বে করনা।

সরো আচ্ছা তাই হবে।

(বিন্দির প্রবেশ)

কিরে বিন্দি ?

বিন্দি মা, আমি বাবার পা টিপ্‌তে যাচ্চি, তুমি এখন ঘরে এস, বাবু ডাক্‌ছেন ?

সরো তুই কি বাবার দাসী ?

মোতিয়া ভুমি এখন যাও, আমার ঘুম পাচ্ছে।

সরো তাড়াতাড়ি নেই; যা বিন্দি যা, আমি যাচ্ছি।

[বিন্দির প্রস্থান।

মোতিয়া তোমার তাড়াতাড়ি নাই, আমার আছে; ভারি ঘুম পাচ্ছে। (শয়ন)

সরো আরো অনেক কথা ছিল। সকাল বেলা এসে ডেকে তুলবো এখন। [প্রস্থান।

মোতিয়া (উঠিয়া, হাত দিয়া চক্ষু ঢাকিয়া) জগদীশ্বর! যাহাকে চাই তাহাকে দাও। এ অনাথিনী বালিকাকে চরণে রাখ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[অপরাহ্ণ। কাননে।]

মোতিয়া আর এ বাগানের দিকে তাকাইতে ইচ্ছা করে না; ফুলে যেন আর গন্ধ নাই; পাতায় সে শোভা নাই। সকলই যেন করুণাহীন কর্কশ। যাঁহার জন্য কাঁদিয়া মরি, তিনি কি আমাকে ভালবাসেন? সাহেবে মন নাই; দিদি তাহা বুঝিয়াছেন। তিনি করুণাময়ী, উদ্ধার করিবেন বলিয়াছেন। কিন্তু একথা তাঁহাকে বলিতে পারিব না। সুরেশ বাবু শুনিলে যদি আমাকে বেহায়া ভাবেন? সে দিনকার সেই কথাগুলি যেন ভালবাসার কথা; সেই রাগের ভিতর বুঝি ভালবাসা ছিল। যত দিন কুহক থাকে ততদিনই ভাল; তার পর ক্ষুদ্র মোতিয়া ফুল আপনি ঝরিয়া পড়িবে। এই কুঞ্জতলে একবার দাড়াই। আজি কুঞ্জ ভরিয়া ফুল ফুটিয়াছে; কিন্তু সেদিনকার সে শোভা আর নাই।

* * * * হৃদয়ং মদীয়ং

অঙ্গারচূর্ণমিতমিব বাথমানমাস্তে।

(চিন্তিতভাবে উপবেশন।

সুরেশ (প্রবেশ করিয়া, স্বগত) একি, মোতিয়া একাকিনী এই কুঞ্জতলে? আজি একবার কথা কহিব। যাহা বলিবার আছে বলিয়া ফেলিব। (অগ্রসর হইয়া) মোতিয়া!

মোতিয়া (বিস্মিতভাবে উঠিয়া) একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম।

সুরেশ একটা কথা বলিব। এইটি শেষ কথা বলিয়া ক্ষমা করিও। তুমি জানন৷ আমি তোমাকে কত ভালবাসি।

মোতিয়া (স্বগত) মা বিশ্বজননি! আজি তোমার ক্ষুদ্র মোতিয়া ফুল দলে দলে ফুটিয়া উঠিল।

সুরেশ তুমি দুদিনের মধ্যে পরের হইবে; এখনও তুমি পরের।

মোতিয়া (অশ্রু মুছিয়া) আমি কি আপনার যোগ্য?

সুরেশ এত বিনয় মোতিয়া!

মোতিয়া আমাকে ভালবাসিতে—তা—

সুরেশ তুমি আমাকে কখনও ভালবাসিতে কি?

মোতিয়া যে তোমার পায়ের ধূলার যোগ্য নহে, সে সে কি করিয়া ভালবাসা জানাইবে?

সুরেশ তবে বিবাহে স্বীকৃত হইলে কেন?

মোতিয়া কে বলিল? আজি বৌদিদিকে সব বলিয়াছি! তিনি বিবাহ হইতে দিবেন না বলিয়াছেন।

সুরেশ (হাত ধরিয়া) মোতিয়া, তবে তুমি আমার হইবে?

মোতিয়া পায়ে রাখিলে।

সুরেশ (চিবুক ধরিয়া) "নৈসর্গিকী সুরভিনঃ কুসুমস্য সিদ্ধা, মূর্দ্ধ্নি স্থিতিঃ"।

মোতিয়া মালিরা আসিতেছে। এখন যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

[যোগেশ বাবুর পাঠাগার।

যোগেশ উপবিষ্ট; সরোজিনীর প্রবেশ।

সরো দেখ তোমাকে একটা নূতন সংবাদ দিতে এলাম।

যোগেশ আমিও তোমাকে সে সংবাদ দিতে পারি। তোমার দাদার বিবাহের নিমন্ত্রণ ত? সে আমিও পাইয়াছি।

সরো সে আবার কি?

যোগেশ এই যে নগেন, চিঠি লিখেছে যে ১৫ই তারিখে অর্থাৎ আজি রাত্রে মিঃ রের মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ। এতে নাকি তার হাইকোর্টের পসারের পক্ষে সুবিধা হবে।

সরো তাইত! এদের মেজাজ বোঝা ভার।

যোগেশ—আমি মনে করেছিলাম তুমি জান; তাই আমাকে বলতে এসেছিলে।

সরো—তা নয়; আমি বল্‌তে এসেছিলাম যে, মোতিয়া আমাদের খাতিরে নিতান্ত চুপ করিয়াছিল, বিবাহে তার আদৌ মন ছিল না।

যোগেশ—তা হলে রক্ষা পাওয়া গিয়াছে। নহিলে সাহেবের ব্যবহারে বিনয়ের কাছে লজ্জিত হতে হত।

সরো—যাক্‌, মানে মানে মান রক্ষা হয়েছে। দাদা কি সেই প্রভাকে বিয়ে কর্ব্বেন নাকি?

যোগেশ—হাঁ।

সরো—দাদার যেমন পছন্দ! অমন আস্ত বিবি ছনিয়ায় দেখিনি।

যোগেশ—তা না হলে আর তোমার দাদার পছন্দ হয়?

সরো—আমরা এখন দুএক ঘণ্টার মধ্যে কলিকাতা যাই কি করে?

যোগেশ—সে ভাবনা কত্তে হবে না। আমাদের যাওয়া সে চায় না বলিয়াইত দেরী করিয়া চিঠি লিখেছে। তুমি যাবে খালি পায়ে, আর আমি যাব ধুতি পরে; তাতে তাদের লজ্জা হয়, অপমান হয়। এখন কিছু উপহার পাঠাইলেই যথেষ্ট।

সরো—খালি পা দেখিলে লজ্জা হয়; আর প্রভা যে সেদিন অদ্ভুত কাপড় পরে প্রায় বুক খুলে সকলের সাম্‌নে বেড়াচ্ছিল?

যোগেশ—সেটা বিলাতি সভ্যতা।

সরো—ছি, ছি, এমন মেয়েও দাদার বউ হবে গা!

যোগেশ—এখন কি পাঠাবে ভাব্‌ছ?

সরো—চল বাড়ীর ভিতর যাই। দেখি কিছু আছে কি না। দাদার বিবাহ দেখিতে পেলাম না, এমনও কপাল! বিলাত দেশটা পুড়ে ছারখার হোক্‌। আমরা জাতি মানিনা বলিলেই হয়, কিন্তু আজি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি যে বিলাত গেলে সত্য সত্যই জাতি যায়।

যোগেশ—এইটি খাসা বলেছ।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[অন্তঃপুর; যোগেশ বাবুর বিশ্রাম গৃহ]

যোগেশ—আচ্ছা ভাই, তুমি কোন্‌ লজ্জায় বিলাত ফিরে এসে ধুতি চাদর নিয়ে ঘরে ফিরলে?

বিনয়—আর তুমি কোন লজ্জায় এতদিন আমার বোনটিকে অবিবাহিতা রেখেছ?

যোগেশ—সেকথা আর বলিও না। বড় ভুল করেছিলাম।

বিনয়—ভুল করেছিলে, না কচ্চ?

যোগেশ—বিলাত থেকে হেঁয়ালি শিখে এসেছ নাকি?

বিনয়—তোমাদের এখানে সোজা কথা যে হেঁয়ালি হয় তাত জানা ছিল না। তোমাদের চোখ্‌ নাই, এটা খুব আশ্চর্য্য।

যোগেশ—কেন বল দেখি?

বিনয়—আমার গিন্নি ত একদিনের মধ্যেই বুঝে ফেলেছিল যে মোতিয়াকে এইখানেই রেখে যেতে হবে।

যোগেশ—ফের হেঁয়ালি।

বিনয়—সুরেশ আর মোতিয়ায় ভারি প্রণয় হয়েছে।

যোগেশ—তাই নাকি?

বিনয়—আমার গিন্নির প্ররোচনায় তোমার গিন্নি এইমাত্র ছজনার কবুল জবাব আদায় করেছেন। এখনি তারা এখানে আস্‌বে। ঐ আস্‌ছে।

(সরোজিনী সুরেশকে ধরিয়া এবং মনোরমা মোতিয়াকে ধরিয়া প্রবেশ)

বিনয়—বাঃ, আসামী সব গ্রেপ্তার!

মনোরমা—তোমরা সব এখন একটু বাহিরে যাও।

[যোগেশ ও বিনয়ের প্রস্থান।

সরো—আচ্ছা ঠাকুরপো, তোমার এ কি কাণ্ড? এতদিন আমাকে কিছু বলনি কেন?

মনো—আর এই মেয়েটার আক্কেল দেখ! আমাদের স্নেহ কাটাতে বসেছে।

সরো—ঠাকুরপো, মাথার অসুখ সেরে গেছে?

মনো—বিবাহের দিন বিবাহ হবে, একবার আমরা যুগলমূর্ত্তি একসঙ্গে করে দাঁড় করাই।

সরো—বিন্দি!

(নেপথ্যে—"কি মা!")

একবার শাঁখ বাজা।

(মনোরমা কর্ত্তৃক মোতিয়া সুরেশের পার্শ্বে নীতা। নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি)

সরো—দেখ ঠাকুরপো, মোতিয়াতে আমার অর্দ্ধেক ভাগ আছে। তুমি একা পূরো পাচ্চনা।

প্রবাসী]

টোড়া দেবমন্দির।

[Indian Press, Allahabad.

বলিয়া মনে হয়। প্রথম প্রথম ইউরোপীয়দের এই ধারণা হইয়াছিল যে টোডারা হয়ত রোমান, গ্রীক অথবা শক জাতীয়; যে সমস্ত শক, গ্রীক প্রভৃতি সময়ে সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিল হয়ত তাহাদেরই এক দল অপর সব দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়া নীলগিরিতে টোডা নাম ধারণ করিয়াছে। কিন্তু মান্দ্রাজের ডাক্তার শর্ট* সাহেব বহু প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে টোডারা দ্রাবিড়জাতীয় লোক। ইহাঁর মতে দ্রাবিড়েরা হিন্দু হইবার পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, টোডাদের বর্ত্তমান সামাজিক রীতিনীতি এবং সভ্যতা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। টোডাদের ভাষা তামিল ও কানাড়ি ভাষার অনুরূপ; কিন্তু ইহাদের উচ্চারণ এত কদর্য্য যে কানাড়ি ও তামিল যাহাদের মাতৃভাষা, তাহারা সহজে ইহাদের কথা বুঝিতে পারে না। কিন্তু একটু পরিশ্রম স্বীকার করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহাদের ভাষা কানাড়ি ও তামিলের অনুরূপ।

টোডাদের ভিতর প্রবাদ আছে যে পূর্ব্বে তাহারা পর্ব্বতের নিম্নে সমতল ভূমিতে বাস করিত, কিন্তু রাবণের উপদ্রবে সমতল ভূমি ছাড়িয়া পর্ব্বতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। অপর একটি কারণে মনে হয়, রাবণের অত্যাচারে নয়, কিন্তু মহীশুরের হিন্দুদিগের অত্যাচারে টোডাদিগকে পর্ব্বতে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

মহিষ টোডাদের নিকট অত্যন্ত পবিত্র জীব। তবে হিন্দুরা যেমন গোজাতিকে পবিত্র মনে করেন এবং গোহত্যা করা পাপ মনে করেন, টোডারা মহিষকে হত্যা করা সেরূপ পাপ মনে করে না।

টোডারা মৃত দেহ দাহ করে। পুরুষেরা গুরুজনের মৃত্যু হইলে মস্তক মুণ্ডন করিয়া সম্মান প্রদর্শন করে। এই প্রথাটি সকল দলের ভিতর প্রচলিত নাই। মৃত্যুর এক বৎসর পর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে তাহার কুটীর খানি দগ্ধ করা হয় এবং তাহার দুই একটি মহিষ বধ করা হয়। পূর্ব্বে তাহার সব মহিষগুলিকেই বধ করা হইত। এখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা বন্ধ করিয়াছেন।

* An account of the tribes on the Neilgherries, by J. Shortt, M.D. etc.

টোডারা নিতান্ত অলস প্রকৃতির লোক। কোন কাজ কর্ম্ম করিতে ভাল বাসে না। কিন্তু আজকাল দ্রুত গতিতে নানা রকম পরিবর্ত্তন হইতেছে, এবং ইউরোপীয় সভ্যতার বিস্তার হইতেছে। তাই বলিয়া প্রকৃত পক্ষে যে টোডাদের উন্নতি হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না।

মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ প্রভৃতি পর্ব্ব উপলক্ষে ইহারা পূর্ব্বে পূর্ব্বে তাহার সমস্ত মহিষ বধ করিত। ইহাদের বিশ্বাস যে হত মহিষ পরলোকে মৃত ব্যক্তির নিকট যায়। আজকাল সমস্ত মহিষ বধ না করিয়া এক আধটি বধ করিয়া থাকে মাত্র। এরূপে মহিষ হত্যা করা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে ইহারা মহিষকে খুব সম্মান করে। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় মাঠ হইতে মহিষ ঘরে ফিরিবার সময় তাহাদিগকে নমস্কার করিতে হয়। মহিষের যত্ন করা এবং দুগ্ধ দোহন প্রভৃতি কার্য্য পুরোহিতকে করিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই মহিষসেবক পুরোহিতকে টোডা ভাষায় "পূজারি" বলে। টোডাদের মহিষ অত্যন্ত দুর্দান্ত এবং টোডাদের "মন্ত্রের" নিকট মাঠে ঘাটে স্বাধীনভাবে চরিয়া বেড়ায়। এই সব মহিষের বেশী নিকটে গেলে ইহারা টোডা ব্যতীত অপর লোককে আক্রমণ করে। মহীশুর রাজ্যে প্রবাদ আছে যে মহীশুর প্রদেশ পূর্ব্বে মহিষাসুরের অধীন ছিল। দেবী দশভুজা মহীশুরের রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষের উপাসনায় সন্তুষ্ট হইয়া মহিষাসুরকে বধ করেন এবং রাজ্য রাজাকে অর্পণ করেন। অদ্যাবধি মহীশুরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "মহিষাসুরমর্দ্দিনী" এবং "মহিষাসুর" হইতে রাজ্যের বর্ত্তমান নাম "মহীশুর"।

টোডাদের প্রবাদের সহিত এই বিষয়ে কতকটা মিল আছে। রাবণ রাজাও দশভুজার উপাসক ছিল এবং তাঁহারই কৃপায় সর্ব্ববিজয়ী হইয়াছিল। টোডারা হয়ত কালে মহীশুরের রাজার নাম ভুলিয়া গিয়াছিল; পরে রাবণ খুব বড় রাজা ছিল এবং দশভুজার উপাসক ছিল জানিতে পারিয়া রাবণকেই তাহাদের নিগ্রহকর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে মহীশুরের প্রবাদাদির সহিত সংলগ্ন করিয়া দেখিলে ইহাই নিশ্চিত বোধ হয় যে টোডারাই মহীশুরের মহিষাসুর ছিল।

টোডাদের ভিতর বহুপত্যাত্মক বিবাহ প্রচলিত। বড় ভাই বিবাহ করিলে তাহার স্ত্রী সব ভাইয়ের সাধারণ ভার্য্যা

হয়। আবার স্ত্রীর অপর ভগ্নী থাকিলে তাহারাও এই ভাইদের সাধারণ ভার্য্যা হয়। অর্থাৎ যদি স্বামীরা তিন ভাই হয় এবং স্ত্রীর আরও দুই বোন থাকে, তাহা হইলে এই তিন ভ্রাতার তিন স্ত্রী হইবে, কিন্তু প্রত্যেক ভ্রাতারই প্রত্যেক স্ত্রীতে স্বত্ব থাকিবে।

সন্তানের পিতৃত্ব নির্ণয়ের কৌশল অদ্ভুত। প্রথম পুত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার, দ্বিতীয় পুত্র দ্বিতীয় ভ্রাতার, ইত্যাদি, নিয়ম এইরূপ। টোডারা সন্তানকে খুব ভাল বাসে এবং যত্ন করে। শিশুদিগকে ইহারা পবিত্র মনে করে। শিশু এবং "পূজারি" ব্যতীত অপর কেহ যখন তখন মহিষ দোহনের স্থানে যাইতে পারে না। মহিষ দোহনের স্থানের নাম মন্দির বা দেবালয়।

টোডাদের কুটীরগুলির একটা মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার। ভিতরে তিন চারি ভ্রাতা এবং তাহাদের পরিবারবর্গ বাস করে এবং কুটীরের ভিতর রান্নাও করে; সুতরাং কুটীরের ভিতর ভয়ানক অপরিষ্কার।

টোডারা স্নান বড় করে না। তার পর, শরীরে ঘী মাখিবার প্রথা প্রচলিত আছে। ঘী শীঘ্রই পচিয়া যায়; এবং টোডার শরীর হইতে ভয়ানক দুর্গন্ধ নির্গত হয়।

টোডাদের প্রধান দেবতা "হিরিয়া" বা ঘণ্টা। এই ঘণ্টা দলের প্রধান মহিষের গলায় বন্ধন করা হয়। ইহাদের পুরোহিত দুই জাতীয়: "পালাল" ও "দেবলাল"। পালালের খুব মান। যে কোন টোডা পালাল হইতে পারে। পালাল হইতে হইলে কয়েকদিন জঙ্গলে উপবাস এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান করিতে হয়। দেবলাল পালাল হইতে নিম্নশ্রেণীস্থ। "দেবলালের" কার্য্য "পালালের" মহিষের পরিচর্য্যা প্রভৃতি। ইহা ব্যতীত প্রত্যেক "বসতি" বা "মণ্ডে"ই পূজারি আছে। মহিষের পূজার সময় তাহার সম্মুখে দুগ্ধ অর্ঘ দিতে হয়।

নীলগিরিতে বসন্ত একটি প্রধান রোগ। তা ছাড়া চক্ষুরোগের খুব প্রাদুর্ভাব। বহু লোক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরে একত্রে ধুঁয়ার মধ্যে বাস করে বলিয়া এই রোগটার সৃষ্টি হইয়াছে।

টোডাদের বিবাহ প্রথা হইতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে টোডা স্ত্রীলোকের সতীত্বজ্ঞান নাই। জঘন্যচরিত্র ইংরেজগণ আজকাল টোডাদিগের ভিতর নানারকমের কুৎসিৎ ব্যাধি আনয়ন করিয়াছে। টোডারা এই সব ব্যাধির চিকিৎসা জানেনা, সুতরাং ইহার ফল বিষময় হইতেছে। আজ কাল ইহারা আবার পানদোষও অভ্যাস করিতেছে।

গত দুইবার ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা গণনা করা হয়। কিন্তু ঐ সময় টোডারা নিজনিজ 'মণ্ড' বা বসতি ছাড়িয়া অন্যত্র মহিষ চরাইতে যায়। এইজন্য তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ, তাহারা এই সময়ে একস্থানে দুই চারি দিনের বেশী থাকে না; এবং এরূপ দুরধিগম্য প্রদেশের বিশেষজ্ঞানসম্পন্ন এত অধিক গণনাকারীও পাওয়া যায় না যে টোডাদের সমুদয় আড্ডার লোকসংখ্যা একই সময়ে নির্ণীত হইতে পারে। আদমসুমারির নিকটতম যে সময়ে টোডারা মণ্ডে থাকে তাহা ১৫ই ডিসেম্বর। এই জন্য গত আদমসুমারিতে ১লা ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া টোডাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়, এবং এই তালিকা ১৫ই তারিখে গণনাপত্রে মিলাইয়া শুধরাইয়া লওয়া হয়। নীচের তালিকায় গত চারি আদমসুমারি অনুসারে টোডাদের সংখ্যা দেওয়া গেল।

সাল	পুরুষ	স্ত্রীলোক	মোট
১৮৭১	৪০৫	২৮৮	৬৯৩
১৮৮১	?	?	৬৭৫
১৮৯১	৪২৭	৩১২	৭৩৯
১৯০১	৪২১	৩৩০	৭৫১

নিম্নে টোডাদের ও একটি গানের নমুনা দিতেছি

"কেহ গামোর, এ গামোর (মহিষের নাম) ;
সন্ধ্যা আসিতেছে, মহিষেরা আসিতেছে,
বাছুরগুলিও ফিরিয়া আসিতেছে,
মহিষেরা নমস্কৃত হইয়াছে,
গোয়ালা বাছুরগুলিকে ঠেঙ্গাইতেছে,
পুরুষমহিষকে দুগ্ধ অর্ঘ দেওয়া হইয়াছে,
আঁধার হইয়া আসিতেছে।"

মহীশুরের মহারাণীর উতকামন্দ আগমন উপলক্ষে—

"আমরা সব টোডা তাঁহার বাড়ী
গিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করি।
তিনি আমাদিগকে পনর টাকা দেন।
তিনি আমাদের মেয়েদের কাছে আসিয়া
তাহাদের সহিত কথা বলেন।
তিনি আমাদিগকে কাপড় দেন।
তাহার পরদিন আমরা [তাঁর কাছে] দুধ নিয়ে
যাই, সকালে আট ও সন্ধ্যায় চারি বোতল।

তিনি মাসে মাসে আমাদের দুধের দাম দেন।
তিনি মহীশুরে ফিরিয়া যান, এবং তৎকালে আমরা সারি বাঁধিয়া তাঁহার সম্মুখে দাড়াই।
তিনি আমাদিগকে ভেট, কাপড় ও তিনটি টাকা দেন।
মেয়েরা তাহাদের চুল কাটে এবং তাঁহার সম্মুখে দাড়ায়।"

টোডা বিবাহবাসর সঙ্গীত—

"বালকবালিকারা গান করিতেছে!
তাহারা অনেক টাকা খরচ করিতেছে।
কন্যাকে তাহার বাবা পাঁচটি মহিষ দিতেছেন।
স্বামী স্ত্রীকে বলিতেছেন যে তাহাকে তাহার চুল কাটিতে হইবে।
যদি তাহার চুল কোঁকড়া হয়, তাহাহইলে সকলে আনন্দিত হইবে।"

ইত্যাদি।*

শ্রীসতীশচন্দ্র মৌলিক।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

১—নাট্যশাস্ত্র।

ভারতীয় নাটাশালার ন্যায় অতি পুরাতন নাটাশালা অন্য কোন দেশে বর্ত্তমান ছিল না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—ভারতীয় নাটাশালার অবনতি আরম্ভ হইবার সময়ে ইউরোপীয় নাটাশালার অভ্যুদয় হয়। সুতরাং ভারতীয় নাটাশালার অতিপ্রাচীনত্ব এখন সর্ব্ববাদিসম্মত। কোন্ পুরাকালে এই অতিপুরাতন নাট্যকলার অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা আর নিঃসন্দেহে নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা নাই। ইতিহাসের অভাবে অন্যান্য পুরাতত্ত্বের ন্যায় নাট্যতত্ত্বও বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখন এদেশে যে সকল নাটাশালা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আধুনিক ইউরোপীয় অনুকরণে অতি অল্প দিন হইল অভ্যুদিত হইয়াছে; তাহাকে স্বদেশের পুরাতন প্রিয় পদার্থ বলিয়া অভ্যর্থনা করা যায় না!

সংস্কৃত সাহিত্যে নাটাশাস্ত্র "পঞ্চম বেদ" বলিয়া পরিচিত। ইহাই ভারতীয় নাট্যকলার প্রাচীনত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পুরাকালে দৃশ্যশ্রব্যভেদে কাব্যশাস্ত্র দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছিল। সাধুকাব্যনিসেবনে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষলাভের সহায়তা হইবে বলিয়া, আর্য্যসমাজে কাব্যের সমাদর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বেশভূষা ও অঙ্গভঙ্গি সহকারে কাব্যকথার অভিনয় করিয়া লোকব্যবহার প্রত্যক্ষবৎ প্রদর্শিত করিবার জন্য দৃশ্যকাব্যের অভ্যুদয় হয়; এবং তাহাকে যথাযথরূপে লোকসমাজে অভিব্যক্ত করিবার জন্যই নাটাশালা সংস্থাপিত হয়। তাহার উৎপত্তি, নির্ম্মাণকৌশল ও অভিনয়প্রণালী যে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারই নাম নাটাশাস্ত্র—তাহার "পঞ্চম বেদের" অন্তর্গত বলিয়া সমাদৃত।

মহামুনি ভরত এই নাট্যবেদ নরলোকে প্রকাশিত করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ভরতকৃত নাটাশাস্ত্র নামক পুরাতন গ্রন্থ সুদুর্ল্লভ হইলেও, উত্তরকালে সঙ্গীত-দামোদর, সাহিত্যদর্পণাদি যে সকল গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছিল, তাহাতে ভরতকৃত নাটাশাস্ত্রের বহু শ্লোক উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগের অভিধানেও নাট্যাচার্য্যগণ "ভরতপুত্র" নামে পরিচিত। এক্ষণে বোম্বাই নগর হইতে ভরতপ্রণীত নাটাশাস্ত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া আমাদিগকে আদিগ্রন্থের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ একবার "ভারতী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে নাটাশাস্ত্রোক্ত বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্য সংকলিত হওয়া আবশ্যক।

"দেবদানবগন্ধর্ব্বৈ রক্ষোযক্ষমহোরগৈঃ।
জম্বুদ্বীপে সমাক্রান্তে লোকপালপ্রতিষ্ঠিতে॥
মহেন্দ্রপ্রমুখৈর্দ্দেবৈরুক্তঃ কিল পিতামহঃ।
ক্রীড়নীয়কমিচ্ছামো দৃশ্যং শ্রব্যঞ্চ যদ্ভবেৎ॥
ন চ বেদব্যবহারোঽয়ং সংশ্রাব্যঃ শূদ্রজাতিষু।
তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ব্ববর্ণিকম্॥
এবমস্ত্বিতি তানুক্ত্বা দেবরাজং বিসৃজ্য চ।
সস্মার চতুরো বেদান্ যোগমাস্থায় তত্ত্ববিৎ॥
ধর্ম্ম্যমর্থ্যং যশস্যঞ্চ সোপদেশং সসংগ্রহং।
ভবিষ্যতশ্চ লোকস্য সর্ব্বকর্ম্মানুদর্শকম্॥
সর্ব্বশাস্ত্রার্থসম্পন্নং সর্ব্বশিল্পপ্রবর্ত্তকং।
নাট্যাখ্যং পঞ্চমং বেদং সেতিহাসং করোম্যহম্॥"

নাট্যোৎপত্তি প্রসঙ্গে মহামুনি ভরত লিখিয়াছেন যে, বেদশাস্ত্র দ্বিজাতির বিশেষ অধিকারভুক্ত বলিয়া, ইন্দ্রাদি

*From *Madras Government Museum Bulletin*, Vol. iv, No 1: Anthropology.

দুজন টোডা বালক।

টোডা বালিকা।
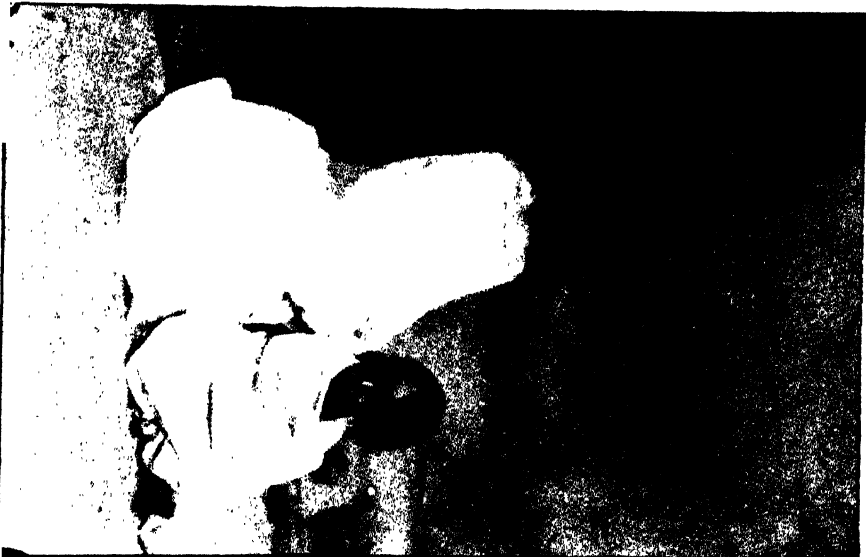
প্রবাসী]
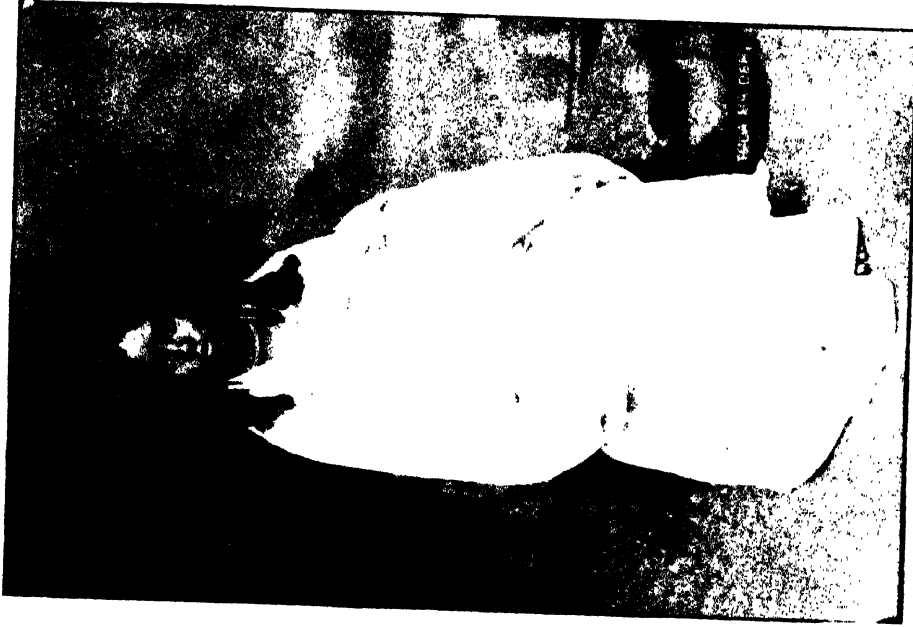
[Indian Press, Allahabad.

টোডা কুমারী।

টোডা মাতা ও শিশু।

[Indian Press, Allahabad.

দেবগণের অনুরোধে বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা যোগযুক্ত হইয়া লোক-শিক্ষার্থ নাট্যাখ্য সার্ব্ববর্ণিক পঞ্চম বেদ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার সারভাগ চতুর্ব্বেদ হইতেই গৃহীত হইয়াছিল। যথা ;—

"জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্ব্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্ব্বণাদপি।"

ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্য, সাম হইতে সংগীত, যজু হইতে অভিনয় ও অথর্ব্ব হইতে রস সংগৃহীত হইয়া নাট্যাখ্য পঞ্চমবেদ গঠিত হইয়া মহামুনি ভরতপ্রসাদে নরলোকে প্রচারিত হয়। কিন্তু ভরতবিরচিত নাট্যশাস্ত্রে অন্যান্য প্রবীণতর নাট্যশাস্ত্রের উল্লেখ ও মত সংকলন দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়,—ভরতমুনির পূর্ব্বেও নাট্যশাস্ত্র প্রচলিত ছিল, হয়ত সর্ব্বত্র সুপরিজ্ঞাত ছিল না।

দৃশ্যকাব্য অভিনয়াত্মক। সুতরাং অভিনয়ের উপযোগী স্থান, বেশভূষা প্রভৃতি একালের ন্যায় সেকালেও প্রচলিত হইয়াছিল। নাট্যশাস্ত্রে তাহার সমস্ত ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। অভিনয়গৃহের নাম নাট্যশালা, নাট্যমণ্ডপ, নাট্যমন্দির বা প্রেক্ষাগৃহ ; তথায় অভিনেতৃগণের বেশ-ভূষার জন্য নেপথ্য, অভিনয়সাধনার্থ রঙ্গভূমি ও দর্শকগণের জন্য প্রেক্ষা বা উপবেশনস্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। একালের ন্যায় সেকালে কোন সাধারণ নাট্যশালা ছিল কি না তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নাট্যশালা রাজবাটীর অংশবিশেষে সংস্থাপিত ছিল। তাহা সাধারণতঃ প্রাসাদ-দ্বারদেশেই নির্ম্মিত হইত। যথা গরুড়পুরাণে,—

"নাট্যশালা চ কর্ত্তব্যা দ্বারদেশসমাশ্রয়া।"

এই নাট্যশালার নির্ম্মাণপ্রণালী কিরূপ ছিল, ভরতবিরচিত নাট্যশাস্ত্রে তাহারও বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নাট্যশালায় রাজাপ্রজা সকলেরই অভিনয়দর্শনোপযোগী যথাযোগ্য স্থান ও আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল ; তাহার সম্মুখে রঙ্গালয়ের রঙ্গদ্বার যবনিকাপরিবৃত হইয়া অভিনয়ারম্ভে দর্শকগণের কৌতূহল বর্দ্ধন করিত। রঙ্গস্থলের সম্মুখভাগ বিচিত্র দারুকর্ম্মে সুশোভিত হইত। ভিত্তি ও দ্বারাদির লেপকর্ম্ম সমাপ্ত হইলে তাহা নানা চিত্রে সুশোভিত হইত ; স্তম্ভ,ভিত্তি প্রভৃতি ইষ্টক ও দারুযোগে নির্ম্মিত হইত; তাহাতে পটী আপটী প্রভৃতি দৃশ্যপট সুসজ্জিত থাকিত। যাহারা পটচিত্রে সুদক্ষ, তাহাদিগকে "পুস্তকার" বলিত : পট তৎ-কালে "পুস্ত" নামেই পরিচিত ছিল। এই সকল পটে সমুদ্র, পর্ব্বত, আকাশ, দেবলোক, নাগগন্ধর্ব্বলোক, বায়ুমণ্ডলের বিবিধ স্তরবিন্যস্ত নক্ষত্রলোক, বন উপবন, পশুপক্ষী ও নর-নারী কিরূপ সুচিত্রিত হইত, চিত্রপ্রদর্শনপ্রসঙ্গে মহাকবি ভবভূতি "উত্তররামচরিতে" তাহার আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে বিবিধ নট পরস্পরের অসমক্ষে অভি-নয় করিবার প্রথা অনেক নাটকেই দেখিতে পাওয়া যায় ; এক দৃশ্যে তিরস্করিণীসাহায্যে রঙ্গস্থল যে নানাভাগে বিভক্ত হইত তাহা এতদ্দ্বারা সুব্যক্ত হইতেছে।

যাত্রাগানে যেমন প্রথমে "আখ্ড়াই" করিয়া পরে পালা আরম্ভ করে, নাটকাভিনয়েও সেইরূপ আখ্ড়াই করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহারই নাম "পূর্ব্বরঙ্গ"। তাহার সহিত অভিনেতব্য নাটকের আখ্যানবস্তুর কোন সংস্রব ছিল না। এই পূর্ব্বরঙ্গ অতি পুরাকালে বাহুল্যরূপে অনুষ্ঠিত হইত ; তজ্জন্য প্রথম "আতোদ্য" অর্থাৎ বাদ্যোদ্যম, পরে নৃত্য ও দেব ঋষি রাজার সম্ভ্রমসূচক গীত এবং স্তোত্রাদি পঠিত হইত। পূর্ব্বরঙ্গের বাহুল্য দর্শকগণের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিত ; কালে তাহার আতিশয্যে দর্শকবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা দেখিয়া নাট্যাচার্য্যগণ পূর্ব্বরঙ্গ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত করিয়া প্রস্তাবনার আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রচলিত পুরাতন নাটকাদির মধ্যে "মৃচ্ছকটিক" নামক প্রকরণে প্রাচীন পূর্ব্বরঙ্গের আভাস আছে। মৃচ্ছকটিকের সূত্রধার রঙ্গপ্রবে-শের পর কোন সঙ্গীত না করিয়া বলিতেছেন,—"সঙ্গীত করা ত শেষ হইয়াছে, সুদীর্ঘকাল সঙ্গীতোপাসনা বশতঃ ক্ষুধায় নয়নতারকা বিশুষ্ক পদ্মবীজের ন্যায় খট্ খট্ করিয়া উঠিতেছে" ইত্যাদি। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মৃচ্ছকটিক রচিত হইবার সময় পর্য্যন্তও পূর্ব্বরঙ্গের আতিশয্য ছিল। অন্যান্য নাটকে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। সূত্রধারের এই উক্তি মৃচ্ছকটিকের সমধিক প্রাচীনত্বের একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

পূর্ব্বরঙ্গেই নান্দীপাঠ প্রচলিত ছিল। তাহা তানলয়-সহকারে গীত হইত। সূত্রধার এই কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাহার পর "স্থাপক" নামক অন্য নট আসিয়া প্রস্তাবনা নামক নাট্যসূচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। পরবর্ত্তী যুগে এই প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া নান্দীপাঠ সমাপ্ত হইবার পরেই সূত্রধারের

প্রবেশ নির্দ্দিষ্ট হয়। তদনুসারে নাটকাদিতে "নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ" পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক এই প্রণালী অনুসরণ করিলে কে নান্দী পাঠ করিবে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়ে। কারণ, নাটকে নান্দী কাহারও উক্তি বা সঙ্গীত বলিয়া লিখিত নাই। নাট্যশাস্ত্রের ঐতিহাসিক তথ্য বিলুপ্ত হওয়ায়, সংস্কৃত নাটকের নান্দী কাহার পাঠ্য, তদ্বিষয়ে উত্তরকালে অনেক বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। ভরতমুনি সূত্রধারকেই নান্দীপাঠের ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছেন; কারণ, তখন নান্দীপাঠ সমাপ্ত হইলে স্থাপক নামক অন্য নট আসিয়া প্রস্তাবনা আরম্ভ করিতেন। স্থাপকের আগমন রহিত হওয়ার পর সূত্রধার আসিয়া প্রথমে নান্দীপাঠ করিয়া তদন্তে কথা আরম্ভ করিতেন। সময় সংক্ষেপ করিবার জন্যই এই প্রণালী প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

বলা বাহুল্য যে, অভিনয়ক্রিয়া সমুচিত শিক্ষাসাপেক্ষ বলিয়া উপযুক্ত অভিনয়শিক্ষকের প্রয়োজন হইত। এই অভিনয়শিক্ষক "নাট্যাচার্য্য" নামে পরিচিত ছিলেন। উত্তর কালে নট নামে নিম্নশ্রেণীর একটি স্বতন্ত্র জাতি গঠিত হইয়াছিল; তাহারা সমাজে সমাদর লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু পুরাকালের নটগণ উচ্চকুলোদ্ভব সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, এবং নাট্যাচার্য্যগণের শাস্ত্রাধ্যাপকের ন্যায় প্রভূত সম্মান পরিলক্ষিত হইত। "মালবিকাগ্নিমিত্রে" তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজার নিকট নাট্যাচার্য্যগণ কিরূপ সমাদর ও আসন লাভ করিতেন, গণদাস ও হরদত্ত নামক নাট্যাচার্য্যদ্বয় তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

ভরতপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রে নাট্যাচার্য্যের যে সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট। নাট্যাচার্য্যই সূত্রধার হইতেন। সূত্রধার শাস্ত্রে ও শিক্ষাদানে সুপণ্ডিত না হইলে নাট্যাচার্য্যপদে আরূঢ় হইতে পারিতেন না। নাট্যমণ্ডপে নাট্যাচার্য্যই সর্ব্বকার্য্যের নিয়ামক সকলের প্রভু। অন্যান্য নটগণ তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তন করিতেন। সেকালের নাট্যাচার্য্যগণ কিরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহার পরিচয় দিবার জন্য ভরতবিরচিত নাট্যশাস্ত্র হইতে সূত্রধারগুণ উদ্ধৃত হইল। যথা—

"চতুরো নাট্যকুশলঃ শাস্ত্রনীতিপ্রতিষ্ঠিতঃ।
নানা পাষণ্ডকার্য্যজ্ঞো নীতিশাস্ত্রার্থবিত্তথা॥
বেশ্যোপচারনিপুণঃ কাব্যশাস্ত্রবিচক্ষণঃ।
নানাগতিপ্রচারজ্ঞো রসভাববিশারদঃ॥
নাট্যপ্রয়োগকুশলো নানাশিল্পসমন্বিতঃ।
ছন্দোবিধানতত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিচক্ষণঃ॥
গ্রহনক্ষত্রতত্ত্বজ্ঞো দেশব্যাহারতত্ত্ববিৎ।
পৃথিবীদ্বীপবর্ষাণাং পর্ব্বতানাং জনস্য চ॥
প্রমাণচারকজ্ঞশ্চ রাজবংশপ্রসূতিবিৎ।
শ্রোতা শাস্ত্রার্থকাব্যানাং শ্রুত্বা চৈবাবধারকঃ॥
অবধার্য্য প্রয়োক্তা চ শাস্ত্রস্যৈবোপদেশনে।
এবং গুণস্তথাচার্য্যঃ সূত্রধারো বিধীয়তে॥"

এরূপ গুণগণান্বিত নাট্যাচার্য্যের সহিত আধুনিক নাট্যাচার্য্যগণের তুলনা হইতে পারে না বলিয়াই তাঁহারা নাট্যাচার্য্যের পুরাতন সমাদর লাভ করিতে সক্ষম হন নাই। নাট্যাচার্য্যগণই সেকালে গীত বাদ্য নৃত্য ও অভিনয়ের শিক্ষক ছিলেন। কবিগণের সহিত তাঁহাদের সখ্য ছিল। অভিনয়ে স্ত্রীপুরুষ নিযুক্ত হইত; কিন্তু স্ত্রীলোকদিগকেও নাট্যাচার্য্যের নিকট নৃত্যশিক্ষা করিতে হইত। "মালবিকাগ্নিমিত্রে" ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মালবিকা নাট্যাচার্য্য গণদাসের নিকট "চলিত" নামক নৃত্যশিক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত পুরমহিলারাও যে নাট্যাচার্য্যগণের নিকট নৃত্যগীত ও অভিনয়াত্মক হাব ভাব শিক্ষার্থ প্রেরিত হইতেন, ইহাই সেকালের নাট্যাচার্য্যগণের সুবিমল চরিত্রের প্রচুর প্রমাণ। কোন কোন নাটকে পুরুষেও স্ত্রীলোকের অভিনয় করিবার প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন ভবভূতিপ্রণীত "মালতীমাধবের" প্রস্তাবনায় সূত্রধার ও নট অভিনয় করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ সূত্রধার "কামন্দকী" হইলেন, এবং নটও বলিয়া উঠিলেন, "এই দেখ আমিও অবলোকিতা সাজিলাম।" স্থলবিশেষে এরূপ হইলেও, সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেই স্ত্রীলোকের অভিনয় করিতেন।

যথোপযুক্ত পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনে নাট্যাচার্য্যগণকে বিলক্ষণ আয়াসস্বীকার করিতে হইত। বিদূষক নির্ব্বাচনে নটের স্বাভাবিক আকৃতি প্রকৃতির বিচার করাও আবশ্যক হইত। কিরূপ লোককে বিদূষক নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য, ভরতমুনি তাহার এইরূপ আভাস দিয়া গিয়াছেন; যথা----

"বামনো দন্তুরঃ কুব্জো দ্বিজন্মা বিকৃতাননঃ।
খলতিঃ পিঙ্গলাক্ষশ্চ স বিধেয়ো বিদূষকঃ॥"

এরূপ পরিহাসাস্পদ আকৃতিবিশিষ্ট অভিনয়কুশল পাত্র প্রাপ্ত হওয়া সহজ নহে। তজ্জন্য নানাদিগ্দেশ হইতে যথাযোগ্য ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিতে হইত। প্রায় পূর্ব্বদেশের লোকেই বিদূষক সাজিবার জন্য নিযুক্ত হইতেন।

পাত্রনির্ব্বাচনের ন্যায় বসন ভূষণ ও অস্ত্রাদি নির্ব্বাচনেও দেশ কাল ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতে হইত। এখনকার রঙ্গালয়ে বসন নির্ব্বাচনে কোনরূপ দেশকালজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। নাটকের পাত্রপাত্রীগণ যে কালের লোক, সেই কালোচিত বসন ভূষা ব্যবহৃত না হইলে, অভিনয়ের স্বভাবানুকরণমাহাত্ম্য নষ্ট হইয়া যায়। তজ্জন্য সেকালের নাট্যাচার্য্যগণকে এ বিষয়ে সবিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত। কেবল তাহাই নহে;—বসনের বর্ণ নির্ব্বাচনেও বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হইত। সকল বর্ণের পরিধেয় সকল রসের অনুকূল হইতে পারে না। সুতরাং রসের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বসনের বর্ণ বিচার করা আবশ্যক হইত।

"শ্যামো ভবতি শৃঙ্গারঃ সিতো হাস্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কপোতঃ করুণশ্চৈব রক্তো রৌদ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
গৌরো বীরস্তু বিজ্ঞেয়ঃ কৃষ্ণশ্চৈব ভয়ানকঃ।
নীলবর্ণস্তু বীভৎসঃ পীতশ্চৈবাদ্ভুতঃ স্মৃতঃ॥"

অভিনয়ের অনুকূল অঙ্গরাগ প্রকাশিত করিবার জন্য নানাপ্রকার বর্ণচূর্ণ ব্যবহৃত হইত। কোন কোন নাটকের প্রস্তাবনায় নেপথ্য-বর্ণনায় দেখা যায়, তথায় পার্শ্বচরগণ বিবিধ বর্ণপেষণে নিযুক্ত। এই সকল বর্ণের মধ্যে হরিতালই প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তজ্জন্য অভিধানে হরিতাল "নটমণ্ডন" ও "নটভূষণ" নামে অদ্যাপি উল্লিখিত হইয়া থাকে; "রত্নমালায়" ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

সেকালের নাট্যাভিনয় উৎসবমধ্যে পরিগণিত ছিল; এবং জাতীয় মহোৎসবে বা বিবাহাদি মাঙ্গলিক ব্যাপারে, অভিনয় একটি পরিচিত উৎসবাঙ্গ বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল। প্রচলিত নাটকাদিতে দেখা যায়, এই সকল উৎসব উপলক্ষে নূতন নাটক অভিনীত হইত,—তদুপলক্ষে অনেক নূতন কবি খ্যাতিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। মহাকবি ভবভূতিবিরচিত মহাবীরচরিত, উত্তররামচরিত এবং মালতীমাধব ভগবান্ কালপ্রিয়নাথের মহোৎসব উপলক্ষে প্রথম অভিনীত হওয়ার পরিচয় তত্তৎ নাটকের প্রস্তাবনায় দেখিতে পাওয়া যায়। রত্নাবলী শ্রীহর্ষদেবের মদনমহোৎসবে প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। এই সকল অভিনয়ে নানা সামন্ত নরপতি, রাজপদোপজীবী অমাত্যবর্গ ও বিবিধ বিদ্বন্মণ্ডলী দর্শকরূপে উপস্থিত থাকিতেন। পুরুষের কথা দূরে থাকুক, সেকালের পণ্ডিতা মহিলামণ্ডলীও নাট্যশাস্ত্রে কতদূর পারদর্শিনী ছিলেন, "মালবিকাগ্নিমিত্রে" তাহার বিলক্ষণ আভাস পাওয়া যায়। হরদত্ত ও গণদাসের মধ্যে নাট্যশাস্ত্র ও অভিনয় শিক্ষাদানে কে যোগ্যতর, তাহার বিচারভার একজন মহিলার উপরেই অর্পিত হইয়াছে।

নাট্যশাস্ত্রের আবির্ভাবকালের ন্যায় তিরোভাবকালের নির্ণয় করাও কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীন রাজার অনুকম্পাবলে নাট্যাভিনয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। তাঁহারা সমুচিত বেতন দান করিয়া নাট্যাচার্য্যগণকে অভিনয় সম্পাদনে উৎসাহিত করিতেন। কোন কোন স্থলে একের অধিক নাট্যাচার্য্যও রাজানুগ্রহে প্রতিপালিত হইতেন। তাঁহাদের অধঃপতনের সঙ্গেসঙ্গেই যে নাট্যকলার অধঃপতন সাধিত হইয়াছিল, তাহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। "বেণীসংহার" নাটকের শেষে এইরূপ একটি করুণ কবিতা দেখিতে পাওয়া যায়। যথা;—

"কাব্যালাপসুভাষিতব্যসনিনস্তে রাজহংসাগতা
স্তা গোষ্ঠ্যক্ষয়মাগতা গুণলবশ্লাঘা ন বাচঃ সতাং।
সালংকাররসপ্রসন্নমধুরাকারাঃ কবীনাং গিরঃ
প্রাপ্তানাশময়ং তু ভূমিবলয়ে জীয়াৎ প্রবন্ধো মহান্॥"

রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজানুপালিত সুকুমার সাহিত্যের সঙ্গে নাট্যকলাও ভাসিয়া গিয়াছিল। নাট্যাচার্য্যগণ উচ্চ আদর্শ হইতে ক্রমশঃ স্খলিত হইয়া উদরান্নের প্রলোভনে নটজাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যানুরাগ তিরোহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষানিবদ্ধ যাত্রাদির অভ্যুদয় হইয়া প্রাচীন নাট্যকলা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এখন আর তাহাকে সঞ্জীবিত করিবার সম্ভাবনা নাই। তাহা চিরদিনের মত ইতিহাসের জীর্ণমন্দিরে আবর্জ্জনারাশির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সে কাব্যালাপসুভাষিতব্যসনী রাজহংসকুল যে পথে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, নাট্যকলাও সেই পথেই অন্তর্ধান করিয়াছে! এখন কেবল তাহার সুখস্মৃতিই

সেকালের সঙ্গে একালকে একসূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহাও কালবশে কোথায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, কে বলিতে পারে?

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

ভাষার উৎপত্তি।

ইউরোপের ভাষাতত্ত্ববিদ এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতেরা বলেন, পরিজ্ঞাত পৃথিবীতে প্রায় ৫৮৩ প্রকার ভাষার আবিষ্কার হইয়াছে; ইহার মধ্যে প্রায় ৩৭১ প্রকার ভাষায় তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ (বাইবেল) অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে। এই ৩৭১ প্রকার ভাষাকে তাঁহারা "সভ্যজাতির ভাষা" বলিয়া গণ্য করেন এবং অবশিষ্ট ভাষাগুলি তাঁহাদের নিকটে অসভ্য বা অৰ্দ্ধসভ্য জাতির ভাষা বলিয়া পরিগণিত। ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই ৩৭১ প্রকার ভাষাকে পঞ্চশ্রেণীতে বিভক্ত করেন; তদ্যথা,১ম লুপ্ত,২য় অপ্রচলিত,৩য় গ্রন্থপ্রচলিত, ৪র্থ জিহ্বাপ্রচলিত এবং পঞ্চম "প্রচলিত"। যে সকল ভাষার মোটেই প্রচলন নাই—গ্রন্থে বা কথোপকথনে আদৌ ব্যবহার হয় না এবং যাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন—সেই সকল ভাষা "লুপ্ত" ভাষা নামে আখ্যাত। Old Testament গ্রন্থের অন্তর্গত Deuteronomy নামক মুসাবিরচিত পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত Zam Zummigs নামক প্রবল পরাক্রান্ত প্রাচীন রাক্ষস জাতিরা যে ভাষায় কথোপকথন করিত, তাহার এক্ষণে চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই; ইহাই ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদদিগের মতে জগতের অন্যতম "লুপ্তভাষা"। সোলেমান (Solomon) বাদশাহের ভুবনবিখ্যাত দেবালয় নির্ম্মিত হইলে পারস্যদেশের নৈঋৎ কোণস্থিত ইবাপু-দেশস্থ নক্ষত্রোপাসক পুরোহিতেরা যে ভাষায় "আশীর্ব্বচন" (Benedictions) আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে লুপ্ত ভাষার মধ্যে গণ্য। প্রাচীন ইটালীর অধিবাসী ইট্রস্কানদের ভাষা লুপ্ত ভাষা। রামায়ণের সমসাময়িক কিষ্কিন্ধ্যাবাসী হনুমানেরা যে ভাষায় তৎকালে কথোপকথন করিত, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, তাহাও এক্ষণে কোথাও প্রচলিত নাই। যে সকল প্রাচীন ভাষা নানা রূপ ধারণ করিয়া শেষে অতীব সংপ্রকর্ষণ লাভ করতঃ দুরবস্থায় পরিণত হওনানন্তর অৰ্দ্ধসভ্য সমাজে সামান্যরূপে প্রচলিত আছে এবং যে সকল ভাষা এক্ষণে গ্রন্থরচনা অথবা শিক্ষিত লোকের কথোপকথনে স্বল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হয়, তাহাই "অপ্রচলিত ভাষা" বলিয়া গণ্য। যে সকল ভাষার কেবল গ্রন্থ লিখিতেই ব্যবহার হয়, অথবা যাহাতে কেবল গ্রন্থমাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, কিম্বা যাহা কেবল পূজাদিতে ব্যবহার হয়, তাহার নাম গ্রন্থপ্রচলিত ভাষা। যে সকল ভাষা কেবল কথোপকথনে ব্যবহৃত হয়, অন্যভাবে ব্যবহৃত হয় না, তাহাই জিহ্বাপ্রচলিত, এবং যাহা লিখনে, পঠনে, বক্তৃতায়, কথোপকথনে, সর্ব্বথা ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাই "প্রচলিত ভাষা" নামে আখ্যাত। এতক্ষণ যাহা লিখিলাম, তাহাতে একটু বুঝা গেল, পৃথিবীতে বহুপ্রকারের ভাষা আছে এবং ঐ সকল ভাষা পঞ্চশ্রেণীতে বিভক্ত; কিন্তু ভাষার আদি ও উৎপত্তি কোথায়, তাহার কিছুই সমাচার পাইলাম না।

সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য মোক্ষমূলর তাঁহার "সায়ান্স্ অভ্ ল্যাঙ্গোয়েজ্" নামক গ্রন্থে ভাষাসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই উপাদেয় গ্রন্থখানি ভাষাবিজ্ঞানের গ্রন্থ নহে, ইহা শব্দবিজ্ঞানের গ্রন্থ বলিয়া অধিকতররূপে সম্মানিত হইতে পারে। ইহাতে শব্দতত্ত্বের যেরূপ আলোচনা আছে, ভাষাতত্ত্বের সেরূপ আলোচনা নাই। অনেক অনুসন্ধানের পর আচার্য্য প্রধান লিখিয়াছেন—

"জলবায়ুর উত্তমত্ব এবং অধমত্ব অথবা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জল, বায়ু, আচার, আহার প্রভৃতিই ভিন্ন ভিন্ন ভাষার উৎপত্তির কারণ; তদ্ভিন্ন ইহার ঠিক মৌলিক কারণ একেবারে নিঃসন্দেহরূপে বলা যায় না; কারণ সৃষ্টি যত পুরাতন, ভাষাও তত পুরাতন।"

সাহিত্যদর্পণকার অনেক প্রকার ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে আদৌ প্রবেশ করেন নাই। নিরুক্তকার মূকভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থেও ভাষা সম্বন্ধে যাহা কিছু সামান্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কেবল এই বুঝায় যে, ভাষার স্রষ্টা ঈশ্বর, মনুষ্য ইহার স্রষ্টা নহে। বিজ্ঞানের কথা শাস্ত্রকারেরা ছাড়িয়া দিয়া সর্ব্ববিজ্ঞানের বিজ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্মের উপরেই ভাষার উৎপত্তির মূল আরোপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। হিন্দুরা বলেন, শব্দ ব্রহ্ম, খৃষ্টানদিগের

সেণ্ট যোহন লিখিত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ঠিক্ সেই কথাই আছে; কিন্তু এসকল কথায় বৈজ্ঞানিকেরা পরিতুষ্ট হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যোক্ত একটি শ্লোকে পাঠ করা যায় —

"সমাহিতাত্মা না ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
হৃত্ত্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তি-ভেদাদিভাবতে॥"

অস্যার্থঃ---"পরমেষ্ঠি ব্রহ্ম চিত্ত সমাহিত করিলে, তাঁহার হৃদয় আকাশ হইতে একটি শব্দ উৎপন্ন হইতে লাগিল, ঐ শব্দের আকারাদি তিনটি বর্ণ, ঐ তিনটি বর্ণে যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি, এবং প্রলয়ের কর্ত্তা প্রভৃতি বুঝায়। ঐ বর্ণত্রয় হইতে ভগবান্ ব্রহ্মা অন্তঃস্থ ও উষ্মাদি ব্যঞ্জন ও হ্রস্ব দীর্ঘাদি স্বরবর্ণের সৃষ্টি করেন; তৎপর বর্ণ যখন লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন হইল, তখন বর্ণবোধক অক্ষরের সৃষ্টি হইল। ক্রমবিকাশই ভগবৎসৃষ্টির চিরন্তন ধর্ম্ম। সেই বিশ্বরাজ্যের সনাতনী শক্তি প্রভাবে ক্রমে ক্রমে ঐ সকল বর্ণমালা পদ ও বাক্যাকারে ব্যবহৃত হইয়া, ভাষারূপে পরিণত হইল।"

শব্দের সূক্ষ্মতম অংশকে বর্ণ বলে। "বর্ণাতে বিস্তীর্য্যা তেঃসৌ বর্ণঃ" অর্থাৎ কণ্ঠ, তালু, প্রভৃতি স্থান হইতে যাহা বিস্তৃত হয় তাহাই বর্ণ। বর্ণবোধক যে চিহ্ন, তাহাই অক্ষর। ভাষার সৃষ্টি হইবার পর যখন ইহার কোনপ্রকার প্রকাশক চিহ্ন ছিল না, তখন ঠিক মুখে মুখেই ইহার ব্যবহার হইত; তৎপর প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুসারে ক্রমশঃ ইহার প্রকাশক চিহ্নের সৃষ্টি হইতে লাগিল। স্মরণশক্তি চিরদিন অব্যাহত থাকে না; অতএব ভ্রান্তি বশতঃ স্মৃতিনিষ্ঠ ভাষার ক্রমশঃ লোপের সম্ভাবনা। বোধ হয় এই জন্যই ভাষাকে লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার চিরস্থায়িতা বিধানের নিমিত্ত বর্ণপ্রকাশক চিহ্নের অর্থাৎ অক্ষরেরও সৃষ্টিবিধান করা হইয়াছিল। আহ্নিক তত্ত্বোক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে এইরূপ উল্লেখ আছে—

"ষাণ্মাসিকে তু সময়ে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে নৃণাম।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা॥"

অর্থাৎ - মনুষ্যের শ্রুতবিষয়ে ছয় মাস পরে ভ্রম হয় দেখিয়া ব্রহ্মা উহা পত্রারূঢ় করিবার জন্য সৃষ্টি করিলেন। নিরুক্তকার বলেন "নক্ষরতীতি অক্ষর", অর্থাৎ যাহা চ্যুত হয় না তাহার নাম অক্ষর। শাস্ত্রে পঞ্চপ্রকার লিপির উল্লেখ আছে; তদ্যথা—

"মুদ্রালিপিঃ শিল্পলিপির্লেখনীসম্ভবা তথা।
গুণ্ডিকা ঘুণ-সম্ভূতা লিপয়ঃ পঞ্চধা স্মৃতা।"

বারাহ তন্ত্র।

এস্থলে মুদ্রালিপি অর্থে "ছাপা" (Printing) নহে, কারণ তখন ছাপাখানা (Press) ছিল না; উহা একপ্রকার লিথো-গ্রাফ্ বলা যাইতে পারে, Impressionএর উপরে নকল হইত।

ভাষা ও বর্ণমালা সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রকর্ত্তার কথা শেষ হইল; পুরাণাদিতে আরও কিছু কিছু উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে ভাষাতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব অথবা বিজ্ঞানের কথা কিছুই নাই, কেবল নিরবচ্ছিন্ন গল্প। অনেকে গল্প পড়িতে পড়িতে ধৈর্য্য সম্বরণ করিতে না পারেন, এই আশঙ্কায় সে সকল গল্পের কথা তুলিলাম না।

য়িহুদীরা অতি প্রাচীন জাতি এবং তাহাদের হিব্রুভাষায় বিরচিত Old Testament গ্রন্থও খুব প্রাচীন। উক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত জেনেসীস নামক পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে---

"পুরাকালে পৃথিবীতে একই ভাষা প্রচলিত ছিল; কোনও সময়ে কতকগুলি লোক স্বর্গ পর্য্যন্ত সিঁড়ি প্রস্তুত করিতে অভিলাষী হওয়ায়, ঈশ্বর ভাবিলেন তাহা হইলে অতঃপর মনুষ্যেরা স্বর্গে পৌঁছিয়া দেবতাদিগের স্থান অধিকার করিয়া ফেলিবে, এইজন্য সিঁড়ি প্রস্তুত-কারীদিগের প্রত্যেকের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। তাহাতে কেহ কাহারও ভাষা বুঝিতে না পারায় স্বর্গের সিঁড়ি প্রস্তুত হইল না এবং বহু ভাষার সৃষ্টি হইল।" ইত্যাদি।

এরূপ সহজ সিদ্ধান্ত মন্দ নহে। এরূপ সহজ কথায় সকল গোলযোগই মিটিয়া যায়। যাহা হউক, তাহার পরে পার্শীক নামক আর এক প্রাচীন জাতির ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা ছিল, তাহা বুঝাইবার জন্য তাহাদের জেন্দাবস্তা নামক "পবিত্র ও প্রাচীন" গ্রন্থ হইতে একটু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া ভাল। জেন্দাবস্তায় লিখিত আছে, "তদনন্তর সেই প্রজ্বলিত এবং জ্যোতির্ম্ময় বৈশ্বানরের অভ্যন্তরস্থ হিরণ্ময় পুরুষের চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যভাগ হইতে ভাষা নিঃসৃতা হইলেন।" কেন হইলেন, কি প্রকারে নিঃসৃতা হইলেন, সে বিষয়ে পার্শীক পুরোহিত একেবারেই নিস্তব্ধ। জেন্দাবস্তায় কেবল আর একটি স্থানে ভাষার সামান্য উল্লেখ আছে। পুরোহিত

বলিতেছেন,"ভাষা চিরস্থায়িনী, ইহা প্রস্তরের দাগের ন্যায় ; ভাষার লোপ নাই, ইহা অব্যয়।" একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের কোথাও এক শ্লোক পড়িয়াছিলাম মনে হইতেছে

"যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারোনান্যথা ভবেৎ।"

সংস্কৃত শ্লোকের অর্থটাও ঠিক যেন ঐরূপ। তাহার পরে আরবা ও পারস্যগ্রন্থকারগণ কি বলেন, তাহা একবার অল্প সময়ের জন্য আলোচনা করিলে মন্দ হয় না। মুসলমানদিগের "হদিশ্ শরিফ্" (Book of Traditions নামে এখানি মাননীয় গ্রন্থ আছে। মুসলমানেরা ইহার কথা কোরানের ন্যায় মান্য করিয়া থাকেন। হদিশে লেখা আছে "একদিন এক য়িহুদী আসিয়া হজরৎ রসুলেল্লার নিকটে (মহম্মদের নিকটে) ইঞ্জিল হইতে (বাইবেল হইতে) পৎরুশের (St Peter) সেই রোজ্‌-এ-মোবারক্ (The blessed day of Pentecost; *Vide* New Testament; *Acts of the Apostles*, Ch. II) লইয়া আলোচনা করায় হজরৎ (মহম্মদ) বলিলেন, ঐ সময়ে তাহাদের মুখ হইতে নানা ভাষা নিঃসৃতা হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ভাষার কর্ত্তা খোদা (ঈশ্বর), ভাষার কর্ত্তা বনীআদম (মনুষ্য) নহে।" এই টুকু ভিন্ন তাঁহাদের শাস্ত্র মধ্যে আর কিছুই পাই নাই। বোস্তাঁ নামক প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা শেখ সাদি ঐ কাব্যের প্রথমেই লিখিয়াছেন—

বনামে জাহাদার জাঁ আফ্‌রীঁ।
হকামে সখুন্ বরজবাঁ আফ্‌রীঁ॥"

অর্থাৎ ধন্য সেই পরমেশ্বর যিনি জিহ্বার উপরে মনুষ্যের ভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন।

পলাতুশ (Plato) এবং সুকরাৎ (Socrates) প্রভৃতির জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে গ্রীশ দেশের আথেন্স্ নগরে এক প্রকাণ্ড মন্দির ছিল। ঐ মন্দিরে বাঙ্গালীর সরস্বতীবিগ্রহের ন্যায় এক মূর্ত্তি থাকিত। ঐ মন্দির বিদ্যামন্দির নামে বিখ্যাত ছিল। মন্দিরের গাত্রে চিত্রসমূহের নীচে গ্রীক ভাষায় অনেক কথা খোদা থাকিত। এক স্থানে লেখা ছিল "এই দেবী ভাষার সৃষ্টিকর্ত্রী"। ঐ দেবীর মূর্ত্তি প্রায় সরস্বতীর মূর্ত্তির অনুরূপ ছিল।

এইরূপ ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের কিরূপ ধারণা ছিল, তাহা সংক্ষেপে দেখান গিয়াছে। এরূপ ধারণা সরল বিশ্বাস হইতে প্রসূত হইয়াছিল। এই সকল ধারণার উপরে নির্ভর করিয়া চলিলে শব্দবিজ্ঞান অথবা ভাষাবিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিতে হয়। দুঃখের বিষয় এই, গভীর গবেষণার সহিত ভাষাতত্ত্ব এ পর্য্যন্ত কেহ আলোচনা করেন নাই। এক ভাষার সহিত অন্য ভাষার, অথবা এক দেশের ভাষার সহিত অন্য দেশের ভাষার কিরূপ সম্বন্ধ ও সমন্বয়, অনেকে তাহা লইয়াই সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু ভাষার উৎপত্তি লইয়া আলোচনা করিতে এবং সেই আলোচনা হইতে আসল কথা বাহির করিতে কাহাকেও দেখি নাই। পৃথিবীতে কিরূপে সর্ব্বপ্রথমে ভাষার উৎপত্তি হইল, তাহা জানা আবশ্যক। অনেকে বলেন, এই জ্ঞান লাভের জন্য প্রত্যাদেশ (Inspiration) অথবা "প্রকাশিত বাক্য" (Revelation) প্রয়োজন। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানের আরও অধিক চর্চ্চা হইলে, আমরা কি ভাষার উৎপত্তির ইতিবৃত্ত দেখিতে পাইব না? যতদিন শব্দবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানের এতাদৃশ উন্নতি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদিগকে ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের ধারণা লইয়াই প্রসঙ্গ করিতে হইবে।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

"খিচুড়ী"। *

বঙ্গ-সাহিত্যের রঙ্গরস ত্রিধারায় প্রবাহিত। প্রথম ধারা নিতান্ত ক্ষীণ হইলেও, ঝুমুর ও কবিওয়ালার কৃপায় একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই; দ্বিতীয় ধারা অদ্যাপি গুপ্তকবির শিষ্যানুশিষ্যের যত্নে ধীরে ধীরে বহিয়া চলিতেছে; তৃতীয় ধারা বিশেষ বেগবতী;—তাহা রঙ্গালয়ে রসিকসমাজে, সভায়, সংবাদপত্রে, গানে ও কথোপকথনে ক্রমশঃ ফেনাইয়া উঠিতেছে। "খিচুড়ী" এইরূপ ফেনিল রঙ্গরসাত্মক নূতন কাব্য;—যেমন নাম, সেইরূপ গুণগ্রাম। এই রঙ্গরস কোনও নির্দ্দিষ্ট রসপ্রস্রবণ হইতে সমুদ্গত হয় নাই; ইহা বোধ হয় রঙ্গরসের ত্রিবেণীসঙ্গম! কিন্তু প্রবাহ

* শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামি-প্রণীত। মূল্য ৷৹ আনা।

বেগবান্ বলিয়া পঙ্কময়, আবর্ত্তসঙ্কুল বলিয়া ভয়ঙ্কর, নিয়ত নিম্নগামী বলিয়া নীচসঙ্গদুষ্ট;—যেন বর্ষাতরঙ্গতাড়িত পদ্মার প্রবল প্লাবন। সুকুমার সাহিত্যের সুকোমল বেলাভূমি সে প্রবল প্লাবন প্রতিহত করিতে অক্ষম হইয়া কোথায় যেন ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে; চারিদিকে কেবল উচ্ছৃঙ্খল অকূল জলরাশি সাগরাভিমুখে সবেগে প্রধাবিত!

সকল বিষয়েই বাঙ্গালীর ক্ষমতার সীমা নিতান্ত সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এসময়ে বাঙ্গালীর পক্ষে ক্ষমতার অপব্যয় করা শোভা পায় না। কবি যে সাহিত্যশক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাহা সুবিমল হাস্যরসের অবতারণায় সফল কাম হইতে পারিত; কিন্তু সে সাফল্য লাভ করিতে হইলে আবিলতার পঙ্কপল্বল হইতে দূরে দাঁড়াইতে হইত। আমাদের জাতীয়জীবনে হাস্যরসের উপাদানের অভাব নাই; আমাদের সাহিত্যে তাহা দেদীপ্যমান। কিন্তু সেগুলি বাছিয়া লইতে হইলে, ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। সেই সকল মূলসূত্র ধরিয়া বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গলা সাহিত্য-সেবকগণকে উপহাস করিতে পারিলে, কবির পরিশ্রম সার্থক হইত। তাহা হয়ত এরূপ 'খিচুড়ী' হইত না; কিন্তু কবিকে চিরজীবী করিতে পারিত। যাহা হইয়াছে,—ইহাতে সাময়িক কৌতূহল উত্তেজিত হইবে; বিশেষ কোন স্থায়ী ফল প্রসূত হইবে না।

প্রাচীন আলংকারিকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়,—শৃঙ্গার, রৌদ্র, বীর ও বীভৎস নামক রসচতুষ্টয় হইতে অন্যান্য রস উৎপন্ন হইয়া থাকে। শৃঙ্গার হইতে হাস্য, রৌদ্র হইতে করুণ, বীর হইতে অদ্ভুত এবং বীভৎস হইতে ভয়ানক; যথা—

"শৃঙ্গারাদ্ধি ভবেদ্ধাস্যো রৌদ্রাচ্চ করুণো রসঃ।
বীরাচ্চৈবাদ্ভুতোৎপত্তি বীভৎসাচ্চ ভয়ানকঃ"॥

বঙ্গসাহিত্য এই পুরাতন নিয়মশৃঙ্খলে সংযত থাকিতে অসম্মত হইয়া, সকল রস হইতেই হাস্যরসের উপাদান সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই জন্য বঙ্গসাহিত্যের হাস্যরসেও সুবিমল কলহাস্যের অভাব, তাহার হাস্য কখন করুণ, কখন অদ্ভুত, কখন বা যথার্থই ভয়ানক! যাহাকে লক্ষ্য করিয়া হাস্যরসের অবতারণা করা হয়, তাহাকে হয় কাঁদিতে হয়, না হয় ভয়ে জড় সড় হইতে হয়! লোকের যেমন ভিন্ন রুচি, কালেরও সেইরূপ ভিন্ন রুচি। একালের রুচিমাহাত্ম্যে বন্ধুগাত্রে কাঁটা ফুটাইয়া দিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিতে হয়। "খিচুড়ীর" হাস্যরস সেই অভিনব রুচিপ্রস্রবণ হইতেই প্রবাহিত হইয়াছে। তিল তণ্ডুল-হৈয়ঙ্গবীন-সংযোগে সেকালের "কৃশরান্ন" স্বাদে সৌরভে মধুময় হইত; একালের "খিচুড়ী" কেবল খিচুড়ী! সুতরাং কাব্যের নামকরণ সার্থক হইয়াছে।

"খিচুড়ী"র কবি গোস্বামিবংশাবতংস বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। তাঁহার কোন পুরুষেও কেহ পাচকের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার ইতিহাস পাওয়া যায় না। সুতরাং আনাড়ির হাতে হাঁড়ি পড়িয়া খিচুড়ীটা সুপক্ব হইতে পারে নাই। মসলা ঘৃতের অভাব ছিল না; কেবল হাতের দোষে তলায় ধরিয়া গিয়াছে, আর আশে পাশে ও উপরে ভাল সুসিদ্ধ হইতে পারে নাই। সুরস-সংবর্দ্ধন-কামনায় গোস্বামিপাদ গোপনে যে একটু পলাণ্ডু ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাও আস্ত রহিয়া গিয়াছে, বেমালুম গলিয়া যায় নাই!

পথে ঘাটে এরূপ খিচুড়ী উপাদেয় বলিয়াই গলাধঃকরণ করিতে হয়। কিন্তু গৃহে বসিয়া নিমন্ত্রিত বন্ধু বান্ধবের পাতে পরিবেশন করিতে ভয় হয়,—পাছে কাহারও বদহজম ঘটে! তথাপি এরূপ গ্রন্থের সমালোচনা আবশ্যক।

বাঙ্গালী জাতি ও বাঙ্গলা সাহিত্য যে পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, কবি তাহা পছন্দ করেন না বলিয়া, তাহাকে সুপথে আনিবার চেষ্টায় আহারোপলক্ষ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের আশায় "খিচুড়ী" রন্ধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু একে হাঁড়িটি বিলক্ষণ বড়, তাহাতে ধূমায় নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত,—সুতরাং গোস্বামিপাদ গলদঘর্ম্মকলেবরে তাড়াতাড়ি হাঁড়ি নামাইয়া কোনরূপে ১২৮ খানি ভোজনপাত্রে ১২৮ হাতা তপ্ত খিচুড়ী ঢালিয়া দিয়া, আস্তাকুঁড়ে সরিয়া পড়িয়াছেন; কাহার ভাগ্যে কি উঠিল, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর হয় নাই!

ইহাতে কিন্তু হিতে বিপরীত ঘটিবার আশঙ্কা হইয়াছে। যে সকল গণ্য মান্য সাহিত্য-সেবকের উদ্দেশ্যে এই খিচুড়ীভোজের অনুষ্ঠান, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে চটিয়া লাল হইয়া কবির উদ্দেশ্য বিফল করিয়া দিতে পারেন। কবি বুঝিয়াছেন, বুঝি নির্ভীক সমালোচনার অভাবেই বঙ্গসাহিত্যে

ইচ্ছামত সমুন্নত হইতেছে না। কিন্তু নির্ভীক সমালোচনায় যে যোগ্যতা আবশ্যক, তাহা আমাদের মধ্যে কোথায় আছে? তাহার অভাবে সমালোচকগণ হয় নির্ভেজ স্তুতি, না হয় অনর্গল নিন্দা লইয়া লেখনীচালনা করিতে বাধ্য হন। তজ্জন্য আমাদের সাহিত্য-সমালোচনা কেবল বাক্যস্তূপে পরিণত হইয়া থাকে। বঙ্গসাহিত্যের এই দুর্দশা লক্ষ্য করিয়াও কবি যথাযথ সমালোচনা করিবার চেষ্টা করেন নাই; অধিকাংশ স্থলেই সমালোচনার দোহাই দিয়া অকৈতবে নিন্দার তপ্ততৈল ছিটাইয়া দিয়া নেপথ্যে প্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু কুত্রাপি সাহসের কিছুমাত্র অভাব ঘটে নাই। বরং দুই এক স্থলে স্পষ্টই বোধ হইয়াছে যেন

" হাউই কহিল, মোর কি সাহস ভাই!
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই।"

এই খিচুড়ী-ভোজের প্রথম ছয় পাতা ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক বীরবৃন্দের উদ্দেশ্যে নিবেদিত প্রেতবলি; তাহার পিণ্ডশেষ মহর্ষি বাল্মীকির নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। ইহাদের পুণ্যস্মৃতি এরূপ রঙ্গরসের আবর্ত্তে টানিয়া আনিবার প্রয়োজন ছিল না। নিবেদিত শ্রাদ্ধপাত্রে যে খিচুড়ী পতিত হইয়াছে, তাহা ভাল সিদ্ধ হয় নাই,—পলাণ্ডুর গন্ধও বিলক্ষণ! তাঁহাদের কপাল!

প্রথম পাতায় যাহা পড়িয়াছে, তাহাও ভাল সিদ্ধ হয় নাই। একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া শুনিয়া রাঁধিতে পারিলে হয়ত এমন হইত না।

নমুনা এইরূপ--

"প্রেমের বন্যায় ভেসে গেল আহা
এমন সাধের দেশটা,
তবুতো দেখ্‌ছি কাহার এখনও
ভাঙ্গিলনা প্রেমতেষ্টা।"

আজকাল "খোঁয়াড়ি ভাঙ্গার" কথা যথেষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়; "তেষ্টাভাঙ্গা" কথাটা বুঝি নূতন উঠিয়াছে? "মিটিলনা প্রেমতেষ্টা" লিখিলে কিন্তু বাঙ্গালা ঠিক্ হইত। কবি বোধ হয় "প্রেমাত্মক" সাহিত্য পাঠেই অবসরশূন্য; নচেৎ বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য যে কত বিভিন্ন পথে ধাবিত হইতেছে, তাহা তিনি অবশ্যই দেখিতে পাইতেন। "প্রেমে"র বন্যায় ভাঁটা পড়ে পড়ে হইয়া আসিয়াছে। অতিশয়োক্তিতে গ্রন্থারম্ভ করিয়া আদ্যন্ত তাহার ছড়াছড়ি করিতে গিয়া গোস্বামিপাদ অনেক স্থলে আপনাকে কিয়ৎ পরিমাণে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। সেই সকল স্থলে নির্দ্দোষ হাস্যরসের অবতারণার চেষ্টাও কিয়ৎপরিমাণে সফল হইয়াছে।

সপ্তম পাতা হইতে প্রকৃত ভোজনারম্ভ। তাহাতে কিন্তু সনাতন পদ্ধতি সুরক্ষিত হয় নাই। কারণ,—পংক্তি-ভোজের সর্ব্বপ্রথমে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে আসন প্রদত্ত হয় নাই; আসন পাইয়াছেন ঘোষকুলকমলোদ্ভাসক সানুজ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ। কিন্তু ভ্রাতৃযুগল বহুবৎসরের সাহিত্য-সেবার পুরস্কারস্বরূপ যাহা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে ঝালের মাত্রাই বেশী। সে ঝাল দেশী লঙ্কার হইলে তত কষ্ট হইত না; তাহা বিলাতী রাই,—যেমন ঝাল, তেমনই ঝাঁঝ! নমুনা এইরূপ—

"এদের
সাহস আছে হিম্মৎ আছে
আছে প্রতিভার ভাতি,
শিশির ঘোষে গৌরাং ভজে
কলম চালায় মতি।"

প্রভুপাদ অদ্বৈতগোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গভজনার প্রধান প্রবর্ত্তক। তাঁহারই কুলপাবন, বংশপ্রদীপ সুশীল শিশির কুমারকে গৌরাঙ্গভজনার জন্য ব্যঙ্গ করিয়াছেন; ইহা নিতান্তই বিলাতী রাই গোলা!

ঘোষভ্রাতৃযুগলের পার্শ্বে একত্র এক ভোজনপাত্রে উপবিষ্ট "মাননীয়" সুরেন্দ্রনাথ ও রমেশচন্দ্র কাঁচা পাকা ও পোড়া খিচুড়ী প্রাপ্ত হইয়াছেন! রমেশচন্দ্রের "শতবর্ষ" বঙ্গ-সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত। কবি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন -

"শতবর্ষে Grub Street
হইয়াছে কাণা,
সবাই গড়ে বঙ্গভাষা
কারে করবো মানা।"

রমেশচন্দ্রের পক্ষে "শতবর্ষ"—রচনার চেষ্টা ধৃষ্টতামাত্র, – একথা বলিতে গিয়া, কবি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়াছেন! এরূপ সমালোচনা যথার্থই নির্ভীক। ইহাতে বিলক্ষণ বাহাদুরী আছে।

নেশন-সম্পাদক বিলাতপ্রত্যাগত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের সেবক না হইলেও প্রায়শ্চিত্তের বলে কবির প্রিয়পাত্র হইয়া একাকী চারি পাচখানি পাত জুড়িয়া আহারে উপবিষ্ট হইয়াছেন। বিলাতপ্রত্যাগত সিবিলিয়ান বন্ধুগণ তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট অসিদ্ধ তণ্ডুল ও দগ্ধ লঙ্কার প্রসাদ লাভার্থ আহুত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা কেহই খিচুড়ীভোজের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে শুভাগমন করেন নাই!

দুই একজন ব্যতীত দেশের গণ্য মান্য সাহিত্যসেবকদিগের মধ্যে প্রায় কেহই খিচুড়ীভোজে বঞ্চিত হন নাই। সংবাদপত্রে অনেক ত্রুটি হইয়া থাকে; তজ্জন্য যাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে ভুল হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা যেন ক্ষুণ্ণ না হন। যাঁহারা বাদ পড়িয়াছেন, তাঁহাদেরই জোরকপাল। কেবল বিজ্ঞাপন-বিশারদ গুরুদাস বাবুর বাদ পড়া নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। তিনি অধমতারণ মহাশয় লোক,—বাঙ্গালা সাহিত্য বিক্রয় করিয়াই এতবড় হইয়াছেন। এ ভুল অমার্জ্জনীয়!

মহোৎসব-প্রাঙ্গণের যে অংশে কবিকুল ভোজনে উপবিষ্ট, সেখানেই নাস্তানাবুদের ছড়াছড়ি। কেবল "পদ্মার" কবির পরম সৌভাগ্য,—তিনি বিলম্বে আসিয়াছেন বলিয়া সাদর সম্ভাষণ ও বিজয় মাল্য লাভ করিয়াছেন।

"কল্যাণবর পদ্মার কবি
আশিষে কল্যাণ ছানিয়া
মস্তকে তোমার এই দীন কবি
যতনে দিতেছে ঢালিয়া।" ইত্যাদি।

"অন্ধকবি" হেমচন্দ্র এবং "বেদব্যাস" নবীনচন্দ্র অপেক্ষাকৃত অল্পেই অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ, প্রভাতকুমার এবং অক্ষয়কুমার (বড়াল মহাশয়) যথেষ্ট আপ্যায়িত হইয়া ভোজনে নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের পাতে খাদ্য অপেক্ষা অখাদ্যই অধিক পড়িয়া গিয়াছে। কবিকুলের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথকেই ঝালের অত্যাচার অধিক পরিমাণে সহ্য করিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অপরাধের অন্ত নাই;—তিনি পদ্যে, গদ্যে, গানে, গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে, ও সম্পাদকীয় সমালোচনায় অকুতোভয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া "খিচুড়ীর" কবির নিকট অল্পে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তাহার সমালোচনাও অনাবশ্যক। "অশোকগুচ্ছের" প্রিয় কবি প্রয়াগপ্রবাসী দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় যেন সত্য সত্যই শ্বশুরালয়ে—শ্যালিকাসমাজে—মধ্যাহ্ন-ভোজে ব্যাপৃত। এক একটি কবিতা যেন এক একটি চোখা চোখা বাণ; তাহাতে কটাক্ষ আছে, কৌতুক আছে,—কর্ণবিমর্দ্দনচেষ্টারও অভাব নাই। আরম্ভটা এইরূপ

"এক অশোকে ফুল ফুটেছে
শুনতে পাচ্ছি চার রকম,
তাই দেখে—
ময়ূর গুলো ধচ্চে প্যাকম
পায়রা কচ্চে বক্‌বকম।"

"অশোকগুচ্ছ" কি অশোক ফুলের গুচ্ছ? এখনও এই নবপ্রকাশিত কবিতাপুস্তক দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে নাই বলিয়াই কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে হইল। কিন্তু "অশোকগুচ্ছের" কবির কবিতাবলীর সহিত একেবারে পরিচয় নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। তাহাতে ত স্নেহের মাত্রাই অধিক। কিন্তু "খিচুড়ী"র কবি বলিতেছেন—তাহাতে সব আছে, কেবল স্নেহপদার্থের অভাবেই মোলায়েম হয় নাই, কেমন খস্‌খসে! যথা—

"অশোকগুচ্ছে
Saffron আছে • মসলা আছে
আছে কাশ্মীরি চা'ল,
যেরতো টুকু জুটলে পরে
কেউ দিতনা গাল।"

পৃথিবীতে বলা এবং করার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ; "যাহা বলি তাহাই কর, যাহা করি তাহার অনুকরণ করিও না,"—এই নীতিরত্নমালা তত্ত্বোপদেষ্টার কণ্ঠহার। গোস্বামিপাদ তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান রচনাপ্রণালীর দোষ প্রদর্শনের জন্য লিখিয়াছেন—

"অনুস্বরে আপন জীবন
দান করেছেন যাঁরা,
এদের ভাষা বুঝ্‌তে হলে
ভেকু হন তাঁরা।"

কবি ভাবিয়া দেখেন নাই, এই কথাটা তাঁহার পক্ষে কত সত্য! "অনুস্বর"টা কোন ভাষার কথা, আমরা তাহার তথ্যাবিষ্কারে অক্ষম। কবি পাঠকগণকে অনেকবার অদ্ ধাতু বক্র করিয়া লইতে বলিয়া অভিজ্ঞের ন্যায় আত্মপরিচয়

প্রদান করিয়াছেন। অনু + স্ব + ঘঞ্ করিলে কি হয়, তাহা তিনি অবশ্যই জানেন। যাঁহারা সাকার "অনুস্বারে" জীবনদান করিয়াছেন, সেই অধ্যাপকমণ্ডলী নিরাকার "অনুস্বরের" অর্থবোধ করিতেই বেশী "ভেকু" হইবার কথা! কিন্তু ইহাই বর্ত্তমান সমালোচনার নিয়ম; কারণ "খিচুড়ীর" কবি নিজেই বলিয়াছেন,—

"হেথায়
ঝুটা যে সে সাচ্চা বলে
সাচ্চা হয় ঝুটা।
ঝাঁঝরিটি ছুঁইকে বলেন—
তোমার অঙ্গে ফুটা।"

দোষের কথা বলিলাম। গুণের কথাও বলিব। যে সহৃদয়তা লইয়া সমালোচনার লেখনী ধারণ করিতে হয়, তাহাকে "স্তুতি" বলা যায় না। সুতরাং নির্ভয়ে গুণের প্রশংসা করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু গ্রন্থকারগণ কেবল গুণাংশেরই সমালোচনা দেখিতে ইচ্ছা করেন। হংস এত কাল নীরত্যাগ করিয়া ক্ষীর ভোজন করিত, গ্রন্থকারগণও সেই দৃষ্টান্তের দোহাই দিয়া পাঠকগণকে হংসবৃত্তি অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি দান করিতেন। হংস সত্য সত্যই নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর ভোজন করে কি না, আজ কাল তাহারও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আরব্ধ হইয়াছে। এ যুগের সাহিত্যের পক্ষে নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর ভোজনে কল্যাণ নাই। কতটুকু নীর আর কতটুকুই বা ক্ষীর, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা আবশ্যক। তাহাতেই সমালোচনা সাফল্য লাভ করে; তাহাতেই সাহিত্য সমুন্নত হয়। "খিচুড়ী"তে নীরের অভাব না থাকিলেও, ক্ষীরের ভাগও অল্প ছিল না। কবি সেই ক্ষীরকে আরও একটু ঘন করিয়া অম্লরস ছাড়িলে, ক্ষীর টুকু ঠিক্ থাকিত। কুরুচির কাঁচা তেঁতুল পড়িয়া অনেকটা ক্ষীর নষ্ট হইয়া গিয়াছে! শব্দগত ও ভাবগত কুরুচি ত্যাগ করিতে পারিলে, অনেক কবিতাই উপাদেয় হইত। অনেক কবিতা এখনও অনেকের মর্ম্ম স্পর্শ করিবে; কবির ছড়া বাঁধায় ক্ষমতা আছে। ছড়ার ভিতর দিয়া কড়া কথা শুনাইবারও ক্ষমতা আছে। কোন কোন লেখক ও সমালোচকের চেতনা সম্পাদনের জন্য সেরূপ কড়া কথার প্রয়োজন আছে। কবি তাহাতে ত্রুটি করেন নাই। অনেক স্থলে চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। তাহার নমুনা উদ্ধৃত করিব না। যিনি পড়িবেন, তিনিই বুঝিবেন—কবি কাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন।

হাস্যরসের স্বরূপনির্ণয়ে মতপার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন মতানুসারে হাস্য শুভ্র,—কলঙ্কশূন্য পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুবিমল আনন্দরসের আকর। আধুনিক মতানুসারে হাস্য গিরগিটির ন্যায় বহুরূপী,—যখন যেমন তখন তেমন, শ্বেত পীত নীল রক্ত হরিৎ কপিশ! সেই জন্য আধুনিক হাস্যরসের অন্তরালে কখন করুণ কখন বা বীভৎসরস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কবি বলিতেছেন,—তাঁহার হাসি কান্নারই নামান্তর! তবে কবি কোন কোন স্থলে হাসাইবার জন্য এত কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন কেন? প্রাচীনকালে দুই উপায়ে হাস্যরস অভিব্যক্ত হইত; এক উপায়—নিজে হাসিয়া অপরকে হাসাইয়া যাওয়া; আর এক উপায়, নিজের অযথাপ্রযুক্ত গাম্ভীর্য্য, ঔদাস্য, বিষাদ, বৈরাগ্য ও শৌর্য্যবীর্য্যে অপরের হাস্যোদ্রেক করা। কবি এই উভয় উপায় অবলম্বন করিয়াই হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। যেখানে খাঁটী বাঙ্গালায় কুলায় নাই, সেখানে বিলাতী গ্যাড্‌ম্যাডের ব্যবহারে হাস্যরসের তুফান উঠিয়া পড়িয়াছে; তাহাতে কত পাঠকপাঠিকা হাবুডুবু খাইবেন! আবার যেখানে কতকগুলি অর্থহীন বাক্য-জঞ্জাল পুঞ্জীকৃত করিয়া হাস্যবন্যা প্রবাহিত হইয়াছে, সেখানে অর্থানুসন্ধান করিয়া কত সমালোচক মাথা কুটিয়া মরিবেন; না বুঝিয়াও ভাবিবেন, বুঝি ভারি একটা মজার কথা!

হাস্যরসাত্মক কাব্য সমালোচনায় সমালোচকের পথ নিতান্ত কণ্টকাকীর্ণ। এত বড় সমালোচনা ত লিখিলাম; কিন্তু কোন্ কবিতায় হাস্যরস সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহা বাছিয়া বাহির করিতে পারিতেছি না দেখিয়া, বন্ধু দেখাইয়া দিলেন—

"এরা
জানে না কো কারে বলে
মিঠে কথার রসকরা,
উচ্চকণ্ঠে গালি দিয়ে
ভাবে ভারি মস্‌করা।"

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী।

যে আলস্যপ্রিয় শ্রমবিমুখ বাঙ্গালী বাঙ্গালার চতুঃসীমার বাহিরে সহজে পদার্পণ করিত না, পরসেবারত ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া স্বদেশেই কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহাদের অনেকেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামের দিনে স্বদেশে স্বচ্ছন্দে অন্নসংস্থান করিতে না পারিয়া অর্থোপার্জ্জনমানসে নানা দিগ্দেশে গমনাগমন ও ভীষণ-তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রপারবর্ত্তী সুসভ্য ও অসভ্য নানা জনপদে গিয়া বসবাস করিতেছে। এই সুবিস্তীর্ণসাগরব্যবহিত, বিজাতীয়জনগণে পরিবৃত ব্রহ্মদেশ এখন অনেক বাঙ্গালীর কার্য্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সমুদ্রপথে ব্রহ্মদেশ যাওয়া এখন বাঙ্গালীর পক্ষে সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্ব প্রান্তভাগে ব্রহ্মদেশ অবস্থিত। সমুদ্রপথে উহা কলিকাতা হইতে ৭৮৭মাইল ব্যবধান মাত্র। কলিকাতা বন্দরে "বিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্টীম নেভিগেশন" কোম্পানির রেঙ্গুন গামী যে কোন ষ্টীমারে চড়িয়া চতুর্থ দিবসে ব্রহ্মদেশের রাজধানী রেঙ্গুন সহরে পৌছান যায়। প্রতি সপ্তাহে তিনবার করিয়া এই ষ্টীমার ডাক ও যাত্রী লইয়া রেঙ্গুন যাত্রা করে। ষ্টীমার ভাড়া, প্রথম শ্রেণী ৬৫৲, দ্বিতীয় শ্রেণী ৩২৷৷০, তৃতীয় শ্রেণী ১০৲ দশ টাকা। রেঙ্গুন হইতে রেলওয়ে বা ষ্টীমারযোগে ব্রহ্ম-দেশের সর্ব্বত্র যাতায়াত করা যায়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহাউসীর ভারতবর্ষশাসনাধিকারসময়ে রেঙ্গুন সহর ও নিম্ন ব্রহ্মার অন্যান্য দেশসমূহ সম্পূর্ণরূপে বৃটিশসাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তৎকালে এ প্রদেশ সমুদ্রপথে বাণিজ্য ব্যবসায়ে ধনোপার্জ্জনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও সুরাট প্রদেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সকল বণিক্ এখানে আসিয়া সামান্য ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারাই বর্ত্তমান সময়ে এখানকার সমৃদ্ধ ও ধনশালী ব্যক্তিরূপে পরিগণিত। যতদূর অবগত হওয়া যায়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের কমিসারিয়েট বিভাগে চাকরী লইয়াই বাঙ্গালীর ব্রহ্মদেশে প্রথম আগমন। ইংরেজাধিকারভুক্ত কোন নূতন প্রদেশে বাণিজ্যসূত্র অবলম্বনে বাঙ্গালীর প্রথম গমন ও বসবাসের বিবরণ সচরাচর শুনা যায় না। ১৮৯১ সালের সেন্সস অনু-সারে সমগ্র ব্রহ্মদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা, পুরুষ ১৩০৮৮৩, স্ত্রীলোক ৩৫৯৩৫। গত দশ বৎসরে সম্ভবতঃ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে চট্টগ্রামবাসীর সংখ্যাই অধিক। খাস বাঙ্গালার লোক ব্রহ্মদেশে খুবই কম। শিক্ষিত অধি-কাংশ বাঙ্গালীই গবর্ণমেণ্ট, রেলওয়ে বা সওদাগরী আফিসের বেতনভোগী কর্ম্মচারী মাত্র। ব্রহ্মদেশের প্রধান কয়েকটী সহরে ও জেলায় প্রায় ৪০ জন বাঙ্গালী ব্যবহারাজীব ওকালতী ব্যবসা করিয়া বেশ দুপয়সা উপায় করেন। তাঁহাদের মধ্যে তিনজন বিলাতপ্রত্যাগত ব্যারিষ্টার, ৭।৮ জন কলিকাতা হাইকোর্টের ও অবশিষ্ট সকলেই স্থানীয়(Ad-vocateship)এড্‌ভোকেটশিপ পরীক্ষোত্তীর্ণ উকীল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা না দিয়াও নির্দ্দিষ্ট কয়েকখানি আইন পুস্তক পড়িয়া সকলেরই ব্রহ্মদেশে এড্‌ভোকেটশিপ পরীক্ষা দিবার বিশেষ সুবিধা ছিল। সেই সুযোগে কতিপয় বাঙ্গালী যুবক পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। ১৮৯৫ সালে ঐ নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন হয়। আজকাল প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াও স্থানীয় (Burmese Higher Standard) "বর্ম্মিজ হায়ার ষ্টাণ্ডাড" নামক পরীক্ষা পাশ না করিলে কেহই উক্ত পরীক্ষা দিবার অধিকারী নহেন। ব্রহ্মের আকিয়াব, মাণ্ডালে, মোলমিন, প্রোম, পিগু প্রভৃতি সহর অপেক্ষা রেঙ্গুন সহরেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক। এইস্থানে প্রায় শতাধিক বাঙ্গালী সপরিবারে ও ৫।৬ শত বাঙ্গালী মেসে অবস্থিতি করেন। উত্তরপশ্চিম ও মধ্যপ্রদেশের "বাঙ্গালীটোলার" ন্যায় এখানকার বাঙ্গালীরা একস্থানে সম্মিলিত হইয়া বসবাস করেন না; সহরের সর্ব্বত্রই সকলে আপনাপন সুবিধাজনক ভাড়াটিয়া বাটি মনোনীত করিয়া লন। দুই একজন বিশিষ্ট সম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালীর এখানে নিজ বসৎবাটি নাই।

দুঃখের বিষয় ব্রহ্মপ্রবাসী শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ বঙ্গসাহি-ত্যের চর্চ্চায় বড়ই উদাসীন। তাঁহাদের সভাসমিতির কার্য্য-বিবরণী ও বক্তৃতাদি সমস্তই ইংরাজী ভাষায় লিখিত ও পঠিত হয়। রেঙ্গুনের বাঙ্গালী ব্যবসাদার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র-নাথ সরকার কর্ত্তৃক ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুন সহরে স্বর্গীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্মরণচিহ্নস্বরূপ "রেঙ্গুন বিদ্যাসাগর রীডিংরূম" নামে একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐ পাঠাগারে ৫৮০ খানি বাঙ্গালা ও ৩০০ শত ইংরাজী পুস্তক এবং কয়েকখানি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রিকার সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও পাঠাগারের উন্নতিকল্পে অল্পসংখ্যক সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিই সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদান করিয়াছিলেন। প্রথম বৎসর পাঠাগারের কার্য্য বেশ সুশৃঙ্খল ভাবে চলিয়া ইহার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে কতকগুলি হীনচরিত্রব্যক্তিকর্ত্তৃক অনেক পুস্তক অপহৃত হওয়ায় নানা কারণে প্রতিষ্ঠাতা আপাততঃ উহা বন্ধ রাখিয়াছেন। ব্রহ্মদেশস্থ স্কুল ও কলেজসমূহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত। প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রদিগের শিক্ষার উপযুক্ত বিদ্যালয় না থাকায় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় বাঙ্গালীদিগের চেষ্টায় রেঙ্গুন সহরে "ইণ্ডিয়ান সেমিনারি" নামে একটি উচ্চ প্রাইমারি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান ছাত্রসংখ্যা ৩২টী। কেবলমাত্র ছাত্রদত্ত বেতন হইতে বিদ্যালয়ের ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। শিক্ষিত ও সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের প্রতিশ্রুত মাসিক চাঁদা ও সাহায্যাভাবে বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা বড়ই কম।

রেঙ্গুন একাউণ্টেণ্ট জেনারেল আফিসের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে ১৮৯৬ সালে রেঙ্গুন সহরে "বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লব" নামে একটি ক্লব প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রহ্মদেশে নবাগত বাঙ্গালীমাত্রেই এই ক্লবে প্রথমে আশ্রয় লইয়া পরে নিজ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে বা গন্তব্য স্থানে যাইতে পারেন। এই উদ্দেশ্য সাধন হয় বলিয়াই ক্লবটির দ্বারা বাঙ্গালী জনসাধারণের অশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। রেঙ্গুনের গণ্যমান্য সমস্ত ভদ্রলোকই এই ক্লবের সভ্যশ্রেণীভুক্ত। তাস, পাশা দাবা, প্রভৃতি ক্রীড়া, প্রাদেশিক নানা সংবাদপত্রাদি পাঠ এবং প্রাত্যহিক সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া সভ্যগণ গীতবাদ্যাদি নানা প্রকার নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ উপভোগ করিয়া থাকেন। মোলমিন সহরের ভূতপূর্ব্ব জজ ও বর্ত্তমানে রেঙ্গুন সহরের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সেন মহোদয় উক্ত ক্লবের সভাপতি। তিনি "রেঙ্গুন ইণ্ডিয়ান সেমিনারির" একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ও প্রবন্ধলেখকের যত্ন ও পরিশ্রমে ১৯০০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে "রেঙ্গুন বঙ্গীয় সঙ্গীতসমিতির" সভ্যগণ কর্ত্তৃক কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যার্থ স্থানীয় ভিক্টোরিয়া হল নামক প্রসিদ্ধ রঙ্গমঞ্চে "চন্দ্রহাস" নাটকখানি অভিনীত হইয়াছিল। সহর ও মফস্বলের গণ্যমান্য প্রবাসী বাঙ্গালীমাত্রেই অভিনয়দর্শনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সেন মহাশয়ই ঐ সময়ে উক্ত সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি সংগৃহীত অর্থ হইতে খরচ খরচা বাদ ২০০্ টাকা ও নিজ হইতে ৫০্, একুনে ২৫০্ আড়াইশত টাকা কবিবরকে পাঠাইয়া দেন। কবিবরের অভাবের তুলনায় এই সামান্য সাহায্য অতি অকিঞ্চিৎকর হইলেও সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক উহা ভক্তি ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলিরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। অর্থপ্রাপ্তি স্বীকার করিয়া কবিবর "রেঙ্গুন বঙ্গীয় সঙ্গীত সমিতির" বিষয় উল্লেখ করিয়া সেন মহোদয়কে যে পত্র লেখেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।—

PUDDOPOOKER SQUARE
Kidderpore, 8th March, 1900.

My dear Mr Sen,

I beg to acknowledge the receipt of Rs 200 remitted by you on behalf of the members of the "Bangiya Sangit Samiti" and of Rs 50 kindly contributed by yourself. I do so with sincere gratitude. That my countrymen residing so far away feel for me in my present misfortunes and have taken so much trouble to help me, is a matter of which I should be proud, and this kindness on their part will be remembered by me as long as I live. To each and all who have taken part in expressing their sympathy in this way, I tender my heartfelt thanks. * * * *

With very kind regards,
I remain, yours sincerely
(Sd.) HEM CHUNDRA BANERJEE.

ব্রহ্মদেশের জনহিতকর নানা কার্য্যে ও সদনুষ্ঠানে সেন মহোদয় যোগদান করিয়া থাকেন এবং অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা তাহার সহায়তা করেন। মানসম্ভ্রম ও পদমর্য্যাদায় তিনি ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীদিগের শীর্ষস্থানীয়।

কলিকাতার উত্তরাংশস্থিত এঁড়িয়াদহগ্রামনিবাসী অশেষগুণসম্পন্ন ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয়ের নাম ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত। ১৮৮২ সালে তিনি ব্রহ্মদেশে আসিয়া কিছুদিন গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটেরীয়েট আফিসে কেরাণীগিরি চাকরী করেন। পরে ওকালতী পরীক্ষা পাশ করিয়া বর্ত্তমান সময়ে রেঙ্গুন চীফ কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীলরূপে প্রচুর অর্থ ও যশোপার্জ্জন করিয়াছেন। বিনয়, নম্রতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি তাঁহার অস্থিমজ্জাগত। বিপন্ন স্বদেশী, বিদেশী, আত্মীয়স্বজন ও অতিথি অভ্যাগতকে অন্নদান ও তাহাদের আতিথ্যসৎকার তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। পরোপকার ও পরদুঃখমোচনে তিনি এতই মুক্তহস্ত যে স্বীয় প্রতিভাবলে প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিয়াও এপর্য্যন্ত কিছুমাত্র অর্থসংস্থান করিতে পারেন নাই।

ব্রহ্মের রেঙ্গুন ও মাণ্ডেলে সহরে স্থানীয় বঙ্গালীদিগের সংগৃহীত অর্থে প্রতি বৎসর মহা সমারোহে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে। জন্মভূমি হইতে বহুদূরে বিচ্ছিন্ন হইয়াও সুদূর প্রবাসে প্রবাসী বাঙ্গালীগণ বৎসরান্তে এই উৎসবের কয়দিন বেশ আনন্দ উপভোগ করেন। সন ১২৯৬ সালের ১লা বৈশাখ তারিখে রেঙ্গুন একাউণ্টেণ্ট জেনারেল আফিসের পেন্সনপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত নিমাইচরণ সিংহ মহোদয়ের আর্থিক সাহায্যে ও যত্নে রেঙ্গুন সহরে হিন্দুদিগের একটি দুর্গামন্দির ও হিন্দুআশ্রম নির্ম্মিত হয় এবং পবিত্র বারাণসীধাম হইতে ধাতুময়ী দশভুজা মূর্ত্তি আনাইয়া মন্দির মধ্যে স্থাপনা হয়। এই মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিত্য সেবা হইয়া থাকে, এবং আশ্রমে হিন্দু সন্ন্যাসী ও পর্য্যটকগণ আশ্রয় পাইয়া থাকেন। বৌদ্ধপ্লাবিত এইদেশে এই মন্দির ও আশ্রমটি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভগবদ্‌ভক্ত সিংহ মহাশয়ের একটী মহৎ কীর্ত্তি।

রেঙ্গুন সহরে সরকার কোম্পানীর বিলাতী সৌখিন দ্রব্য প্রভৃতির দোকান, চন্দ্রনাথ বানার্জ্জি কোম্পানি ও শশিভূষণ নন্দীর চাউল ডাল তৈল ঘৃতাদির আড়ত, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঔষধবিক্রেতা নরসিংহপ্রসাদ দত্ত কোম্পানীর শাখা ঔষধালয়, রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ ও একমাত্র বাঙ্গালী ডাক্তার বীরচাঁদ দে, এম্ বি, মহোদয়ের সুবৃহৎ ডিস্পেনসারী এবং বিখ্যাত জনডিকিনসন কোম্পানীর এজেণ্ট অতুলকৃষ্ণ চৌধুরীর ষ্টেশনারী মার্ট ছাড়া ব্রহ্মদেশে অন্যত্র কোথাও শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের কোন কারবার দেখিতে পাওয়া যায় না। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্ম অভিযানে যখন ব্রহ্মরাজ 'থিব' নিজ রাজধানী মাণ্ডেলে সহরে বন্দী হন এবং ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা চিরদিনের মত লুপ্ত হয়, তখন কয়েকজন বাঙ্গালী উপর বর্ম্মা ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের রেলওয়ে ও অপরাপর বিভাগে ঠিকাদারী কার্য্য করিয়া বিশেষরূপ সঙ্গতিপন্ন হইয়াছেন। চট্টগামনিবাসী অশিক্ষিত সহস্র সহস্র বাঙ্গালার ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্র দুগ্ধ দধি প্রভৃতির কারবার ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুদীর দোকান আছে। বাঙ্গালী মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সামান্য অবস্থায় আসিয়া ব্রহ্মদেশে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া ধনী হইয়াছেন। ইহাঁদের বড় বড় (Saw mill) কাঠ চিরিবার কল ও সেগুন কাষ্ঠের কারবার আছে। কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক "বেঙ্গল মোহামেডান এসোসিয়েশান" নামক একটী ক্লব ও সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। সেখ মহম্মদ ইস্রাইল খাঁ, বি. এল., মহোদয়ের নাম ইহাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে ভিন্ন চাকরী অন্বেষণে ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালীর আগমন পণ্ডশ্রম মাত্র। গত কয়েক বৎসর হইতে চাকরীপ্রার্থী বিস্তর বাঙ্গালী এস্থানে ভগ্নমনোরথ হইয়া অবশেষে পাথেয় পর্য্যন্ত ভিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখনও ব্রহ্মদেশে ব্যবসাবাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যে ধনাগমের অসংখ্য পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। ব্রহ্মদেশগমনেচ্ছু বাঙ্গালার এক্ষণে সেই সমস্ত উপায় অবলম্বন করাই উচিত। সামান্য রাজকর দিয়া ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্রই এখনো প্রচুর ধান্যের জমি পাওয়া যায়। ঐ জমি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গদেশীয় কৃষক দ্বারায় ভাল করিয়া চাষ করাইলে সহজে ধনবান হইবার সম্ভাবনা। ব্রহ্মদেশ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার; চিরকালই কৃষিজাত দ্রব্যে সুসম্পন্ন বলিয়া খ্যাত। দুর্ভিক্ষের সময় এখানকার চাউলে অনেক দেশ রক্ষা পায়। ডুমরাওনরাজের সুযোগ্য দেওয়ান বাহাদুর এ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে জমি সংগ্রহ করিয়া বিহারপ্রদেশীয় কতকগুলি দরিদ্র কৃষক আনাইয়া বসবাস করাইয়াছেন এবং তাহাদিগের দ্বারা কৃষিকার্য্যে বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মের মোগক প্রদেশে নীলকান্ত, পদ্মরাগ প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তরের খনি আছে। ঐ সকল খনির কার্য্য "রুবি

মাইন কোম্পানী"র প্রায় একচেটিয়া। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বিদেশীয়গণও এইকার্য্য করিয়া ধনবান হইয়াছে। খনির কোন অংশ মনোনীত করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে স্থানীয় কোন লোকের নামে ঐ জমি ইজারা লওয়া যায়। খনির কার্য্যে যত মজুর নিযুক্ত থাকবে, প্রতিলোক পিছু মাসিক ২০, কুড়ি টাকা হিসাবে গবর্ণমেণ্টকে কর দিতে হয়। নির্দ্দিষ্ট জমি খনন করিয়া যে সকল প্রস্তর পাওয়া যায়, তাহা "রুবি মাইন কোম্পানীর" স্থানীয় প্রস্তরব্যবসায়িগণ উচিত মূল্যে ক্রয় করে। সামান্য মূলধন লইয়া সকলেই ব্রহ্মদেশে এই খনির কার্য্যে স্বীয় ভাগ্য পরীক্ষা করিতে পারেন। অনেকে মোগক ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য স্থান হইতে নানাবিধ প্রস্তর খরিদ করিয়া দেশ বিদেশে চালান দিতেছে। বলা বাহুলা, এই ব্যবসা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ব্যবসায়ের উপযুক্ত শিক্ষালাভ করা বিশেষ কর্ত্তব্য। ব্রহ্মদেশ সেগুনকাষ্ঠের জন্য বিখ্যাত। অধিক মূলধন না হইলে এইকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। ব্রহ্মসীমান্তের শান প্রদেশ (Shan State) প্রভৃতি স্থান হইতে শান ও বর্ম্মা পনি (Pony) ক্রয় করিয়া ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে বিক্রয় করা একটি লাভজনক ব্যবসা। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মদেশোৎপন্ন কেরোসিন তৈল, গালা, রবার, চুরুট প্রভৃতি বাণিজ্যোপযোগী অনেক দ্রব্য আছে। সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। দুএক জন সুদক্ষ বাঙ্গালী ডাক্তার এখনও ব্রহ্মদেশে গিয়া সহজে পসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারেন।

ব্রহ্মবাসীরা সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা জীবহিংসা করে না; কোন প্রাণী বধ করিয়া আহার করা ব্রহ্মবাসী-দিগের ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ এক কালেই নাই। সামাজিক পদমর্য্যাদায় উচ্চনীচ জ্ঞান ইহাদের মনে স্থান পায় না। লক্ষপতি ধনী ও একজন সামান্য ভিক্ষুক একত্র উপবেশন ও ভোজন করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না। আগন্তুকের পক্ষে হটাৎ ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রী ও পুরুষ নির্ণয় করা বড় কঠিন। পোষাক পরিচ্ছদ ও শারীরিক অঙ্গসৌষ্ঠবে এদেশীয় স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বড়ই সৌসাদৃশ্য। দেহের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের প্রতি ব্রহ্মদেশীয় রমণী-গণের প্রখর দৃষ্টি। এদেশে পুরুষ প্রতিপালনের ভার প্রধানতঃ রমণীগণকেই গ্রহণ করিতে হয়। ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোকগণ স্বদেশীয় পুরুষ অপেক্ষা বিদেশীয় সকলজাতীয় পুরুষদিগের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইতে ভালবাসে। ইহারা নিঃসঙ্কোচে বিদেশী পুরুষদিগের সহিত কথাবার্ত্তা করিয়া থাকে এবং নিজ হাবভাব ও মধুর আলাপে তাহা-দিগের মন আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করে। অসংযমী যুবাপুরুষ দিগের ইহাদের কুহক হইতে মুক্তিলাভ করা দুরূহ ব্যাপার। প্রবাসী ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মান, পার্শি, হিন্দুস্থানী, মান্দ্রাজী প্রভৃতি লোকদিগের মধ্যে অনেকেই ইহাদিগের বাহ্য রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া এক একটিকে অঙ্কলক্ষ্মী করিয়া আত্মীয় স্বজনের মায়াপাশ কাটাইয়া এদেশে বসবাস করিতেছে। ব্রহ্মপ্রবাসী অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীরও একপ কুকীর্ত্তির কথা শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। সুখের বিষয় এই দুর্নীতিস্রোত ক্রমেই প্রশমিত হইতেছে। ব্রহ্মদেশবাসী পুরুষগণ বড়ই শান্তিপ্রিয়, অলস ও অতিথিবৎসল। ইহারা ইংরাজদিগকে রাজার জাতি বলিয়া অত্যধিক ভয় ও সম্মান করে, এবং কলিকাতা-অঞ্চলবাসী বাঙ্গালীদিগকে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান জ্ঞানে সমধিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে। ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা প্রকৃত নবজীবন লাভ করিয়াছে এবং ইংরাজের সভ্যতা, সাহিত্য, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি অনুকরণ করিয়া নূতন বেশে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে।*

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকার।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বৈজ্ঞানিক।

বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা পর্য্যন্ত জানেন যে, আমাদের চারিদিকে যে বায়ু আছে, তাহার পাঁচ বোতল হইতে এক এক বোতল অক্সিজেন গ্যাস পাওয়া যায়। ঐ গ্যাস ব্যতীত, কাষ্ঠাদি দাহ্য পদার্থ পুড়িতে পারে না, এবং ঐ গ্যাসে পোড়াইলে এত প্রবল বেগে কাষ্ঠাদি পুড়িতে থাকে যে তখন প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। বায়ুতে অক্সিজেনের সহিত নাইট্রোজেন মিশ্রিত আছে। নাইট্রোজেনের দাহিকা শক্তি নাই। তাই বায়ুতে কাষ্ঠাদি মৃদুবেগে পুড়িতে থাকে,

* এই প্রবন্ধ "প্রবাসী"-পত্রের জন্য রচিত হয় নাই।

তাপও তত পাওয়া যায় না। পাঁচ বোতল বায়ুতে এক বোতল অক্সিজেন, চারি বোতল নাইট্রোজেন। বিলাতের বিণ কোম্পানি বায়ু হইতে অক্সিজেন পৃথক্ করিয়া কয়েক বৎসর হইতে বিক্রয় করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের রাসায়নিক উপায়ে বিস্তর ব্যয় হয়, কাজেই সকল আবশ্যক কাজে অক্সিজেন ব্যবহার করিতে পারা যায় না। সম্প্রতি রাউল পিক্‌টে নামক এক ব্যক্তি অল্পব্যয়ে অক্সিজেন পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। বায়ুকে জমাইয়া জলের মত দ্রব করিতে পারা যায়। কিন্তু অক্সিজেন—১৮৩°শ, এবং নাইট্রোজেন—১৯৫°শ শীতে জমাইতে পারা যায়। সুতরাং বায়ুকে ১৮৩°শ পর্য্যন্ত শীতল করিলে অক্সিজেন গ্যাসকে জলের মত দ্রবাকারে পাওয়া যায়, কিন্তু তখন নাইট্রোজেন গ্যাসের আকারেই থাকে। এইরূপে উভয়কে পৃথক করা সহজ হইয়া পড়ে। যাহাহউক, উদ্ভাবক বলেন, এক ঘন গজ অক্সিজেন পাইতে আধ পয়সারও কম খরচ পড়ে। এত সুলভ হইলে খনিজ হইতে ধাতু নিষ্কাশন অল্পব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িবে। এখন যত কয়লা পোড়াইতে হইতেছে, অক্সিজেনের সহিত পোড়াইতে পারিলে তদপেক্ষা অনেক কম কয়লায় ইচ্ছানুরূপ তাপ পাওয়া যাইবে। বড় বড় লোহা, ইস্পাত ভুড়িতে আর তাপের ভাবনা করিতে হইবে না। থিয়েটার, হাসপাতাল, প্রভৃতি স্থানের বায়ুকে বিশোধিত করা সহজ হইয়া পড়িবে। ফলে অনেক ব্যবসায়, কারখানায় যুগান্তর উপস্থিত হইতে পারিবে।

***

আমাদিগের চারিদিকের বায়ুরাশি বা আবহ প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চ স্থানে প্রায় ৭ সের চাপ প্রয়োগ করে। ইঞ্চ হিসাবে আবহের প্রভূত চাপের আন্দাজ পাওয়া যায় না। গণিত দ্বারা জানা যায় যে, প্রতি বর্গ ফুট জায়গায় আবহের চাপ প্রায় এক টন (২৭ মণ), দশ বর্গফুট জায়গায় প্রায় ১০০ টন। যদি ভূপৃষ্ঠের উপরে ৩২।৩৩ ফুট গভীর জল থাকিত, সেই জল ভূপৃষ্ঠকে যত ভারে চাপিত, আবহের ঠিক তত চাপ। কলিকাতার ঘর বাড়ির ভার তথাকার ভূপৃষ্ঠকে বহিতে হইতেছে। কলিকাতার উপরের আবহের চাপও প্রায় ঐ সকল ঘরবাড়ীর সমান।

এত চাপের খানিকটা কম পড়িলে তাহার ফল প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। বায়ুমানের (barometer) পারা আধ ইঞ্চও নামিয়া আসিলে জানা যায়, প্রত্যেক বর্গফুট স্থান হইতে ১৮ সের চাপ কম পড়িয়াছে। বহুবিস্তৃত স্থানে তখন যে কত চাপ কম পড়ে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঝড় বৃষ্টি আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু আবহের চাপের হ্রাস বৃদ্ধিতে সমুদ্রের জলও উচ্চনীচ হইতে পারে। এতদ্দ্বারা ভারের এত প্রভেদ ঘটে যে, তাহাতে কঠিন ভূপৃষ্ঠেও প্রত্যক্ষযোগ্য ফল ঘটিতে পারে। সমুদ্রের জোয়ারের জল এক ফুট কম হইবার অর্থ, প্রত্যেক বর্গ মাইল জলপৃষ্ঠ হইতে ৮০০০০০ টন ভার কম পড়িয়াছে। কেহ কেহ বলেন, আবহের চাপ এমনই কম পড়িবার সময় ভূকম্প হইয়া থাকে। কথাটা অসম্ভব নয়। উপরের চাপ কম পড়িলে ভূনিম্নস্থ গ্যাস বাহিরে আসিবার সুযোগ পায়, এবং সঙ্গে সঙ্গে আগ্নেয়গিরির উপক্ষেপ ঘটাইতে পারে।

***

সূর্য্যগ্রহণ সময়ে আবহের উষ্ণতা ও অন্যান্য অবস্থার কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন হয়। এতদিন কিন্তু তাহা জানা ছিল না। গত বৎসরের ২৮মে দিবসের সূর্য্যগ্রহণকালীন আবহের অবস্থা বিচার করিয়া আমেরিকার আবহবিৎ হেল্‌ম্ ক্লেটন সাহেব এক নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ পাইয়াছেন যে, সূর্য্যগ্রহণ সময়ে একটা ছোট খাট বাতাবর্ত্ত জন্মে। তাহার শীতল কেন্দ্র চন্দ্রের ছায়ার সহিত পৃথিবীর উপর দিয়া ঘণ্টায় ৬৫০০ হাত বেগে ধাবিত হইয়াছিল। আবহের উষ্ণতাহ্রাসই ঐ বাতাবর্ত্তের প্রধান কারণ। এই অল্প হ্রাসে যে বাতাবর্ত্ত জন্মিতে পারে, তাহা আবহবিদ্যার একটি নূতন তত্ত্ব। ইহা হইতে ক্লেটন সাহেব আর একটি তত্ত্ব অনুমান করিয়াছেন। সকলেই জানেন, এক অহোরাত্রের মধ্যে আবহের চাপ দুইবার বাড়ে, দুইবার কমে। এই হ্রাসবৃদ্ধির কারণ জানা ছিল না। ক্লেটন সাহেব মনে করেন, আবহের উষ্ণতার বৈষম্যেই আবহের এই প্রকার জোয়ার ভাটা দেখা যায়। প্রতিদিন দিবাভাগে আবহ খুব গরম হয়, এবং রাত্রে তেমনই শীতল হয়। উষ্ণতার প্রভেদে একদিনের মধ্যেই দুইবার ছোটখাট বাতাবর্ত্ত জন্মিবার সম্ভাবনা। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২৯ আগষ্ট তারিখে একবার সূর্য্যগ্রহণ হয়।

তখনকার আবহের অবস্থা বিচার করিয়া নরওয়ের বৈজ্ঞানিক এক্কেল ষ্টীন সাহেব দেখিয়াছিলেন যে, আবহের চাপের দৈনন্দিন হ্রাসবৃদ্ধির মত উক্ত সূর্য্যগ্রহণ সময়েও ঘটিয়াছিল।

***

বিভিন্ন বস্তুর যোগাযোগে, আজকাল নানাবিধ কৃত্রিম বস্তুর উৎপত্তি হইতেছে। রসায়নবিদ্যার প্রসার কোথায় শেষ হইবে, তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন না। কৃত্রিম নীলরঙ্গের উৎপাত এদেশের কৃষককুলও বুঝিতে পারিয়াছে। কৃত্রিম হীরামাণিক রেশমের সংবাদও অনেকে পাইয়া থাকিবেন। কিন্তু এই সমস্ত কৃত্রিম বস্তু দ্বারা চমৎকারা অন্ন-চিন্তার লাঘব হইতেছে না। কোন উপায়ে যদি ধানচাল উৎপাদন করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে জৈব রসায়নের উন্নতির সার্থকতা বুঝিতে পারিতাম। সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু এই রকমের একটা সংবাদ প্যারিসের পাস্তর চিকিৎসালয়ের জনৈক রাসায়নিক প্রচার করিয়াছেন। কার্পাস হইতে রেশম করা, কিংবা কাঠের গুঁড়া বা নেকড়ার টুকরা হইতে চিনি তৈয়ারি করায় বাহাদুরী আছে বটে কিন্তু তত নাই। কেননা এক্ষণে জৈবপদার্থ ব্যতীত এই সকল জৈবপদার্থের উৎপত্তি হইতেছে না। চাউলের মূল উপাদান কয়লা, জল, নাইট্রোজেন, ও খানিকটা মাটী। রাসায়নিক চাউলকে বেশ স্বচ্ছন্দে এই সকল মূল উপাদানে ভাঙ্গিতে পারিতেছেন, কিন্তু ঐ সকল উপাদান লইয়া একটি চাউল গড়িতে পারেন না। এখন পারেন না বলিয়া যে কোন কালে পারিবেন না, তাহা বলা ধৃষ্টতা। কিছু কাল পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ রাসায়নিক বার্থেলো (Berthelot বলিয়াছিলেন যে ভবিষ্য মানবকুল রাসায়নিক মন্দিরে প্রস্তুত খাদ্যের উপর নির্ভর করিবে। কথাটা অনেকটা সত্য হইয়া দাড়াইতেছে। বাজারে বিলাতী কৌটা পূর্ণ নানাবিধ প্রস্তুত খাদ্য দেখিলে প্রকৃতির কতখানি কাজ রাসায়নিকের হাতে আসিয়াছে তাহা কতকটা বুঝিতে পারা যায়। তথাপি ইহাদের সহিত উপস্থিত প্রসঙ্গের আকাশ পাতাল প্রভেদ। পাস্তর চিকিৎসালয়ের রাসায়নিক ডাঃ এটার্ড সম্প্রতি নাকি এমন কতকগুলি পরীক্ষা করিয়াছেন, যাহাতে গড়িতে পারিবার গুপ্তবিদ্যার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলেন অজৈব পদার্থ (যেমন কয়লা, হাই-ড্রজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক) হইতে পুষ্টিকর খাদ্য প্রস্তুত করা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, যদি চাউলকে ভাঙ্গিতে পারা যায়, এবং কোন কোন জৈব পদার্থ জীব বিনা গড়িতেও পারা যায়, তাহা হইলে চাউলই বা কেন গড়িতে পারা যাইবে না। কৃত্রিম চিনি, কৃত্রিম কুইনীন রাসায়নিকের মন্দিরে প্রস্তুত হইয়াছে। যদি ফুলের রঙ্গ, ফুলের গন্ধ, কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিতে পারা যায়, তবে চাউল ডাইল আলু মাছ কেননা পারা যাইবে? উল্লিখিত পরীক্ষা সমূহে নাকি এই প্রকার গড়া কাজের হদিশ পাওয়া গিয়াছে।

***

কিন্তু তবুত কয়লা জল চাই। একটা বিষম চিন্তা সম্প্রতি নিকোলা টেস্‌লার মস্তিষ্ক গরম করিয়াছে। ইহাঁর নাম সকলেই জানেন। এডিসনের ন্যায় ইহার নামও জগদ্বিখ্যাত। ইনি অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর নিকটে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালাবধি তাড়িতের কারখানায় কাজ করিয়া ১৯ বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকায় এডিসনের কারখানায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেখানে অল্পকাল কাজ করিয়া আর এক তাড়িত কোম্পানীর সহিত জুটিয়াছেন।

মানুষটির পরিচয় এই, কিন্তু এপরিচয়ে তাঁহাকে চিনিতে পারা যায় না। সকল লোকেরই কল্পনাশক্তি আছে, কাহারও বেশী, কাহারও বা কম। কিন্তু টেস্‌লার কল্পনার সাহসের তুল্য কাহারও নাই। তিনি বলিতেছেন, কয়লা জল জড় পদার্থ ত; চারিদিকে এত অফুরন্ত আকাশপদার্থ আছে, তাহা হইতে তৈয়ারি করিয়া লইতে পারা যাইবে! তাঁহার নিকট বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ একটা ছেলেখেলা। সমুদ্রের এপার হইতে ও পারে বিনা তারে তাড়িত সংবাদ পাঠানও বড় একটা কঠিন কথা নয়। সমুদ্রই বা কতটুকু! এই পৃথিবীতে এমন একটা তুমুল তাড়িত সংক্ষোভ জন্মাইতে পারা যাইবে, যাহার ধাক্কা শুক্র ও মঙ্গলের ন্যায় নিকটবর্ত্তী গ্রহের 'মানুষেরা' টের পাইতে পারিবে!

কাঠ কয়লা না পোড়াইয়া তাপ পাইবার যোগাড় টেস্‌লা করিতেছেন। সূর্য্যের এত তাপ; সেই আদি তাপাধার ছাড়িয়া বনের কাঠ, মাটীর কয়লার জন্য লালায়িত হওয়া বাস্তবিক অসভ্যতা। তিনি দর্পণ ও আতশী কাচ যোগে

সূর্য্যের তাপ ঘনীভূত করিয়া এমন প্রচণ্ড তাপের যোগাড় করিতেছেন যে,তাহার তুলনায় কাঠ কয়লার আগুন শীতল বোধ হইবে। তাপ পাইলে তাড়িত উৎপাদনের ভাবনা থাকিবে না, তাড়িতের ভাবনা গেলে যে সে লোকের ঘর কন্নার রাঁধাবাড়া, প্রদীপ জ্বালা, সবই অনায়াসে চলিতে পারিবে। খরচই বা কি? সূর্য্যের তাপ একত্র করার কথা। কাজেই কাঠই বল, কয়লাই বল, কেরোসিনই বল, কিছুই দরকার থাকিবে না।

এসকলেও তাঁহার সাহসের পরিচয় পাওয়া গেল না। মানুষকে সৃষ্টিকর্ত্তার আসনে বসাইতে না পারিলে আর কি হলো! জড়ের যোগাযোগে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুর উদ্ভব। সেই জড় যদি উৎপাদন করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই মানুষ একটি ছোট খাট সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারিবে। বর্ত্তমান রসায়ন শাস্ত্র বলেন যে, জড় লোপও করিতে পারা যায় না, সৃষ্টিও করিতে পারা যায় না। একথা সত্য, কিন্তু তাঁহার মতে বলা উচিত, এ পর্য্যন্ত লোপ বা সৃষ্টি করিতে পারা যায় নাই। কেননা, সৃষ্ট জড় লইয়াই রাসায়নিকেরা নাড়াচাড়া করিতেছেন। কিন্তু তা বলিয়া জড়ের ধ্বংস বা সৃষ্টি করা অসম্ভব বলা অন্যায়। লর্ড কেল্‌ভিন জড়ের যে আদিরূপ বলিয়াছেন, তাহাকেই ধরিয়া টেস্‌লা প্রত্যক্ষ-যোগ্য জড় সৃষ্টি করিবার উপায় চিন্তা করিতেছেন। লর্ড কেল্‌ভিনের অনুমান আমাদের প্রাচীন ঋষিদিগের মতের তুল্য। বিশ্বব্যাপী আকাশ পদার্থ হইতে যাবতীয় জড়ের উৎপত্তি। পুষ্করিণীর স্থির জলে আবর্ত্ত জন্মিলে যেমন তাহা চারিদিকের জল হইতে পৃথক দেখায়, তেমনই সর্ব্বব্যাপী অতীন্দ্রিয় আকাশের কোন স্থানে আবর্ত্ত জন্মিলে তাহা জড়ের আকার ধারণ করে। কথাটা মোটামুটি এই।

তবে আমরা যাহাকে জড় বলি, তাহা আবর্ত্তিত আকাশ মাত্র। আকাশে আবর্ত্ত জন্মাও, জড় সৃষ্টি হইবে; আবর্ত্ত ভাঙ্গিয়া দাও, জড় আকাশে লীন হইবে। তবে আর জড়ের বিনাশ ও সৃষ্টি তত কঠিন কর্ম্ম কি? খুব শীতে বা অন্য উপায়ে আকাশাবর্ত্ত ভাঙ্গিতে পারিলে, এবং প্রচণ্ড তাড়িতে বা ইহার মত কোন প্রচণ্ড শক্তি দ্বারা আবর্ত্ত উৎপাদন করিতে পারিলে, জড়ের ধ্বংস বা সৃষ্টি করা বাকি থাকিবে না।

শুধু কি তাই? যে কোন পদার্থই তখন ইচ্ছামত উৎপাদন করিতে এবং তেমনই ইচ্ছামত তাহাকে শূন্যে মিলাইতে পারা যাইবে। যেখানে এখন কোন জড় দেখিতেছি না, মনে করুন একটা গ্রহ, সেখানে একটা গ্রহের সৃষ্টি হইতে পারিবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সাহিত্যিক।

প্রসিদ্ধ রাসায়নিক আবিষ্কর্ত্তা অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডি এস্‌সি কয়েক বৎসর হইতে প্রাচীন হিন্দুদিগের রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। তাঁহারা সেকালে এ-বিদ্যার কতটা উন্নতি করিয়াছিলেন, তিনি তাহার ইতিহাস লিখিতেছেন। এতদর্থে তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া ভারত-বর্ষের নানা প্রদেশ হইতে হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে তিনি এবিষয়ে আর্থিক ও অন্যবিধ সর্ব্বপ্রকার সাহায্য পাইয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার পুস্তকের প্রথমখণ্ড যন্ত্রস্থ হইয়াছে। ইহা ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইয়াছে। প্রথমখণ্ড রয়েল আটপেজী আকারের আনুমানিক ৪৫০ পৃষ্ঠা পরিমিত হইবে। তন্মধ্যে গ্রন্থের ঐতিহাসিক উপক্রমণিকা প্রায় ১০০পৃষ্ঠা পরিমিত হইবে। গ্রন্থকার ঋগ্বেদে, বিশেষতঃ অথর্ব্ববেদে alchemy তে বিশ্বাসের সূচনা পাইয়াছেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে ঋগ্বেদের সময়ের আর্য্যেরা সোমরসকে এক প্রকার "রসায়ন" মনে করিতেন। অথর্ব্ববেদ হইতেই আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি। আয়ুর্ব্বেদ একটি অথর্ব্ববেদোপাঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রথমভাগের নাম আয়ুর্ব্বেদিক যুগ রাখা হইয়াছে। ইহাতে চরক সুশ্রুতে রসায়ন সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে,তাহা সংগৃহীত হইয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে ডাক্তার রায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের এক অধিবেশনে বলিয়াছিলেন,—"এই চরক সুশ্রুত সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকে অনেক কথা বলেন। এডিন-বরার ডিউগাল্‌ড্‌ ষ্টুয়ার্ট বলেন, এসকল তথ্য ব্রাহ্মণেরা গ্রীকদিগের নিকট হইতে চুরি করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে। ক্ষার-কর্ম্ম নামে যে অধ্যায় আছে, তাহাতে ক্ষারভেদে আধার পাত্রাদির যেরূপ ব্যবস্থা দেখা যায়, আমি সেগুলি নিজে পরীক্ষা করিয়া অজ্ঞাতপূর্ব্ব ফল পাইয়াছি।

যদি এই অধ্যায়টি কেবল মাত্র অনুবাদ করিয়া রস্কোর রসায়ন গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহা কোন মতে তাঁহার ন্যায় রসায়নবিদের পক্ষেও লজ্জাকর হয় না।” আয়ুর্ব্বেদিক যুগের পরই তান্ত্রিক যুগ। এই যুগে বহুসংখ্যক রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই যুগ আনুমানিক ৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৬০০ বর্ষব্যাপী। পুস্তকের এই অংশে গ্রন্থকার রসার্ণব, রসরত্নসমুচ্চয়, রসরত্নাকর এবং অন্যান্য তান্ত্রিক গ্রন্থ হইতে অনেক সানুবাদ মূল সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তান্ত্রিক যুগে ভারতবর্ষে রাসায়নিক জ্ঞান যতদূর বিকাশলাভ করিয়াছিল, ইউরোপে ঐযুগে রসায়নজ্ঞান তদপেক্ষা অনেক কম ও নিকৃষ্ট ছিল। গ্রন্থকার নিজের এই সিদ্ধান্ত কপ (Kopp) এবং বার্ত্তেলো (Berthelot) প্রণীত প্রামাণিক জর্ম্মান ও ফরাশিশ গ্রন্থনিচয় (Geschicte der chemie, Histoire de chimie ইত্যাদি) হইতে অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়া সমর্থন ও সপ্রমাণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ভাগে কার্য্যগত রসায়ন (applied chemistry) বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুরা metallurgy তে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন এই অংশে তাহার বৃত্তান্ত আছে। গ্রন্থখানিতে তীর্য্যক্পাতন (distillation), অধঃপাতন, ভস্মীকরণ (Incineration) ধাতুসত্ত্বপাতন(extraction of a metal from the ores) ইত্যাদি প্রক্রিয়া দেখাইবার জন্য বহুসংখ্যক কাষ্ঠখোদিত প্রতিকৃতি আছে। পুস্তকখানি দেখিবার জন্য আমরা আগ্রহান্বিত হইয়া রহিলাম। ডাক্তার রায় পরিষদের জন্য রাসায়নিক পরিভাষা লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আমাদের আশা ও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে তিনি যেন অবসর মত হিন্দুরসায়নের ইতিহাসের একখানি অন্ততঃ সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদও বাহির করেন।

***

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বাঙ্গালা ভাষায় একখানি হিন্দু জ্যোতিষের ইতিহাস লিখিয়াছেন। পুস্তকখানির নাম “আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ”। লেখক গ্রন্থখানিকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমখণ্ডে বৈদিককাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আমাদের প্রধান প্রধান জ্যোতিষিগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। গ্রন্থকার ইহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্যোতিষের ক্রমোন্নতি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে হিন্দু জ্যোতিষ। এই অংশ প্রস্তাবত্রয়ে বিভক্ত। পুরাণে, জ্যোতিসসংহিতায় ও জ্যোতিষসিদ্ধান্তে যে যে জ্যোতিষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের বিবরণ এই তিন ভাগে দেওয়া গিয়াছে। জ্যোতিষসিদ্ধান্ত পৃথক্ রাখিয়া গ্রন্থকার অপরাপর বিষয়গুলি পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই খণ্ড প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা হইবে। তিন চারি মাসের মধ্যে এই প্রথম খণ্ড ছাপা শেষ হইবার কথা। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বিষয়গুলি শুনিয়াই গ্রন্থকারকে পুস্তকখানি ইংরাজিতে অনুবাদ করিবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। স্বয়ং প্রুফ দেখিবার ভার পর্য্যন্ত লইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই গ্রন্থখানির গুরুত্ব বুঝা যাইবে।

***

কৃষিবিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, “প্রবাসীতে” শর্করাবিজ্ঞান নাম দিয়া যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছেন, তৎসমুদায় মহাজনবন্ধুনামক উৎকৃষ্ট ব্যবসাবিষয়ক মাসিকপত্রে পুনর্মুদ্রিত হইতেছে, এবং তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র পুস্তিকার আকারেও পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তিকাতে কিছু সামান্য সামান্য পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে এবং চিনি প্রস্তুত করিবার এক নূতন যন্ত্র ও প্রক্রিয়ার নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটি সংযুক্ত হইয়াছে।

“কটকের দক্ষিণে বার্হামপুর সহরের ১২ ক্রোশ অন্তরে জে, এফ্, ভি, মিঞ্চিন (Mr J F V Minchin) সাহেব স্থাপিত আস্কা সুগার ওয়ার্কস নামক চিনির কারখানায় এক অভিনব উপায়ে চিনি প্রস্তুত হইতেছে। ইক্ষুদণ্ডগুলি পেষিত না হইয়া কেবলমাত্র ইহাদের বিশেষ একটী কলের দ্বারা চিরিয়া লওয়া হয়। এই সকল চেরা আক্ কতকগুলি নলের মধ্য দিয়া চালিত হয়। প্রত্যেক নলের মধ্যে অতিশয় উষ্ণ জল থাকাতে, এবং চেরা আক্‌গুলি একটী নল হইতে অপর একটী নলে চালিত হওয়াতে, সমস্ত শর্করাভাগ ঐ উষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত হয়; এবং জৈব পদার্থগুলি উষ্ণতাপ্রযুক্ত কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। ইক্ষুদণ্ডে স্বভাবতঃ যে ৯০ বা ৯১ ভাগ রস থাকে, উহার ৮৪ হইতে ৮৬ ভাগ এই উপায়ে বাহির হইয়া আইসে। পরে নল

গুলির মধ্যস্থিত উষ্ণজল ভাল করিয়া ছাঁকিয়া স্ফটিকের ন্যায় পরিণত করিয়া লইয়া শুকাইয়া উহা চিনিতে পরিণত করা হয়। প্রত্যহ ৭০০০ মণ ইক্ষুদণ্ড এই উপায় দ্বারা পরিষ্কার শর্করাতে পরিণত করিতে হইলে, ৪ লক্ষ টাকা দিয়া কল বিলাত হইতে আনাইতে হয়। এই কল প্রেগ্ (Prague) সহরের Böhmisch Mährische-Maschine fabrik কারখানায় পাওয়া যায়।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় Handbook of Indian Agriculture নামক একখানি প্রায় সহস্রপৃষ্ঠাব্যাপী উৎকৃষ্ট কৃষিবিষয়ক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী, সুতরাং এরূপ পুস্তক যে কতদূর প্রয়োজনীয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শিক্ষিত কৃষিজীবী গৃহস্থ মাত্রেরই ইহা কাজে লাগিবে। অনেকে বলেন যে আমাদের দেশের নিরক্ষর চাষারা যে ভাবে চাষ করে, তাহার উপর আর কোন দেশোপযোগী উন্নতি করা যায় না। গ্রন্থকার সেরূপ মনে করেন না। অন্যদেশের কথা দূরে থাক, আমাদের এই ভারতবর্ষেই মান্দ্রাজ অঞ্চলে তিনি বঙ্গদেশ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট চাষের প্রণালী দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষীয় কৃষকেরা রক্ষণশীল বটে, কিন্তু, তাহাদের চক্ষের সমক্ষে নূতন যন্ত্র বা প্রক্রিয়ার সুবিধা দেখাইয়া দিলে তাহারা তাহা অনায়াসে অবলম্বন করে। মান্দ্রাজে একটি কৃষিবিষয়ক কলেজ আছে। পুনা এবং শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কৃষিবিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রদেশে কানপুরে যে কৃষিবিদ্যালয় আছে, তাহাকে কলেজে পরিণত করা হইবে এবং তথাকার উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৈজ্ঞানিক উপাধি (Degrees in Science) দেওয়া হইবে। পরীক্ষার বিষয়াদি স্থির করিবার জন্য মাননীয় বাবু শ্রীরাম রায় বাহাদুর এবং মেঃ কক্স্, ওয়ার্ড ও হিলকে লইয়া সেনেট একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। ইহাঁরা শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর এবং কৃষিবিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টরের সহিত পরামর্শ করিয়া সমুদয় বিষয় স্থির করিবেন। বঙ্গদেশেও এইরূপ বন্দোবস্ত হইলে ভাল হয়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকখানির একখানি সংক্ষিপ্ত বাঙ্গলা সংস্করণ হইলে ইংরাজী অনভিজ্ঞ অনেক গৃহস্থ উপকৃত হইবেন।

***

কয়েকমাস হইল, আমরা 'সত্যবেদ' নামক একখানি পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা "শ্রীলক্ষ্মণ মজুমদার সঙ্কলিত। Published by R. K. M" 'বেদবেত্তা' ব্রহ্মদেশান্তর্গত Rathedaung, Akyab Districtএ বাস করেন। তাঁহার পুস্তকখানি 'অভিনব গদ্যে' লিখিত। ভূমিকায় আছে—

"উল্লিখিত নব গদ্যভাষাকে সত্যবেদ-সঙ্কলয়িতা শৈশবাবস্থা হইতেই প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া আসিতেছেন; বিশেষতঃ এবম্বিধ গদ্যের যৎপরোনাস্তি মধুরতা অনুভাবিতে পারাতেই ইহার দিকে তাঁহার এতাদৃশ ঝুঁক। সময়ে ইহাই যে বঙ্গভাষার যথোপযুক্ত গদ্যরূপে সর্ব্বসাধারণ জনগণ কর্ত্তৃক সাদরে স্বীকৃত হইবে, ইহাঁর আশা এরূপ বলেন। এই অভিনব গদ্য যে, অনর্থক সময় নষ্ট হইতে পরিশ্রমী কর্ম্মব্যস্ত বিষয়ী ব্যক্তিবর্গকে উদ্ধার করিবে, এতদ্বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নাই। দিন দিন লোককে উদরপূজার জন্য অত্যধিক পরিশ্রমিতে হইতেছে, কাজেই বৃথা সময় ব্যয় তাহার সহিয়া উঠা ভার। অনর্থক সময় নষ্ট হইতে ইহা কিরূপে আমাদিগকে উদ্ধারিবে, এতদ্বিষয়ের একটি উদাহরণ দিতেছি; যথা, এখন আমরা বলিয়া থাকি 'ভক্ষণ করিব;' এই নব গদ্যের প্রচারে আমাদিগকে বলিতে হইবে, ভক্ষিব। এখানে দেখুন একটি শব্দের বৃথা উচ্চারণ হইতে আমরা রক্ষা পাইতেছি। আরও একটি বিশেষ কারণ এই যে, বঙ্গভাষার 'করা' 'ধরা' প্রভৃতি মূল ক্রিয়াবাচক শব্দের নিতান্ত অভাব; এই অভাবপ্রযুক্ত একটি 'করা' ও একটি 'হওয়া' মূলক শব্দদ্বারা সমস্ত ক্রিয়াবাচক পদের সম্পাদনে আমাদিগকে বাধ্য হইতে হয়; এতন্নিবন্ধন এক শব্দের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে ভাষায় শ্রুতিকঠোরতা দোষ বর্ত্তে।"

মূল পুস্তকের একটু নমুনা উদ্ধার করিয়া দিতেছি—

"ইংরাজ ভারতে আগমিবার পূর্ব্বে, কে পূর্ব্বজন্মে এরূপভাবে কর্ম্মিয়াছিলেন যে, ইংরাজ আমলে তিনি প্রধান পণ্ডিত বা হাইকোর্টের শ্রেষ্ঠ জজ হইবেন? ব্রিটিশ ত্রিদেশে পশিবার পূর্ব্বে সমস্ত নিম্নজাতীয়দের কর্ম্মফলে কপালে ছিল কেবল ব্রাহ্মণের দাসত্ব প্রভৃতি নীচ কর্ম্ম করিতে, আর যেমনি ইংরাজ ভারতে আসিলেন, অমনি তাহাদের কর্ম্মফল হইল, প্রভুত্বিতে রাজত্বিতে। আহা রে হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মফল।

ধিক্ তোরে শতবার! পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল শিক্ষা দেওয়া আর হাত পা থাকিতে লোককে পঙ্গাইয়া বা পঙ্গু করিয়া রাখা একই কথা।"

***

"বঙ্গসাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমরা দুইখানি পত্র পাইয়াছি। প্রথমখানিতে শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু লিখিয়াছেন—'জগদানন্দ ব্রাহ্মণ নহেন বৈদ্য; তাঁহার নিবাস শ্রীখণ্ডে। তিনি যাত্রাদলে রাই সাজিতেন কি না, তাহা ভারতী মহাশয় ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। * * জগদানন্দ সম্বন্ধে বোধ হয় শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ মহাশয়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুসন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধানের ফল ৫ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যা সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় প্রায় ৩ বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে। * * জগদানন্দ একজন শাব্দিক কবি ছিলেন। অনুপ্রাস যমক প্রভৃতিতে তাঁহার গীতগুলি সালঙ্কারা যোড়শী মৃন্ময়ী। উহাতে ভাবের প্রাণ নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ কবিরাজ, বা জ্ঞানদাসের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ তুলনাও চলে না। তাঁহার গীত কর্ণ পর্য্যন্ত পঁহুছে মাত্র। মহাভারতী মহাশয় জগদানন্দের অতিরিক্ত স্তুতি করিয়াছেন। ইতিহাসলেখকের পক্ষে এরূপ অতিরঞ্জন সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।" দ্বিতীয় পত্রখানিতে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি ঘোষ লিখিয়াছেন যে 'স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা বাবু লোকনাথ দাস সৎচাষী (চাষাধোপা), রজক নন"। শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ঘোষও কোন কোন বিষয়ে মহাভারতী মহাশয়ের ভ্রম প্রদর্শনার্থ একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন। দীনেশ বাবুর গ্রন্থ থাকিতে উহা প্রকাশ করা অনাবশ্যক।

***

আমরা "প্রবাসী"-পদকের জন্য সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটি রচনা পাইয়াছি; উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পঞ্জাব সম্বন্ধে ২টি, ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে দুটি ও বেহার সম্বন্ধে একটি। মধ্যপ্রদেশ সম্বন্ধে কোন রচনা আমাদের হস্তগত হয় নাই। এই পাঁচটির মধ্যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের রচনাটি পদকের যোগ্য হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাকে পদক দেওয়া যাইবে। অপর রচনাগুলিতেও অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। সেগুলি সম্পূর্ণ বা অংশতঃ মুদ্রিত হইতে পারে।

কাম ও প্রেম।

কামে প্রেমে বহুদূর যোজন যোজন!
কাম জানি, প্রেম কি যে জানে কোন্ জন?
কাম যেন কাদাখোঁচা কাদা ভালবাসে;
প্রেম সে কপোত যেন উড়য়ে আকাশে।
কাম যেন কুজ্ঝটিকা ধরাতে লোটায়;
প্রেম যেন সূর্য্যরশ্মি জলদের গায়।
কাম বরিষার গঙ্গা, ডুব, কাদা লাগে;
প্রেমের পরশে প্রাণে নব পুণ্য জাগে।
কাম যেন কারাবাস, ঘোর অধীনতা,
প্রেমেতে স্বাধীন করে, বাড়ায় উচ্চতা।
কাম গিল্টী সোণা, পাই দোকানে দোকানে,
প্রেমের হীরক মিলে দুই এক স্থানে।
প্রচণ্ড গোঁয়ার কাম বলেতে নির্ভর;
বলের নামেতে প্রেম শরমে কাতর।
কাম মুখে স্বর্গ দিয়ে ডুবায় নিরয়ে;
নিরয়ে পাইলে প্রেম স্বর্গে লয় বয়ে।
কামেতে স্বাতন্ত্র্য রাখে, ভোক্তা আর ভোগ্য;
প্রেমে দুটী এক হয় যেটি যার যোগ্য।
নৈকট্যে জাগয়ে কাম, ভোলে নেত্র-আড়ে,
দূরত্ব না মানে প্রেম বিচ্ছেদে সে বাড়ে।
কাম চায় বহুজনা, হেলে পুরাতন;
প্রেম লক্ষে এক চায়, সে চির-নূতন।
শুভযোগে শুভলগ্নে চোখোচোখি হয়,
দুটী প্রাণে একি সুর, দুটী প্রাণে লয়!
উভে পশে এক হয় যুগল মূরতি;
কি জানে তাহার তত্ত্ব কাম স্থূল-মতি?
হায়! কি বিচিত্র প্রেম! প্রেমের প্রভাবে
একের শকতি যায় অন্যের স্বভাবে!
শকতি শকতি মিলে লাগয়ে জোয়ার,
নদ নদী উভে মিলে হয় যে প্রকার।
এক হতে অন্যে লও, উভে শক্তি-হীন,
ভাঁটার সরিৎ যথা তটান্তে বিলীন!

উদ্ধারণদত্তের প্রতিমূর্ত্তি।

অশোকের সময় (২৫০ খৃঃ পূঃ) হইতে বঙ্গীয়বর্ণমালার ক্রম বিকাশ।

দুটী আঁখি সদা যদি ফুটে থাকে পাশে,
জগৎ সংসারে প্রেম ভূলে অনায়াসে।
সে দুটী বিরূপ হলে ভুবন আঁধার,
লক্ষ কোটী নর নারী ধূলি স্তূপাকার!
কাম রমণীরে দেখে পুষ্পের আঘ্রাণ,
বাসি হলে ফেলে দেও, অন্যে পাড় টান;
কাম দুষ্ট মুখে মিষ্ট নারীকে ভুলায়ে,
বিষম পঙ্কিল হ্রদে আসেগো ডুবায়ে;
মাঝে মাঝে যায় তথা, সে নহে তুলিতে,
অলি যথা যায় ফুলে সুখ টুকু নিতে।
নিজ সুখ চায় কাম, অন্য-সুখ প্রেম,
কাম দেখে ভোগ মাত্র, প্রেম দেখে ক্ষেম।
প্রেম রমণীরে পূজে ; তাহার সম্মান
রাখিবারে দিতে পারে দেহ মন প্রাণ;
লঘুচিত্ত নহে প্রেম ; তার সন্নিধানে,
শত সাধু চিন্তা জাগে সে জনার ধ্যানে।
মূর্খা নারী পুরুষের কুহকে ভুলিয়া,
প্রেম বলি কামে পূজে হৃদয়ে স্থাপিয়া;
অসার সে চাটুবাদে হয় আত্মহারা,
কামে ডুবে, নাহি দেখে প্রেমের কিনারা;
শেষেতে যখন জাগে, কাঁদে রাত্রিদিনে,
জোয়ারের মড়া যেন ভাটার পুলিনে!
সাধুচিত্তা নারী প্রেমে পারেগো চিনিতে,
আপনাকে দেয় তাই অপরে জিনিতে;
আপনা হারায়ে উভে পরস্পরে পায়,
দাসত্বে মহত্ত্ব শুধু দেখিগো হেথায়!
কাম ভাঙ্গে, প্রেম গড়ে গৃহ পরিবার,
প্রেমে প্রেমে প্রেম জাগে মিষ্ট ত্রিসংসার!
হৃদয় পবিত্র হয়, আত্মার নয়ন
খুলে যায়, দেখা দেয় ধর্ম্ম সনাতন!
তাই বলি কামে প্রেমে বহু ব্যবধান,
কাম এই স্থূল সৃষ্টি, প্রেম ভগবান্!

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"।*

দ্বিতীয়সংস্করণে এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানির বাহ্যসৌন্দর্য্য যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, লিখিত বিষয়েও তদ্রূপ অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।

এই পুস্তকখানিকে আমরা বাঙ্গালী জাতির একটি গৌরবের বস্তু বলিয়া মনে করি। ইহা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আমরা জানিতাম না যে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য কত পুরাতন ও ঐশ্বর্য্যশালী। ইহা পড়িয়া আমরা যে কেবল জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ আনন্দও উপভোগ করিয়াছি। যে বাঙ্গালা পুস্তকালয়ে ইহা নাই, তাহা অঙ্গহীন; যে শিক্ষিত বাঙ্গালী ইহা পড়েন নাই, অবিলম্বে তাঁহার ইহা পড়া উচিত। কেহ যেন মনে না করেন যে আমরা পুস্তকখানিকে নিখুঁত বলিতেছি। ইহাতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ আছে, কিন্তু গুণের তুলনায় সেগুলি ধর্ত্তব্য নহে। আমরা পুস্তকখানির সমালোচনা করিতে অক্ষম। কারণ, যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া দীনেশ বাবু ইহা লিখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ভবিষ্যতে পুস্তকখানির অধিকতর বিস্তৃত পরিচয় দিবার ইচ্ছা রহিল।

নূতন সংস্করণে কতকগুলি সুন্দর চিত্র সংযোজিত হইয়াছে। যথা—(১) কয়েকটি পালী অক্ষরের নমুনা। (২) বঙ্গীয় বর্ণমালার ক্রমবিকাশ। (৩) সেনরাজগণের লিপিনিদর্শন। (৪) দক্ষিণ রায়ের প্রতিমূর্ত্তি। (৫) চণ্ডীদাসের ভিটা (উত্তর-পূর্ব্ব দৃশ্য)। (৬) চণ্ডীদাসের ভিটা (দক্ষিণ-পূর্ব্ব দৃশ্য)। (৭) বাশুলী দেবী। (৮) বাশুলী মন্দির। (৯) চৈতন্য প্রভু ও পারিষদবৃন্দ। (১০) কবি জগদানন্দের হস্তাক্ষরের নিদর্শন। (১১) ১০৬৮ সনের একখানি প্রাচীন চৈতন্যভাগবত পুঁথির মলাটস্থ সংকীর্ত্তনের তৈলচিত্রের প্রতিলিপি। (১২) উদ্ধারণ দত্তের প্রতিমূর্ত্তি। (১৩) হরিলীলার অন্যতম কবি আনন্দময়ীর বংশোদ্ভবা ত্রিপুরাসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক ৭০ বৎসর

---

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। (ইংরেজ প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত)। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বি. এ., প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। পরিশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত। প্রকাশক—সান্যাল এণ্ড কোম্পানি, কলিকাতা। মূল্য চারি টাকা। বিশেষ সংস্করণ দশ টাকা।

পূর্ব্বে লিখিত হরিলীলা পুঁথির এক পত্রের প্রতিলিপি। ইহার মধ্যে গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ আমাদিগকে "বঙ্গীয় বর্ণমালার ক্রমবিকাশ" ও "উদ্ধারণ দত্তের প্রতিমূর্ত্তি" প্রবাসীতে পুনর্মুদ্রিত করিতে অনুমতি দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। এই চিত্রগুলি ভারতমিহিরযন্ত্রে মুদ্রিত।

দীনেশ বাবু দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন "এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই আমি উৎকট শিরোরোগে আক্রান্ত হই। প্রায় দুইবৎসর কাল উত্থানশক্তিরহিত ও শয্যাশায়ী হইয়া এখন কিঞ্চিৎ সুস্থতালাভ করিয়াছি। এখনও মাসে মাসে রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং তজ্জন্য আমাকে অনেক দিনের জন্য শয্যাগত থাকিতে হয়। ফলে এ জীবনে আর কখনও যে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া কাজের যোগ্য হইব, এরূপ আশা করি না।" গবর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তি দিতেছেন। সাহিত্যিক বৃত্তি আমাদের দেশে তিনিই প্রথম পাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও নিজ কর্ত্তব্য করিয়াছেন। আমরা সকলে দীনেশবাবুর গুণের সমাদর করিতে পারিলে তাঁহার কার্য্যকারিতা বাড়ে, ও দেশেরও মুখ উজ্জ্বল হয়।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পঞ্জাবে বাঙ্গালী।

সাধারণের বিশ্বাস বাঙ্গালীর প্রবাসবাসের আদি কারণ চাকরী। এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক না হইলেও উহা মূলকারণ নহে। চাকরীর জন্য বাঙ্গালীর প্রবাসবাস মুসলমানদিগের আমল হইতে কতকটা আরম্ভ হইয়া ইংরাজ রাজত্বে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। উহার পূর্ব্বে হিন্দুরাজসরকারে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী মসীজীবী প্রবাসী হইয়াছিলেন কি না, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে বাঙ্গালী যে সৃষ্টির আদি হইতে ভীরুস্বভাব এবং কূপমণ্ডূক প্রকৃতি ছিল না, বাঙ্গালী যে দেশান্তরে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, বাঙ্গালী যে যুদ্ধ করিতে জানিত, বাঙ্গালীর রণতরী এবং বাণিজ্যতরী ছিল, ইতিহাস তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করে। এই সকল সত্য অতি প্রাচীনকাল হইতে দেশীয় ও বৈদেশিকগণের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়া আসিলেও বাঙ্গালীর ঔপনিবেশিকতা, যুদ্ধযাত্রা ও বাণিজ্যের কথায় লোকে হাসিয়া উঠে! এই জন্য বাঙ্গালীর সামান্য পরিচয় দিয়া তাহার উত্তর-পশ্চিম অযোধ্যা ও পঞ্জাব প্রবাসের কথা বলিব। মহাবীর আলেকজাণ্ডার খ্রীঃ পূর্ব্ব ৩২৭ অব্দে ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিজ আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সিলিউকস্ কর্ত্তৃক পাটলীপুত্রে প্রেরিত হন। তিনি বঙ্গদেশ স্বচক্ষে দেখিয়া বঙ্গের ঐশ্বর্য্য ও বিস্তৃত বাণিজ্যের বিষয় অনেক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সে আজ দুই হাজার দুইশত বৎসরের কথা। তাঁহার বহু পরবর্ত্তী পণ্ডিতবর প্লীনি বাঙ্গালীর সামরিক শক্তির* উল্লেখ করিয়াছেন। বর্দ্ধমান, সুবর্ণগ্রাম, ঢাকা, যশোহর,পাটলীপুত্র,গৌড়, মালদহ প্রভৃতি স্থান বৈদেশিকগণের নিকট বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল বলিয়া পরিচিত ছিল। ভারতীয় প্রদেশসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে টলেমি বঙ্গের কত নদ নদী গ্রাম নগর লোকজন ব্যবসায় বাণিজ্য রীতি নীতি প্রভৃতির কথা লিখিয়াছেন এবং এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন যে বোধ হয় তাঁহার উপকরণগুলি† ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ না করিলে তিনি ততদূর কৃতকার্য্য হইতেন না। দিল্লীর কুতবমিনার যথায়

* "* * * This Great people occupied all the country about the mouths of the Ganges * * * * * They must have been a powerful people, to judge from the military force which Pliny reports them to have maintained and their territory could scarcely have been restricted to the marshy jungles at the mouth of the river now known as the Sunderbans, but must have comprised a considerable portion of the province of Bengal."—Page 173-175, Ancient India as described by Ptolemy and translated by J. W. McCrindle, M.A., M.R.A.S.

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পূর্ব্ববঙ্গবাসী বিহার জয় করিয়াছিল, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। "সেন রাজগণ বারাণসী পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। গঙ্গাবংশীয়গণ উদ্ধত পাঠানগণকে তিন শত বৎসর ধরিয়া যেরূপে শাসিত রাখিয়াছিলেন, সেরূপ চিতোরের রাজবংশ ভিন্ন আর কোন হিন্দু রাজবংশ পারেন নাই। তাঁহারা যেমন বাঙ্গালায় মুসলমানদিগকে শাসন করিয়াছিলেন, দক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজাদিগকেও তেমনি শাসিত রাখিয়াছিলেন"—প্রচার—শ্রাবণ ১২৯১।

† "It *evident* that he was indebted for his materials here chiefly to native sources of information and *itineraries* of *merchants* or caravans." P.105, *ibid.*

বিদ্যমান, সেই প্রাঙ্গণে একটি ২২ ফুট উচ্চ ঢালাইকরা লৌহের নিরেট স্তম্ভ* আছে। ঐ স্তম্ভ ৪১৫ খৃঃ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত কর্তৃক স্থাপিত হয়। ঐ স্তম্ভে তাঁহার সহিত ও বঙ্গদেশের অধিপতিগণের সহিত যুদ্ধের বর্ণনা আছে। এই সকল এবং অন্যান্য গ্রন্থাদি হইতে জানা যায়, বাঙ্গালী-প্রকৃতি ভীরু নহে এবং বাণিজ্যব্যপদেশে তাহার সহিত বৈদেশিকগণের আদান প্রদান ছিল। বাঙ্গালী দেশবিদেশে স্থলপথে ও জলপথে গমনাগমন করিত। চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান বঙ্গের প্রধান বন্দর তাম্রলিপ্ত (তমলুক) হইতে বাঙ্গালীর অর্ণবপোতে চড়িয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। বঙ্গের শিল্পজাত দ্রব্য যদিও প্রকারভেদে অধিক ছিল না, তথাপি যেগুলি ছিল, তাহাতেই বাঙ্গালী, ভারত কেন, জগতের সকল জাতিকেই পরাস্ত করিয়াছিল। এখনও কোন কোন বিষয়ে পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।† গ্রীস, রোম, মিসর, পারস্য, তুরস্ক, প্রভৃতি দেশে বাঙ্গালী সওদাগরগণ এই সকল দ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিত। এসিয়ামাইনর এবং মিসর হইয়া ঢাকাই মসলিন পশ্চিম ইউরোপে রপ্তানি হইত। কতিপয় বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ রোমের বাদশাহের নিকট তৎকালীন বঙ্গাধিপের পত্র ও উপঢৌকন লইয়া গিয়াছিলেন। বোগদাদের খলিফাগণের বিলাসভবন বঙ্গের কারুকার্য্যখচিত শিল্পজাত দ্রব্য দ্বারা সজ্জিত হইত। আমাদের দেশে শিল্পসাহিত্য বার্ত্তা বাণিজ্য সমস্ত থাকিলেও নানা কারণের সমবায় বশতঃ বাঙ্গালী বাঙ্গালীর জীবনচরিত ও ইতিহাস এবং কেবল পার্থিব বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়া যান নাই। এই জন্যই প্রাচীন সাহিত্যে কেবল ধর্ম্মবীরগণের কীর্ত্তি জাজ্বল্যমান। তাহা না হইলে শত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের ইতিহাসে, বাঙ্গালী ধনপতি, চাঁদ, শ্রীমন্ত, ও বেণী সওদাগর প্রমুখ উচ্চচরিত্রজনের নাম দেখা‡ যাইবে কেন? খৃষ্ট জন্মিবার ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর সিংহল বিজয় ও তথায় উপনিবেশ স্থাপনের কথা অনেকেই জানেন। বঙ্কিমবাবু তাই লিখিয়াছিলেন "কাম্বেল সাহেব যখন বাঙ্গালার প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন বাঙ্গালীরা আসিয়া খণ্ডের মধ্যে এথিনীয় জাতীর সদৃশ। বাস্তবিক একদিন বাঙ্গালীরা আর কিছুতে না হউক ঔপনিবেশিকতায় এথিনীয়দিগের তুল্য ছিল। সিংহল বাঙ্গালীকর্তৃক পরাজিত এবং পুরুষানুক্রমে অধিকৃত ছিল। যবদ্বীপ ও বালীদ্বীপ বাঙ্গালীর উপনিবেশ, ইহাও অনেকে অনুমিত করেন। তাম্রলিপ্তি ভারতবর্ষীয়ের সমুদ্রযাত্রার স্থল ছিল। ভারতবর্ষীয় আর কোন জাতি এরূপ ঔপনিবেশিকতা দেখান নাই।" (বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৯২ সং, ২০২ পৃষ্ঠা)। তিব্বতের ইতিবৃত্তে আছে যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামক একজন বাঙ্গালী বৌদ্ধসন্ন্যাসী দ্বাদশশতাব্দীতে তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। যে জাতি বাণিজ্যতরী সাজাইয়া দেশদেশান্তরে যাইতে ভীত হইত না, সেই জাতি বাণিজ্যব্যপদেশে এক প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে গমন করিত, তাহা একপ্রকার অনুমানসিদ্ধ। আর্য্যাবর্ত্ত যখন ধর্ম্ম, সাহিত্য, শিল্পবিজ্ঞান, বীরত্ব, এবং বিবিধ ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্রভূমি, শিল্প এবং কৃষিজাত বাণিজ্যই তখন সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী বঙ্গের প্রধান সম্বল ছিল। সে দিন পর্য্যন্ত বঙ্গের বাণিজ্য অপ্রতিহত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ অর্ম্ম লিখিয়া গিয়াছেন, "অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশের বাণিজ্যই সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল।" বাণিজ্যই যে জাতির প্রধান সহায়, সে জাতি যে দূর দূরান্তরে প্রবাসী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান মাড়ওয়ারীগণ তাহার সাক্ষী। ইংরাজের ত কথাই নাই। ইংরাজ যে বাণিজ্যপ্রধান বঙ্গে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?

ঐতিহাসিককাল অতিক্রম করিয়া পৌরাণিক সময়ের সন্ধান করিলে দেখা যায়, বাঙ্গালী তখনও ধর্ম্মার্থে প্রবাসী হইয়াছে। ভারতের প্রাচীনতম মহাতীর্থ-সকল উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্চনদ প্রদেশে অবস্থিত হওয়ায়, দাক্ষিণাত্য ও বঙ্গদেশ হইতে লোকজন আসিয়া তীর্থবাস করিত না, একথা কেহ বলিতে পারেন না। ২৪৪৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে কাশ্মীররাজ প্রথম গোনর্দ্দের সময়ে যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

* Valentine Ball's "Economic Geology of India."—Page 338, and Vincent Smith's "Ancient History of India" published at page 8 of the Journal of the Royal Asiatic Society, 1897.

† ". . . . Although the manufactures of Bengal be not of a varied character, still a high excellence was attained in certain branches in which to this day the Bengalis have not been surpassed by any nation in the world."—A Hand book of Indian Products, by T. N. Mukharji, Cal., 1883.

‡ বিশ্বকোষ ৪১১—১২ পৃষ্ঠা।

অর্জ্জুনের প্রপৌত্র জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে অনেক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ আহুত হইয়াছিলেন। উক্ত যজ্ঞে যাঁহারা আহুত হন, তাঁহারা বঙ্গে ফিরিয়া যান নাই। তাঁহাদেরই বংশাবলী গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।* বিশ্বকোস-সম্পাদক মহাশয় ইহার† বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু এখনও ইহা তর্কস্থল হইয়া আছে। কেহ কেহ বলেন, এই গৌড়ীয়গণ বাঙ্গালীই হইবেন, কারণ বঙ্গদেশ বহুকাল হইতে সর্পবশীকরণ এবং নানাবিধ যাদুমন্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিমের অনেক গ্রামবাসীর এখনও সে ধারণা যায় নাই। পঞ্জাবে সাপুড়ের ন্যায় একটা অসভ্য জাতি আছে, তাহারা নানাবিধ তন্ত্রমন্ত্রের অনুষ্ঠান করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। তাহারা বাঙ্গালী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী মুসলমান "হোসেন খাঁর" অদ্ভুতশক্তি উত্তর-পশ্চিম ও পঞ্জাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও এতদ্দেশীয়গণের উক্ত ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়া গিয়াছে।

যাহা হউক পৌরাণিক সময়ের কথা ছাড়িয়া, আধুনিক ঐতিহাসিক যুগে এতদঞ্চলে বাঙ্গালীর সংস্রব দেখা যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেন দিল্লীতে দশ বৎসর রাজত্ব করেন*। ইনি বারাণসী, প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে বিজয়স্তম্ভ† স্থাপন করেন। ইঁহার সভাপণ্ডিত গীতগোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব গোস্বামী। জয়দেব পরিব্রাজকের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া শিষ্যগণসমভিব্যাহারে নানা স্থান পর্য্যটন করতঃ ধর্ম্মঘোষণা করিয়াছিলেন। ইনি জাতিভেদের উচ্ছেদ করতঃ নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মধ্যে পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়া সংসারী হন, পরে পুনরায় পরিভ্রমণে বহির্গত হন। কিন্তু তাঁহার ভ্রমণের মধ্যে একমাত্র বৃন্দাবন ও জয়পুর প্রবাসের উল্লেখ দেখা যায়‡। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ রাজত্ব করেন। তাঁহার জীবনচরিতলেখক চাঁদবর্দাই কর্ত্তৃক পৃথ্বীরাজরায়সাতে জয়দেবের উল্লেখ আছে। এদেশে জয়দেবের নাম পরম ভক্তির সহিত উচ্চারিত হয়। ইঁহার প্রসিদ্ধির বিষয় এই বলিলেই হইবে যে সুদূর কাশ্মীর পর্য্যন্ত তাঁহার যশ-সৌরভ পৌঁছিয়াছিল। তথায় তাঁহার গীতগোবিন্দের গান হইত। রাজতরঙ্গিণী ও রাজস্থানে অনেক স্থলে ইঁহার বিষয় লিখিত আছে। [ক্রমশঃ।]

* Census of the N.-W. P., 1865.

† বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড ২য় ও ৩য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬১—৭২।

* জয়দেবচরিত, পৃষ্ঠা ৩০

† ৺ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এম.এ বি.এল; প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস।

‡ ভক্তমাল, দ্বাদশমালা।

নিবেদন।

প্রবাসী বঙ্গদেশের বাহির হইতে প্রকাশিত হওয়ায় অনেক অসুবিধা ঘটে। তজ্জন্য আমরা এবারেও দুই সংখ্যা একত্র বাহির করিতে বাধ্য হইলাম। ৭২ পৃষ্ঠা অর্থাৎ পূর্ণ দুই সংখ্যা অপেক্ষা ৮ পৃষ্ঠা অধিক দিলাম। ১ম অর্থাৎ বৈশাখ সংখ্যার ২য় সংস্করণ হইয়াছে। ঐ সংখ্যা বা অন্য কোন সংখ্যা হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। নয় সংখ্যায় আমাদের ২৮৮ পৃষ্ঠা লেখা দিবার কথা। তৎপরিবর্ত্তে আমরা ৩৬০ পৃষ্ঠা দিয়াছি। এই নয় সংখ্যায় ১১৯ খানি ছবি আছে।

শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ কার্য্যাধ্যক্ষ, এলাহাবাদ।

রবিবর্ম্মাকৃত সীতার পরীক্ষা

[INDIAN PRESS.

প্রবাসী

প্রথম ভাগ। মাঘ, ১৩০৮। ১০ম সংখ্যা।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

২। নাট্য-সাহিত্য।

ভারতীয় নাট্যশালার গৌরবস্বরূপ যে নাট্যসাহিত্য সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার কোন কোন গ্রন্থ কাল পরাজয় করিয়া অদ্যাপি আত্মগৌরবে জগদ্বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তল, ভবভূতির উত্তররামচরিত, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস, শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, শ্রীহর্ষের রত্নাবলী ও ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নাট্যসাহিত্যের সমুজ্জ্বল অলঙ্কার। এই সকল গ্রন্থ এখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকটেও যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় যথাযথ অনুবাদ না থাকায়, অনেকে এই প্রাচীন নাট্যসাহিত্যের রসাস্বাদে বঞ্চিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক প্রস্থ যথাযথ অনুবাদ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া সে অভাব দূর করিয়া দিয়াছেন। এই অনুবাদ রচনামাধুর্য্যে মূলগ্রন্থের রসাস্বাদের যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারিবে, এবং বঙ্গসাহিত্যের সমুচিত গৌরববর্দ্ধন করিবে। যাঁহারা সংস্কৃতভাষাশিক্ষার ক্লেশ স্বীকারে পরাঙ্মুখ, তাঁহারা এখন বঙ্গভাষার সহায়তায় এই সকল পুরাতন নাটকের রসমাধুর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যাঁহারা নাটকোক্ত লোকব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পুরাতত্ত্ব সংকলন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে মূল নাটক পাঠ করিয়া পরিশ্রান্ত হইবার আর প্রয়োজন হইবে না।

নাট্যসাহিত্যের সাধারণ নাম রূপক। রূপের আরোপ করা হয় বলিয়া ইহার নাম রূপক। নাট্যসাহিত্য অভিনয়াত্মক। সুতরাং বিশুদ্ধ শ্রব্যকাব্যের ন্যায় পাঠ বা শ্রবণ মাত্রে তাহার সৌন্দর্য্য ও রসোৎকর্ষ উপভোগ করা যায় না। অভিনয়কালেই নাট্যসাহিত্যের প্রসুপ্ত রস প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে; যাহা অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় পদ্যগদ্যময় পদবন্ধে সঙ্কুচিত হইয়া ছিল, তাহা যেন সহসা কায়ারূপে নয়নসমক্ষে বিচরণ করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং নাট্যসাহিত্যের পক্ষে রূপক নামই সর্ব্বথা সার্থক।

রূপকের ন্যায় উপরূপকও প্রচলিত হইয়াছিল। রূপকের সংখ্যা দশ; উপরূপকের সংখ্যা অষ্টাদশ। নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথী, প্রহসন,—রূপকের অন্তর্গত। নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক ইত্যাদি—উপরূপকের অন্তর্গত। সমগ্র রূপক ও উপরূপক শ্রেণীর নাট্যসাহিত্য এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। রূপকান্তর্গত শকুন্তলাদি নাটক, মৃচ্ছকটিক প্রকরণ, এবং উপরূপকান্তর্গত রত্নাবলী নাটিকা, কালপরাজয় করিয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; অন্যান্য গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দশরূপক ও অষ্টাদশ উপরূপকাত্মক কি বিপুল নাট্যসাহিত্যই ভারতবর্ষে সমুদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও বিস্মিত হইতে হয়! কোন সাহিত্যেরই জন্মকালে শ্রেণীবিভাগ হয় না। কালক্রমে বহুসংখ্যক গ্রন্থ প্রচলিত হইলে, পার্থক্য রক্ষার জন্য শ্রেণীবিভা-

গের প্রয়োজন হইয়া থাকে। যখন ভারতীয় নাট্যসাহিত্য এইরূপ শ্রেণীবিভক্ত হইয়াছিল, তখন যে তাহা বিপুলাকারে বর্ত্তমান ছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে কাংক্রংকারে ধূলিপটলের ন্যায় সে বিপুল নাট্যসাহিত্য না জানি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে! যাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা লইয়াই নাট্যসাহিত্যের ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে পরিতৃপ্ত হইতে হইবে। সাহিত্যদর্পণের ন্যায় আধুনিক গ্রন্থেও যে সকল রূপক ও উপরূপক উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারও সকল গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। কালপ্রভাব এতই দুরতিক্রমনীয়!

ভারতীয় নাট্যসাহিত্য কত পুরাতন, তাহার কাল নির্ণয় করিবার উপায় নাই। ভরতবিরচিত অতি পুরাতন নাট্যশাস্ত্রেও পূর্ব্বপ্রচলিত নাটকাদির নাম ও সঙ্গীত উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার সন্ধান পাইবার উপায় নাই, তাহার জন্য নিষ্ফল বিলাপ পরিত্যাগ করিয়া, প্রচলিত নাটকগুলির কালনির্ণয়ের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাহাও কালক্রমে বহু বিতর্কের আধার হইয়া উঠিয়াছে।

মহাকবি ভবভূতি উত্তররামচরিত নাটকে নাট্যাচার্য্য ভরতমুনিকে বাল্মীকির সমসাময়িক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ভরতমুনির লিপিপ্রণালী রামায়ণের ন্যায় তুল্য লক্ষণাক্রান্ত বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং নাট্যসাহিত্য যে বহু পুরাতন, তাহাতে সংশয় নাই। ইতিহাসের অভাবে গ্রন্থনিহিত প্রচ্ছন্ন প্রমাণবলে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রচলিত নাট্যসাহিত্যের মধ্যে মৃচ্ছকটিককেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নির্দ্দেশ একেবারে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

মৃচ্ছকটিক শূদ্রক নামক কোন এক নরপতির বিরচিত বলিয়া প্রস্তাবনায় উল্লিখিত আছে। কিন্তু এই প্রস্তাবনা-শ্লোক কবিবিরচিত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; কারণ তাহাতে কবির মৃত্যুকথাও বর্ণিত হইয়াছে! ইহা উত্তরকালে নাট্যাচার্য্যগণ সংযুক্ত করিয়া থাকিবেন। এই বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়—

"গজপতি গতি তাঁর, চকোর নয়ন,
পূর্ণেন্দু বদন চারু, শরীর শোভন,
ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ তিনি, গম্ভীর হৃদয়,
খ্যাত কবি শূদ্রক নামেতে পরিচয়।
অপিচ
ঋগ্বেদ সামবেদ
অঙ্কশাস্ত্র, হস্তিবিদ্যা কলাআদি চৌষট্টি প্রকার,
এসব করিয়া শিক্ষা,
শিবের প্রসাদে লভি জ্ঞান-নেত্র বিগত-আঁধার,
পুত্রেরে রাজত্ব দিয়া
মহাসমারোহে করি অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন,
পশিলেন হুতাশনে
শতবর্ষ দশদিন পরমায়ু করিয়া যাপন।"

এই কবিপরিচয় সত্য হইলে, শূদ্রক অতি পুরাকালের নরপতি ছিলেন বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়; কারণ, অশ্বমেধ যজ্ঞের ন্যায় হুতাশনপ্রবেশে আত্মবিসর্জ্জনের প্রথাও দ্বিসহস্রাধিক বর্ষ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই শূদ্রকবিরচিত মৃচ্ছকটিকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর উল্লেখ দেখিয়া ইহাকে বৌদ্ধাবিভাবের পরবর্ত্তী বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতে হয়! শকবংশীয় কণিষ্কনামা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নরপতি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাশ্মীরে রাজশাসন করিয়া "নাণক" নামক মুদ্রাপ্রচলন ও "বাসুদেব" নামক উপাধি ধারণ করেন। মৃচ্ছকটিকে "নাণক" শব্দ মুদ্রার্থে ও "বাসুদেব" শব্দ প্রবলপুরুষার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিয়া, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মৃচ্ছকটিকের কাল নির্দ্দেশে খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীর উল্লেখ করিয়াছেন।

বৌদ্ধাবির্ভাবের পর একসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত ভারতভূমি নানা কারণে দেশবিদেশে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে একদিকে গ্রীক্ অপরদিকে চৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া ভারতবিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে গ্রীক্ রাজদূত মেগাস্থিনীস্ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহার বর্ণনায় ভারতীয় জনসাধারণের যে সাধুচরিত্রের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, মৃচ্ছকটিকে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না; তখন খলস্বভাবের প্রাবল্য দেখিয়া তন্নিবারণোদ্দেশ্যেই কবি প্রকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে মৃচ্ছকটিক খৃষ্টোত্তর দুই এক শতাব্দীর মধ্যে রচিত বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত বলা

হয় না। মৃচ্ছকটিকের ন্যায় অন্য কোন রূপক বা উপরূপকে জনসাধারণের চিত্র তত সুব্যক্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এজন্য মৃচ্ছকটিক ইতিহাসপাঠকের প্রিয় সহচর।

মৃচ্ছকটিকের ন্যায় মুদ্রারাক্ষসও একখানি প্রাচীন দৃশ্য-কাব্য। এই কাব্যে সামন্ত বটেশ্বর-পৌত্র মহারাজ পৃথুর পুত্র বিশাখদত্ত নামধেয় কবি চাণক্যচন্দ্রগুপ্তের কৌশলোৎ-পন্ন নন্দবংশধ্বংশকাহিনী চিত্রিত করিয়াছেন। পুরাণে মগধরাজবংশের নন্দবংশধ্বংসকাহিনী বর্ণিত আছে। মহাভারতোক্ত কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসানে পরীক্ষিতের জন্ম হইতে মহারাজ নন্দের অভিষেককাল ১৫০০ বৎসরের পরবর্ত্তী বলিয়া বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে। তদনুসারে নন্দাভিষেক কলিযুগাব্দ দ্বিসহস্রবর্ষসনকালের অর্থাৎ অদ্যনাতনকালের তিনসহস্র বৎসরের সমসাময়িক হইয়া পড়ে। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে সেকেন্দার শাহ ভারতপ্রান্তে উপনীত হইবার প্রসিদ্ধি আছে। তাহাও দ্বিসহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। যে দিক দিয়া দেখ, চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও বৌদ্ধাবির্ভাবের পরবর্ত্তী সময়ে মগধেশ্বর ছিলেন। তাঁহার কথা অবলম্বন করিয়া যে নাটক রচিত হইয়াছে, তাহা যে বহুশত বৎসর পরে রচিত, এরূপ অনুমান অসঙ্গত বোধ হয়। কারণ, চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের কথা সমধিক প্রচলিত না থাকিলে কবি তদবলম্বনে কাব্য রচনায় সাহসী হইতেন না। সেকথা বহুশত বৎসর পর্য্যন্ত লোকচিত্তাকর্ষণ করার সম্ভাবনা ছিল না। ইহা ব্যতীত, মুদ্রারাক্ষসে যে সকল গ্রন্থনিহিত আভ্যন্তরিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও ইহার প্রাচীনত্ব সূচিত করে। ইহাতে পাটলিপুত্র নগর "কুসুমপুর" নামে অভিহিত। পাটলি একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। শাক্যসিংহ তথায় গঙ্গা পার হইবার সময়ে পাটলির ভবিষ্যৎ ভাগ্যোন্নতির ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেন। তাহার পরে পাটলিপুত্র ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করে; এবং কালে পাটলিপুত্র নাম প্রচলিত হইয়া কুসুমপুর নাম বিলুপ্ত হইয়া যায়। মুদ্রারাক্ষস রচিত হইবার সময় পর্য্যন্তও কুসুমপুর নামই সমধিক প্রচলিত থাকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কারণে মৃচ্ছকটিকের সমসময়ে মুদ্রারাক্ষসের কাল নির্দ্দেশ করিতে হয়। কিন্তু মুদ্রারাক্ষস খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। বিশাখদত্তের কোন ইতিহাস আবিষ্কৃত হয় নাই; অনুমানবলেই কালনির্ণয় সুসম্পন্ন হইয়াছে। মুদ্রারাক্ষসে ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দ অবলম্বন করিয়া ইহাকে মৃচ্ছকটিকের পরবর্ত্তী বলা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। সূক্ষ্মরূপে কাল নির্দ্দেশের তর্কবিতর্ক আপাততঃ পরিত্যাগ করিয়া এই পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে,—বৌদ্ধযুগের গৌরবের দিনে মৃচ্ছকটিক ও মুদ্রারাক্ষস রচিত হইয়াছিল; অন্যান্য রূপক ও উপরূপকও বৌদ্ধযুগের মধ্য ও পরিণতাবস্থায় বিরচিত হয়। বৌদ্ধযুগ সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাট্যযুগ।

বৌদ্ধযুগে মধ্যাবস্থায় ভাস ও সৌমিল্ল নামক খ্যাতনামা কবিগণের দৃশ্যকাব্যই যে লোকসমাজে সমাদৃত ছিল, তাহা "মালবিকাগ্নিমিত্রের" প্রস্তাবনায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের প্রবল খ্যাতিতে কুণ্ঠিত না হইয়া, আর একজন নবকবি নাট্যসাহিত্যাঙ্গে ধীরে ধীরে সাহিত্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইঁহারই নাম কালিদাস। তৎকালে ভাস-সৌমিল্লাদি কবিকুল জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না; তাঁহাদের কোন গ্রন্থও এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। সূত্রধার কালিদাসকৃত "মালবিকাগ্নিমিত্রের" অভিনয় করিবার প্রস্তাব করিলে, পারিপার্শ্বিক নট ভাসসৌমিল্লাদির নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "ভাস ও সৌমিল্ল প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিদের রচনাসকল অতিক্রম করে,' বর্ত্তমান কবি কালিদাসের রচনাকে সভাসগুলী এত অধিক আদর করবেন কিবলে"? সূত্রধারমুখে নবকবি এইরূপে তাহার উত্তর দিয়াছেন—

"শুধু পুরাতন বলি, কোন কাব্য নহে মাননীয়,
অথবা নূতন বলি, নহে হেয় ইহাও জানিও।
পরীক্ষিয়া দোষ গুণ সাধু সুধীগণ
তার মধ্যে একটিরে করেন বরণ।
পরবুদ্ধি অনুসারে যার মতিগতি
বিবেচনাশক্তিহীন সেযে মূঢ় অতি॥"

এইরূপে মুখবন্ধ পাঠ করিয়া নবকবি কালিদাস নবকাব্যের অবতারণা করায় "মালবিকাগ্নিমিত্র" তাঁহার প্রথম দৃশ্যকাব্য বলিয়া বোধ হয়। ইহার নান্দীতে শকুন্তলের নান্দীর একটু পূর্ব্বাভাস আছে; ইহার প্রস্তাবনান্তে পাত্রপ্রবেশ কৌশলেও শকুন্তলের অপূর্ব্ব পাত্রপ্রবেশকৌশলের ক্ষীণ

উদ্যম লক্ষ্য করা যায়। বর্ণনাসাদৃশ্যে, শব্দপ্রয়োগবাৎসল্যে "মালবিকাগ্নিমিত্র" অভিজ্ঞানশকুন্তলের অমর কবির বাল্য রচনা বলিয়া অনুমান করিবার কারণের অভাব নাই। তজ্জন্য উইলসন সাহেবের মত খণ্ডিত হইয়া যাইতেছে। তাঁহার মতে মালবিকাগ্নিমিত্ররচয়িতা কালিদাস অভিজ্ঞান-শকুন্তলের কালিদাস হইতে পৃথক ব্যক্তি। বিক্রমোর্ব্বশীয় নাটকসম্বন্ধে এরূপ অনুমান অনেক পরিমাণে সুসঙ্গত বোধ হইতে পারে; কিন্তু মালবিকাগ্নিমিত্র ও শকুন্তল এক-লেখনীপ্রসূত বলিয়াই বোধ হয়। রাজচরিত্র ও রাজান্তঃপুরের ঐতিহাসিক তথ্য লাভের জন্য "মালবিকাগ্নিমিত্র" উৎকৃষ্ট উপকরণ; আশ্রমচিত্র সংকলনের জন্য "শকুন্তল" অতুলনীয়। কালিদাস জনসাধারণের কথা বড় অধিক লিপিবদ্ধ করেন নাই; সুতরাং সাধারণ লোকব্যবহার অবগত হইবার পক্ষে কালিদাস-বিরচিত দৃশ্যকাব্য বহুমূল্য নহে।

ইহার পর নাট্যসাহিত্যক্ষেত্রে আর একজন অমর কবির অভ্যুদয় হইয়াছিল। তিনিও কালিদাসের ন্যায় নিতান্ত অপরিচিতের মত নাট্যাচার্য্যের সহায়তায় প্রতিভার পরিচয় দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। কালিদাস যুক্তমার্গে পদক্ষেপ করিয়া, দর্শকবৃন্দের কৃপাকটাক্ষের ভিখারী হইয়া, নবক বর কাব্যকলার নিরপেক্ষ সমালোচনার আশায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই নূতন কবি আত্মক্ষমতার সুদৃঢ় ভিত্তিতে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রগল্‌ভের ন্যায় আত্মমহিমা ঘোষণা করিয়া সগর্ব্বে বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

"অল্পই বোঝে তারা
যারা করে মোর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ,
তাহাদের তরে নহে
বলি শুন—মোর এই রচনা-প্রয়াস
জনমিতে পারে পরে
কিম্বা আছে কেহ মোর সমান ধরমী,
অসম্ভব কিবা তাহে;
কালের নাহিক সীমা, বিপুলা ধরণী।"

"মালতীমাধবের" এই সাহঙ্কার শক্তি-সূচনা "উত্তররামচরিতে" সমাদর লাভ করায়, মহাকবি ভবভূতির নাম নাট্যসাহিত্যে চিরজীবী হইয়াছে। তাঁহার "মালতীমাধব" স্বকপোলকল্পিত প্রণয়কাহিনী; লোক-ব্যবহারের বহু দৃষ্টান্তের আকর। তাঁহার মহাবীরচরিত ও উত্তররামচরিতও বহু ঐতিহাসিক তথ্যের আধার। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কালিদাস ও ভবভূতির দৃশ্যকাব্যের বঙ্গানুবাদ উপলক্ষে লিখিয়াছেন—"কালিদাসের রচনা—পরিপাটী পরিচ্ছন্ন সুন্দর সুমার্জ্জিত সুবিন্যস্ত সুরম্য উদ্যান, এবং ভবভূতির রচনা—সুন্দর ভীষণ বীভৎসময় নিবিড় বিপুল জটিল মহারণ্য!" ইহা কাব্যাংশের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। কিন্তু ইতিহাসাংশে ভবভূতি বহু পুরাতত্ত্বের আকর, কালিদাস কেবল আকরোত্থিত সুমার্জ্জিত রত্নখণ্ড; তথ্যানুসন্ধানের অগ্নিপরীক্ষায় তাহা এক মুষ্টি বহুমূল্য ভস্ম ভিন্ন অধিক কিছু প্রদান করিতে অক্ষম!

অতঃপর নাট্যসাহিত্যের পরিণতির পর্য্যবসানে, তিরোধানের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুই তিন জন সুগৃহীতনামা অমর কবি পুরাতন নাট্যসাহিত্যের গৌরবরক্ষার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীন শ্রীহর্ষ ও আধুনিক ভট্টনারায়ণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীহর্ষের নামে "রত্নাবলী" ও "নাগানন্দ" সুপরিচিত; উভয় গ্রন্থই লোকব্যবহারের ও ঐতিহাসিক তথ্যের আধার। ভট্টনারায়ণের "বেণীসংহার" সেরূপ নহে। তথাপি "বেণীসংহার" সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের অতুল কীর্ত্তি। নাট্যাংশে অতি উৎকৃষ্ট না হইলেও, বীররসবর্ণনায় প্রশংসনীয়। ইহার পর যেন নাট্যসাহিত্যের উদ্যম নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পরবর্ত্তী নাটকে আর সে লালিত্য নাই, সে রসসমাবেশচাতুর্য্য নাই, সে ভাষাকৌশল যেন কৃত্রিমতার ক্ষীণ গণ্ডীর মধ্যে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে! মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার সময় হইতে নাট্যশালার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-সাহিত্যও অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে!

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের কাব্যাংশের অনেক উৎকৃষ্ট সমালোচনা বঙ্গসাহিত্যে সাদরে স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত নাট্যসাহিত্য হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংকলনের চেষ্টা যথারীতি আরব্ধ হয় নাই। তাহা শ্রম ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ; বোধ হয় বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান দুর্ব্বল রুচির পক্ষে দুষ্পাচ্য পথ্য। তথাপি ইহাতে সাহিত্যসেবকগণের হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। যিনি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের বঙ্গানুবাদে ব্যাপৃত, তাঁহাকে এখনও অনেক দিন অনন্যকর্ম্মা হইয়া

সেই ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে হইবে। অন্য কেহ নাট্য-সাহিত্যনিহিত ঐতিহাসিক তথ্য সংকলনে উদ্যোগী হইলে, অল্পায়াসে বহু ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পুনরায় লোকলোচনের সমীপবর্ত্তী হইতে পারে। যে দেশের সাহিত্য ক্ষীণ, অথচ লিখিত ইতিহাস বিপুল, সে দেশের ইতিহাসে যাহা লিখিত নাই, তাহা আর সংকলিত হইবার আশা নাই। কিন্তু যে দেশের সাহিত্য বিপুল, সে দেশের লিখিত ইতিহাস না থাকিলেও, সাহিত্য অনেকাংশে তাহার অভাব পূরণ করিতে সক্ষম। এই হিসাবে আমাদের দেশের ইতিহাসের অভাব সাহিত্যের সহায়তায় কালক্রমে কিয়ৎপরিমাণে দূরীকৃত হইতে পারে। কিন্তু তাহার জন্য বহু বিভাগে বহুসংখ্যক সাহিত্যসেবকের সেবাব্রত গ্রহণ করা আবশ্যক। এ কথা বঙ্গসাহিত্যে বহুবার ঘোষিত হইলেও, পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ, এখনও সাহিত্যালোচনা সখের সামগ্রী বলিয়াই পরিচিত; তাই সাহিত্যশক্তির অপচয় করিয়াই সাহিত্যসেবকগণ কৃতার্থম্মন্য! এরূপ দিনে শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের যথাযথ বঙ্গানুবাদ প্রচারে যেরূপ অধ্যবসায় ও কৃতিত্বের পরিচয় দান করিতেছেন, তাহা যথার্থই বিস্ময়ের বিষয়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

বরুণাবিষ্কার।

গত ভাদ্রের প্রবাসীতে "গ্রহকঙ্কর" বিষয়ক প্রবন্ধে গ্রহ আবিষ্কারের দুইটি ক্রম আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রথমটি চক্ষে (অর্থাৎ মুক্তনেত্রে কিম্বা দূরবীক্ষণ নেত্রে) দেখিয়া আবিষ্কার, দ্বিতীয়টি গণনাদ্বারা অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া আবিষ্কার। দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে আবিষ্কারের আবার দুইটি বিধান আছে। গ্রহ বলিতে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণশীল জ্যোতিষ্ক বুঝায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম পত্তন হইতেই, গতি দেখিয়া গ্রহ আবিষ্কারের বিধান চলিয়া আসিয়াছে। বার বার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কোন জ্যোতিষ্ককে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে দেখিলে, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ অপর সকল জ্যোতিষ্কের তুলনায়, তাহাকে গতিশীল জ্যোতিষ্ক অথবা "গ্রহ" বলা যায়। গতি দেখিয়া গ্রহ চিনিয়া লওয়া সময়সাপেক্ষ। কোন গ্রহ ও পৃথিবীর অবস্থিতিভেদে কোন কোন সময় এরূপ ঘটে যে পৃথিবী হইতে গ্রহকে কিছু দিন পর্য্যন্ত এক স্থানে নিশ্চল দেখায়; তখন তাহার আপাতঃদৃষ্ট গতির অভাবে তাহাকে গ্রহ বলিয়া চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু ঐ অবস্থায় গ্রহ চিনিয়া লইবার অপর একটি বিধান রহিয়াছে। তাহা দূরবীক্ষণের তীক্ষ্ণতাসাপেক্ষ। আমাদের পরিচিত যে সকল গ্রহ আছে তাহারা সকলেই সৌরপরিবারভুক্ত; একারণ, আকাশের অপর সকল জ্যোতিষ্কাপেক্ষা তাহারা আমাদের সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী। এই সন্নিধান হেতু, তীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণ দ্বারা দেখিলে তাহাদের আকৃতি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমরা মুক্তনেত্রে জ্যোতিষ্কসকলকে যেরূপ এক একটি আলোকবিন্দুরূপে দেখিয়া থাকি, দূরবীক্ষণ দ্বারা তাহাদের কোনটি যদি কেবলমাত্র বিন্দুরূপে না দেখাইয়া বিশিষ্ট আকৃতিবিশিষ্ট দেখায়, তবে ইহা নিশ্চয় জানিতে পারি যে ঐ জ্যোতিষ্ক একটি গ্রহ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। যদি কোন গ্রহ, মানুষের অপরিজ্ঞাত অবস্থায়, কোন দূরবীক্ষণ ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবার সময় পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিতি করে যে ঐ দূরবীক্ষণ তাহার বিশিষ্টাকৃতি দেখাইতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে, তাহার গতি না দেখিলে, তাহাকে গ্রহ বলিয়া চিনিয়া লইবার অন্য উপায় নাই।

গ্রহ কখনও আপন কক্ষে নিশ্চল থাকে না।• কিন্তু কখন কখন তাহার স্থিতি এরূপ হয় যে, স্বীয় কক্ষে চলিবার সময় পৃথিবী যদি তাহার ঠিক সম্মুখে কিম্বা পশ্চাতে থাকে, অর্থাৎ পৃথিবী হইতে দেখিতে গেলে তাহার গতিরেখা পৃথিবীস্থ মানবের দৃষ্টিরেখার সহিত মিলিয়া একসূত্রবদ্ধ হইয়া যায়। তখন মানুষের চক্ষে ঐ গ্রহ কিছু কালের জন্য নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়। গ্রহকক্ষের যে যে বিন্দুতে এরূপ ঘটে, সে সকল বিন্দুকে তাহার "অচল বিন্দু" বলা যায়। ঐরূপ একটি অচল বিন্দুতে অবস্থান কালে কোন গ্রহ দূরবীক্ষণ ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলে, তাহার কোন বিশিষ্ট আকার না দেখিতে পাইলে, তাহাকে সহজেই স্থিরনক্ষত্র বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। ইহা হইতে সহজে অনুভব করা যাইতে পারে যে কত সূক্ষ্ম নৈসর্গিক অন্তরায় অতিবাহন করিয়া এক একটি গ্রহাবিষ্কার ঘটিতে থাকে।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ উইলিয়ম হর্শেল দূরবীক্ষণ-সাহায্যে প্রথম গ্রহ আবিষ্কার করেন। সেই দিন ঐ গ্রহ পৃথিবী হইতে এত দূরে ছিল, এবং হর্শেলের দূরবীক্ষণের তীক্ষ্ণতা বর্ত্তমানের তুলনায় এত হীন ছিল, যে তিনি গ্রহের কোন বিশিষ্ট আকার দেখিতে সক্ষম হন নাই। সমস্ত রজনীর পর্য্যবেক্ষণের ফলে জ্যোতিষ্কের ধারাবাহিকগতি প্রতিপাদন করিয়াই তিনি তাহাকে গ্রহ বলিয়া ঠিক করিতে পারিয়াছিলেন। উপরোক্ত ঘটনার ১০ দিন পূর্ব্বে যদি তিনি ঐ জ্যোতিষ্কের স্থিতিতে দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে তিনি আর তাহাকে গ্রহরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন না ; কারণ ৩রা মার্চ্চ উক্ত গ্রহ যে স্থলে ছিল সেইটি তাহার কক্ষের একটি "অচল বিন্দু"।

এইরূপ দৈবানুগৃহীত গ্রহাবিষ্কারের পর, তাহা দ্বারা কিরূপে একটি অকারণলব্ধ সংখ্যাসমাবেশে একটি বিশিষ্ট সংখ্যার ঘর পূরণ হইয়াছিল, এবং তাহা হইতে বিশ্বাসবলে কিরূপে বহু সংখ্যক "গ্রহকঙ্কর" আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা গত ভাদ্রের "প্রবাসী"তে আলোচনা করা হইয়াছে।

বোদের বিধানে যে সংখ্যাসমাবেশ প্রকটিত হয়, তাহার কোন কারণ জানা যাইতেছে না। এরূপ কোন ভৌতিক নিয়মের অস্তিত্ব জানা যায় নাই, যদ্দ্বারা গ্রহরাজ্যে এইরূপ সংখ্যাসমাবেশদ্বারা তাহাদের দূরত্ব নিয়মিত হইতেই হইবে। হর্শেলাবিষ্কৃত গ্রহের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া জ্যোতির্ব্বিদসমাজ বোদের বিধানে বিশ্বাসস্থাপন করিলেন, এবং দূরবীক্ষণ সাহায্যে আকাশ তন্ন তন্ন করিয়া "গ্রহকঙ্কর" আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইলেন। এই আবিষ্ক্রিয়ার মূল,—বিশ্বাস। পূর্ব্বে যে সকল আবিষ্ক্রিয়ার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের মূল,—দৈববল। কিন্তু আজ যে আবিষ্ক্রিয়ার বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহার মূল,—জ্ঞান। দৈববল আকস্মিক সংঘটন ; বিশ্বাস সম্ভাব্যতা প্রতিপাদন করে ; কিন্তু জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক। ইহা প্রতিপাদন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

[১৭৮১ খৃষ্টাব্দে হর্শেল যে গ্রহ আবিষ্কার করেন তাহার ইয়ুরোপীয় নাম Uranus ; কিন্তু অনেক খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ ইহাকে এখনও "হর্শেল" নাম দিয়া থাকেন। হর্শেল নিজে ইহার নাম "Georgius Sidus," অর্থাৎ "জর্জ্জতারা" রাখিয়াছিলেন। ১২৯৯ সালের অগ্রহায়ণের ভারতীতে আমি যথাবিহিত কারণ দেখাইয়া ইহার 'ইন্দ্রগ্রহ' নামকরণ করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও আমি ইহাকে "ইন্দ্রগ্রহ" নামে পরিচিত করিব।]

ইন্দ্রগ্রহ আবিষ্কৃত হইবার পর দেখা গেল যে ইতিপূর্ব্বে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ৯০ বৎসরের ভিতর এই জ্যোতিষ্ক নানা স্থানে বিংশবার নানা নামীয় নক্ষত্ররূপে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু পরে আর তাহাকে ঐ সকল স্থানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। ঐ সকল পর্য্যবেক্ষণের ফলের সহিত পরবর্ত্তী ১০ বৎসরের ফল মিলাইয়া, এই ১০০ বৎসরের স্থিতি নির্ণয় করিয়া, তাহা হইতে গ্রহের গতিপথ গণনা করিতে আরম্ভ করা হইল। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে গ্রহের কক্ষ ও স্বরূপাদি নির্দ্ধারিত হইলে পর, গণিতবলে তাহার ভবিষ্যৎ স্থিতি নিরূপিত হইয়া তালিকাবদ্ধ হইতে লাগিল। এই তালিকা দিনপঞ্জিকাকারে প্রচারিত হইলে নানা স্থানে গ্রহের পর্য্যবেক্ষণ চলিতে লাগিল। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদসমাজ ইহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন যে, যদিও একই নিয়মে গণনা করার ফলে অপর সকল গ্রহই নির্দ্দিষ্ট সময়ে আপন আপন গণনার স্থিতিতে উপনীত হইতেছে, তথাপি ইন্দ্রগ্রহকে কিছুতেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে আপন গণনার স্থানে পাওয়া যাইতেছে না। যত প্রকারের গণনা প্রয়োগ করা যাইতে পারে তাহা সমস্ত করিয়াও দেখা গেল যে গ্রহ নিয়ত গণনার স্থান হইতে আগে সরিয়া পড়িতেছে। এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারে জ্যোতির্ব্বিদসমাজে মহা উৎকণ্ঠা জন্মাইয়া দিল। তৎপর পুনরায় যথাক্রমে ৩০ বৎসর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার ফল তালিকাবদ্ধ করা হইল, কিন্তু এই সকল ফল কিছুতেই পূর্ব্বগণিত ফলের সহিত মিলিল না। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে Bouvard নামক জনৈক ফরাশি জ্যোতির্ব্বিদ, কেবল মাত্র এই ৩০ বৎসরের পর্য্যবেক্ষণফল গ্রহণ করিয়া গ্রহের এক নূতন গতিপথ নির্দ্ধারণ করিলেন। তখন দেখা গেল যে এই পথ পূর্ব্বসাধিত পথের সহিত মিলিতেছে না।

এস্থলে গ্রহের গতি গণনা বিষয়ে একটি কথা জানা দরকার। নিউটন ইহা আবিষ্কার করেন যে সূর্য্যের আকর্ষণবলে গ্রহগণ নিয়ত চক্রাকার পথে পরিভ্রমণ করিতেছে।

ঐ সকল চক্র সম্পূর্ণ গোলাকার নহে, এবং সূর্য্য ঐ সকল চক্রপথের 'নাভিতে' (Focus) অবস্থিত। অতঃপর নিউটন ইহা আবিষ্কার করেন যে প্রত্যেক জড়বস্তু জগতের অপর যাবতীয় জড়বস্তুকে কোন এক নির্দ্দিষ্ট বিধান বলে আপনার দিকে টানিয়া লইতেছে। এই আবিষ্ক্রিয়া যদিও নিউটনকে জগতে বৈজ্ঞানিকসমাজের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছে, কিন্তু তৎকালে ইহাই তাঁহাকে এক বিষম বিজ্ঞানসঙ্কটে ফেলিয়াছিল। প্রত্যেক জড়বস্তু যদি অপর সকল জড়বস্তুকে আপনার দিকে টানিয়া লইতে থাকে, তাহা হইলে ইহা মানিতে হইবে যে প্রত্যেক গ্রহ কেবল যে সূর্য্যকর্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে তাহা নহে, বস্তুতঃ অপর যাবতীয় গ্রহ কর্তৃক আকৃষ্ট হইবে; এবং সূর্য্য যেমন গ্রহকে আকর্ষণ করিতেছে, গ্রহও সেইরূপ সূর্য্যকে আকর্ষণ করিবে। এইরূপে পরস্পরের আকর্ষণের ফলে গ্রহদিগের প্রত্যেকের গতি কিরূপ হইবে, তাহা নিউটন গণনা করিতে সক্ষম হন নাই। তিনটি জড়বস্তু পরস্পরের আকর্ষণে চলিতে থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের গতি কিরূপ হইবে, এই সমস্যা লইয়াই নিউটনের শেষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ইহার কিছু মীমাংসা করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই বৈজ্ঞানিক ভেলকি প্রায় ০ বৎসর "The Problem of Three Bodies" নামে পরিচিত ছিল। তৎপরে ফরাশিদেশস্থ ৫ জন বৈজ্ঞানিক একই সময়ে ইহার যুগপৎ মীমাংসা করেন। লাপ্লাশ ইঁহাদের শীর্ষস্থান অধিকার করেন; কারণ তিনি কেবল তিনটি জড় পিণ্ডের গতি আবিষ্কার করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, পরন্তু যে কোন সংখ্যক জড়পিণ্ড পরস্পরের আকর্ষণে চলিতে থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের পথ কিরূপে নিরূপণ করিতে হইবে তাহারও প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। লাপ্লাশের গণিতচর্চ্চার ফলে গ্রহদিগের প্রকৃত গতিপথ সাধন মানুষের সাধ্যায়ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এবং তাঁহারই উদ্ভাবিত প্রণালীমতে গ্রহগতি গণনা হইতে লাগিল। অতঃপর দেখা গেল যে গ্রহের বাস্তব স্থিতির সহিত গণনার ফলের আর অনৈক্য হইতেছে না।

ইহা ইন্দ্রগ্রহ আবিষ্কারের আগেকার কথা। ঐ গ্রহ আবিষ্কৃত হইলে পর, তাহার ভিন্ন ভিন্ন স্থিতি সমন্বয় করিয়া, তাহাতে লাপ্লাশের গ্রহগতিপ্রণালী প্রয়োগ করিয়া সূর্য্য ও অপর যাবতীয় গ্রহের আকর্ষণফল সাধন পূর্ব্বক, গ্রহের গন্তব্য পথ নিরাকৃত হইল। কিন্তু ৮০ বৎসরের পর্য্যবেক্ষণ ফল মিলাইয়া দেখা গেল যে গ্রহের প্রকৃত পথ কোন প্রকার গণিত পথের সহিত মিলিতেছে না। ইহা হইতে পূর্ব্বোক্ত ফরাশি জ্যোতিষী Bouvard এই সমস্যা করিলেন যে হয়ত নিউটনাবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ ও লাপ্লাশাবিষ্কৃত গতিপ্রণালী ইন্দ্রগ্রহে প্রযুজ্য নহে, নতুবা যাবতীয় পরিজ্ঞাত কারণ ছাড়া ইন্দ্রগ্রহের গতিবিপর্য্যয় ঘটিবার অপর কোন অপরিজ্ঞাত কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। Bouvardএর উপরোক্ত সমস্যা বৈজ্ঞানিক সমাজে নূতন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিল। অতঃপর যতই দিন যাইতে লাগিল এবং ইন্দ্রগ্রহের গতিবিপর্য্যয় উত্তরোত্তর আরও অধিকতর পরিস্ফুট হইতে হইতে লাগিল, ততই জ্যোতির্ব্বিদগণ Bouvardএর সমস্যার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে Bouvardএর গণনাফল প্রচারিত হয়। কিন্তু ঐ বৎসরের পর্য্যবেক্ষণফল এক নূতন বিপর্য্যয় ঘটাইল। এত দিন ইন্দ্রগ্রহ কোন অজ্ঞাত কারণে আপন কক্ষে ক্রমাগত "অগ্রসর" হইয়া চলিতেছিল, এবারে তাহার অগ্রগতি রহিত হইয়া কেবলমাত্র সূর্য্য হইতে তাহার দূরত্ব বৃদ্ধি পাইতে দেখা গেল। অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখা গেল যে গ্রহের গতিবিপর্য্যয় অগ্রবর্ত্তী না হইয়া ১৮২২ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ক্রমশঃ "পশ্চাদ্বর্ত্তী" হইয়া পড়িতেছে এবং তাহার মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। তত দিনে Bouvard স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন যে কোন অপরিজ্ঞাত কারণে গ্রহের গতিবৈষম্য ঘটিতেছে; এবং ঐ কারণকে তিনি বিনাসঙ্কোচে একটি অপরিচিত গ্রহরূপে নির্দ্দেশ করিলেন। ইহাই জ্ঞানবলে একটি অপরিচিত গ্রহের সত্তার প্রথম উপলব্ধি।

অপর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত চিত্রে "স" চিহ্নিত স্থান সূর্য্যের অবস্থিতি। তাহার চতুর্দ্দিকে চক্রাকার পথ ইন্দ্রগ্রহের কক্ষ। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রহের আবিষ্কারের পর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন বৎসরে গ্রহ স্বীয় কক্ষে যে যে বিন্দুতে অবস্থিত ছিল, তাহা ঐ সকল বৎসর জ্ঞাপক সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ

করা হইয়াছে। ঐ সকল বিন্দু হইতে ভিন্ন ভিন্ন দিগ্‌গামী যে সকল "শর" অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা, ঐ সকল বিভিন্ন স্থানে অবস্থিতিকালে, গণিতফল হইতে গ্রহের প্রকৃত স্থিতির যে সকল বিপর্য্যয় আপাততঃ অপরিজ্ঞাতকারণলব্ধ বলিয়া জানা গিয়াছে, তাহার দিঙ্‌নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এস্থলে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে সূর্য্য ও ইন্দ্রের পরস্পর আকর্ষণ, এবং ইন্দ্রোপরি অপর যাবতীয় পরিজ্ঞাত গ্রহের আকর্ষণ ইত্যাদিজনিত যাবতীয় গতিবিপর্য্যয়ের কারণ বাদ দিয়া, কেবল মাত্র যাহার কারণ জানা যাইতেছে না সেই বিপর্য্যয়ের দিক শর দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। Bouvard এই সকল বিপর্য্যয়ের দিঙ্‌নির্দ্দেশ করিতে গিয়াই একটা ইন্দ্র-কক্ষবহিঃস্থ গ্রহের আভাস দিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে দূরবীক্ষণের ক্ষমতা বাড়াইয়া আকাশ তন্ন তন্ন করিয়া ঐ অপরিজ্ঞাত গ্রহের অনুসন্ধান করিবেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হওয়াতে ঐ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।
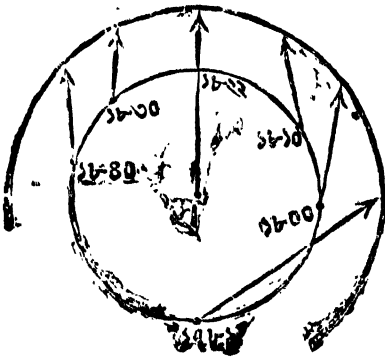
১৮৪১ খৃষ্টাব্দে J. C. Adams নামক একজন ইংরাজ যুবক, কেম্ব্রিজস্থ সেণ্ট্ জন্‌স্ কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে Bouvardএর সমস্যার বিষয় জ্ঞাত হইয়া, গণিতবলে উপরোক্ত অপরিজ্ঞাত গ্রহের অস্তিত্ব প্রতিপাদনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কেম্ব্রিজের গণিত পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। তাহার পর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি স্বীয় সঙ্কল্পিত গণনাতে মনোনিবেশ করিলেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত জর্ম্মন জ্যোতিষী Bessel উপরোক্ত গ্রহগণনাতে হস্তক্ষেপ করিতে সঙ্কল্প করিয়া কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অব্যবহিত কাল পরেই তিনি পীড়িত হইয়া মানবলীলা সংবরণ করেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তিনটি পদার্থখণ্ড পরস্পরকে মাধ্যাকর্ষণবলে আপনার দিকে টানিতে থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের গতি কিরূপ হইবে তাহা আবিষ্কার করিতে নিউটনের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। লাপ্লাশ নূতন গণন-প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া বহুসংখ্যক পদার্থখণ্ডের পরস্পর আকর্ষণজনিত গতি কিরূপে সাধন করিতে হইবে তাহা শিক্ষা দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ঐ গণনার মূলে, আকর্ষণের কারণ জানা থাকাতে তাহার ফল সাধন করিয়া গতিনির্ণয়ের ক্রম বিধিবদ্ধ রহিয়াছে। "পরিজ্ঞাত" কারণের কার্য্যফলে গতি সাধন করাই লাপ্লাশের গণনার ভিত্তি। কিন্তু ইন্দ্রগ্রহের গতিবিপর্য্যয় যে জটিল সমস্যা উৎপাদন করিয়াছে তাহা এই যে,—একটি গ্রহে সকল পরিজ্ঞাত কারণ আরোপ করিয়া তাহার গতি সাধন করিয়া দেখা যাইতেছে যে ঐ গ্রহের প্রকৃত গতির সহিত গণনা দ্বারা সাধিত গতি মিলিতেছে না; এক্ষণে এই অসামঞ্জস্যের কারণকে একটি "অপরিজ্ঞাত" গ্রহরূপে নির্দ্দেশ করিয়া, গণনাদ্বারা ঐ গ্রহের আকৃতি, জড়মান, দূরত্ব ও গতি আবিষ্কার করা যাইতে পারে কি না? এস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ঐ সময়ে গণিতবিদ্যা যতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহা উক্ত গণনার পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রচুর! ঐ সমস্যার যিনি মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইবেন, তাঁহাকে নূতন গণিত উদ্ভাবন করিতে হইবে!

আডাম্‌স্ আড়াই বৎসর অদম্য অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে নানা জটিল গণিত-সেতুবন্ধন পূর্ব্বক উক্ত নূতন গ্রহতত্ত্ব উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে, সেপ্টেম্বর মাসে তিনি কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের অধ্যক্ষ Challis সাহেবের কাছে স্বীয় গণনার ফল প্রথম প্রকাশ করেন। Challis কালবিলম্ব না করিয়া ঐ গণনার ফল তাৎকালিক ইংলণ্ডের রাজজ্যোতিষী Airy সাহেবের গোচর করেন। রাজজ্যোতিষী মহাশয় ঐ গণনার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পরীক্ষা করিতে গিয়া কয়েকটা জটিল প্রশ্ন উত্থাপন

জে. সী. আডাম্‌স্।

করেন, এবং তাহার মীমাংসার জন্য আডাম্‌স্‌কে পত্র লেখেন। ঐ সকল প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত, আডাম্‌সের গণনার নির্দ্দেশানুসারে উক্ত "অপরিজ্ঞাত" গ্রহের অনুসন্ধানার্থ দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করা তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। এদিকে ৯ মাস পর্য্যন্ত আডাম্‌স্‌ রাজজ্যোতিষী মহাশয়ের পত্রের কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। ইত্যবসরে বিধাতার বিধান-চক্র অন্যপথে ঘুরিতে আরম্ভ করিল।

এস্থলে ইহা বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে আডাম্‌সের গণনার বিষয়, উপরোক্ত দুইজন জ্যোতির্ব্বিদ মানমন্দিরাধ্যক্ষ এবং আডাম্‌সের কেম্ব্রিজস্থ কয়েকজন বন্ধু ভিন্ন অন্য কেহই জানিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ফরাশি জ্যোতির্ব্বিদ Bouvardএর মৃত্যু হয়। তার পর তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র Eugene Bouvard তাঁহার কার্য্যভার প্রাপ্ত হন। Eugene পূর্ব্ব হইতেই পিতৃব্যের কার্য্যে সহায়তা করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৪৫ খৃঃ অঃ সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ফরাশি বিজ্ঞানসভাতে ইন্দ্রগ্রহের গতিবিপর্য্যয় বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন; তাহাতে ঐ বৎসর পর্য্যন্ত ইন্দ্রগ্রহের যত পর্য্যবেক্ষণফল সংগ্রহ করা হইয়াছে তৎসমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি ইহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে তাঁহার পিতৃব্য যে অপরিজ্ঞাত গ্রহের আভাস দিয়া গিয়াছেন তদ্ভিন্ন ইন্দ্রগ্রহের গতিবিপর্য্যয় ঘটিবার অন্য কোন কারণ থাকা সম্ভব নহে।

ঐ সময়ে বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ Arago উক্ত বিজ্ঞান-সভার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার বয়স তখন ৬০ বৎসর; একারণ তিনি নিজকে কঠোর গণিতচর্চ্চায় অসমর্থ মনে করিয়া, তাঁহার যুবা বন্ধু লাবেরিয়েকে উপরোক্ত ইন্দ্রতত্ত্ব বিষয়ক গণনায় প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। লাবেরিয়ের বয়স তখন ৩৪ বৎসর। ইতিমধ্যে তিনি সমুদায় গ্রহতত্ত্ব আয়ত্ত করিয়া তাহা হইতে অনেক নূতন বিধান উদ্ভাবন পূর্ব্বক লাপ্লাশের প্রবর্ত্তিত বিধানসমূহের আমূল সংস্কার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েকমাস পূর্ব্বে তিনি বুধতত্ত্ববিষয়ক (Theorie du Mouvement de Mercure par U. J. Le Verrier) গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে বুধের কক্ষান্তরালে সূর্য্যের অতি নিকটে অপর একটী গ্রহ বিচরণ করিতেছে।

যখন বিজ্ঞান সভাতে Eugene Bouvardএর প্রবন্ধ পঠিত হয় তখন লাবেরিয়ে একটী জটিল ধূমকেতুতত্ত্বে ব্যাপৃত ছিলেন। Aragoর পরামর্শে তাহা স্থগিত রাখিয়া তিনি ইন্দ্রগ্রহতত্ত্বে মনোনিবেশ করিলেন। ঐ বৎসর, ১০ই নবেম্বর Comptes Rendus নামক ফরাশি বৈজ্ঞানিক সংবাদপত্রে তাঁহার ইন্দ্রতত্ত্ববিষয়ক প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি ইহা সপ্রমাণ করেন যে অপরাপর গ্রহাপেক্ষা বৃহস্পতি ও শনি গ্রহদ্বয় আয়তন এবং সান্নিধ্য অত্যধিক প্রবল হওয়াতে, ঐ গ্রহদ্বয়জনিত গতি বৈপরীত্য বিশেষরূপে গণনা হওয়া প্রয়োজন; এবং তাহা করিতে হইলে ঐ গ্রহদ্বয়ের তত্ত্ব অগ্রে বিশোধিত হওয়া কর্ত্তব্য। ইহা করিতে গিয়া তিনি উক্ত প্রবন্ধে বৃহস্পতি ও শনি গ্রহদ্বয়ের তত্ত্বে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইলেন, এবং তৎসমুদায় প্রয়োগ করিয়া ইন্দ্রগ্রহের সমস্ত গতিফল বিশোধিত করিয়া লইলেন। এস্থলে ইহা জানা আবশ্যক যে লাপ্লাশকর্ত্তৃক সাধিত "নিউটনের কালসমস্যা" (The Problem of Three Bodies যাহা চিন্তা করিতে করিতে নিউটনের জীবন সাঙ্গ হইয়াছিল) লাবেরিয়ের হাতে নব-জীবন লাভ করিয়াছিল। তাঁহার গণনাপ্রণালী অনেক স্থলে লাপ্লাশের উদ্ভাবনী শক্তিকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল।

উপরোক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের প্রায় ৭ মাস পরে, ১৮৪৬ খৃঃ অঃ ১লা জুনের Comptes Rendus পত্রিকায় লাবেরিয়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে তিনি তাঁহার গণিতফলের সহিত পর্য্যবেক্ষণফল মিলাইতে চেষ্টা করেন। প্রত্যেক পর্য্যবেক্ষণফল ও গণিতফলের বৈষম্য হইতে এক একটী "সমীকরণ" (Equation) উৎপন্ন হয়। লাবেরিয়ে এইরূপ ২৮০টী পর্য্যবেক্ষণফল সাধন করিয়া তাহার বৈষম্য হইতে ২৮০টী সমীকরণ গ্রহণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করেন। অতঃপর তাহাদিগকে সমফলের হিসাবে মিলাইতে গিয়া ১১৫টী জটিল সমীকরণে দাঁড় করান। ইহাদিগকে পুনরায় পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারে সাধন করিতে গিয়া ৩৬টী মৌলিক সমীকরণ প্রাপ্ত হন, যাহার সাধনা হইতে তাঁহাকে অপরিজ্ঞাত কারণ আবিষ্কার করিতে হইবে!

উপরোক্ত সংখ্যাগুলির উল্লেখ করিয়া আমি এস্থলে পাঠকদিগকে ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে লাবেরিয়ে যে প্রণালীতে কার্য্য করিতেছিলেন তাহা সাধারণ মানব-বুদ্ধিতে অমানুষিক শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। লাবেরিয়ের এই গণনার উল্লেখ করিতে গিয়া সার জন হর্শেল বলিয়াছিলেন যে "ফরাশি জাতি বিজ্ঞানভীম-প্রসবিনী। লাবেরিয়ে দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে ঐ ভীমবংশ এখনও তিরোহিত হয় নাই।" (The race of giants is not yet extinct) একদিন আডাম্‌সের সহিত আমার গণিতচর্চ্চাতে ভাষার উপযোগিতাবিষয়ে আলাপ হইতেছিল। তাহাতে তিনি লাবেরিয়ের উপরোক্ত গণনার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে ফরাশি ভাষাই গণিতের ভাষা। ঐ ভাষায় গণিত শিক্ষা না করিলে এরূপ সূক্ষ্ম গণনার ক্ষমতা জন্মে না। কি দুঃখ হৃদয়ে পোষণ করাতে আডাম্‌সের মুখ দিয়া এই কথা বাহির হইয়াছিল তাহার উল্লেখ পরে হইবে। এস্থলে আডাম্‌সের পদানুসরণ করিয়া আমিও বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই দুই মনীষীর গণিতের তুলনা বাঙ্গালাভাষায় সম্ভবে না। ইংরাজিতে বলিতে হইলে প্রবাসীর পাঠকদিগকে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে আডাম্‌সের গণনার বিধান—"Successive approximation" এবং লাবেরিয়ের গণনার বিধান—"Rigorous analysis"।

লাবেরিয়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধে যে ৩৬টী সমীকরণ সাধন করা হইয়াছে তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন কারণের সহিত মিলাইয়া ইন্দ্রগ্রহের গতিবৈষম্যের লোপ সাধন করিতে প্রয়াস করা হইয়াছে। কিন্তু গণনার ফলে অপর সকল কারণ অগ্রাহ্য হইয়া একমাত্র কারণ অবশিষ্ট রহিয়াছে, যাহা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে একটী বহিঃস্থ গ্রহ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া চলিতে চলিতে ইন্দ্রগ্রহকে নিয়ত আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছে।

লাবেরিয়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে পর সমস্ত বিজ্ঞান-জগৎ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের রাজজ্যোতিষীরও তখন আসন টলিল। তিনি এখন দেখিতে পাইলেন যে আডাম্‌সের গণনায় যে সকল জটিল প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল, লাবেরিয়ের গণনায় তাহাদের যথাযথ উত্তর পাওয়া যাইতেছে। গ্রহ যে আছে সে বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। সে গ্রহকে কোথায় দেখা যাইবার সম্ভাবনা তাহাই এক্ষণে আলোচিত হইতে লাগিল। তৎপর ৩১শে আগষ্ট লাবেরিয়ে তাঁহার তৃতীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি ঐ "অপরিজ্ঞাত" গ্রহের বিশিষ্ট সংজ্ঞা প্রচার করিতে সক্ষম হইলেন; তিনি গণনাদ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন যে ঐ গ্রহ সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের ৩৬ গুণ দূরে থাকিয়া প্রায় ২১৭৩৩...বৎসরে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতেছে। ঐ গণনার পর একমাসের ভিতর ঐ গ্রহ কোন্ কোন স্থানে থাকিতে পারে তিনি তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

এদিকে লাবেরিয়ের তৃতীয় প্রবন্ধ ইংলণ্ডে না পৌঁছিতেই ২রা সেপ্টেম্বর আডাম্‌স্ তাহার পূর্ব্ব গণনার সংস্কার করিয়া এক দ্বিতীয় প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাহা রাজজ্যোতিষী মহাশয়ের হস্তগত করেন। আডাম্‌সের প্রথম গণনাতে কল্পিত গ্রহের দূরত্ব সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের প্রায় ৩৮॥০ গুণ, এবং তাহার আবর্ত্তনকাল প্রায় ২৩৭॥০ বৎসর গণনা করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধে তাহা সমস্ত সংশোধিত হইয়া দূরত্ব প্রায় ৩৭॥০ গুণ এবং আবর্ত্তনকাল ২৩১ বৎসরে দাঁড়াইল। প্রথম প্রবন্ধ প্রেরণের পর রাজজ্যোতিষী মহাশয়ের প্রশ্নমালা প্রাপ্ত হইয়া আডাম্‌স্ স্বীয় গণনার অপূর্ণতা বুঝিতে পারিলেন; এবং ৯মাস পরিশ্রমের পর সমস্ত গণনার পুনঃসংস্কার করিয়া দ্বিতীয় প্রবন্ধে কল্পিত গ্রহের সকল বিবরণ গণনাসাধ্য করিয়া প্রকাশ করিলেন।

আডাম্‌সের দ্বিতীয় গণনার সহিত লাবেরিয়ের গণনার প্রণালীগত পার্থক্য থাকিলেও ফলের ঐক্যবিষয়ে রাজজ্যোতিষী মহাশয় এক প্রকার নিঃসন্দেহ হইলেন। তখন তিনি কেম্ব্রিজ মানমন্দিরের অধ্যক্ষ Challis সাহেবকে কল্পিত গ্রহের অনুসন্ধানার্থ কেম্ব্রিজের বৃহৎ দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করিতে আদেশ করিলেন। Challis সাহেব আডাম্‌সের গণনার নির্দ্দেশানুসারে আকাশের এক বিস্তৃতাংশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাতে যে সকল তারা দেখিতে পাইলেন, সকলগুলিরই স্থিতি লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি প্রায় তিন সপ্তাহকাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনেকগুলি তারার স্থিতিফল গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে কোন একটী গতিশীল তারা বাছিয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অপরদিকে লাবেরিয়ে কেবল গণনা সাঙ্গ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি গ্রহের সঠিক স্থিতি নির্দ্দেশ করিয়া বার্লিন মানমন্দিরের অধ্যক্ষ 'গল' সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আমি যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম সেখানে যদি মনোযোগ দিয়া দেখ তবে একটী ক্ষীণজ্যোতি তারা দেখিতে পাইবে। অতি অল্প সময় পর্য্যবেক্ষণ করিলেই ইহার গতি বুঝিতে পারিবে।" বস্তুতঃই ২৩শে সেপ্টেম্বর লাবেরিয়ের নির্দ্দেশিত স্থানে 'গল' কর্ত্তৃক নূতন গ্রহ ধরা পড়িল।

নিজের গণনাতে লাবেরিয়ের বিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে তিনি যেরূপ ভাষাতে গলকে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা পড়িলে মনে হয় যেন তিনি ধ্যানযোগে গ্রহকে ঐ স্থানে দেখিতে পাইয়াছিলেন! পরে চালিসের পর্য্যবেক্ষণফল সকল গণনা করিয়া দেখা গেল যে তাহা হইতেও নূতন গ্রহ অনায়াসে ধরা পড়িত।

এই একই গ্রহের যুগল আবিষ্ক্রিয়া লইয়া ইংরাজ ও ফরাশিজাতিতে যে তুমুল বিবাদ বাধিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে গেলে তিনখণ্ড 'প্রবাসী' পূর্ণ করিয়া লিখিলেও অতি সংক্ষিপ্ত হইবে। সকল বিপদেরই অবসান হয়; এই বিপদেরও অবসান হইল, এবং ফরাশি ভিন্ন অপর সকল সুসভ্য জাতির সম্মতিক্রমে লাবেরিয়ে ও আডাম্‌স্‌ উভয়কেই নূতন গ্রহের যুগল আবিষ্কর্ত্তারূপে বরণ করা হইল।

ইয়ুরোপে এই নূতন গ্রহের নাম Neptune রাখা হইয়াছে। Neptune জলাধিপতি বলিয়া আমি ইহার নাম 'বরুণ' রাখিয়াছি এবং তাহা হইতেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের শিরোনামাঙ্কণ হইয়াছে।

বরুণাবিষ্কারের পর আজ ৫৫ বৎসর চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে গ্রহের স্বরূপাদি বিশদরূপে গণনা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্রকৃত গ্রহ কোন গণিত গ্রহের সহিত মিলিতেছে না। প্রকৃত গ্রহের গণনা হইতে দেখা যাইতেছে যে ইহা সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের ৩০ গুণ দূরে থাকিয়া প্রায় ১৬৪৷৷০ বৎসরে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে!! একজন আমেরিকান জ্যোতির্ব্বিদ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে দেবতারা ফরাশি জাতির গৌরব বর্দ্ধন জন্যই যেন বরুণ গ্রহকে ধরিয়া আনিয়া লাবেরিয়ের নির্দ্দেশিত স্থানে বসাইয়া দিয়াছিলেন!

এক্ষণে প্রশ্ন এই উঠিতেছে যে, যে সমস্যাপূরণ করিতে গিয়া দুইজন বৈজ্ঞানিক আপন আপন প্রতিভার পরিচয় দিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিলেন, তাহা কি সম্পূর্ণ হইল? প্রকৃতপক্ষে বিচার করিয়া জানা যাইতেছে যে বরুণাবিষ্কার ইন্দ্রগ্রহের সমস্যা সম্যক পূরণ করা দূরে থাকুক, বরং অনেক নূতন সমস্যা উৎপাদন করিতেছে। বোদের বিধান মতে এই গ্রহের দূরত্বের ক্রমানুপাত ৩৮৮ হওয়া উচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার পরিমাণ ৩০০ মাত্র। বরুণগ্রহের আকর্ষণ যোগ করিয়া ইন্দ্রগ্রহের গতি অনেক পরিমাণে সমন্বিত হইলেও সম্পূর্ণ মিলিয়া আসিতেছে না। বরুণের গতিবিপর্য্যয়ের আবিষ্কারের এখনও সময় হয় নাই। আডামস ও লাবেরিয়ে উভয়েই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের মতে গ্রহাবিষ্কারের পালা এখনও সাঙ্গ হয় নাই। *

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

চিন্ হিল্।

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলি সুবিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী হিমালয় হইতে বহির্গত হইয়া আসামদেশের উত্তর ভাগ হইতে বঙ্গোপসাগরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। উত্তরে আসাম এবং মণিপুর, দক্ষিণে ব্রহ্মদেশান্তর্গত আরাকান, পূর্ব্বে ব্রহ্ম, পশ্চিমে ত্রিপুরারাজ্য ও চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশ দ্বারা চতুঃসীমাবেষ্টিত হইয়া যে ভূভাগ অবস্থান করিতেছে, তাহাকেই সাধারণত চিন হিল বলিয়া থাকে।

এই পার্ব্বত্য প্রদেশে আসামপ্রদেশস্থ অরণ্যবাসী কুকী নাগা প্রভৃতি অসভ্য জাতির বংশধরগণ বাস করিয়া থাকে। ইহাদিগকে সাধারণতঃ তুরেনিয়ান জাতীয় বলিয়াই

---

* আডাম্‌স ও লাবেরিয়ের যুগলমূর্ত্তি প্রবাসীর গ্রাহকদিগকে উপহার দিবার একান্ত ইচ্ছাসত্ত্বেও তাহা ঘটাইতে পারিলাম না। ইংলণ্ডে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও লাবেরিয়ের একটী ছবি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। আডামসের মৃত্যুর একবৎসর পূর্ব্বেকার ছবি পাঠকদিগকে উপহার দিলাম। শ্রীঅঃ

বোধ হয়। অনেকের ধারণা মণিপুরের কুকী, বঙ্গদেশ ও আসামের লুসাই ও চিনহিলের চিনেরা কোন কালে একত্রে তিব্বতদেশে বাস করিত এবং তথা হইতে ক্রমশঃ এই সকল স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহাদিগের শারীরিক ও ভাষাগত সাদৃশ্য এবং আচারব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিলে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম দেশের ভাষায় ডেন (Jen) অথবা (Yen) য়েন বলিলে "মানুষ" বুঝায়। বোধ হয় ব্রহ্মবাসীদিগের এই শব্দ হইতে চিনহিলের অধিবাসীরা চিন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকিবে। চিনেরা আপনাদিগকে কিন্তু ঐ নামে অভিহিত করে না। চিনহিলের উত্তরাংশের চিনেরা আপনাদিগকে (Yo) য়ো, হাকা প্রভৃতি, দক্ষিণভাগস্থ অধিবাসীরা আপনাদিগকে লে (Lai) এবং নিম্নব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী চিনেরা আপনাদিগকে সু (Shu) নামে অভিহিত করে।

চিনহিল এক্ষণে ইংরাজরাজ্যের অন্তর্ভূত ও তাঁহাদের দ্বারা শাসিত। ইহার রাজধানী ফালাম। ইহা এখান হইতে এক জন পলিটিকাল এজেণ্ট ও কয়েকজন সহকারী দ্বারা শাসিত হয়। সমগ্র চিনহিলের মধ্যে ফালাম ব্যতীত ইংরাজের আরও তিনটি প্রধান সহর আছে। ইহাদের নাম হাকা, টিডিম ও ফোর্ট হোয়াইট। এই তিনের প্রত্যেকটিতে এক এক জন সহকারী পলিটিকেল এজেণ্ট বাস করিয়া থাকেন। এখানকার পলিটিকেল এজেণ্ট ও তাঁহার সহকারীদিগকে সচরাচর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও এসিষ্টেণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলা হয়।

চিনহিলের পর্ব্বত সকল পাঁচ হাজার হইতে নয় হাজার ফুট উচ্চ। সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত লিকলাং প্রায় দশ হাজার ফুট উচ্চ। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর পর্ব্বত আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। চিনহিলের মধ্যে অনেকগুলি নদী আছে। তন্মধ্যে মণিপুর নদী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এ দেশের কোন স্থানে উল্লেখযোগ্য সমতল ভূমি নাই। কেবল উচ্চ পর্ব্বত ও সুগভীর খড্ (khud) ব্যতীত আর কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। জমি সর্ব্বত্রই উর্ব্বরা এবং চেষ্টা করিলে সকল প্রকার শস্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। চিনগণ অসভ্য বলিয়া, বন্য ফল মূল ও মৃগয়ালব্ধ পশু ও পক্ষিমাংস দ্বারা উদরপূর্ত্তি করে, সুতরাং আমাদের ব্যবহারোপযোগী সকল শস্য উৎপন্ন করে না।

এখানকার অরণ্যে শাল, শিশু, দারু প্রভৃতি বৃক্ষাদি জন্মিয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পর্ব্বতগাত্র ক্ষুদ্র তৃণ ও লতাগুল্মাদিসমাচ্ছন্ন। পর্ব্বতগাত্রস্থ অরণ্যে নানাজাতীয় ওষধি ও রাস্না (Orchids) পাওয়া যায়। রসকর্পূর, আরাপান, গুলঞ্চ, বাকস্ ইত্যাদি অনায়াসলভ্য। আম, কাঁঠাল, পীচ্, কদলী, পিয়ারা, লেবু প্রভৃতি ফলবৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোন ফলেরই অবস্থা উন্নত নহে। বর্ষাঋতুতে নানাজাতীয় পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হওয়ায় পর্ব্বতগাত্র, অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, কিন্তু এই সকল পুষ্পের কোনটিতেই সুগন্ধ অনুভূত হয় না।

বহুদিন পূর্ব্বে এখানকার জলবায়ু নিতান্ত স্বাস্থ্যকর ছিল না। ব্রহ্ম বা ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে এদেশে আসিলে প্রায় কাহারই সুস্থদেহে ফিরিয়া যাইবার আশা থাকিত না। কিন্তু ইংরাজের আগমনের সময় হইতে নানারূপ বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হওয়ায় জলবায়ুর অনেক উন্নতি সংঘটিত হইয়াছে। এক্ষণে চিনহিল বলিলেই অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া কাহারও মনে ধারণা হওয়া উচিত নহে।

এখানে দুইটি মাত্র ঋতু অনুভব করা যায়। বর্ষা এবং শীত। দুইটিই কিন্তু বিশেষ ক্লেশকর। ইংরাজী মে মাস হইতে বর্ষা আরম্ভ হইয়া নভেম্বরের মধ্য পর্য্যন্ত প্রচুর বারিপাত হইয়া থাকে, এবং নভেম্বরের শেষ হইতে মে মাসের মধ্য পর্য্যন্ত প্রচণ্ড শীতের প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে এত শীতের প্রাখর্য্যেও অধিবাসীরা কোন শীতনিবারণোপযোগী শীতবস্ত্র ব্যবহার করে না। নিতান্ত শীত বোধ করিলে ইহারা সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়া নিরাপদে নিদ্রা যায়। এত শীত হইলেও জল এদেশে জমিয়া বরফে পরিণত হইতে দেখা যায় না। ফালাম সহর সমুদ্রতল হইতে ৭৫০০ ফুট্ উচ্চ। যতই ইংরাজের প্রভুত্ব এদেশে বদ্ধমূল হইতেছে, ততই ঋতুর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে শীত ও বর্ষা অনেক পরিমাণে অল্প বোধ হইতেছে।

চিন পর্ব্বত সকল বন্য জন্তুতে পরিপূর্ণ, সুতরাং শিকারী সাহেবদিগের মহোৎসব চিরবিরাজমান। বন্যজন্তুর মধ্যে হস্তী, গণ্ডার, বাইসন (bison), নানাজাতীয় হরিণ, সিংহ, ব্যাঘ্র, বন্য-বিড়াল, নানাজাতীয় বানর, বন্য কুকুর, শূকর ও ভল্লুক বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। পক্ষী, নানা জাতীয় ও নানা সম্প্রদায়ের দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার ছাগ দেখিতে অতি মনোহর। ইহাদের দেখিলে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। ইহাদের আকার ক্ষুদ্র এবং দেহ প্রচুর জটাসমন্বিত লোমে আচ্ছাদিত। ইহারা প্রায়ই অপালিত অবস্থায় অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। বহুজাতীয় অনির্দ্দিষ্টনামা সরীসৃপ চিনহিলে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে Hamadryad, Himalayan tree viper, Cobra, green snakes, Spotted snakes, Russel's viper প্রধান। নানাজাতীয় মৎস্য নদীতে ধৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে Mahseer (দুই প্রকার), Carp, Chilwa, Stone loach, Sharpnosed eel, Catfish, ও Murrel Goonch প্রধান।

চিন-পর্ব্বতগর্ভে নানা প্রকার ধাতু, বহুমূল্য প্রস্তর, গন্ধক, কেরোসিন তৈল ও লবণ পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন ধাতুই ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত হইয়া পরীক্ষার্থ প্রেরিত হয় নাই। অতএব এ অনুমান কত দূর সত্য বলা যায় না। কেবল চিনদিগকে অল্প পরিমাণ লবণ ও গন্ধক ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

চিনহিলের উৎপন্ন কোন পণ্য দ্রব্য আজিও বিদেশে রপ্তানি হয় না। কোন কোন দ্রব্য চিনহিলে উৎপন্ন হইলেও তাহার পরিমাণ এত অল্প যে তাহা চিনদিগের ব্যবহারের জন্যও যথেষ্ট নহে।

চিনহিলের অধিবাসীরা অতি প্রাচীন কাল হইতেই নিজ দেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ইংরাজরাজ্যে প্রবেশ করিত এবং সাতিশয় উৎপাত ও অত্যাচার করিয়া অধিবাসীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। তথা হইতে তাহারা মনুষ্য, গো, মহিষ প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিত। ইহাদের উৎপাত হইতে ইংরাজ-প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্য ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন, এবং তাহারই ফলস্বরূপ ইহারা এক্ষণে কয়েকটি সম্প্রদায় ব্যতীত সকলেই ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

চিনগণ নানা জাতি ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাহারা আপনাদিগকে নানা নামে অভিহিত করিয়া থাকে এবং প্রত্যেকেই বিশ্বাস করে, নিজ জাতি বা নিজ সম্প্রদায় অন্য জাতি ও সম্প্রদায় হইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় ইহারা সকলেই কুকী-জাতীয়। তাহাদের লিখিত কোন ভাষা না থাকায় এবং তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদা আত্মকলহ বিদ্যমান থাকায়, কালক্রমে তাহারা নানা জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিভিন্নতা এত সুস্পষ্ট যে দুইটী নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীদিগের ভাষা ও আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

চিনদিগের শারীরিক গঠন সুন্দর। ইহারা ব্রহ্ম ও আসামবাসী অপেক্ষা দৃঢ়কায়। পাঠান অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলেও গুরখা অপেক্ষা দীর্ঘ। বস্তুতঃ শতকরা ৪০ জন চিন এরূপ দীর্ঘকায় হইলেও তাহাদের দৈহিক গঠনের নানারূপ বিভিন্নতা বর্ত্তমান আছে, অর্থাৎ নানা গঠনের ও আকারের চিন সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয়।

এক জন সবলকায় চিন এক শত পাউণ্ড বা একমণ দশ সের বোঝা অনায়াসে দশ মাইল দূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে কেবল ৬০ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০ সের বোঝা দিবার অনুমতি দিয়াছেন। সরকারী ও বেসরকারী কার্য্যের জন্য ইহারা কুলীর কাজ করিয়া থাকে। চিনগণ অনেক ভারি জিনিষ বহিতে পারে বটে, কিন্তু ইহাদের গতি বড় মন্থর। এক জন ভুটিয়া ৬০ পাউণ্ড পরিমাণ ভার লইয়া যত দ্রুতপদে পর্ব্বতগাত্রে আরোহণ করে, চিনেরা তাহা পারে না। ইহারা মন্থরগতিতে চলে বটে, কিন্তু সহজে ক্লান্তি বোধ করে না।

চিনেরা পৃষ্ঠে ভার বহন করে এবং একটা ঝুড়ি এই কার্য্যের জন্য ইহাদের পৃষ্ঠে বাঁধা থাকে। চিনহিলের দুই একটি জাতি ভিন্ন অধিকাংশ চিনের শ্মশ্রু গুম্ফ দেখা যায় না। সাধারণতঃ ইহারা শ্মশ্রু গুম্ফ ধারণ ভালবাসে না। বৃদ্ধদিগের মধ্যেই কাহারও কাহারও এই দুই দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায়। চিননারীরা শ্মশ্রু গুম্ফশোভিত মুখ পছন্দ করে না সুতরাং চিন যুবক এই দুইটিকে ব্রহ্মবাসিদিগের মত চিমটার সাহায্যে নির্ম্মূল করিয়া থাকে।

চিনদিগের দেহ অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং তাহাদের দেখিলে তাহারা যে কোন কালে স্নান করে এরূপ বিশ্বাস হয় না। দেশে প্রচণ্ড শীত বলিয়া ইহারা সচরাচর স্নান

করিতে না পারিলেও ইহারা যে মধ্যে মধ্যে স্নান করে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু স্নান করিবার পরক্ষণেই ইহারা যেখানে সেখানে শয়ন ও উপবেশন করে বলিয়া ইহাদের দেহ কখনই পরিচ্ছন্ন থাকে না। ইহাদের নিকটে আসিলে নিতান্ত দুর্গন্ধময় স্থানে আসিয়াছি বলিয়া মনে হয় এবং যতক্ষণ ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা না যায় ততক্ষণ সুস্থ-চিত্ত হইবার আশা দুরাশা। ইহারা স্ত্রীপুরুষে সর্ব্বদা শূকরের বসা ইত্যাদি মস্তকে মর্দ্দন করে, বহু পুরাতন হুকার জল খায় ও নিতান্ত মলিন বস্ত্রাদি ধারণ করে বলিয়া ইহাদের দেহে এই দুর্গন্ধ চিরবিরাজমান।

অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায় মিথ্যাভাষণ, চৌর্য্য ও জীবহত্যা চিনদিগের স্বভাব। যখনি তাহারা বুঝিতে পাবে যে চুরী করিলে ধৃত হইবার সম্ভাবনা নাই তখনই তাহাদের চুরী করিতে দ্বিধা বোধ হয় না।

চিনেরা সকলেই মস্তকে সম্মুখভাগে বেণীবন্ধন করিয়া থাকে। ঐ বেণীর চতুর্দ্দিকে উহারা একখণ্ড বস্ত্র বেষ্টন করিয়া পাগড়ীরূপে ব্যবহার করে। ইহাতে কেবল যে তাহাদিগকে সুন্দর দেখায় তাহা নহে, ইহাতে তাহাদের দেহের দৈর্ঘ্যও কয়েক ইঞ্চি বর্দ্ধিত হয়। এইরূপ বেণীবন্ধন প্রথা চিনহিলের সর্ব্বত্র দেখা যায় না। স্থানে স্থানে অধিবাসিদিগকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কেশরঞ্জন করিতে দেখা যায়। ইহারা সকলেই কেশের এরূপ যত্ন করিলেও ইহাদের মস্তক কচিৎ উৎকুনশূন্য হইয়া থাকে। চিনেরা স্ত্রী পুরুষের এবং পুরুষ স্ত্রীর মস্তক হইতে উৎকুন বাহির করিয়া বানরের মত দন্তের সাহায্যে তাহাদের ধ্বংস সাধন করে। ইহাদের স্ত্রীলোকগণ সুদীর্ঘ কেশদাম নিতান্ত ভালবাসে, কিন্তু কেশ সম্বন্ধে কোন রূপ প্রশংসা করা নীতিবিরুদ্ধ, এবং এই জন্য ইহারা কেশে পুষ্পাদি ধারণ করে না।

চিনহিলে ইংরাজের আগমনের পূর্ব্বে ইহারা সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ থাকিত এবং এক্ষণেও ইহাদের গ্রামে গমন করিলে স্ত্রী পুরুষ সকলকেই উলঙ্গ অবস্থায় দেখা যায়। এক্ষণে এদেশে নানাদেশীয় লোকের আগমন হওয়াতে ইহারা তাহাদের দেখাদেখি একেবারে উলঙ্গ থাকা অভ্যাস ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিতেছে। এক্ষণে চিনদিগের পরিধানে এক কৌপীন ও একটা মোটা চাদর ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। এই চাদর এবং কৌপীনোপযোগী কাপড় ইহাদের স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং বুনিয়া থাকে। ঐ সকল কাপড় দেখিতে সুন্দর এবং আমাদের দেশী তাঁতে প্রস্তুত কাপড়ের ন্যায় দৃঢ়।

চিন শিশুগণ ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাহাদের কর্ণবেধকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। ইহাদের স্ত্রী, পুরুষ ও বালকবালিকার কর্ণে ইয়ারিং শোভা পাইয়া থাকে। ইহাদের ইয়ারিং তামা বা পিতলের হইয়া থাকে এবং ইহার গঠনে কোন কারুকার্য্য অবলম্বিত হয় না। তামা বা পিতল অভাবে বাঁশ বা সজারুর কাঁটায় ইয়ারিংএর কার্য্য হইয়া থাকে। ইহারা গলদেশে শঙ্খমালা বা কৌড়ীর মালাও ব্যবহার করে। অনেকে অনুমান করেন এই সকল শঙ্খ ও কৌড়ীর মালা ইহারা চট্টগ্রাম ও আসামের বাজার হইতে ক্রয় করিয়া থাকে। কারণ ঐ সকল দ্রব্য চিনহিলে প্রস্তুত হয় বলিয়া জানা যায় নাই। চিনের নিকট এই মালাসকল বিশেষ মূল্যবান এবং এগুলি পৈতৃক সম্পত্তিরূপে পিতার নিকট হইতে পুত্রে আসিয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে চিনহিলে উল্লেখযোগ্য সমতল স্থান নাই। চিনেরা তাহাদের গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য পর্ব্বতগাত্র সমতল করিয়া লয়। অতএব এখানকার অধিকাংশ গ্রামই পর্ব্বতগাত্রে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। রাজপথ হইতে ঐ সকল গ্রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সেগুলি সাতিশয় মনোরম বলিয়া বোধ হয়।

এখানকার পর্ব্বতের গহ্বরে বর্ষার জল জমিয়া স্থানে স্থানে পুষ্করিণীর আকার ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু পার্ব্বতীয় উৎস ব্যতীত পানীয় ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য অন্য জলের উপায় নাই। ইহারা কাষ্ঠের ও বংশের নলদ্বারা উৎস হইতে জল আনয়ন করিয়া গ্রামে ব্যবহার করে এবং চিনহিলের সর্ব্বত্রই এইরূপ জল সংগ্রহ হইয়া থাকে।

চিনহিলে প্রচুর জমি অকর্ষিত অবস্থায় আছে বলিয়া প্রত্যেক চিন তাহার গৃহপ্রাঙ্গণে এক একটি সুবৃহৎ বাগান রাখিয়া থাকে এবং ইহার ভিতরে ইহাদের মৃতদেহের কবরের উপর প্রয়োজনীয় সমস্ত শাক সবজী উৎপন্ন করিয়া থাকে।

চিনদিগের গৃহসকল একতল প্রস্তুত হয় এবং গৃহস্বামীর অবস্থা অনুসারে গৃহের তারতম্য হইয়া থাকে। এদেশের

গৃহসকল কাষ্ঠ বা বংশনির্ম্মিত ও উপরে খড়ের আচ্ছাদনযুক্ত, বংশের বা কাষ্ঠের বড় বড় স্তম্ভের উপরে নির্ম্মিত এবং নিম্নদেশে শূকরপ্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষীর থাকিবার স্থান সমন্বিত। গৃহের নিম্নদেশে এইসকল পশুদিগের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় চিনগৃহে প্রবেশ করিলেই অসহ্য দুর্গন্ধ অনুভব করিতে হয়। এই সকল গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চিনদিগের অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে, কারণ গৃহনির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্যসামগ্রী বহুদূর হইতে এবং বহু আয়াসে সংগ্রহ করিতে হয়।

চিনদিগের গৃহপালিত পশুর মধ্যে মিথুন, শূকর, ছাগ, কুকুর, বিড়াল এই কয়েকটি প্রধান। সমস্ত চিনগণ কুকুরমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে; কেবল হাকা প্রভৃতি দক্ষিণদিকস্থ কোন কোন জাতি উহা খায় না। শূকরের মাংস ইহারা অতিশয় ভালবাসে। গৃহে কোন আত্মীয় উপস্থিত হইলে শূকর না মারিয়া তাহার অভ্যর্থনা করা হইল বলিয়া মনে করে না। চিনেরা প্রায় প্রত্যেক পশুকেই বধ করিতে হইলে নিতান্ত নিষ্ঠুরতার অভিনয় করিয়া থাকে। কোন পশুকে বধ করিতে হইলে আহার পানীয় বিনা তাহাকে তিন চারি দিন আবদ্ধ রাখিয়া পরে একটা বাঁশের গোঁজ তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া তাহাকে হত্যা করা হয়। চিনগণ মিথুন এবং ছাগীর দুগ্ধ দোহন করে না। ইহারা দুগ্ধ যে পানীয় তাহা জানেনা এবং ইহাদের বিশ্বাস যে কোন প্রাণীর দুগ্ধ পান করিলে পানকারী ঐ পশুত্ব পাইয়া থাকে। এদেশের কুকুর আমাদের দেশীয় কুকুর হইতে বিভিন্ন। ইহাদের আকার ক্ষুদ্র এবং গায়ে বড় বড় ঘন লোম আছে। চিনেরা প্রধানতঃ শস্যক্ষেত্র ও গৃহরক্ষার্থে কুকুর পুষিয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে আপনাদের ভূতের উদ্দেশে ইহাদিগকে বলি দিয়া আনন্দ অনুভব করে।

মিথুন চিনদিগের প্রধান সম্পত্তির মধ্যে গণ্য। পার্ব্বত্য বাইসন বুল (Bison bull) এবং গৃহপালিত গাভীর সম্মিলনে এই মিথুন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা দেখিতে আমাদের ধর্ম্মের ষাঁড়ের মত কিন্তু তাহার অপেক্ষাও ভীষণ। মিথুনের শৃঙ্গের পরিমাণ অনুসারে তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে এবং যাহার যত বড় শৃঙ্গ, তাহার তত অধিক মূল্য দিতে হয়। এই মিথুনসকল অন্যান্য পশুর মত পোষ মানিয়া থাকে। হাকা প্রভৃতি অঞ্চলে বন্য মিথুনের দল সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা অরণ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া বেড়ায় এবং আবশ্যক হইলে চিনরা তাহাদিগকে গুলি করিয়া মারিয়া সংগ্রহ করে। মিথুন বধ করিতে হইলেও পূর্ব্বোক্ত প্রণালীমতে ইহাকে প্রথমে অনাহারে রাখিয়া পরে বধ করা হয় এবং এইরূপ অনাহারে থাকে বলিয়া ইহার মাংস সহজেই আহারোপযোগী হয়। মিথুন বধ করিয়া অল্পক্ষণ পরেই ইহারা আহার করিয়া থাকে।

চিনগণ অতি আনন্দের সহিত মাংস ভক্ষণ করিলেও শস্যই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা বর্ত্তমান নাই। তাহারা সকলেই সকলের সহিত একত্রে আহার বিহারাদি করিয়া থাকে এবং ব্যাঘ্র ও মনুষ্য মাংস ব্যতীত আর সকল মাংসই খাইয়া থাকে। গৃহের স্ত্রীলোক ও ক্রীতদাসদাসীগণ ইহাদের রন্ধনকার্য্য সমাধা করে। গৃহের সমস্ত লোক একত্রে বসিয়া আহার করে এবং তৎপরে ক্রীতদাসদাসীরা ভোজন করিয়া থাকে। উন্নত পাকপ্রণালী ইহারা অবগত নহে। সুতরাং ইহাদের রন্ধন নামমাত্র, বলাই বাহুল্য। কোন দ্রব্য সুসিদ্ধ হইলেই ইহারা যথেষ্ট মনে করে, এবং অভাবে আমমাংসও খাইয়া থাকে। ইহারা প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে তিনবার আহার করিয়া থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে আহার করে। ফলতঃ চিনগণ সর্ব্বদাই কিছু না কিছু খাইয়া থাকে এবং আহারের ইচ্ছা না থাকিলেও খাদ্যসামগ্রী সম্মুখে পাইলেই আহার না করিয়া ছাড়ে না। চাউল ইহাদের প্রধান খাদ্য, কিন্তু এ প্রদেশে চাউল সুলভ নহে বলিয়া উহা ব্যতীত ইহারা একপ্রকার ঘাসের দানা হইতে চাউল প্রস্তুত করিয়া আহার করে। এই ঘাসের দানার চাউলকে ইহারা কাউনি বলিয়া থাকে, কিন্তু উহাকে কোন প্রকারে চাউল নামে অভিহিত করা যায় না। উহা ঘাসের বীজ ব্যতীত আর কিছুই নহে। লবণ চিনদিগের অন্যতর প্রিয়বস্তু এবং এদেশে নিতান্ত দুর্লভ। ইহারা এক্ষণে বিলাতী লবণ ব্যবহার করিয়া থাকে।

চিনগণ অনেকেই হাঁড়ি জালা প্রভৃতি মৃত্তিকানির্ম্মিত দ্রব্য প্রস্তুত করে। তৎসমুদয় অস্মদ্দেশীয় হাঁড়ি প্রভৃতি

হইতে উৎকৃষ্ট না হইলেও উহাদ্বারা এই অসভ্য জাতির অনেক প্রয়োজন সাধিত হইয়া থাকে। মণিপুর চট্টগ্রাম প্রভৃতি সহরের বাজার হইতে ইহারা পিতলের হাঁড়ি কিনিয়া আনিয়াও ব্যবহার করে। কিন্তু এই সকল হাঁড়ি তাহারা এরূপ মলিন অবস্থায় রক্ষা করে যে ইহা হইতে নানা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু চিনগণ এবিশ্বাদের কোন ভিত্তি আছে বলিয়া স্বীকার করে না। মাটীর হাঁড়িতে ইহারা জল ও বংশ নির্ম্মিত ঝুড়িতে ইহারা ধান্যাদি শস্য রক্ষা করিয়া থাকে।

চিনহিলের সর্ব্বত্রই তামাকু জন্মিয়া থাকে। তামাকুর পাতা ইহারা কেবলমাত্র রৌদ্রে বা অগ্নিতে অল্প শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করে। চিনরমণীগণ অনবরত ধূমপান করিয়া থাকে। পুরাতন হুকার জল ইহারা সযত্নে রক্ষা করে, কারণ এই হুকার জল চিন পুরুষগণ পান করিয়া থাকে। ইহারা লাউ শুকাইয়া তাহার ভিতরের অংশ বাহির করিয়া উহাদ্বারা হুকার খোল তৈয়ার করে এবং বাঁশের নলিচা ও মাটীর কলিকা ব্যবহার করে। ইহাদের হুকার আকার কতকটা ইংরাজী পাইপের মত।

চিনগণ মদ্যকে জু (Zu) বলিয়া থাকে। ইহা চাউল কাউনি অথবা ভুট্টা ইত্যাদি খাদ্য হইতে প্রস্তুত হয়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী সহজ। চাউল, কাউনি, ইত্যাদি একটা মৃত্তিকার জালাতে কিছুদিন পচাইয়া পরে ব্যবহার করিয়া থাকে। যে মদ্য যত বেশীদিন পচিতে পায়, তাহা তত উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। চিনহিলের বালক বালিকা বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেই প্রচুর পরিমাণে এই জু (Zu) পান করিয়া থাকে। কিন্তু তাহারা এত মদ্যপানে রত হইলেও তাহাদের অধিকাংশকে দীর্ঘজীবী হইতে দেখা যায় ; এমন কি দুই তিন পুরুষ একত্রে বসিয়া মদ্যপান করার দৃশ্য নিতান্ত সুলভ।

চিনদিগের পীড়ার মধ্যে নানা রকমের উদরের পীড়া, চর্ম্মরোগ ও চালশেই প্রধান। কিন্তু অল্প পরিমাণে সকল পীড়াই এদেশে বর্ত্তমান আছে বলিতে হইবে। ইহাদের পীড়া হইলে কোন ঔষধ ব্যবহার করিবার প্রথা নাই, অস্ত্রচিকিৎসা মাত্র কিয়ৎ পরিমাণে করিতে দেখা যায়। কোন স্বাস্থ্যভঙ্গকর কারণে পীড়া হইয়া থাকে, চিনদের এরূপ বিশ্বাস নাই। তবে পীড়া হইলে ইহারা মনে করে, কোন ভূত রুষ্ট হইয়াছে এবং তাহার পূজা করিলেই পীড়া আরোগ্য হইবে। বলা বাহুল্য ইহারা অসংখ্য দুষ্ট প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করিয়া থাকে। চিনগৃহে রোগী মুমূর্ষু অবস্থায় উপস্থিত হইলে ইহারা সকলে একত্রিত হইয়া ঢাক ঢোল বাজাইয়া তুমুলকাণ্ড উপস্থিত করে। তাহাদের বিশ্বাস এই সকল বাদ্যের শব্দে ভূত রোগীকে ছাড়িয়া পলায়ন করিবে।

চিনদিগের দেহের কোন অঙ্গ ভগ্ন হইলে তাহারা দুই ভগ্ন অংশ যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক একখণ্ড তুলা দিয়া উহা বাঁধিয়া রাখে এবং পুনরায় আঘাতলাগা নিবারণ করিবার জন্য ভগ্ন অংশের চারিদিকে বাঁশের বেষ্টন বাঁধিয়া থাকে। কোন স্থানে ফোড়া হইলে জলপটি বাঁধিয়া রাখে। প্রথম প্রথম ইংরাজী ঔষধের উপর ইহাদিগের আস্থা দেখা যায় নাই, কিন্তু এক্ষণে ইহারা ইংরাজী ঔষধের পরম ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। চিনের দেহে আঘাত লাগিলে অতি অল্প সময়ে উহা আরোগ্য হয়। ইহাদের মধ্যে কুষ্ঠরোগও স্থানে স্থানে দেখা যায়। কুষ্ঠরোগীকে ইহারা যাহার তাহার সহিত মিশিতে বা বিবাহাদি করিতে দেয় না।

চিনদিগের বিশ্বাস মদ্যপান, যুদ্ধবিগ্রহ ও পশু শিকার করাই জীবনের উদ্দেশ্য। নারীগণ অন্যান্য কার্য্যের জন্য সৃষ্ট। সকল চিনই এই বিশ্বাসের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সুরাপান প্রত্যেক ঘটনারই প্রধান অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হয়। শত্রুর পরাজয়, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ বা ঋণপরিশোধ, প্রত্যেক কার্য্যেই সুরাপান অবশ্যম্ভাবী। ইহাদের উৎসব বলিলেই এক সুরাপানের বীভৎস পরিণাম অনুমান করিতে হয়। চিনগৃহে নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে হইলে এক এক ভাণ্ড মদ্য লইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়া প্রথা। অতএব প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তির নিকট হইতে এক এক ভাণ্ড সংগৃহীত হইয়া এত পরিমাণ সুরা একত্রিত হয় যে ইহাদের উৎসব ক্রমাগত কয়েকদিবস পর্য্যন্ত হইতে থাকে। উৎসবের কয়েকদিন মদ্যপান ও অর্দ্ধসিদ্ধ মিথুন বা শূকরমাংস আহার ব্যতীত আর অন্য কাজকর্ম্ম কিছুই হয় না। ইহাদের সঙ্গীত বিচিত্র রকমের। এই সঙ্গীত সর্ব্বদা সকলের দ্বারাই গীত হয়। ইহাদের সঙ্গীতেও

Photo by] চিন্ দম্পতি। [Abdul Aziz, H E.

উক্ত সঙ্গীতের কোন কোন অংশ বর্ত্তমান আছে বলিয়া বোধ হয়। ইহারা পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া এবং কদাচিৎ একাকীও নৃত্য করিয়া থাকে।

চিন স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সতীত্ব বলিয়া কোন জিনিষ বর্ত্তমান নাই। বিবাহের পূর্ব্বে গর্ভধারণ ইহাদের মধ্যে নিন্দনীয় হইলেও এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে ইহাদের কোন সামাজিক দোষ হয় না। বিবাহ-সম্বন্ধ পিতা বা অন্য অভিভাবকের দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। কন্যার রূপ বা গুণের জন্য কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না, তাহার গৃহকার্য্যপটুতা থাকা চাই। ফলতঃ চিন পিতামাতা কন্যার প্রকৃত মূল্য গ্রহণপূর্ব্বক কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহের জন্য সমান ঘরের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

চিনশিশুর পিতার নামে ও চিন বালিকার মাতার নামানুসারে নামকরণ হইয়া থাকে। চিনদিগের বিশ্বাস যে মৃত্যুর সহিত দেহের নাশ হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না। অতএব ইহারা মৃতের আত্মার মঙ্গলোদ্দেশে নানারূপ পূজাদির অনুষ্ঠান করে। ইহারা বলে মৃত আত্মাকে সন্তুষ্ট না রাখিতে পারিলে তাহারা অনিষ্ট করিতে পারে, কিন্তু ইহাদের মঙ্গল করিবার শক্তি নাই। মৃতব্যক্তির কবর বাটীর উঠানে দিয়া থাকে ও উহার উপরে স্মরণচিহ্ন স্থাপন করে। নানা প্রকার পশু, পক্ষী ও মনুষ্যের মূর্ত্তি এই সকল স্মৃতিফলকে খোদিত হইয়া থাকে।

অতি সামান্য কারণে চিনগণ শপথ করিয়া থাকে। কোন প্রাণী বধ পূর্ব্বক তাহার রক্ত দেহে ধারণ করাই ইহাদের সাধারণ শপথ। এইরূপ শপথবদ্ধ হইলেও ইহারা শপথ কচিৎ রক্ষা করে। যখনই দেখে যে শপথানুযায়ী কার্য্য না করিলে তাহার কোন ভয়ের কারণ নাই, তখনই শপথ ভঙ্গ করিয়া থাকে।

তাহারা, বিশ্বের যে একজন নিয়ন্তা আছেন, এরূপ বিশ্বাস করে না। সামান্যকায় মুর্গী হইতে বৃহৎকায় মিথুন পর্য্যন্ত ইহারা সকল প্রাণীর ভূত পূজায় নিয়োজিত করে। কাহারও দুরারোগ্য পীড়া উপস্থিত হইলে ইহারা ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র

চিন্ পুরুষ ও বালক।

Photo by] চিন্ স্ত্রীলোক ও বালক। [Abdul Aziz, H E.

হইতে বহুতর পশু বলি দিতে থাকে, যদি ইহাতেও পীড়ার উপশম না হয়, তবে রোগীকে তাহার ভবিতব্যের উপর ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়।

চিনদিগের কোন লিখিত ভাষা নাই। কথিত ভাষা ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন ভাবে কথিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহাদের ভাষা লে নামেই অভিহিত হয়। প্রবাসীর পাঠকদিগের জন্য নিম্নে ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি।

কাপা = পিতা, কানু = মাতা, কাফা = পুত্র,
কাফানু = কন্যা, কাপু = পিতামহ, কানি = খুড়ী।

চিনদিগের নানা ভাবের সঙ্গীত আছে। উহার নমুনা এইরূপ—

প্রবাসী প্রেমিক।

বিং বির লোদি কোট নর
তাট্ লিং চিম্
চাউং দেলো মোইয়ে।

"হে বন্য কুসুমগণ! তোমরা আমার প্রবাসী প্রণয়ীর নাম গান কর, কারণ তিনি প্রবাসে আছেন এবং আমি (যুবতী) তোমাদের নিকট ইহার জন্য কৃতজ্ঞ হইব।"

ঘুমপাড়ানি গীত।

কা নাও দি ও
তুপ্ লিং মাং হ্লা লো
কা বাং ইন্
হু নু ক্লুং ইন্
নু টিন রিয়েল বাং জু (Zu)
টান দি লে।

"ও আমার ছোট ভাই! তুমি কাঁদিও না। তোমার মুখ ব্যথা করিবে, এবং যখন তোমার মা ফিরিয়া আসিবেন, তখন তিনি তোমাকে, বরফের মত গলিয়া গিয়াছ, দেখিতে পাইবেন।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র দত্ত।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পঞ্জাবে বাঙ্গালী।

(২)

জয়দেব এবং চৈতন্যদেবের মধ্যবর্ত্তী সময়ে প্রবাসী বাঙ্গালীর তথ্য দুষ্প্রাপ্য। তবে এই সময়ে কুল্লুকভট্ট কাশীবাসী হন এবং কাশী অবস্থানকালে মনুসংহিতার টীকা প্রণয়ন করেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দী ইহার অভ্যুদয়কাল।* ইনি যে বাঙ্গালী ছিলেন তাহা ইহার স্বরচিত "গৌড়েনন্দনবাসি নাম্নী সুজনৈর্ব্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাং কুলে" ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যায়। যাহা হউক অতি প্রাচীন কাল হইতে বাঙ্গালীগণ কাশীপ্রবাসী হইয়াছেন। বৃন্দাবনেও বাঙ্গালীর বাস প্রায় চারিশত বৎসরের কম নহে। ফাহিয়ান যখন পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে

* "Kulluk Bhatta wrote his famous commentary on "Manu" in the 14th century almost 5 centuries after Mithila had had learning enough to send Medhatithi the second commentator of the same sacred Law book of the Hindus."
A Literary History of India by R. W. Frazer, L.L.B. London, 1898.

ভগবতীর তীর্থদর্শনে আইসেন, তখন মথুরায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব দেখিতে পান। ৭ম শতাব্দীতেও হোয়েন্থসাং মথুরায় ২০টী বৌদ্ধবিহার ও দুইসহস্র বৌদ্ধসন্ন্যাসী দেখেন। * বাঙ্গালী ভক্তগণ তখন মথুরাপ্রবাসী হইয়াছিলেন কিনা, তাহার ইতিহাস নাই। কিন্তু চৈতন্যদেবের সময় হইতে উত্তরপশ্চিমে বাঙ্গালীর প্রবাসের ইতিহাস আছে। ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ছয়জন গোসাই বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। ইঁহারাই মথুরার গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক এবং বৃন্দাবনের প্রথম মন্দিরনির্ম্মাতা। † বারাণসী এবং বৃন্দাবন, এই দুই স্থানে বাঙ্গালীর যত পুরাতন কীর্ত্তি বিদ্যমান আছে, প্রবাসের আর কোথাও তত নাই। বৃন্দাবনে কালীদহের উপর লোহিত প্রস্তর নির্ম্মিত মদনমোহনের মন্দিরশীর্ষে জাতীয়নিদর্শনস্বরূপ, প্রথমে বঙ্গাক্ষরে পরে নাগরী অক্ষরে একটী সংস্কৃত শ্লোক খোদিত আছে। এই মন্দির সনাতন গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। জীব গোস্বামীর রাধাদামোদরের মন্দির ও গোপালভট্টের প্রতিষ্ঠিত রাধারমণের মন্দির সুপ্রসিদ্ধ। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, অর্থাৎ ইংরাজরাজত্বের সূত্রপাত সময়ে, রাজা গোপালসিংহ মদনমোহনের একটী নূতন মন্দির স্থাপন করেন ও মুর্শিদাবাদ হইতে গোঁসাই রামকিশোর নামক একজন বাঙ্গালীকে আনাইয়া তত্ত্বাবধানের ভার প্রদান করেন। গোস্বামী বাৎসরিক ২৭ সহস্র টাকা আয়ের একখানি জমিদারি প্রাপ্ত হন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৮২১) বাবু নন্দকুমার ঘোষ গোপীনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। রাধাদামোদর ও মদনগোপালের মন্দিরে জীব এবং তাঁহার পিতৃব্যদ্বয় রূপ ও সনাতন গোস্বামীর দেহভস্ম রক্ষিত হইতেছে। শত শত বাঙ্গালী প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে এখানে "দেহাস্থোৎসব" দেখিতে আগমন করেন। আধুনিক বাঙ্গালীনির্ম্মিত মন্দিরগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদ কান্দির বিখ্যাত জমিদার স্বনামধন্য লালাবাবু (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) প্রতিষ্ঠিত "কৃষ্ণচন্দ্রমার" চতুষ্কোণ মন্দির বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য স্থানে আধুনিক কালীবাড়ী যেমন নিরাশ্রয় বাঙ্গালীর আশ্রয়স্থল, লালাবাবুর মন্দিরও বৃন্দাবনে তদ্রূপ আশ্রয়স্থল। এই মন্দিরের সংশ্লিষ্ট একটী অন্নছত্র আছে। অসংখ্য অতিথি এখানে অন্ন পাইয়া থাকে। ইহার জন্য বাৎসরিক ২২০০০৲ টাকা ব্যয় হয়। কৃষ্ণচন্দ্রমার মন্দির নির্ম্মাণে ২৫ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদের ৬হরকৃষ্ণ সিংহ একজন প্রসিদ্ধ সওদাগর ও জমিদার ছিলেন। ইঁহার অধস্তন চতুর্থপুরুষ রাধাগোবিন্দসিংহ নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ ও সিরাজউদ্দৌলার নবাবসরকারে চাকরী গ্রহণ করেন এবং বিশেষ সম্মান ও উচ্চপদে উন্নীত হন। তাঁহার ভ্রাতা দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নাম বাঙ্গালীর অজানিত নাই। তাঁহার পৌত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ত্রিশ বৎসর বয়সে মথুরাপ্রবাসী হন। মথুরায় ইনি ১৫ খানি গ্রাম এবং আলিগড় বুলন্দসহর প্রভৃতি স্থানে কিছু জমিদারী ক্রয় করেন। লালাবাবুর কীর্ত্তি বৃন্দাবনের চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান। ৪০ বৎসর বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ৪২ বৎসর বয়সে এই বাঙ্গালী কোটীপতি পরলোক গমন করেন *। ইহার পর হইতে এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করে। ইহার পরবর্ত্তী অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা ২৬৫ ছিল, কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী ২৬ বৎসরের মধ্যে ৮৫৬২ হয়; গত দশ বৎসরে আরও বাড়িয়া থাকিবে। লালাবাবুর আগমনের ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে, বর্দ্ধমানরাজমহিষী এখানে "পানসরোবর" নির্ম্মাণ করিয়া বাঙ্গালীর আর একটী প্রাচীন কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই জলাশয় দৈর্ঘ্যে ৮১০, প্রস্থে ৩৭৪ ফুট।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, যে জয়দেব এবং চৈতন্যদেবের মধ্যবর্ত্তী সময়ের বাঙ্গালী প্রবাসীর ইতিহাস পাই নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত ইতিহাস না পাইলেও বাঙ্গালীর উপনিবেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মুরাদাবাদের কলেক্টর মেল্‌ভিল সাহেব সেন্সস্ কমিশনরকে যে রিপোর্ট † লিখিয়া পাঠান, তাহা হইতে জানা যায় উক্ত জেলার "সম্বল" নগরে ৫০০ বৎসর

* Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1878, Page 130

† The first named community (Bengali or Gauriya Vaishnavas) has had a more marked influence on Brindaban than any of the others, since it was Chaitanya, the founder of the sect, whose immediate disciples were its first temple-builders."
Page 183, Mathura, a District Memior, by F. S. Growse, B. C. S. 1880

* Mathura Memoirs, pages 237-239.

† Census of N. W. P. for 1865, page 5, Vol. I. Appendix B.

পূর্ব্বে এবং আমরোহা নগরে ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণগণ আসিয়া বাস করেন। সাহারানপুরে প্রায় সার্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৭৬৫ অব্দে, বঙ্গদেশ হইতে বাঙ্গালীগণ আসিয়া বাস করেন। সুতরাং বলিতে হইবে, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও উত্তরপশ্চিমে বাঙ্গালীর উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গতিবিধির সূত্রপাত ভারতের সর্ব্বত্রই হইয়াছিল। এই সময় সনাতন গোস্বামী রাজপুতানায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও বাঙ্গালী প্রবাসের সূত্রপাত করেন। তাঁহার পঞ্জাবী শিষ্য লালা রামদাস কর্ত্তৃক পঞ্জাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। রামদাস মুলতানের প্রসিদ্ধ বণিক ছিলেন। ইনি মথুরায় বাণিজ্য করিতে আসিয়া সনাতন গোস্বামীর শিষ্য হন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ইঁহার নাম কৃষ্ণদাস লিখিত হইয়াছে। *

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বঙ্গের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণের ঘন ঘন আগমন হেতু বারাণসীতে বাঙ্গালীর প্রবাসের সীমা বিস্তৃত হইতে লাগিল। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কাশীতে আসিয়া শিবস্থাপনা এবং ছত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহার পর রাজা রাজবল্লভ আগমন করেন। মণিকর্ণিকার শ্মশান ঘাট ইঁহারই নির্ম্মিত। কথিত আছে এই ঘাট নির্ম্মাণের দস্তুরি হইতে শীতলাদেবীর ঘাট এবং দশাশ্বমেধের কাচা † ঘাট ও মন্দির নির্ম্মিত হয়। রাজা রাজবল্লভের সরকার রামানন্দ ইহার তত্ত্বাবধান করেন। তৎপরে নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী কাশীবাসী হন। ১৬৭৫ শক, অর্থাৎ ১৭৫৩ অব্দে, রাণী ভবানী কাশীধামে "ভুবনেশ্বর" ‡ নামে এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীর প্রসিদ্ধ দুর্গাবাড়ী ও দুর্গাকুণ্ড রাণী ভবানীর ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। প্রতিবর্ষে শ্রাবণ মাসে এখানে একটি মহামেলা হয়। দুর্গাকুণ্ডের কিছু দূরে "কুরুক্ষেত্রতলাও" নামে একটি জলাশয় আছে। ইহাও রাণী ভবানীর কীর্ত্তি। দুর্গামন্দিরের কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য প্রশংসনীয়। রাণী ভবানী কাশীরাজ চেৎসিংহের পিতা বলবন্ত সিংহের সময় অর্থাৎ ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে আগমন করেন। এখানে তাঁহার লোকহিতকর কীর্ত্তির মধ্যে ব্রাহ্মণভোজনার্থ ছত্র, দুর্গাকুণ্ড ও দুর্গামন্দির নির্ম্মাণ, ভাস্করপুষ্কর তীর্থে পুষ্করিণী খনন, পিশাচমোচন পুষ্করিণী খনন, আদিকেশবের ঘাট নির্ম্মাণ, মন্দির ও ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা, পঞ্চক্রোশীর রাস্তা ও তাহার স্থানে স্থানে ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ, কূপ ও উদ্যান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাণী ভবানী আর এক কীর্ত্তির জন্য ইনি কাশীতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। ইনি ৩৬০ জন ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে একখানা বাড়ী ও একহাজার টাকা দান করেন। কিম্বদন্তী এই যে কাশীর বাঙ্গালীটোলা স্থাপনার উহাই মূল। কিন্তু জনৈক শতবর্ষবয়স্ক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ ও জনৈক বৃদ্ধ দণ্ডী বলিলেন, তাৎকালীন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা দান গ্রহণ না করায় অপরদেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে ঐগুলি প্রদত্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গবিশ্রুত পুঁটিয়ার রাণী ভুবনময়ী কাশীধামে আসিয়া বাঙ্গালীর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি গঙ্গার তলদেশ হইতে প্রস্তরময় সোপান দ্বারা দশাশ্বমেধঘাট উত্তমরূপে বাঁধাইয়া তদুপরি ব্রহ্মপুরী মন্দির ও তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বাঙ্গালীটোলার শিবমন্দিরসংলগ্ন বৃহৎ অন্নসত্র ইঁহারই স্থাপিত। এই অন্নছত্রে অনেক অনাথ বঙ্গসন্তান নিত্য প্রতিপালিত হইতেছে। দুর্গাকুণ্ডের নিকটস্থ বিস্তীর্ণ বাগানবাটী রাণী ভুবনময়ীর; এক্ষণে পুঁটিয়ার বাগান নামে অভিহিত। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবী এই বংশের রাজবধূ।

রাণী ভবানীর পর যে সকল বাঙ্গালী কাশীবাসী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের সন্ধান পাওয়া যায়; তাঁহাদের বংশাবলী এখানে বাড়ী ঘর করিয়া স্থায়ী হইয়াছেন। অনেকে আবার বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে কিছুদিনের জন্য প্রবাসী হইতেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছিলেন। এক শতাব্দীর উপর হইল বারাণসীর খ্যাতনামা স্বর্গগত রায় প্রমদাদাস মিত্র বাহাদুরের প্রপিতামহ দেওয়ান আনন্দময় মিত্র কাশীপ্রবাসী হন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কলিকাতার মিত্রবংশোদ্ভব রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কাশীস্থ বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের নেতা

* বৃন্দাবনরহস্য, রামদাস ও সনাতন—পৃ ৩৬—৪৩।

† পরে রাণী ভুবনময়ী কর্ত্তৃক প্রস্তর দ্বারা পুনর্নির্ম্মিত হয়।

‡ বাণব্যাহৃতি রাগেন্দুগণিতে শকবৎসরে। নিবাসনগরে শ্রীমদ্বিশ্বনাথস্য সন্নিধৌ॥ ধরামরেন্দ্র বারেন্দ্র গৌড় ভূমীন্দ্রভামিনী। নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রীভবানীশ্বর মন্দিরং॥ মুর্শিদাবাদকাহিনী পৃ ২৯০ সং ১৩০৪।

ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৬৮৬ খৃঃ অব্দে) ইঁহার পূর্ব্বপুরুষ গোবিন্দরাম মিত্র কলিকাতার ইংরাজ-ফ্যাক্টরির গভর্ণর জব চার্ণকের নিকট কোম্পানি-সরকারে চাকরী গ্রহণ করেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্র হইতে জানা যায়, ইনি অতিশয় দক্ষতা ও গৌরবসহকারে বহুকাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন। সুতানুটী গোবিন্দপুরের নাম ইতিহাস-পাঠকগণের অবিদিত নাই। গোবিন্দরাম মিত্র কলিকাতা দুর্গের নিকটবর্ত্তী স্থান স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া তথায় স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। ইঁহারই নামে গোবিন্দপুরের নামকরণ হয়। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ কালে, ইঁহাকে ইংরাজদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর, ইংরাজ বাহাদুর ইঁহাকে উদ্ধার করিয়া কলিকাতা পুলিসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ প্রদান করেন। ঠিক এক-শতাব্দীপর, অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহের সময়, ইঁহারই বংশীয় বাবু গুরুদাস মিত্র কাশীস্থ বিপন্ন ইংরাজগণকে যৎপরোনাস্তি সাহায্য প্রদান এবং বিদ্রোহ দমনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কাশীর কমিশনর এবং গবর্ণর জেনারেলের প্রতিভূ ভারতগবর্ণমেণ্টকে এতৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন -

"I have much satisfaction in stating that Babu Gurudas Mittra, son of the good Rajendra Mittra, has done all in his power during the mutiny to assist Government. He attended in person at the Mint on the night of the mutiny. He during the following days gave supplies for the troops; he furnished six or seven horses, a palki-gari (or coach), a number of carts, wheels, and, in short, as far as his ability extended, did all that he could to identity himself with the cause of Government." *

এই মিত্রপরিবারের বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া শেষ করা যায় না। অনন্যসাধারণ বদান্যতা এবং লোকহিতব্রতের জন্য ইঁহারা কাশীর অধিবাসিগণের নিকট চিরপরিচিত হইয়া থাকিবেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইঁহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে বহুমূল্য খিলাত প্রাপ্ত হয়েন। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ গভর্ণমেণ্টের চাকরী করিলেও চাকরী উদ্দেশে ইঁহারা কাশীবাসী হয়েন নাই।* কিন্তু রায় প্রমদাদাস বাহাদুর অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও, বারাণসী কলেজে ইংরাজীসংস্কৃত বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রবল বিদ্যানুরাগই তাঁহাকে উক্ত চাকরী গ্রহণে প্রবৃত্ত করে। ইনি পণ্ডিতগণকে সংস্কৃতের সাহায্যে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন এবং সংস্কৃত ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ইঁহার সরল সংস্কৃতে অনর্গল বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। "পণ্ডিত" বলিয়া এখান হইতে যে সংস্কৃত পত্রিকা প্রকাশিত হয়, প্রমদা বাবু তাহাতে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ইনি কলিকাতা ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হয়েন। হিন্দুধর্ম্মে ইঁহার অচলা ভক্তি ছিল। আচার এবং পোষাক পরিচ্ছদে ইঁহাকে একজন নিরীহ ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া বোধ হইত। শুনা যায়, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইঁহারাই প্রথম দুর্গোৎসব করেন। তদবধি ইঁহাদের প্রাসাদে মহাসমারোহের সহিত শারদীয় উৎসব হইয়া থাকে।

বারাণসীতে অনেক বাঙ্গালী জমিদারের স্থায়ী বাস হইয়াছে। তন্মধ্যে এ প্রদেশে অনেকের জমিদারি আছে। কাশীনরেশের দেওয়ান বাবু গিরীশচন্দ্র দের স্বর্গীয় পিতা, মিউটিনীর বহুপূর্ব্বে, কাশীপ্রবাসী হন এবং পাঁড়ে হাউলি ও মদনপুরায় আবাসবাটী নির্ম্মাণ করেন। গিরীশ বাবু এক্ষণে পেন্সন উপভোগ করিতেছেন।

প্রায় ৮০ বৎসর হইল স্বর্গীয় প্যারিমোহন কবিরাজ কাশীবাসী হন এবং সোণারপুরায় ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত শীতলপ্রসাদ গুপ্ত বড়বাঁকা গভর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনি হিন্দীভাষা এরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে উহাতে অতি সুন্দর সুন্দর কবিতা পর্য্যন্ত লিখিয়া হিন্দুস্থানী সুলেখকদিগেরও প্রশংসাভাজন হইতেন। "হিন্দীপদ্যাবলী" নামে ইঁহার একখানি সুবৃহৎ কবিতা-

* Hindu Tribes and castes as represented in Benares, by the Rev: M. A. Sherring, M.A., LL.B., Lond. 1872 Page 313.

* "Diwan Anandamaya Mittra * * * did not come out from the metropolis of India as a Government Employe as the ancestors of the Bengali settlers of these provinces generally were, but he was a landholder, who at once secured an honored position among the gentry of Benares.—Kayastha Samachar, July 1901; Page 92.

পুস্তক আছে। উহা বিবর ইংরাজী খণ্ড-কবিতার হিন্দী পদ্যানুবাদ। প্রায় কুড়ি বৎসর হইল, উহা কাশীতে মুদ্রিত হয়। স্বর্গীয় রামচন্দ্র সেন উত্তরপশ্চিমের প্রাচীন বিদ্বন-

স্বর্গীয় রামচন্দ্র সেন।
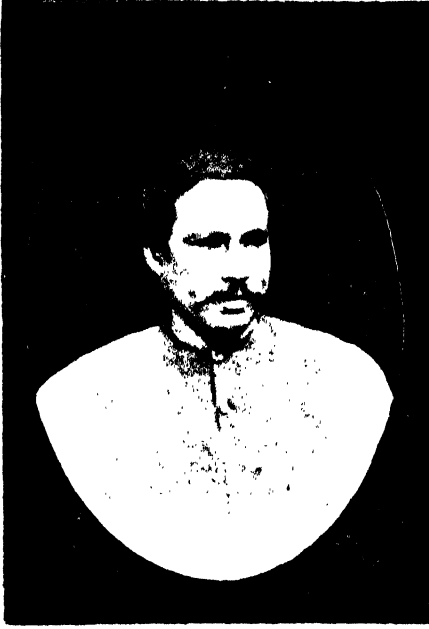
FROM AN EXTREMELY FADED PHOTOGRAPH.

মণ্ডলীর মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন। সিপাহীবিদ্রোহের বহু পূর্ব্বে রামচন্দ্র বাবুর পিতা রামকুমার সেন গভর্ণমেণ্টের কর্ম্ম লইয়া প্রথমে গাজীপুর আগমন করেন। রামচন্দ্র বাবু বারাণসী কলেজের বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন। ইনি Senior Scholarship পরীক্ষায় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হন। সাধারণে ইহাকে Flower of the Benares College বলিতেন। রামচন্দ্র বাবু অযোধ্যা প্রদেশের Inspector of Schools হন। এদেশীয়গণ তাঁহার ইংরাজী রচনাকে আদর্শ ভাবিয়া কাহারও রচনা ভাল হইলে বলিতেন, "বাবু রামচন্দ্রকে এয়সে আংরেজী লিখ্‌তে হাঁয়"। ইনি কয়েকখানি দার্শনিক ইংরাজী গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইখানি আমরা দেখিয়াছি। Essay on Human Life ইহার প্রধান গ্রন্থ। রামচন্দ্র বাবু ধর্ম্মচর্চ্চায় জীবনের অধিকাংশকাল ক্ষেপণ করিতেন এবং যোগসাধনায় বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন। সাধনার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া উত্তর কালে ইনি Inspector এর পদত্যাগ করিয়া Head master এর পদ পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার সহিত স্থানীয় উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষগণের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। তাঁহারা রামচন্দ্র বাবুর বিদ্যাবুদ্ধি অমায়িকতায় এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে ইহার জীবন তাঁহারা অতি মূল্যবান বিবেচনা করিতেন। রামচন্দ্র বাবুর মৃত্যু হইলে, তাঁহার আত্মীয়বর্গ মৃতদেহ যখন নৌকা করিয়া দশাশ্বমেধঘাট হইতে মণিকর্ণিকার ঘাটে লইয়া যাইতেছিলেন, কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর স্বয়ং নৌকা হইতে তাঁহার ফোটো তুলিয়া লইয়াছিলেন।

বাঙ্গালী স্বভাবতঃ বিদ্যানুরাগী। আমরা দেখিতে পাই কি প্রাচীনকালে, কি বর্ত্তমান সময়ে, বাঙ্গালী যে স্থানে প্রবেশ করিয়াছে সেই স্থানেই বিদ্যানুশীলন আরম্ভ ও স্থানীয় অধিবাসিগণের বিদ্যানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রবন্ধের যথাস্থানে তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে, চৈতন্যের প্রেমধর্ম্মোপদেশ কাশীর ঘোর বৈদান্তিক মণ্ডলীরও চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইয়াছিল। সিপাহীবিদ্রোহের বহুকাল পূর্ব্বে, পণ্ডিতশিরোমণি দেবনারায়ণ বাচস্পতি কাশীবাসী হন এবং একটী সুবৃহৎ চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তথায় অনেক বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। দেবনারায়ণ বাচস্পতি প্রায় শতবর্ষ জীবিত ছিলেন। ইঁহার পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন পাণ্ডিত্যে প্রায় পিতারই সমতুল্য ছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র সান্যাল, এম.এ, কাশী কুইন্‌স্ কলেজের অঙ্কশাস্ত্রাধ্যাপক ছিলেন। ইঁহাদিগেরও পূর্ব্বে, শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাসাগর কাশীতে একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। বোধ হয় কাশীতে বাঙ্গালীস্থাপিত চতুষ্পাঠীর ইহাই সূত্রপাত। ইঁহার প্রসিদ্ধ চতুষ্পাঠীতে ন্যায় স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতির অধ্যাপনা হইত। ইঁহার স্বনামখ্যাত পুত্র কালীকুমার বাচস্পতি কাশীর একজন সুপণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জয়রাম ভট্টাচার্য্য এক্ষণে অধ্যাপনা করিতেছেন। একটী দুইটী করিয়া কাশীতে স্থানে স্থানে বাঙ্গালীর অনেকগুলি চতুষ্পাঠী হইয়াছে। তন্মধ্যে যেগুলি বর্ত্তমান ও প্রসিদ্ধ তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অধ্যাপক	অধ্যাপনার বিষয়।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি	ষড়্দর্শন
„ রাখালদাস ন্যায়রত্ন	ন্যায়শাস্ত্র
পণ্ডিত সুরেন্দ্রলাল তর্কতীর্থ—	ন্যায়শাস্ত্র
„ প্রিয়নাথ তর্করত্ন -	সাংখ্য, বেদান্ত
„ কালীকুমার বাচস্পতি—	ব্যাকরণ, পুরাণ
„ মহাদেব স্মৃতিতীর্থ—	স্মৃতিশাস্ত্র
„ চন্দ্রকান্ত স্মৃতিকণ্ঠ—	ঐ
„ রাজেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্ররত্ন—	ব্যাকরণ, কাব্য অলঙ্কার, দর্শন
„ গদাধর শিরোমণি—	ব্যাকরণ
„ গোবিন্দচন্দ্র ন্যায়পঞ্চানন -	ন্যায়শাস্ত্র
„ গৌরাচাঁদ বাচস্পতি —	ব্যাকরণ ও পুরাণ
„ যাদব তর্কাচার্য্য —	ব্যাকরণ
„ অঘোরনাথ বিদ্যারত্ন —	সাহিত্য

১৮৫৯ খৃঃ অব্দে "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ," "পদার্থতত্ত্বসার" প্রভৃতি প্রণেতা স্বনামখ্যাত পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কাশীবাসী হন। এখানে প্রত্যহ তাঁহার নিকট দণ্ডী পরমহংস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সাধু সন্ন্যাসী ও অপরাপর বিদ্যার্থিগণ আসিয়া বেদ ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। কাশীনরেশ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য ইঁহাকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মাসিক বৃত্তি দান করেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই যশস্বী হইয়াছেন। তন্মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম, ভারত কেন, জগদ্বিখ্যাত। তাঁহার অন্যতম শিষ্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, সি আই ই, সম্প্রতি এতদঞ্চলে প্রবাসী হইয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্য, এম. এ, মহাশয় এপ্রদেশের ডেপুটী একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত। গুরুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তর্কপঞ্চানন মহাশয় আনন্দোচ্ছ্বাসে বলিয়াছিলেন, "আজ দ্রোণের আবাসে অর্জ্জুন আসিয়াছেন"।* দুঃখের বিষয় বঙ্গের মহামহাপণ্ডিতগণ এতদঞ্চলে বহুকাল হইতে প্রবাসী হইয়াছেন, কিন্তু অর্জ্জুনের ন্যায় শিষ্যের অভাবে আজি আর তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। বিলুপ্ত চতুষ্পাঠীসকলের মধ্যে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্নের চতুষ্পাঠী প্রধান ছিল। পাণ্ডিত্যের জন্য তারাচরণ তর্করত্নের বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। তিনি কাশীনরেশের প্রধান সভাপণ্ডিত ছিলেন। কালীচরণ চট্টোপাধ্যায় কাশীরাজ ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (ক্রমশঃ)

* শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রণীত চরিতমালা।

বঙ্গের বাহিরে বঙ্গসাহিত্য।

সিমলা। এখানে প্রায় এক শত বাঙ্গালী বারমাস বাস করেন। গ্রীষ্মের কয়েক মাস বড় বড় দপ্তরের সঙ্গে অনেক বাঙ্গালী এখানে আসিয়া থাকেন, কিন্তু এযাবৎ একটীও ভাল বাঙ্গালা পুস্তকালয় বা পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হইল না। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে ৬০৭০ খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ ছিল। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ অবকাশমত সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতেন। কিন্তু ইহা সাধারণের সুবিধাজনক না হওয়ায়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বন্ধ-প্রমুখ কয়েকজন বঙ্গসন্তান একত্র হইয়া একটি সাধারণ বাঙ্গলা পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে সংকল্প করেন। তাহারই ফল সিমলা "অমরাবতী লাইব্রেরী"। উক্ত যোগেন্দ্র বাবুর প্রদত্ত ৬০।৭০ খানি গ্রন্থ, বাবু মুকুন্দনাথ রায় প্রদত্ত অনেকগুলি গ্রন্থ এবং সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থ হইতে ক্রীত সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় চারিশত বাঙ্গালা পুস্তক লইয়া ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে পুস্তকালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। স্থানীয় স্যানিটারি কমিশনর বাবু নগেন্দ্রনাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে, বাবু যোগেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদকতায় এবং মুকুন্দনাথ রায় প্রমুখ অপর চারিজনের তত্ত্বাবধানে "অমরাবতী লাইব্রেরী" প্রায় দেড় বৎসর এক প্রকার চলিয়াছিল। কিন্তু ইহার একজন প্রধান উদ্যোগী কর্ম্মচারীর স্থানান্তরে গমন অবধি পুস্তকালয়ের অবনতি আরম্ভ হয়। ১৮৯৯ এবং ১৯০০ সালে পুস্তকালয় এক প্রকার বন্ধ ছিল। ইতিমধ্যে অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ অপহৃত হয়। পরে এইরূপ স্থির হয় যে অবশিষ্ট পুস্তকগুলি বিক্রয় করিয়া তাহার উপস্বত্ব স্থানীয় কালিবাড়ীর তহবিলে প্রদত্ত হইবে। "ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী" নামে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত এখানে একটি ইংরাজী পুস্তকালয়

আছে। তাহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। ইহা হইতেই সিমলা-প্রবাসীর কতদূর মাতৃভাষানুরাগ তাহা বেশ বুঝা যায়। যাহা হউক, সম্প্রতি গ্রন্থগুলিকে বিক্রয়ের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া পুস্তকালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বাঙ্গালাসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। "অমরাবতী লাইব্রেরী" "ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী" ভুক্ত হইয়াছে।

মিরজাপুর—মিরজাপুরে পূর্ব্বে অনেক বাঙ্গালীর বাস ছিল, কিন্তু বড় বড় আফিসগুলি উঠিয়া যাওয়ায় বাঙ্গালীর সংখ্যা সমধিক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানে মিউনিসিপালিটীর সাহায্যপ্রাপ্ত একটি সাধারণ পুস্তকাগার আছে। এপর্য্যন্ত উহাতে কেবল ইংরাজী উর্দ্দু ও হিন্দী পুস্তক রক্ষিত হইতেছিল। সম্প্রতি স্থানীয় বাঙ্গালা ভদ্রসন্তানগণের চেষ্টায় একটি বাঙ্গালা বিভাগ খুলা হইয়াছে। গত মাসে উহাতে ৫১ খানি বাঙ্গালা পুস্তক ছিল এবং নূতন গ্রন্থ সংগৃহীত হইতেছিল। এক্ষণে বোধ হয়, বাঙ্গালা বিভাগের পুস্তকসংখ্যা একশত হইবে। বাঙ্গালা সাময়িক ও সংবাদ পত্র একখানিও নাই। মিরজাপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত কেদার নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সম্পাদকতায় এবং স্থানীয় শিক্ষিত বঙ্গসন্তানগণের সহানুভূতি দ্বারা পুস্তকালয়টির উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছে।

ফয়জাবাদ—এখানে ১৮৯১ সালের সেন্সাস অনুসারে ৩৫৩জন বাঙ্গালীর বাস। সম্প্রতি ফয়জাবাদে কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি "বঙ্গসাহিত্যসমাজ" নামে একটি বাঙ্গালা পুস্তকালয় ও পাঠাগার সংস্থাপিত করিয়াছেন। আপাততঃ প্রায় ১০০ গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক বঙ্গসাহিত্যসেবক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় এসময় ফয়জাবাদ-প্রবাসী হওয়ায় পুস্তকালয় শীঘ্র উন্নতি লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

ঝান্সী—১৮৮৯ সালে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক "বঙ্গসাহিত্য-সমাজ" নামে একটী বাঙ্গালা পুস্তকালয় ও পাঠাগার স্থাপিত হয়। পুস্তকালয়টী প্রথমে ঝান্সীর রাণীর প্রাসাদে স্থান পাইয়াছিল; তখন ইহাতে ৩০০ বাঙ্গালা গ্রন্থ ছিল। পরে ইহাকে ঝান্সী গভর্মেণ্ট স্কুলে স্থানান্তরিত করা হয়। উহা উক্ত স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। ১৮৯৩ অব্দ পর্য্যন্ত ইহার কার্য্য সুন্দর ভাবে চলিয়াছিল। তাহার পর হইতে ইহার অবনতি আরম্ভ হয়। ৩০০ পুস্তকের স্থানে এক্ষণে প্রায় ১৫০ খণ্ড গ্রন্থ অবশিষ্ট আছে। নূতন পুস্তক আর সংগৃহীত হইতেছেনা। যাহা একশত গ্রাহকের সাহায্যে এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মিত্র এবং প্রতিষ্ঠাতাপ্রমুখ উৎসাহী ব্যক্তিগণের যত্নে উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছিল এবং ঝান্সীপ্রবাসী বঙ্গসন্তানগণের মাতৃভাষাচর্চ্চার কেন্দ্রস্থল স্বরূপ বিরাজ করিতেছিল, এক্ষণে তাহা সাধারণের সহানুভূতি অভাবে এবং প্রতিষ্ঠাতাগণের অনুপস্থিতিতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ঝান্সীতে ১৮৯৩ সালের আগষ্ট মাসে "Friends' Association" নামে একটী বিতর্কসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। গভর্মেণ্ট হাই স্কুলের ছাত্রগণ ১৮৯৬ সালে উহাতে সংবাদপত্রাদি সংগ্রহ করিয়া উহাকে পাঠগোষ্ঠীতে পরিণত করেন। ইহার সভ্যগণ সকলেই শিক্ষিত এবং উৎসাহী। এলাহাবাদের বঙ্গসাহিত্যোৎসাহিনী সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তত্রস্থ বান্ধবসমিতির হস্তে সভার ভার অর্পণ করিয়া যেরূপ পুস্তকালয়টীকে রক্ষা করিয়াছিলেন ঝান্সী বঙ্গ-সাহিত্য সমাজ তদ্রূপ "Friends' Association"এর হস্তে অর্পিত হইলে, বোধ হয়, পুস্তকালয়টী পুনর্জীবিত হইতে পারে। শুনা যায় ইতিপূর্ব্বে এরূপ প্রস্তাব ছাত্রসমাজ হইতে উঠিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যসমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক মহাশয় সহসা উহা হস্তান্তরিত করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি অবশ্য ঝান্সীতে থাকিলে পুস্তকালয়টীর তত্ত্বাবধান করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার অনুপস্থিতিতে, গভর্মেণ্ট স্কুলের শ্রদ্ধাস্পদ হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়দ্বয়ের চেষ্টায়, উৎসাহী যুবকসমাজের হস্তে ন্যস্ত হইলে পুস্তকালয়টী পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয়

মান্যবরেষু।

মহাশয়--প্রবাসী বাঙ্গালীদেরমধ্যে বাঙ্গালাভাষার চর্চ্চা কিরূপ হইতেছে, কোন্ স্থানে কিরূপ সভা সমিতি সংগঠিত হইয়া বাঙ্গালীদের পরস্পর মিলনের সুবিধা সুযোগ করা হইয়াছে,

রবিবর্ম্মাকৃত দ্রৌপদী ও সিংহিকা।

[INDIAN PRESS.

তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়া "প্রবাসী" বেশ কাজ করিতেছেন। এলাহাবাদ সাহিত্যসভা, সাহিত্যসম্মিলনী, সাহিত্যমন্দির, বান্ধবসমিতি ইত্যাদির আবির্ভাবের সংবাদ শুনিয়া আমরা বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই। ইহাতে আর কিছু হউক আর না হউক, প্রয়াগস্থ বাঙ্গালীদের কার্য্যতৎপরতা ও বাঙ্গালা সাহিত্যানুশীলনের ইচ্ছা এখনও বিনষ্ট হয় নাই—ইহা দ্বারা বিলক্ষণ প্রমাণিত হইতেছে। দুঃখের বিষয় পাঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অনেক স্থানেই বাঙ্গালীদের নির্জীবভাব নয়নগোচর করিলে, তাহার হৃদয়ে এখনও কোন উৎসাহস্ফুলিঙ্গ বর্তমান আছে, তাহাও নির্বাপিত হইতে আরম্ভ করে।

দেরাডুন ক্ষুদ্র সহর; যদিও ভারতীয় জরীপবিভাগের শাখাত্রয়ের এক শাখার কেন্দ্রস্থান বলিয়া গত ৪০ বৎসরের পূর্ব্ব হইতেই এখানে বাঙ্গালীর পদার্পণের চিহ্নসকল দৃষ্টিগোচর ও শ্রুতিগোচর হইতেছে, তথাপি এখনও ২০ ঘরের অধিক বাঙ্গালী এখানে নাই; ইহার মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালার লোকের সংখ্যা প্রায় তুল্য। এতদ্ব্যতিরিক্ত কতকগুলি বাঙ্গালী যুবক মে হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত মাত্র এখানে বাস করেন। এতদিন ধর্ম্মমতনির্ব্বিশেষে বাঙ্গালীদের মিলিবার ও পরস্পর মিলিয়া কাজ করিবার এমন বিশেষ কিছু ছিল না। গত জানুয়ারি হইতে, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এখানেও সাহিত্যসমিতি নামক একটী সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ও জীবনদাতা বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বি এ। ইনি এখানকার স্থায়ী প্রবাসী নহেন, কার্য্যোপলক্ষে ৬ মাস কাল মাত্র এখানে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। ইঁহারই উৎসাহাগ্নি অনেকের জড়তা দগ্ধ করিয়া সমিতির জন্ম সম্ভব করিয়াছে। সমিতি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র গ্রহণ করেন না। নব্যভারত, সাহিত্য, প্রদীপ, প্রবাসী, ভারতী, উদ্বোধন ও সাহিত্যসংহিতা সম্প্রতি লওয়া হইতেছে। পূর্ণিমা, হিন্দুপত্রিকা ও দরোগার দপ্তর পাওয়া যাইতেছে। স্মিথ ও রাউডেল কোম্পানীর বড় বাবু প্রবীণ শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দত্ত মহাশয় সমিতির তত্ত্বাবধায়ক ও পরিদর্শক মনোনীত হইয়াছেন। বাবু উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, বাবু হৃদয়ধন বসু ও বাবু ঈশানচন্দ্র দেব কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য। শেষোক্ত বাবু ইহার সম্পাদক ও বাবু বিমলাচরণ ঘোষ ইহার সহকারী সম্পাদক। আমাদের সভ্যদিগের মধ্যে বাবু প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্ এ, "বুয়ার যুদ্ধের ইতিহাস" লিখিয়াছেন। অন্য কেহ বাঙ্গালা কোন পুস্তক লিখেন নাই। উপেন্দ্র বাবু উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে এক ইংরাজি গ্রন্থ লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট পুরস্কৃত ও সুখ্যাতিভাজন হইয়াছেন; মধ্যে মধ্যে মাসিক পত্রিকাদিতেও প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। ঈশান বাবু মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা ও ইংরাজিতে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। যদিও সমিতির সভ্যসংখ্যা অল্প, তথাপি এককালীন দান অনেক পাওয়া যাইতেছে ও পাওয়ার আশা আছে বলিয়া সমিতির পুস্তকালয় অল্প সময় মধ্যেই যথোচিত উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো করিবে এরূপ আশা করা যায়।

দেরাডুন, ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯০১। — শ্রীঈশানচন্দ্র দেব।

ভারতবর্ষীয় জাতীয় মহাসমিতি।

অনেকে মনে করেন জাতীয় মহাসমিতি আমাদের ক্ষতি করিয়াছে। অপরপক্ষ কংগ্রেসের উপকারিতা নিরন্তর ঘোষণা করিতেছেন।

কংগ্রেসবিরোধীদিগের প্রধান যুক্তি এই যে ইহার অস্তিত্ব আমাদিগকে গবর্ণমেণ্টের অবিশ্বাসের পাত্র করিয়াছে; এবং যেহেতু শাসনকর্তাদিগের বিশ্বাসলাভ ব্যতীত প্রজার উন্নতি অসম্ভব, তাই কংগ্রেস আমাদিগের অমঙ্গলের কারণ। এই যুক্তি তত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। জাতীয় মহাসমিতির জন্মদানে ভারত গবর্ণমেণ্টের তাৎকালিক কর্ণধার রাজনীতিবিশারদ লর্ড ডফরিণের কিছু হাত ছিল। অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ রাজপুরুষ মহাত্মা হিউম ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অপর এক রাজপুরুষ মহামতি ওয়েডারবর্ণ ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজ করিতেছেন। রাজকর্ম্মচারিগণ দর্শকরূপে কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিবেন, এই আদেশ প্রদান দ্বারা লর্ড ল্যান্সডাউন ইহাকে স্পর্শদোষ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। অধিকন্তু বর্তমান রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জন বাহা-

তুর জাতীয় মহাসমিতির সভাপতিকে প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গলার্থ মন্ত্রণার জন্য আহ্বান করিয়া ইহাকে সম্মানিত ও অনুগৃহীত করিয়াছেন। সুতরাং বুদ্ধিমান্, দায়িত্বজ্ঞানবিশিষ্ট রাজপুরুষেরা কংগ্রেসের সহিত গবর্ণমেণ্টের প্রকৃত কোন বিরোধ আছে বলিয়া মনে করেন, এরূপ ভাবিবার অবসর নাই। অপরিচিত আগন্তুকের ন্যায় নবাভ্যুদিত জাতীয় মহাসমিতির প্রতি আংশিক সন্দেহ নিতান্ত অসম্ভব নয়; কিন্তু যতই দিন যাইবে, ততই গবর্ণমেণ্টের সহিত ইহার সম্পর্ক অধিকতর সদ্ভাবপূর্ণ হওয়ার আশা করা যায়।

তারপর, যদিই আজকাল আমাদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্বভাবের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, সে জন্য কংগ্রেসকে দোষী করা যায় না। কংগ্রেস ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত সমাজের কতকগুলি আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রকটীভাব মাত্র। যদি রাজপুরুষেরা কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ হন, তবে বলিতে হয় যে তাঁহারা সেই সমুদয় আশা ও আকাঙ্ক্ষার উপরই বিরূপ। কিন্তু সে গুলি আমাদের শিক্ষার ফল। ইংরেজী শিক্ষার অস্তিত্বে তাহাদের উদ্ভব অনিবার্য্য। সুতরাং কংগ্রেসের প্রতি রাজপুরুষদিগের বিমুখতা স্বীকার করিলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে অনিবার্য্য কারণে যে সকল আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদিগের হৃদয় অধিকার করিতেছে, আমাদের শাসিতৃগণ তাহাদের প্রতিকূল। এবং তাহা হইলে, কংগ্রেসের সৃষ্টিব্যতীতও যখনই বা যে ভাবেই সে গুলি প্রকাশিত হইত, অচিরাৎ উক্ত প্রতিকূলতাও আবির্ভূত হইত। তাই মনে হয় এবিষয়ে কংগ্রেস নিতান্তই নির্দ্দোষ। যাঁহারা কংগ্রেসওয়ালাদিগকে ব্যাধিগ্রস্ত মনে করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে তাঁহাদের নিজ যুক্তি অনুসারেও কংগ্রেসটা ব্যাধি হইতে পারে না। ওটা প্রলাপ মাত্র, আসল রোগ ইংরেজী শিক্ষা।

প্রকৃত প্রস্তাবেই কংগ্রেস আমাদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিষদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তর্কানুরোধে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া লওয়া যাউক। এই পূর্ব্বপক্ষ স্বীকৃত হইলে আমাদের এই মাত্র ক্ষতি দেখা যায় যে, যখন আমাদের গবর্ণমেণ্ট-প্রাসাদের দ্বারে ভিক্ষার জন্য চীৎকার করিবার ও ক্ষমতা ছিল না, তখন নিতান্ত নিঃসহায়, নিঃসম্বল ও কৃপাপাত্র জ্ঞানে ইংরেজ রাজপুরুষেরা আমাদিগকে যে ভুক্তাবশিষ্ট অন্নকণিকা অথবা ভিক্ষুকযোগ্য অন্যবিধ যৎকিঞ্চিৎ দান করিতেন, এখন আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইব। কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট দেখিতে পান যে কংগ্রেসমণ্ডপে সমবেত ভারতবর্ষ পূর্ব্ববৎ দীন ভিখারি নহে, পরন্তু শক্তিমান্, স্বপদে দণ্ডায়মানসমর্থ এবং আত্মনির্ভরপর, তবেই গবর্ণমেণ্টের তাদৃশ ভিক্ষাদানবিমুখতা সম্ভব হয়। কাজেই আমাদের কল্পিত পূর্ব্বপক্ষ স্বীকার করিলে সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে কংগ্রেস আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কৃপাপাত্র মনে করিতেন; কিন্তু এখন কৃপা করা দূরে থাকুক, আমাদিগকে জব্দ রাখা আবশ্যক বোধ করিতেছেন। কিন্তু যদি কংগ্রেস ভারতীয় প্রজাবর্গের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে অসমর্থলভ্য অনুগ্রহে বঞ্চিত করিয়া থাকে, তবে তাহাতে দুঃখের পরিবর্ত্তে আনন্দেরই কথা। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের বিরোধজননরূপ যে অপরাধ জাতীয় মহাসমিতির স্কন্ধে আরোপিত হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে উহার স্তুতিবাদ বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ এই যে উহা হিন্দু মুসলমানের বিচ্ছেদ সংঘটন করিয়াছে। কিন্তু এই অভিযোগও যুক্তিসঙ্গত নহে।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সহিত পূর্ব্বাপরই হিন্দু ও মুসলমান সমাজের সম্পর্ক কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন। ইংরেজেরা হিন্দুদিগের হস্ত হইতেই ভারতবর্ষ গ্রহণ করিয়াছেন, এই আধুনিক ঐতিহাসিক মত সত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরেজরাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ মুর্শিদাবাদ, হায়দরাবাদ ও শ্রীরঙ্গপত্তনে মুসলমান রাজদণ্ড পরিচালিত হইতেছিল। তখনও মুসলমানগণ আপনাদিগকে বিজেতৃস্থানাভিষিক্ত মনে করিতেছিলেন; হিন্দুগণ স্বাধীনতা লাভেরজন্য ন্যূনাধিক কৃতকার্য্যতার সহিত চেষ্টা করিতেছিলেন মাত্র। দিল্লীশ্বরের নামের তখনও প্রবল প্রভাব, স্বয়ং ইংরেজ কোম্পানী যে নামের মোহিনীশক্তি স্বীয় শক্তি সম্বর্দ্ধনার্থ প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাই ইংরেজাধিকার পরাধীনতায় অভ্যস্ত হিন্দুর নিকট একের পরিবর্ত্তে অপর বৈদেশিকের রাজত্ব; মুসলমানের চক্ষে তাহা আত্মভোগ্য সিংহাসনে অপরের অধিষ্ঠান, স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে পরাধীনতা। কাজেই হিন্দুর রাজভক্তি যত সহজ, মুসলমানের

ততটা নয়। যদিও কোন কোন আংলো-ইণ্ডিয়ান মুসলমান-দিগকে রাজভক্ত ও হিন্দুদিগকে তদ্বিপরীত বলিয়া প্রকাশ্য ঘোষণা করিতে নিতান্ত উৎসুক, কিন্তু প্রকৃত কথাটা তাহা নহে। এবং যদিও সম্প্রতি ইংরেজানভিলষিত কোন কোন রাজকার্য্যে নিয়োগ সম্বন্ধে মুসলমান প্রার্থীদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের একটুকু অতিরিক্ত অনুগ্রহে মুসলমান সমাজ তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়াছে, তথাপি ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে হিন্দুদিগের প্রতি পক্ষপাতী মনে করিতেন। সে যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে ইংরেজরাজের সহিত হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ক ঠিক এক নহে। সুতরাং এই দুই সমাজের রাজনৈতিক চিন্তাস্রোত বিভিন্ন মুখে প্রধাবিত হওয়াই স্বাভাবিক। কংগ্রেস তাহার কারণ নহে।

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের শিক্ষাও বিভিন্ন গ্রামে অবস্থিত। নবভারতের নূতন উদ্যম ইংরেজী শিক্ষারই ফল। হিন্দুগণ অতি দ্রুতবেগে প্রাচীন শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য আদর্শ পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইতেছেন; কিন্তু মুসলমানগণ এখনও এবিষয়ে ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাই ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক আদর্শ হিন্দুর আদর্শ অপেক্ষা অধিকতর প্রাচ্যভাবাপন্ন। সুতরাং পাশ্চাত্য সভ্যতামূলক রাজনৈতিক আন্দোলনে হিন্দুর ন্যায় আগ্রহসহকারে যোগ না দেওয়াই মুসলমান সমাজের পক্ষে স্বাভাবিক। অতএব কংগ্রেস রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমানকে হিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, এরূপ কল্পনা নিতান্ত ভিত্তিহীন। কিন্তু তথাপি হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক সম্বন্ধে কংগ্রেসের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের ফলাফল ঠিক এক নহে। পূর্ব্বে যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকিয়াও প্রচ্ছন্ন ছিল, কংগ্রেস তাহাকে ব্যক্ত করিয়াছে। প্রচ্ছন্ন ও ব্যক্ত সত্তায় প্রভেদ বিস্তর। পূর্ব্বে বুঝা যায় নাই, কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে আজিও মুসলমানগণ হিন্দুদের ন্যায় উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শ ধরিতে পারেন নাই। ইহাতে সাময়িক সংঘর্ষ, দুর্ব্বলতা ও মনঃকষ্টের বীজ নিহিত। কংগ্রেসমণ্ডপে এই পার্থক্য হঠাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া স্বার্থসাধনপর বা রাজভক্তি-পরিচালিত ব্যক্তিগণ আত্মপ্রবোধার্থ অথবা ভারতহিতৈষিগণের স্বজাতিমঙ্গলাকাঙ্ক্ষাপ্রণোদিত উদ্যমের গৌরবের হ্রস্বতাপাদনার্থ উচ্চনিনাদে মুসলমানের কংগ্রেসবিরতির সংবাদ চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিতেছে। কংগ্রেসের বন্ধুগণও সময়ে সময়ে কংগ্রেসকে ভারতসমাজদেহের বাহুদ্বয়ের বিভিন্নক্রিয়ত্বের জন্য দায়ী করিতে প্রলুব্ধ হইতেছেন। অতএব পূর্ব্বপ্রচ্ছন্ন বৈষম্যের কংগ্রেসজনিত সুব্যক্ততা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে, ইহারও একটা গুরুত্ব ও সার্থকতা আছে। কিন্তু তাহা আমাদের ক্ষতিমূলক না হওয়া বরং ঠিক তাহার বিপরীত। নবালোকোদ্ভাসিত পুনর্জীবিতপ্রায় হিন্দুসমাজের আশাসন্ধুক্ষিত ঊর্দ্ধগামী আকাঙ্ক্ষা ও সোৎসাহ কর্ম্মপ্রয়াস জাতীয়মহাসমিতিকর্ত্তৃক মুসলমানসমাজের নয়ন সমক্ষে জাজ্বল্যমানভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে। তাহার প্রতিঘাতে মুসলমানসমাজও আর নিরুদ্যম বিচ্ছিন্ন মানবসমষ্টিমাত্র থাকিতে পারিতেছে না। সমাজহিতকল্পে কর্ম্মবাসনা এবং নবযুগোপযোগী আদর্শ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের হৃদয়েও সুনির্দ্দেশ্য আকার ধারণ করিতেছে। একভাবে বিবেচনা করিলে ইহা ইংরেজী শিক্ষারই ফল; কংগ্রেসও তাই। কিন্তু মুসলমানসমাজের এই নবোদ্যমে জাতীয় মহাসমিতির প্রতিক্রিয়ার প্রভাব কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।

মুসলমান সমাজের উদ্যম সম্প্রতি শিক্ষাভিমুখী। শিক্ষাবিস্তার সর্ব্বদেশের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, এবং সমধিক পরিমাণে ভারতীয় মুসলমানসমাজের মুখ্য প্রয়োজন। অতএব শিক্ষাবিস্তারের রাজনৈতিক ফলাফল ছাড়িয়া দিলেও স্বরূপতঃ ইহা ভারতহিতচিকীর্ষু কংগ্রেসের অত্যন্ত আনন্দের কারণ। অধিকন্তু, পাশ্চাত্য শিক্ষায় কংগ্রেসের উদ্ভব এবং তাহার বিস্তারে কংগ্রেসের বলবৃদ্ধি এবং ফলবত্তার আশা। তাই মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান আপেক্ষিক অন্ধকারাবস্থায় তাঁহাদের উদ্যম প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে সমধিক ব্যয়িত না হইয়া শিক্ষাবিস্তারে প্রযুক্ত হওয়ায় কংগ্রেসের দুঃখ বা ভয়ের কারণ নাই, বরং তদ্বিপরীতেই জাতীয়মহাসমিতির জীবনতরুর মূল শুষ্ক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

মুসলমানগণ শিক্ষাসমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আলীগড় কলেজকে আংলো-মহাম্মদীয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার প্রস্তাব উচ্চপদাভিষিক্ত ইংরেজ রাজপুরুষদিগের অনুমোদন লাভ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ

সাহায্যে চারিদিকে মুসলমান ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং স্থাপিত হইতেছে। কোন কোন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান হয়ত মনে করেন, এই সকল কারণে মুসলমানগণ হিন্দুদিগহইতে অধিকতর কৃতজ্ঞ থাকিবেন; অর্থাৎ তাঁহারা কংগ্রেসে যোগ দিবেন না। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ইংরেজ রাজপুরুষগণ-কর্ত্তৃক উৎসাহিত ঠিক এই সকল ব্যাপারই মুসলমানদিগকে কংগ্রেসের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট করিবে।

মুসলমানগণ এখনও রাজকর্ম্মচারী নির্ব্বাচনার্থ পরীক্ষাতে হিন্দুদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ নহেন। এখনও আইন, চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যবসায়ে এবং মিউনিসিপালিটী, জিলাবোর্ড বা ব্যবস্থাপক সমাজে শিক্ষিত হিন্দুদিগের সহিত তাঁহারা আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রকৃতিপুঞ্জের অবারিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ উন্মুক্ত হইলে হিন্দুগণই প্রাধান্য লাভ করিবেন। এই কারণেই মুসলমানসমাজ কংগ্রেসানুমোদিত প্রজাতন্ত্রানুরূপ শাসনপ্রণালীর তত সমর্থন করিতেছেন না। কিন্তু মুসলমান শিক্ষাসমিতি, আলীগড় কালেজ, ও মুসলমান ছাত্রনিবাসগুলিরিদ্বারা শিক্ষা যতই বিস্তৃত হইবে, ততই মুসলমানগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপযোগী শক্তি লাভ করিবেন। তখন হিন্দুপ্রাধান্যের বিভীষিকা তাঁহাদিগকে পীড়িত করিবে না। এতদ্ব্যতীত, বিস্তৃততর শিক্ষা উচ্চতর রাজনৈতিক আদর্শের সৃষ্টি করিবে। সেই আদর্শের আয়ত্তীকরণ প্রবৃত্তিও মুসলমানদিগকে কংগ্রেসমণ্ডপে হিন্দুদিগের সহিত সম্মিলিত করিবে। অতএব জাতীয় মহাসমিতি হিন্দুমুসলমানের প্রচ্ছন্ন বৈষম্য সুব্যক্ত করিয়া উন্নত আদর্শ ও সমধিক শক্তিমত্তা লাভের মূলীভূত শিক্ষাভিমুখে মুসলমান সমাজের উদ্যম পরিচালন পূর্ব্বক স্বীয় সাফল্য সম্ভাবনা নিশ্চিততর এবং সমগ্র ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর করিয়াছে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যুক্তিগুলির মধ্যে যে দুইটীর প্রকৃত গুরুত্ব আছে বলিয়া আমার মনে হয়, তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিলাম। এখন কংগ্রেসের উপকারিতাসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া উপসংহার করিব।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংস্কারই কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার পৃষ্ঠপোষকগণ বলিয়া থাকেন ইহাদ্বারা সেই উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সংসাধিতও হইয়াছে। কিন্তু আমার বোধ হয় সে কৃতকার্য্যতা অতি সামান্য; উল্লেখযোগ্যই নহে। অধিকন্তু কংগ্রেসের বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব্ব করিবার চেষ্টা হইতেছে। মুদ্রাযন্ত্রসম্বন্ধীয় নূতন আইন এবং কলিকাতা মিউনিসিপালিটির নূতন গঠন তাহার প্রমাণ। ফলতঃ কংগ্রেসদ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ভারতের রাজনৈতিক সংস্কার সাধিত হইবে, এরূপ আশা কোন ক্রমেই পোষণ করিতে পারি না। অথচ কংগ্রেসের উপকারিতা নাই, অথবা সামান্য মাত্র, এরূপও বোধ হয় না। জাতীয় মহাসমিতি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক গুলির সম্মিলন। ইহাদের সমবেত শক্তি অপরিমেয়। তাই জাতীয় মহাসমিতির জাতীয় উদ্ধারসাধন ক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা অসন্দিগ্ধচিত্ত।

জাতীয় মহাসমিতির ফল প্রত্যক্ষ নহে, পরোক্ষ। এই মহামিলন ভারতের জাতীয় ঐক্যসাধনের পন্থা প্রস্তুত করিতেছে। ইহারই অনুকরণে ভারতবাসিগণ নানা বিভাগে সমবেত উদ্যমশীলতা প্রদর্শন করিতেছে। কংগ্রেস ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। এই সকল বিষয়ে সুষুপ্ত ভারতবর্ষকে বীতনিদ্র করিতে সমর্থ হইলে জাতীয় মহাসমিতি রাজনৈতিক অধিকার লাভ অপেক্ষাও মহত্তর ব্যাপারের অনুষ্ঠাতা হইল, সন্দেহ নাই। এবং তদবস্থায় কংগ্রেসের পরোক্ষ ফলস্বরূপ রাজনৈতিক উন্নতি সহজে উক্ত সর্ব্ববিধ আভ্যন্তরীণ উন্নতির পদাঙ্কানুসরণ করিবে। সুপ্তোত্থিতকল্প ভারতবর্ষের নানাবিষয়ক নবোদ্যম যে জাতীয়মহাসমিতির প্রভাবপ্রসূত, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সূক্ষ্মদর্শন বা চিন্তাশীলতার প্রয়োজন হয় না—চক্ষুরুন্মীলন মাত্র তাহা বোধগম্য হয়। জাতীয় মহাসমিতির অস্তিত্বেই কংগ্রেসের জীবন; প্রাদেশিক সমিতিগুলি উহার প্রত্যঙ্গ। মুসলমান শিক্ষাসমিতি কংগ্রেসেরই প্রতিবিম্ব। একের বিষয় শিক্ষা, অপরের রাজনীতি; প্রথমটী সুধু মুসলমানের, দ্বিতীয়টী হিন্দু মুসলমান উভয়ের। এতদ্ব্যতীত কংগ্রেসের ও মুসলমান শিক্ষাসমিতির মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। কংগ্রেসসংশ্রবে কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনীও আরম্ভ হইল। সামাজিকসমিতির ন্যায় একেশ্বরবাদীদিগেরও একটা সমিতি

গঠনের উদ্যোগ চলিতেছে। সেদিন মুসলমান পণ্ডিত-দিগের যে সমিতি হইয়া গিয়াছে এবং বোম্বেতে হিন্দু পণ্ডিত গণেরও সম্মিলনের যে পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকলও ন্যূনাধিকপরিমাণে কংগ্রেসেরই অনুকৃতি মাত্র। কায়স্থ সমিতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও সেই কথা। ফলতঃ নগণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর সম্মিলনে প্রকাণ্ড নদীসৃষ্টির ন্যায় ক্ষীণ-বল বহু লোকের চেষ্টা সমবেত হইয়া কি প্রকারে মহদনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইতে পারে এবং বহুধাবিচ্ছিন্ন অগণিত মানব কি ভাবে এক সাধারণ মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া সমষ্টীভূত সত্তায় স্ব স্ব ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিতে পারে, জাতীয় মহাসমিতি তাহার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। তাহারই ফল উল্লিখিত বহুবিষয়ক উদ্যম। ইহা কংগ্রেসের অল্প গৌরবের কথা নহে।

কংগ্রেসসম্বন্ধে বিশেষ আশার কথা ইহার দূরগামী ও বহুব্যাপী হিতগর্ভতা। যতই দিনযাইতেছে, ততই নূতন নূতন দিকে ও নূতন নূতন ভাবে কংগ্রেসের কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হইতেছে। ভবিষ্যতে কত অভিনব বিষয় কংগ্রেসমণ্ডপে ভারতবর্ষের চিন্তার বিষয়ীভূত হইবে, এখন নির্ণয় করা দুরূহ। কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ অভিব্যক্তি কোনদিকে কোন আকার অবলম্বন করিবে, তাহা এখন ঠিক কেহই বলিতে পারেন।। বিগত অধিবেশনের শিল্পপ্রদর্শনী ইতিপূর্ব্বে কাহারও মনশ্চক্ষুর গোচর ছিল না। কংগ্রেসের অতীত ইতিহাস ইহার স্থিতিস্থাপকতার প্রমাণ। সময় ও অবস্থা-ভেদে তাদৃশ পরিবর্ত্তনশীলতাই কংগ্রেস সম্বন্ধে আমাদিগকে সমধিক আশান্বিত করিতেছে।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ

গত আশ্বিন ও কার্ত্তিকের 'প্রবাসী'তে কুমীরা পোকার বিবরণ পড়িয়া সকলেই প্রীতি লাভ করিয়া থাকিবেন। যিনি যতটুকু নিজে পরিদর্শন করিয়া জানিয়া-ছেন, ততটুকু অন্যের চক্ষে যৎসামান্য হইলেও অনেক। আমরা প্রায়ই পরের দেখা, পুঁথিতে লেখা বিষয় লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া থাকি, নিজে দেখিয়া নাড়াচাড়া করিতে এখনও শিখি নাই। যে দিন শিখিব সে দিন আমরা মানুষ হইতে পারিব।

কুমীরা নামটি কোন কোন স্থানে চলিত হইলেও উহা কুমর, বা কুম্ভকার শব্দের অপভ্রংশ। কারণ এই পোকা কুমরের মত কাদা লইয়া কাজ করে। কাজটী অত্যাবশ্যক; -ভাবী সন্তানের পুষ্টিনিবাসনির্ম্মাণ।

উপযুক্ত শব্দের অভাব কত, তাহা কুমীরা পোকাকে 'পোকা' বলিবার সময় প্রকাশ পায়। কৃমি, কীট, পোকা, পতঙ্গ—এই চারি নামেই নিম্নশ্রেণী প্রাণীর সামান্য নামের শেষ। অথচ যিনি প্রাণিবৃত্তান্ত অবগত হইতে চান, তাঁহাকে বিশেষ অর্থে বিশেষ নাম প্রয়োগ করিতেই হইবে। আভিধানিকগণ পোকা শব্দ দেশজ বলিয়াই শান্ত হইয়া-ছেন। উহার ব্যুৎপত্তি জানি না। কৃমি শব্দের ধাত্বর্থ—যে গমন করে। কীট শব্দের দুই প্রকার অর্থ পাওয়া যায়। এক অর্থে যে—বন্ধন করে; অন্য অর্থে—যে রঙ্গ করে। রেশম-কাটে গুটি বা কোষ, বন্ধনের, এবং লাক্ষাকীটের অলক্তক, রঙ্গের দৃষ্টান্ত। এই রূপে কীটজ অর্থে রেশম, এবং কীটজ অর্থে লাক্ষা আছে। কৃমি শব্দেও লাক্ষাকীট বুঝায়। কৃমিজ অলক্তকাদি কৃমিজাত রক্তরঙ্গ। এই কৃমিজ শব্দ হইতে ইংরাজি crimson শব্দের উৎপত্তি। পতঙ্গ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে পত্র বা পক্ষ দ্বারা গমন করে। এইরূপে, ফড়িং পতঙ্গের উদাহরণ।

আর একটা বাঙ্গালা শব্দ আছে। সেটি প্রজাপতি। প্রজাপতি অর্থে পতঙ্গবিশেষ চলিত আছে। কিন্তু এই অর্থ সংস্কৃতে দেখিতে পাই না।

এই কয়েকটা শব্দ বিচার করিলে দেখা যায়, পোকা বলিলে কেঁচোর মত পদহীন দীর্ঘাকার প্রাণীকে বুঝায়। কৃমি শব্দেও এই প্রকার অর্থ মনে আসে। অন্ত্রকৃমিকে আমরা বাঙ্গালায় প্রায়ই কৃমি বলিয়া থাকি। ওড়িয়ায় পোকা বলে। বস্তুতঃ ইংরাজীতে যাহাকে worm বলে, আমরা বাঙ্গালায় তাহাকে পোকা বা কৃমি বলিয়া থাকি। কীট বলিলে অপেক্ষাকৃত উন্নততর প্রাণী মনে আসে। মনে হয় যেন তাহার পা আছে; তবে আকারে ক্ষুদ্র। পতঙ্গের পদ ও পক্ষ আছে।

সকলেই জানেন, চারি দশায় প্রজাপতির এক জন্ম শেষ হয়। প্রথম দশায় উহা ডিম্ব। দ্বিতীয় দশায় উহা পোকা। তৃতীয় দশায় উহা নির্জীব নিস্তব্ধ আকারে থাকে। চতুর্থ দশায় পদ ও পক্ষযুক্ত প্রজাপতি। ডিম্ব উদ্ভেদের পর কোন কোন প্রজাপতি শুঁয়া পোকা আকারে গাছের পাতা খাইয়া পাঁচ ছয় দিন কাটায়। তখন উহার ক্ষুধা অতিশয় প্রবল থাকে; দিবারাত্রি খাইলেও যেন ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। পরে উহা নিশ্চল নির্জীব স্থান খুঁজিয়া দ্রুতবেগে নিজ দেহ সূত্রজালে আবৃত করে। এই সূত্রকোষে তাহার দেহের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। শুঁয়া পোকার পা কয়টা অদৃশ্য হয়, লম্বা আকার ক্রমশঃ হ্রস্ব হইতে থাকে, গায়ের শুঁয়া খসিয়া যায়। ভিতরে ভিতরে দেহের এমন পরিবর্ত্তন হইতে থাকে যে, পরিবর্ত্তন সমাপ্তির পরে উহা প্রকৃতপতঙ্গের আকারে উড়িতে আরম্ভ করে। তৃতীয় দশায় দেখিলে হঠাৎ মনে হয় যে উহার জীবন নাই, অসাড়; কিন্তু টিপিলে বা নাড়াচাড়া করিলে নড়িতে থাকে।

প্রজাপতির এই চারিদশার উল্লেখ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, চারিদশার চারিটী নাম চাই। ডিম্ব শব্দ আছে পোকা শব্দও আছে। দ্বিতীয় দশার নাম পোকা বলা গেল। ইংরাজীতে তখন উহা grub, larva। তৃতীয় দশার ইংরাজিতে pupa, chrysalis। Pupa শব্দের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ সোণালী। করবী-গাছের পাতায় সোণালী রূপালী রঙ্গের বিচিত্র কোস ঝুলিতে দেখা যায়। কোষে থাকে বলিয়া এই অবস্থায় কোষস্থ বলা যাইতে পারে। চতুর্থ দশায় প্রজাপতির imago বা প্রকৃত মূর্ত্তি।

কুমর পোকারও এই চারি দশা আছে। তবে প্রথম তিনটী দশা মাতার লালামিশ্রিত কর্দ্দমকোষেই গত হয়। মাতা দ্বিতীয় দশায় ভাবী সন্তানের দেহবৃদ্ধি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার অভিপ্রায়ে অন্য পতঙ্গের পোকাকে বিষপ্রয়োগে সংজ্ঞাহীন করিয়া কোষমধ্যে স্থাপন করে। তৃতীয় দশা গত হইলে কর্দ্দমকোষ ভিন্ন করিয়া প্রকৃত মূর্ত্তি বহির্গত হয়।

উপরে কয়েকটী নাম বিচার করা গিয়াছে। এরূপ বিচারের প্রয়োজন আছে। যেহেতু এক এক নামের সহিত বহুজ্ঞান জড়িত থাকে। কুমোরা পোকার বৃত্তান্তলেখক উহার 'পোকার' খাদ্যকে সরীসৃপ বলিয়াছেন। কিন্তু সরীসৃপ অর্থে সংস্কৃত সর্প, এবং তাহা হইতে উহা বাঙ্গালায় সমগ্র reptiles শ্রেণীর নাম হইয়াছে। এইরূপে, চলিত কথায় কুমর পোকা নাম থাকিলেও কুমর পতঙ্গ বলাই ভাল বোধ হয়। উহার ছয় পদ, ও চারি পক্ষ আছে। বিজ্ঞানে উহা hymenoptera বর্গের (order) অন্তর্গত। চারি পক্ষ সূক্ষ্ম ত্বকে নির্ম্মিত। এই নিমিত্ত বর্গের নাম সত্বক্ পতঙ্গ করা যাইতে পারে। প্রজাপতিরও চারি পক্ষ। কিন্তু পক্ষে আঁইস বা শল্ক আছে। প্রজাপতির ডানা হাতে ধরিলে এই শল্ক হাতে জড়াইয়া যায়। এজন্য উহাকে সশল্ক পতঙ্গ বলা যাইতে পারে। আর একটা নামের উল্লেখ করা আবশ্যক। ইংরাজি insecta নামের মত একটা শ্রেণীর নাম চাই। যাহাদের দেহ কতকগুলি অংশে কর্ত্তিত, তাহাদের সামান্য নাম insecta ছিল। এইরূপে ঐ নামে মাকড়সা, বিছা, প্রজাপতি, কাঁকড়া, চিংড়ি প্রভৃতি অনেক প্রাণী বুঝাইত। এখন ঐ শব্দের অর্থ সংকীর্ণ হইয়াছে। কেহ কেহ ঐ নাম ত্যাগ করিয়া hexapoda করিয়াছেন। এই রূপে, বাঙ্গালায় আমরা ষট্‌পদ শ্রেণী ত বা ষটপদাদির মধ্যে কুমর পতঙ্গের স্থল নির্দেশ করিতে পারি।

এই সকল কথা যাহাই হউক, কুমর-পতঙ্গের বিবরণ-লেখক আরসলা ও কাচপোকার প্রবাদের উল্লেখ করিয়া ভাবে বলিয়াছেন যেন প্রবাদটী সত্য। কিন্তু তাঁহার ন্যায় যিনি স্বচক্ষে দেখিয়া মতামত প্রকাশ করিতে চান, তিনি কখনই এই প্রকার অনুমানে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। এজন্য আশা করি, লেখকমহাশয় ঐ প্রবাদের মূল অন্বেষণ করি-বেন। এইটুকু মাত্র দেখা গিয়াছে যে, কাচপোকা আর-সলার মস্তকের 'স্পর্শনে' (যদ্দ্বারা স্পর্শজ্ঞান হয়—শুঁয়া? Antennae হুল ফুটাইয়া বিষ প্রবেশ করাইয়া দেয়। ফলে আরসলা সংজ্ঞাহীন হইয়া মাথা নীচু করিয়া থাকে। কাচপোকা তখন একটী স্পর্শন নিজের মুখে ধরিয়া আরসলাকে অবলীলাক্রমে যথা ইচ্ছা তথা টানিয়া লইয়া যায়। কাচপোকা অপেক্ষা আরসলা আকারে ও বলে বড়। কিন্তু হুলবিদ্ধ হইবার পর তাহা পলায়নের চেষ্টা না করিয়া কাচপোকার অনুগমন করে।

আমার বোধ হয় আরসলার কাচপোকাত্ব প্রাপ্তির অর্থ ভিন্ন আছে। সে অর্থ কি, তাহা সংস্কৃত সাহিত্যসেবকগণ বলিতে পারেন। প্রবাদের অর্থ প্রথমে ঠিক হইলে উহার সত্যাসত্য নির্ণয় সহজ হইবে।

—০—

গত কার্ত্তিকমাসের ভারতীতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ হংসের নীরত্যাগ ও ক্ষীরপানের বিবরণ সংস্কৃত সাহিত্য হইতে প্রদর্শন করিয়া মীমাংসার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। এখানে হংস ও ক্ষীর লইয়া কথা। তিনি দেখাইয়াছেন যে ক্ষীর অর্থে দুগ্ধও বটে, মৃণালের রসও বটে। তাঁহার উদ্ধৃত প্রমাণ হইতে হংসের নিম্নলিখিত কয়েকটী লক্ষণ পাওয়া যায়। উহা বকের মত শ্বেতবর্ণ, বকের সহিত একত্র জলাশয়ে বিচরণ করে, পদ্মবনে পদ্মের মৃণাল ভক্ষণ এবং তাহার রস পান করে, কৈলাস পর্ব্বত এবং তত্রত্য মানসসরোবর হইতে ভারতে আসে। তাহার এক নাম রাজহংস, অন্য নাম ক্রৌঞ্চ। তবে বুঝা গেল, এই হাঁস পোষা পাতিহাঁস নহে। Swanও নহে। Goose বলিয়া বোধ হইতেছে। যাহাকে কড়হাঁস (কলহংস) বলে, বোধ হয় ক্ষীরপায়ী হংস তাহাই। কড়হাঁস শীতকালে উত্তর ভারতে আসে। বঙ্গদেশে প্রায় দেখা যায় না। অবশ্য বেলে হাঁস ও সোরেল প্রভৃতি পক্ষী নহে। এই কড়হাঁস হইতে গ্রাম্য বা পোষা রাজহাঁসের উৎপত্তি।

পোষা পাতিহাঁস ও রাজহাঁস পাওয়া যায়। কিন্তু এই দুই হাঁস দুগ্ধ পান করে না। খাঁটি দুধ, এমন কি আগুনে শুকাইয়া ঘন করিয়া দিলেও খায় না। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, নীরত্যাগ ও ক্ষীরপান অর্থে দুগ্ধপান নহে। অবশ্য শাবকাবস্থা হইতে অভ্যাস করাইলে হাঁস গাভীদুগ্ধ পান করিতে পারে। তৃণভোজী অশ্বকে যখন মাংস খাওয়াইতে পারা যায়, তখন হংসকে দুগ্ধ পান করান কঠিন নহে। সংস্কৃত কাব্যে যে হংসের কথা আছে, তাহা পোষা গৃহপালিত রাজহংস বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তাহাহইলে হিমালয় হইতে ভারতে আসিবার কথা থাকিত না। গৃহপালিত না হইলে হংসের দুগ্ধপান রুচি জন্মিতে পারিত না। হংস স্তন্যপায়ী নহে, জন্মাবধি দুগ্ধের সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। উহা প্রকৃত তৃণভোজী প্রাণী। অথচ সংস্কৃত সাহিত্যের হংসের ক্ষীরপান যেন স্বাভাবিক অর্থ বলিয়া বোধ হয়।

বাস্তবিক দেখিতে গেলে ক্ষীর অর্থে গবাদির দুগ্ধ করিলে কথাটা হাস্যকর হইয়া পড়ে। কারণ এমন কি দুগ্ধ আছে যাহাতে স্বভাবতঃ বিস্তর জল থাকে না। গাভীর 'নির্জ্জলা' দুধেও সের প্রতি কিঞ্চিদূন ৮৵০ ছটাক জল থাকে। যদি প্রবাদের অর্থ এই করা যায় যে, স্বাভাবিক দুগ্ধের জলীয়াংশ হইতে কঠিনাংশ (ছানা) পৃথক্ করিবার ক্ষমতা হংসের আছে, তাহাহইলে জলমিশ্রিত দুগ্ধের কথা হইতে পারিত না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন, "যদি যথার্থই হংসের ক্ষীরনীরবিবেচনক্ষমতা থাকে, তাহাহইলে নবাবিষ্কৃত দুগ্ধপরীক্ষণযন্ত্র (Lactometer) উহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইবে সন্দেহ নাই।" কিন্তু গোয়ালারা দুধে জল মিশাইয়া দুধে জলের স্বাভাবিক পরিমাণ বৃদ্ধি করে মাত্র। সুতরাং হংসের উক্ত ক্ষমতা থাকিলেও উহাদ্বারা দুধের সমস্ত জল পৃথক্ হইয়া পড়িবে। খাঁটি দুধ পাইবার আশায় কেহ দুধ হইতে ছানা কাটিয়া লইতে চান না।

কিন্তু আর একটী কথা আছে। পোষা রাজহংসের মুখের লালার অম্লগুণ আছে। মুখের ভিতর জিহ্বার উপর অম্লত্ব পরীক্ষার কাগজ রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে, লালা ঈষৎ অম্ল। এই দেখিয়া কয়েকটা পোষা রাজহাঁসকে ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় বাটীতে খাঁটি দুধ দেওয়া গিয়াছিল। কেবল দুধ কিছুতেই স্বেচ্ছায় খাইল না। বাটীর দুধে চাউল নিক্ষেপ করিলে সমুদয় চাউল খুঁটিয়া খাইয়াছিল, শেষে চারিটা হাঁসের মধ্যে একটা এক ঢোক দুধও খাইয়াছিল। বাটীতে প্রায় সমস্ত দুধই ছিল। মনে করিয়াছিলাম হয়ত দুধটা অম্লযোগে কাটিয়া যাইবে। কিন্তু দুই তিন ঘণ্টাতেও কাটিয়া ছানা হয় নাই। বোধ হয় অম্লের মৃদুতা ও অল্পত্ব বশতঃ দুধ কাটে নাই।

কিন্তু এইরূপ করিয়া কি প্রাচীনেরা হংসের ক্ষীরনীরবিবেচনক্ষমতা নির্ণয় করিয়াছিলেন? পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে সংস্কৃত সাহিত্যের হংস কোন জাতীয়, এবং কি প্রকারে তাহার এই গুণ নিরূপিত হইয়াছিল, তাহা জানা নাই। সুতরাং উপরে যাহা বলা গিয়াছে, তদ্দ্বারা প্রশ্নটীর শেষ মীমাংসা করা যাইতে পারে না।

কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, ক্ষীর অর্থে মৃণালের রসও বুঝায়। বস্তুতঃ ক্ষীর অর্থে জল, অর্কাদি বৃক্ষের সাদা দুগ্ধবৎ রস, এবং দুগ্ধ বুঝায়। উপস্থিত স্থলে জল হইতে পারে না, এবং দুগ্ধ বাদ দিলে অর্কাদি বৃক্ষের ক্ষীর থাকে। অনেক স্থানে গাছের শাদা রসকে চলিত কথায় ক্ষীর বলে। ক্ষীরই গাছ প্রসিদ্ধ। চলিত ওড়িয়াতে আকন্দ প্রভৃতি গাছের দুধের মত শাদা রসকে ক্ষীর বলে। অনেক গাছের ক্ষীর আছে। পদ্মের মৃণালের,জলজ কলমী শাকের রসও দুধের মত শাদা। সুতরাং সেই রসকে ক্ষীর বলা যাইতে পারে। সকলেই জানেন, হাঁস ঘাস, কোন কোন গাছের কোমল পাতা, কলার থোল, কলমী ও পদ্মের ডাটা ভক্ষণ করে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রাচীন গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন যে, পদ্মের মৃণালদণ্ড হংসের আহার। অতএব বোধ হইতেছে, হংসের ক্ষীরপান অর্থে মৃণালাদির দুগ্ধবৎ শাদা রস পান বুঝিতে হইবে!

ইহার ভিতরে আর একটু কথা আছে। পদ্মপাতার মৃণালের রস শাদা, গাঢ় দুধের মত। এই রসে অল্প জল, এবং সেই জলে শাদা কঠিন চূর্ণবৎ পদার্থ ভাসিয়া বেড়ায়। এই চূর্ণ জলে মিশে না, সুরাতে মিশে। পদ্ম-মৃণালের ক্ষীরে জল মিশাইলে ঐ শাদা পদার্থ এজন্য পৃথক্ হইয়া পড়ে। কারণ উহা ধুনাজাতীয় পদার্থ। পদ্মক্ষীরের আস্বাদ ঈষৎ তিক্ত ও লবণ। বস্তুতঃ উহা কেবলমাত্র জল নহে।

যদি হংসের ক্ষীরপান অর্থে মৃণাল-ক্ষীর হয়, তাহাহইলে ক্ষীর-নীর-বিবেচনক্ষমতা হংসের নহে। মৃণালের ক্ষীরের ধর্ম্মই এই যে, উহা জলে মিশে না, ভাসিয়া বা পৃথক্ হইয়া পড়ে।

সমুদয় বিবেচনা করিলে মনে হয় হংসের নীরত্যাগ ও ক্ষীরপান অর্থে গবাদি পশুর দুগ্ধপান নহে, মৃণালের দুগ্ধবৎ রস বুঝিতে হইবে। হংস যখন মৃণালের রস পান করে, তখন সেই রসের জলীয়াংশও পান করে। কিন্তু রসের জলবৎ অংশ হইতে ক্ষীরবৎ অংশ পৃথক্ হয় বলিয়া মনে হয় যেন হংসই উহাদিগকে পৃথক্ করে। পদ্মমৃণালের ক্ষীর জলে মিশে না ইহা জানা না থাকিলে নীরত্যাগ ক্ষীর গ্রহণ বাস্তবিক বিস্ময়কর বিষয় বটে।

টাকার কথা।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বয়স যখন দুই তিন বৎসর তখন সে অত্যন্ত আদুরে ছেলে ছিল। দুধ খাওয়া, জামা গায়ে দেওয়া প্রভৃতি সকল কার্য্যেই সে বিষম বাহানা করিত এবং শেষে উচ্চৈঃস্বরে কান্না জুড়িয়া দিত। সে সময়ে তাহাকে ঠাণ্ডা করা আমাদের কাহারও সাধ্য হইত না। তখন কেবল পুরাতন ভৃত্য মনিরামই অবলীলাক্রমে তাহাকে শান্ত করিতে পারিত। উচ্চৈঃস্বরে রোরুদ্যমান শিশুকে কোলে লইয়াই সে তাড়াতাড়ি নানারূপ খাবারের গল্প ফাঁদিয়া দিত। মন্দিরের ন্যায় সন্দেশ, গাড়ির ন্যায় জিলাপী, একঘর লুচি প্রভৃতি দ্রব্য মুহূর্ত্ত মধ্যে একত্র হইয়া যখন মনিরামের হিন্দিবঙ্গমিশ্রিত নিজস্ব ভাষায় সেই বালকের অস্ফুট কল্পনার সম্মুখে নৃত্য করিত, তখন আমরা তাহার মুখে কান্নার পরিবর্ত্তে হাসির রেখা দেখিতে পাইতাম।

অনেকে বলেন যে আজকাল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক মাসিকপত্রাদির প্রবন্ধ আগাগোড়া বেশ মন দিয়া পড়েন না। সাহিত্য, বিজ্ঞান ইতিহাসাদি ত দূরের কথা, রীতি-মত উপন্যাসের পৃষ্ঠায় বিচরণ কালেও পাঠকের অধীর দৃষ্টির উল্লম্ফনী শক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। গল্পের ঘটনাবলীর মধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা এবং নীতিবিষয়ক আলোচনা ও উপদেশ সমূহ রঙ্গালয়ে দুই অঙ্কের মধ্যবর্ত্তী সময়ের ন্যায় কষ্টকর বোধে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। ইহা সুলক্ষণ বলিয়া বোধ হয় না। ছেলের বাহানার ন্যায় ইহা চাঞ্চল্য, অধীরতা,ঔদাস্য ও মানসিক দুর্ব্বলতার চিহ্ন বই আর কিছুই নহে।

তাই আমরা ভৃত্য মনিরামের পন্থা অনুসরণ করিয়া আজ টাকার কথা পাড়িলাম। এই অর্থগতপ্রাণ কলিযুগে অন্য কথা শুনুন আর না শুনুন টাকার কথা কেহ উপেক্ষা করিবেন না, বিশ্বাস আছে।

আজকাল যেমন অর্থ বলিতেই ঝক্‌ঝকে সাদা চাক্‌তি ও ঝন্ ঝন্ শব্দ আমাদের মনে উদিত হয়, বহুশত বৎসর পূর্ব্বে আদিম মানবের মনে অবশ্য সেরূপ হইত না। ভূ-প্রোথিত মৃৎপাত্র ও শিলাফলকাদি এবং অতি প্রাচীন ভাষা সমূহের গঠন হইতে যে সকল পণ্ডিতেরা গভীরগবেষণা-

রবিবর্ম্মাকৃত তদ্গতচিত্তা।

[INDIAN PRESS.

দ্বারা মানবজাতির আদিম অলিখিত ইতিহাস সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের পরিশ্রমের ফলে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবার পর মানবসমাজ চারিটী প্রধান অবস্থার ভিতর দিয়া ক্রমোন্নতির পথে চালিত হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় মানব স্বভাবজাত পর্ব্বতের গহ্বরে, বৃক্ষকোটরে কিম্বা গভীর বনরাজির নিবিড় ছায়ায় বাস করিত এবং অরণ্যজাত ফলমূল ও স্বকীয় প্রস্তরাদি-নির্ম্মিত অস্ত্র দ্বারা নিহত বন্য জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিত। দ্বিতীয় অবস্থায় মনুষ্যগণ বাসের জন্য সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিতে শিখিল এবং বহুসংখ্যক গোমেষমহিষাদি জন্তুর পালন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের সহজ উপায় করিয়া বহুকষ্টসাধ্য ব্যাধবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিল। কিন্তু কৃষিকার্য্যে অজ্ঞতা প্রযুক্ত তাহারা পালিত জন্তুর আহার্য্য সংগ্রহের জন্য দলবদ্ধ হইয়া নূতন নূতন স্থানে বিচরণ ও বসতি স্থাপন করিতে বাধ্য হইত। তৃতীয় অবস্থায় মনুষ্য কৃষিকর্ম্মে অভিজ্ঞাত হইয়া এই কষ্টকর ও উন্নতিরোধক ভ্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। পৃথিবীর অনেক প্রদেশের নরসমাজ এক্ষণে এই তৃতীয় অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু ইউরোপীয় কয়েকটী দেশের নরনারী স্বকীয় বুদ্ধি, কার্য্যদক্ষতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণে কৃষিযুগের অগ্রবর্ত্তী বাণিজ্য ও শিল্পের যুগে প্রবেশপূর্ব্বক ঐহিক উন্নতি বিষয়ে পৃথিবীর জাতিসমূহের শীর্ষস্থানীয় হইয়া রহিয়াছেন।

ব্যাধ, পশুপালক, কৃষি ও শিল্পী মানবসমাজের ক্রমোন্নতির এই চারি অবস্থারই উদাহরণ এখনো পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছে। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ও অর্থরূপে ব্যবহৃত বস্তুসমূহের ক্রমিক পরিবর্ত্তনের আলোচনা যে অতীব চিত্তাকর্ষক ও লাভজনক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ব্যাধ অবস্থায় সমাজসমূহের মধ্যে পশুর লোম, চর্ম্ম, অস্থি প্রভৃতি অদ্যাপি অর্থের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত টার্টরি প্রদেশের নরনারী জমাট বাঁধা চায়ের খণ্ড অর্থরূপে ব্যবহার করিয়া হাট বাজার করিয়া থাকেন। আবিসিনিয়ায় সৈন্ধবলবণের খণ্ড দ্বারা ক্রয় বিক্রয়াদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রাচীন লাসিডামনে লৌহময় মুদ্রা তস্করকে উপেক্ষা করিয়া ধনীদিগের প্রাঙ্গণ জুড়িয়া পড়িয়া থাকিত। আমাদের দেশে কড়ি এখনো চলিতেছে। গবাদি জন্তু যদিও এক্ষণে ভারতবর্ষে বিনিময়ের জন্য সচরাচর ব্যবহৃত হয়না, তথাপি বহুকাল ধরিয়া তাহাদের ঐরূপ ব্যবহারের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেফের উপাখ্যানে লিখিত আছে যে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিত অজিগর্ত্তের পুত্রকে এক শত গো দ্বারা ক্রয় করিয়াছিলেন এবং তাহাকে হাড়কাটে ফেলিবার জন্য একশত ও কাটিবার জন্য আর একশত গরু খরচ করিয়াছিলেন।*

টাকার কথা বলিব বলিয়া লোভ দেখাইয়া, অন্য কথা বলিতেছি, এই জন্য হয়ত পাঠকপাঠিকারা রাগ করিতে পারেন। কিন্তু এত প্রকার মনোরম, ব্যবহারোপযোগী ও নিত্য আবশ্যকীয় বস্তু থাকিতেও স্বর্ণরৌপ্যই কেনস র্ব্ববাদি-সম্মত বহুমূল্য অর্থরূপে পরিগণিত হয়, ইহা যে জানিবার বিষয় সন্দেহ নাই। যাহা হউক সে কথা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রাখিয়া আমরা এক্ষণে খাস টাকার কথা পাড়িলাম। পাঠকের নিকট অনুরোধ যেন কতকগুলি টাকা সঙ্গে লইয়া এই প্রবন্ধ পড়েন ও কথিত বিষয় যথা সম্ভব মিলাইয়া লন।

আজকাল বৃটিশ ভারতবর্ষে যে টাকা প্রচলিত আছে, তাহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ঈষ্ট-ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর শাসনকালের টাকা। ইহাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুকুটহীন মূর্ত্তি আছে। দ্বিতীয়তঃ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর হস্ত হইতে মহারাণী ভারতশাসনভার গ্রহণ করিবার পরে মুদ্রিত টাকা। ইহাতে মহারাণীর সমুকুট মূর্ত্তি ও "কুঈন ভিক্টোরিয়া" এই লিপি আছে। তৃতীয়তঃ ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর ভারতরাজরাজেশ্বরী উপাধি গ্রহণের পরের টাকা। তাহা মহারাণীর মুকুটভূষিত মূর্ত্তি ও "এম্প্রেস ভিক্টোরিয়া" এই লেখায় শোভিত।

* ঐতরেয় ব্রাহ্মণ সপ্তম পঞ্চিকা ৩.৩ দেখুন। "তং হোবাচ ঋষেহ হং তে শতং দদাম্যহ মেষা মেকেন কেবল" ইত্যাদি। অর্থাৎ "রোহিত অজিগর্ত্তকে বলিলেন হে ঋষে! আমি আপনাকে এক শত দিতেছি। আপনার পুত্রদের মধ্যে একটির দ্বারা" ইত্যাদি। 'শতং দদামি' এস্থলে সায়নাচার্য্য অর্থ করিয়াছেন গবাং শতং। তবেই দেখুন সে সময়ে প্রধানতঃ গরুদ্বারাই ক্রয় বিক্রয় হইত। স্বর্ণ রৌপ্যাদিদ্বারা হইলে শতং বলিলেই শত গরু বুঝাইত না। যেমন এখন বাড়িটার দাম দশ হাজার তাহার মাহিনা দেড় শত, ইত্যাদি স্থলে তত্তৎসংখ্যক টাকাই বুঝায়।

এক্ষণে কোম্পানী আমলের যে সকল টাকা চলিতেছে তাহার সকল গুলিতেই ১৮৪০ এই সাল লিখিত আছে। কিন্তু তাই বলিয়া সকলগুলিই যে ১৮৪০ সালে প্রস্তুত তাহা নহে। ১৮৪০ হইতে ১৮৬১ সালের মধ্যে ঐ টাকা গুলি প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮৪০ হইতে ১৮৫১ সাল পর্য্যন্ত প্রস্তুত টাকা অন্য টাকা হইতে কিছু বড় এবং তাহাতে "কুঈন" ও "ভিক্টোরিয়া" এই কথা দুইটী কিছু কাছা কাছি লেখা; ১৮৫২ হইতে ১৮৬১ সাল পর্য্যন্ত প্রস্তুত টাকার আকার অন্য টাকার সমান এবং তাহাতে মহারাণীর মূর্ত্তির এক পার্শ্বে কুঈন ও অন্য পার্শ্বে ভিক্টোরিয়া লিখিত আছে। বড় ঢপের টাকাগুলি অধিক পুরাতন বলিয়া এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের কোষাগারসমূহে তাহা বাছিয়া রাখা হইতেছে, ক্রমে গলাইয়া নূতন টাকা করা হইবে।

সমুকুট মূর্ত্তি ও "কুঈন ভিক্টোরিয়া" নামাঙ্কিত টাকাগুলি ১৮৬২ হইতে ১৮৭৬ সালের মধ্যে প্রস্তুত হয়। তাহার মধ্যে ১৮৬২ সালাঙ্কিত টাকাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই যে ১৮৩২ হইতে ১৮৭৩ সালের মধ্যে যত টাকা প্রস্তুত হইয়াছিল সমস্ত গুলিতেই ১৮৬২ এই তারিখ লিখিত হইয়াছে। ১৮৭৪ সাল হইতে টাকার যথার্থ তারিখ লিখিবার প্রথা প্রচলিত হয়। সেই জন্য খৃষ্টাব্দ ১৮৭৪ হইতে খৃষ্টাব্দ ১৮৯৩ পর্য্যন্ত সমস্ত সালেরই টাকা দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টাব্দ ১৮৯৪ হইতে খৃষ্টাব্দ ১৮৯৬ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের টাঁকশাল সমূহে টাকা প্রস্তুত হয় নাই। ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ সালে খুব কম টাকাই প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহাও করদ রাজ্যসমূহের জন্য। ১৮৯৯ সালে মোটেই হয় নাই। ১৯০০ হইতে আবার রীতিমত মুদ্রণ চলিতেছে।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে ১৮৭৪ সালের পূর্ব্বের টাকা হইলেই হয় ১৮৪০ নয় ১৮৬২ সালাঙ্কিত হইবে। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে অধুনা বাজারে প্রচলিত টাকার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সালাঙ্কিত টাকা নিম্নলিখিত মাত্রার সংখ্যায় বর্ত্তমান আছে। যথা—১৮৪০ সালের বড় ঢপের টাকা শতকরা ৪•১, ঐ সালের ছোট ঢপের ১১'৮, ১৮৬২ সালের ১৯, ১৮৭৪ সালের ৭৬, ১৮৭৫ সালের ১'০৩, ১৮৭৬ সালের ১'৩৬, ১৮৭৭ সালের ৪'২, ১৮৭৮ সালের ২'৯০, ১৮৭৯ সালের ২'৫ ১৮৮০ সালের ২.৪, ১৮৮১ সালের ৩, ১৮৮২ সালের ২৭৩, ১৮৮৩ সালের ১, ১৮৮৪ সালের ১'৯২ ১৮৮৫ সালের ৩•৭, ১৮৮৬ সালের ২.১৫, ১৮৮৭ সালের ৩.৯, ১৮৮৮ সালের ২.৯, ১৮৮৯ সালের ৩'৩৩, ১৮৯০ সালের ৫'৬, ১৮৯১ সালের ৩, ১৮৯২ সালের ৪•৯, ১৮৯৩ সালের ৩'৮, ১৮৯৭ সালের '১৭, ১৮৯৮ সালের '৪, ১৯০০ সালের ৬৮, ১৯০১ সালের ৩'০৫। কিছু কাল পূর্ব্বে চতুর্থ উইলিয়মের মূর্ত্তিবিশিষ্ট টাকা প্রায় দেখা যাইত কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ঐ টাকা ক্রমাগত সংগ্রহ করিয়া গলাইয়া ফেলায় এক্ষণে আর বড় দেখা যায় না।

এক্ষণে টাকার ওজন ও চলন সম্বন্ধে কিছু বলা যাউক। টাকার ধাতুতে শতকরা ৯১'৬৬ ভাগ খাঁটি রৌপ্য থাকে, অবশিষ্ট তাম্র ও অন্যান্য ধাতুর খাদ; সুতরাং চলিত কথায় টাকার রূপাকে পাঁচ পাই খাদের রূপা বলিলে নিতান্ত ভুল হয় না। এক টাকার ওজনকে এক ভরি বা এক তোলা বলে তাহা সকলেই জানেন। উহা ইংরাজী ট্রয় ১৮০ গ্রেনের সমান। সুতরাং এক দোয়ানির ওজন সাড়ে বাইশ গ্রেন। বহুকাল ব্যবহারে শতকরা দুই ভাগ অর্থাৎ প্রতি টাকায় ৩'৬ গ্রেন পর্য্যন্ত কম হইলেও সে টাকা আইন মতে বাজারে চলিবে। কিন্তু তদপেক্ষা অধিক তকম হইলে কেহ সে টাকা লইতে বাধ্য নহে, অর্থাৎ ঠিক ধরিতে গেলে তাহা অচল। সুতরাং সকলেরই উচিত যে টাকা লইবার সময় দেখিয়া লয়েন যে গৃহীত টাকার প্রত্যেকটী ওজনে ১৭৬.৪ গ্রেনের উপর হয়।

খুব বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিলে, নিরীহ লোকের অনর্থক লোকসান হইতে পারে ও ভারতের অধিকাংশ লোকেই সূক্ষ্ম ওজন প্রভৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ, এই জন্য সদাশয় গবর্ণমেণ্ট আপাততঃ নিয়ম করিয়াছেন যে শতকরা ৬.২৫ ভাগ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ প্রতি টাকায় এক আনা বা ১১'২৫ গ্রেন) কম হইলেও সে টাকা গবর্ণমেণ্টের কোষাগারে গৃহীত হইবে ও তাহার পরিবর্ত্তে পূরা ওজনের টাকা পাওয়া যাইবে। কিন্তু সকলেরই ভাবিয়া রাখা উচিত যে এই নিয়মটী অনুগ্রহ মাত্র এবং গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছামত প্রত্যাহৃত হইতে পারে। যে টাকা অপর লোকে আইন মতে লইতে বাধ্য নহে, গবর্ণমেণ্টও তাহা লইতে অস্বীকার করিতে পারেন। সুতরাং ওজনে শতকরা দুইভাগ কম হইলে সে টাকা না

লওয়াই কর্ত্তব্য এবং সকলেরই ঐরূপ টাকা চিনিবার ও ওজন করিয়া লইবার অভ্যাস করা উচিত।

বৈধ ব্যবহারে ঘর্ষণের দ্বারা টাকার যে ওজনের হ্রাস হয় তাহার পরিমাণ দেড় শত বৎসরেও ষোড়শাংশ বা টাকায় এক আনা হয় না। সুতরাং যে টাকার ওজন পনের আনা বা তদপেক্ষা কম তাহা যে অবৈধ উপায়ে কমান, ইহা সুনিশ্চিত। বিশেষতঃ যদি টাকাটী ১৮৪০ বা ১৮৬২ সালাঙ্কিত না হইয়া আরও পরবর্ত্তী সময়ের হয় তাহা হইলে ত কোনও সন্দেহই থাকে না। দুঃখের বিষয় যে এক্ষণে প্রচলিত টাকার মধ্যে অবৈধ রূপে কমান হাল্‌কা টাকার সংখ্যা কম নহে। বলা বাহুল্য যে লোভপরায়ণ দুর্বৃত্তগণ জনসাধারণকে প্রতারিত করিয়া লাভ করিবার জন্য গোপনে টাকা হইতে রূপা বাহির করিয়া লয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এই দুষ্ক্রিয়ার প্রাদুর্ভাব বিষয়ে ন্যূনতাধিক্য থাকিলেও মোটের উপর এদেশে রৌপ্যমুদ্রার সহস্রের মধ্যে ২৫টী অবৈধ রূপে ব্যবহৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়।

কিরূপে জুয়াচোরেরা অবৈধ উপায়ে টাকা হইতে রূপা বাহির করিয়া লয় তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নহে। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে টাকার ন্যায় ধার কাটা মুদ্রার কিনারা হইতে রূপা চাঁচিয়া লওয়া এক প্রকার অসম্ভব। এক সময়ে ইংলণ্ডে মুদ্রার কিনারা চাঁচিয়া বা কাটিয়া লওয়া অপরাধ এত প্রবল হয় যে প্রচলিত মুদ্রাসমূহের আকার নিয়মিত আকারের অর্দ্ধেক হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্য প্রসিদ্ধ গণিতবেত্তা সার আইজক নিউটন প্রথমে ইংলণ্ডে ধারকাটা মুদ্রার প্রচলন করেন। এক্ষণে আমাদের দেশে অবৈধ উপায়ে চাঁচা টাকা কদাচিৎ দুই একটী মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাও অতি সহজে ধরা পড়ে। চাঁচিয়া রূপা বাহির করিলে টাকা কিছু ছোট হইয়া পড়ে ও আবার অতি সাবধানে নূতন করিয়া ধার কাটিতে হয়। এই জন্য টাকা কমাইবার এ উপায় আমাদের দেশের প্রবঞ্চকদিগের প্রিয় নহে।

বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ হাল্‌কা টাকাই তেজাবী। নাইট্রিক এসিডকে হিন্দীতে তেজ্‌আব বলে। তেজাবের গুণ এই যে স্বর্ণ ভিন্ন অন্য সমস্ত সাধারণ ধাতুই ইহার স্পর্শে দ্রব হইয়া যায়। একটী মৃন্ময় পাত্রে তীক্ষ্ণ নাইট্রিক এসিড্ রাখিয়া তাহাতে দুই তিন সেকেণ্ডের জন্য একটী টাকা ডুবাইয়া রাখিলে প্রায় দেড় দুই আনা রূপা বাহির হইয়া যায়। পরে ঐ রৌপ্যযুক্ত এসিড্‌কে জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে তামার পাত রাখিলেই ঐ পাতে রূপা লাগিয়া যায় ও তাহা সহজে চাঁচিয়া লওয়া যাইতে পারে।

আজকাল আর এক কারণেও অনেক টাকা হাল্‌কা হইয়া যায়। ইলেক্ট্রোপ্লেট অর্থাৎ পিত্তলাদি নির্ম্মিত বস্তুকে তাড়িতক্রিয়াদ্বারা রৌপ্যাচ্ছাদিত করা এখন খুব প্রচলিত। একটী মাটির বা কাচের পাত্রে রাসায়নিক দ্রববিশেষ রাখিয়া তাহার একধারে একখণ্ড রৌপ্য ও অন্যধারে তামাদি নির্ম্মিত বস্তু নিমজ্জনপূর্ব্বক ঐ দ্রবের মধ্যে তাড়িত-প্রবাহ সঞ্চারিত করিলে রৌপ্যখণ্ড ক্রমে দ্রবীভূত হইয়া তামনির্ম্মিত বস্তুকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই কার্য্যে রৌপ্যখণ্ডের পরিবর্ত্তে অনেক সময় টাকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং প্রবঞ্চকেরা এইরূপে ব্যবহৃত টাকা বাজারে চালাইতে কুণ্ঠিত হয় না।

তেজাবী বা ইলেক্ট্রোপ্লেটে ব্যবহৃত টাকা দেখিতে ঠিক ভাল টাকার ন্যায়, কেবল কিছু পাত্‌লা। ওজন না করিলে তাহা অবৈধ উপায়ে ব্যবহৃত বলিয়া ধরা কঠিন। দরিদ্র লোকে প্রলুব্ধ হইয়া পাছে এই সকল সহজ উপায়ে সাধারণের ক্ষতি করে, এই জন্য অবৈধ উপায়ে টাকা হইতে রূপা বাহির করিবার দণ্ড অতি কঠিন করা হইয়াছে। লঘূকৃত মুদ্রা চালাইতে চেষ্টা করিলে দশবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

যে টাকা ওজনে শতকরা দুইভাগের অধিক কমিয়া গিয়াছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের কোষাগারে ধরা পড়িলেই কাটা হয় এবং তাহা অবৈধ উপায়ে লঘূকৃত বলিয়া প্রমাণ না হইলে যাহার টাকা তাহাকে নিম্নলিখিতরূপ মূল্য দেওয়া হইয়া থাকে; যথা—ওজনে পনের আনার উপর হইলে টাকার পুরা দাম দেওয়া হয়; চৌদ্দ আনা হইতে পনের আনার মধ্যে ওজন হইলে চৌদ্দ আনা, তের আনা হইতে চৌদ্দ আনার মধ্যে হইলে তের আনা এবং বার আনা ও তের আনার মধ্যে হইলে বার আনা দেওয়া হয়। টাকা ওজনে বার আনার কম হইলে তাহা কাটিয়া অধিকারীকে ফেরত দেওয়া যায়, কোষাগারে গৃহীত হয় না। আজকাল

রূপার যে দর তাহাতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মসমূহ যে সাধারণের পক্ষে নিতান্ত সুবিধাজনক ও গবর্ণমেণ্টের সদাশয়তার পরিচায়ক তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তেরআনা ওজনের একটী টাকা কাটিয়া অধিকারীকে ফেরত দিলে বাজারে তাহার মূল্য সাড়ে আট আনা বা নয় আনার অধিক হয় না,কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তের আনা মূল্যে তাহা গ্রহণ করেন। বার আনা অপেক্ষা কম ওজনের টাকা ফেরত দেওয়ায় অধিকারীর কিছু ক্ষতি হয় বটে কিন্তু ঐরূপ টাকা কদাচিৎ দুই একটী দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহা এত বিকৃত যে সকলেরই তাহা চিনিতে পারা ও না লওয়া কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের কোষাগারসমূহে বৎসরে গড়ে দেড়লক্ষাধিক হাল্কা টাকা ধরা পড়ে এবং কাটা হইয়া থাকে।

হাল্কা টাকার প্রসঙ্গে মেকি টাকার বিষয় দুই একটী কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হয় না। সৌভাগ্যের বিষয় যে এদেশে প্রচলিত টাকার মধ্যে মেকি টাকা অধিক নাই। প্রায় এক কোটি টাকার পরীক্ষার ফল সংগ্রহ করিয়া দেখা গিয়াছে যে সাধারণতঃ এক লক্ষের মধ্যে কুড়ি পঁচিশটী মেকি থাকে। মেকিগুলি অধিকাংশই অল্পমূল্য শ্বেতবর্ণ মিশ্রিত ধাতুতে প্রস্তুত, কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে রৌপ্যের মূল্য হ্রাস হওয়ার পরে যে সকল মেকি প্রস্তুত হইয়াছে তাহাদের কতকগুলিতে কিছু রৌপ্যের ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি গবর্ণমেণ্টের টাকার ন্যায় উত্তম রূপায় প্রস্তুত জাল টাকাও দুই একটী দেখা গিয়াছে। এক্ষণে রৌপ্যের যে দর তাহাতে যথার্থ রূপায় জাল টাকা প্রস্তুত করিলেও প্রত্যেক টাকায় পাঁচ ছয় আনা লাভ থাকে অথচ মেকি টাকা সহজে ধরা পড়ে না। এই-জন্য চতুর প্রবঞ্চকেরা আজকাল এই উপায় অবলম্বন করিতেছে। মেকি টাকা অনেক সময় এমন সুন্দররূপে প্রস্তুত হয় যে তাহা ধরা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু অভ্যাসের ফলে মেকি টাকা ধরা সহজ হইয়া পড়ে। দুই সহস্র টাকার মধ্যে একটী মেকি টাকা মিশাইয়া দিলে পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে ধরিয়া দিতে পারে এমন বেনে বা পোদ্দার দুর্লভ নহে। ধারের কাটা দেখিয়া লওয়াই মেকি চিনিবার প্রধান উপায়। অন্য সমস্ত অংশ সুন্দর রূপে নকল করিতে পারিলেও মেকিকরেরা সমানভাবে ধার কাটিতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের কোষাগারে মেকি টাকা ধরা পড়িলে উহা কাটিয়া যাহার টাকা তাহাকে ফেরত দেওয়া হয় এবং ঐ টাকা প্রস্তুতকরণে সে সংশ্লিষ্ট এরূপ সন্দেহ হইলে তাহাকে পুলিশের হস্তে অর্পণ করা হইয়া থাকে। মেকি টাকা প্রস্তুত করিবার দণ্ড যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস। ভারতবর্ষের কোষাগারসমূহে প্রতি বৎসর গড়ে বিশ হাজার মেকি টাকা ধরা পড়ে ও কাটা হয়।

এক্ষণে একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। ধনীর ভাণ্ডারে, দরিদ্রের কুটীরে, হাটে বাজারে সর্ব্বত্রই টাকার অধিষ্ঠান। কত স্থানে কত ভাবে যে সহস্র সহস্র টাকা ছড়ান রহিয়াছে,তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। এখন যদি কেহ প্রস্তাব করে যে দেশে সর্ব্বশুদ্ধ কত টাকা আছে তাহা গণনা করা হউক, তাহাহইলে প্রথমতঃ সে বাতুল বলিয়া উপহাসাস্পদ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে টাকার গণনা কার্য্য যে মোটামুটি সম্পন্ন করা যায় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কেহ বলিতে পারেন যে সরকারী টাঁকশালেরত হিসাব আছে, প্রতিবৎসর কত টাকা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা দেখিয়া ঠিক দাও, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে মোট টাকার সংখ্যা কত। কিন্তু যখন ভাবিয়া দেখা যায় যে বৎসর বৎসর কত টাকা রপ্তানি হইয়াছে,কত টাকা গলান হইয়াছে, কত টাকা মানবের অগম্য স্থানে পড়িয়া চিরদিনের জন্য হারাইয়া গিয়াছে,তখন বুঝা যায় যে যত টাকা প্রস্তুত হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেকও বর্ত্তমান আছে কি না সন্দেহ। দশবৎসর পূর্ব্বে যখন রূপার দর টাকায় ভরির অধিক ছিল, তখন অলঙ্কার প্রস্তুত করিবার জন্য যে প্রতি বৎসর কতটাকা গলান হইত, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? এখনও পর্য্যাপ্ত কোন মধ্যবিত্ত লোকের গৃহে দশ বিশ ভরি “টাকা ভাঙ্গা” রূপার গহনা নাই? আরও প্রতিবৎসর কত হাল্কা টাকা কাটা হয়, কত পুরাতন টাকা টাঁকশালে গলাইয়া ফেলা হয়। ভাবিয়া দেখুন ১৮৪০ সালের পূর্ব্বে কত কোটি টাকা ছিল, কিন্তু এক্ষণে নানা কারণে তাহার প্রায় একটীও দেখা যায় না। সুতরাং কত টাকা প্রস্তুত হইয়াছে,তাহা দেখিয়া বর্ত্তমান টাকার সংখ্যা ঠিক্ করিবার উপায় নাই। তবে

একথা জানিয়া রাখা ভাল যে ১৮৩৫ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতবর্ষে তিনশত পঞ্চান্ন কোটি টাকা প্রস্তুত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইশত সাড়েচারি কোটি বম্বের টাঁকশালে, ১৩৯৷৷০ (একশত সাড়ে উনচল্লিশ) কোটি কলিকাতার টাঁকশালে ও ১১ কোটি মান্দ্রাজের টাঁকশালে প্রস্তুত। ১৮৬২ সালে মান্দ্রাজের টাঁকশাল উঠিয়া যায়। এক্ষণে ভারতবর্ষে দুইটীমাত্র টাঁকশালে টাকা প্রস্তুত হয়। মোট প্রস্তুত টাকার সংখ্যা হইতে ইহা বুঝা যায় যে বর্ত্তমান টাকার সংখ্যা যতই হউক, ৩৫৫ কোটির অধিক হইতে পারে না।

ভারতের টাকা গণনার কথা বলিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে একটা কথা বলা উচিত। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একাউন্টেণ্ট জেনারেল সুবিদ্বান্ শ্রীযুক্ত এফ্. বি হ্যারিসন মহোদয়ই সর্ব্বাগ্রে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। জেভন্স্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রদর্শিত উপায় বহু পরিশ্রমে ভারতবর্ষের উপযোগী করিয়া তদ্দ্বারা টাকার সংখ্যা নির্ণয় বিষয়ে তিনি অনেক যত্ন করিয়াছেন। অদ্যাপি এ সকল বিষয়ে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা ও চেষ্টা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

এক্ষণে কি নিয়মে টাকার সংখ্যা নির্ণয় করা হয়, তাহা মোটামুটি ভাবে দেখা যাউক। মনে করুন একটী কলসীর মধ্যে আধকলসী তেঁতুলের বীজ আছে এবং একে একে না গনিয়া তাহার সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। যদি আরও একশত সেই প্রকার বীজ বিশেষরূপে চিহ্নিত করিয়া সেই কলসীতে মিশাইয়া দেওয়া যায়, তবে সেই মিশ্রিত বীজরাশি হইতে কতকগুলি উঠাইলে তাহার মধ্যে দুই চারিটি চিহ্নিত বীজ দেখা যাইবে। মিশ্রণকার্য্য খুব ভালরূপে সম্পন্ন করিলে চিহ্নিত বীজগুলি কলসীস্থ বীজরাশির মধ্যে সমানভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। এক্ষণে যদি পাত্র হইতে একশত বীজ উঠাইয়া দেখা যায় যে তাহার মধ্যে পাঁচটি চিহ্নিত, তাহা-হইলে বুঝিতে হইবে যে কলসীর মধ্যস্থ সমস্ত বীজরাশির শতকরা ৫টী চিহ্নিত। চিহ্নিত বীজের সংখ্যা একশত, ইহা জানা থাকায় মোট বীজসংখ্যা যে ২০০০ তাহা নিশ্চয় জানা যাইবে। সুতরাং নির্ণীত হইবে যে মিশ্রণের পূর্ব্বে কলসীতে ১৯০০ বীজ ছিল।

মনে করুন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বার কোটী নূতন টাকা প্রস্তুত হইল। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে টাঁকশাল হইতে বাহির হইবার পরে তিন চারি বৎসরের মধ্যেই নূতন টাকা পুরাতন টাকার সহিত মিশিয়া প্রচলিত মুদ্রার মধ্যে সমান ভাবে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এক্ষণে যদি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে দশ হাজার টাকা বাছিয়া দেখা যায় যে তাহার মধ্যে এক হাজার বা শতকরা দশটী ১৮৯৯ সালের টাকা, তাহা হইলে কি সিদ্ধান্ত হইবে? যে মুদ্রারাশির দশমাংশ বার কোটি, তাহার পরিমাণ কত? এই সহজ প্রশ্নের উত্তরে বুঝা যাইবে যে এ দেশে প্রচলিত মুদ্রারাশির পরিমাণ ন্যূনাধিক একশত কুড়ি কোটি।

অনেক বর্ষের টাকা সম্বন্ধে এইরূপ গণনা করিয়া ও নানা উপায়ে অজ্ঞাত বিষয়সমূহের যথাসাধ্য নিষ্কাশন, নিশ্চয় বা অনুমান দ্বারা বহু পরিশ্রম ও গণিতসম্বন্ধীয় গবেষণার ফলে নির্ণীত হইয়াছে যে বর্ত্তমান কালে প্রচলিত টাকার সংখ্যা ১১৫ হইতে ১২৫ কোটির মধ্যে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ১৮৩৫ সাল হইতে যত টাকা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেকও এক্ষণে বর্ত্তমান নাই।

শ্রীজ্ঞানশরণ কাব্যানন্দ।

কবির প্রতি অনুরোধ।

মধুর প্রণয় গান আর গাহিয়ো না,
—আর গাহিয়ো না।
হের ওই নবীন উষায়,
আঁখি মেলি ধরণী জানায়
জীবলোকে জীবনের নব উদ্দীপনা!
আর গাহিয়ো না,—আর গাহিয়ো না!
ক্ষান্ত দেও প্রেম-গীতি, কবি! গাহিয়ো না,
—আর গাহিয়ো না!
মিলনের নিশি হের শেষ,
খুলে ফেল নায়কের বেশ;—
সুধার সে সুখাবেশ আর চাহিয়ো না!
আর গাহিয়ো না,—কবি! গাহিয়ো না!
প্রেমমন্ত্রে মুগ্ধ বঙ্গ! আর গাহিয়ো না,—
প্রেম গাহিয়ো না!

সুমধুর রসে ভর পুর
বঙ্গ, যেন যৌবনের পুর ;—
নারীপ্রেম কি গো সার জীবনসাধন ?
আর গাহিয়ো না,—প্রেম গাহিয়ো না !
কর্ম্ম ডাকে প্রাণদ্বারে !—প্রেম গাহিয়ো না,
আর গাহিয়ো না !—
ছায়া-ছায়া, মায়াময় পুরে
প্রেমস্বপ্নে কি হইবে ঘুরে ?
মুক্ত ক্ষেত্রে মহত্বের জাগাও চেতনা !
—আর গাহিয়ো না – আর গাহিয়ো না !
ফিরে বাঁধ বীণা, কবি ! আর গাহিয়ো না,
—প্রেম গাহিয়ো না !
দীপ্ত দিবা,—শুভ ভবিষ্যৎ,
দৃপ্ত মন্ত্রে চেতাও জগৎ !—
কোমল প্রণয়-তান আর তুলিয়ো না !
আর গাহিয়ো না, প্রেম গাহিয়ো না !

কবিতা-সুন্দরী।

কত দিনে পাব তোরে হৃদয় মাঝারে
কবিতা, কল্পনা-লক্ষ্মি ! পূর্ণ বিভাভরে
আলোকিয়া পুলকিয়া সমস্ত অন্তর
পাতিবে আসন খানি। উজ্জ্বল সুন্দর
যাহা কিছু জগতের হইবে বিলয়
তোমার মাধুরী মাঝে। ধ্যানস্থ, তন্ময়,
হেরিব বিশ্বে আছ তুমি শুধু, আর
তোমারি প্রতিভা-দীপ্তি কবিত্ব-সম্ভার।
এবে শুধু ঘুরে মরি বৃথা অন্বেষণে,
চমকিয়া উঠি কভু বিরলে বিজনে
যেন তব ছায়া হেরি' বাতুলের প্রায় ;
কভু শুনি তব বীণা নীরব সন্ধ্যায়
ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ তান করে আলাপন ;
কভু তব নূপুরের মধুর নিক্কণ,
বহে আনে সুরভিত বসন্ত মলয়
প্রসন্ন শ্রবণে,—যবে শুভ্র জ্যোৎস্নায়
স্নাত করি দেহখানি প্রশান্ত শয়নে,
আরাম লভি গো সুখে মুক্ত বাতায়নে,
অর্দ্ধ নিমজ্জিত রাতে ; তন্দ্রাহীন আঁখি
কার পথ চেয়ে দেখে চমকি চমকি ;
তোমার ললিত গান শরৎ-উষায়,
শুনি কভু কম্প প্রাণে পুলকপ্রভায়।
মনে হয় তুমি যেন মিশায়ে আকাশে
ফিরিতেছ মোর পিছে, অতি পাশে পাশে,—
উপত্যকা, অধিত্যকা, পর্ব্বতগুহায়,
শ্যামল বনের মাঝে, পল্লবপ্রচ্ছায়,
উত্তালতরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রসৈকতে,
শিবা-কণ্ঠ-মুখরিত শ্মশানে, নিশীথে,
প্রেমিকার মঞ্জু কুঞ্জে, নিভৃত বিতানে,
কলস্বনা তটিনীর শীতল পুলিনে;
বিশ্বের প্রত্যেক দ্বারে ;—প্রতি পথে পথে.
যেথানে যাইগো আমি তোমা' অন্বেষিতে,
যেন তব কণ্ঠস্বর—মধুময়ী বাণী
আমারে বলিয়া দেয় কোথা, কত খানি
মাধুরী লুকায়ে আছে ;– তোমার আভাস।
নাহি জানি কবে হবে পূর্ণ পরকাশ !
আর করিওনা ছল চাতুরী সৃজন,
হে প্রেয়সি ! এস বক্ষে মুছাও নয়ন।
এত প্রেম, এত পূজা ঠেলনা চরণে ;
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ খানি তব অন্বেষণে ;
আশাহত ভগ্ন হৃদি লয়ে আঁখি-ধার,
চলেছে অন্তিম শয্যা করিতে বিস্তার।

শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ।

তমাল।

কার সে বাঁশরী-রবে প্রেম-বৃন্দাবনে
উষার কণকভূষা ধরি চারু শিরে
জাগিলে প্রথম তুমি বিপুল ভুবনে
হে তমাল ! স্বচ্ছ শ্যাম কালিন্দীর তীরে ?
কার সে বিরহতপ্ত দীন আঁখিজলে

নিয়ত হইতে সিক্ত পল্লব-শাখায় ?
কার আজন্মের সাধ তব পদতলে
লভিত বিরাম চির, ঘন জ্যোছনায় ?
কার রাঙ্গা চরণের আবেশ-পরশে
হরষমুখর, কার নূপুর-শিঞ্জনে
সোহাগে উঠিত ফুটি হাসিয়া হরষে
তোমার কুসুমরাজী গোকুল-ভবনে ?
কার সে মিলন-মধু পান করি সুখে
মাধুরী উথলি যেত তব বুকেবুকে !

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

অনুতাপ।

[ক্ষুদ্রকথা]

(১)

প্রমথনাথ বড়মানুষের ছেলে ; নিবাস শ্রীপুর নামক একটা পল্লীগ্রামে। তিনি কলেজি-শিক্ষার অনুরোধে কলিকাতা-প্রবাসী। নিরভিমানী, সরলচিত্ত এবং বিদ্যানুরাগী বলিয়া এই ধনীসন্তানের বন্ধুত্বলাভের জন্য, সহাধ্যায়ীরা সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।

মিষ্টার মিটার, জাতিতে বিলাতফেরত ; তাঁহার পুত্র উইলি মিটার, প্রমথনাথের সহপাঠী। উইলির সহিত প্রমথনাথের ঘনিষ্ঠতা জন্মিল ; এবং প্রমথনাথ উইলির বাটীতে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। উইলির পিতামাতা ভ্রাতা-ভগিনী সকলেই তাঁহাকে আদর করিতেন। মিটারপরিবারের আদব কায়দা এবং কথাবার্ত্তায় প্রমথনাথ নিরতিশয় মুগ্ধ হইলেন।

প্রমথনাথের পিতা ধনী হইলেও পল্লীগ্রামবাসী ; শিক্ষিত হইলেও দেশীয় প্রথাপদ্ধতির বশবর্ত্তী। এই জন্য মিটার পরিবারের দৃশ্য,প্রমথনাথের নিকট নূতন এবং কৌতূহলপ্রদ হইল। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জিতগৃহে, উইলির অনূঢ়া কিশোরী ভগিনী 'এমি'র স্বচ্ছন্দ বিচরণ, সুমিষ্ট সম্ভাষণ,এবং পিয়ানোপ্রবৃদ্ধ সঙ্গীত, প্রমথনাথের মানসনয়নে নবীন সৌন্দর্য্য রচনা করিতে লাগিল। এই ইংরাজী মুলুকে, ইংরাজী শিক্ষার এবং ইংরাজী নবেল প্রভৃতি পাঠে বাল্য-কালে সকলেরই মনে ইংরাজী আদর্শের প্রতি আসক্তি জন্মে, সকল হৃদয়েই ন্যূনাধিক পরিমাণে বিলাতি পদ্ধতি অবলম্বনের কামনা ফল্গুনদীর মত অন্তঃসলিলা হইয়া প্রবাহিত হয়। অন্তঃসলিলা স্ফুটবাহিনী হইল। প্রমথনাথ ভাবিতে লাগিলেন, যে, দেশীয়সমাজ কি বর্ব্বর, দেশীয় পরিহাস কি সৌন্দর্য্যশূন্য ; এবং দেশীয় অন্তঃপুর কি সুখহীন !

এখন ইংরাজ রাজা ; চাকুরী এবং মান সম্ভ্রম ইংরাজের হাতে ; তাহাতে বহুদিনের পরাধীনতায় দেশীয়সমাজ বিচ্ছিন্ন ; সে অবস্থায় সমাজকে উপেক্ষা বা পরিত্যাগ করা অতি সহজ। 'সৎসাহস' বা বীরত্বের প্রয়োজন হয় না। অল্পমাত্রায় বিদ্রূপ সহ্য করিবার ক্ষমতা থাকিলে, এবং লজ্জা পরিহার করিতে পারিলে এ কার্য্য অতি সুসাধ্য। কিন্তু একটা কথা লইয়া প্রমথনাথ গোলে পড়িয়াছেন ; তিনি বিবাহিত। পূর্ব্বে কখনও মনে হয় নাই, কিন্তু এখন মনে হইতে লাগিল, যে বিবাহিত হইয়া তিনি কি অসুখী হইয়াছেন !

একদিন সন্ধ্যার পর গৃহের বারান্দায় বসিয়া এমি এবং প্রমথনাথ কথাবার্ত্তা কহিতেছেন ; এমির ছোট ছোট ভাই বোনেরা পার্শ্বে বসিয়া খেলা করিতেছে। শাস্ত্রে নানা বিষয়ের বিধি এবং নিষেধ ব্যবস্থা দেখিতে পাই ; কিন্তু চন্দ্রালোকে রমণীমুখ-দর্শন নিষিদ্ধ বলিয়া শুনি নাই। নবমীতে অলাবু ভক্ষণ করিলে কি পাতক হয়, জানি না ; কিন্তু এই চন্দ্রালোকে এমির মুখ দেখিয়া প্রমথনাথের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে কবে বুঝি তাঁহাকে ইংরাজকবির বচন আওড়াইয়া বলিতে হইবে O my Amy, mine no more ! প্রমথনাথের জীবনকাব্যে এই তাঁহার অনুতাপের প্রথম পরিচ্ছেদ।

(২)

কলিকাতা থাকিলে পড়া ভাল হইবে এই কথা জানাইয়া, প্রমথনাথ গ্রীষ্মের বন্ধে বাটিতে যায় নাই। কিন্তু ছুটীটা মিষ্টার মিটারের ছেলেমেয়েদিগের সঙ্গে জু দেখিয়া,কোম্পানীর বাগানে গিয়া ইংরাজী থিয়েটার দেখিয়া কাটাইয়াছেন। এখন পূজার ছুটী উপস্থিত। বাড়ীতে না গেলে আর চলে না। একে বাড়ীতে পূজা, তাহার উপর বাপ মা জিদ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। প্রমথনাথ

পিতৃমাতৃবৎসল; বিশেষতঃ এ সংসারের কোন আকর্ষণ মাতৃস্নেহকে বিস্মৃত করাইতে পারে না। বাড়ী যাইবেন স্থির করিলেন; ধুতি চাদর পরিতে হইবে, তাহাও না হয় করিবেন; অসভ্য সমাজের লোকজনের সঙ্গে মিলিতে মিশিতে হইবে, তাহাও কায়ক্লেশে সহ্য করা যায়, কিন্তু এমিকে লইয়াই যত গোলযোগ। এমি জিজ্ঞাসা করিল "কতদিনে ফিরিয়া আসিবে?" কতদিনে! তাইত! গৃহের সম্মুখস্থ পুষ্পকানন, শরতের প্রভাত সৌন্দর্য্যস্নাত, হৃদয় প্রেমরাগদৃপ্ত, এবং এমির রক্তাধর সদ্য চা-পান-সিক্ত। কি বলিবেন বুঝিতে না পারিয়া এমির অধর চুম্বন করিলেন। হরি, হরি! প্রমথনাথ ভাবিলেন কাজটা বুঝি ভাল হইল না। কিন্তু এমি প্রেমচুম্বিত অধরে, তৃপ্তি জ্ঞাপন করিয়া প্রমথনাথকে আশ্বস্ত এবং উৎসাহিত করিলেন। ঠিক সেই সময়ে শ্রীপুরে একটী মুগ্ধা বালিকা প্রমথনাথের ভগিনী শারদাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "কলিকাতা হইতে পত্র আসিয়াছে কি?" এবং সেই সাপরাধ প্রশ্নটা প্রকাশ না পায় বলিয়া, তাহাকে মাথার দিব্য দিতেছিল। বালিকার নাম সরমা।

যাহা হউক প্রমথনাথ গৃহে গেলেন। বিলাত ফিরিয়া আসিলে এই অধম দেশটা কিরূপ দেখায়, জানি না। কিন্তু এবারে প্রমথনাথের চক্ষে শ্রীপুর অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছিল। লোকজন কথা কহিতে জানে না, অর্থাৎ বেশী কথা বলে। সামাজিকতা জানে না, অর্থাৎ বড় মেশামিশি করিতে চাহে। স্ত্রীজাতির প্রতি মর্য্যাদা নাই, কেননা ভদ্রঘরের রমণীরাও দাসীদিগের মত ঘর কন্না করে, কলসী কাঁকালে করিয়া জল টানে। মানসিক পরিবর্ত্তনের ফলে, চিরঅভ্যস্ত দৃশ্যগুলি এইরূপ অদ্ভুত হইয়া উঠিল।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, প্রমথনাথ যেখানে গিয়া নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবেন, তাহা জানিয়া শুনিয়া, বুঝিয়া সুঝিয়া বালিকা সরমা অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের সহিত ঠিক সেই স্থানে গিয়া বসিয়াছিল; এবং প্রমথনাথ উপস্থিত হইবামাত্র, ঘোমটা টানিয়া ছুটিয়া পলাইল। সম্পর্কের হিসাবে যাঁহারা তামাসা করিতে পারেন, তাঁহারা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সরমাকে দেখাইয়া একটু বাক্‌চাতুরী করিবার প্রয়াস পাইলেন। প্রমথনাথ ভাবিলেন, একি বর্ব্বর সমাজ! কোথায় পিয়ানোসঙ্গীত এবং প্রেমসম্ভাষণ, এবং কোথায় এই ঘোমটা টানিয়া পলায়ন! প্রমথবাবু যখনই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন তখনই "দৈবাৎ" সরমার চক্ষুদুটি চক্ষে পড়িত; এবং সেই বালিকা ছুটিয়া পলাইত। কিন্তু সেই চক্ষুদুটি! সে কথায় এখন কাজ নাই। পূজার গোলমালে প্রমথনাথের অনুতাপের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ শেষ হইল।

(৩)

যমের দরজায় কাঁটা দিয়া প্রমথনাথের ভগিনী ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিলেন; ভ্রাতৃদ্বিতীয়া শেষ হইল; পূজার ছুটি কাটিয়া গেল। মা বলিলেন, ছুটী হইলেই বাড়ী আসিও, কলিকাতায় থাকিও না। আত্মীয় পরিজন সকলেই সেইরূপ অনুরোধ করিল। সকলেই অনুরোধ করিল, কিন্তু একজন এবিষয়ে কোন কথা কহে নাই। প্রমথনাথ যখন শয্যায় সুপ্ত হইতেন, তখন যে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া নির্নিমিষ নয়নে মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত, এবং তিনি জাগ্রত হইলেই নিদ্রার ভান করিয়া মুখ ঢাকিয়া শুইত, সে ত কোন প্রকার অনুরোধ করিল না! সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া কথা কহিতেছে, সেই সময়ে দোতালার ছাত হইতে অর্দ্ধউন্মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া দুইটী চক্ষু তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে। প্রমথনাথ সেই চক্ষু একবার দেখিলেন, দুইবার দেখিলেন, বোধ হয় অনেকবার দেখিলেন। যমুনা-জলের মত নীল, গঙ্গাজলের মত পবিত্র, আকাশের মত প্রশান্ত, বাতাসের মত স্নিগ্ধ। অনেকবার দেখিলেন, কিন্তু দেখিয়াও দেখিলেন না।

প্রমথনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন যে মিটার পরিবারে একটা গোলযোগ উপস্থিত। কথাটা এই যে মিটার সাহেবের বৃদ্ধামাতা একাকিনী বাড়ীতে থাকিতে পারেন না বলিয়া দেশ হইতে কলিকাতা আসিয়াছেন। তাঁহার থাকিবার স্থানের অভাব। যে কয়েকটী ঘর আছে তাহার মধ্যে একটী মিটার সাহেবের বেড্‌রুম, একটী ড্রেসিং রুম; দুটী বড় ছেলে বড় মেয়ের বেড্‌রুম, একটীতে ছোট ছেলেদিগকে লইয়া আয়া শয়ন করে; এমিকে কষ্ট করিয়া বেড্‌রুমেই কাপড় চোপড় পরিতে হয়। লাইব্রেরিতে সকলে বসিয়া লেখা পড়া করে; ডিনার রুম এবং ড্রইং

রুমে ত লোক থাকা হতেই পারে না। সাহেবের ইচ্ছা ছিল যেন কোন একটা ভাল ঘর খালি করিয়া দেন; কিন্তু গৃহিণীর আদব কায়দার বিচারে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। অবশেষে বাথরুমের সংলগ্ন একটা ক্ষুদ্র ঘরে বৃদ্ধা স্থান পাইলেন। এমি তাঁহাকে কড়া হুকুম দিয়া রাখিলেন যে, কোন ভদ্রলোক বা মহিলা বাটীতে আসিলে, তিনি যেন লুকাইয়া থাকেন। অসভ্য পরিচ্ছদ মিটরপরিবারে নিষিদ্ধ। প্রমথনাথ উজ্জ্বল সভ্যতার পশ্চাতে গভীর অন্ধকারের ছায়া দেখিলেন। যাহাহউক কথাটা তাঁহার অধিকক্ষণ মনে রহিল না, কারণ পিয়ানো-স্বর-সংযোগে এমি গাহিতে লাগিল

আমি প্রাণ দিতে চাহি তারে, প্রাণ নিতে চাহিনা।
পাখীর মত গান গাহি, ভুলাতে তারে চাহিনা।
লুকায়ে রাখি পরাণে সখি
প্রাণের যত বাসনা,
লুকায়ে রাখি পরাণে ঢাকি
প্রাণের যত যাতনা।

সুখের নেশা ঘনীভূত হইয়া আসিল। কি করিলে এমি আমার হয়, এই চিন্তায় প্রমথনাথের চিত্ত ব্যথিত হইতে লাগিল।

(৪)

চারিদিকে রাষ্ট্র হইল যে প্রমথ বাবু মিটার সাহেবের কন্যাকে বিবাহ করিবেন। মিটার বিলাতফেরত হইলেও হিন্দু। বিবাহ হিন্দুমতে হইবে কাজেই বহুবিবাহের দোষ স্পর্শিবে না। জনরব শ্রীপুর পর্য্যন্ত পঁহুছিল।

প্রমথনাথের পিতা, তাঁহাকে বাড়ী যাইবার জন্য পত্র লিখিলেন; অবশেষে লোক পাঠাইলেন। প্রমথনাথ এম. এ. পরীক্ষার ফলের জন্য অপেক্ষা করিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু অগত্যা শ্রীপুরে যাইতে হইল। বয়স্যেরা আকার ইঙ্গিতে কথাটা পাড়িবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তিনি কোন কথাই কানে তুলিলেন না। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! লোকে কত কিছু বলিতেছে, সে কি সত্য?" প্রমথ নিরুত্তর। কিন্তু মনে মনে কৃতসংকল্প, যেমন করিয়া হউক এমিকে বিবাহ করিবেন। পিতা, রাশভারি লোক, কখনও পুত্রের সঙ্গে বেশী কথা কহিতেন না; এ বিষয়েও কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন না। পুত্রকে গৃহে আনিয়াছেন, গৃহেই রাখিলেন। পাড়ার মেয়েরা জুটিয়া সরমাকে শিক্ষা দিল, যে, সে একবার স্বামীকে উপরোধ অনুরোধ করিবে, এবং স্ত্রীজাতির ব্রহ্মাস্ত্র—একটু চক্ষুর জল ফেলিবে। সরমা বিরক্ত হইয়া বলিল "ছি!"। সকলে তাহাকে হাবা মেয়ে বলিয়া তিরস্কার করিল; কিন্তু সে কাহারও কথা শুনিল না।

প্রমথনাথ যেদিন বাটীতে আসিলেন, সেইদিন রাত্রে শয়নকক্ষে গিয়া দেখিলেন, শয্যার এক পার্শ্বে সরমা শয়ানা। এমি বলিয়াছিলেন যে সরমার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন না। সেই কথা মনে পড়িল। প্রমথবাবুর "মরাল ফিলসফি" পড়া ছিল; তিনি গম্ভীরভাবে সরমাকে বলিলেন, "তোমার সঙ্গে একত্র শয়ন নীতিবিরুদ্ধ; তুমি অন্যত্র যাও"। ভালবাসার কথা বলিলে সরমা হয়ত কথা কহিত না; কিন্তু এবার উঠিয়া বসিল। স্থিরভাবে কহিল, "আমি এখন অন্য ঘরে গেলে, বড় গোল হইবে। মা আমাকে বকিবেন; ঠাকুর তোমাকে তিরস্কার করিবেন। আমি এক কোণে পড়িয়া থাকি, ক্ষতি কি?" প্রমথনাথ ঠিক ঝগড়া বাধাইবেন বলিয়া ছুতা খুঁজিতে আসেন নাই; কিন্তু একটু কিছু হইলে ভাল হইত। তাহা হইলে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হওয়ার পক্ষে বেশ সুবিধা হইত। অলক্ষে এই ভাবটী মনের মধ্যে নিহিত ছিল। প্রমথনাথ সরমাকে বলিলেন, "আমি বিবাহ করিব—তোমার সঙ্গে আমার প্রকৃত বিবাহ হইয়াছে, স্বীকার করিতে পারি না। তুমিও জান যে তুমি আমাকে ভালবাস না"। বালিকা সরমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল; কিন্তু সে অকম্পিত-স্বরে কহিল, "তুমি যাহাতে খুসী হও নিশ্চয়ই তাহা করিবে, কিন্তু মাকে এবং ঠাকুরকে রাজী করিয়া কাজ করিও। মাকে ভাল করিয়া বলিলে তিনি সম্মতি দিবেন"। অবস্থায় পড়িলে মুগ্ধাও প্রগল্‌ভা হয়। দীপালোক অনুজ্জ্বল; মানসনয়নপথে এমির প্রেমকুহেলিকার আবরণ; প্রমথনাথের চক্ষে, সরমার যজ্ঞবহ্নির মত প্রদীপ্ত রূপ, প্রতিভাত হইল না। সরমা শয্যার এক পার্শ্বে মুখ লুকাইয়া শুইল; প্রমথনাথ আর কোন কথা না কহিয়া নিশি যাপন করিলেন। তাহার পরদিন হইতে সরমা, শয্যাগৃহে অন্য শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিতে লাগিল।

(৫)

"আমার সাত রাজার ধন এক মানিক, ঐ এক ছেলে। বিবাহে বাধা দিলে কি হইবে কে জানে; প্রমথ বিবাহ

করুক। কত লোকে, দুই বিবাহ করে; তুমি আপত্তি করিও না।" কথাগুলি প্রমথনাথের মাতা বিজনে আপন স্বামীকে বলিলেন। প্রমথনাথের পিতা "হুঁ হুঁ" করিলেন; কিন্তু কোন কথার উত্তর দিলেন না। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,"আমার মা লক্ষ্মীর কি হইবে?" সরমাকে প্রমথনাথের পিতা মা লক্ষ্মী বলিতেন। গৃহিণীও সরমাকে পুত্রীনির্বিশেষে স্নেহ করিতেন; বলিলেন,"যাহার কপালে যাহা আছে তাহাই হইবে"। কিন্তু কথাগুলি বলিতে বলিতে চক্ষু দিয়া জল পড়িল:

যাহাই হউক আবার রাষ্ট্র হইল যে এমির সহিত প্রমথনাথের বিবাহ হইবে এবং সে বিবাহে তাঁহার পিতা, মাতা, স্ত্রী,প্রভৃতি সকলেই সম্মত। প্রমথবাবু আবার কলিকাতায় গেলেন।

তিনি যখন কলিকাতা পোঁছিলেন, তখন বেলা ১১।০টা। বাসায় না যাইয়া একেবারে মিটারভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। মিটার সাহেব তখন স্বীয় কার্য্যে আপীসে গিয়াছেন; উইলি গৃহে নাই, সে এম এ পরীক্ষার অব্যবহিত পরেই দেশপর্য্যটনে বাহির হইয়াছে; ছোট ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে গিয়াছে; গৃহিণী এবং এমিও মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রাম করিতেছেন। বাড়ীতে কাহারও সাড়া শব্দ নাই। মিটারগৃহের দ্বার তাঁহার নিকট অবারিত; তিনি গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। খানসামা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল; তিনি তাহাকে গৃহের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। খানসামার মুখে শুনিলেন, সাহেবের বৃদ্ধা জননী অত্যন্ত পীড়িতা। অমনি প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। অতি ঘৃণিত শয্যায় অনাদরে, স্নান করিবার ঘরের পার্শ্বস্থিত একটা ক্ষুদ্র ঘরে তিনি শয়ানা। প্রমথ বাবু তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধা মুখ তুলিয়া চাহিল। প্রমথ বাবুর দয়া দেখিয়া চক্ষু দিয়া জল পড়িল, এবং বৃদ্ধ-বয়স সুলভ বাক্-বাহুল্যতা প্রকাশ পাইল। যাহা শুনিলেন,তাহাতে বড়ই ক্লিষ্ট হইলেন। মিটার সাহেব মাতার সেবা করিতে অনিচ্ছুক নহেন, কিন্তু মিসেস্ এবং এমি প্রতিবাদিনী। গৃহিণীর অনভিমতে কোন কার্য্য করা সাহেবের সাধ্যাতীত। এমির নামে দুনামটা প্রমথবাবু বিশ্বাস করিলেন না, কিন্তু ভাবিলেন যে বৃদ্ধার সেবার একটা বন্দোবস্ত করিতেই হইবে। অল্প সময়ের মধ্যেই প্রমথবাবুর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া মিসেস্ এবং মিস্ মিটার আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার অভ্যর্থনার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রমথবাবু বৃদ্ধার কথা পাড়িলেন, এবং অল্প কথাবার্ত্তার পরেই ভাব গতিক বুঝিয়া প্রস্তাব করিলেন যে স্থান পরিবর্ত্তন করিলে উপকার হইতে পারে; এবং তিনি তাঁহার নিজের বাসায় বৃদ্ধাকে লইয়া যাইতে প্রস্তুত। তাঁহার একাগ্রতা দেখিয়া কথাটার কেহ প্রতিবাদ করিল না—এবং প্রমথবাবু পাল্কী ডাকাইয়া বৃদ্ধাকে আপনার বাসায় লইয়া গেলেন। উজ্জ্বল সভ্যতার অন্তরালস্থিত অন্ধকার এবার ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত হইল।

ডাক্তার ডাকিলেন, রাত্রিদিন নিকটে থাকিয়া শুশ্রূষা করিলেন;—কিছুতেই কিছু হইল না। মিটার সাহেবও অবকাশ পাইয়া নিত্য আসিয়া মাতার সেবায় নিযুক্ত হইতেন। বৃদ্ধা পুত্রমুখ চুম্বন করিয়া, প্রমথনাথকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপ্ত হইবার পর, সাহেব, প্রমথবাবুকে তাঁহার গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। প্রমথবাবু অতি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, তিনি আর তাঁহার গৃহে যাইবেন না। মিটার সাহেব কথাটার অর্থ বুঝিলেন—এবং বিনা বাক্যব্যয়ে স্বগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। প্রমথবাবু তিন চারিটী হ্যাট্ কিনিয়াছিলেন, সেগুলি অগ্নিদেবকে উপহার দিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন। অনুতাপের এই আর এক পরিচ্ছেদ।

(৬)

প্রমথবাবু এমিকে বিবাহ করিবেন না,স্পষ্ট জানাইলেন। তখন একদিন এমির পক্ষ হইতে একখানি উকিলের চিঠি পাইলেন; তাহাতে লেখা আছে যে বিবাহ-চুক্তি ভঙ্গের জন্য তাঁহাকে ৩০ হাজার টাকা ডামেজ দিতে হইবে। চিঠিখানা একখানি খামে পুরিয়া, মিটার সাহেবকে পাঠাইয়া দিয়া, প্রমথবাবু শ্রীপুর চলিয়া গেলেন। গৃহে যাইতেছেন এ সংবাদ গৃহের লোকের জানা ছিল না। রাত্রে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া একাকী পদব্রজে গৃহে গেলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক ধীরে ধীরে গেলেন, কাজেই গৃহে পৌছিতে অনেক রাত্রি হইল। পথে দুই একজন লোকের সহিত দেখা হইয়াছিল, তাহারা বলিল "একি বাবু, আপনি একাকী?" প্রমথবাবু কথা কহিলেন না। তাহারা সঙ্গে যাইতে চাহিল পাল্কীর

বন্দোবস্ত করিয়া দিতে চাহিল, কিন্তু প্রমথবাবু তাহাদিগকে বিদায় দিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার গাম্ভীর্য্য দেখিয়া তাহারা আর কথা কহিতে সাহসী হইল না।

অলক্ষ্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। চাকরেরা প্রায় সকলেই জাগ্রত ছিল; কিন্তু তাহারা বহির্ব্বাটীতে বসিয়া দারোয়ানজীর মুখে তদীয় বীরত্বের কথা শুনিতেছিল, কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল নাই।

আপনার শয়নকক্ষের দ্বারে গিয়া ধীরে ধীরে দরজায় আঘাত করিলেন; এবং মৃদুকণ্ঠে কক্ষাভ্যন্তর হইতে প্রশ্ন হইল, "কে?" প্রমথবাবু স্বর শুনিয়াই বলিলেন, "শারদা, দরজা খোল; আমি।" শারদা একটু উচ্চকণ্ঠে বলিল—"ওমা, দাদা! কখন এলে?" প্রমথবাবু কহিলেন, "চুপ! দরজা খুলিয়া দে"। শারদা তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিল; এবং দাদার পায়ের ধূলা মাথায় দিল। প্রমথবাবু দেখিলেন, শারদার সঙ্গিনী শয্যায় নিদ্রিতা। তখন শারদাকে বলিলেন, "তুই কাহাকেও না জাগাইয়া অন্য ঘরে গিয়া শুইতে পারিবি!" শারদা কিছুই বুঝিতে পারিল না; ভাবিল একি! জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে দাদা!" প্রমথ সস্নেহে বলিলেন, "কিছু নয়,—আমার শরীর তত ভাল নাই, একটু শুইব। তোর পায়ে পড়ি কাহাকেও কিছু বলিসনে—এখন অন্য ঘরে গিয়ে শো।" শারদা এ অদ্ভুত প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হয় না; তখন তাহাকে বাহিরে লইয়া প্রমথবাবু গোপনে কি যেন কহিলেন; সে সস্মিতমুখে অন্য ঘরে যাইবার ভাণ করিয়া কিছু দূরে গিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া ফিরিয়া আসিল, এবং বৌদিদির ঘরের জানালার ধারে কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটা বড় দুষ্ট।

সরমা তখনও নিদ্রিতা। প্রমথবাবু ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন তাহার শয্যার পার্শ্বে দেওয়ালে, তাঁহার একখানি ফ্রেমে বাঁধা ফটো। বুক মেঘে ভরা ছিল; চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধারা বহিল। অশ্রুসিক্তমুখ নিদ্রিতা সুন্দরীর চরণপদ্মে স্থাপন করিলেন। সরমা চমকিতা হইয়া জাগিয়া উঠিল, দেখিল পদতলে তাহার ইষ্টদেবতা। পা ছাড়াইয়া লইয়া আলু থালু বেশে শয্যা হইতে উঠিয়া পায়ের ধূলা মাথায় দিল।

প্রমথ বলিলেন, "সরমা, আমাকে ক্ষমা কর"। সরমা ভাবিল, স্বামী বিবাহ করিয়া আসিয়াছেন;—তাই এই ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। হাসিয়া বলিল, "একা আসিয়াছ? না নূতন বৌ নিয়ে? আমি দেবীচৌধুরাণী পড়িয়াছি—সতীনের সঙ্গে ভাব করিব।" প্রমথ বলিলেন তিনি সে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। সরমা প্রতিমা বিসর্জ্জন-কথাটার অর্থ বুঝিল না; ভাবিল এ'ম বুঝি মরিয়াছে। অমনি কাঁদিয়া ফেলিল, শপথ করিয়া বলিল যে তাঁহাকে এবং এমিকে সুখী করিবার জন্য সে কত কথা ভাবিয়া রাখিয়াছিল। প্রমথনাথকে বেষ্টন করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "আমি তোমাকে সুখী করিতে পারি নাই, যে তোমাকে সুখী করিতে পারিত, সে মরিল! আমার কপাল মন্দ!" হায় প্রমথনাথ! বিলাতি ছাঁচে কি এমনটা গড়ে! প্রমথবাবু অল্পকথায় বিবাহভঙ্গের ইতিহাস বলিলেন; এবং লুকাইয়া আসিয়া, প্রথমেই তাহার কাছে আসিয়াছেন, বলিলেন। সরমা চমকিয়া উঠিল। "ছি! ছি! সে কি কথা!—তুমি এখনি যাও? আগে সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কর।" অগত্যা প্রমথনাথ বাহির হইলেন। শারদার কর্ণে সব কটি কথাই গিয়াছিল; সে আগেই ছুটিয়া গিয়া সকলকে ডাকিয়া তুলিল। এবং ছুটিয়া গিয়া একটা দাসীর পীঠে কীলের উপর কীল বসাইতে লাগিল। এটী শারদাসুন্দরীর আদরের দাসী। দাসী বলিল, "কর কি দিদিমণি! কর কি! লাগে যে!" শারদার যেন আহ্লাদের সীমা পরিসীমা নাই, কিন্তু তাই বলিয়া দাসী বেচারী মার খাইয়া মরে কেন?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

"সীতার পরীক্ষা" নামক চিত্রে সীতা, তাঁহার জননী ধরিত্রী, রাম, লক্ষ্মণ, কুশ লব, মহর্ষি বাল্মীকি, ও অপর একজন ঋষির চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

***

"দ্রৌপদী ও সিংহিকা" নামক চিত্রের বিষয় মালয়ালিম ভাষায় লিখিত একটী প্রাচীন নাটক হইতে গৃহীত। ক্রিমির নামক একজন রাক্ষস দ্রৌপদীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া নিজ আলয়ে লইয়া যাইতে সংকল্প করে। এই উদ্দেশ্যে সে নিজ ভগ্নী সিংহিকাকে দ্রৌপদীর নিকট প্রেরণ করে। সিংহিকা সুন্দরী নারীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া

দ্রৌপদীকে বলে যে অরণ্য মধ্যে স্থিত দেবীমন্দিরে গিয়া যদি তিনি দেবীর পূজা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সমুদয় দুঃখ দূর হইবে। সরলা দ্রৌপদী তাহার কথায় প্রতারিত হইয়া ক্রমেই গভীর হইতে গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিতে থাকেন। অবশেষে যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখনও কোন মন্দির দেখিতে না পাইয়া তাঁহার মনে ভয়মিশ্রিত সন্দেহের উদয় হয়। চিত্রে তাঁহাকে ভীত ও অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক এই ভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। সিংহিকা তাঁহার অনিচ্ছা দেখিয়া এই সময়ে নিজমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু নকুল দ্রৌপদীর উদ্ধার সাধন করেন।

***

রবিবর্ম্মার অঙ্কিত এবারকার তৃতীয় ছবিখানির নাম "তদ্গতচিত্তা"। ইহাতে প্রেমাস্পদের সুখচিন্তানিমগ্না কোনও তরুণীর মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে।

***

"শিষ্য" নাম দিয়া আমাদের একজন পাঠক লিখিয়াছেন —"রাজা রামমোহনরায়ের রাজনীতি"শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক মহাশয়, ইয়ুরোপীয়গণ এতদ্দেশে উপনিবেশস্থাপনের অধিকার প্রাপ্ত হইলে, ভারতের ইষ্টানিষ্টের কি কি সম্ভাবনা ছিল, তদ্বিষয়ে রাজার মতসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে রাজা ভবিষ্যৎ ভারতকে 'খৃষ্টানদেশ' বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে লেখকের মনে একটী প্রশ্নের উদয় হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইটী এই—"রাজা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে খৃষ্টান দেশ কেন বলিলেন?" (পৃঃ ১১১) লেখক মহাশয় প্রশ্নটীর তিনটী সমাধান প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বোধ হয় পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন, "প্রশ্নটী কিন্তু রহস্য পূর্ণ।"

প্রবন্ধটী পাঠ করিবার পর হইতেই আমি রাজার গ্রন্থাবলী দেখিতেছিলাম। রাজা তদীয় "Remarks on Settlement in India by Europeans" নামক পুস্তিকার দ্বিতীয় প্যারায় ইয়ুরোপীয়গণের উপনিবেশদ্বারা ভারতের যেরূপ ইষ্টসাধন হইতে পারে, তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। উক্ত প্যারার ৯ম দফায় তিনি লিখিয়াছেন—

"If however, events should occur to effect a separation between the two countries, then still the existence of a large body of respectable settlers (*consisting of Europeans and their descendants professing Christianity*) and speaking the English language in common with the bulk of the people,(*as well as possessed of superior knowledge—scientific, mechanical and political*) would bring that vast empire to a level with *other Christian countries* in Europe, &c.&c."

এক্ষণে লেখকমহাশয়ের উদ্ধৃত অংশটী (পৃঃ ১১০) ইহার পর পাঠ করিলে রাজার মনোগত ভাব বুঝিতে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না। পরে পাঠ করিবার একটী তাৎপর্য্য আছে। রাজা প্রথমতঃ ভারতের ভাবী মঙ্গলের আলোচনা করিয়া পরে অমঙ্গলের আলোচনা করিয়াছেন। দুইটী উদ্ধৃত অংশের ভাষা ও ভাবের সাদৃশ্য এতদূর যে পূর্ব্বটী ছাড়িয়া পরটীর অর্থ হঠাৎ করা যায় না। মদুদ্ধৃত অংশের"other Christian countries"ও বন্ধনীর অন্তর্গত কথাগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিলেই সমুদয় সন্দেহ বিদূরিত হইয়া যায়। খৃষ্টান ঔপনিবেশিকগণ ধনে, বিদ্যাবলে, কৌশলে,ইত্যাদি সর্ব্ববিষয়ে ভারতবাসীর অগ্রণী হইবে,এবং তাহাদিগের নামেই ভারত জগতে পরিচিত হইবে, এমত সংস্কারের অধীন হইয়াই রাজা ভবিষ্যৎ ভারতকে খৃষ্টানদেশ বলিয়াছেন ; এতদ্বিষয়ে আর সন্দেহ হইতে পারে না।"

ফতেপুরসিক্রী—বাহ্যদৃশ্য।
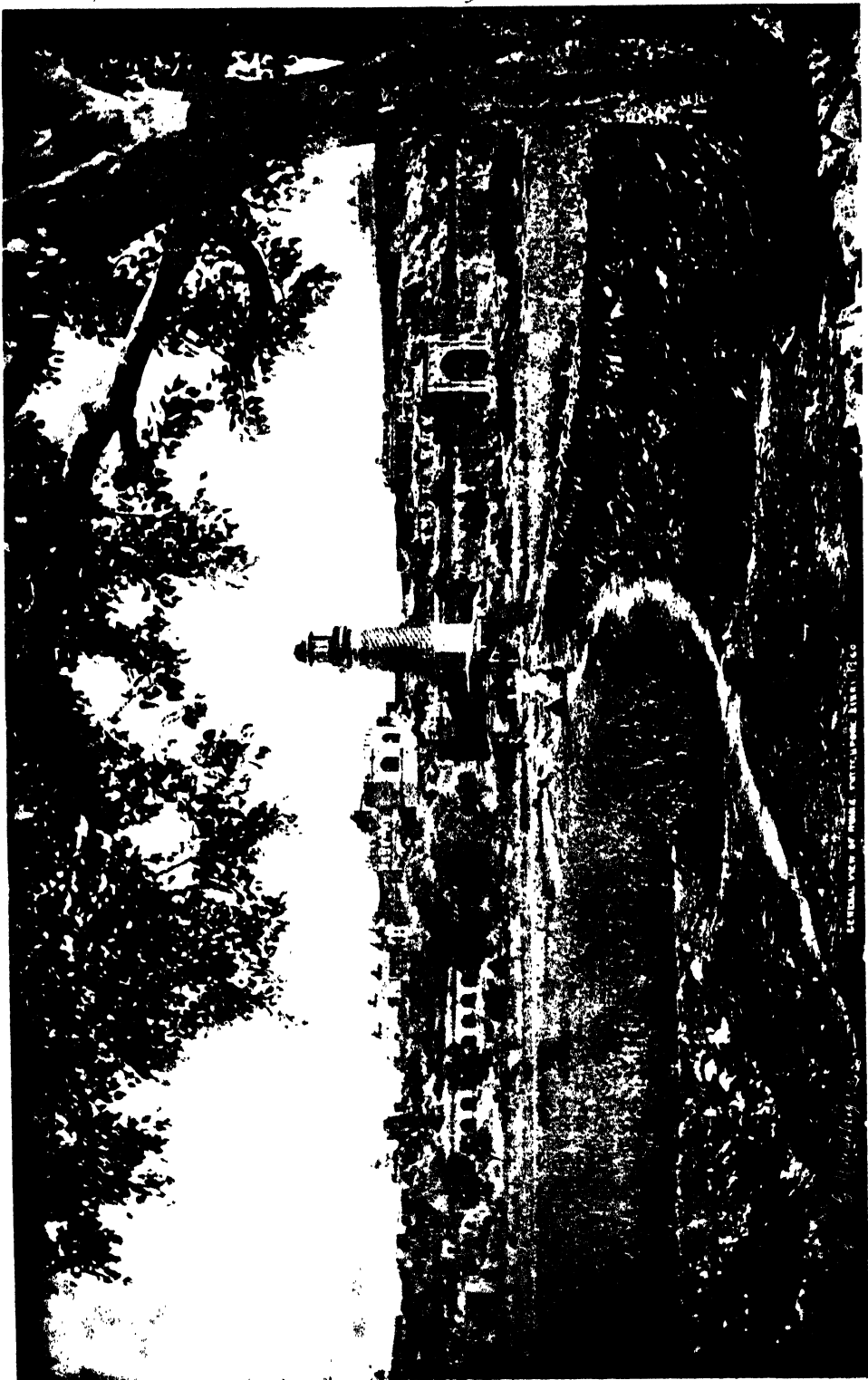
INDIAN PRESS.

প্রবাসী

প্রথম ভাগ। | ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩০৮ | ১১শ ও ১২শ সংখ্যা।

প্রাণী ও উদ্ভিদ্।

প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে পার্থক্য কি? ইহার উত্তরে হয় ত পাঠক মোটামুটিভাবে বলিবেন,—উভয়ই সৃষ্টির সজীব পদার্থ, যে হিসাবে প্রাণী সজীব, উদ্ভিদও প্রায় সেই হিসাবে সজীব,--পার্থক্যটা কেবল তাহাদের শারীরিক (?) ও জীবনধারণের উপায়ে সীমাবদ্ধ। কথাটা ঠিক্ বটে,—ক্রম-বৃদ্ধি, পুরুষানুক্রমিতা ও অপত্যোৎপাদন প্রভৃতি যে সকল গুণ প্রাণীর প্রধান ধর্ম্ম, তাহা উদ্ভিদেও বর্ত্তমান। উদ্ভিদ তাহার পত্রদ্বারা সহস্রমুখে আহার্য্য সংগ্রহ করে, ভূপৃষ্ঠ-প্রোথিত মূলদ্বারা জলপান করে, অপত্যোৎপাদনের জন্য তাহারও স্ত্রী পুং ভেদ আছে, এবং বংশরক্ষা ও বংশ বিস্তারের জন্য প্রাণিগণকে যে প্রকার সচেষ্ট দেখা যায়, চৈতন্যহীন উদ্ভিদেও সে চেষ্টার অভাব দেখা যায় না। সুতরাং পার্থক্যের মধ্যে এই যে চলচ্ছক্তিসম্পন্ন প্রাণী, শারীরিক যন্ত্রাদির সাহায্যে তাহার জৈব কর্ত্তব্য যে প্রথায় সম্পন্ন করে, স্থাণু উদ্ভিদ অবস্থাবিশেষে কখন তাহার দেহের বিশেষ বিশেষ অংশদ্বারা, কখনও বা বাহ্যপ্রকৃতির সাহায্যে সেই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া থাকে।

এই ত গেল স্থূল পার্থক্যের কথা। কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি পার্থক্য আছে, যাহা হঠাৎ আমাদের চোখে পড়ে না,—অথচ সেইগুলিই প্রাণী ও উদ্ভিদের স্পষ্ট বিশেষত্বজ্ঞাপক। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রাণী ও উদ্ভিদের সেই সকল পার্থক্য ব্যাপারের মধ্যে ইহাদের আহার্য্য ও তদানুষঙ্গিক পার্থক্যের বিষয় আলোচনা করিব।

প্রথমে দেখা যা'ক, ইহাদের আহার্য্যের পার্থক্যটা কি। জীবতত্ত্ববিদ্‌কে এসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিবেন—এ বিষয়ে উভয়ের সম্বন্ধ ঠিক বিপরীত; উদ্ভিদ স্বাবলম্বী ও উৎপাদক, প্রাণী পরজীবী ও সংহারক। আমরাও স্থূল দৃষ্টিতে এই উক্তির সত্যতার কতকটা আভাস পাই,—উদ্ভিদ-ভোজী প্রাণিগণের উদ্ভিদই ত প্রাণস্বরূপ, মাংসাশী প্রাণীদেরও আহার্য্যব্যাপার উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে। কারণ যে সকল দুর্ব্বল প্রাণীর মাংসে তাহারা জীবন রক্ষা করে, তন্মধ্যে অনেকেই উদ্ভিদ্‌ভোজী, কাজেই তাহাদের অস্থি-মাংসমজ্জা সকলই উদ্ভিজ্জসারে গঠিত। কিন্তু শরীর পোষণের জন্য উদ্ভিদসকল কোন প্রাণীরই সাহায্য গ্রহণ করে না; প্রথমে সহস্র সহস্র পত্রদ্বারা তাহারা বায়ুমিশ্রিত প্রচুর অঙ্গারক বাষ্প শোষণ করিয়া লয়, এবং পরে তাহা হইতেই সূর্য্যকিরণ সাহায্যে তাহাদের শরীরপোষণোপযোগী প্রধান খাদ্য অঙ্গার সংগ্রহ করে। এ'টা উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরস্পর সম্বন্ধের একটা মোটামুটি কথা,—জীবরাজ্যের এই দুই জাতির প্রকৃত সম্বন্ধটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, বিষয়টার একটু বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক।

সংসারের অতি তুচ্ছ সামগ্রী একখণ্ড শুষ্ক তৃণ লইয়া প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, উদ্ভিদ্‌দেহমাত্রেই প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অঙ্গার মুক্তাবস্থায় বিদ্যমান থাকে, সুতরাং আমাদের উল্লিখিত শুষ্ক তৃণখণ্ডে ঐ উভয় পদার্থই যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ত্তমান আছে,তাহা অসঙ্কোচে স্বীকার

করিয়া লওয়া যাইতে পারে। তার পর সেই তৃণখণ্ডে অগ্নি সংযোগ কর,—একটু তাপ, একটু আলোক দিয়া তৃণের অস্তিত্ব লোপ পাইবে এবং কেবল সোডা, ফস্‌ফরস্‌, নাইট্রোজেন ও গন্ধক মিশ্রিত একটা যৌগিক পদার্থ ভস্মাকারে থাকিয়া তৃণের দহন জ্ঞাপন করিতে থাকিবে মাত্র। এখন পাঠকপাঠিকাগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—এই দহন ব্যাপারটা কি? রসায়নবিদ্‌গণ তদুত্তরে বলিবেন,—তৃণখণ্ডে যে হাইড্রোজেন মুক্তাবস্থায় ছিল, অগ্নিসংযোগে তাহাই বায়ুস্থ অক্‌সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া জলীয় বাষ্পাকারে বায়ুতে মিশাইল। আর সেই মুক্ত অঙ্গার বায়ুর অক্‌সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া অঙ্গারক-বাষ্পে পরিণত হইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রকৃত দহনব্যাপারটা সেই শুষ্ক তৃণখণ্ডস্থ মুক্ত অঙ্গার ও হাইড্রোজেনের সহিত, বায়ুস্থ অক্‌সিজেনের সংযোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, অগ্নিসংযোগে ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড হইতে যে একটু তাপালোকের বিকাশ হইল, তাহার উৎপত্তি কোথায়?

এই প্রশ্নের মীমাংসা জন্য তৃণের অতীত জীবনের দুই একটা কথার আলোচনা আবশ্যক। পাঠকপাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন, সূর্য্যকিরণই উদ্ভিদ্‌ জগতের প্রাণস্বরূপ। উদ্ভিদসকল পত্রদ্বারা বায়ুস্থ অঙ্গারক বাষ্প গ্রহণ করে, এবং মূলদ্বারা আবশ্যক জল ইত্যাদি শোষণ করে সত্য,—কিন্তু সূর্য্যকিরণের অভাবে সেগুলিকে জীর্ণ করিয়া দেহ পোষণ কার্য্যে নিয়োজিত করিবার শক্তি উদ্ভিদের নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে সৌরালোক উদ্ভিদপত্রে পতিত হইলে, পত্রশোষিত সেই অঙ্গারক বাষ্প তাহার গঠনোৎপাদন অক্‌সিজেন ও অঙ্গারে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়; এবং তার পর উদ্ভিদ্‌ সকল দেহ পোষণের জন্য আবশ্যক মুক্ত অঙ্গারটাকে রাখিয়া অব্যবহার্য্য অক্‌সিজেন বাষ্প বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়। মূলশোষিত জলকেও ঠিক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেনে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখা গিয়া থাকে, এবং এস্থলে উদ্ভিদ্‌ সকল দেহগঠনে ব্যবহার্য্য হাইড্রোজেনটাকে ধরিয়া রাখিয়া অনাবশ্যক অক্‌সিজেনকে পূর্ব্ববৎ বাতাসে ছাড়িয়া দেয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে অঙ্গারক বাষ্প ও জল বিশ্লিষ্ট করিয়া উদ্ভিদদেহে মুক্ত অঙ্গার ও হাইড্রোজেন যোগাইবার জন্য প্রচুর সৌরশক্তি ব্যয়িত হইয়া থাকে। জগতে শক্তির বিনাশ নাই,—বৃক্ষপত্রপতিত সেই সৌরশক্তিও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না; উদ্ভিদদেহস্থ সেই পৃথকীভূত মুক্ত অঙ্গার ও হাইড্রোজেনের মধ্যে তাহা গুপ্তাবস্থায় থাকে। তাপমান যন্ত্রাদি দ্বারা সেই শক্তির কোনও লক্ষণ দেখা যায় না সত্য, কিন্তু পরে যখন অগ্নিসংযোগে বা অপর কোনও কারণে উদ্ভিদদেহ রূপান্তর পাইতে থাকে, তখন সেই গুপ্তশক্তির বিকাশ দৃষ্ট হয়। আমাদের সেই প্রজ্বলিত তৃণখণ্ডের তাপালোক উক্ত গূঢ়সৌরশক্তির বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়;—প্রচুর সূর্য্যকিরণ ব্যয় করিয়া তৃণখণ্ডটি আজন্ম যে মুক্ত অঙ্গার ও হাইড্রোজেন দেহস্থ রাখিয়াছিল, অগ্নিসংযোগে তাহাই বায়ুস্থ অক্‌সিজেনের সাহায্যে অঙ্গারক বাষ্প ও জলীয় বাষ্প উৎপন্ন করিয়া পূর্ব্বব্যয়িত তাপ ও আলোকের বিকাশ করে।* একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর ভূপৃষ্ঠ হইতে উঠাইয়া উচ্চস্থানে রাখিতে যে শক্তিপ্রয়োগের আবশ্যকতা হয়, তাহার কিয়দংশ যেমন সেই উচ্চস্থানস্থিত প্রস্তরে গুপ্তাবস্থায় থাকিয়া যায়, অথচ তাহাতে সেই শক্তির কোন চিহ্ন দেখা যায় না, তার পর স্থানচ্যুত হইলেই সেই শক্তিপ্রযুক্ত প্রস্তরখণ্ডটা যে প্রকার মহা বেগে ভূপতিত হইয়া গুপ্তশক্তির পরিচয় দেয়; আমাদের সেই তৃণদেহে সৌরশক্তির গূঢ় অবস্থিতি ও বিকাশও কতকটা তদ্রূপ। প্রস্তরখণ্ডের শক্তি তাহার উচ্চাবস্থানে এবং তৃণের সৌরশক্তি তাহার দেহস্থ অঙ্গার ও হাইড্রোজেনের পৃথক্‌ ও মুক্ত অবস্থানে গূঢ়াবস্থায় থাকে,—তারপর যথাসময়ে এই উভয় শক্তির বিকাশ দেখা যায়।

অবিমিশ্র অঙ্গার ও হাইড্রোজেন জগতের একান্ত দুর্লভ সামগ্রী। অঙ্গারক বাষ্প ও জল ইত্যাদিতে ইহাদের প্রচুর অস্তিত্ব আছে সত্য, কিন্তু তথায় যৌগিক অবস্থায় থাকে বলিয়া সেই অঙ্গার ও হাইড্রোজেন দ্বারা সৃষ্টির উচ্চতর

* বিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,—শরীরগঠনের জন্য উদ্ভিদ্‌ সকল যে পরিমাণ অঙ্গারক বাষ্প ও জল বাহ্য প্রকৃতি হইতে গ্রহণ করে, এবং তাহা দেহপোষণোপযোগী করিতে যে পরিমাণ সৌর তাপালোক ব্যয় করে, দগ্ধীভূত হইবার সময় তাহারা আবার ঠিক সেই পরিমাণ অঙ্গারক বাষ্প, জল ও তাপালোক ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকে।

কার্য্যের কোনই সহায়তা হয় না। উল্লিখিত জল ও অঙ্গারক বাষ্প বিশ্লেষ করিয়া মুক্ত অঙ্গার ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করার এবং ঐ মুক্তপদার্থস্থ গূঢ় সৌরশক্তিকে সৃষ্টির সহস্র কার্য্যে প্রয়োগ করিবার জন্য সঞ্চীকৃত রাখার কেবল একটী মাত্র যন্ত্র জগতে দেখা গিয়া থাকে। বলা বাহুল্য তাহাই উদ্ভিদ।

এখন প্রাণীদের কার্য্য কি দেখা যাউক। ইহাদের শ্বাসযন্ত্র আছে এবং উদ্ভিজ্জখাদ্য আহার করিয়া তাহা জীর্ণ করিবার সুব্যবস্থাও ইহাদের শরীরে দেখা গিয়া থাকে। শ্বাসযন্ত্রের কার্য্য,—অক্‌সিজেন বাষ্প শরীরস্থ করিয়া তাহাই আবার অঙ্গারক ও জলীয় বাষ্পাকারে শরীরচ্যুত করা; পাকযন্ত্রের কার্য্য,—ভুক্ত উদ্ভিজ্জ সামগ্রীস্থিত সেই সৌরশক্তিপূর্ণ মুক্ত অঙ্গার ও হাইড্রোজেন হইতে গূঢ়শক্তির বিকাশ করিয়া জান্তবতাপের উৎপত্তি করা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উদ্ভিদসকলের আজন্ম চেষ্টার ফলে, জড়প্রকৃতি হইতে যে সজীব পদার্থের সৃষ্টি হয়, এবং জগৎসবিতা সূর্য্যের অনন্ত তাপভাণ্ডার হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহারা দেহপঞ্জরে যে বিশাল শক্তিস্তূপ লুক্কায়িত রাখে, সংহারক প্রাণী উদ্ভিদের সেই আজন্মসংগৃহীত সংযত শক্তির বন্ধন মোচন করিয়া নিয়তই তাহাকে আবার সেই আদিম উচ্ছৃঙ্খল শক্তিতে পরিণত করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদশরীরস্থ জগতের সেই একমাত্র সজীব পদার্থটাকেও চিরকালের জন্য ধ্বংস করিতেছে।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয়েই জীবশ্রেণীভুক্ত হইলেও, তাহাদের সম্বন্ধ বাস্তবিকই বিপরীত। উদ্ভিদ্ স্রষ্টা, প্রাণী সংহারক, উদ্ভিদ্ উৎপাদক, প্রাণী ভক্ষক, উদ্ভিদ সকল আজন্ম পরিশ্রমে যে বিশাল শক্তিস্তূপের রচনা করে, আবশ্যক অনাবশ্যক ছোট বড় সহস্র কার্য্যের ছলনায় নিষ্মম প্রাণী তাহা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

রাধাভাব।

শ্রীচৈতন্যদেব জগতে একটি কথা সপ্রমাণ করিয়াছেন; **ভগবানকে ভালবাসা যায়, স্ত্রী পুত্র বন্ধু প্রভৃতিকে** যেরূপ ভালবাসা যায়, তদপেক্ষা শত গুণ বেশী ঈশ্বরকে ভালবাসা যায়; ঈশ্বরকে ভাল বাসিয়া তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন।

এ ভাবটি ধর্ম্মশাস্ত্রে একটি অভিনব তত্ত্ব। এ পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ব্বে কেহ ভগবানকে ভালবাসিতে পারেন নাই। যোগী ঋষি বহু কৃচ্ছ্রসাধন ও শরীর নিগ্রহ করিয়া তাঁহার আভাস দর্শন লাভ করিয়াছেন। "আত্মানমাত্মনাবলোকয়ন্তম" সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া যেন অসীম দর্শন, সেই দর্শনে—তাঁহারা নিস্পন্দ হইয়া ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন। উপনিষৎকার ঋষিগণের এইরূপ সাক্ষাৎকার লাভ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা জগদধিপের বিরাট ঐশ্বর্য্যের নিকট আত্মহারা ও বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা ভগবানের প্রেমে মজেন নাই।

শুকদেব, নারদ, প্রহ্লাদ ভক্ত। ভক্তি ও প্রেমে প্রভেদ আছে; ভক্তিতে পদে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার অধিকার হয়, কিন্তু প্রেমে কণ্ঠ জড়াইয়া বক্ষে রাখিবার ও আলিঙ্গন করিবার সাধ জন্মে। প্রেমিক মান করেন, ভর্ৎসনা করেন, কিন্তু নিরাশ ভক্তের শুধু ফিরিয়া তপস্যা করিবার চেষ্টা হয়।

প্রেম চিত্তবৃত্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য। এই বৃত্তি যদি ভগবানের সেবায় না লাগিল, তবে ইহার প্রকৃত সার্থকতা কোথায়? আমরা জ্ঞানপথে ভগবানের অন্বেষণ করিতে পারি, ভক্তি তাঁহার নিকটে লইয়া যায়। তখন সাধক তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অবলুণ্ঠিত হইয়া পড়েন, কিংবা তাঁহার বিরাটত্বে বিস্মিত হইয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়েন। ইহাই শাস্ত্রকারগণের নির্দ্দেশ। সমস্ত ধর্ম্মেই ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের এইটুকু সম্বন্ধ সূচিত আছে। কিন্তু ঈশ্বরের বিরহে আমরা বিরহী সাজিতে পারি, উদ্‌ভ্রান্তের মত হইয়া যাইতে পারি, একথা ইতিপূর্ব্বে অপরিজ্ঞাত ছিল। মানুষ মানুষকে ভালবাসিয়া যখন উদ্‌ভ্রান্ত হয়, প্রলাপ বলে,—তখন কবি শ্রেষ্ঠ কাব্যের উপাদান প্রাপ্ত হন। এই সুন্দর ভাব মানবীয় কাব্যের অস্থিমজ্জা, কবিগণ ইহা বর্ণনা করিতে চির-লোলুপ। কত রোমিও-জুলিয়েট, ওথেলো-ডেসডিমনা, লয়লামজনু, কাব্যসাহিত্যে চরম সৌন্দর্য্যের আকর হইয়া রহিয়াছে।

কিন্তু ঈশ্বরের প্রেমে যিনি উন্মত্ত, তাঁহার মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে অনুরূপ হৃদয়ের আবশ্যক। সে হৃদয়

হইতে সমস্ত পার্থিব সংস্কার মুছিয়া ফেলিতে হইবে। এ সংসার প্রকৃত ভালবাসার আস্পদ নহে, এই ভাবটি হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে হইবে। আমাদের সে ধারণা হয় না, এজন্য চৈতন্যদেবকে ভাল করিয়া বুঝি না। আমরা এই প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, সুতরাং এতদতিরিক্ত কিছু বুঝিতে চাহি না। কিন্তু যদি এই জড়জগতের কণ্ঠে স্বর-লহরী উত্থিত হইতে পারিত, তবে চন্দ্রসূর্য্যময়ী প্রকৃতি একবার গাহিয়া উঠিত —

"আমি ছায়া,—নহি আমি অনন্ত মহান।
অনন্ত মহান্ তিনি আমি যাঁর ছায়া।"

পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মবীরগণ যাহা শিখাইয়াছেন, তাহা হইতে চৈতন্যদেবের শিক্ষা একটুকু নূতনভাবের। ঈশ্বরকে ভালবাসিতে কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত অধিকারী? যিনি মানুষকে ভালবাসিতে শিখিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে, যিনি জীব-জগতের সমস্তকে ভাল বাসিয়াছেন, তাঁহারই সেই মহৎ অধিকার লাভ হইতে পারে। যাঁহার সঙ্গে জগতের সৌহার্দ্দ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ঈশ্বরকে ভালবাসিবার তাঁহার কোন সামর্থ্য নাই। এই সোপানাবলীর একটির পর অপরটিতে পদস্থাপন করিতে হইবে, এস্থলে ডিঙ্গাইয়া উর্দ্ধে উঠিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা।

মনুষ্যের সঙ্গে মনুষ্যের ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের জন্য যিশু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি উপদেশ দিলেন, যদি দেবমন্দিরে পূজা লইয়া আসিয়া থাক, তবে স্মরণ করিয়া দেখ, কাহারও সঙ্গে তোমার কলহ আছে কি না। যদি সেরূপ অপরাধ করিয়া থাক, তবে যাও, আগে সেই কলহ মিটাইয়া আইস, তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিয়া আইস, তৎপর পূজা,- নতুবা তোমার পূজা গৃহীত হইবে না।

মানবজাতি যিশুর সংশিক্ষায় এই অভিনব ভ্রাতৃত্ব অনুভব করিয়া উন্নীত হইল। কিন্তু বুদ্ধের শিক্ষা এতদপেক্ষা উচ্চতর।* শুধু মানুষ নহে, জগতের প্রত্যেক জীব আমাদের প্রেমের পাত্র, এই সার্ব্বজনীন প্রেম কপিলাবস্তু হইতে জগতে প্রচারিত হইল। এই ধর্ম্মবীরগণের চেষ্টায়, প্রথমতঃ মানুষের সহিত মানুষের, তৎপরে মানুষের সহিত জীবমাত্রেরই প্রীতিসম্বন্ধ নির্ণীত হইল। যখন মানবহৃদয় এইভাবে উন্নততর প্রেমের যোগ্য হইল, যখন মানুষহিংসা ও জীবহিংসার শিকড় হৃদয় হইতে উন্মূলিত হইল,—যখন পুরুষানুপুরুষক্রমে মৎস্যমাংসাহারে নিবৃত্ত ব্রাহ্মণ শাস্ত্রচর্চ্চা-দ্বারা বিষয়নিস্পৃহভাবে ভগবদারাধনায় রত হইলেন, তখন সেই বংশে সাত্ত্বিক প্রেমের অবতারস্বরূপ চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইলেন। ঈশ্বরের প্রেম কিরূপ, তিনি বুঝাইলেন। যুগযুগান্তর, জন্মজন্মান্তর যাবৎ যিনি আমাদের প্রিয়তম সুহৃৎ,—পুষ্পসমূহ যাঁহার প্রেমলিপির ন্যায়, মুমূর্ষুর শ্রুতিতে যাঁহার নাম অমৃত, রোগে শোকে দুঃখে যাঁহার হস্ত স্নেহকোমলস্পর্শে আমাদের হৃদয়ের ব্যথা ভুলাইয়া দেয়, তাঁহার প্রতি ভালবাসা জন্মিলে সে ভালবাসা কতকটা অসীমভাব ধারণ করে। এ সমস্ত জগৎ তাঁহার কৃপার সাক্ষী: কুসুম-পল্লব, নদী-তরঙ্গ, বনান্তের শ্যামশোভা, চির-হারৎক্ষেত্ররাজি, ডুবন্ত সূর্য্যালোক, উদিত শশিলেখা, এ সকলের সঙ্গে তাঁহার মধুস্মৃতি জড়িত। এ প্রেমের যিনি আস্বাদ পাইবেন, তিনি যে একবারে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িবেন, তাহাতে বিচিত্র কি?

এই প্রেমের রূপক রাধা,--বৈষ্ণবকবিগণাঙ্কিত রাধা একটি সাত্ত্বিক ভাবের ইতিহাস; ইহা কাব্যের চরিত্র নহে। "কেন মেঘ দেখে রাই এমন হ'লি", কিংবা "সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা" প্রভৃতি বর্ণনা পরোক্ষভাবে বৈষ্ণবমহাত্মগণের লীলাস্মারক। বাস্তবিকই মাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি মেঘ দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলেন—"মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্যকথন। মেঘ দরশন মাত্র হয় অচেতন।"--(চৈতন্য-

* বুদ্ধদেব যিশুখৃষ্টের অনেক পূর্ব্বে আবির্ভূত হইলেও যিশু-প্রচারিত ভ্রাতৃত্ব ভারতবর্ষে অজ্ঞাত ছিল না। ভারতবাসিগণ ধর্ম্ম-বিষয়ে পৃথিবীর সর্ব্বজাতি হইতে উন্নত ছিলেন। যিশুর ভ্রাতৃভাব বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও যে ভারতবাসিগণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা বুদ্ধদেবের নিজের কথায়ই জানা যাইতেছে—"সে আমাকে মারিয়াছে, সে আমাকে জব্দ করিয়াছে, সে আমাকে ঠকাইয়াছে, যাহারা এইরূপ চিন্তা মনে পোষণ করে, তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে বিদ্বেষবৃত্তি কখনই যাইবে না, কারণ বিদ্বেষদ্বারা বিদ্বেষ কখনই নষ্ট হইবে না,—ভালবাসা দ্বারা বিদ্বেষ নষ্ট হইবে, ইহা প্রাচীন নীতিকারগণ কহিয়াছেন।" বুদ্ধের উক্তি, ধম্মপদ।

ভারতবর্ষে এই উচ্চ নীতি পরিজ্ঞাত থাকিলেও জগতের অপরাপর দেশে যিশুই সর্ব্বপ্রথম এই ভাবটি জীবন্তরূপে প্রমাণিত করেন।

ভাগবত)। আর চৈতন্যদেবের ত কথাই নাই। "যাহা নদী দেখে তাহা মানয়ে কালিন্দী। মহা প্রেমবশে প্রভু নাচে, পড়ে কান্দি।" "উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন জ্ঞান। তাহা যাই নাচে গায় ক্ষণেক মূর্চ্ছা যান॥" (চৈতন্যচরিতামৃত)। "তমালের বৃক্ষ এক নিকটে দেখিয়া। কৃষ্ণ বলি বাহু ভিড়ি ধরে জড়াইয়া।" (গোবিন্দদাসের কড়চা)। মহাপ্রভুর এই চেষ্টার সঙ্গে তমালদর্শনে রাধিকার উদ্‌ভ্রান্ত বিলাপলহরী অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। অনেক সময় বাসু ঘোষ কিম্বা অপরাপর চৈতন্যলীলাবর্ণনাকারীদের প্রসঙ্গ রাধিকার কথা বলিয়া ভ্রম হইবে। "শিরিষকুসুম জিনি, কোমল পদতল—বিপথে পড়ত অনিবার।" চৈতন্যদেব পথে যাইতে টলিয়া পড়িতেছেন, এই প্রেমোন্মত্ত ছবি দেখিয়া শ্রীরাধিকার প্রতি সখীর উক্তি,—"ধীরে যাগো কমলিনী" প্রভৃতি গীতি স্বতঃই মনে পড়িবে। ফলতঃ চৈতন্যজীবনীবর্ণিত তদীয় লীলাময় চরিত এবং বৈষ্ণবকবিবর্ণিত 'রাধাভাব' উভয় যেন এক স্বর্ণসূত্রে জড়িত। যদি রাধাভাবটিকে এই স্বর্গীয় রূপক বিচ্যুত করিয়া সাধারণ নায়িকাশ্রেণীর অন্তর্গত করা হয়, তবে তাহার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য লুপ্ত করা হইবে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু পরবর্ত্তী পদকর্ত্তাগণের পদসমূহে চৈতন্যদেবের প্রভাব জাজ্বল্যমান। সেই সকল পদে বর্ণিত রাধা অনেক স্থলেই চৈতন্যলীলার স্পষ্ট রূপক। মৎপ্রণীত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য নামক পুস্তকে এবং ১৩০৭ সালের জৈষ্ঠমাসের প্রদীপে "চৈতন্যপ্রভু ও পদাবলী" শীর্ষক প্রবন্ধে কবি কৃষ্ণকমল বর্ণিত রাধিকা ও চৈতন্যদেবের সাদৃশ্য বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করিয়াছি। এস্থলে সুপ্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দদাস এবং অপরাপর পদকর্ত্তাগণের রচনা হইতে তদনুকূল দৃষ্টান্ত সঙ্কলন করিব।

চণ্ডীদাসের একটি পদ এইরূপ—"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" এ ছবিটি অতি সহজ। রাধা ও কৃষ্ণ এক সঙ্গে আছেন, তথাপি ভাবী বিরহের আশঙ্কায় উভয়ের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ; ইহা স্বাভাবিক; কিন্তু গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণের এই ধরণের বর্ণনায় কতকটা নূতনত্ব প্রবেশ করিয়াছে।

"রোদিতি রাধা শ্যাম করি কোর।
হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥"

শ্যাম নিকটে আছেন অথচ উদ্‌ভ্রান্ত রাধা শ্যাম কোথায় গেল এই ভাবের বিলাপ করিতেছেন, ইহা আশ্চর্য্য নয় কি?—"সহচরী চিত্র-পুত্তলী সম চায়।" সহচরীরা এ দৃশ্য দেখিয়া চিত্র-পুত্তলীর ন্যায় চাহিয়া রহিল।

ঈশ্বরানুসন্ধান কতকটা স্বীয় অন্তরস্থ সামগ্রীর খোঁজ নয় কি? একটি হিন্দী গানে আছে "ময়কো কাহে ঢুঁড় বান্দা ময় তেরি পাসমে"—আমিত তোমার কাছেই আছি, তুমি আমায় কোথায় খুঁজিতেছ? বাঙ্গলা আর একটি গানে "আঁচলে মাণিক বেঁধে কেঁদে কেঁদে অগাধ জলে খুঁজতে গেল" এই ভাবটি পাওয়া যায়। কৃষ্ণকমল চৈতন্যসম্পর্কে লিখিয়াছেন —"হরি বিরহেতে হরি কাঁদি বলে হরি হরি"। পূর্ব্বোল্লিখিত গোবিন্দদাসের পদটি এই ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। গোবিন্দদাস শুধু একটি পদে এই ভাবটি প্রকাশ করেন নাই, তাঁহার বিস্তর পদে এইরূপ কথা আছে—

"নাগর সঙ্গে যবে বিলসই
কুঞ্জে শুতল ভুজপাশে।
কানু কানু করি রোয়ই সুন্দরী
দারুণ বিরহ হুতাশে।
আঁচল হেম আঁচলে রহু যৈছন
খোঁজি ফিরত আন ঠাঁই।
রাইক কোরে কানু ঐছে বিলাপই
ব্রজবনিতাগণ হাসে।"

অন্যত্র

"রসবতী বৈঠি রসিকবর পাশ,
রাই কহই ধনি বিরহ-হুতাশ,
আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম।"

শুধু গোবিন্দদাস নহেন, অপরাপর পদকর্ত্তাগণের রচনায়ও একথা বিরল নহে। রাধিকার নিকট কৃষ্ণ বসিয়া বিলাপ করিয়া বলিতেছেন,—

"সে ধনী চাঁদ বয়ান কিয়ে হেরব।
শুনব অমিয়া বোল,
সহচরী দূরহি হাস।" —মাধবীদাস।

"ধনী কোরে বিনোদ নাগর ভুলল।
রোয়ত নীর নয়ন বহি গেলা॥"

রাধাবল্লভ দাস।

এরূপ অনেক পদ আছে। সাধারণ নায়ক নায়িকার প্রেম কখনই এরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইতে পারে না, যে সম্মুখে থাকিয়াও পরস্পরের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া বিরহ বিলাপ করিবে। যাঁহার হৃদয়ে ভগবান বিরাজিত, অথচ সময়ে সময়ে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কোন অনুকূল বসন্তমুহূর্ত্তে হৃদি-বৃন্দাবনকুঞ্জে তিনি দেখা দিয়া আবার বিস্মৃতির মথুরাপুরীতে অন্তর্হিত হন, এ বিলাপ তাঁহারই মুখে শোভা পায়; —যিনি হৃদয়ে বিরাজিত, তাঁহাকে না পাইয়া বিলাপ করিলে দর্শক-মণ্ডলী অবশ্যই পরিহাস করিতে পারেন,—রাধার সখীগণ এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিত, এবং চৈতন্যদেবের অনুচরগণও তাঁহার বিরহ অবস্থা বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। এই ভাবটি ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কৃষ্ণকমল লিখিয়াছেন :—

"গোস্বামী সিদ্ধান্ত মতে স্বয়ং ভগবান।
বৃন্দাবন ছাড়ি এক পদ নাহি যান॥
তবে যে গোপিকার হয় এতই বিষাদ।
তার হেতু প্রেমিক ভক্তের রসাস্বাদ।
স্ফূর্ত্তিরূপে মূর্ত্তি যখন দেখেন নয়নে।
তখন ভাবেন কৃষ্ণ এলেন বৃন্দাবনে।
অদর্শনে ভাবেন কৃষ্ণ গেলেন মধুপুরী॥"

এ রাধিকা চৈতন্যদেবের ছায়া, —এবং ঈশ্বরপ্রেমের পবিত্র কথায় সুপবিত্র। আমরা অন্যভাবে পদাবলী পড়িতে পারি না। বৈষ্ণবসাহিত্য রীতিমত পড়িলে রাধিকাকে সাধারণ নায়িকা বলিয়া কখনই মনে হইবে না। দেবোদ্দেশে অর্পিত কুসুমহার যিনি পার্থিব প্রেমপাত্রের কণ্ঠে দোলাইয়া দেখিতে চাহেন, তিনি দেখিবেন, কিন্তু তাহা হইলে চৈতন্যের মধুময় লীলার আস্বাদ তিনি পাইবেন না।

সেই "বিকশিত ভাবকদম্ব", "কত সুরধুনী"প্লাবিত নয়নযুগ্ম, "ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত" -বাসুঘোষ-বর্ণিত এই প্রেমের পূর্ণ বিগ্রহ—বৈষ্ণবকবির পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের লীলার অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন! কৃষ্ণের মত তিনিও "দুই হাত বুকে ধরি রাই রাই করি, ধরণী পড়ত মুরছই।" এবং রাধার ন্যায় তিনি দিবারাত্র "অবশ হইয়া কহে কানু কানু নাম।" এই দুই দৃশ্যের অপরূপ একত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া দুইটি সামগ্রী সৃষ্টি করিলে, মাধুর্য্যের হানি হইবে, নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।

সাহিত্যসেবা।

মার্ক প্যাটিসনের নিকট কোন গ্রন্থকার এক খানা গ্রন্থ রচনা করা সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, এইরূপ এক খানা গ্রন্থ লিখিতে গেলে, এত সকল বিষয় অনুসন্ধান করা এবং জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে, বিশবৎসরব্যাপী চর্চ্চা ব্যতীত এ কাজ সম্ভব নয়। কোন বৈজ্ঞানিককে একবার কোন বিশেষ বিষয়ে কিছু বলিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। তিনি উত্তর দিয়াছিলেন— "আমি বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত আছি; উক্ত বিষয় জানিবার এখনও আমার তেমন সুবিধা বা অবকাশ হয় নাই"। এই দুইটী ঘটনা হইতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, সেবার উপযুক্ত হইবার জন্য সঙ্কল্পের সহিত সাধনা অবলম্বন করা আবশ্যক। জঠরজ্বালা নিবৃত্তির জন্য যে সাহিত্যসেবা, সে সেবা যেমন অকিঞ্চিৎকর, সে সাহিত্যও তেমনই অস্থায়ী ও অগভীর। লাঞ্ছিত হইয়া ডিজ্‌রেলি বলিয়াছিলেন,—"অপেক্ষা কর, এমন একদিন আসিবে যখন তোমাদিগকে আমার কথা শুনিতেই হইবে"। সাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ শক্তি ও প্রভাব লাভ যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমন সাধনাসাপেক্ষ।

বাস্তবিক যদি বলিবার মত প্রকৃতই কিছু না থাকে, তবে শুদ্ধ বাগাড়ম্বর করিলে যে সাহিত্যের সেবা করা হয়, এরূপ মনে করা নিতান্তই ভ্রম। প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করিলে পূজা আরম্ভ হইতে পারেনা; চিন্তার গাম্ভীর্য্য ও বিষয়ের গৌরব যদি ভাষার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে না পারে, তবে তদ্দ্বারাও সাহিত্যের পূজা হয় না। সত্য বটে ছন্দোবদ্ধ শব্দপ্রবাহে কর্ণে মধুরতা ঢালিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কাহাকেও কিছু শিখাইতে পারেনা, কাহাকেও এক চুলও অগ্রসর করিতে পারেনা। এরূপ লালিত্যপূর্ণ, চিন্তাবিহীন ভাষার সাহায্যে যে সাহিত্যসেবা, তাহা বাস্তবিক সেবা নামের অধিকারী কি না, গভীর সন্দেহের বিষয়। সাহিত্যের হিসাবে ভাষা অগ্রাহ্য করিবার বস্তু নয় জানি; কিন্তু অন্তঃসারশূন্য ভাষা লইয়া কোন জাতির সাহিত্য গঠিত হইলে কি তাহা সে জাতির গৌরবের কারণ হয়, না তাহাতে তাহাদের মানসিক সঙ্কীর্ণতা ও স্থূলতাই প্রকাশ পায়? অনেক সময় এমন হয় যে, শব্দের মধুর প্রবাহে ভাসমান

হইয়া চলিতে থাকি ; যখন পাঠ সমাপ্ত হয়, তখন কতকগুলি সুবিন্যস্ত শব্দের মধুর ঝঙ্কার কর্ণে ধ্বনিত হইতে থাকে, কিন্তু শব্দস্পন্দ ছাড়া আর কিছু লাভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়না। সাহিত্যের কাজ একটা জাতির জীবনকে সঞ্জীবিত রাখা। শুদ্ধ শব্দের ঝঙ্কারে কি সে গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইতে পারে ?

একবার কোন ইংরেজী পুস্তকে এক শ্রেণীর বক্তাদিগের একটা বক্তৃতার নমুনা পড়িয়াছিলাম। নমুনাটা এই জাতীয়—"বিশাল সুনীল গগনমণ্ডল, নক্ষত্রখচিত, জ্যোৎস্না-প্লাবিত—আবার ইহাই গভীর কৃষ্ণবর্ণ মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে! মেঘের উৎপত্তি আবার বড়ই রহস্যজনক! সূর্য্যের কিরণ সাগরজলকে বাষ্পে পরিণত করে, তাহা হইতেই মেঘের উৎপত্তি; সাগরের কথা কি বলিব? বিশাল নীল জলধি, কি অকূল, কি অপার! কিন্তু সাগরবারি লবণাক্ত; লবণ, আহা! বিধাতার কি কৌশল!" ইত্যাদি ইত্যাদি। পাঠক রকমটা বুঝিতেছেন? বাক্যের মাঝে ফাঁক বুঝিয়া একটা কথা ধরিয়া কেবলই শব্দের স্রোত বুঝি, কোথায়ই বা গগনমণ্ডল আর কোথায়ই বা লবণ! এরূপ বকিতে কিঞ্চিৎ ভাষাজ্ঞান আবশ্যক হইলেও বিশেষ চিন্তা, অনুশীলন বা পরিশ্রমের আবশ্যক হয়না। এরূপ প্রলাপ বক্তৃতায়ই হউক আর প্রবন্ধাকারেই হউক, ভাষার মাধুর্য্যে মধুর, শব্দের গৌরবে গৌরবান্বিত হইলে শুনিতে ও পড়িতে নিতান্ত মন্দ লাগার কথা নয়; কিন্তু আসল কথাটা এই, ইহাতে তোমার মনের কোন্ জায়গাটার কি উৎকর্ষ বা বিকাশ সাধন করিয়া দিয়া গেল ?—তোমার কোন চিন্তা-টাকে জাগাইয়া তুলিল, বা তোমার দৃষ্টির সমক্ষে—যাহা তুমি দেখিয়াও দেখিতেছিলেনা—এমন কোন বিষয়টাকে উজ্জ্বল করিয়া ধরিল? এসকল প্রশ্নের সদুত্তর সাহিত্যের নিকট হইতে আদায় করিতে না পারিলে, সে সাহিত্য সমুচিত সম্মানের যোগ্য হয়না।

কিন্তু ব্যক্তিগত সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সরসতা সম্পাদন কি সাহিত্যের কার্য্য নয়? সাহিত্য কি কেবল গভীর সত্য লইয়াই বাস করিবে, ইহা কি কখন লোকের মনকে সরস রাখিতে চেষ্টা করিবেনা? তাহা হইলে সে সাহিত্য পেচকসমাজের উপযোগী হইতে পারে, মানব-সমাজের উপযোগী হইবেনা। মানবের একটা বিশেষ বৃত্তিকে যে সাহিত্য অবহেলা করে, সে সাহিত্যকে কখন পূর্ণাঙ্গ বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত প্রকার আপত্তি সমীচীন বটে, কিন্তু যত গোল ঐ সরসতা কথাটা লইয়া। আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, চিত্তের স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিকতা বিনষ্ট করিয়া সরসতা বজায় রাখা বা প্রদান করা প্রকৃত সাহিত্যের কাজ নয়। চিত্তের বিকার অথবা অস্বাভাবিক-তা উৎপাদনকে সরসতা নাম দেওয়া একটা মহা ভ্রান্তি।

শব্দশাস্ত্রে সকল শব্দেরই স্থান আছে, কিন্তু যে শব্দ আপন জীবনের হীন ইতিহাস লইয়া উপস্থিত হয়, যে শব্দের ভাবকে উন্নত করিয়া তোলা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়, তেমন শব্দ দ্বারা বিকারগ্রস্ত রুচি পরিতৃপ্ত করিবার আয়াসকে কখন সরস সাহিত্য সৃষ্টি করা বলা যাইতে পারেনা। ঠাকুরমার স্নেহপ্রবণ হৃদয় ঘরের রুগ্ন ছেলেকে পান্তা ভাত দিয়া যমা-লয়ের পথে একটু অগ্রসর করিয়া রাখিয়া আসে। সাহি-ত্যের যাঁরা মুরুব্বি, তাঁরাও কি তেমনি অপথ্য দিয়া জাতীয় রুচিকে বিকৃত করিয়া, জাতীয় জীবনকে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে থাকিবেন?

চিত্তরঞ্জনের জন্য যাহা লিখিত হইবে, তাহাতেই যদি চিত্তকে এক ধাপ না নামাইলে না চলে, তবে সে সাহিত্যকে আমরা বাঁচিয়া থাকিবার যোগ্য অথবা অনুকরণীয় বলিতে পারি না। জাতীয় সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দরের একটা স্থান হইতে পারে, কিন্তু জাতীয় জীবন গঠনের প্রশ্ন উঠিলে সেই সাবেকী সাহিত্যের রুচির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা একটা মহা বিড়ম্বনা—একটা বিপথগামী প্রয়াস। জাতীয় রুচি এখনও যে সম্পূর্ণ সুস্থ ও সুস্থ একথা বলা যাইতে পারেনা। প্রাচীন "রঙ্গরসের" প্রণালী হইতে ইহাকে উদ্ধার করিয়া যে পথে আনা হইয়াছে, এতদূর উদ্ধার সাধন করিতেও সাহিত্য ভাণ্ডারের কর্ত্তাদিগকে বঙ্গসাহিত্যের পাঠকদিগের রুচির খাতিরে মাঝে মাঝে বেশ তরল খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। কিন্তু সে তরলতা প্রাচীন প্রণালীর এক ধাপ উপরে থাকিতেই প্রয়াস করিয়াছে। মোটামুটির উপর বলিতে গেলে জাতীয় জীবন এখন সে তরলতাও ছাড়াইয়া চলিয়াছে। এখন জাতীয় সাহিত্যকে সবল করিবার জন্য সাহিত্যসেবীদিগের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য সাহিত্যে অস্থি যোগান।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশ্য মনকে প্রকৃতিস্থ রাখা। কিন্তু মনকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে গিয়া কি জীবনটাকে একঘেয়ে করিয়া তুলিতে হইবে? কখনই নয়। যাহার জীবন একঘেয়ে, সে জীবনের একটা দিকই দেখে, সমস্ত দিক্‌গুলি সামলাইয়া দেখিতে পারেনা; এবং দেখিতে পারেনা বলিয়াই তাহার জীবনে যেমন কতকগুলি অভাব ও অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়, সে যাহা শিক্ষা দিতে চায় তাহাও তেমনি অসম্পূর্ণ হয়। কিন্তু চিত্তকে প্রকৃতিস্থ রাখা যায় কি করিয়া? শরীরকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে হইলে যেমন কঠিন ও তরল উভয়বিধ খাদ্যেরই ব্যবস্থা করিতে হয়, মনসম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা প্রয়োজ্য। কিন্তু অখাদ্য যোগাইবার প্রয়োজন নাই। যাহা দিলে চিত্ত লঘু হয়, মতি হীন হয়, কল্পনা কলুষিত হয়, মনের দৃঢ়তা কমিয়া যায়, এমন কোন তরল খাদ্যের ব্যবস্থা করিলে সে ব্যবস্থাকে মন প্রকৃতিস্থ রাখার সম্পূর্ণ বিরোধী ও অনুপযোগীই বলিতে হইবে।

বঙ্গীয় বহু পাঠকের রুচি পরিতৃপ্ত করিবার জন্য সাধারণতঃ লঘু সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। সেই লঘু বা তরল সাহিত্যের সরবরাহকারীরা যদি জাতীয় জীবনের অতীত ও বর্ত্তমান শিক্ষা ও অভাব ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়া আপনাদিগকে খাঁটী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, এবং একটা শোভন আদর্শ সরল কথার ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার সংসঙ্কল্পে আপনাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারেন, তবেই তাঁহাদের রচিত সাহিত্য জাতীয় জীবন গঠনে কাজে লাগিবে। হয়তো একটা প্রবন্ধ বা একটা সমাজসংস্কারের বক্তৃতা অপেক্ষা সামাজিক বা জাতীয় ব্যাধি প্রদর্শক একটা গল্প বা বিদ্রূপাত্মক কবিতা সময়ে সময়ে অধিক কার্য্যকর হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে অশ্লীলতার ভেজাল দিবার কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া বোধ হয়না। খাঁটী কথাটা সরল ভাষার পবিত্র আবরণে সদুদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া উপস্থিত হইতে পারিলেই তাহার সার্থকতা।

সাহিত্যসেবক যে শিক্ষা দিয়া থাকেন, সে শিক্ষার গতি কোন্ দিকে, ইহাও তাঁহার ভাবিবার বিষয়। তাঁহার শিক্ষার আদৌ গতিশীলতা আছে কিনা, না দুই পা অগ্রসর হইয়াই আর চলিতে পারিবেনা, তাহাও তাঁহার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। যে শিক্ষার ফল দিনের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যায়, জীবনে এমন গতি বা বেগ দিয়া যাইতে পারেনা যে, তাহার বলে সমাজ ও জাতির জড়তা ঘুচিয়া গিয়া ইহারা উন্নতির অভিমুখে ধাবিত হইতে পারে, সাহিত্যসেবীকে তেমন অকিঞ্চিৎকর ভাবের উপরে উঠিতে হইবে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবন যেমন বহু উন্নতসম্ভাবনা-বিশিষ্ট, আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনও তদ্রূপ। কিন্তু সেই সম্ভাবনা সম্বন্ধে যদি সাহিত্যসেবক অন্ধ হন, তবে সেই অদূরদর্শিতার ফলস্বরূপ জাতীয় উন্নতি বহু বৎসর পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। সাহিত্যসেবকগণ একটা জাতিকে সীমাহীন জ্ঞানালোকের পথে না লইয়া গিয়া যদি একটা কৃত্রিম, সঙ্কীর্ণ আলোকগণ্ডীর মধ্যে নৃত্য করাইতে থাকেন, তাহাতে সাহিত্যসেবীর উপযশ লাভ হইতে পারে; কিন্তু সেই জাতিটা সাহিত্যের এই কৃত্রিম বিচেষ্টার পাকে পড়িয়া যে পঙ্কিলতা সংগ্রহ করে, তাহা প্রক্ষালন করিতে পুনরায় যে পরিমাণ শক্তি ও সময় আবশ্যক হইবে, সেই পরিমাণে জাতীয় অবনতি হইল, অথবা জাতীয় উন্নতি স্থগিত রহিল, একথা অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

সাহিত্যসেবীও এক হিসাবে সমাজসংস্কারক, জাতির পথপ্রদর্শক এবং গুরু; এই জন্যই তাঁহার পক্ষে অগ্রগামিত্ব আবশ্যক। কুজ্ঝটিকার মধ্যে চিরদিন বাস করিতে করিতে তাহা একটা স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়; কিন্তু যাঁহারা কুজ্ঝটিকার সীমা ছাড়াইয়া মুক্ত উদার নীলাকাশের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করেন, তাঁহারা কুজ্ঝটিকার অনিষ্টকারিতা সহজেই বোঝেন। সামাজিক ও জাতীয় গলদের ভিতরে নিরন্তর বাস করিয়া সেগুলিকে অস্বাভাবিক ও অস্বাস্থ্যকর বলিয়া যাঁহাদের মনে হয় না, তাঁহারা সাহিত্যক্ষেত্রে সে গুলিরই পৃষ্ঠপোষকরূপে অবতীর্ণ হন। কিন্তু সাহিত্যসেবীকে জাতীয় জীবনের নেতা ও শিক্ষক হইতে হইলে তাঁহার আসন তাঁহার সময়ের জাতীয় জীবনের উচ্চতম অভিব্যক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যাঁহারা জাতীয় জীবনের রুদ্ধ দ্বার গুলি মুক্ত করিয়া দিতে পারেন, আলোক ও বায়ুর প্রবেশপথের বাধাগুলি সরাইয়া দিয়া জাতীয় দেহে স্বাস্থ্য
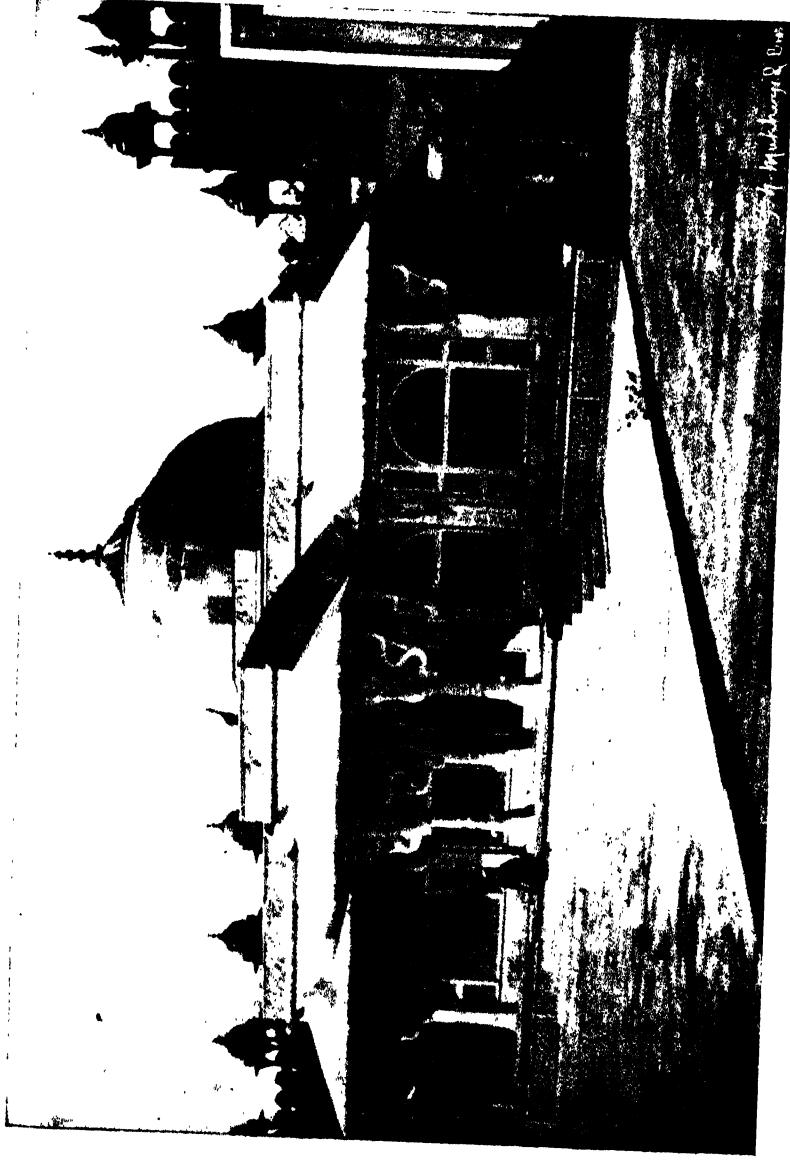
শেখ সলীমশাহ চিস্তীর দর্গা—ফতেপুরসিক্রী।

INDIAN PRESS.

সঞ্চারের উপায় করিয়া দিতে পারেন, তাঁহাদের সাহিত্য-সেবা সর্ব্বথা ধন্য হয়। সঙ্কীর্ণতা ও অন্ধকারের ভিতর বাস করাতে যে কূপমণ্ডূকবৎ অস্বাস্থ্যকর ও কৃত্রিম আত্মতৃপ্তি জন্মে, তাহা নির্ব্বাসিত করিয়া, কপট অহঙ্কার ও দম্ভকে চূর্ণ করিয়া দিয়া, জগতের বিশালতার সহিত যিনি জীবনের পরিচয় করাইয়া দিতে পারেন, তাঁহার সাহিত্য-সেবা জাতীয় জীবনে নব যুগের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে।

সাহিত্য কৃত্রিম হইতেছে কি না এবং ইহার শক্তি দিন দিন লঘু হইতেছে কি না, তাহা দেখাও সাহিত্যসেবীর কর্ত্তব্য। উদ্ভিদ্ ও জীবের ভিতরে এক শ্রেণী আছে, যাহাদিগকে পরভুক (Parasite) বলে। এই পরভুকেরা যে বৃক্ষে অথবা যে প্রাণীতে অধিষ্ঠান করে, তাহারই জীবনী শক্তিতে আপনারা বাঁচিয়া থাকে। সাহিত্যেও পরভুকের অভাব নাই। অপরের ভাবসম্পদ্ লইয়া, শব্দৈশ্বর্য্য লইয়া তাহারা সাহিত্যের বাজারে কেনা বেচা করিয়া আছে মন্দ নয়। জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, স্বাবলম্বনশীল বৃক্ষ ও প্রাণিগণের দৈহিক যন্ত্রসমূহের ও শক্তিসামর্থ্যের যেরূপ বিকাশ হইয়া থাকে, উদ্ভিদ্ অথবা প্রাণিজগতে পরভুকদিগের তেমন ত হয়ই না, বরং তাহাদের গতি উন্নতির অভিমুখী না হইয়া অবনতির দিকে অগ্রসর হয়। আর সাহিত্যের এই পরভুকদিগের সাহিত্যসেবাও অল্পকালের মধ্যেই অধঃপতিত হয়। তাহারা যে নিজেরা দিন দিনশক্তিহীন হইয়া পড়িতে থাকে, কেবল তাহা নয়, তাহাদের সংখ্যার বৃদ্ধি হইলে জাতীয় সাহিত্যও কৃত্রিম হয়, তাহাতে আর জীবনপ্রদায়িনী শক্তি থাকেনা, তাহাতে আর মনকে উদ্বোধিত করিয়া উচ্চগ্রামে লইয়া যাইতে পারে না। সত্য বটে, আমরা পরকীয় ভাব, চিন্তা ও বাক্যের নিকট ঋণী না হইয়া থাকিতে পারিনা, তাই বলিয়া কি আমাদের একটা নিজের বিশেষত্ব থাকা কর্ত্তব্য নয়? আমাদের কি ব্যক্তিগত স্বাধীন বিচার থাকিবে না? একটা সত্য পাইয়া কি আমরা সে সত্যটাকে আপন শক্তি দ্বারা আপনার রক্তে পরিণত করিতে চেষ্টা করিব না? অপরের পদতলে বসিয়া সত্য বা তত্ত্ব শিক্ষা করাতে অপরাধ বা অপমান নাই; কিন্তু কথাটা এই, সত্যটা আগ্রহ প্রীতি ও শ্রদ্ধাসহকারে বাস্তবিকই শিখিতেছি কি না? না, পরের কথাটা যেন তেন প্রকারে দশ জনের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া হাতে হাতে স্বর্গে যাইতে চাহিতেছি? সত্য বা তত্ত্বটা রক্তের ন্যায় তোমার মন প্রাণে সঞ্চারিত হইয়া তোমাকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে ত?

শেষ কথা, সাহিত্য কি কর্ণধার-বিহীন তরণীর ন্যায় ঘাতপ্রতিঘাতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবার জন্য? ঘরের রেসারেষি, হিংসা বিদ্বেষ কি সাহিত্যের পুণ্যক্ষেত্রে লইয়া আসা নিতান্তই আবশ্যক? সাহিত্য কি তোমার আমার স্বার্থের জন্য; না জাতীয় স্বার্থসাধন, জাতীয় উন্নতি ও বিকাশের জন্য? যাহার দৃষ্টি আপন লাভালাভের বিচারে, স্বার্থের অন্ধকারে মুহ্যমান, যে ব্যক্তি উদারনেত্রে জাতীয় উন্নতি-রূপ মহা সাধনার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারেনা, তাহার সাহিত্যসেবকের উচ্চ আসন হইতে নামিয়া বসাই ভাল। যাহারা দেবমন্দিরের শান্তি ভঙ্গ করে তাহারা যেমন দণ্ডনীয়, সাহিত্যের দেবমন্দিরে উচ্চ আরাধনার কথা ভুলিয়া গিয়া যাহারা স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সত্যের অপলাপ করে, তাহারাও তেমনই তিরস্কৃত হইবার উপযুক্ত। ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতার সহিত তুলনায় আমরা অতি নগণ্য; সেই ক্ষুদ্র আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতা স্মরণ করিয়া যে পরিমাণে একটা সত্যকে জীবনের ভিতরে লইয়া গিয়া জীবনের রক্তে তাহা পরিপুষ্ট করিতে পারি, সেই পরিমাণে আমাদের কথার মাহাত্ম্য, সেবার সার্থকতা। আমাদের দুদিনের স্বার্থের জন্য ব্রহ্মাণ্ডের গতি দাঁড়াইয়া থাকিবে না। আমরা সেই গতির সহিত আপনাদিগকে যুক্ত রাখিতে পারিলেই ধন্য হইব; আর না হয়, পেছনে পড়িয়া থাকিয়া আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিব।

২৫শে জুলাই, ১৯০১। শ্রীসত্যানন্দ দাস।

ফতেপুর-সিক্রি।

আগ্রাকলেজের প্রিন্‌সিপলের বাঙ্গলার দক্ষিণ সীমা অতিক্রম করিয়াই ডান হাতে পশ্চিমদিকে সামান্য উত্তর কোণে সাগঞ্জের রাস্তা। সাগঞ্জের মধ্য দিয়া এই রাস্তাই সোজা ২৩ মাইল দূরে ফতেপুর-সিক্রি চলিয়া গিয়াছে। সাগঞ্জের পুলিশের চৌকি পার হইলে বড় একটা লোকের বসতি নাই। প্রশস্ত রাস্তার দুদিকেই বড় বড় গাছ। তাই

পথ দীর্ঘ হইলেও সর্ব্বদাই ছায়াযুক্ত। দুদিকেই বিস্তীর্ণ মাঠ, কেবল মাঝে মাঝে কচিৎ দূরে দু একটি বসতি। ফতেপুর-সিক্রির প্রায় দুই তৃতীয়াংশ পথ অতিক্রম করিলে কেরনির বসতি। এই বসতিটি বেশ বড়। এখানে বাজার আছে; ফতেপুর-সিক্রি ও আগ্রার মধ্যে এই প্রধান আড্ডা; এখানে আসিয়া সকলেই বিশ্রাম করেন বা ডাক বদলাইয়া লয়েন। আগ্রা হইতে কেরনি আসিতে প্রায় দুই ঘণ্টা লাগে। তাই প্রাতে আগ্রা ছাড়িলে এখান হইতেই রৌদ্রের প্রকোপ বাড়িতে আরম্ভ করে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পিপাসা পাইতে থাকে। ফতেপুর-সিক্রি দেখিতে যাওয়ার সময় সঙ্গে আগ্রা হইতে ভাল জল লইয়া যাইতে হয়, রাস্তার নোনা জল গলাধঃ করা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। এমনকি ফতেপুর-সিক্রি পৌঁছিয়াও ভাল জল পাওয়া দুরূহ।

কেরনি ছাড়িয়া কতকদূর অগ্রসর হইলেই দূরে অনুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতে থাকে। তখন হইতে ফতেপুর-সিক্রি দর্শনেচ্ছা একটু বেশী প্রবল হয়, মনে হয় আর কতক্ষণে ফতেপুর-সিক্রি পৌঁছিব। ফতেপুর সিক্রির বাহিরে অনেক ধনী লোকেরা উদ্যানাদিতে বাস করিতেন, স্থানে স্থানে আজিও তাহার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান থাকিয়া ফতেপুর-সিক্রির পূর্ব্ব গৌরব জাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা পাইতেছে। ক্রমে ফতেপুর-সিক্রির বিরাট উচ্চ প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হয়, এবং দেখিতে দেখিতে ফতেপুর-সিক্রির আগ্রার দিকের প্রাচীরের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। আগ্রার সহর ছাড়িয়া এখানটা ২২শ মাইল। এখান হইতেই আকবর সাহের ফতেপুর-সিক্রি আরম্ভ কিন্তু ফতেপুর-সিক্রির প্রাসাদ ও অন্যান্য দর্শনীয় ভগ্নাবশেষ এবং আধুনিক ফতেপুর-সিক্রি আরও এক মাইল দূরে। এখান হইতে রাস্তার দুপাশেই পূর্ব্ব উদ্যানাদির ভগ্নাবশেষ যথেষ্ট বর্ত্তমান রহিয়াছে; অনেক স্থানেই কেবল লালরঙ্গের প্রস্তরের স্তূপ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাস্তা দুই দিকে বিভক্ত হইয়াছে। ডানহাতের রাস্তাটি কিঞ্চিৎ উঁচুর দিকে; কিন্তু সে রাস্তা ধরিয়া গেলে সোজা ভগ্নাবশেষের মধ্যে যাওয়া যায়। আর সেই রাস্তায় গেলে ডাকবাঙ্গলার নিকটে যাইয়াই গাড়ী থামে। তাই সাহেবেরা প্রায়ই সেই রাস্তায় যাইয়া থাকেন। বাম হাতের রাস্তায় গেলে বুলন্দদরজার নিকট পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইতে হয়। দেশীয়েরা প্রায়ই এই রাস্তায় যাইয়া থাকেন। রাস্তার পাশে কোনও উদ্যানে যাইয়া বিশ্রাম ও আহারাদি করা যায়। অবশ্য বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য, উদ্যান বলিয়া বিশেষ সুবিধা নাই। খাবার ইত্যাদি সব আগ্রা হইতে আনিয়া এখানে গাছতলায় বসিয়া খাওয়া, এই যা সুখ, বেশ একটু বনভাতি হয়। দরকার হইলে ফতেপুর সিক্রিতে খাবার জোগাড় করিয়া লইবেন, সে আশা করা বৃথা; বাজার দূরে, আর ভাল জিনিস পাইলেও যথেষ্ট পাইবেন কিনা সন্দেহ। ডাকবাঙ্গলায় পূর্ব্বেই খবর দিতে হয়, নতুবা সেখানে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান করিয়াও বিশেষ লাভবান হইবার আশা অল্প; আমরা ঠেকিয়া শিখিয়াছি। সর্ব্বোপরি ফতেপুর-সিক্রির মাছির উপদ্রব। আমাদের মতে ফতেপুর-সিক্রি যাইতে হইলে যথেষ্ট খাবার সঙ্গে লইয়া যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তিন ঘণ্টা সাড়ে তিন ঘণ্টা গাড়ী বা একার ঝাঁকনিতে বেশ ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেক হইবার কথা এবং পাঁচ ছয় ঘণ্টা উঠা নামা করিয়া সব দেখিতে গেলে যথেষ্ট পরিশ্রান্ত বোধ করিতে হয়।

আকবর সাহের ফতেপুর-সিক্রি স্থাপন ও অবশেষে আগ্রায় রাজধানী পুনঃস্থাপন সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে। বাবর যখন প্রথম আগ্রায় তাঁহার রাজধানী সংস্থাপন করেন, তখন ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে রানা সঙ্গ ও অন্যান্য সমবেত রাজপুতদিগকে সিক্রির যুদ্ধে পরাজিত করেন। সিক্রি তখন সামান্য বসতি, তাহার অদূরেই জঙ্গলাকীর্ণ সিক্রির পাহাড়। আকবর সাহের রাজত্বকালে ঐ পাহাড়ের নিভৃত গুহায় সলিম নামে এক প্রতিভান্বিত ফকির বাস করিতেন। পারস্যদেশের চিস্তগ্রামনিবাসী ধর্ম্মগুরুর শিষ্য বলিয়া তিনি সলিমচিস্তি নামে অভিহিত হইতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার কিয়ৎদিন পূর্ব্বে অম্বররাজকুলোদ্ভবা আকবর-মহিষী রাজাবিহারীমলের দুহিতার কুমারদ্বয়ের কাল হইয়াছে তাই আকবরসাহ নিঃসন্তান অবস্থায় নানা চিন্তার মধ্যে দেব ও গুরুর কৃপাপ্রার্থী হইলেন। সিক্রির পাহাড়ের ফকিরের প্রভাব তাঁহার কর্ণগোচর হওয়া বিচিত্র নয় ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে উজবেক আমীরদিগকে দমন করিয়া আগ্রা প্রত্যাবর্ত্তনকালে সিক্রির পাহাড়ে তিনি ফকিরের সহিত

সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কৃপাভিখারী হন। কথিত আছে আকবরসাহ বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্তনকালে ফকিরের ছয়মাসবয়স্ক শিশু নিজ জীবনদানে বাদসাহের পুত্র-বর প্রার্থনা করেন, এবং তাহার ফলে নিঃসন্তান আকবর সেই বৎসর পুনরায় পুত্রমুখদর্শন করেন। ফকিরের নামানুযায়ী কুমারের নাম সলিম রাখা হয়। আকবরসাহ কুমার সলিমকে সর্ব্বদাই সেখ বাবা বলিতেন। ইনিই কালে বাদসাহ জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করেন। কথিত আছে অম্বর-রাজদুহিতা অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় সিক্রিতেই অবস্থান করিয়াছিলেন এবং আজিও লোকেরা দর্শকদিগকে আঁতুড়ঘর দেখাইয়া দিয়া থাকে। কুমারের জন্ম হইতেই সিক্রির পাহাড়ে রাজকীয় বাসস্থান নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। আকবরসাহ ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাট প্রদেশে মির্জা হোসেনের বিদ্রোহ দমনের পর সিক্রিতে আসিয়া নূতন রাজধানীর ফতেপুর নাম দেন। সেই হইতেই সকলে ইহাকে ফতেপুর সিক্রি বলিয়া আসিতেছে। ক্রমে দুর্গপ্রাচীরে ফতেপুর-সিক্রির চতুর্দ্দিক ঘেরাও হইতে থাকে। সেখ সলিমচিস্তি সতত রাজদরবারের সান্নিধ্যে তাঁহার ধ্যানের ব্যাঘাত হয় দেখিয়া আকবর সাহকে ফতেপুর সিক্রিতে রাজধানীস্থাপনবাসনা পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন; তাই ফতেপুর সিক্রি পূর্ণবিকাশ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই আবার জনমানবশূন্য হইতে আরম্ভ করে। এমন কি বাদসাহ জাহাঙ্গীরের সময়েই রাত্রিতে ফতেপুর-সিক্রির মধ্য দিয়া যাতায়াত মহা ভয়সঙ্কুল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ফতেপুর-সিক্রির জনমানবশূন্য প্রাসাদাবলী ও তাহার চতুর্দ্দিকের ধ্বংসাবশেষ দেখিবার মত জিনিস। তিন শত বৎসরের পরে আজিও অনেক প্রাসাদ নূতন বলিয়া বোধ হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কৃপায় এই পূর্ব্বগৌরব অক্ষুন্ন রাখিবার যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে। ফর্গুসন সাহেবের তীব্রসমালোচনার ফল ফলিয়াছে—"How much of this palace remains it is impossible to say. When I was there the Government were selling the stones at 10 rupees the hundred maunds—a little less than it would cost to quarry them..." (History of Architecture). আজ ফতেপুর-সিক্রি দেখিতে গেলে তিনি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইতেন। বড় লাট লর্ড কর্জনের আদেশে প্রাসাদাবলির পূর্ণ জীর্ণসংস্কার এবং স্থানে স্থানে লুপ্ত চিত্রাবলির যথার্থ পুনরুদ্ধার চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না। Archaeological Survey Department এর স্মিথ সাহেবের চেষ্টায় অনেক চিত্রের পুনরুদ্ধার হইয়াছে এবং যোগ্য ব্যক্তিরা সেই সকল চিত্রের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।

প্রাসাদাবলীর মধ্যে উচ্চ বুলন্দদরজার দৃশ্যই সর্ব্বপ্রথমে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। Fergusson সাহেবের মতে ইহা ভারতে অদ্বিতীয়, এমনকি পৃথিবীতে এরূপ উচ্চ খিলান আর আছে কিনা সন্দেহ। প্রশস্ত প্রস্তর-সোপানাবলীর সাহায্যে উচ্চভূমিতে উঠিয়া বুলন্দদরজার দ্বারদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। উচ্চভূমির পৃষ্ঠে বিরাট প্রস্তরদেহ আজিও অক্ষুন্ন; ১৩০ ফুট উচ্চে মস্তক ধারণ করিয়া যথার্থই যেন মরজগতে আকবরসাহের খান্দেসজয়বার্ত্তা অমর রাখিবার চেষ্টা পাইতেছে। দর্শক বুলন্দদরজার উপর হইতে ২৫ মাইল দূরে পূর্ব্বদিকে আগ্রার তাজ দেখিবার চেষ্টা পাইতে পারেন। উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি সুন্দর। ফতেপুর-সিক্রির অন্যান্য প্রাসাদাদি বুলন্দদরজার বিরাট দেহের নিকট অতি ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়।

বুলন্দদরজার উত্তরে একটি চত্বর, চত্বরের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে বারেন্দা ও ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ এবং পশ্চিমদিকে মসজিদ। চতুর্দ্দিক বেষ্টিত এই চতুষ্কোণ চত্বর পূর্ব্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণে ৩৬০ ফুট এবং ৫৯ ফুট। দক্ষিণ দিক হইতে বুলন্দদরজার ভিতর প্রবেশ করিতে দুপাশে দেওয়ালে ফয়জিরচিত আকবর সাহের গুণানুবর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে নানা ধর্ম্মবচন ও পৃথিবীর অসারত্ববিষয়ক বিবিধ বচন প্রস্তরগাত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে।

চত্বরের পশ্চিম সীমা মসজিদ। বুলন্দদরজা এত নিকটে বলিয়া যদিও ইহার অনেকটা সৌন্দর্য্য হানি হইয়াছে, তথাপি ফর্গুসন সাহেবের মতে ভারতে এরূপ মসজিদ খুব কমই আছে; হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মভাবের এরূপ সুন্দর সমাবেশ অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। ফর্গুসন সাহেবের ভাষায় "a style unrivalled in any part of the world." (History of Architecture.) অন্যান্য প্রাসাদাদির ন্যায় জুম্মা মসজিদও লালপ্রস্তরনির্ম্মিত। প্রস্তরে

নানারূপ কারুকার্য্য আছে, এবং মুসলমানধর্ম্মবিরুদ্ধ হইলেও প্রাচীরের উপরে নীচে সকল স্থান বিবিধ সুন্দর চিত্রে চিত্রিত। মসজিদের মাঝখানে কতকটা স্থান শ্বেত মর্ম্মরের, তাহা ব্যতীত সর্ব্বত্রই লাল প্রস্তর। চিত্রের রঙ্গ অনেক স্থানেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি এখনও চিত্তাকর্ষক। The Journal of Indian Art and Industry, vol Viii, April 1899, No 66, কাগজে স্মিথ সাহেব এই সকল চিত্রের নমুনা দিয়াছেন। আকবরসাহ এই মসজিদেই ইমাম রূপে স্বপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত প্রচারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এবং এখানেই প্রসিদ্ধ আকবরনামা আইন-আকবরী লেখক আবুল ফজল আকবরসাহের প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করেন। মসজিদের প্রধান খিলানের উপর এইরূপ লিখিত আছে---এই মসজিদ "দ্বিতীয় স্বর্গ"। পারস্য ভাষায় প্রচলিত সঙ্কেতলিপি অনুসারে এই অর্থ বোধ হয় যে "এই মসজিদ ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্টিত।"

মসজিদের পশ্চাতে উত্তর-পশ্চিম দিকে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ফকিরের সেই ছয়মাসবয়স্ক শিশুর কবর, কুমার সলিমের আঁতুড়ঘর ও ফকির প্রথমে যে গুহায় বাস করিতেন সেই গুহা, এই সব প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এখানে পাথুরিয়াদিগের নির্ম্মিত একটি ছোট মসজিদও বর্ত্তমান।

বুলন্দ দরজায় প্রবেশ করিলেই দর্শকের সম্মুখে চত্বরের উত্তর ভাগে শ্বেত মর্ম্মর রোয়াকের (raised platform) উপর নাতিবৃহৎ নাতিক্ষুদ্র একটি প্রিয়দর্শন মন্দির রহিয়াছে। ইহাই সলিমচিস্তির দর্গানামে প্রসিদ্ধ। আকবর সাহ ও তৎপরে জাহাঙ্গীর বাদসাহ সলিমচিস্তির উপর আপনাদের অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধার এই মনোরম স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মুসলমানেরা ও এখানকার সকলেই সলিমচিস্তির দর্গার যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকেন। যখন ফতেপুর-সিক্রির অন্যান্য স্থান জনমানবশূন্য, তখনও সলিমচিস্তির দর্গার যথেষ্ট সমাদর। আজিও হিন্দু মুসলমান সকলেই, বিশেষতঃ, বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা, তীর্থস্থান রূপে সেখানে গমন করিয়া মানত করিয়া থাকেন। বুলন্দদরজার প্রকাণ্ড কপাট ও মন্দিরের বেড় (প্রাচীর) মানতের নিদর্শনে পরিপূর্ণ। বাহির হইতে সলিমচিস্তির দর্গা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ শ্বেত মর্ম্মরের বলিয়াই বোধ হয়। চারিদিকের ঝিল্লিকাটা (জালিকাটা trellis work) শ্বেত মর্ম্মরের বেড় (প্রাচীর) দূর হইতে সুন্দর রেশমের বুনট লেসের পর্দ্দা বলিয়া ভ্রম হয়। প্রকোষ্ঠের চারিদিকে বারেন্দা, বারেন্দার উপর ঘরের চালার মত হেলান কর্ণিস। বাহিরে প্রাচীরগাত্রে কোরানের বচন সকল অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রকোষ্ঠের ভিতরে ৪ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত শ্বেত মর্ম্মরের; তার উপর লাল প্রস্তর। প্রকোষ্ঠের ভিতরে অনেক বিচিত্র কারুকার্য্য বর্ত্তমান এবং প্রাচীরেও নানা স্থানে পূর্ব্বে বিবিধ রঙ্গের সুন্দর চিত্র বর্ত্তমান ছিল বলিয়া বোধ হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে আগ্রার তৎকালীন কালেক্টর মেনসেল সাহেবের আজ্ঞায় সেই সকল চিত্র স্থানে স্থানে পুনরুদ্ধার করা হয়। এই সকল আধুনিক চিত্র স্মিথ সাহেব তাঁহার Archaeological Survey Reportএ আসল চিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন্ন বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন। স্মিথ সাহেব অনেক স্থানে পূর্ব্ব চিত্র পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব চিত্র ও Mansell সাহেবের আদেশে যে সব চিত্র পূর্ব্ব চিত্রের পুনরুদ্ধাররূপে চিত্রিত হইয়াছিল, তাহার নমুনা Journal of Indian Art and Industry, Vol viii Oct. 1898, No 64, পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। সলিমচিস্তির কবরের উপর ছত্ররূপে একটি আবলুস কাষ্ঠের চান্দোয়া (Canopy) চারিদিকে চারিটি ঐ কাষ্ঠের থামের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। চান্দোয়া ও তাহার পায়া চারিটি অতীব সুন্দর ঝিনুকের (mother of pearl) কারুকার্য্যখচিত। উহা প্রকোষ্ঠের আধ আধ আলোতে অতিশয় চিত্তাকর্ষক দেখায়। দেখিলে স্বতঃই মনে হয় এরূপ কারুকার্য্য নিশ্চয়ই বিরল হইবে। ফতেপুর-সিক্রির প্রাসাদাদির মধ্যে তুলনায় সলিমচিস্তির দর্গা নিঃসন্দেহ শীর্ষস্থানীয়। আকারে বিশেষ বড় না হইলেও "in respect of design and the costliness of material of which it is built, it stands unrivalled and is a perfect gem of art" (Smith, Archaeological Survey.)

দর্গার ঠিক সম্মুখে দক্ষিণদিকে একটি চৌবাচ্চা আছে। কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-উত্তরে সলিমচিস্তির পরিবারের মেয়েদের গোরস্থান, এবং তাহারই পাসে চিস্তি সাহেবের পৌত্র জাহাঙ্গীর বাদসাহের রাজত্বকালে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ইসলামখাঁর

কবরের উপর স্মৃতিচিহ্ন রহিয়াছে। Smith সাহেব ইহার ভিতরকার চিত্রসকলেরও নমুনা বাহির করিয়াছেন। ইসলামখাঁর গোরের ঠিক দক্ষিণেই চত্বরের দক্ষিণসীমার প্রকোষ্ঠমালার মাঝের খিলান।

চত্বরের পূর্ব্ব-উত্তর কোণে প্রকোষ্ঠমালার বাহিরে আকবর সাহের চিরসহচর আবুল ফজল ও তাঁহার ভ্রাতা রাজকবি ফয়জির বাসস্থান। আজকাল তাঁহাদের মহল ইংরাজী স্কুল রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

চত্বরের পূর্ব্ব দ্বার দিয়া বাহির হইয়া উত্তর দিকে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সরিয়া যোধবাই মহল। কেন যে এই মহলের নাম যোধবাই মহল হইয়াছে নির্ণয় করা দুরূহ। যোধবাই জাহাঙ্গীর বাদসাহের মহিষী ছিলেন, আগ্রা দুর্গে তাঁহার মহল বর্ত্তমান; জাহাঙ্গীর বাদসাহের মাতা মেরিয়ম-উজ্জমানি নামেই প্রসিদ্ধা ছিলেন। যোধবাই মহলে মাঝে চতুষ্কোণ চত্বর, দৈর্ঘ্য প্রস্থে ১৭৭ ও ১৫৭ ফুট। চত্বরের চারিদিকেই বারেন্দা; উত্তর ও দক্ষিণের বারেন্দার উপর প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। প্রকোষ্ঠের ছাদ, দোতালা ঘরের চালার মত, গাঢ় নীল মীনা (enamalled) করা টাইলের ছাউনি। পশ্চিম দিকের ঘর হিন্দু দেবদেবী-মূর্ত্তি, বিবিধ চিত্র ও হিন্দু কারুকার্য্যে পূর্ণ। এই মহলটি অন্য সকল মহল হইতে বড় বলিয়া কীন সাহেব, তাঁহার Handbook to Agra পুস্তকে, আকবরসাহের প্রধান মহিষী আকবরসাহের খুল্লতাত মিরজা হিন্দলের দুহিতা জানিখানান রুকিয়া সুলতান বেগমের বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। হইতে পারে আকবরসাহ এই মহলেই সাধারণতঃ বিশ্রাম করিতেন। এই মহলের অন্তর্গত উত্তরদিকে উপরের বাহিরের দিকের প্রকোষ্ঠ ঝিল্লিকাটা (trellis work) লাল প্রস্তরের বেড়ে (প্রাচীর) ঘেরাও। সে স্থানটা বিশ্রামাগার বলিয়া মনে হয়। সেখান হইতে বাহিরের দৃশ্যও কিছু দেখা যায়।

অশ্বশালার ঠিক সম্মুখে উত্তর দিকে, যোধবাই মহলের উত্তরপশ্চিম কোণে রাজা বীরবলের প্রাসাদ। দ্বিতল অট্টালিকার উপরে নীচে চারিটি করিয়া প্রকোষ্ঠ। অশ্বশালার এত নিকটে বলিয়া অশ্বাধ্যক্ষের বাসস্থান বলিয়াই মনে হয়। আকবরসাহ ও রাজা বীরবল সম্বন্ধে আমাদের দেশে নানা রূপ গল্প প্রবাদ যুবকবৃদ্ধ সকলেরই পরিজ্ঞাত। কনলীনিবাসী দরিদ্র ভাট ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদাস নিজ প্রতিভাবলেই রাজকবি বীরবল ও রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়া পরিশেষে বাদসাহের একজন বিশ্বস্ত মন্ত্রিরূপে বরিত হইয়াছিলেন। কি যুদ্ধ কি অবসর কাল, সকল সময়েই রাজা বীরবল বাদসাহের পার্শ্বচর থাকিতেন, তাই তাঁহার মত বিচক্ষণ লোকের পক্ষে বাদসাহের উপর আধিপত্য স্থাপন করা কিছুই আশ্চর্য্যের কথা নয়। বাদসাহের হিন্দুধর্ম্মে আস্থা তাঁহারই আধিপত্যের ফল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। রাজা বীরবলের এইরূপ আধিপত্যে অন্যান্য সকলেই তাঁহার উপর খড়গহস্ত ছিলেন, শুধু বাদসাহের একান্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন বলিয়াই তাঁহার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়াও কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। রাজা বীরবল আকবরসাহের বিশ্বস্ত মন্ত্রিরূপে স্বদেশে ও বিদেশে অনেক দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, অবশেষে রাজাজ্ঞায় বিরুদ্ধাচারী ইউসুফজাই আফগানদিগকে দমন করিতে যাইয়া ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।

রাজা বীরবলের প্রাসাদ আজিও সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রস্তরগাত্রে কারুকার্য এখনও বেশ স্পষ্ট রহিয়াছে। কীন সাহেব প্রাসাদের প্রশংসা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন "as if a Chinese ivory worker had been employed upon a cyclopean monument." বস্তুতঃ দৃঢ় প্রস্তরে এরূপ কাজ দানবীয় বলিয়াই মনে হয়। রাজা বীরবলের প্রাসাদে এখন আগ্রার কালেক্টরের অনুমতি লইয়া দর্শকেরা থাকিতে পারেন; তাহারও বন্দোবস্ত আছে।

যোধবাই মহলের উত্তরে অন্তঃপুরমহিলাদের মসজিদ ও তৎসংলগ্ন বাগান, বাগানের দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে ছোট চৌবাচ্চা। এই সকলের পর বহুদূরব্যাপী ধ্বংসাবশেষ; সর্ব্বত্রই স্তূপাকার প্রস্তর। ইহারই নিকটে পর্ব্বতের একটু নিম্ন ভূমিতে হাতীপুল দরজা। এই দরজার খিলানের দুপাশ হইতে দুইটি প্রকাণ্ড প্রস্তর হস্তী যুদ্ধস্থলে যেন প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, কিন্তু বাদসাহ ঔরঙ্গজেবের রোষানলে পড়িয়া উহারা এখন মস্তকহীন অবস্থায় রহিয়াছে। হাতীপুল পার হইয়া "সঙ্গিন বুরুজ"—অসম্পূর্ণ দুর্গপরিবির
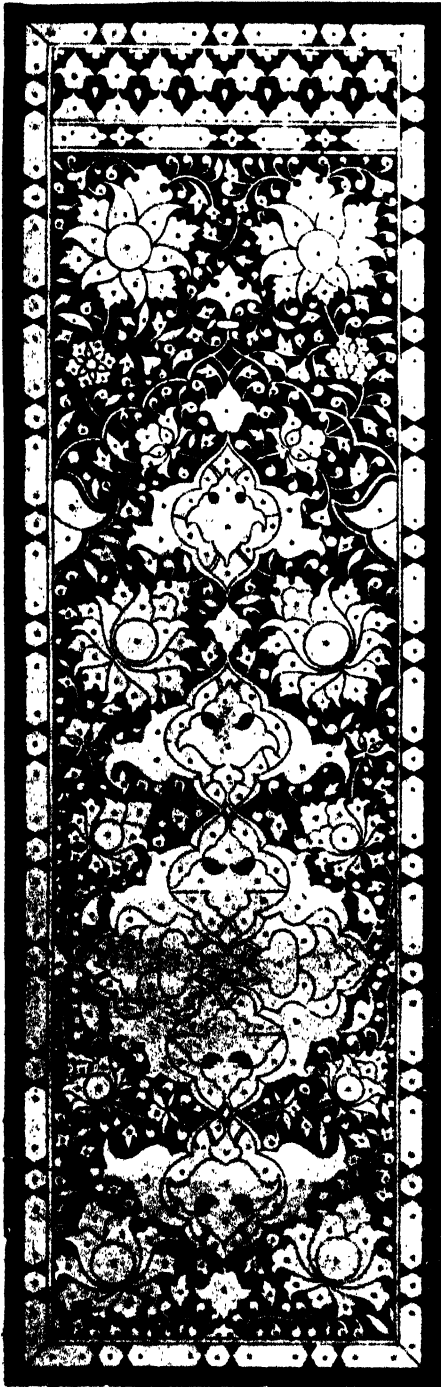
সেখ সলিম চিশ্‌তির দর্গার চাঁদোয়ার স্তম্ভে ঝিনুকের কাজ।

ভগ্নাবশেষ। ইহারই নিকটে সরাইয়ের ভগ্নাবশেষ। দেশ দেশান্তর হইতে বাণিজ্যব্যবসায়ী লোক এখানে আসিয়া আশ্রয় পাইত। আজ সকলই শ্রীহীন অবস্থায় পড়িয়াছে। অন্তঃপুর হইতে হাতীপুল পর্য্যন্ত অন্তঃপুরমহিলাদের জন্য একটি সেতুপথ ছিল; তাহার ভিতর হইতে তাঁহারা বিক্রয়ার্থ জিনিসাদি দেখিতে পাইতেন।

এখান হইতে কিছু দূর উত্তরে "হিরণ মিনার"। প্রবাদ আকবরসাহের প্রিয় হস্তীর গোরের উপর এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়; তাহারই চিহ্নস্বরূপ স্তম্ভের চতুর্দ্দিক হইতে হস্তিদন্তাকারে বহুসংখ্যক প্রস্তর দণ্ড বাহির হইয়াছে। আকবরসাহ এই মিনারের উপর হইতে শিকার খেলিতেন।

যোধবাই মহলের উত্তর পশ্চিম কোণে বিবি মরিয়মের প্রাসাদ। এই প্রাসাদে খ্রীষ্টধর্ম্মের নানা চিহ্ন আছে বলিয়া অনুমান হয় ইহা আকবরসাহের খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী মহিষীর জন্য নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। জনপ্রবাদ ও হুইলার সাহেবের মত এইরূপ। কিন্তু আইন আকবরি কিম্বা তৎসাময়িক কোনও ইতিহাসে এরূপ কোন মহিষীর উল্লেখ নাই। এই মহল "সনেরি মহল" নামেও আখ্যাত, কেননা প্রবাদ আছে এই মহলের সর্ব্বত্রই স্বর্ণাক্ষরে পারস্যকবি ফারদূসির সাহনামায় বিবৃত ঘটনাবলির অনেক চিত্র ও ফৈজিরচিত পদ্যে শোভিত ছিল। তাহা ছাড়া আরও অন্যান্য সুন্দর ধর্ম্মবিষয়ক ও অন্য প্রকারের চিত্রেরও অভাব ছিল না। এই সকল চিত্র কোথায়ও ঔরঙ্গজেবের ন্যায় গোঁড়া মুসলমানদের অতিমাত্র ধর্ম্মান্ধতার আঘাতে কোথাও বা সময়ের প্রভাবে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

বিবি মরিয়মের প্রাসাদের পূর্ব্বদিকে "খাস মহল"। খাস মহলের মাঝে দৈর্ঘ্য প্রস্থে ২১০ এবং ১২০ ফুট একটি চত্বর; চত্বরের মাঝখানে একটি প্রশস্ত চৌবাচ্চা, চৌবাচ্চার মাঝ খানে খানিকটা বসিবার জায়গা; চৌবাচ্চার চারি পার হইতে প্রস্তর সেতুদ্বারা সংলগ্ন। ইহারই দক্ষিণে "খোয়াব গা"। "খোয়াব গা" ত্রিতল অট্টালিকা। প্রথম ও দ্বিতীয় তলে বিশেষ কিছুই নাই, প্রস্তরের স্তম্ভের উপর প্রস্তরের ছাদ, সব দিকেই বাতাস খেলিতে পারে। তৃতীয় তলে একটী প্রকোষ্ঠ, প্রকোষ্ঠের চারিদিকে বারেন্দা।

বারেন্দার চারিধারে চালার মত হেলান প্রস্তরের ছাদ; আকবরসাহ ইচ্ছা করিয়াই যেন প্রস্তরদ্বারা মাটির কাজ করাইয়াছিলেন! প্রকোষ্ঠটি দৈর্ঘ্য প্রস্থে প্রায় ৪ ফুট করিয়া; বারেন্দা প্রস্থে ৯॥ ফুট। প্রকোষ্ঠের চারিদিকে চারিটি দ্বার, দ্বারের উপরে ছোট জানালা, তাহাতে ঝিল্লিকাটা (জালিকাটা) প্রস্তরের আবরণ। প্রকোষ্ঠের উপর নীচে সর্ব্বত্রই সুন্দর চিত্রে চিত্রিত ছিল, এখন সকলই লুপ্তপ্রায়। প্রকোষ্ঠটিকে নানারূপ চিত্রে মনোরম করিবার কোনই ত্রুটি হয় নাই। বহুযত্নে Smith সাহেব কোন কোন স্থানের চিত্র আংশিক পুনরুদ্ধারে সক্ষম হইয়াছেন। কোথাও প্রাকৃতিকদৃশ্য, কোথায়ও মৃগয়াদৃশ্য আবার কোথাও বা জলে বিহার চিত্র, সকলই স্বাভাবিক। ইহার মধ্যে একটি চিত্র নিঃসন্দেহ বুদ্ধদেবের। স্মিথ সাহেবের মতে এই চিত্রে বুদ্ধদেব যমান্তকরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম বিরোধীদিগের চিরদুঃখের বিধান করিতেছেন (Journal of Indian Art and Industry, Vol. July 1894, No 47.) চিত্রটি বোধ হয় চিনাদেশীয় চিত্রকর দ্বারা চিত্রিত হইয়াছিল। এই চিত্র হইতে প্রতীয়মান হয় যে আকবরসাহ হয়ত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিয়া

বীরবলের কন্যার প্রাসাদ।

থাকিবেন। প্রকোষ্ঠের দ্বারের উপরে ফয়জিরচিত আকবর সাহের স্তুতিবাদ। স্তুতিবাদের নমুনা—"এই প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশের ধূলি স্বর্গের অপ্সরাগণ নেত্রকজ্জল রূপে ব্যবহার করিতে পারেন"। "যাহারা স্বর্গদূতদের মত এই প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে তাঁহাদের মস্তক অবনত করিবেন, তাঁহারা শুকতারার (venus) মত উজ্জ্বল হইবেন"। "স্বর্গের দ্বাররক্ষক এই প্রাসাদের অঙ্গন (Floor) আরসিরূপে ব্যবহার করিতে পারেন"। "এই প্রাসাদ স্বর্গের অনুরূপে নির্ম্মিত" ইত্যাদি। "খোয়াবগা" অর্থে "স্বপ্ন মন্দির"। বোধ হয় এই প্রাসাদ আকবরসাহের শয়নমন্দির রূপে ব্যবহৃত হইত।

খাস মহলের উত্তরপূর্ব্ব কোণে রুমীবেগমের প্রাসাদ। রুমীবেগমের অস্তিত্বসম্বন্ধে ঐতিহাসিক কোনও মূল নাই। স্তাম্বুলি বেগমের প্রাসাদ একতালা একটি প্রকোষ্ঠ হইলেও ভিতরে ও বাহিরে প্রস্তরের উপর খোদাই কাজ খুব উঁচু-

দয়ের। বস্ত্র ফলফুল ইত্যাদি অতি স্বাভাবিক ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকোষ্ঠের প্রস্তর প্রাচীরে খোদাই পশুপক্ষী ইত্যাদির যে সব অংশ ঔরঙ্গজেবের রোষানলে বিধ্বস্ত হয় নাই, তাহা হইতে তাহাদের বিষয়ও অনুমান করা যায়। সেগুলিও অতি সুন্দর স্বাভাবিক হইয়াছিল। পশু পক্ষী সকলেই মস্তকবিহীন। বাদসাহ ঔরঙ্গজেবের মত গোঁড়া মুসলমানদের বিশ্বাস স্বাভাবিক কিছু অনুকরণ করিতে গেলে ঈশ্বরের অবমাননা করা হয়। অন্যদিকে প্রশস্তমনা আকবরসাহ মনে করিতেন, শিল্পী চিত্রকর সকলেই স্বাভাবিক কিছু অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাইলে বুঝিতে পারে তাহাদের শক্তি সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের শক্তির তুলনায় কত অকিঞ্চিৎকর। খাস মহল অন্তঃপুরের অন্তর্গত বলিয়া চারিদিক ঝিল্লিকাটা প্রস্তরের বেড় (প্রাচীর) দ্বারা ঘেরাও ছিল। স্থানে স্থানে তাহার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু প্রায়ই সব অদৃশ্য হইয়াছে।

খাস মহলের উত্তরপশ্চিম কোণে অন্তঃপুরের ছেলে মেয়েদের স্কুল ছিল বলিয়া প্রবাদ। তাহারই পাশে পশ্চিম দিকে পাঞ্চ মহল। এই অট্টালিকাটি অন্যান্য সকল প্রাসাদ হইতে একটু স্বতন্ত্ররকমের; নীচের তলা হইতে উপরে ক্রমে ছোট হইয়া গিয়াছে, সবদিকেই খোলা। নীচের তলায় ৫৬টি স্তম্ভ, সর্ব্বোপরি পঞ্চমতলায় মাত্র চারিটি স্তম্ভ। স্তম্ভগুলির বিশেষত্ব আছে, সকল গুলিই প্রায় ভিন্ন রকমের খোদাই। এই অট্টালিকাটিতে বিশেষ কি প্রয়োজন সংসাধিত হইত, বুঝা কঠিন। অট্টালিকার উপর হইতে চারিদিকের দৃশ্য বেশ দেখায়। অট্টালিকাটি অনেক জায়গায় ধ্বংস পাইতেছিল। সুখের বিষয় বড় লাট লর্ড কর্জ্জনের আদেশে বিভিন্ন প্রাসাদ গুলির যথাসম্ভব জীর্ণসংস্কার হইয়াছে ও হইতেছে। বিশেষ রুমী বেগমের মহালের ভিতরদিককার ছাদ ও ঝিল্লিকাটা বেড় (প্রাচীর) বড়ই দুরবস্থায় পড়িয়াছিল। এই সকল নূতন কাজ "নয়াকাম" বলিয়া টিকিট মারিয়া রাখা হইয়াছে।

খাস মহলের উত্তরের চত্বরে একটি দশপঁচিশ খেলিবার সুবৃহৎ ঘর অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রবাদ তাহার কোঠা গুলিতে সুসজ্জিতা রমণীরা গুটির স্থান অধিকার করিতেন। চত্বরের উত্তরে "দেওয়ানি খাস" বা এক থাম্বা। বাহির হইতে প্রাসাদটি দ্বিতল বলিয়া মনে হয়। ভিতরে মাঝখান হইতে একটি বৃহদায়তন স্তম্ভ উঠিয়াছে; স্তম্ভের মস্তক চারিকোণ হইতে চারিটি ১০ ফুট লম্বা প্রস্তর সেতুদ্বারা চারিপাশের বারেন্দার সহিত সংলগ্ন; দক্ষিণদিককার বারেন্দা হইতে দূরে ফতেপুর-সিক্রির বসতির দৃশ্য দেখা যায়। এক থাম্বার প্রকাণ্ডদেহ একটি মাত্র প্রস্তর হইতে কাটিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। স্তম্ভের উপর সমঅষ্টকোণ একটি বসিবার স্থান। প্রবাদ আকবর সাহ এখানে বসিয়া, চারিকোণে তাঁহার প্রধান মন্ত্রিচতুষ্টয় খানিখানান (সরদারের সরদার), বীরবল, আবুল ফজল এবং ফয়জির সহিত মন্ত্রণা করিতেন এবং বিশেষ বিশেষ রাজাজ্ঞা দিতেন। আর এখানেই নানা ধর্ম্মেরও আলোচনা হইত। আকবরসাহ মাঝে বসিয়া তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। এই সকল আলোচনায় আবুল ফজলেই বাদসাহের প্রধান সহায় ছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে কাহারও তিষ্ঠিবার যো থাকত না।

"দেওয়ানি খাসের" পশ্চিমে "আঁখমিচোনি"। প্রবাদ আকবরসাহ এখানে অন্তঃপুরমহিলাদের লইয়া লুকোচুরী খেলিতেন। কিন্তু অন্তঃপুর হইতে এত দূরে এবং "দেওয়ানি খাসের" এত নিকটে বলিয়া ও দৃঢ় গঠন দেখিয়া কীন সাহেব অনুমান করেন এস্থানে ধনাগার ছিল।

আঁখমিচৌনির নিকটেই আর একটি ছোট রকমের অট্টালিকা আছে, তাহাতে একজন বৈষ্ণব সাধু থাকিতেন বলিয়া প্রবাদ। মকরমুখাকৃতি কারুকার্য্য দেখিয়া ফর্গুসন সাহেব অট্টালিকাটি জৈন ভাবের বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আগ্রা দুর্গের যোধবাই মহল এইরূপ কারুকার্য্যে পূর্ণ।

যে চত্বরে পচিশির ঘর রহিয়াছে, তাহারই পূর্ব্বদিকে "দেওয়ানি আম"। দ্বিতলের একটী প্রকোষ্ঠে বাদসাহ সর্ব্বজন সমক্ষে বসিয়া বিচারাদি করিতেন। তাঁহারই সম্মুখে নীচে দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ৩৬০ ও ১৮০ ফুট এক চত্বর। চত্বরের চারিদিকে বারেন্দা। সম্মুখে ও পাশের বারেন্দায় রৌদ্র বৃষ্টি হইতে আশ্রয় লইয়া সাধারণ লোকে বাদসাহের বিচারাদি দেখিতে পাইত। বাদসাহ যে স্থান হইতে বিচারাদি করিতেন, সে স্থানে যাইবার তত সহজ পথ নাই। তাঁহার প্রকোষ্ঠের দুপাশেই ঝিল্লিকাটা প্রস্তর প্রাচীর অন্য সকলকার হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।
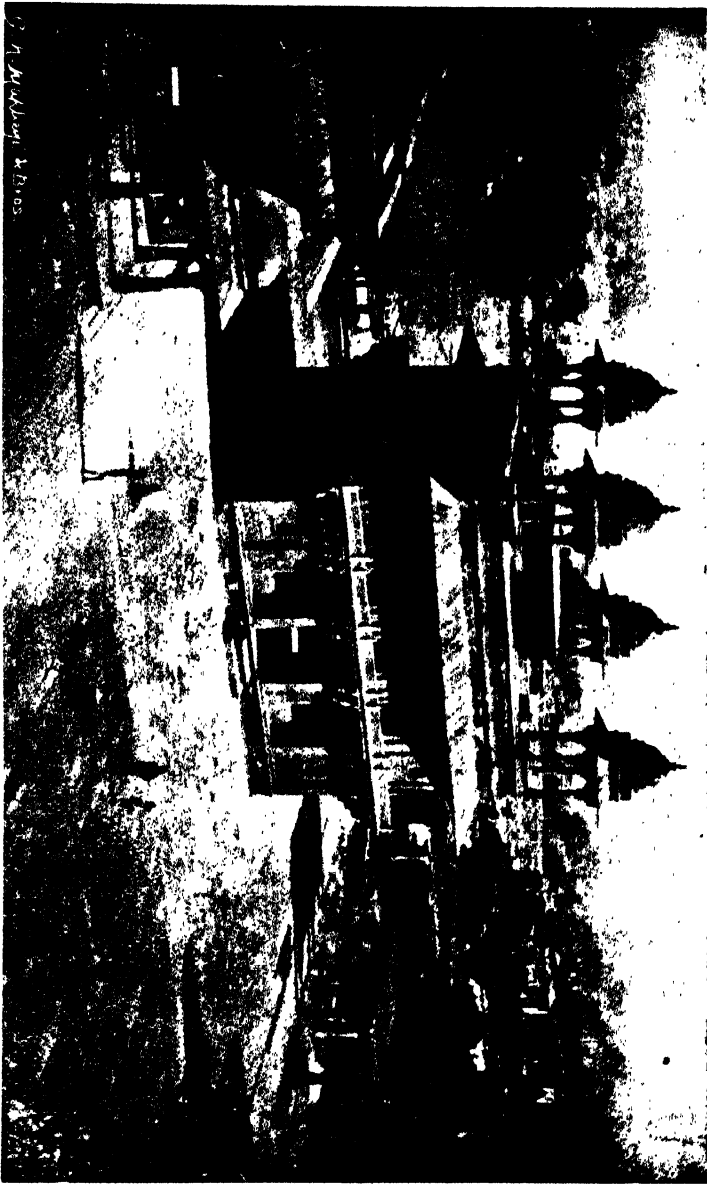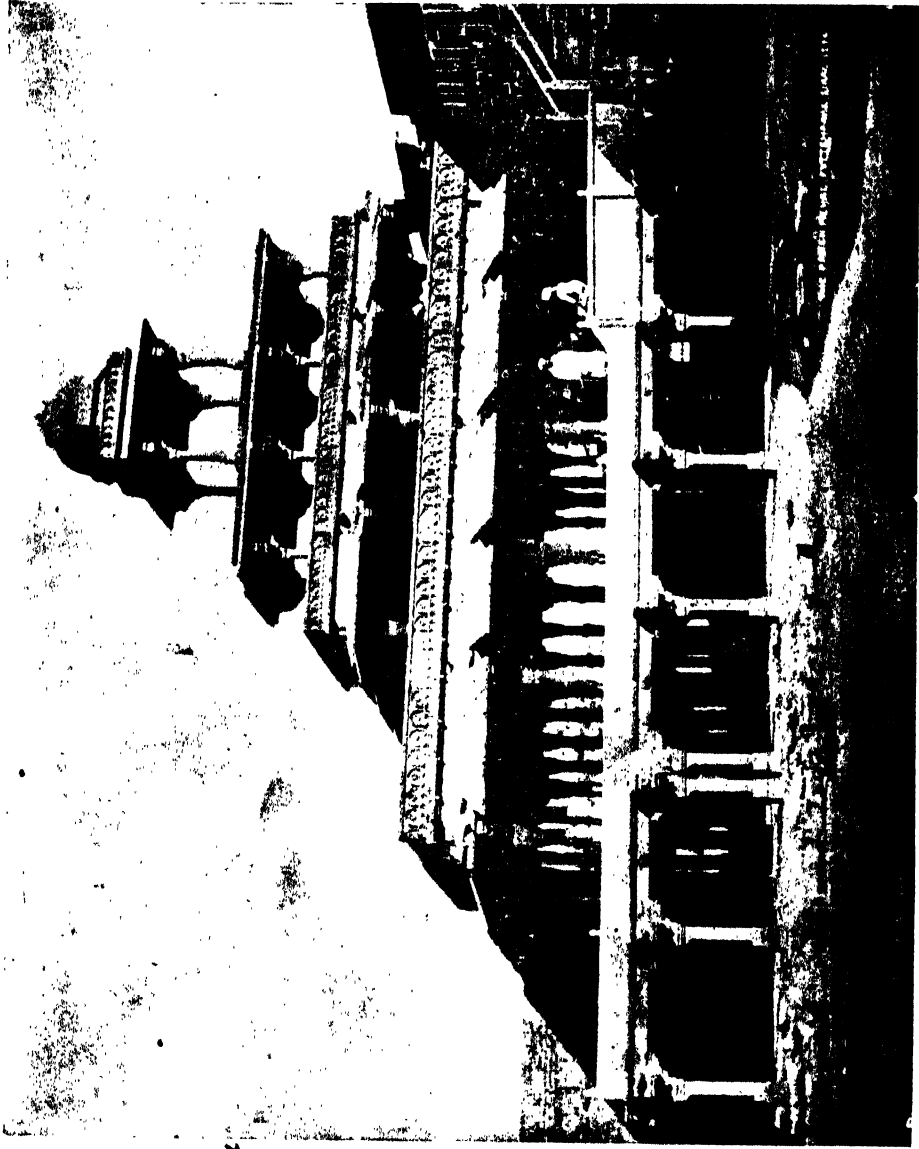
দেওয়ান-ই-খাস — ফতেপুরসিক্রী।

পঞ্চমহল—ফতেপুরসিক্রী।

INDIAN PRESS.

রুমীবেগমের গৃহ—ফতেপুরসিক্রী।

বীরবলের প্রাসাদ—ফতেপুরসিক্রী।
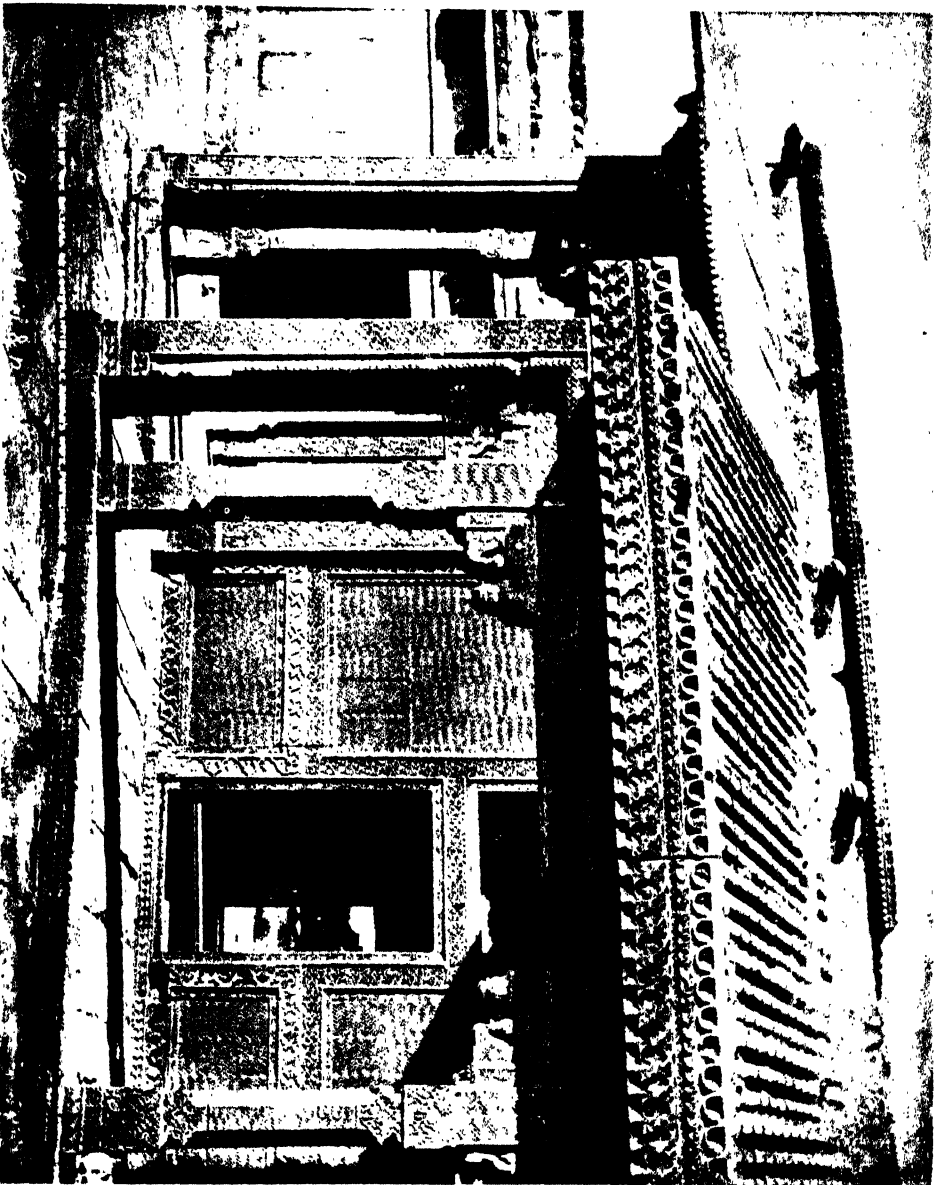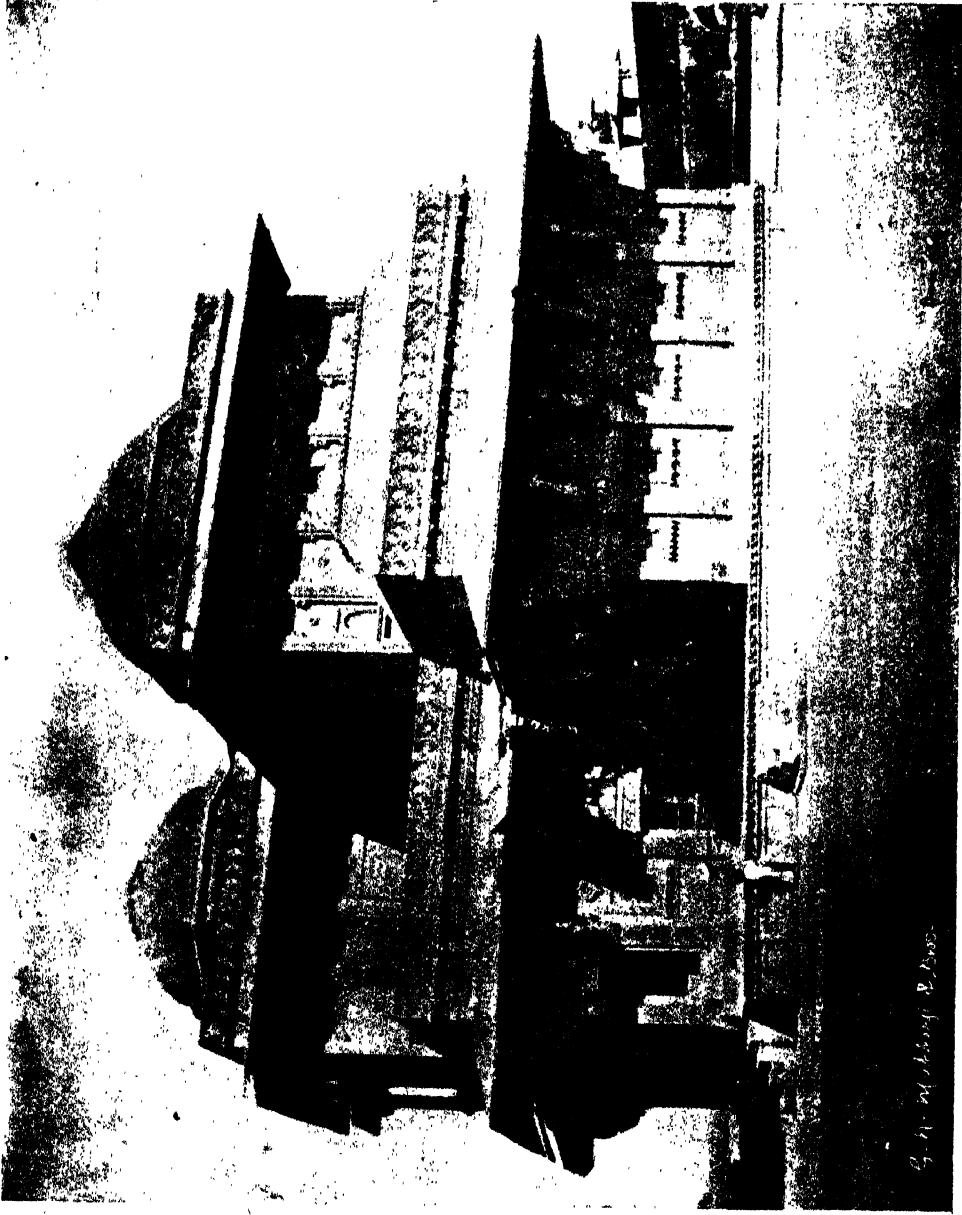
দেওয়ানিআমের চত্বরের উত্তরপূর্ব্বদিকে ডাকবাঙ্গলার সেই রাস্তাটী আসিয়া মিশিয়াছে। এই রাস্তার উত্তর দিকে টাঁকশালের ধ্বংসাবশেষ, কিন্তু সেখানে টাঁকশাল সংক্রান্ত কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। এই পথ দিয়া প্রবেশ করিয়া চত্বরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া "খোয়াবগার" পশ্চাতে দক্ষিণ দিকে ডাক বাঙ্গলার নিকটে আসিয়া গাড়ী থামে। চত্বরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া বাহিরে আসিলে পশ্চিম কোণে "হাম্মাম" বা স্নানাগার। স্নানাগারেও নানা রূপ চিত্র ছিল, এখন সকলই লুপ্তপ্রায়, শেষদশায় রহিয়াছে। স্মিথ সাহেব স্থানে স্থানে তাহারও উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন; Journal of Indian Art and Industry, vol vi, No. 47 কাগজে তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা দিয়াছেন।

"হাম্মামের" দক্ষিণে ও খোয়াবগার পশ্চাতের চত্বরের পূর্ব্ব দিকে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রাজবৈদ্যের আবাস নিহিত রহিয়াছে বলিয়া প্রবাদ।

এই চত্বরের দক্ষিণ সীমায় আজকাল ডাকবাঙ্গলা; পূর্ব্বে ইহাই "দপ্তরখানা" (Record office) ছিল বলিয়া কথিত হয়। এই স্থানটা খাস মহল ইত্যাদি অপেক্ষা অনেক নিম্ন ভূমিতে। এখান হইতে সলিমচিস্তির দর্গার পূর্ব্বদ্বারে একটি পথ চলিয়া গিয়াছে। সে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া পুনরায় বুলন্দদরজায় আসা যায়। বুলন্দদরজার বামপাশে প্রকাণ্ড বাঁধান ইন্দারা। তাহার জল এখন অব্যবহার্য্য। বুলন্দদরজার দক্ষিণে দৃঢ় প্রশস্ত প্রস্তর সোপানাবলি নিম্নভূমিতে নামিয়াছে। আধুনিক ফতেপুর-সিক্রি ইহারই পূর্ব্বদিকে; যথেষ্ট বসতি থাকিলেও শ্রীহীন বাড়ী রাস্তা ঘাট ইত্যাদি সেই আকবর সাহের আমলের।

যে ফতেপুর-সিক্রিতে দেশ দেশান্তরের শিল্পী আসিয়া আশ্রয় পাইত এবং যেখানে সকল শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, সেখানে আজ বাণিজ্যদ্রব্যের মধ্যে কেবল সিক্রির পাহাড়ের প্রস্তর উল্লেখযোগ্য।

ফতেপুর-সিক্রির উত্তরদিকে কিছুদূরে এক বিস্তীর্ণ হ্রদ ছিল, দৈর্ঘ্যে ৬ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় দুই মাইল হইবে। হ্রদের উত্তর দিকে পর্ব্বত এবং দক্ষিণদিকে উচ্চ বাঁধ। কখন কখনও হ্রদের জল বাঁধ ছাড়াইয়া চারিদিক প্লাবিত করিয়া যথেষ্ট ক্ষতি করিত। আকবরসাহের সময়ে এরূপ এক প্লাবনের বিবরণ আইন আকবরিতে বর্ণিত আছে। এখান হইতেই নানা উপায়ে ফতেপুর-সিক্রির বিভিন্ন স্থানের চৌবাচ্চা জলপূর্ণ করা হইত। সে সকল সরঞ্জাম এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট টমাসন সাহেবের সময়ে এই হ্রদের জল সেচন করিয়া ফেলা হইয়াছে। তদবধি লোকেরা সেখানে শস্যাদি জন্মাইতেছে।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

৩। নাট্য বিচার।

সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক অধ্যাপক ওয়েবর বলেন,—দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতপ্রান্তে কিয়ৎকালের জন্য যে যবনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার সংস্রবে গ্রীকনাট্যের অনুকরণে ভারতীয় নাট্যসাহিত্য জন্ম গ্রহণ করে। এ কথা সত্য হইলে, ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে গ্রীকনাট্যের ছায়া বর্ত্তমান থাকিত। অধ্যাপক ওয়েবর সেরূপ কোন ছায়া আবিষ্কারে অক্ষম হইয়াও, কেবল কয়েকটি অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া স্বমত প্রচারিত করিয়াছেন।* তাঁহার ইতিহাস বিবিধ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রামাণিক গ্রন্থরূপে অধীত ও অধ্যাপিত হইয়া আসিতেছে। তৎসূত্রে ভারতীয় নাট্যসাহিত্য গ্রীকনাট্যের অনুকৃতি মাত্র বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য কিনা, তাহার সমালোচনা আবশ্যক।

মধ্যএসিয়ায় গ্রীক রাজ্যের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দিগ্বিজয়ী সেকন্দর শাহের সেনানায়কগণের চেষ্টায় কিয়ৎকালের জন্য ভারতপ্রান্তে যে যবন রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতীয় শিক্ষা দীক্ষার প্রভাবই প্রবল ছিল। সেই অত্যল্পকালস্থায়ী যবনরাজ্যই যে ভারতীয় কলানৈপুণ্যের শিক্ষাক্ষেত্র, এরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিবার মত যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য রূপক ও উপরূপক নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে রূপক সমধিক পুরাতন। ভরতবিরচিত নাট্যশাস্ত্রে উপরূপকের উল্লেখ নাই; সমগ্র নাট্যসাহিত্য রূপক নামেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই শ্রেণী-বিভাগ ভার-

*Weber's History of Indian Literature, P. 207.

তীয় নাট্যসাহিত্যের বিশেষত্ববিজ্ঞাপক। অন্য কোন সভ্য সমাজের নাট্যসাহিত্যে এরূপ শ্রেণীবিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা অনুকরণ-বাদের অনুকূল নহে।

কোন্ সময়ে উপরূপকের আবির্ভাব হয়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। রূপক ও উপরূপক শ্রেণীর আদিগ্রন্থ কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা এখনও বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে মৃচ্ছকটিককেই অধ্যাপক ওয়েবর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মৃচ্ছকটিক প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত বলিয়াও স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং অধ্যাপক ওয়েবরের সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, মৃচ্ছকটিককে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের আদিযুগের গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু মৃচ্ছকটিক এরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করে না।

মুদ্রাযন্ত্র প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষের ন্যায় বহুবিস্তৃত মহাদেশে পুরাতন গ্রন্থ বিলুপ্ত হওয়া বিস্ময়ের ব্যাপার নহে। নাট্যসাহিত্যের পক্ষে তাহা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার; নাট্যগ্রন্থ অধীত হইত না, অভিনীত হইত। নাট্যশালা ও নাট্যামোদীর গৃহই তাহার প্রধান আশ্রয়স্থান ছিল। রুচিপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যশালায় নূতন নূতন নাট্যগ্রন্থের অভিনয় সম্পাদিত হইত; প্রয়োজন ও অনুরাগের অভাবে পুরাতন নাট্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পরিত্যক্ত ও বিলুপ্ত হইবার অনুকূল কারণের অভাব ছিল না। শতবর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে যে সকল কবি, পাঁচালী ও যাত্রার পালা প্রচলিত ছিল, তাহার পাণ্ডুলিপি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পুরাতন নাট্যসাহিত্যও সেই স্বাভাবিক নিয়মে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং দ্বিসহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন নাট্যগ্রন্থ না দেখিয়া, কেবল সেই কারণে, তৎপরবর্ত্তী সময়ে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের জন্মকাল নির্দ্দেশ করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে নাট্যসাহিত্যের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কিনা, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া অধ্যাপক ওয়েবর কয়েকটি ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে শৈলালী, কৃশাশ্বী, শৈলূষ, ভরত, ভরতপুত্র, নট প্রভৃতি শব্দে অভিনেতাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সূত্রধার শব্দও অভিনেতৃ বিশেষকে সূচিত করে। এই সকল শব্দের মধ্যে সূত্রধার, শৈলালী ও কৃশাশ্বী শব্দ নট শব্দের ন্যায় বহু পুরাতন, বৈদিক সাহিত্যেও অপরিচিত নহে। পাণিনির বার্ত্তিকে শৈলালী ও কৃশাশ্বী শব্দ নট নামে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং তাহারা যে নাট্যসূত্র অভ্যাস করিত, তাহারও আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। অধ্যাপক ওয়েবর ধাত্বর্থ বিচার করিয়া ইহাদিগকে নর্ত্তক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধাত্বর্থ অনুসরণ করিয়া সকল কথারই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; পঙ্কজকেও শেওলা বলিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায়! কিন্তু ভারতবর্ষে নৃত্য গীত অভিনয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পৃথক প্রাদুর্ভূত হওয়ার প্রমাণ নাই। নৃত্য গীত ও অভিনয় একসঙ্গেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। পুরাতন বৌদ্ধগ্রন্থেও নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ আছে। অধ্যাপক ওয়েবর ঐ সকল গ্রন্থের সমধিক প্রাচীনত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া স্বমত রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত ভারতীয় গ্রন্থে নাট্যাভিনয়জ্ঞাপক শব্দের অভাব নাই; তাহাকে নৃত্যগীত বোধক সংকুচিত অর্থে ব্যাখ্যা না করিলে, অধ্যাপক ওয়েবর স্বমত রক্ষা করিতে পারিতেন না। ইহার সমালোচনা অনাবশ্যক। ইহাকে স্বমতান্ধতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রস ভাব ও বিষয় ভেদেই রূপক নাট্য দশ ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকিবে। কোন রূপক বীররসপ্রধান; কোন রূপক রৌদ্র, করুণ, বা হাস্যরসপ্রধান; কোন রূপক আবার কেবল শৃঙ্গার রসের আধার। সমবকার ও ভাণ বীররসপ্রধান। ডিম রৌদ্ররসে পরিব্যাপ্ত। অঙ্কে করুণরস প্রবল। ব্যায়োগে হাস্য, শৃঙ্গার ও করুণরসের অভাব। প্রহসনে আবার হাস্যরসই উচ্ছ্বসিত। নাটক, প্রকরণ ও ঈহামৃগ শৃঙ্গাররসাত্মক। এই রসপার্থক্য ধরিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, নাট্যোৎপত্তিকালে হাস্য, করুণ ও শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। প্রথমে জয়োল্লাসের আনন্দই মানবসমাজের প্রধান আনন্দ বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রার্থনায় জয়াশা উৎসবে জয়ঘোষণা—ইহাই সর্ব্বত্র অভিব্যক্ত। মানবসমাজ যথেষ্ট রূপে শৃঙ্খলানিবদ্ধ সমাজতন্ত্রের শান্তিসুখ উপভোগ করিবার পূর্ব্বে হাস্য, করুণ বা শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য স্থাপিত

হইতে অবসর পায় না। যে সকল নাটক বর্ত্তমান আছে, তাহা প্রধানতঃ হাস্য, করুণ ও শৃঙ্গাররসাত্মক ; পুরাতন বীর-রৌদ্র রসের আতিশয্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। সে সকল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রুচিপরিবর্ত্তনে তাহার আদর চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবার কথা নহে।

নাট্যসাহিত্যের আখ্যানবস্তু প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। কোন গ্রন্থে প্রখ্যাত ইতিবৃত্ত, কোন গ্রন্থে বা কবিকল্পিত লৌকিকবৃত্ত হইতে আখ্যানবস্তু সংকলিত। রূপক নাট্যের মধ্যে প্রকরণ, ভাণ এবং প্রহসন ভিন্ন অন্য কোন রূপকে কবিকল্পিত লৌকিক বৃত্তের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রখ্যাতবৃত্ত এবং কবিকল্পিত লৌকিকবৃত্তের মধ্যে কোন বৃত্ত হইতে আখ্যানবস্তু প্রথমে গৃহীত হওয়া সম্ভব? যাহা লোকসমাজে সর্ব্বত্র সুপরিচিত তাহাই সকলদেশে প্রথমে গৃহীত হইয়াছে। ইহাই মানবস্বভাবসুলভ সরল পথ। সেই পথে চলিতে চলিতে কবিকল্পনা প্রয়োজনবশতঃ প্রখ্যাতবৃত্তকে কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তরিত করিতে গিয়া লৌকিক বৃত্ত অভ্যাস করে ; কালে লৌকিক বৃত্ত সম্পূর্ণরূপে আখ্যানবস্তুর উপাদান হইতে সক্ষম হয়। অধ্যাপক ওয়েবর বলেন, ভারতবর্ষে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া প্রথমেই কবিকল্পিত লৌকিক বৃত্ত, পরে প্রখ্যাত বৃত্ত গৃহীত হইয়াছিল। ইহা অবশ্যই অনুমান মাত্র। কিন্তু এরূপ অনুমান না করিয়া তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না। কারণ, তাঁহার মতে "মৃচ্ছকটিক" সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, প্রায় দ্বি-সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত। সেই মৃচ্ছকটিক কবিকল্পিত লৌকিকবৃত্তমূলক প্রকরণজাতীয় দৃশ্যকাব্য। ভারতবর্ষে স্বাভাবিক পদ্ধতির ব্যতিক্রম না ঘটিয়া থাকিলে, দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন প্রকরণ দেখিয়া বলিতে হইবে—তাহার বহুপূর্ব্বে প্রখ্যাতবৃত্ত প্রচলিত ছিল। অগত্যা অধ্যাপক ওয়েবর ভারতবর্ষে মানবচিত্তবৃত্তির ক্রমবিকাশের এক স্বতন্ত্র পদ্ধতির অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ভারতীয় নাট্যোৎপত্তির ইতিহাস কিংবদন্তিমাত্রে পরিণত হইয়াছে। ইহাও প্রাচীনত্বের নিদর্শন। এত পুরাতন, যে তাহার জন্মকথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে! ভরতমুনি যখন নাট্যোৎপত্তির ইতিহাস সংকলনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, তখনও কিংবদন্তির অধিক আর কিছু বর্ত্তমান ছিল না। তদনুসারে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে নাট্যোৎপত্তির পর সর্ব্বপ্রথম যাহা অভিনীত হয়, তাহা সমবকার শ্রেণীর রূপক, নাম—"সমুদ্র-মন্থন," বিষয়—দেবাসুরের কলহ-কাহিনী। ইহা বিশ্বাসযোগ্য সম্ভবপর কথা। কারণ, পুরাকালে দেবাসুরের কথাই সর্ব্বত্র প্রখ্যাত ছিল। নাট্য-সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে অবলম্বন করাই স্বাভাবিক। অধ্যাপক ওয়েবর ভরত-নাট্যশাস্ত্র বা তল্লিখিত নাট্যোৎপত্তি-প্রসঙ্গের কোন সমালোচনা বা উল্লেখ করেন নাই।

রূপকের মধ্যে নাটক এবং প্রকরণই সর্ব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ গ্রন্থ ;—পাঁচ হইতে দশ অঙ্কে বিভক্ত। এরূপ বৃহৎ গ্রন্থ প্রথমে রচিত হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ডিম ও ঈহামৃগ অঙ্কচতুষ্টয়ে সমাপ্ত। সমবকার তিন অঙ্কে সীমাবদ্ধ। অন্যান্য রূপক এক অঙ্কেই পরিসমাপ্ত। যাহার অঙ্কসংখ্যা নিতান্ত অল্প, সেরূপ রূপক প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে ; যাহার অঙ্কসংখ্যা অধিক ; তাহাই বর্ত্তমান আছে। এই অঙ্কবিভাগপ্রণালী দেখিয়াও, মৃচ্ছকটিককে ভারতীয় নাট্যোৎপত্তির বহুপরবর্ত্তী যুগে রচিত বলিয়া অনুমান করিতে হয়।

দশরূপকের মধ্যে ভাষা ও লাস্যাঙ্গের পার্থক্যও যথেষ্ট। কোন রূপকে সংস্কৃত বাক্যাবলির আধিক্য ; কোন রূপকে আবার প্রাকৃতের প্রাবল্য। কোন রূপকে পদ্যের বাহুল্য ; কোন রূপকে গদ্যের আতিশয্য। কোন রূপকের সঙ্গীত সরল, কোন রূপকের সঙ্গীত নিতান্ত জটিল। মৃচ্ছকটিকে গদ্যের বাহুল্য, প্রাকৃতের প্রাবল্য, সঙ্গীতের সমুন্নতাবস্থা পরিব্যক্ত। নাট্যসাহিত্যের পরিপক্কাবস্থায় যাহা যাহা দেখিতে আশা করা যায়, মৃচ্ছকটিকে তাহার অভাব নাই। সুতরাং ভারতীয় নাট্যসাহিত্য যে মৃচ্ছকটিকের বহুপূর্ব্বে অভ্যুদিত হইয়াছিল, তাহাই সঙ্গত সিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয়।

শাক্যসিংহের আবির্ভাবের দুইশত বৎসর পরেও ভারতবর্ষ গ্রীসদেশের সকল লোকের নিকট সুপরিজ্ঞাত ছিল না। সেকন্দর শাহ পারস্যজয় সাধন করিয়া ভারতসীমায় উপনীত হইবার পরবর্ত্তী সময় হইতেই গ্রীস এবং ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ সংযোগের আরম্ভ। শাক্যসিংহের সময়ে এরূপ সংস্রব বর্ত্তমান ছিল না। কিন্তু তখনও ভারতীয় নাট্য-

সাহিত্যের কথা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছিল। অধ্যাপক ওয়েবর এই সকল বৌদ্ধ গ্রন্থকে আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই; সেগুলি যথার্থই পুরাতন কিনা তাহাতে কিঞ্চিৎ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। প্রথমে সিদ্ধান্ত স্থাপনা করিয়া পশ্চাৎ তাহাকে সমর্থন করিতে গিয়া অধ্যাপক ওয়েবর এইরূপ অনেক তর্কের যথাযোগ্য মীমাংসা করিতে অগ্রসর হন নাই।

সকল শ্রেণীর নাট্যসাহিত্য সকল শ্রেণীর লোকের চিত্ত বিনোদনে সমর্থ হয় না। সুতরাং জনসমাজের রুচিভেদেই যে নানাশ্রেণীর নাট্য প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সেকালে কোন্ শ্রেণীর নাট্য কোন্ শ্রেণীর লোকের চিত্তবিনোদন করিত, ভরতমুনি তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যথা—

"নানা শীলাঃ প্রকৃতয়ঃ শীলান্নাট্যং বিনির্ম্মিতং।
উত্তমাধমমধ্যানাং বৃদ্ধবালস্য যোষিতাম্॥
তুষ্যন্তি তরুণাঃ কামে বিদগ্ধাঃ সময়ান্বিতে।
অর্থেষ্বর্থপরাশ্চৈব মোক্ষেষ্বাথ বিরাগিনঃ॥
শূরাবীভৎসরৌদ্রেষু নিযুদ্ধেষ্বাহবেষু চ।
ধর্ম্মাখ্যানপুরাণেষু বৃদ্ধাস্তুষ্যন্তি সর্ব্বদা॥"

লোকভেদে রুচিভেদের ন্যায় কালভেদেও রুচিভেদ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য এক সময়ে রূপকের আদর ছিল; কালভেদে ও রুচিভেদে উপরূপক প্রচলিত হইয়াছিল। সেকালের জনসাধারণের সাহিত্যরুচি কিরূপ ছিল, নাট্যসাহিত্যে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃচ্ছকটিক যে সাহিত্যরুচির পরিচয় প্রদান করে, তাহা সমাজ ও সাহিত্যের সমুন্নত ও সমৃদ্ধাবস্থার কথা। নাট্যোৎপত্তির আদিযুগে এরূপ গ্রন্থ বিরচিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

৪। নাট্যরুচি।

রূপক সাহিত্যের নাট্যরুচি প্রথমে রাজরুচির অনুবর্ত্তন করিত। তখন রাজাই নাট্যশালার প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। তজ্জন্য রূপকে শৃঙ্গাররসের অভাব না থাকিলেও, কবিলেখনী সম্ভ্রান্ত ও সংযত ভাষার ব্যবহার করিত। রাজা, রাণী ও রাজপরিষদের বিদগ্ধমণ্ডলী অভিনয়দর্শনে সমাগত হইতেন বলিয়া, অভিনয় ব্যাপারেও সংযতভাব সুরক্ষিত হইত।

লজ্জাকরং তু যৎ।
এবং বিধং ভবেৎ যৎ যৎ তত্তৎ রঙ্গেন কারয়েৎ॥
পিতৃ পুত্র স্নুষাশ্বশ্রূদৃশ্যং যস্মাত্তু নাটকং।
তস্মাদেতানি সর্ব্বাণি বর্জ্জনীয়ানি যত্নতঃ॥

রূপকনাট্যে এই ঋষিনির্দ্দেশের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। কালভেদে রুচিভেদ প্রবর্ত্তিত হইয়া, ক্রমে কিছু কিছু অসংযত ভাব, ভাষা ও লাস্যাঙ্গ প্রচলিত হইয়াছিল। তাহা রূপকে স্থান লাভ না করায়, উপরূপকের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। কারণ, যে সকল গ্রন্থ উপরূপকশ্রেণীর অন্তর্গত, তাহাতেই এইরূপ রুচিপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

রূপকের আদিরসে আবিলতা অল্প; তাহা পরকলত্রবিষয়ক জঘন্যরস নহে; অনাবিল দাম্পত্যপ্রেমের উচ্ছ্বাস মাত্র। তখনকার মানবসমাজে ভাবগোপনের চেষ্টা বড় অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তজ্জন্য দাম্পত্যপ্রেমের চিত্রে স্বাভাবিক বর্ণাতিশয্য প্রকাশিত হইয়া পড়িত। কিন্তু তাহাও ধর্ম্মশৃঙ্গার, অর্থশৃঙ্গার ও কামশৃঙ্গার নামক ভাগত্রয়ে বিভক্ত হইয়া উত্তম, মধ্যম ও অধম আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। রূপকে অধম শ্রেণীর কামশৃঙ্গার বিরল, তাহা উপরূপকেই সমধিক অভিব্যক্ত। রূপকের নায়ক দুষ্মন্ত নায়িকা শকুন্তলার সহিত সুসঙ্গত হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় অধীর হইয়াও সংযত; উপরূপকের নায়ক রত্নাবলীর রাজা দাসী বলিয়া জানিয়াও সাগরিকাকে সম্ভোগ করিবার জন্য অসংযত, ও ব্যাকুল,—শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিতেও সমুদ্যত!

সেকালের প্রহসন কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার জন্য প্রচুর কৌতূহল থাকিলেও, কৌতূহল চরিতার্থ করিবা মত যথেষ্ট উপকরণের অভাব। প্রহসন ও ভাণ কবিকল্পিত আখ্যানবস্তু অবলম্বনে রচিত হইত। প্রহসনে ধৃষ্ট নায়কের অশালীনত্ব প্রদর্শন করিয়া লোকশিক্ষার্থ বিশুদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা করাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল বলিয়া বোধ হয়। তথাপি প্রহসনে কালক্রমে রুচিবিকার প্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে শুদ্ধ, সংকীর্ণ ও বিকৃত নামক ভাগত্রয়ে বিভক্ত করিয়া উত্তম, মধ্যম ও অধম আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। শুদ্ধ প্রহসনের নায়ক একজন—ব্রাহ্মণ বা তপস্বী। সংকীর্ণ প্রহসনে বহু ধৃষ্ট নায়কের আস্ফালন। বিকৃত তাহা অপেক্ষাও উচ্ছৃঙ্খল। হাস্যার্ণব বিকৃত প্রহসনের নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত! রূপক-

যুগের প্রহসন দেখিতে পাওয়া যায় না; যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা উপরূপক যুগের অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ,—তাহাতে রুচিবিকার সুব্যক্ত! রুচি সম্বন্ধীয় উত্তম, মধ্যম, অধম নামক শ্রেণীবিচার দেখিয়া বোধ হয়, নাট্যসাহিত্যকে সমুন্নতাবস্থায় রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ও সমালোচনা প্রচলিত হইয়াছিল।

এই সকল শ্রেণীবিভাগে নানা রুচিবৈচিত্র্য প্রচলিত হইয়াছিল। রূপকে রুচিবৈচিত্র্যের অভাব নাই; কিন্তু রুচিবিকার অল্প। যে রূপকে রুচিবিকার লক্ষ্য করা যায়, তাহা অধম শ্রেণীর গ্রন্থ। কিন্তু উপরূপকের উত্তম শ্রেণীর গ্রন্থেও রুচিবিকারের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপরূপকযুগে ভারতীয় জনসমাজ যে সংযম অপেক্ষা সম্ভোগকেই সমাদর করিতে শিখিয়াছিল, তাহার পরিচয় সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। কোন্ শ্রেণীর সাহিত্যরুচির তৃপ্তিসাধনের জন্য উপরূপকের আবির্ভাব হয়, তাহা এই সকল উপায়ে স্থিরীকৃত হইতে পারে।

সুকুমার সাহিত্যের বিশুদ্ধ কলামাধুর্য্য সকল লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় না। যাহা যথার্থই সুন্দর, জনসাধারণ অনেক সময়ে তাহারও সৌন্দর্য্য ভোগে সক্ষম হয় না। তজ্জন্যই সাহিত্যে উত্তম, মধ্যম ও অধম রুচি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইলে, জনসমাজ অশ্লীল হইতে আরও অশ্লীল নাট্য প্রার্থনা করে। তখন সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। দেশের লোকের চরিত্র ও রুচি অতিক্রম করিয়া সাহিত্য সহজে সমুন্নত হইতে সক্ষম হয় না; লোকরুচি তাহাকে নিম্নাভিমুখে আকর্ষণ করে! ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের রুচি পরিবর্ত্তনের ইতিহাসের মধ্যে এই কারণে জনসমাজের চরিত্রগত উত্থানপতনের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রস, ভাব, ভাষা ও বিষয়ভেদে ভারতীয় উপরূপক নাট্য অষ্টাদশভাগে বিভক্ত। অনেক উপরূপক সংগীতাঢ্য—গীতিনাট্যবিশেষ। কোন কোন উপরূপক ইন্দ্রজালবিদ্যার কৌশলপ্রদর্শক। অবশিষ্ট উপরূপক রূপকের মত নানা রসাশ্রিত; কেবল রুচিপার্থক্যে উপরূপক বলিয়া ভিন্ন শ্রেণীতে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে।

নাটিকা, ত্রোটক, গোষ্ঠী, সট্টক, নাট্যরাসক, প্রস্থান, উল্লাপ্য, কাব্য, প্রেক্ষণ, রাসক, সংলাপক, শ্রীগদিত, শিল্পক, বিলাসিকা, দুর্ম্মল্লিকা, প্রকরণিকা, হল্লীশ ও ভাণিকা,—এই অষ্টাদশ শ্রেণীর উপরূপকের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লাপ্য দিব্যবৃত্ত,—দেবতার লীলামৃত। শ্রীগদিত প্রখ্যাতবৃত্ত,—সুললিত সংগীতাঢ্য। ত্রোটক দিব্যমানুষবৃত্ত,—দেবলোক ও নরলোকের প্রেমপরিণাম। অন্যান্য উপরূপকে লৌকিক বৃত্তের প্রাধান্য। উল্লাপ্য ও শ্রীগদিত ব্যতীত, অন্যান্য উপরূপকের আখ্যানবস্তু কবিকল্পিত। তজ্জন্য রূপক অপেক্ষা উপরূপকে লোকচরিত্র অধিক পরিস্ফুট।

উপরূপকের মধ্যে ত্রোটকই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ,—পাঁচ, সাত, আট, অথবা নয় অঙ্কে সমাপ্ত। পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত "বিক্রমোর্ব্বশীয়" একখানি সুপরিচিত ত্রোটক। নাটিকা, শিল্পক, দুর্ম্মল্লিকা, সট্টক ও প্রকরণিকা অঙ্কচতুষ্টয়ে সীমাবদ্ধ। সংলাপক তিন অথবা চারি অঙ্কে বিভক্ত। কাব্য তিন অঙ্কে, প্রস্থান দুই অঙ্কে ও অন্যান্য উপরূপক এক অঙ্কে পরিসমাপ্ত।

সট্টকে অদ্ভুত রস। রূপকে অদ্ভুত রস বিরল। তাহা উপরূপকেই উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। দুর্ম্মল্লিকায় হাস্যরস; নাট্যরাসকে হাস্য ও শৃঙ্গার এবং উল্লাপ্যে হাস্য, শৃঙ্গার ও করুণ রস পরিস্ফুট। সংলাপকে শৃঙ্গার ও করুণ রসের অভাব; শিল্পকে হাস্য রসের অভাব; অবশিষ্ট উপরূপকে শৃঙ্গার রসের প্রাবল্য।

রূপক যুগের সাহিত্যের প্রিয় রস বীর রৌদ্র ও হাস্য। উপরূপক যুগের সাহিত্যের প্রিয় রস হাস্য ও শৃঙ্গার। করুণ রস উভয় যুগের সাধারণ সম্পৎ। রসপার্থক্য ধরিয়া বিচার করিতে হইলে বলিতে হইবে, রূপক যুগ কর্ম্মযুগ; উপরূপক যুগ সম্ভোগযুগ। সে যুগে অধিকার বিস্তারের অতৃপ্ত অধ্যবসায় অপেক্ষা অধিকৃত বিষয়ের সম্ভোগের পরিচয় অধিক। নাচ আরও নাচ; গাহ আরও গাহ; সম্ভোগের উপর সম্ভোগ ঢালিয়া দেও:—ইহাই যেন উপরূপকযুগের নাট্যসাহিত্যের প্রধান আকাঙ্ক্ষা! এই আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধনের জন্য উপরূপকের ভাব, রস, ভাষা ও বিষয়

নির্ব্বাচনে যে পার্থক্য সূচিত হইয়াছিল, তাহা ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের পরিণতাবস্থার পরিচয় বিজ্ঞাপক।

রূপকে সংস্কৃত পাঠ্যের আধিক্য। তাহা সরল, সুব্যক্ত, —অনর্থক অলংকারভারে প্রপীড়িত নহে; যেন আত্মগৌরবে সমুচ্ছ্বসিত প্রস্রবণের অনাবিল সলিলধারা! উপরূপকে প্রাকৃতের প্রাবল্য; সংস্কৃতের আড়ম্বর কেবল শব্দঝঙ্কারে ও অলঙ্কারঝনৎকারে যেন নিয়ত থন থন করিয়া উঠিতেছে।

সভাসমাজে দুই শ্রেণীর সাহিত্যরসিক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণী মার্জ্জিতরুচির অনুরাগী। ইঙ্গিতেই পরিতৃপ্ত। অন্য শ্রেণী স্থূলরুচির পক্ষপাতী;—স্পষ্ট ভাষা, স্পষ্ট ভাব ও স্পষ্ট রস প্রার্থনা করে। তজ্জন্য সাহিত্য দ্বিধা বিভক্ত। সে কালের নাট্যসাহিত্য বোধ হয় এইরূপ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া রূপক ও উপরূপক নাম ধারণ করিয়াছিল। রুচিপার্থক্যই উভয় শ্রেণীর নাট্যসাহিত্যের প্রধান পার্থক্য। সাহিত্যরুচির বিশুদ্ধভাব উপরূপকে কিয়ৎপরিমাণে বিকৃত হইলেও, ঐতিহাসিক তথ্যে উপরূপক উপাদেয়। দেবী ছাড়িয়া দাসীতে অনুরক্ত নরপতি, উত্তম ছাড়িয়া অধমে প্রেমাসক্তা উদাত্তনায়িকা, উপরূপক ভিন্ন রূপকে দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্র এবং লোকচরিত্র সমান হয় না; শাস্ত্র যাহাকে নিন্দা করে, লোকে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে সক্ষম হয় না। রূপকে শাস্ত্রমর্য্যাদা সুরক্ষিত; উপরূপকে লোকচরিত্রে বিকৃত করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা সুরক্ষিত হয় নাই। তজ্জন্য উপরূপক সমাজচিত্রে সমুজ্জ্বল। রূপকের পাত্র পাত্রী আদর্শ নরনারী; উপরূপকের পাত্র পাত্রী সংসারের রক্তমাংসের অসম্পূর্ণ জীব! তাহারা স্বাভাবিক মানুষ; তাহাদের আচার ও অধ্যবসায় গুলিও স্বাভাবিক;—সুতরাং কিছু অসংযত, কিছু অসঙ্গত, কিছু নিন্দনীয়! তজ্জন্য তাহাদের ভাষাও অপেক্ষাকৃত উচ্ছৃঙ্খল!

কি রূপক, কি উপরূপক, ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের কুত্রাপি বিয়োগান্ত আখ্যানবস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। বিয়োগান্ত আখ্যায়িকা পাঠকচিত্তে বিষণ্ণতা আনয়ন করে, বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য অভিনয়কৌশলে প্রত্যক্ষবৎ প্রদর্শিত হইয়া লোকচিত্ত প্রিয়বিয়োগকাতর করুণরসে অভিভূত করে। তাহাতে গাম্ভীর্য্য বা সৌন্দর্য্য বিনষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের মূল সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। মিলনের প্রণালী উদ্ঘাটন করিয়া মিলনানন্দে নাট্যাবসান করাই ভারতীয় নাট্যের বিশেষত্ব। তজ্জন্য কোন পাত্র বা পাত্রীর মুখ দিয়া কবি সর্ব্বশেষে বলাইতেন, "অতঃপর আর কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিব?" অভিনয়ান্তে দর্শকচিত্তে মোটের উপর যে ভাব বদ্ধমূল হয়, তাহাই স্থায়ী ভাব। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য আনন্দকেই স্থায়ী ভাব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। আখ্যায়িকা বর্ণনকালে যাহা কিছু আশঙ্কা, উদ্বেগ, পরিতাপ, পরিদেবনা, গ্রন্থশেষে তৎসমস্ত আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইত। ইহাতে ভাব ও রসের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছিল; এবং আনন্দকে সর্ব্বোপরি আসন প্রদান করায়, নাট্যসাহিত্য চিত্তবিনোদনের উৎকৃষ্ট পন্থা গ্রহণ করিয়াছিল।

অভিনয়কৌশলের ন্যায় রচনাকৌশলেও বিচিত্রতা লক্ষ্য করা যায়। রচনাকৌশলের সাধারণ নাম বৃত্তি। তাহা ভারতী, সাত্বতী, কৈশিকী, ও আরভটী নামক চারিভাগে বিভক্ত। বৃত্তিচতুষ্টয়ের ন্যায় প্রবৃত্তিচতুষ্টয়ও পরিচিত ছিল;—তাহার নাম আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, পাঞ্চালী, ও ওড্রমাগধী। রসভেদে বৃত্তি এবং দেশভেদে প্রবৃত্তি প্রচলিত হইয়া ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যে এত বিচিত্রতা আনয়ন করিয়াছিল।

শৃঙ্গারে কৈশিকী, বীরে সাত্বতী, রৌদ্র ও বীভৎসে আরভটী এবং শান্তাদি রসে ভারতী বৃত্তি প্রযুক্ত হইত। উপরূপকে কৈশিকী বৃত্তির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। দাক্ষিণাত্যে কৈশিকী বৃত্তির সমাদর ছিল; অবন্তী প্রদেশে সাত্বতী ও কৈশিকী বৃত্তি মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিল; পাঞ্চালদেশে সাত্বতী ও আরভটী বৃত্তির প্রাবল্য সংস্থাপিত হইয়াছিল।

বৃত্তি ও প্রবৃত্তি ধরিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়,—ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বীর, রৌদ্র ও বীভৎস রসের আতিশয্য থাকায়, তত্তৎ দেশে উপরূপক অপেক্ষা রূপকের আদর অধিক ছিল। অবন্তী প্রদেশে বীর ও শৃঙ্গার রসের আতিশয্য থাকায়, তথায় রূপকের ন্যায় উপরূপকেরও প্রভাব প্রকাশিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গাররসের আতিশয্য থাকায়, তথায় রূপক অপেক্ষা উপরূপকই সমধিক সমাদর লাভ করিয়াছিল। এই সিদ্ধান্তের অনুকূল

প্রমাণের অভাব নাই। উপরূপক শ্রেণীর অধিকাংশ গ্রন্থই অদ্যাপি দাক্ষিণাত্যে বর্ত্তমান; আর্য্যাবর্ত্তে রূপকেরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। আর্য্যাবর্ত্ত অপেক্ষা দাক্ষিণাত্য কিয়ৎপরিমাণে অনুন্নত থাকায়, তথায় রূপকের মার্জ্জিতরুচির সমাদর প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। বৃত্তি ও প্রবৃত্তি অবলম্বনে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের সমালোচনা করিবার সময়ে, কোন গ্রন্থ কোন্ যুগে কোন্ দেশে প্রচলিত হইয়াছিল; তাহা দেশান্তরে নীত হইয়া, কি জন্য কোন কোন স্থলে পাঠান্তর প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার সমস্ত কার্য্যকারণ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তন্মধ্যে আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের বিবিধ প্রদেশের লোকচরিত্রের যে প্রচ্ছন্ন ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই সমগ্র সমালোচনাশ্রম সার্থক হয়।

ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের প্রকৃতি ও রুচি বিচার করিলে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে কেবল ভারতীয় বিশেষত্বই লক্ষ্য করা যায়। গ্রীকনাট্যের অনুকরণে ভারতীয় নাট্যসাহিত্য সমুদ্ভূত হইলে, এত বিচিত্রতা প্রবেশ করিতে পারিত না। এই বিচিত্রতা ভারতবর্ষের জনসাধারণের বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ রুচির উপযোগী; পাশ্চাত্য সাহিত্যে এরূপ রুচি বর্ত্তমান ছিল না। ভারতীয় নাট্যসাহিত্য যে সেকালে কেবল ভারতবর্ষেই প্রচলিত ছিল, তাহা বোধ হয় না। ভরতবিরচিত নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায়, ভারতবর্ষের বাহিরে বাহ্লীকাদি রাজ্যেও ভারতীয় নাট্যগ্রন্থের অভিনয় সম্পাদিত হইত। সেকালে ভারতীয় শিক্ষা দীক্ষার প্রভাব সমগ্র এসিয়াখণ্ডে বিস্তৃত হইয়া ভূমধ্যসাগরতীরপর্য্যন্তও ভারতবর্ষের কলানৈপুণ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ভারতীয় গণিত ও শিল্পের ন্যায়, ভারতীয় নাট্যকলাও যে পাশ্চাত্য রাজ্যে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিয়া তত্তৎদেশে কালক্রমে শিক্ষা ও সমুন্নত কলানৈপুণ্য বিস্তৃত করিয়াছিল, তাহাই বরং সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। অধ্যাপক ওয়েবর ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের বহিঃপ্রকৃতির আলোচনা করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন; অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, তাহাকে গ্রীক নাট্যের অনুকৃতিমাত্র বলিতে কদাচ সাহসী হইতেন না। মৃচ্ছকটিক যে যুগের গ্রন্থ, সে যুগে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যজনপদ কিরূপ সমুন্নত ছিল, তাহা ইতিহাসে অজ্ঞাত নাই। তখন ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল, মৃচ্ছকটিকে তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং তুলনায় সমালোচনা করিলে তৎকালের ভারতীয় সাহিত্য যে অন্যান্য দেশের সাহিত্য অপেক্ষা সমধিক সমুন্নত ছিল, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না।

মৃচ্ছকটিকের প্রাচীনতা।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' মনোযোগসহকারে পাঠ করিয়াছি। কৃতী লেখকের হস্তে নাট্যসাহিত্য সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পরিস্ফুট হইবে, আশা করি। আমি এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে মৃচ্ছকটিক সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার একটুখানি সমালোচনা করিব।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত এই যে মৃচ্ছকটিক খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর গ্রন্থ। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মৃচ্ছকটিক অতি প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত। পশ্চিমপ্রদেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে তেমনি ঐ গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া গৃহীত হয়। পূজ্যপাদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় যদি এ গ্রন্থখানিকে অতি প্রাচীন না বলিতেন, তাহা হইলে অকুণ্ঠিত চিত্তে ইহার আধুনিকতার প্রমাণ প্রয়োগে অগ্রসর হইতে পারিতাম। রচনার সরলতাদি ব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রমাণ প্রদত্ত হয় নাই বলিয়া স্বর্গীয় মহাত্মার সিদ্ধান্তের অন্যরূপ কথা বলিতে সাহসী হইতেছি। ভূদেব বাবুর মত অনুসন্ধানতৎপর চিন্তাশীল এবং সুপণ্ডিত এ যুগে দুর্লভ। তিনি যদি ইহলোকে থাকিতেন, তাহা হইলে আমার সন্দেহের কথা এবং প্রমাণগুলি তাঁহারই চরণতলে স্থাপন করিতাম।

ভূদেব বাবুর দোহাই দিয়া বলিতে পারি যে, অক্ষয় বাবু প্রস্তাবনার শ্লোকটির যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই শ্লোকটির যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলে, গ্রন্থের প্রাচীনতার সমস্যা পূরণেও সহায়তা হইবে বলিয়া, আমি প্রবাসীর পাঠকদিগকে ভূদেব বাবুর অতুল্য ব্যাখ্যাটি তাঁহার নিজের ভাষায় উদ্ধৃত করিয়া উপহার দিতেছি—

"পরিচয়স্থলে রচয়িতার ভূয়সী প্রশংসা থাকে। এই জন্য কেহ কেহ মনে করেন যে প্রস্তাবনার ঐ ভাগ, নাটকরচয়িতা স্বয়ং লেখেন না * *। এরূপ অনুমান যে অমূ-

লক, তাহা ঐ পরিচয়ভাগের রচনাপ্রণালীর সহিত অপরাপর রচনাপ্রণালীর সাদৃশ্য দেখিলেই উপলব্ধ হয়। মৃচ্ছকটিকের ঐ পরিচয়ভাগে বলা হইল, রচয়িতার নাম শূদ্রক, তিনি রাজা এবং দ্বিজমুখ্যতম, ঋগ্বেদ এবং সামবেদে পণ্ডিত, বেদজ্ঞবর্গের শ্রেষ্ঠ, এবং হস্তীর সহিত বাহুযুদ্ধে উন্মুখ। তিনি শতবর্ষ এবং দশ দিন আয়ুষ্কাল ভোগ করিয়া পুত্রকে রাজ্য দান পূর্ব্বক, চিতারোহণে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি নামে হইলেন শূদ্র, কাজে হইলেন সমরব্যসনী ক্ষিতিপাল, এবং ব্যবহারে হইলেন তপোধন ব্রাহ্মণ! * * এমন স্থলে যদি মনে করা যায় যে গ্রন্থকারের এই শূদ্রক নামটাই কল্পিত, তাহা হইলে কি নিতান্ত কষ্টকল্পনা করা হয়? * * তিনি বলিয়াছেন যে, তাৎকালিক 'নয়প্রচার', 'ব্যবহারদুষ্টতা', 'খলস্বভাব', 'ভবিতব্যতা' প্রভৃতি বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে মৃচ্ছকটিক রচনা করিয়াছেন। সমাজবর্ণনে প্রবৃত্ত গ্রন্থকারগণ প্রায়ই স্ব স্ব নাম গোপন করিয়া থাকেন। অতএব কোন নাটকরচয়িতা সমাজের বৃহত্তম ভাগ যে শূদ্র জাতি, তন্নামানুসারে স্বয়ং শূদ্রক নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক, আপনাকেই ক্ষত্রিয়গুণ এবং ব্রাহ্মণগুণ সমন্বিত, এবং সমুদয় সমাজের প্রতিরূপস্বরূপ দেশসাধারণের রাজা বলিয়া বর্ণনপূর্ব্বক নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, এরূপ মনে করিলেও করা যাইতে পারে। গ্রন্থকার যে নিজ মৃত্যুবিবরণও স্বমুখে খ্যাপন করিতে পারিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্যও উল্লিখিত কল্পনার অবলম্বনে কিছু বিশদ হইতে পারে। শাস্ত্রে বলে, মনুষ্যের পূর্ণ আয়ুষ্কাল শতবর্ষ; অতএব মনে করা যাইতে পারে, এক একটি সমাজপ্রতিরূপের বয়স এক শত বৎসর। আর মৃত্যুর পর দশদিন যে অশৌচকাল, সে পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তির লোকান্তর গতি নাই; এক প্রকার ইহলোকেই স্থিতি। এই জন্য এক একটি সমাজপ্রতিরূপের অবস্থিতিকাল শতবর্ষ দশ দিন। সেই এক শতবর্ষ দশ দিনের পর, দ্বিতীয় সমাজপ্রতিরূপ, পূর্ব্বগত সমাজপ্রতিরূপের পুত্রস্বরূপ প্রাদুর্ভূত হয়। এই জন্য মৃচ্ছকটিকরচয়িতা—

> রাজ্যানংবীক্ষ্য পুত্রং
> লব্ধাচায়ুঃ শতাব্দং দশ দিন সহিতং
> শূদ্রকোগ্নিং প্রবিষ্টঃ।"

এই ব্যাখ্যার পর বোধ হয় যজ্ঞাদির পুরাতনত্বের উপর শূদ্রকের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না।

মৃচ্ছকটিকের অপেক্ষাকৃত আধুনিকত্বের অনুকূলে আমার বক্তব্য এই—

(১) বৌদ্ধযুগের পর যখন শৈবধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়, মৃচ্ছকটিক যে সেই সময়ে লিখিত, তাহা নান্দী পাঠেই উপলব্ধ হয়। এই সময়টা প্রায় শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক।

(২) সকল দেশের সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে সামাজিক তত্ত্বাদি লইয়া গ্রন্থরচনা, আইডিয়াল-রচনাযুগের বহু পরবর্ত্তী। প্রায়শঃ প্রথম সাহিত্য দেবমাহাত্ম্য লইয়া; তাহার পর লোকমাহাত্ম্য বর্ণনা প্রাদুর্ভূত হয়। এই লোকমাহাত্ম্য বর্ণনায়ও প্রথমতঃ আদর্শ গুণের কথাই অঙ্কিত হইয়া থাকে।

(৩) প্রাচীন কালের গ্রন্থে দৈবশক্তি এবং অতিমানুষ শক্তিদ্বারা অনেক কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। মৃচ্ছকটিকে তাহা আদৌ হয় নাই। নায়ক সাধারণ শ্রেণীর গুণবান দরিদ্র পুরুষ, এবং নায়িকা গুণশালিনী গণিকাকন্যা। এই সকল অবস্থা, এবং এই নাটকের ঘটনার জটিলতা ইহার আধুনিকত্বের নির্দ্দেশক। কথায় কথায় রাষ্ট্রবিপ্লব দেখিলেও, যে সময়ে ভারতবর্ষের গৌরব লুপ্ত হইবার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময়ের কথাই মনে পড়ে।

(৪) যে প্রাকৃতভাষা শকুন্তলা কিম্বা উত্তরচরিতাদি কাব্যে ব্যবহৃত, তাহা অধিকাংশ স্থলেই মার্জ্জিত শৌরসেনী প্রাকৃত। কিন্তু মৃচ্ছকটিকে মাগধী এবং অন্যান্য পরবর্ত্তী সময়ের প্রাকৃতভাষা বহুলপরিমাণে লক্ষিত হয়। মৃচ্ছকটিকের প্রাকৃতে যত পরিমাণে খাঁটি বাঙ্গালা, ওড়িয়া এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রচলিত শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, এমন অন্য কোন নাটকের ভাষায় দেখা যায় না। ইচ্ছা ছিল যে কতকগুলি শব্দের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিই; কিন্তু আমরা নাকি সকলেই সাহিত্যক্ষেত্রে সখের ব্যবসায়ী, কাজেই শ্রমসাপেক্ষ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার ততটা সময় হয় না। পারি ত ভবিষ্যতে এবিষয়ে পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

চৈত্রপূজা।

এক সময় চৈত্রপূজা বা 'চৈৎপরব' পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বপ্রধান উৎসব ছিল। কালবশে চৈত্রপূজার প্রভাব বহুপরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের হৃদয় চৈত্রপূজার নামে যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, এমন আর কিছুতেই হয়না। 'চৈতালী'র ঢাকের রুদ্র তালের মধ্যে এমন এক মাদকতা আছে যে, আজিকার এই ভয়ানক জীবনসংগ্রামের দিনেও জমীদার-মহাজন-রূপী রাক্ষসের কবলগত কৃষক আপনার সমস্ত দুঃখ ভুলিয়া হাতের কাস্তে ও পাচন ফেলিয়া নাচিবার নিমিত্ত না যাইয়া থাকিতে পারে না। নিদাঘমার্ত্তণ্ডের প্রখরকির-ণোত্তপ্ত মধ্যাহ্ন ঢাকের তালে তালে এই রুদ্র-সেবকগণের উদ্দণ্ড তাণ্ডব দেখিলে মনে হয় ইহাদের সন্ন্যাসী আখ্যা একবারে অন্যায় নহে।

শুনা যায় শিব-সেবক বাণ রাজা এই পূজার প্রচার করিয়াছিলেন। নীলতন্ত্রে নাকি এই পূজার পদ্ধতি লিখিত আছে। নীলতন্ত্র দেখিবার সুবিধা আমরা পাই নাই। সুতরাং তন্ত্রের সহিত প্রচলিত পূজাপদ্ধতির যে কতদূর সামঞ্জস্য আছে তাহা বলা যায় না। তবে উৎসবটী যখন শিব-পূজা, তখন কোন না কোন তন্ত্র ইহার প্রবর্ত্তক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাণ ও নীল শব্দ দুইটী এই পূজার সহিত বিশেষভাবে গ্রথিত। যে কাষ্ঠমূর্ত্তি খানির পূজা করা হয়, উহার এক নাম নীল এবং যে অস্ত্রদ্বারা পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ করিয়া চড়কে ঘুরান হয়, তাহার নাম বাণ। যাহাহউক, শাস্ত্রীয়তা ছাড়িয়া বর্ত্তমান পূজা যেরূপে সম্পাদন করা হয় তাহাই আমাদের আলোচ্য।

চৈত্রপূজায় নিম্নলিখিত মূর্ত্তি ও অস্ত্রগুলির পূজা হইয়া থাকে।—

(১) দেল,* (২) বাণ, (৩) পাশ, (৪) পঞ্চম, (৫) আন্থ, (৬) খড়্গ, (৭) চড়ক গাছ, (৮) মৈন, (৯) হর-গৌরী।

দেল।

দেল শব্দ বোধ হয় দেবালয় বা দেউল শব্দ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু দেবালয়ের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। এ 'দেল' একখানি নিম্ব বা বিল্বকাষ্ঠের তক্তা। উহার একদিক সূক্ষ্ম। উপরিভাগে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম চিহ্ন অঙ্কিত। সূক্ষ্মাগ্রভাগ হইতে কিছু দূরে (প্রায় মাঝামাঝি) ত্রিশূলাকার এক খানি লৌহ ও অপর প্রান্তের নিকট দুই খানি সরল লৌহ প্রোথিত। এই সরল লৌহ দুই খানির নাম 'যুগল'। সমগ্র তক্তাখানি লোহিতবর্ণের বস্ত্রে আবৃত থাকে। গৃহস্থবাড়ী যখন লইয়া যাওয়া হয় তখন অগ্রভাগের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া অগ্রভাগে সিন্দূর ও সমগ্র তক্তাখানিতে তৈল লেপন করা হয়। এই তক্তাখানিই চৈত্রপূজার প্রধান দেবতা। সাধারণে ইহাকে শিবপ্রতিমা মনে করে। এই প্রতিমার নাম—দেল, নীল, নীলপাট বা পাট ঠাকুর। বাঙ্গালা মন্ত্রগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে চৈত্রপূজা শিবেরই পূজা। কিন্তু শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিষ্ণুরই অস্ত্র। এসকল চিহ্ন অঙ্কিত কাষ্ঠখণ্ড কেন যে শিবের প্রতিমা বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধানের বিষয় বটে। আরও আশ্চর্য্য, কাষ্ঠখণ্ড শিব প্রতিমা বলিয়া সাধারণে বিশ্বাস করিলেও পূজার সময় উহাতে কেবল শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, † ত্রিশূল ও যুগলের পূজা হইয়া থাকে। প্রথমে বিষ্ণুর চিহ্ন শঙ্খাদি, তৎপর শৈবচিহ্ন ত্রিশূল, তৎপর 'যুগল' দেখিয়া মনে হয় ইহা কি বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম্মের সমন্বয়? হরিহরে অভেদ জ্ঞানই বোধ হয় এই প্রতিমানির্ম্মাণের উদ্দেশ্য ছিল। কালে হরির প্রভাব লোপ পাইয়াছে। সংক্রান্তির পূর্ব্বরাত্রিতে হর-গৌরী মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। সকল অনুষ্ঠান দেখিয়া স্বতঃই মনে হয়, বর্ষশেষের এই মহাপূজা বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের শুভসম্মিলন।

চৈত্রপূজায় বহু মন্ত্র পঠিত হয়। এই মন্ত্রগুলির আলোচনা করিলে পূজার ইতিহাস অনেকটা বুঝিতে পারা যায়। মন্ত্রগুলি একরূপ পদ্য। অক্ষরগণনার নিয়ম উহাতে রক্ষিত নাই, কিন্তু উচ্চারণে তাল ও মিলের দিকে কতকটা দৃষ্টি আছে। আদিম বাঙ্গালা কবিতার প্রকৃতিই এইরূপ। মিল ও তাল লইয়াই বাঙ্গালা কবিতার উৎপত্তি। অক্ষর গণনার নিয়ম পশ্চাৎ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মন্ত্র ও

*দেলের মধ্যে শংখাদি চিহ্ন এবং ত্রিশূল ও যুগলের পূজা হয়।

† শঙ্খায় নমঃ, চক্রায় নমঃ ত্রিশূলায় নমঃ, যুগলায় নমঃ, ইত্যাদি।

মেয়েলি ছড়াই বাঙ্গালার আদিম কবিতা। তন্মধ্যেও মন্ত্রই প্রাচীন। তান্ত্রিক বঙ্গদেশে ভাষার গর্ভবাসসময়েই মন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। অতি প্রাচীন মন্ত্রগুলি বড়ই দুর্ব্বোধ্য, তন্ত্রের ক্লীং হ্রীং হং হোংএর মত কতকগুলি অর্থহীন কথার পর দুই একটা দেবদেবীর দোহাইযুক্ত। মন্ত্র যতই সরল ও মাত্রাক্ষরপরিমিত, ততই উহার বয়স কম। চৈত্রপূজার যে সকল মন্ত্র আমরা সংগ্রহ করিয়াছি, উহা ভূত-ছাড়ান ও সাপের বিষ নামানর প্রাচীন মন্ত্রগুলি অপেক্ষা আধুনিক। বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি ও পরিপুষ্টির ইতিহাসে এবং বাঙ্গালার নানাবিধ গ্রাম্য পূজা পদ্ধতির বিচারে মন্ত্রের বড়ই প্রয়োজন। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত বাঙ্গালা মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলে বাঙ্গালার অনেক তত্ত্ব সংগৃহীত হইতে পারে।

মণ্ডপবন্দনা মন্ত্র। *

অনুরূপ ভাবে নর জলে করিয়া স্নান।
গো কণ্ঠে রোগী যোগী করিয়া ধ্যান।
হরি গৌরীনন্দন বিস্তু গুণে পতি।
সরোবর পুষ্করিণী দেলের উত্তর ভিটা।
দক্ষিণে বৈসে লোহিত গঙ্গা নিরমল জল।
মণি কোটী দরশনে পাপ পলাইল সকল।
কামাখ্যা দরশনে মুক্ত হৈল নর।
মাধব দরশনে হর হর হর।
নীল আসনে চল্।

দেলের জন্ম।

খাট না ছিল পাট না ছিল
না ছিল সিংহাসন।
কোথায় ছিল খাট পাট
কাহারি আসন।
দেল সৃষ্টি খাট খানি
সুতারে চাইছা দিল।
সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান
ভাইবা আছেন স্থূল।
সৃষ্টি কর্ত্তা ভগবান
ভাইবা আছেন স্থূল।
পাটের উপর হানিয়া দিলেন
মহিষা ত্রিশূল।
হানিয়া ত্রিশূল বাণ
কাটা সারি সারি।
যুগল বস্ত্র দিয়া পাট বাণ
ঢাকিব ঘেরিব।
ঢাকিয়া ঘেরিয়া পাট বাণ
নিব প্রলয় সমুদ্রের কূলে
প্রলয় সমুদ্রের কূলে করি
দেলের স্থাপনা।
চারি দিকে জয় জোকার
ঢাকের বাজনা।
এগার মাস আছিলা শিব
নিদ্রা আসি ঘরে।
মধুমাসে শিবপূজা
যখন তলপ পড়ে।
সন্ধ্যা গায়ত্রী পড়িয়া ব্রাহ্মণ
শিব দিলেন হাতে।
পাটের করলেন জীবন্যাস
তুইলা লইলাম মাথে।
পূজব আমি শিব পূজা
পূজব পাট বাণ।
ভোলা মহেশ্বর সদাশিব
চারি যুগে জানি।
জগৎ জননী মাতা
যাহার ঘরনী।
প্রণাম করি তোমার
পদ্ম নমস্তুতে॥
সোণার খাট রূপার পাট
হীরার জ্বাল বাতি।

---

* অনেক স্থানে মন্ত্রগুলি দুর্ব্বোধ্য বা অর্থহীন। এই অর্থহীনতাই উহার মাহাত্ম্যবৃদ্ধির কারণ। মন্ত্রসংগ্রহে আমরা ভাষার প্রাদেশিকতা রক্ষা করিলাম। মন্ত্রগুলি নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখে শ্রুত। তাহারা যেরূপ উচ্চারণ করে, ঠিক সেইরূপ লিখিত হইল।

এহি খাটে নিদ্রা যাও
প্রভু নিজ পতি।
আমার দেল ছাড়িয়া যদি
অন্য দেলে যাও।
দোহাই ধর্ম্মের লাগে
কার্ত্তিক গণেশের মাথা খাও।

দেল বন্দনা।

১। ধর্ম্ম বন্দম শিরে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, পূবে বন্দম দিবাকর,
পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চৌদিকে নাম
পূবে যে আছেন ঠাকুর চন্দ্র সূর্য্য তান
চরণে পঞ্চ প্রণাম।
ঠাকুর চন্দ্র সূর্য্য যে অখিলের অধিপতি,
হেত হুতাশন ভাবন বুদ্ধি,
ত্বং চরণে প্রণামে কেবল শঙ্খ মুদ্রা সিদ্ধি।

এইরূপ অন্য তিন দিকের বন্দনা আছে।

চারি কোণা বন্দিয়া আমি করিলাম সার।
তার পর বন্দিব স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল।
মাটী মাটী হেট লতা,
লক্ষ্মী অলক্ষ্মী পবনে, করলেন স্থির।
কুম্ভীরের পৃষ্ঠে হৈলেন বসুমতী স্থির।
র র * বসুমতী তোকে দেই বর,
বৎসর বৎসর বাড়ুক মাটী দ্বাদশ কর।
মেউর মান্দার জীব জন্তু
ইহাদিগে স্থান দিও স্তুতি করি তোরে॥
ঝির কুটী ছাইনি ঘর মধ্যে গিছে ভাল।
দিশা বিশা নাই তার সম্পূর্ণের জালা।
পাক দিয়া ফেলাইলেন প্রভু মাটী চাইর দলা।
চারি দলা মাটী নররে পর্ব্বত সমতুল।
তার মাঝে লাগাইলেন প্রভু নানা বরণ ফুল।
ঘৃত অন্ন জল ঝাড় চন্দনের হাটী,
হাট বসাইলেন প্রভু পাথরের ঘাটী।

* রহ রহ।

কহত সদগুরু মহেশের বর।
দেলের স্থাপনা করলাম ভোলা মহেশ্বর॥

এই মন্ত্র গুলির অর্থ ও অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝা যায় না। দেল বন্দনার মন্ত্রে ধর্ম্মের বন্দনা দেখিয়া মনে হয়, বুঝি বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত চৈত্রপূজার কিছু সংস্রব আছে। পূর্ব্ব বঙ্গে অনেক মন্ত্রেই ধর্ম্ম, আদ্য ও নিরঞ্জন শব্দ পাওয়া যায়। চৈত্রপূজার মধ্যেও আদ্যেশ্বরীর পূজা আছে। এই শব্দগুলি বৌদ্ধধর্ম্ম লক্ষ্য করে। সমুদয় মন্ত্র সংগ্রহ করিতে পারিলে একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারা সম্ভব। কিন্তু মন্ত্র সংগ্রহ বড়ই কঠিন। যাহারা এই সকল মন্ত্র জানে স্বীয় সমাজে তাহাদের 'গুণী' বলিয়া একটা প্রতিপত্তি আছে। অন্যকে শিখাইয়া তাহারা নিজের এই প্রতিপত্তি নষ্ট করিতে কোন মতেই ইচ্ছুক নহে। অর্থের প্রলোভন দেখাইয়াও অনেক স্থলে সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মন্ত্রগুলির উচ্চারণের এক বিশেষ প্রণালী আছে। যখন মাথমা (প্রধান সন্ন্যাসী) তাহার অভ্যস্ত ভঙ্গীর সহিত মন্ত্রগুলি পাঠ করে তখন বস্তুতই লোমহর্ষণ হয়। সে ভঙ্গী, সে তদ্‌গততা না দেখিলে বুঝাইবার উপায় নাই। মন্ত্রগুলির উচ্চারণপদ্ধতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া আমরা উহা ছত্রবদ্ধ করিলাম।

বাণ।

এ বাণ ধনুর্ব্বাণের বাণ নহে। চৈত্রপূজার বাণ এক প্রকার বড়শীর আকার অস্ত্র। ইহারও পূজা হয়। "বাণেশ্বর্য্যৈ নমঃ" বলিয়া ইহার পূজা হয়। ইহার দেবতার নাম বাণেশ্বরী। সংক্রান্তি দিবস বৈকাল বেলা এই অস্ত্র পৃষ্ঠে বিদ্ধ করিয়া কোনও সন্ন্যাসীকে চড়ক গাছে ঘুরান হইত। ইংরেজের আইনে বাণবিদ্ধকরণ অনেক স্থল হইতেই উঠিয়া গিয়াছে।

পাশ ও পঞ্চম।

পাশ ও পঞ্চম এক প্রকার পঞ্চশীর্ষ অস্ত্র। ইহা দ্বারা উভয় পার্শ্ব-দেশ ও ভ্রূযুগল বিদ্ধ করা হয়। যখন পার্শ্ব দেশ বিদ্ধ করা হয় তখন উহার নাম 'পাশ'। আর যখন ভ্রূ-যুগল বিদ্ধ করা হয়, তখন উহাকে পঞ্চম কহে।

আগ্য।

ইহা এক প্রকার লৌহ শলাকা। ইহা দ্বারা জিহ্বার অগ্রভাগ বিদ্ধ করা হয়।

মৈন।

মৈন বোধ হয় মাণ শব্দ হইতে উৎপন্ন। তান্ত্রিক শব সাধনায় যেরূপ শব ব্যবহৃত হইবার নিয়ম আছে, সেইরূপ শবের (সাধারণতঃ শিশু) মস্তক গ্রহণ করিয়া উহাকে এক বৎসর কাল প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট বিধান অনুসারে পূজা করিতে হয়। এক বৎসর পূজার পর উহা 'মৈন' হয়। কোন কোন স্থলে বানরের মস্তকও গ্রহণ করিবার রীতি আছে। সংক্রান্তির পূর্ব্বদিবস রাত্রে মৈনের পূজা হয়। 'কালীকাচ' খেলিবার সময় এই মৈন কালীকাচের হাতে দেওয়া যায়। এক হাতে মৈন, অপর হাতে তরবারী লইয়া রণরঙ্গিনী কালিকার অভিনয় হয়।

দেল নামান।

চৈত্রপূজার প্রথম ক্রিয়া দেল নামান। দেল নামানকে কোন কোন স্থানে ঠাকুর স্নান করান বলে। বৎসরের প্রায় সমস্ত সময়েই তক্তারূপী শিব ঠাকুর দেউলীর (যাহার বাটীতে চৈত্রপূজা হয়) মণ্ডপঘরে বস্ত্রাবৃত শরীরে নিরম্বু উপবাসে কাটান। চৈত্র মাসের ৩ দিন ৫ দিন কি ৭ দিন থাকিতে ভক্তগণ তাঁহাকে মনে করে। যে দিন দেল নামাইতে হইবে, সেই দিন প্রধান সন্ন্যাসী সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যাকালে নীলপাট খানি মাথায় লইয়া ঢাকী ও অন্যান্য লোক সহ নিকটবর্ত্তী নদী বা পুকুরের ঘাটে যায়। তথায় যাইয়া নীলপাট মাথায় লইয়া প্রধান সন্ন্যাসী ডুব দিয়া উঠিয়া আসে। পরে ঘাটের মধ্যে একটু স্থান লেপিয়া তথায় নীল পাট নামায়। পুরোহিত গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করেন। এক যোড়া বা একটী কপোত বলি দেওয়া হয়। তৎপর প্রধান সন্ন্যাসী নীল পাট মাথায় লইয়া সকলের অগ্রে, পশ্চাৎ ঢাকী ও অন্যান্য সকলে সারি বাঁধিয়া দেউলীর বাড়ীতে আসে, এবং দেল খানি মণ্ডপের বেদীর উপর রাখিয়া দেয়। প্রথম দিনের কার্য্য এ পর্য্যন্ত হইলেই শেষ হয়। প্রথম দিন আর বিশেষ কিছু করিতে হয় না।

খাট্না খাটা।

যাহারা চৈত্রপূজার দলভুক্ত হয়, তাহাদিগকে সন্ন্যাসী কহে। সন্ন্যাস আশ্রমের সমস্ত নিয়মই ইহাদিগের পালনীয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হয়না। কেবল প্রধান সন্ন্যাসী অন্নভোজন পরিত্যাগ প্রভৃতি কৃচ্ছ্র অবলম্বন করে। অপর সন্ন্যাসীরা চৈত্রপূজার কয়েক দিন মৎস্য খাইতে পারে না। সন্ন্যাসী হইলেই ভিক্ষোপজীবী হইতে হয়। সন্ন্যাস আশ্রমের এই ভিক্ষার ব্যবস্থা চৈত্রপূজার সন্ন্যাসীরা বিশেষভাবে পালন করিয়া থাকে। যে দিন ইহারা সন্ন্যাসী হয়, সেই দিন হইতেই ইহাদিগকে নিজ বাড়ী ত্যাগ করিয়া দেউলীর বাড়ী যাইয়া থাকিতে হয়। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া পান্তা ভাত খাইয়া সারাদিনের মত ইহারা ভিক্ষায় বাহির হয়। সঙ্গে ঢাক ঢোল সানাই প্রভৃতি থাকে। যে সকল দলের ঢোল ও সানাই রাখিবার সামর্থ্য নাই, তাহারা কেবল ঢাকই রাখে। ঢাক দুইটী রাখিতে হয়। দলবলে ইহারা গৃহস্থের অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া অঙ্গনের মধ্যস্থলে নীলপাট নামাইয়া রাখে। সন্ন্যাসীরা নীলপাট ঘিরিয়া গোলাকারে দাঁড়ায়। তৎপর গৃহস্থের ফরমাইস মত বা নিজেদের ইচ্ছানুসারে দুইটী বা একটী সন্ন্যাসী কোন কবিতা গানের স্বরে আবৃত্তি করে। আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ঢোল ও সানাই বাজে। দুই দুই চরণ আবৃত্তির পর ঢাকী খুব জোরে নাচিবার তাল বাজায়, এবং সন্ন্যাসীরা নীলপাট ঘিরিয়া নানা ছন্দে নাচিতে থাকে। এই নৃত্য ব্যাপারকে "খাট্না খাটা" বলে। খাট্না খাটায় ও কবিতা বলায় সন্ন্যাসীদের বড়ই আমোদ। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহুলোক চৈত্রের প্রখর মধ্যাহ্নে এই খাট্না খাটিবার জন্য সন্ন্যাসী হয়। এবং বহু পুরাতন হইলেও গৃহস্থবধূগণ আগ্রহের সহিত এই তাণ্ডব দর্শন ও কবিতা শ্রবণ করে।

খাট্না খাটায় যে সকল কবিতা গীত হয় তাহার অধিকাংশই কৃষ্ণলীলাবিষয়ক; বিরহ বা মাথুর বর্ণনার ভাগই অধিক। গ্রাম্য বা দেশীয় ঘটনা লইয়া রচিত দুই একটী কবিতাও শুনিতে পাওয়া যায়। কবিতা বলা শেষ হইলে উপসংহারচ্ছলে কিছু কাল নৃত্য করা হয়। এই সময় ঢাকের তালে তালে নৃত্যকারিগণ টপ্পা গাইয়া থাকে।

কদাচিৎ "আমরা চৈত্রপূজার সন্ন্যাসী, নামের মহিমা শুনে এসেছি বাবুজী" প্রভৃতিও গাওয়া হয়।

নৃত্য শেষ হইলে গৃহস্থবধূগণ কিছু চাউল ও ২।১টী কাঁচা আম ভিক্ষা দেয়। এবং নীলপাটকে দিবার জন্য একটী বাটীতে কিছু তৈল এবং একখান পাতায় অল্প সিন্দুর তৈলে গুলিয়া দেয়। এক জন সন্ন্যাসী এই তৈল ও তৈল সিন্দুর লইয়া তৈল শিব ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গে ঢালিয়া তৈল সিন্দুর তাহার মাথায় মাখাইয়া দেয়। তৎপর ঠাকুরকে মাথায় তুলিয়া লইয়া অন্য বাড়ী যায়। সংক্রান্তি ও তাহার পূর্ব্বদিবস ব্যতীত প্রত্যহ সন্ন্যাসীদিগকে সমস্ত দিন এই রূপ বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতে হয়।

যে সকল দেউলীর অবস্থা ভাল তাহার দল ভিক্ষার্থে বেশী ভ্রমণ করে না। কিন্তু প্রত্যহ অন্ততঃ তিন বাড়ী ভিক্ষা করিতে সকলেই বাধ্য।

প্রাত্যহিক পূজা।

সন্ন্যাসী দল সমস্ত দিন ভিক্ষার্থে পর্য্যটন করিয়া সন্ধ্যাকালে গৃহাভিমুখে গমন করে। বাড়ীর নিকট আসিলে পর কোন নদী বা পুকুরে সকলে স্নান করে। একজন বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী নীলপাট মাথায় লইয়া ডুব দেয়। ডুব দেওয়ার পরই সে আর সহজ মানুষ থাকে না। নানা অমানুষ ভঙ্গীর সহিত ঢাকের তালে তালে নাচিতে নাচিতে দেউলীর মণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হয়। এবং দেলখানি মণ্ডপের বেদীর উপর রাখিয়া দিয়া ঢাকের তালে তালে ভৈরব নৃত্য করিতে থাকে। এইরূপ কিছুকাল নৃত্য করিবার পর মাটীতে পড়িয়া মাথা ঘুরাইতে থাকে। ইহাকে 'ভার হওয়া' বলে। 'ভার হওয়া'র অর্থ মনুষ্যের উপর দেবতার আবির্ভাব। ভার হইলে পর প্রধান সন্ন্যাসী বা প্রধান ঢাকী তাহার নিকট নানা বিষয় (যেমন পূজা নির্ব্বিঘ্ন হইবে কিনা? অমুকের সন্তান মরে কেন? ইত্যাদি) জিজ্ঞাসা করে। 'ভার'ও যথারীতি (যেমন ভক্তি আসিলে পূজা নির্ব্বিঘ্ন হইবে, অমুককে ভূতে ধরিয়াছে, একন্য সন্তান বাচেনা, ইত্যাদি) উত্তর দেয়। এইরূপ জিজ্ঞাসা করাকে "জব লওয়া" বলে। জব লওয়া হইলে পর উহার গাত্রে গঙ্গাজলের ছিটা দেওয়া হয়। গঙ্গাজল স্পর্শ মাত্র সে ব্যক্তি হঠাৎ যেন অচেতন হইল এই ভাবে পড়িয়া যায়। একটু পরে উহাকে ধরিয়া তুলিয়া মাথায় ফুঁ দিলেই সুস্থ হয়।

ইহার পর নীলপাটের পূজা হয়। প্রাত্যহিক পূজার জন্য পুরোহিতের আবশ্যক হয় না। মাথমা (প্রধান সন্ন্যাসী) যে জাতিই হউক না কেন, প্রাত্যহিক পূজা তাহারই কর্ত্তব্য। প্রত্যহ শঙ্খাদি চিহ্ন, ত্রিশূলাদি অস্ত্র, হরগৌরী ও শিবের পূজা হয়। সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিবস রাত্রে বিশেষ ভাবে, অর্থাৎ হরগৌরী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, যে পূজা হয় তাহাতেই পুনরায় পুরোহিতের প্রয়োজন পড়ে।

ধূপ খেলা।

পূজা হইলে পর ধূপ খেলা হয়। দুইটী ধূপতি (ধূপদান) অগ্নিপূর্ণ করিয়া দেলের সম্মুখে বা যে উঠানে ধূপ খেলা হইবে সেই উঠানে রাখা হয়। যে ব্যক্তি ধূপ খেলাইবে সে ভাল করিয়া কাপড় আঁটিয়া পরিয়া ধূপতির সম্মুখে উপবিষ্ট হয়। প্রধান সন্ন্যাসী উহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া উচ্চ স্বরে কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণ করে। এক একটী মন্ত্র আবৃত্তি শেষ হইলে ঢাকী এক একবার বাজায় এবং প্রধান সন্ন্যাসী ধূপতির মধ্যে ধূপচূর্ণ নিক্ষেপ করে।

মাটীর জন্মকথা, ধূপতির জন্ম কথা, ধূপের জন্ম কথা, ধূপ ক্রীড়ার মাহাত্ম্য প্রভৃতি এই সকল মন্ত্রে বর্ণিত আছে। মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে ক্রীড়ক ধূপতি দুইটী হাতে লইয়া চক্রাকারে ঢাকের তালে তালে নাচিতে থাকে। অনেক নৃত্য করিবার পর তাহার ভাব হয়। তখন মাটীতে পড়িয়া যায়। তখন তাহার নিকট জব লওয়া হয়।

ধূপখেলার মন্ত্র।

মাটীর জন্ম।

মাটী মাটী মাটী বিড়ুলস মাটী
মাটী সিরজাইল কে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ভোলা মহেশ্বর
মাটী সিরজাইল সে।
দন্তেতে উঠাইয়া মাটী
ফালাইয়া দিল জলে
সেই মাটীর জন্ম হৈল
কুম্ভের উপরে।

ধূপাতির জন্ম।

ভানু কুমারেরা সাত পাঁচ ভাই
মাটী খানি ছানিয়া থুইল এক ঠাঁই।
মাটী খানি আনিয়া তুইলা দিল চাকে,
মহাদেবের ধূপতি হৈল আড়াইটা পাকে।
রবি দিলেন শুকাইয়া,
ব্রহ্মা দিলেন পুড়িয়া
গুরু দিলেন হস্তে
মুই লইলাম মস্তকে,
কালিন্দী যমুনা নব শঙ্খের জল।
আমার ধূপতি শুদ্ধ কর মহেশ্বর।

ধূপের জন্ম।

ধূপ ধূপ গাছেরি আটা,
রাবণে আনিল ধূপ মানব এথা।
যত কিছু ছিল রাবণ মনেরি বাসনা।
দশমুণ্ড কাটিয়া রাবণ পাতিল রচনা।
ছেদ ধূপ নেদ ধূপ আমইনা আউসা ধূপ,
সাতা পাঁচা ধূপে করি অন্ধকার,
ধূপের গন্ধে নাচে তাল আর বেতাল।
ধূপের গন্ধে নাচে ঢাকী আর সন্ন্যাসী
ধূপের গন্ধে নাচে পাতালে বাসুকী।
যখন নরে ধূপ ধরে,
ত্রিশ কোটী দেবগণ দৃষ্টি করে।
বসোয়ার পৃষ্ঠে দিয়া পাও,
মহাদেব ধূপ খাও।

ডামর মন্ত্র। *

(১)

প্রথমে আইল ডামর দাঁঘে দিয়া ফোটা
তার পরে আইল ডামর মহীরাবণের বেটা।
কৈঙ্কা নিঙ্কৈঙ্কা আইল তারা দুটী ভাই।
তার পাছে কত ডামর লেখা জোখা নাই।
নাগ ডামর ভূত ডামর দেব ডামর।
সকল ডামর কর আমার কণ্ঠে অধিষ্ঠান।
প্রণমোহ নারায়ণী চরণে তোমার।

(২)

ঝাজ বাজে ঝাজরা বাজে, বাজে রামা তুলা।
যোল শ ডাকিনী নিয়া নাচে গভস্থরা।
শ্রীরামের ভাগিনা তুই কালিয়ার পুত।
সাঙ্গ কৈরা বাইন্ধা আন যত আছে ভূত।

এতদ্ব্যতীত আরও ডামর মন্ত্র আছে। চৈত্রপূজার সকল মন্ত্র লিখিতে গেলে 'পুঁথি বাড়িয়া যায়', তজ্জন্য আমরা ক্ষান্ত হইলাম।

সংক্রান্তির পূর্ব্বদিবস খাটনা খাটা হয় না। এই দিন প্রথম বেলা দুটী লোক শিব ও পার্ব্বতী সাজিয়া বাড়ী বাড়ী যাইয়া নাচে ও পয়সা ভিক্ষা করে। পার্ব্বতীর এই নৃত্যকে বৌনাচানি কহে। ভারত লিখিয়াছেন কৈলাসের ভিখারী সাপ নাচাইতেন, তাঁহার বৌ নাচানর কথা ইহারা কোথা হইতে গড়িয়া লইল?

অপরাহ্ন বেলায় 'আমভাঙ্গনী' ও 'মেছেহাটা' হয়। ফল সহিত একটী আম্রশাখা অঙ্গনের মধ্যস্থলে রোপন করা হয়, একজন লোক হনুমানের সাজ ধরিয়া আসিয়া আম্রশাখার আম ছিঁড়ে। ইহার নাম আমভাঙ্গনী। আমভাঙ্গনীর সহিত চৈত্রপূজার কি সম্পর্ক বুঝা যায় না। আমভাঙ্গনার পর মেছেহাটা হয়। একজন জেলে মাছের খাড়ী লইয়া উঠানের একদিকে বসে। সন্ন্যাসীরা সকলে তাহার সম্মুখে দলবদ্ধ হইয়া বসিলে জেলে মাছের খাড়ী ধুইয়া সেই জলের ছিটা ইহাদের গাত্রে দেয়। এই মাছের জলের ছিটা পাইলেই সন্ন্যাসীরা বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।

এই দিন রাত্রির কার্য্য—হরগৌরী পূজা, কালীকাছখেলা ও হাজরা। হরগৌরীমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া এই রাত্রিতে ষোড়শোপচারে পূজা করা হয়। পুরোহিত এই পূজা করেন। হরগৌরীর পূজার পর কালীকাছ খেলা হয়। দুইটী লোক কালীর মুখস পরিয়া হাতে তরবারী লইয়া যুদ্ধের তালে নাচিতে থাকে। কিছুকাল নাচা হইলে পর একজনের বাম হাতে 'মৈন' দেওয়া হয়। 'মৈন' দেওয়ার পর অতি

* ধূপ খেলিবার সময় এবং অন্যান্য ভাবের সময় এই ডামর মন্ত্র উচ্চারিত হয়। ডামর মন্ত্র বড়ই গোপনীয়। অতি অল্প লোকেই এগুলি জানে। যে জানে তাহার অমানুষ ক্ষমতায় সকলের ধ্রুব বিশ্বাস। ডামরমন্ত্র সহজে কেহ শিখায় না।

অল্পক্ষণ নাচিয়াই অস্থির হইয়া পড়ে। তখন উহাদিগকে ধরিয়া মুখস খুলিয়া সুস্থ করা হয়।

কালীকাছ খেলার পর 'হাজরা' পূজা করে। শাল, শোল, বোয়াল প্রভৃতি মৎস্য দগ্ধ করিয়া একখানি পাতায় রাখা হয়। আর একখানিতে চাউলভাজা প্রভৃতি রাখা হয়। এই সমস্ত উপকরণ সহ প্রধান সন্ন্যাসী দুইজন উত্তরসাধক ও ঢাকীসহ অল্পরাত্রি থাকিতে শ্মশানে গমন করে। তথায় পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে শ্মশানকালীর অর্চ্চনা করিতে হয়। অর্চ্চনার পর মন্ত্র হাজার বার জপ করিতে হয়। হাজার সংখ্যা জপ করিতে হয় বলিয়া এই পূজার নাম হাজরা। চৈত্রপূজার মধ্যে যতগুলি কার্য্য আছে, সর্ব্বাপেক্ষা হাজরাই কঠিন। হাজরা করিতে যাইয়া অনেকের প্রাণ যাইত। এখনও অনেকে ভয় পাইয়া আসিয়া বহুদিন রোগ ভোগ করে। মাথমারা বলে হাজরার সময় নাকি দেবতার দর্শন লাভ হয়।

সংক্রান্তি দিবস চড়কপূজা ও চড়কে বাণবিদ্ধ হইয়া ঘরাই কার্য্য। প্রাতঃকালে চড়কগাছ জল হইতে তুলিয়া নানা রং দিয়া রঞ্জিত করা হয়। পুরোহিত গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা চড়কের পূজা করেন। বিকাল বেলা একটী সন্ন্যাসীকে নূতন বস্ত্র পরাইয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে বাণ বিদ্ধ করা হয়। সে হাতে রুদ্রাক্ষ মালা লইয়া চড়কগাছের নিকট হাটিয়া আসে। তখন তাহাকে চড়কে বাঁধিয়া দিয়া ঘুরান হয়। পরিহিত নূতন বস্ত্রখানা ছাড়া একটা টাকা ঐ ব্যক্তি পায়। চড়কগাছে ঘুরা হইলেই চৈত্রপূজার কার্য্য শেষ হয়। চড়কতলায় মেলা বসে, লাঠী খেলা হয়।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

গত নভেম্বর মাসে সন্ধ্যার পর পশ্চিমাকাশে সুন্দর গ্রহসমাগম সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। শুক্র গুরু শনির অপূর্ব্ব মিলন সকলকেই চমৎকৃত করিয়া থাকিবে। গত ১৮ই নভেম্বর শুক্র ও বৃহস্পতির, এবং ১৯শে শুক্র ও শনির সমাগম হইয়াছিল। পরে শনিগুরুর সমাগম ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। মঙ্গলও নিকটে ছিল, তবে তাহার দীপ্তি ইহাদের মত ছিল না। ২৮শে দিবসে শনিগুরু অতিশয় নিকটস্থ হইয়াছিল। জ্যোতির্বিদেরা গণনা করিয়া বলিয়াছেন, গত ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ দুই গ্রহ এইরূপ নিকটস্থ হইয়াছিল, এবং আগামী ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে আর সেরূপ হইবে না। পূর্ব্বদিকে দীপ্তিশালী শুক্র, কিছু পশ্চিমে (প্রায় ৮ অংশ) শনিগুরু, আরও পশ্চিমে (প্রায় ১১ অংশ) মঙ্গল ছিল। শুক্র শনি গুরু কুজ চারিটি উজ্জ্বল তারাগ্রহের নিকটে নিকটে অবস্থিতি দেখিবার বিষয় বটে।

ফরাসীদেশে ঘড়ীর ঘণ্টা জানাইবার এক সুন্দর বিধান হইয়াছে। এক অহোরাত্রে ২৪ ঘণ্টা; কিন্তু আমরা একাদিক্রমে চব্বিশ ঘণ্টা না গণিয়া দুইবারে গণিয়া থাকি। ফলে বলিতে হয়, প্রাতে ৮টা, রাত্রে ৮টা, দিন ১২টা, রাত্রি ১২টা ইত্যাদি। ইহাতে অসুবিধা বই সুবিধা কিছুমাত্র নাই। রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ বিভাগে এই অসুবিধা ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে ১ হইতে ২৪ ঘণ্টা গণিত হইয়া থাকে। সেইরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তিথির সহিত দুর্দিন সুদিন সম্ভাবনার কোন সম্বন্ধ আছে কি? বরাহাদি আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষিগণ তিথিনক্ষত্র লইয়া আবহের ভবিষ্যৎ অবস্থা গণনাসম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সকল দেশেই প্রাচীনকালে চন্দ্রের স্থিতির সহিত আবহের সম্বন্ধ অল্পাধিক স্বীকৃত হইত। আধুনিক সভ্যজগতে এই বিষয় লইয়া দুই দল আছেন। এক দল বলেন, কোন সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হয় না; অপর দল বলেন, প্রত্যক্ষ হয়। প্রথম দলেই অধিকাংশ খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিককে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের প্রধান তর্ক এই যে, যদি চন্দ্রের স্থিতিনিমিত্ত কোন স্থানে বর্ষা হয়, তবে পৃথিবীর সকল স্থানেই হয় না কেন? পৃথিবীর সকল স্থানের পক্ষেই চন্দ্রের স্থিতি এক থাকে, অথচ এ পাড়ায় বৃষ্টি হইলে অন্য পাড়ায় হয় না। বাস্তবিক ইহার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। এক জন রুষ আবহবিৎ (নামটি স্মরণ হইতেছে না) উক্ত সম্বন্ধ স্বীকার করেন। ইংলণ্ডের কোন কোন ব্যক্তি এই সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন। অন্য দিকে অষ্ট্রেলিয়ার গভর্মেণ্ট জ্যোতির্ব্বিৎ দেখাইয়াছেন

যে, তিথির সহিত বায়ুচাপের কোন সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। তিনি বিশ বৎসরের বায়ুচাপ তুলনা করিয়া এই কথা বলিতেছেন। বরাহাদি জ্যোতির্ব্বিৎ উপরি উক্ত তর্কের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ভারতবর্ষকে কতকগুলি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া এক এক প্রদেশে এক এক ফল ফলে, বলিয়া গিয়াছেন। হয়ত এই ভাবে দেখিলে সকল তর্কের মীমাংসা হইতে পারে। অর্থাৎ আবহের অবস্থা কেবল চন্দ্রেরই উপর নির্ভর করে না। অন্যান্য কারণের মধ্যে চন্দ্র একটি।

সুখের বিষয় বোম্বে কোলাপুরের রাজারাম কলেজের গণিতাধ্যাপক আপ্তে মহাশয় ভারতসম্বন্ধে এই বিষয় অনুসন্ধান করিতেছেন। গত কার্ত্তিকের 'সাহিত্য' দেখিতেছি, বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দেব এই বিষয় কিছু কাল আলোচনা করিতেছেন। এদিকে মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত সূর্য্য নারায়ণ রাও প্রাচীন আবহ-বিদ্যায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনা করিয়া নানা স্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন।

শুক্রের সহিত জলের সম্বন্ধ আছে, এই বিশ্বাস প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছে। ঋকসংহিতার বেন দেবতা আমাদের শুক্র বলিয়াই বোধ হয়। তিনি জলবর্ষণকারী। পুরাণে, ফলিত জ্যোতিষে, সংহিতা জ্যোতিষে সেই কথা পুনঃ পুনঃ লিখিত আছে। শুক্রের সঞ্চারবিশেষে যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে কেবল তিথি লইয়া বৃষ্টি অনাবৃষ্টি গণনা করিলে চলিবে না। আমাদের ২৭টি নক্ষত্রের মধ্যে একটির নাম আর্দ্রা। আর্দ্রা অর্থে ভিজা। এই নক্ষত্রের আর্দ্রা নাম হইবার কারণ কি? এই সকল বিষয় যথার্থ মীমাংসা করিয়া সার উদ্ধার করা বহু পরিশ্রমের কার্য্য। কেবল পরিশ্রমেও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। বিশেষ শিক্ষা না থাকিলে পদে পদে ভ্রান্তি আসিয়া জুটিবে এবং সাধারণেও মীমাংসায় সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না।

সকলেই জানেন, সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণ দেখিবার নিমিত্ত পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণ কত আয়োজন করিয়া নানাবিধ কষ্ট স্বীকার করিয়া দূরদেশান্তরে গমন করেন। গত ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সূর্য্যগ্রহণ দেখিবার নিমিত্ত নানাদেশ হইতে এদেশে জ্যোতির্ব্বিদগণ আগমন করিয়াছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আলজিয়ার্স প্রদেশে অনেক জ্যোতির্ব্বিৎ সেই উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন। গত ১৮ই মে আবার সেই প্রকার আয়োজন হইয়াছিল। এবারের সূর্য্যগ্রহণ দেখিবার সুবিধাজনক স্থান অধিক ছিল না। একদিকে বোর্বো ও মরিশস দ্বীপ, অন্যদিকে সুমাত্রা, মধ্যে ভারত সমুদ্র। এই তিন স্থানেই দলে দলে জ্যোতির্ব্বিৎ গমন করিয়াছিলেন। একদল ফরাসী
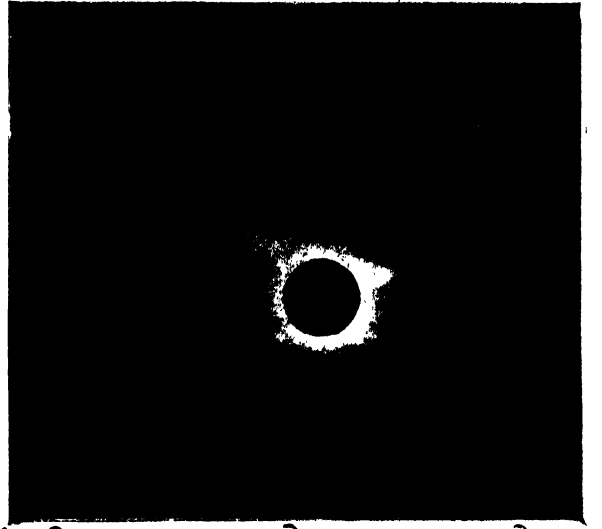
সূর্য্যের কিরীটমণ্ডল।

বোর্বোতে, কয়েকজন ইংরাজ মরিশসে, এবং অপর ইংরাজ, মার্কিন, ওলন্দাজ ও জাপানী দল সুমাত্রায় গিয়াছিলেন।

যে অনুসন্ধানে জ্যোতির্ব্বিদগণ এতদিন ব্যস্ত ছিলেন, তাহার ফল প্রায় হস্তগত হইয়াছে। সৌরদেহ নির্ণয় করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। প্রখর জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যবিম্বকেই আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। এই অংশ হইতেই আলো পাইতেছি। এই অংশের নাম প্রভামণ্ডল (Photosphere)। ইহার চারিদিকে আর এক মণ্ডল। পূর্ব্বকালে পূর্ণগ্রহণের সময় এই মণ্ডল দেখিবার সুযোগ হইত। এক্ষণে কৌশলক্রমে সকল সময়েই দেখা যাইতে পারে। এই মণ্ডলের নাম বর্ণমণ্ডল (Chromosphere) রাখা হইয়াছে, কারণ পূর্ণ-গ্রহণের সময়ে উহা দীপ্ত অগ্নিবৎ ঘোর রক্তবর্ণ দেখায়।

হাইড্রোজেন ইহার প্রধান উপাদান। এই দুই মণ্ডল ছাড়াইয়া সূর্য্যদেহের আর এক আবরণ আছে। তাহা কেবল পূর্ণগ্রহণের সময়েই দৃষ্টিগোচর হয়, অন্য সময়ে হয় না। এই আবরণকে কিরীটমণ্ডল (Corona) বলে। এই কিরীটমণ্ডল দেখিবার নিমিত্তই এত আয়োজন, এত আগ্রহ। যত প্রকার যন্ত্র প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তৎসমুদয়ই প্রযুক্ত হইয়াছে। এক এক গ্রহণ যায়, আর অভিজ্ঞতা, ত্রুটি, সমস্ত লিপিবদ্ধ হয়। এইরূপে ১৮ ৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কিরীটমণ্ডল দর্শনের নিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছে, তৎসমুদয় মনে করিলে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। যাহা হউক, এখন বোধ হইতেছে যে, কিরীটমণ্ডলের অধিকাংশ জড়কণায় গঠিত। কিরীট সূর্য্যবিম্বের চারিদিকে সমান দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত নহে। উহার যেন শিখা আছে সেই সকল শিখা আকাশের বহু বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই রূপ একটা শিখা ৭০।৮০ লক্ষ মাইল দীর্ঘ পরিমিত হইয়াছে। সকল সময়েই এত দীর্ঘ থাকে না, এবং কিরীটও একই প্রকার দেখা যায় না। উপরের অনুমান সত্য হইলে সূর্য্যবিম্ব হইতে সূক্ষ্ম জড়কণার স্রোত বহুদিকে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে। কিরীটে বায়বীয় পদার্থ অল্পই আছে। জড়কণাও ঘন সন্নিবিষ্ট নহে। কারণ কোন কোন সময়ে ধূমকেতু তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখা গিয়াছে, অথচ তাহার গতি কিছু মাত্র বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই।

আপাততঃ মনে হইতে পারে, প্রখর দীপ্তিশালী সূর্য্যবিম্ব কোন বস্তু দ্বারা আচ্ছাদন করিলে কিরীটমণ্ডল দৃশ্য হইবে। কিন্তু তাহা হয় না। না হইবার কারণ আমাদের আবহের আলো। যদি আবহের উপরে উঠিয়া দেখা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে সূর্য্যবিম্বকে আচ্ছাদন করিলেই বর্ণমণ্ডল ও কিরীটমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হইত। বর্ণমণ্ডল ৮।১০ হাজার মাইল গভীর। কিরীটমণ্ডলের দীপ্তি অল্প নহে; দুই তিনটা চাঁদের আলোর সমান।

কিন্তু কিরীটমণ্ডল যে সূর্য্যদেহের অংশ, বাহিরের কিছু নহে, তাহার প্রমাণ কি? ইহার দুইটি প্রমাণ আছে। একটি প্রমাণ এই যে, পরস্পর দূরবর্ত্তী স্থান হইতে কিরীটের যে সকল ফটো লওয়া হইয়াছে, সকলের মধ্যেই একই ভাব দেখা যায়। অবশ্য যন্ত্রের দোষগুণে, আবহের অবস্থাভেদে কিছু কিছু প্রভেদ দেখা যায়। কিন্তু সে প্রভেদে এমন বুঝায় না যে, আবহের ফলে কিরীটের উৎপত্তি। দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, কিরীটে স্বপ্রকাশ বায়বীয় পদার্থের লক্ষণ পাওয়া গিয়াছে। চন্দ্রের নিকটে বা আমাদের আবহে এরূপ পদার্থ দেখা যায় না। কাজেই কিরীটটি সূর্য্যদেহের অংশ বলিতে হইয়াছে। সূর্য্যবিম্বের বা প্রভামণ্ডলের ব্যাস প্রায় ৯ লক্ষ মাইল। তাহাকে বেষ্টন করিয়া যে বর্ণমণ্ডল ও কিরীট রহিয়াছে, তাহাদের বিস্তার যোগ করিলে সৌর দেহখানি কত বড় দাঁড়ায়, ভাবিয়া দেখুন। অথচ সূর্য্য একটা তারা মাত্র!

প্রেমলীলা।

[নাট্যরাসক]

বিজ্ঞপ্তি।

এই দৃশ্যকাব্যখানি নাট্যরাসক নামের অনুপযোগী না হইতে পারে; কারণ দর্পণকার বলিয়াছেন

নাট্যরাসকমেকাঙ্কং বহুতাললয়ান্বিতং।
উদাত্তনায়কং তদ্বৎ পীঠমর্দ্দোপনায়কম্‌।
হাস্যোঽঙ্গ্যত্র সশৃঙ্গারো নারী বাসকসজ্জিকা।
মুখনির্ব্বহণে সন্ধী লাস্যাঙ্গানি দশাপি চ।

কাব্যখানি একটি অঙ্কে শেষ বলিয়া অঙ্কের নাম না দিয়া, কেবল প্রথম দৃশ্য, দ্বিতীয় দৃশ্য ইত্যাদি দ্বারা গর্ভাঙ্ক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি।

জ্যোতিঃ, আনন্দ, সুষমা, সুহাসিনী; ও তিন জন দেবলোকবাসিনী, যথা বনবালা, অনিলবালা এবং সরবালা।

প্রস্তাবনা।

সময় সন্ধ্যা—স্থান কাননভূমি

[বনবালা এবং সরবালার প্রবেশ]

বন—কাননে ফুল ফুটেছে

সর— আকাশে চাঁদ উঠেছে

উভয়ে— খেলাবি কে কে তোরা আয়।

সর—সুধা ঝরে চাঁদের করে, প্রেমের খেলা
কে খেলাবি আয়।

উভয়ে—কাননে ইত্যাদি

[অনিলবালার প্রবেশ]

অনিল— (গান)

বহিছে মধুর মলয় বায়,
পরাণ লইয়া খেলি গো আয়।
আমি কুড়ায়ে পেয়েছি হৃদয় দুটি
তাই নিয়ে আয় খেলিগো।
আমি উড়ায়ে এনেছি হৃদয় দুটি
তাই নিয়ে সবে খেলিগো।

বন—দেখি দেখি সখি পেয়েছ কি ধন?

সর—এ যে মানবজীবন—ধূলার রতন!

অনিল—এইত খেলনা মনের মতন,
তাই নিয়ে সবে খেলিব
লয়ে দুখময় মানবহৃদয় পিরীতির খেলা দেখিব।

অনিল—(নাচিয়া) আমি এনেছি লুটি হৃদয় দুটি
(এদের) প্রেমের সাগরে ভাসাব,
সুখে হাসাব; দুখে কাঁদাব—
(আবার) বিরহযাতনা করিয়ে রচনা ধূলার মাঝারে খেলিব।
আমি উড়ায়ে এনেছি হৃদয় দুটি, কুড়ায়ে এনেছি হৃদয় দুটি,
তাই নিয়ে আয় খেলিব।

বন—(হৃদয় দুইটি হাতে লইয়া ফুঁদিয়া)
আমি দিনু ভরি প্রেম অনুরাগ

অনিল—(উক্ত প্রকার করিয়া) আমি দিনু সখি যাতনা।

সর—(উক্ত প্রকার করিয়া)
আমি দিনু ভাই সুধুই সোহাগ
দুখে সুখময় ভাবনা।

[হৃদয় দুইটি দূরে নিক্ষেপ করণ]

(সকলে নাচিতে নাচিতে গান গাহিয়া)

বন— (মোরা) উড়িয়া বেড়াই ফুলে মধু খাই
প্রেম কারে বলে জানিনা
(সদা) জোছনা নিশিতে হাসিতে হাসিতে
হেরিগো প্রেমের যাতনা।

অনিল— (সুখে) বিচরি গগনে, পবন বাহনে
মেঘের আসনে বসি;
(আর) হেরি অনুরাগ সোহাগ বিরাগ
খিল্ খিল্ করে হাসি।

সর— (মোরা) বীচিবিভঙ্গে সলিলে রঙ্গে
নাচিগো পুলক ভরে;
(সুধু) হেসে হই খুন, প্রেমের আগুন
দহে যবে নারীনরে।

সকলে— (আজি) লুকায়ে কুঞ্জে কুসুমপুঞ্জে
পবনে গগনে জলে,
(সবে) প্রেমের মিলন বিরহরোদন
হেরিব গো কুতূহলে।

প্রথম দৃশ্য।

প্রথম রজনী।

সুষমা— (বনপ্রান্তে মালা গাঁথিতে গাঁথিতে)

সোহিনী বাহার—কাওয়ালি

(একি) আপনি উথলে প্রাণ হরষে!
আপনি ফুটিয়া উঠে বসন্ত ভুবনে,
আপনি কুহরে পিক কুসুমিত কাননে,
আপনি বিকাশি নিশি বিশদ জ্যোছনারাশি,
দিশি দিশি সুধা বরষে।
আপনি সৌরভভরে ফোটে ফুল কুঞ্জে,
আপনি সুখের ঘোরে অলিকুল গুঞ্জে,
আপনি জীবনতটে যৌবন উঠে ফুটে
পূরি প্রাণ প্রেমলালসে।

জ্যোতিঃ— (বনের অন্য প্রান্তে দাঁড়াইয়া)

কীর্ত্তন ভাঙ্গা ঝাঁপতাল

কে গো বিরাজে আজি রমণীমণি কুসুমবনে;
হাসিছে শত ফুল্লফুল কুসুমিত ও যৌবনে।
কাহার তরে পবন বহে? কাহার তরে বিহগ গাহে?
আমার পরাণ চাহে লুটাতে সুধু ও চরণে।

(সুষমার নিকট অগ্রসর হইয়া)

কে তুমি কানন মাঝে কুসুমময়ি ললনে!

(সুষমা ব্রীড়াভরে সঙ্কুচিতা, এবং নম্রদৃষ্টিতে অপাঙ্গে জ্যোতির মুখাবলোকন)

মরি কি সুন্দর মালা শোভিছে নানা বরণে।

সুষমা—নিত্য হেথা মালা গেঁথে ঝুলাই পাদপশাখে,

নিত্য এই মালা ঘিরে প্রভাতে বিহগ ডাকে।

জ্যোতিঃ—বনের বিহগ যারা তাদেরো পরাণ গলে ;

মাধুরির মধুরিমা নিত্য সিদ্ধ মহীতলে।

পাদপের কি সৌভাগ্য !

(নেপথ্যে নারীকণ্ঠধ্বনি)

সুষমা— (কম্পিত হস্ত হইতে মালাপতন)

সখীরা আসিছে বনে,

(স্নেহসূচনা করিয়া)

যাই আমি ! [প্রস্থান

জ্যোতিঃ— আর দেখা হবে কি ইহার সনে ?

মালা কুড়াইয়া লইয়া

যত দিন ফুল গুলি আপনি না পড়ে ঝরি,

কাটাব যামিনী দিবা এই মালা বুকে পরি।

(মালা চুম্বন ও বক্ষে ধারণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দ্বিতীয় রজনী।

জ্যোতিঃ- সেই পুরাতন কথা ! আত্মবাসনায়

রমণীর প্রেম মোরা গ'ড়ি কল্পনায়।

কই, আজি আর দেখা হলনা যখন,

ভুলেছে আমারে তবে রমণীরতন।

(মাথায় ও গলায় কাপড় জড়াইয়া আনন্দের প্রবেশ)

আনন্দ—(দূর হইতে আত্মগত)

বটে বটে, বনে বসে আছেন রাত্তির উপরে,

মুখখানি নীচুদিকে চক্ষু দুটি উপরে।

ব্যাপারখানা দেখি লুকিয়ে একটু খানি।

এত নেশা কবিতার ? তাত নাহি জানি।

জ্যোতিঃ— (গান)

গোপনে বিজনে আমরা দুজনে

(যবে) নয়নে নয়নে চাহিনু—

আঁখির ভাষায় প্রেমের তৃষায়—

নীরবে প্রণয় যাচিনু—

লুকছিলমন করিতে চুম্বন

লাজে ভরা রাঙ্গা কপোলে—

(তুমি) গেলে গো চলিয়া কাতরে চাহিয়া—

লোকলাজ-ভয়ে চপলে।

প্রণয়ের নামে এ বিজন ধামে

রচিনু বিরহযাতনা।

পোহায় অমনি চাঁদনি রজনী ;

এস তুমি ফুলবসনা।

আনন্দ (স্বগত)

একি বলে ! ঠেক্‌ছে যেন কথা গুলি ঠিক।

না,না মিছা কল্পনা এ ; কবিতার বাতিক।

(নিকটে গিয়া প্রকাশ্যে)

ওহে ভাই, কি হচ্ছেহে এত রাত্রে বসে ?

আঃ রে গেল ! বাঘ্ ভাল্লুকের ভয়ও নাই কি মনে?

হেথা বসে উদ্ধ মুখে ভাবছ কিসের ভাবনা ?

প্রতিজ্ঞা কি করেছ যে ঘরে ফিরে যাবনা ?

কাব্য নিয়ে ভাববে কত ? ধর্‌বে যে গো মাথা ;

কামড়াবে যে হাত পা ভাই, গায়ে হবে ব্যথা।

হিম লাগালে বনে বনে হবে যে ভাই কাশি ;

দেখ বরং চাঁদ্‌নি রাত বন্ধ করে শাশি।

জ্যোতিঃ তুমিও জাননা সখা কি বেদনা বক্ষে।

আনন্দ হিম লেগেছে ; কমফর্ট বাঁধ যদি চাও রক্ষে।

বাড়ী চল গরম জলে ফোমেণ্ট করে দিব।

জ্যোতিঃ— এনহে সে ব্যথা, সখা, কি আর কহিব।

(দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ)

আনন্দ—হয়েছে কি ?

জ্যোতি — হায় সখা, মম প্রাণ মন

হারায়েছি হায় ! কোথা সে জীবনধন ?

আনন্দ —এই বল্লে প্রাণে ব্যথা ; এই বলছ ভাই

হারিয়েছ জিনিষটাই, একেবারেই নাই ?

নাই জিনিসের এত ব্যথা ? থাক্‌লে হত কি ?

জ্যোতি—তামাসা কি লাগে ভাল ? বল করিব কি ?

আনন্দ—সুধু তুমি দেখ্‌লে কারে, (আর) প্রাণটা গেল হারিয়ে,

এটা কিন্তু কথা নয়হে,— অৰ্দ্ধেক গেলে ভাঁড়িয়ে।

চোখোচোখিও হয়েছে, কথাবার্ত্তাও ধ্রুব :
আঁচও কিছু পেয়েছ, কোন রকম শুভ।
এক হাতে কি তালি বাজে? বোঝেন সবই শম্ভু ;
তাতে কি কবিতা ছোটে এত লম্বা লম্বা ?

জ্যোতিঃ—আঁখি যে দিয়াছে আশা, সে বুঝি আসিবে ভাই।

আনন্দ—তবে একটু বসে থাক, আমি না হয় সরে যাই।
জলদি জলদি যা হয় কর, রাত হচ্ছে ভারি ;
আমার আছে সর্দ্দির ভয়, সে অবলা নারী।

[আড়ালে অবস্থান।

জ্যোতিঃ— (গান)

লতায় পাতায়
সরসীজলে
জ্যোছনা ঝলে;
শাখায় শাখায় কুসুম হাসে।
অধীর সমীর
সুরভি লুটি
বহিছে ছুটি ;
ভরিছে ভুবন মধুর বাসে।
কলিকা বালিকা
আপনি খুলি
হৃদয়কলি,
দিতেছে অনিলে সুরভি সেধে ;
তুমি কি সুমুখি
বিরহ ঢালি
হৃদয়ে খালি,
রহিবে পরাণ পাষাণে বেঁধে ?

আনন্দ—(পুনঃ প্রবেশ করিয়া)
না ভাই কিছু হলনাক, সৃষ্টিটা নিঃঝুম।
আমারও ছাই পেয়েছেত বেজায় রকম ঘুম।
রমণী আর সমীরণ, শুভ্র চাঁদ্‌নি রাত ;
এতেত আর পেট ভরে না ; চল খাইগে ভাত।

জ্যোতিঃ—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া)
হা মোহিনি ! আমাদের কবে দেখা হবে ?
অসহ জীবনভার কিসে বহি তবে ?

(আনন্দের গান গাহিতে গাহিতে জ্যোতিঃর সঙ্গে প্রস্থান)

আনন্দ (গান)
বাহবা এ বড়ই মজা মাছ ধরেছে বড়শীতে।
একটুখানি খেলুক বরং দেখুক পাড়া পড়সীতে।
গভীর জলে থাকেন যাঁরা, আগে ধরা পড়েন তাঁরা,
সুখে করে ছুটাছুটি চুনা পুঁটি কূলেতে।

তৃতীয় দৃশ্য।

তৃতীয় রজনী।

(সুষমা ও সুহাসিনীর প্রবেশ ; উভয়ে বনমধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে)

সুষমা— (গান)

এ'হিনা সখি কুসুমবনে
ডাকিল বঁধু গাহিয়া ;
আর কি হারে হেরিব তারে
নয়নে ?
শন্য হেরি বিজন বন,
উঠিছে প্রাণ কাঁদিয়া।
এহি কি ফল প্রেমফুল
চয়নে ?

(কিঞ্চিৎ মৌনাবলম্বনের পর সুহাসিনীর দিকে চাহিয়া)

(গান)

ভ্রমিনু গহনবন
বিচরি ;
সখি কি করি ?
কোথা গেলে পাব তারে দেখিতে ?
এত যে ডাকিনু তারে
কাঁদিয়া,
এত সাধিয়া ;
কোথা বল গেল বঁধু চকিতে ?

সুহাসিনী—

চ একটি কথা কই প্রিয় সই
শুন স্থির চিতে—
বলদেখি ভাবনাটা কি
পুরুষের প্রাণ নিতে ?
যখন সাঁঝে বনের মাঝে
ঐ রকমে দেখা,

(তখন) ঘুরে ঘুরে আসবে ফিরে
বনে একা একা।
যদি ক্ষণে নয়ন কোণে
চাওগো তাহার পানে,
নামটি ধরে ডাক তারে
ইষারাতে গানে —
ছুট কাটিয়ে পথ না পেয়ে
পড়বে প্রেমের পাশে
প্রেমপিঞ্জরে রেখো পুরে—
নাচিবে উল্লাসে।
সোহাগ ভরে ডানা নেড়ে
পড়বে পড়া যা
বলবে পষ্ট রাধা কেষ্ট
বকবা বকম বা।
(যদি) শোনে প্রেমে গেছে ঘেমে
যুবতী রূপসী,
ঋষি মনিষ্যি যে হোক খুসী
বাঁধন যাবে খসি।
(পুরুষের) এইত রীতি এই পিরীতি,
এই পুরুষের প্রাণ।
তারই তরে বিষাদ ভরে
এত আন চান্?

সুষমা—তুমিত বোঝনা সখি, সে যে ত্রিদিবের ধন
শত শত তপস্যায় মেলেনাক সে রতন।
ছলনায় নাহি প্রেম, সে যে অতুলন ভবে,
প্রেমহীন আঁখি তব, প্রেম কি দেখিবে তবে?

সুহাসিনী—
প্রেমটা বোধ হয় গুঁড়ো বালি লেগে যায় যার চোখে,
চক্ষু থাকতে কানা সেজন অন্য সবাই দেখে:
এগিয়ে এল আগে যে, তার মনটা নিশ্চল:
আর তোমারি মন হাল্কা-বাতাস কিম্বা নদীর জল।
নিজেরাই কল্লে খাড়া মনগড়া এক বাখড়া —
বিরহের কুস্তি কচ্চ খুলে প্রেমের আখড়া।

সুষমা—(হাসিয়া ও আদর করিয়া)
নিত্য হাস্যময়ী তুমি প্রিয় সহচরি;

এস দুঁহে গান গেয়ে যাতনা পাশরি।
(উভয়ের গান)
(গান)

সুষমা—যৌবনে একি বিষময় বাসনা,
দহে প্রাণ মন সখি সৃজি নব যাতনা।
সুহাসিনী—ফুটিলে কমল কলি সৌরভে জুটে অলি
ভুলাতে পুরুষে তাই বিধির এ রচনা।
যৌবনে তাই সই সুখময় বাসনা।
সুষমা—প্রেম কি বিষম সই বিরহে আকুল হই,
সুখের আশায় নারী চিরদুখে মগনা।
সুহাসিনী—নিদাঘের জ্বালা সই বরষায় থাকে কই?
দই এই বঁধু তব আসিল দেখনা।
(আমি আর রব না)
(সুহাসিনীর প্রস্থান)

বনপাশে জ্যোতির প্রবেশ

— —

চতুর্থ দৃশ্য।

চতুর্থ রজনী।

(জ্যোতিঃ ও আনন্দের প্রবেশ)

জ্যোতি (গান)
সাজিল কি চারু সাজে বসন্ত বালিকা,
পরিয়া মোহনমালা নব নব প্রসূনে।
চুমি কিশলয় দল বুকে দোলে কলিকা
আহরিছে মধু অলি বিকশিত কুসুমে:
শোভিয়া পাদপদেহ ঐ বনলতিকা
কাঁপিতেছে ঘন ঘন নব সুখ পবনে;
অমল ধবল রূপে মল্লিকা যূথিকা
মোহিত করিছে মন আজি কিবা কাননে।

আনন্দ—বস, বস, ঢের হয়েছে; ভালো ভনিয়ার খেলা!
আজ যে বড় হাসি খুসী দেখছি সাঁঝের বেলা।

জ্যোতিঃ—নব সুখ উৎস আজি উচ্ছলিছে হৃদিতটে,
প্রকৃতি মোহনরূপে ভাতিছে নয়নপটে।

আনন্দ—
সেটা বেশ বুঝ্তে পারি নূতন প্রেমের জোরবে
একটা দিনই দেখ্তে পাই, শিমুল ফোটেন সৌরভে।

একটা দিনই আছের ভাই সন্দেহ নাই তাতে ;
যখন জোছনা ফোটে একেবারে অমাবস্যার রাতে,
আর, যখন তখন কোকিল ডাকে বহে সমীরণ।
তার পরে হলে পরে বিবাহ মিলন,
থাকবে দোঁহে দিনকতক যেন মানিক জোড়---
অবশেষে উলটে পালটে খাঁড়া বড়ি থোড়।
তুমি আসবে তেতে পুড়ে সে রাঁধবেনা ভাত,
কোথায় রবে কোকিল তখন কোথায় চাঁদনি রাত।
আধ আধ ন্যাকা কথা থাকবে কতক্ষণ,
ড্যাকরা আর পোড়ারমুখো প্রিয় সম্বোধন।
এইরূপে যাবে দিন, তার পরে আবার
উদয় হবেন খোকা খুকী, উজ্জ্বল সংসার।
কোথায় রবে কার্পেট বোনা কিম্বা মালা গাঁথা,
চাঁদবদনী কর্বেন সেলাই খুকুমণির কাঁথা।
কোথায় যাবে ফুল চন্দন আতর গোলাপজল,
খোকা বাবুর লালে অঙ্গ করবে টলমল।
ম্যালাই কথায় বকাবকি এখন না হয় থাক।
শুনে নেও দুটি দিন কোকিলেরি ডাক।

জ্যোতিঃ—বাহাবা আনন্দ! কিন্তু সবি অ জি মিঠে :
বিদ্রুপটুক মনে হল যেন মধুর ছিটে।
(দূরে সুষমা ও সুহাসিনীর প্রবেশ)

আনন্দ—আসছেন রূপের গরবিনা! এক জোড়া যে!
উনি কে?

জ্যোতি—বোসো তুমি, আ ম একটু এগিয়েই আনিগে।

সুহাসিনী—(জ্যোতির প্রতি)
মহাশয় নমস্কার ; আমি সখী সুষমার।

আনন্দ— বাহাবারে বেহায়া! গুরু মহাশয় নমস্কার!

সুহাসিনী—আঃ মলো যা, এটাকে, গায়ে পড়ে কথা কয়?
যা তা বলে গাল দিচ্ছে? একটুও নাহি ভয়!

আনন্দ— ভয় নেই? খুব আছে : বাপ্ রে কি অবলা!
মহাশয় কি মুখ বুজেই থাকেন নাকি দুবেলা?

জ্যোতি— এস আমরা সরে পড়ি ঝগ্ড়া করুক দুজনে—

সুষমা— সখি আমি আসছি—

সুহাসিনী— (কথা না কানে তুলিয়া)
দেখিনি ত্রিভুবনে
এমন ধারা মিন্সে ; ঝগ্ড়া নিলে বাধিয়ে!
নাকের জলে চোখের জলে যাব তোমায়
কাঁদিয়ে।

আনন্দ— যে বাজের কড়মড়ি, যে বর্ষার ঘটা
জলে দেবে ভিজিয়ে তাহে কিবা ল্যাটা।

সুহাসিনী—রসিকতাও কত্তে জান? পোড়ার মুখো বাঁদর!

আনন্দ— তাইত আমি তোমায় দেখে কচ্চি এত আদর।
(ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া সুহাসিনীর দিকে তাকাইয়া)
মুখখানিত ফরসা, চোখ দুটিও খাসা,
ঠোঁটও বেশ পাত্‌লা, তিলফুল নাসা।
চুলগুলিও ঘন ঘন মেঘের মত কালো,
জিভ্ একটু ঠাণ্ডা হলেই সব্ হত ভাল।

সুহাসিনী—(একটু নরম সুরে)
সুন্দরী হই, নাই হই, কিম্বা ভূত পেত্নী—
তোমার কি?

আনন্দ— আমি যদি কত্তে চাই পত্নী?

সুহাসিনী—(খুব ঠাণ্ডা সুরে)
আস্পর্দ্ধা দেখনা, এই দিলেন গাল,
এই দেখাচ্চেন ভালবাসা ; আঃ পোড়া কপাল!

আনন্দ— তবে তোমার মন নেই, রাগ করেছ, বটে?
কোথা গেল ওরা সব? দেখে আসি উঠে।

সুহাসিনী—(বলি) একটুখানি থাক না!
এখান থেকেই ডাকনা!
কি বল্‌ছ বলনা!
গাল্ কি মনে থাকে?
না হয় কিছু বলেছ,
না হয় দোষ করেছ,
ঘাট হয়েছে বল্লেই
সবদোষ ঢাকে।
অত গোল নাই কল্লে,
তা না হয় নাই বল্লে,
মেটাবার মন থাক্‌লে
সবি যায় মিটে।

আনন্দ—[স্বগত] আমারও যে ভিজ্‌লো মন,
তামাসার নাই দম,

বলছে কিন্তু যা এখন
লাগ্‌ছে বেড়ে মিঠে।

[প্রকাশে] বল্‌ছিনু কি, পুরুত ডেকে মন্তর টন্তর পোড়ে,
একেবারে তোমাকে নিয়ে যাই ধরে।

সুহাসিনী—তা আমার কাপড়ের পুঁটুলিটি যে আছে?
আনতে পার লোক পাঠিয়ে পিসীমার কাছে?

আনন্দ—তার আর ভাবনা কি? এখন এস নাচি;
আর একটা গান গেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

[উভয়ের গান ও নৃত্য]

(গান)

আনন্দ—
[ওগো] যেঁসিনে পিরীতের কাছে তব এসে পড়ে গায়;

সুহাসিনী—
মনের কথা বল্লে খুলে, এই পিরীতি সবাই চায়।

আনন্দ—
মন্দানি আর রৈল কোথা, থোঁতা মুখ করেছ ভোঁতা,
কিন্তু বলি সত্যি কথা, পিরীতে প্রাণ নাহি ধায়।

সুহাসিনী—
বকের কথা জানি বটে, মাছে রুচি নেইক মোটে,
সুধু জল ঘাঁটিতে ঠোঁটে সরোবরে পা বাড়ায়!

আনন্দ—
সুখতো এতে করে ঢু ঢু, কে খাবে দিল্লিকা লাড্ডু
ছদিনের ধন রূপ যৌবন তারি তরে এত হায়।

সুহাসিনী—
বুকে যার লালসা শুধু, সে কি গো পায় প্রেমে মধু?
অমৃত ফল খেতে গিয়ে হনুমানের বটে দায়।

[জ্যোতি ও সুষমার প্রবেশ]

জ্যোতি—এই না যুদ্ধ হচ্ছিল, তুমুল বেজায়;
চট্‌করেই হল সন্ধি?

সুষমা—(হাসিয়া) থাক সে কথায়।

আনন্দ
থাক্‌বে কেন? বল্‌ছি শুন, সঙ্গীন যুদ্ধ এখন:
চল্‌বে এটা বরাবর যত দিন যায় জীবন।

জ্যোতি:—(হাসিয়া) বেশ হয়েছে,

সুষমা— বেশ হয়েছে,

আনন্দ— আমিও বলি বেশ,

সুহাসিনী—তুমি একটি আস্ত গরু গাধা কিম্বা মেষ।
ওদের বিয়েয় বেশ বল, তাহলেত সাজে?

আনন্দ আমাদের বিয়েটাকি নিতান্তই বাজে?

বিদায় দৃশ্য।

চতুর্থ রজনী শেষে

বনবালা, সরবালা ও অনিলবালার প্রবেশ।

(একসঙ্গে সকলের গান ও নৃত্য)

গান।

মোরা ভেসে যাই ভবে গেয়ে যাই
এস নেচে যাই এক সঙ্গে।

প্রেমলীলা প্রেমের খেলা—
দেখিয়াছি কত রঙ্গে।

কানন ভরি বহিছে মরি
কৌমুদী নদী ঐ গো।

আয়লো স্বজনি সাঁতারে এখনি
চাঁদ লতে তনু যাইগো।

প্রেমের নদী, মানবহৃদি
উছলি উছলি চলিল—

আনন্দে হাসিতে ভাসিতে ভাসিতে
সুষমা জ্যোতিতে মিলিল।

যায়রে চাঁদনি নিবিয়ে স্বজনি,
পাই কি না পাই ধরিতে।

মধুমাস যায় যামিনী পোহায়
চল নেচে যাই ত্বরিতে।

[সকলের প্রস্থান]

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা ও পঞ্জাবে বাঙ্গালী।

খ্যাতনামা বারাণসী-প্রবাসিগণের মধ্যে স্বর্গীয় রামকালী চৌধুরী মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইঁহার আদর্শ জীবন বঙ্গীয় যুবক মাত্রেরই শিক্ষাস্থল। ১৮২৮ খৃঃঅব্দে কৃষ্ণনগরে মাতুলালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইঁহার পিতা কলিকাতার একটী সওদাগরী আপিসে কর্ম্ম করিতেন। রামকালীবাবু দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃহীন হন। তাঁহার শোকার্ত্তা জননী তখন তাঁহাকে লইয়া কাশীবাসিনী হন। এখানে পিতৃহীন বালক প্রথমে জয়নারায়ণ কলেজে ভর্ত্তি হন। তৎপরে বারাণসী কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং যথাসময়ে জুনিয়র ও সীনিয়র বৃত্তি লাভ করিয়া বারাণসীর কমিশনর রীড সাহেবের নিকট আইন অধ্যয়ন করেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তৎকালীন ছোটলাট টমসন্ বাহাদুরের নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হন। কিন্তু ছোটলাট প্রথমে তাঁহাকে আগ্রার আদালতে উর্দ্দু সেরেস্তার কর্ম্ম শিক্ষা করিতে পরামর্শ দেন। এই সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর। আগ্রা অবস্থানকালে স্থানীয় কলেক্টর সাহেবের অনুরোধক্রমে ইনি কয়েকখানি ইংরাজী প্রথমশিক্ষার উর্দ্দু অনুবাদ পুস্তক প্রণয়ন করেন। ঐ পুস্তকগুলি গ্রাম্য পাঠশালার ছাত্রগণের পাঠ্য নির্দ্ধারিত হয়। পরে রামকালীবাবু মৈনপুরী জেলা আদালতের অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হন এবং ১৮৫৬ সালে গাজীপুরে উচ্চবেতনে উক্তপদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময় মহম্মদাবাদ মুন্সিফী পদ শূন্য হওয়ায় রামকালীবাবু যোগ্যতার পুরস্কারস্বরূপ উহা প্রাপ্ত হন। সিপাহীবিদ্রোহের শান্তি হইলে রামকালীবাবু কয়েকবৎসর অতীব দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করিয়া উত্তর-পশ্চিমের নানা স্থানে মুন্সিফ সদরালা ও জজের পদে উন্নীত হন। যখন ভারত-গভর্ণমেণ্টের আদেশে হাইকোর্টে দেশীয় বিচারপতির পদ সৃষ্টি করা হয় তখন স্থানীয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জষ্টিস ষ্টুয়ার্ট মহোদয় বাবু রামকালী চৌধুরী, বাবু কাশীনাথ বিশ্বাস এবং বাবু দ্বারকানাথ বিশ্বাস এই তিনজন বাঙ্গালীর নাম উক্ত পদের উপযোগী বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু সে সময় ভিন্নপ্রদেশবাসীকে ঐ পদে নিয়োজিত করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না করায় প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তবে রামকালীবাবুর কার্য্যকুশলতা, সুবিচারপদ্ধতি এবং অসাধারণ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে এলাহাবাদ ছোট আদালতের জজ নিযুক্ত করেন। ১৮৮৪ সালে ইনি পেন্সন গ্রহণ করিয়া কাশীবাসী হন। রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াও রামকালীবাবু অবশিষ্ট জীবন অলসভাবে ক্ষেপণ করেন নাই। প্রকৃত কর্ম্মবীরগণ তাহা পারেন না। তাঁহাদের কর্ম্মক্ষেত্র উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করে। ইনি সারাটি জীবন বিবিধ সৎকার্য্যে এবং পরহিতব্রতে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইনি বহুকাল বারাণসীর মিউনিসিপাল কমিশনর, অনররি ম্যাজিষ্ট্রেট, বোর্ডের ভাইসচেয়ারম্যান, ষ্টাণ্ডিং কংগ্রেস কমিটির সার্বজীবন প্রেসিডেণ্ট, কারমাইকেল লাইব্রেরী, বাঙ্গালীটোলা স্কুল, বাঙ্গালীটোলা এসোসিএশন, বঙ্গসাহিত্যসমাজ, এচিসন অর্ফানেজ, টোটাল এব্‌ষ্টিনেন্স্ সোসাইটি প্রভৃতির সভাপতি এবং কাশী নাগরীপ্রচারিণী সভার একজন সুযোগ্য সদস্য ছিলেন। উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে নাগরী যাহাতে স্থানীয় আদালতের ভাষা হয়, ইনি তজ্জন্য বহুকাল হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন এবং অবশেষে "নাগরী মেমোরিয়াল" ব্যাপারে যৎপরোনাস্তি সাহায্য করিয়াছিলেন। রামকালী বাবু উত্তর-পশ্চিমের নানা স্থানে বিবিধ সদনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ইনি কিছুকাল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভার সভ্য ছিলেন। সত্যনিষ্ঠা, সৎসাহস, সহিষ্ণুতা, চরিত্রের নির্ম্মলতা প্রভৃতি অনন্যসাধারণ গুণরাশিতে ইনি সমাজের আদর্শস্থানীয় হইয়া ১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে পরলোক গমন করেন। ইনি বর্ণ, ধর্ম্ম, ও জাতিনির্ব্বিশেষে সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন, এমন কি ইঁহার ঘোরতর বিরুদ্ধবাদী য়্যাণ্টিকংগ্রেস-নেতা স্বনামখ্যাত সার সৈয়দ আহমদ এক সময়ে বলিয়াছিলেন "He is an honest enemy"। ইঁহার বিদ্যানুরাগ এতদূর প্রবল ছিল যে উপরোক্ত সভা সমিতিতে যোগ দান করিয়াও রীতিমত সাহিত্যসেবা করিতেন। "The Reflector" বলিয়া এলাহাবাদ হইতে যে পত্রিকা প্রকাশিত হইত ইনি তাহার একজন প্রধান লেখক ছিলেন। ইউরোপীয় এবং হিন্দু দর্শন তাঁহার প্রিয় প্রসঙ্গ ছিল এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কাণপুর অবস্থানকালে ইনি অম্লরোগে আক্রান্ত হইয়া কিছুদিনের জন্য নাইনিতাল পাহাড়ে গমন করেন। এখানে তাঁহার বৈবাহিক বাবু সারদাপ্রসাদ সান্ন্যাল, এবং ৺নীলকমল মিত্রের সহিত একবাসায় অবস্থান করেন। সারদাবাবু বলেন, রামকালীবাবু অলসভাবে জীবন ক্ষেপণ করিতে একান্তই নারাজ ছিলেন। এখানেও তিনি নানা কার্য্যে আপনাকে ব্যাপৃত রাখিতেন। অধ্যয়ন, ভ্রমনাদির পর
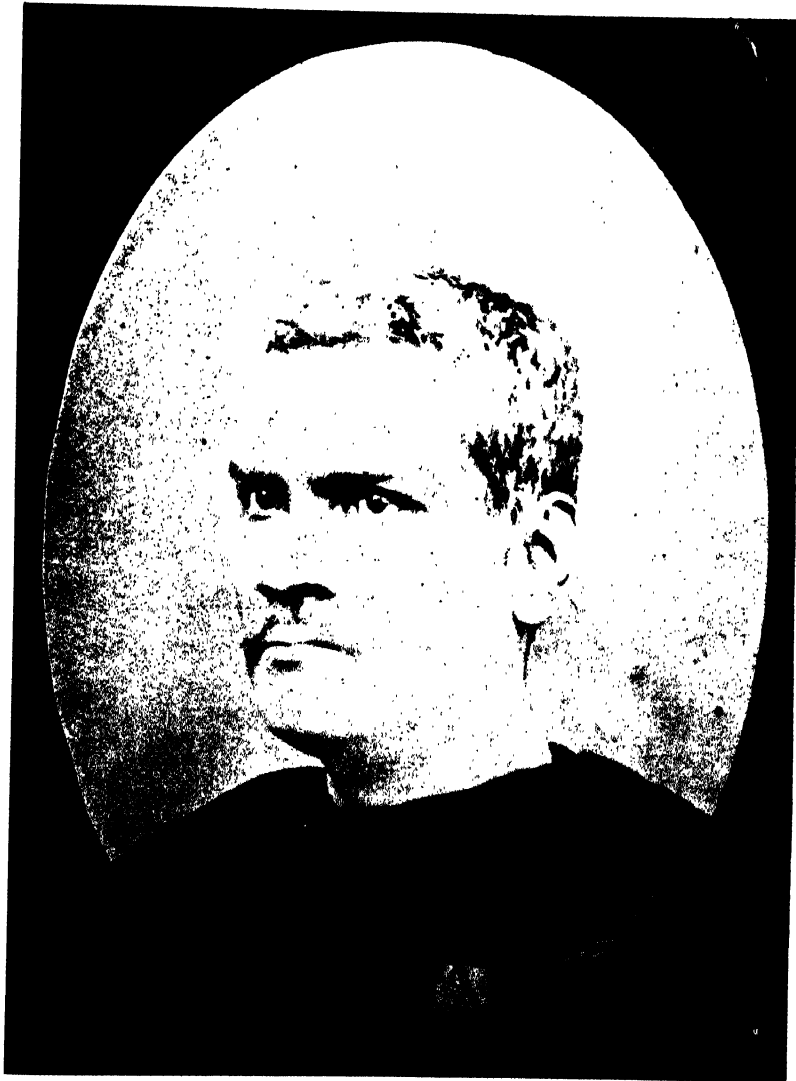
স্বর্গীয় রামকালী চৌধুরী।

From a Faded Photograph.] INDIAN PRESS.

যে টুকু সময় পাইতেন, তাহার মধ্যে পার্ব্বতীয় নানা প্রকার গাছের পাতা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের তালিকা প্রস্তুত করিতেন। এইরূপে যে কোন সদুপায়ে আলস্যকে জয় করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। ইনি এতদঞ্চলে এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে জানেন না এমন প্রবাসী বাঙ্গালী এ প্রদেশে বিরল।

কাশীপ্রবাসের অব্যবহিত পরেই এলাহাবাদে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়। প্রায় নব্বই বৎসর হইল মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন কোন কর্ম্মোপলক্ষে অযোধ্যার নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। ৺রামধন মুখোপাধ্যায় তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলেন. রামকমলবাবু রামধনবাবুকে প্রয়াগে রাখিয়া যান। ইনি কলিকাতা ভবানীপুর হইতে আসিয়াছিলেন। শুনা যায় প্রথমে ইনি ওভারসিয়ারের কর্ম্ম করেন; পরে "ফোর্টের কণ্ট্রাক্টার" হইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। রামধন বাবুর ন্যায় ধনীর কথা এলাহাবাদে অল্পই শুনা যায়। যদিও তাঁহার পূর্ব্বে দুই একজন বাঙ্গালী প্রয়াগপ্রবাসী হইয়াছিলেন, তথাপি প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীগণের মধ্যে ইনিই প্রথম। গঙ্গাযমুনা সঙ্গমের নিকট ইহার ১২ মহল প্রাসাদ ছিল। জস্‌রা নামক স্থানে সুবিস্তৃত জমীদারী ছিল। প্রায় ২৫।২৬ বৎসর হইল রামধনবাবুর মৃত্যু হইয়াছে। কথিত আছে মৃত্যুকালে ইনি ত্রিশলক্ষ টাকা নগদ রাখিয়া যান। এক্ষণে এলাহাবাদ দুর্গের সম্মুখস্থ "লাল কুঠি" তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে মাত্র। ঐ কুঠী প্রয়াগপ্রবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্রের অধিকারে আছে। চারুবাবুর পিতা এলাহাবাদের বিখ্যাত নীলকমল মিত্রের নাম স্থানীয় সকলের নিকট সুপরিচিত। কলিকাতা ইডেন উদ্যানের ন্যায় সুবিস্তৃত গভর্ণমেণ্টের উদ্যান "আলফ্রেড পার্কের মধ্যস্থলে স্থানীয় জনসাধারণের সান্ধ্যভ্রমণ এবং বিশ্রামের জন্য যে পুষ্পসজ্জিত ভূমির মধ্যস্থ প্রস্তর বেদী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নীলকমল মিত্র মহাশয়ের কীর্ত্তি। ইহার ব্যবসায় এতদঞ্চলের প্রায় সকল প্রধান প্রধান সহরে বিস্তৃত ছিল।

বারাণসীর বিখ্যাত চৌধুরীবংশসম্ভূত ৺রামেশ্বর চৌধুরী অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া পর্য্যটন করিতে করিতে প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হন। শুনা যায় তাঁহার গলগণ্ড বা গণ্ডমালা দেখিয়া পরিবারের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহার গৃহত্যাগের ইহাই কারণ। প্রয়াগের সন্নিকটে জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং এই সন্ন্যাসীপ্রদত্ত ভস্মলেপনে ইহার গণ্ডমালা ভাল হইয়া যায়। সাধুর উপদেশমত রামেশ্বরবাবু এলাহাবাদে স্থায়ী হন। তাহার পর কমিসেরিয়ট আপিসে কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া দোস্তমহম্মদের সময় কাবুলযুদ্ধে গমন করেন। তথা হইতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া এলাহাবাদে প্রত্যাগত হন। এখানে রেলের কণ্ট্রাক্টরী করিয়াও অনেক অর্থ সঞ্চয় করেন মৃত্যুকালে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা নগদ, রাজপ্রাসাদতুল্য বাগান বাটী এবং পঞ্চাধিকসহস্র টাকা মাসিক আয়ের জমিদারী প্রভৃতি রাখিয়া যান। তাঁহার এই অতুল ঐশ্বর্য্য এক্ষণে স্বপ্নবৎ হইয়া দাড়াইয়াছে। ৺রামধন মুখোপাধ্যায়, ৺রামেশ্বর চৌধুরী ও মিওর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্যের স্বর্গীয় পিতা, জমিদার মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী. বাবু তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়, বাবু মাধবচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি এলাহাবাদের অতি পুরাতন প্রবাসী। দারাগঞ্জের মিত্রপরিবারও বড় পুরাতন। তৎকালে সরকারী দপ্তরগুলি কেল্লার নিকট অবস্থিত থাকায় কীডগঞ্জ এবং দারাগঞ্জেই বাঙ্গালীগণ প্রথম বাস নির্দ্দেশ করেন। ক্রমে অনেকে মুঠিগঞ্জ ও কর্ণেলগঞ্জে এবং সিপাহীযুদ্ধের দুই এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে ৺ঈশানচন্দ্র দাস, স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র পাকড়াশী ও বাবু সারদাপ্রসাদ সান্ন্যাল প্রমুখ বর্দ্ধিষ্ণু বাঙ্গালীগণ সাহাগঞ্জ, আতরসুইয়া প্রভৃতি পল্লীতে আসিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিয়া স্থায়ী বসবাসী হন। এখানে যে সকল বাঙ্গালী মিউটিনীর সময় ছিলেন তাঁহাদের অনেকেই দুর্গের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে দুর্দ্দিনে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। অনেকে সর্ব্বস্বান্তও হইয়াছিলেন। এই সময়ের তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে উত্তরপাড়ানিবাসী স্বর্গীয় প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কাশীস্থ কোন আত্মীয়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, এবং এখানে অধ্যয়নাদির পর মুন্সেফী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যে সময় বিদ্রোহ হয় নাই সেই সময় ইনি এলাহাবাদের নিকটস্থ মঞ্জনপুর নামক স্থানের মুন্সেফ ছিলেন। স্থানীয় প্রভূত শক্তিশালী জমিদারবর্গ বিদ্রোহী

হইয়া কয়েকখানি গ্রাম জ্বালাইয়া নিরীহ গ্রামবাসীদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার করে। এই সকল জমিদার গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রকৃত যুদ্ধসজ্জা করিয়া অস্ত্র শস্ত্র গোলাগুলি লইয়া যখন ইংরাজ তহশীল আক্রমণ করে, সে সময় প্যারী

From an extremely faded Photograph

স্বর্গীয় প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোহনবাবু স্বয়ং সৈন্যদল গঠন করিয়া কিরূপ সাহস ও বিক্রমের সহিত শত্রুদলকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাহা "পাইওনিয়র" নামক ইংরাজী সংবাদপত্রে, "প্রদীপের" প্রথম খণ্ডে এবং উত্তরপাড়া হিতকরীসভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত "যোদ্ধা মুন্সেফের" সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে প্রকটিত হইয়াছে। একবার ইঁহাকে শিবির সংস্থাপনপূর্ব্বক রীতিমত যুদ্ধ করিতে হয়। সে যুদ্ধে দুর্দ্দান্ত বিদ্রোহিদলপতি ধাঅল সিংহ এবং অনেক সর্দ্দার হত হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করায় বিদ্রোহিগণ তাঁহার ভয়ে আর যমুনা পার হইতে পারে নাই। এই দ্বাবিংশবর্ষীয় বাঙ্গালীযুবকের সংসাহস ও বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ বড়লাট বাহাদুর কাণপুর দরবারে তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া বহুমূল্য খিলাত দিয়াছিলেন এবং রাজভক্তির স্বতন্ত্র পুরস্কারস্বরূপ ডেপুটীকালেক্টরের পদ প্রদান করেন। ১৮৬১ অব্দে তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও পূর্ব্বকীর্ত্তির কথা জানিয়া কাশীর মহারাজা গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনে স্বীয় জমিদারীর ভার দেন। ১৮৬৬ সালে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে প্যারীমোহনবাবু ওকালতি আরম্ভ করেন। এলাহাবাদে মিওর কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে ইনি, স্বর্গীয় রামকালী চৌধুরী এবং স্বর্গীয় রামেশ্বর চৌধুরী বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৬৯ অব্দে ছোটলাট স্যার উইলিয়ম মিওর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"The names of Lala Gyaprasad, of Babus Peary Mohan and Rameshur Choudhri, have been mentioned to me as foremost in this movement." প্যারীমোহনবাবু এদেশের অধিবাসিগণের এরূপ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশ্য সভা করিয়া স্থানীয় জনসাধারণে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ চাঁদা সংগ্রহ করেন এবং ঐ টাকায় প্রতি দ্বিতীয় বৎসর কলেজের পদার্থবিদ্যাধ্যায়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার দিবার ব্যবস্থা করেন। এলাহাবাদ সিটিরোডের উপর কায়স্থকলেজের পার্শ্বস্থ বৃহৎ অট্টালিকা এবং উদ্যান বাঙ্গালী যোদ্ধা মুন্সেফের স্মৃতি বহন করিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্যারীমোহন বাবু দেশস্থ অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর উত্তর পশ্চিম প্রবাসের মূল।

ইঁহার সমসাময়িক বাবু সারদা প্রসাদ সান্যাল ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে এলাহাবাদে আগমন করেন। নিঃসম্বল অবস্থায় বিদেশে আসিয়া স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে যাঁহারা কৃতী হইয়াছেন, সারদা বাবু তাঁহাদের একজন। ছাত্রজীবনে ইঁহার যেরূপ প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল, উত্তরকালে তাঁহার কর্ম্মজীবনও হীনপ্রভ হয় নাই। পূর্ব্ববাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে মাসিক বৃত্তি লাভ করিয়া একত্রে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন; তাঁহাদিগকে "Exhibition scholars" বলা হইত। সারদাবাবু কটক গভর্ণমেণ্ট স্কুলের চরম পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে সর্ব্বপ্রধান হইয়া এই শ্রেণীভুক্ত হন। ইঁহার সহপাঠিগণের মধ্যে স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, কুচবিহারের দেওয়ান শ্রীযুক্ত কালিকাদাস দত্ত, বারাণসীর ভূতপূর্ব্ব সবজজ শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, প্রভৃতি অনেকেই বঙ্গের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। সারদাবাবু যে সকল জনহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি ইচ্ছা করিলে প্রভূত যশোলাভ করিতে পারিতেন। ১৮৬৮ সালে ডেপুটি কালেক্টর স্বর্গীয় বাবু কমলালের উদ্যোগে আহিয়াপুর পল্লীস্থ "খাসজীর বাগানে"

Allahabad Institute নামে একটি সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা স্থানীয় জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করে। সারদা বাবু ইহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন।

শ্রী সারদাপ্রসাদ সান্যাল

সহকারী হইয়েও প্রকৃত পক্ষে সম্পাদকীয় সমস্ত কার্য্য ইনিই সম্পাদন করিতেন। যে মিওর সেণ্ট্রাল কলেজ আজ উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রস্থল রূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সারদা বাবু কর্ত্তৃক প্রথম উত্থাপিত হয়। শুভক্ষণে একদিন সভার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাপ্ত হইলে সভ্যগণসমক্ষে সারদা বাবু এ প্রদেশে উচ্চশিক্ষোপযোগী কলেজ সংস্থাপনের জন্য গভর্ণমেণ্টে আবেদন করিবার প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল। সারদা বাবু "Donations for a college at Allahabad" শীর্ষক এক খণ্ড কাগজ সকলের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। বাবু নীলকমল মিত্র তৎক্ষণাৎ এক সহস্র টাকা দান স্বাক্ষর করিলেন এবং প্যারীমোহনবাবু ও লালা গয়াপ্রসাদ প্রত্যেকে এক সহস্র করিয়া দান স্বাক্ষর করিলেন। এইরূপে এক ঘণ্টার মধ্যে পঞ্চ সহস্র মুদ্রা স্বাক্ষরিত হইল। অনন্তর সারদা বাবুর যত্নক্রমে প্রায় ১৫০০০ টাকা সংগৃহীত হইল। তখন সভা হইতে দাতাগণের নামসহ গবর্ণমেণ্টে এক আবেদনপত্র প্রেরিত হইল। সে সময় বিখ্যাত Sir William Muir উত্তর পশ্চিমের ছোটলাট। তিনি আবেদন গ্রাহ্য করিয়া পরম আহ্লাদসহকারে রাজা জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে লক্ষাধিক অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি উচ্চ শিক্ষার কলেজ এবং একটি Medical College প্রতিষ্ঠা বিষয়ক মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। অবিলম্বে উভয় কলেজের ভিত্তি স্থাপনা হইল। ক্রমেই Muir College প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু মিওর সাহেবের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর Medical College এর মেধা (Funds) সমস্ত উঠিয়া রহিত হইয়া গেল। সেই ভিত্তির উপর এখন Dufferin Hospital নির্ম্মিত হইয়াছে। কলেজের প্রথম বার্ষিক বিবরণীতে এবিষয় লিখিত আছে। Mr. W. H. Carey র সম্পাদকতায় যখন "The North West Literary Gazette" নামক সাপ্তাহিক পত্র এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত, সারদা বাবু তাহাতে প্রবন্ধাদি লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন। সেই সময় "The Reflector" নামক এক খানি সংবাদপত্রের জন্ম হয়। এদেশের স্থানীয় অধিবাসীদিগের দ্বারা ইংরাজী সংবাদপত্র প্রচারের ইহাই প্রথম উদ্যম। বাবু প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু নীলকমল মিত্র উহার প্রবর্ত্তক। বাবু রামকালী চৌধুরী এবং সারদা বাবু ইহার প্রধান লেখক ছিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া হিন্দী আদালতের ভাষা করিবার জন্য যে মহা আন্দোলন চলিয়াছে এবং নাগরী প্রচারিণী সভা প্রভৃতি হইতে নানা পুস্তিকা ও পত্রাদি প্রকাশিত হইতেছে, সারদা বাবু তাহার মূল—একথা বলিলে অনেকেই বিস্মিত হইবেন। কিন্তু ৩২ বৎসর পূর্ব্বে এবিষয়ে ইনি Aligarh Institute Gazette ও Reflector প্রভৃতি পত্রে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া তুমুল আন্দোলন করিয়া ইহার বীজ রোপণ করিয়াছিলেন। তখন মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা সার সৈয়াদ আহমদ তাহার ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন এবং উভয়ের বাদ প্রতিবাদ উক্ত পত্রিকাদ্বয়ে

প্রকাশিত হইতে লাগিল। সেই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মিওর মহোদয় সারদা বাবুকে ডাকিয়া পাঠান। সারদা বাবু পাারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকালী চৌধুরী, নীলকমল মিত্র এবং গয়া প্রসাদ, এই চারি জন সমভিব্যাহারে লাট সমীপে উপনীত হইলেন। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর কেম্পসন সাহেব তথায় উপস্থিত ছিলেন। লাট বাহাদুর ইঁহাদের সাদর অভ্যর্থনা করিয়া সারদা বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখিতেছি, আপনারা বাঙ্গালী, এদেশে চাকরি উপলক্ষে আসিয়াছেন, কর্ম্ম শেষ হইলে স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন। আপনাদের আদালতে উর্দ্দু থাকাতে ক্ষতি কি?" তখন উন্নতমনা তেজস্বী রামকালী বাবু দণ্ডায়মান হইয়া সংক্ষিপ্ত অথচ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া বলিলেন—"মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে দেশে বাস করে সেই দেশীয় লোকের হিতচিন্তা ও দুঃখ মোচন করিতে যত্নপর হয়। বাঙ্গালী জাতি এত স্বার্থপর নহে যে এরূপ অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে পরাঙ্মুখ হইবে।" তৎপরে তিনি হিন্দী প্রচলনের আবশ্যকতা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু ছোটলাট এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া বলিলেন, "হিন্দী ভাষার এখনও এমত অবস্থা হয় নাই যে উর্দ্দু ভাষার সমকক্ষ হইতে পারে। যখন দেশীয় লোকের চেষ্টায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যপুস্তক হিন্দীতে লিখিত হইবে তখন হিন্দী ভাষা আদালতে গৃহীত হইতে পারিবে; এখন নহে"। ইহার পর হইতে সারদা বাবু এবিষয়ে নীরব রহিলেন। কিন্তু রামকালী বাবু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার পক্ষাবলম্বন ও আন্দোলন করিয়া গিয়াছেন। সারদা বাবু যে বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, সার এণ্টনি ম্যাকডনেল মহোদয়ের কৃপায় তাহা অঙ্কুরিত হইল।

সারদা বাবু Accountant Generalএর আপিষে এক জন Superintendent ছিলেন। ৩০ বৎসর প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়া মাসিক দুই শত টাকা পেন্সন প্রাপ্ত হইয়াছেন। পেন্সন লইয়াও ইনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। ১৮৯২ সালে এখানকার Agra Savings Bank ২০ লক্ষ টাকার অধিক কারবার করিয়াও বিপন্ন হইয়া পড়িলে তাঁহাকে একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত করে। ব্যাঙ্ক বন্ধ হইলে বঙ্গদেশীয় অনেক বিধবা ও নাবালক নিঃস্ব হইয়া পড়ে দেখিয়া ইনি বিনা বেতনে উক্ত পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু সার গ্রীফিথ ইভানস্ ও অন্যান্য সাহেবদিগের ইচ্ছায় ব্যাঙ্ক বন্ধই করিতে হইল। সারদা বাবুর বয়ঃক্রম এক্ষণে ৬৫ বৎসর। শ্রবণশক্তির হ্রাস হইয়াছে, শরীরও অপটু হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এখনও তাঁহার অধ্যয়নস্পৃহা পূর্ব্ববৎ বলবতী আছে। বিজ্ঞান তাঁহার অধ্যয়নের প্রধান বিষয়। এবয়সেও সমগ্র Encyclopædia Britannica ক্রয় করিয়া দিবারাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। জড় ও প্রাণিজগতের শক্তি ও গঠনপ্রণালী, আলোক, নক্ষত্র ও আকাশ সম্বন্ধে ইঁহার অনেক অভিনব ধারণা আছে। সেই সকলের প্রমাণ সংগ্রহ ও সত্যাবিষ্কারে ইনি এক্ষণে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত আছেন।

প্যারীমোহন বাবু যাঁহাদের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে আনয়ন করেন, মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদিগের অন্যতম। জষ্টিস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৭২ অব্দে এলাহাবাদে মুন্সেফী পদ প্রাপ্ত হন এবং গাজীপুর ও বারাণসীতে মুন্সেফী করিয়া ১৮৭৬ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের ডেপুটি রেজিষ্ট্রার হন। ১৮৮০ সালে সবজজ নিযুক্ত হন এবং কিছুকাল সেসন ও ডিষ্ট্রিক্ট জজের কর্ম্ম করিয়া ১৮৯৩ সালে লক্ষ্ণৌএর additional জজ নিয়োজিত হন। অব্যবহিত পরেই হাইকোর্টের বিচারপতির সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার দানের হস্ত সঙ্কুচিত থাকে না। সেজন্য দীন দুঃখী অনাথ নরনারীকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতে শুনা যায়। অনাড়ম্বর গুপ্ত দান করিয়াই ইনি অধিক তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। ইঁহার ভগিনীর জামাতা স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্যারীমোহন বাবুর সূত্রে এতদঞ্চলে আগমন করেন। অবিনাশ বাবু কলিকাতার দক্ষিণে বড়িশাবেহালা গ্রামে ১৮৪১ খৃঃ অব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। অসচ্ছল অবস্থায় জন্মগ্রহণ করায় ইঁহাকে বাল্যজীবনে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। অর্থের অভাবে অবিনাশ বাবু ডল এবং ডফ সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে প্রথম শিক্ষা লাভ করিয়া ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করতঃ প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে অধ্যয়নকালে ইনি স্কলারসিপের টাকা হইতে সংসারখরচ চালাইতেন এবং অধিক মূল্যের পুস্তক ক্রয় করিবার সামর্থ্য না থাকায় অনেক গ্রন্থ স্বহস্তে

শ্রীপ্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

INDIAN PRESS.
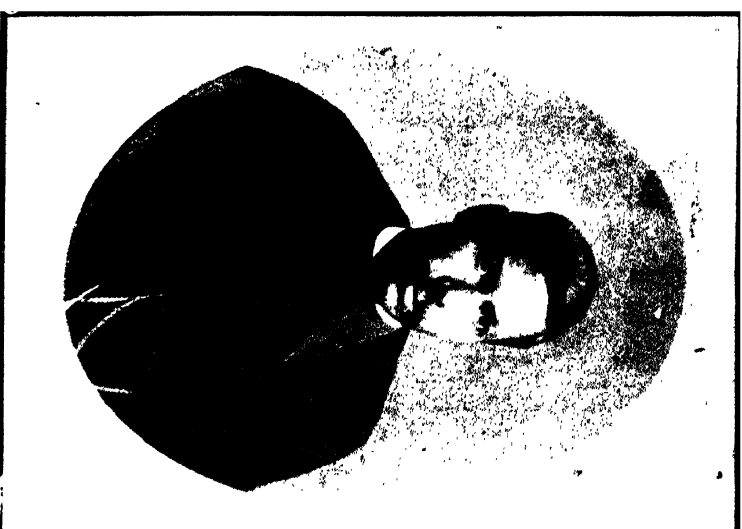
খাতায় নকল করিয়া লইতেন। অসাধারণ পরিশ্রম এবং প্রতিভাবলে ইনি উনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে (১৮৬৫) বি.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রথমে সালকিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পরে হেয়ার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু অসুস্থ হইয়া পড়ায় নিম্নবঙ্গ ত্যাগ করিয়া নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া পাটনায় গমন করেন। এস্থানে অবস্থানকালে ইনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ইঁহার আত্মীয় প্যারীমোহন বাবুর আহ্বানে আগ্রা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু বিহারের স্কুলপরিদর্শক ডাক্তার ফালন তাঁহাকে কোন মতে ছাড়িতে চাহিলেন না এবং অবিনাশবাবুর কর্ম্ম-পরিত্যাগ-পত্র প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। ফ্যালন সাহেবের অনুরোধ তখন এড়াইতে না পারিয়া তিনি ছুটি লইলে অবিনাশ বাবু কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ১৮৬৮ সালের নবেম্বর মাসে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করিলেন। এখানকার হাইকোর্ট তাঁহাকে ১৮৭০ খৃঃ অব্দের অগষ্ট মাসে আগ্রার দ্বিতীয় শ্রেণীর মুন্সেফী পদ প্রদান করেন। অতীব দক্ষতার সহিত কর্ম্ম করায় অল্প সময়ের মধ্যে ইঁহার ঘন ঘন পদোন্নতি লাভ হয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুবিচারপদ্ধতি এবং ন্যায়নিষ্ঠায় অবিনাশ বাবু তাঁহার সময়ে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিলেন। Succession to Hathras Raj, Beswan Principality এবং Hasnain Raj প্রভৃতি বড় বড় রাজ্যসংক্রান্ত মোকদ্দমায় সুবিচার করিয়া ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। আপোসের মকদ্দমায় হাইকোর্টের বিচারপতিগণ ইঁহার রায় পাঠ করিয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করেন।

অবিনাশবাবু আট বৎসর আগ্রায় মুন্সিফী করেন। তৎপরে তিন বৎসর আগ্রার সবজজের কার্য্য করেন এবং পুনরায় ১৮৮৯ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আগ্রাতেই ছোট আদালতের বিচারপতির সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এইরূপে তিনি "আগ্রার অবিনাশ বাবু" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এখানে কত শত প্রবাসী পান্থ আসিয়া অবিনাশ বাবুর আশ্রয়ে বিশ্রাম লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে আগ্রায় পদার্পণ করিয়াছেন অথচ তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন নাই, এমন তীর্থযাত্রী বা পর্য্যটক অতীব বিরল। সুবিচারক বলিয়া ইঁহার কিরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল, একদিনকার একটি ঘটনার উল্লেখ করিলে বেশ বুঝা যাইবে। ১৮৮৬ খৃঃ অব্দে এলাহাবাদে কোন সভায় প্রধান বিচারপতি সার জন এজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কেহ তথায় বলেন যে দেশীয় বিচারকগণ কখনই সাহেব জজদিগের সমকক্ষ হইতে পারে না। এই কথার প্রতিবাদ করিয়া সার জন এজ অবিনাশ বাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এরকম দেশীয় জজ আছেন যে তাঁহার স্বীয় মকদ্দমা থাকিলে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরের সহিত তাঁহাদের নিকট বিচারের নিমিত্ত যাইতে প্রস্তুত আছেন। অবিনাশ বাবুর জীবদ্দশায় যখনি কোন জটিল মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তখনি ইনি তাহার গ্রন্থি ছেদন করিতে ও জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সারসত্য নির্দ্ধারণ করিতে প্রেরিত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য তিনি গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মের জন্যই দেহপাত করিয়া গিয়াছেন। কর্ত্তব্য সম্পাদনে তাঁহার এই অমানুষিক পরিশ্রমই তাঁহার অমূল্য জীবনের অকালে অবসানের কারণ। সাধারণের অবিদিত নাই যে জীবিত থাকিলে, ১৮৯০ সালে জষ্টিস মামুদের অবসর প্রাপ্তির পর তৎস্থলে অবিনাশ বাবুই নিয়োজিত হইতেন। অবিনাশবাবু Civil Procedure Code এবং Specific Relief Actএর উর্দ্দু কমেণ্টরি প্রণয়ন করেন। বিচারবিভাগের উর্দ্দু ভাষাভিজ্ঞ কর্ম্মচারীগণের মধ্যে তাঁহার পুস্তকগুলির এরূপ সমাদর যে অনেকে বলিয়া থাকেন, যে সকল আইন কানুন উক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয় নাই তাহা দেখিবারও প্রয়োজন নাই। রাজকার্য্যে ইঁহার যেরূপ প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল, জনহিতকর ব্যাপারেও ইঁহার তদ্রূপ ঐকান্তিকতা প্রকাশ পাইয়াছিল। যৌবনকালে ইনি কলিকাতা তালতলায় একটী বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, এবং উত্তর কালে নানা স্থানে বিদ্যালয়, পুস্তকাগার, সভা, সমিতি প্রভৃতি স্থাপন করেন। ১৮৮৯ সালে যখন আগ্রা গভর্ণমেণ্ট কলেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হয়, তখন ইনিই তাহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করিয়া পুরাতন কলেজটী রক্ষা করেন। তখন উহা একটী বোর্ড অফ্ ট্রষ্টির হস্তে ন্যস্ত হইয়া অধ্যক্ষ সভার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। অবিনাশ বাবু উভয় সভারই সভ্য মনোনীত

হন। ইনি বহুকাল কলেজের উন্নতিকল্পে দেহমন নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত আগ্রা গভর্ণমেণ্ট কলেজ বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত হইতে পারিত কিনা সন্দেহ। বলিতে কি ইনিই ইহার জীবন স্বরূপ হইয়াছিলেন। আলীগড়ে এম এ ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে অবিনাশ বাবু প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রকে পদক দান করেন এবং ইহার প্রতিষ্ঠাতা সার সৈয়দ আহমদকে উক্ত কলেজে আইনের শ্রেণী খুলিতে অনুরোধ করেন। উহা খোলা হইলে ইহার উদ্যোগে এবং অনুরোধে স্থানীয় উকিলগণ তথায় ছাত্রগণকে আইন অধ্যাপনা করান।

যে খৃষ্ট ধর্ম্মের নবালোকে বঙ্গের প্রতিভাবান যুবকগণের মধ্যে অনেকে স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া বঙ্গীয় সমাজ অন্তঃসার-শূন্য করিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহারই কুহকে পড়িয়া এই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন যুবক ডফ সাহেবের প্ররোচনায় রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই দিন তাঁহার সহিত মহাত্মা কেশব বাবুর সাক্ষাৎ হইল। অবিনাশ বাবু বলিতেন, তাঁহার শ্রদ্ধেয় বন্ধু কেশব বাবু এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মই তাঁহাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছে। অবিনাশ বাবু ব্রাহ্ম ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্বীয় ধর্ম্মজীবন গঠন করিয়াছিলেন; কিন্তু জীবনের শেষভাগে তদীয় ধর্ম্মমতের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মশীলতার সহিত উদার ভাবের সংমিশ্রণে তাহা আর বিশেষ সম্প্রদায়-গত ছিল না। তাঁহার নৈতিক জীবন কলঙ্কশূন্য ছিল। ইহজীবনে তিনি কখনও মদ্য স্পর্শ করেন নাই।

উত্তর-পশ্চিমে অবিনাশবাবু যেরূপ সর্ব্বজনপ্রিয় ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহার সময়ে এরূপ আর কোন বাঙ্গালী হয়েন নাই। অবিনাশবাবুর অনন্যসাধারণ চরিত্র-বলই সাহেবদিগের সম্মুখে বাঙ্গালীর সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিল। এখানে যে সময় পাবলিক কমিশন বসে, তখন এম এ ও কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ বেক বাঙ্গালীর নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন; তাহাতে Sir Charles Turner বেক সাহেবকে সর্ব্বপ্রথমে জিজ্ঞাসা করেন "Do You know Babu Abinash Chander Banerji, a great judge?" আগ্রাবাসিগণের নিকট তিনি এতদূর প্রিয় এবং সম্মানিত হইয়াছিলেন যে কলিকাতা হইতে আগত জনৈক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, এতদঞ্চলে ভ্রমণকালে যে কোন অপরিচিত স্থানে অবিনাশ বাবুর বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, সেই স্থানেই সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছেন। একদিনকার একটী ঘটনা হইতে জানা যায় অবিনাশবাবু কতদূর লোকপ্রিয় হইয়াছিলেন। লণ্ডন একজিবিসনে আগ্রার একজন মিঠাইবিক্রেতা প্রদর্শনী-স্থলে জিলপী বিক্রয় করিতেছিল। একখানি জিলিপীর জন্য এক সিলিং করিয়া মূল্য গ্রহণ করিতেছিল। বাবু মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় তাহার নিকট জিলিপী ক্রয় করিবার কালে বলিয়াছিলেন তিনি আগ্রার অবিনাশবাবুর একজন বন্ধু। এই কথা শুনিবামাত্র মিঠাই ওয়ালা মোহিনী বাবুকে তৎক্ষণাৎ বিনামূল্যে জিলিপী খাওয়াইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছিল। ১৮৯৯ সালের ২রা এপ্রেল অবিনাশবাবু অমরধাম গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে আগ্রার আদালত, স্কুল ও কলেজ বন্ধ হইয়া যায় এবং যে সময় তাঁহার শবদেহ রাজপথ দিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন পথের উভয়পার্শ্বস্থ অট্টালিকার ছাদের উপর হইতে পুষ্প এবং পুষ্পমালা সেই দেহের উপর অজস্র বর্ষিত হইয়াছিল। সে দিন আগ্রার রাজপথে কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্যই হইয়াছিল! কোটীপতি রাজা মহারাজা সহসা যে সম্মানের অধিকারী হইতে পারেন না, অনাটনের সংসারে জন্ম লইয়া, যৌবনের প্রথম উন্মেষে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া এবং স্বীয় চরিত্র ও প্রতিভাবলে সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া, স্বর্গীয় অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় লক্ষ লক্ষ মানবের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে শতকণ্ঠে তাঁহার গৌরব গীতি উচ্চারিত হইল, সহস্র হস্তের পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা তিনি জনসাধারণের পূজা প্রাপ্ত এবং সেই রাজদুর্লভ সম্মানের অধিকারী হইলেন।

১৮৫৮ অব্দে এলাহাবাদে উত্তর পশ্চিমের রাজধানী হয়। ইহার পূর্ব্বে ২২ বৎসর আগ্রাই কোম্পানির রাজধানী ছিল। সে সময় ফতেগড় এ প্রদেশের একটী প্রধান স্থান ছিল। এখানে ইংরাজদিগের ফৌজ থাকিত, এখানে টাকশাল ছিল এবং রসদবিভাগ, গনফ্যাক্টারী প্রভৃতির জন্য প্রজাসাধারণের বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। প্রায় ৮০ বৎসর হইল স্বর্গীয়

ঈশানচন্দ্র দেব কাশীপুর গনফাকটরী হইতে বদলী হইয়া ফতেগড়ে আইসেন। এখানে তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় মেজর রামসডেন মেজর আবট, কর্ণেল আলেকজাণ্ডার এবং কর্ণেল ফর্ডীস প্রমুখ বড় বড় সাহেবগণ তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। বলা বাহুল্য তাঁহাদের অধীনে কর্ম্ম করিলেও ঈশানবাবুর সহিত তাঁহাদের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। বিলাত হইতে তাঁহারা ঈশানবাবুকে এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে আমরা কতকগুলি দেখিয়াছি। একখানি পত্রে কর্ণেল ফর্ডীস "It is an age, my worthy friend, since I last wrote to you" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। আজি কালিকার দিনে চাকর মনিবে এরূপ সদ্ভাব বড় একটা দেখা যায় না। ফতেগড়ে এই দেব পরিবারের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। গঙ্গার ধারে ইহাদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা এখনও বিরাজমান। তাহার নিকটেই কমলবোসের মন্দির, তাহার সান্নিধ্যে ভাতুবাবু নাড়ুবাবুদের মন্দির রহিয়াছে। কমলবোসের মন্দিরচূড়ায় একটি স্বর্ণময় weathercock ছিল। ক্যাণ্টনমেণ্টের গোরারা ইষ্টকাঘাতে তাহা চূর্ণ করিয়াছে। বিদ্রোহের সময় ইহাদের বাটী লুট হয়। আত্মরক্ষার্থে ইঁহারা সপরিবারে ফরক্কাবাদের কোন হিন্দুস্থানী বন্ধুর বাটিতে লুকাইয়া থাকেন। স্বীয় জীবন সঙ্কটাপন্ন হইলেও ঈশানবাবু রবার্টসন সাহেবকে বিপদের সময় সাহায্য করেন। ইনি ভরতপুরের যুদ্ধে গিয়াছিলেন। যখন রবার্টসন সাহেব স্ত্রী ও তিনটী কন্যা লইয়া নৌকা করিয়া অন্ধকার রাত্রে পলায়ন করেন, তখন সিপাহীরা জানিতে পারিয়া গুলি করে। তাহাতে রবার্টসন আহত হন এবং নৌকা ফুটা হইয়া যায়। স্ত্রী ও কন্যাগণ ডুবিয়া যাইলে সাহেব সাঁতার দিয়া রাজা হরদেবরায়ের (তখন জমিদার) জমিদারীতে গিয়া উঠেন। ঐ স্থান ঈশানবাবুর বাটীর সম্মুখে গঙ্গার পরপারে। রাজার লোক রবার্টসন সাহেবের নিকট হইতে সংবাদ আনিয়া দেয় যে রবার্টসন বাঁচিয়াছেন কিন্তু পথ্যের অভাবে তাঁহার জীবনসংশয় হইয়াছে। এরূপ লোকের কথা বিশ্বাস না করায় সে ব্যক্তি তাঁহার পত্র ও অঙ্গুরী প্রদর্শন করে। তখন তিনি অতি গোপনে সাগু, সোডা, ব্রাণ্ডি, বিসকুট প্রভৃতি কয়েকবার প্রেরণ করেন। কিন্তু জ্বর হইয়া রবার্টসন সাহেব কয়েকদিনের পর মারা যান। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে দেবপরিবার চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। সে সময় নবাব তজম্মুল হোসেন ফতেগড়ের নবাবী পদ গ্রহণ করেন। তিনি কোন সূত্রে রবার্টসনের মৃত্যুদিবসে দেবপরিবারের ক্রন্দনের ও সাহায্যের সংবাদ শুনিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার ঘোর সন্দেহ হওয়ায় প্রত্যহ ঈশানবাবু এবং তাঁহার দাদা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে হাজির হইতে আদেশ করেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের বাসায় খানাতল্লাসী করা হইত। এই ভয়ে ইঁহারা সাহেবদিগের চিঠি পত্র প্রায় সমস্ত নষ্ট করিয়া বা লুকাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কয়েকবার ইঁহাদিগকে ইংরাজের পক্ষ বলিয়া তোপের মুখে স্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু ঈশানবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীবৎস দেব নবাবকে কয়েকটী বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন বলিয়া

স্বর্গীয় শ্রীবৎস দেব।

সে যাত্রা সকলে রক্ষা পান।* ইঁহাদের নিগ্রহের কথা কাগজপত্রে অনেক প্রকাশিত হইয়াছিল। বুলোন হইতে কর্ণেল ফর্ডীস একখানি পত্র লিখেন। সেই পত্রের এক স্থানে লিখিত আছে —

"Mrs. Fordyce begs me to say how rejoiced she was to learn that you got safely through the late horrors, and I hope to hear that the good service you performed towards Government and for poor Major Robertson has been acknowledged and met with some reward" Extract from a letter from Colonel John Fordyce to Babu Issaun Chunder Deb, Dated Boulogne, 16th August, 1858.

"The English Journals mentioned that you had been heavily mulcted by the rebels, from having been found in correspondence with the Europeans. Is it so? and will not Government reimburse you for suffering in their cause so. I hope so. The papers also have a report that Major Robertson has escaped."

আর একজন রাজ পুরুষ ঈশান বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু আশুতোষ দেবকে লিখেন * * * * It pained me to hear of his suffering and yours thro' the courage and fidelity to Government which brought on you the atrocious acts of those infamous scoundrels, the rebels." *

ইতিহাসজ্ঞ মাত্রেই জানেন কিরূপে সার চার্লস নেপিয়র ফরক্কাবাদের গুপ্তদ্বার দিয়া গোপনে প্রবেশ করত জয়লাভ করেন। যাঁহারা এবিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, ঈশান বাবু তাঁহাদের একজন। শ্রীবৎস বাবু প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। রেভারেণ্ড পেরারা ইঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ইঁহাকে ফরাসী ভাষা এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রবিদ্যা (mechanics) শিখাইতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে কলকারখানা সম্বন্ধে ইঁহার এরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিল যে যখন দেশীয় ব্যক্তিগণের ভিতর ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নাম মাত্র প্রবেশ করে নাই, এমন সময়ে ইনি মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতে লাগিলেন। এখন কলিকাতায় যেমন বোণ শেপার্ডের দোকান, লক্ষ্ণৌএ এপ্রদেশে তখন (Sache) স্যাসের একমাত্র ফটোর দোকান ছিল। শ্রীবৎস বাবুর ফটোগ্রাফীর দোকান এলাহাবাদে সেই সময়ে স্থাপিত হয়। ইঁহারা একটী সোডাওয়াটারের ফ্যাক্টারীও খুলিয়াছিলেন। কলিকাতা যোড়াসাঁকোতে ইঁহাদের ভদ্রাসন ছিল। কলিকাতায় "বলরাম দের ষ্ট্রীট" যাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে,তিনি ঈশান বাবুর পিতামহ।

* Extract from a letter from Goueral J. Alexander, K.C.B. to Babu Ashutosh Deb, Hd. Accountant to the Gun-carriage Agency, Fatehgarh, dated London [illegible]

ইঁহাদের ফতেগড়ে আসিবার পূর্ব্বে খলিসানি নিবাসী ৺ রামচাঁদ মিত্র ফরাক্কাবাদে বাস করিতেছিলেন। কারণ শঙ্করবিজয়জয়ন্তী নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্বগ্রামস্থ ৺ তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায় ইঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন ইনি স্থানীয় ডাকমুন্সী। ১৮২০ অব্দে পোষ্টবিভাগ কলেক্টরের হস্ত হইতে সিভিল সার্জ্জনের অধীন হয়। এই সময় তারিণী বাবু আলাগড় পোষ্ট আপিসে কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। এপর্য্যন্ত লোক মার্ফত ডাক যাইত, অতঃপর অশ্বের ডাক প্রবর্ত্তিত হইল। আলিগড় ডাক অশ্বের শেষ কণ্ট্রাক্টর ডাক্তার এডমণ্ড টীরিটন সাহেব তাঁহাকে আগ্রার কণ্ট্রাক্টর করিলেন। ইহাতে বেশ আয় হওয়ায় ইনি আলিগড়ের অন্তঃপাতি ভুকরাউলী গ্রামে একটী নীলের কুঠী স্থাপন করিলেন। তখন উত্তর-পশ্চিমের স্থানে স্থানে নীলের কুঠী থাকিলেও আলিগড়ে উহাই প্রথম। পরে এখানে অনেক গুলি বাঙ্গালীর নীলের কুঠী স্থাপিত হয়। তারিণী বাবুর পূর্ব্বপুরুষগণের দেশে শস্যাদির বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। কালনা, ভদ্রেশ্বর, ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের বড় বড় গোলা ছিল। তারিণী বাবু উক্ত কুঠীর কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে শস্যাদির ব্যবসাও আরম্ভ করিলেন, এবং তাহার উপস্বত্ব হইতে জমিদারী ক্রয় করিলেন। ইঁহার পুত্র বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৪০ সালে আলীগড়ের ডাকমুন্সী, পরে ট্রেজারি হেডক্লার্ক, হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তারিণী বাবু নানা স্থানে পলায়ন করিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। ঈশ্বর বাবু দেশে চলিয়া যান। ১৮৫৯ অব্দে প্রত্যাগত হইয়া কিছুকাল পরে কর্ম্মত্যাগ করিয়া জমিদারী কার্য্য ও বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন। ইঁহাদের বংশাবলী আলিগড়ে বাস করিতেছেন। ইঁহারা এস্থানের অতি পুরাতন এবং সম্ভ্রান্ত পরিবার। ঈশ্বরচন্দ্র বাবু সাহিত্যসেবিগণকে মধ্যে ২ অর্থ সাহায্য দ্বারা উৎসাহিত করিতেন। ইঁহাদেরও পূর্ব্বে ফতেগড়ে বাঙ্গালী ছিলেন। "সিঙ্গি মহাশয়" বলিয়া পরিচিত কোন বাঙ্গালী ফতেগড় মিণ্ট আপিষে কর্ম্ম করিতেন। ইনি বড়ই সাধু ব্যক্তি ছিলেন। কর্ম্ম করিতে করিতে ইঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের ভাব উদিত হওয়ায় চাকরিতে ইনি জবাব দিয়া নির্জ্জনে যোগসাধন আরম্ভ করেন এবং ফতেগড় হইতে

চারি পাঁচ মাইল দূরে একটী গ্রামে স্বীয় আশ্রম নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারই নামে ঐ স্থানের নাম সিঙ্গিরামপুর হইয়াছে। তাঁহার আশ্রম এক্ষণে সাধু সন্ন্যাসী ও গ্রামবাসিগণের নিকট পবিত্র স্থান বলিয়া সম্মানিত হইতেছে।

গাজীপুরে বাঙ্গালীর বাস বড় অল্প দিন হইতে নহে। গাজীপুরে গোরাবাজার সন্নিহিত গঙ্গার উপকূলস্থিত "সিদ্ধেশ্বরনাথের মন্দির" নামে একটী অতি পুরাতন দেবালয় আছে। এরূপ জাগ্রত দেবতা, এমন পবিত্র স্থান, এমন সুরম্য দেবালয়, স্থানীয় হিন্দুগণের এমন উৎসবস্থল গাজীপুরে আর নাই। প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতিহাসের অভাবে কত কীর্ত্তিই যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই গাজীপুরের এই মন্দির যে বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত তাহা ক্রমে কিম্বদন্তীতে পরিণত হইয়াছে : মন্দিরশীর্ষস্থ বঙ্গাক্ষরে খোদিত শিলালিপি প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতি বহন করিতেছিল, কিন্তু অল্প দিন হইল উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিগণ এখনও তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন বলিয়াই ইহা বাঙ্গালীর কীর্ত্তি বলিয়া জানা যায়। এরূপ জনপ্রবাদ আছে যে বসু উপাধিধারী কোন বাঙ্গালী বণিক বাণিজ্যতরী সাজাইয়া এই স্থানের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে জলমগ্ন হন। বণিক অবশেষে অনেক কষ্টে উপকূলে উঠিতে সমর্থ হন এবং হতাশহৃদয়ে তথায় সমস্ত দিবানিশি পড়িয়া থাকেন। রজনীতে তিনি স্বপ্ন দেখেন যেন মহাদেব স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "ভয় নাই, কল্য প্রাতে অন্বেষণ করিলে তোমার নষ্টদ্রব্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, কিন্তু এই স্থানে সিদ্ধেশ্বর নাথের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে ভুলিওনা।" বলা বাহুল্য যে স্থলে নৌকা ডুবিয়াছিল তথা হইতে বণিক নষ্টদ্রব্য উদ্ধার করিয়া বাণিজ্যে বহির্গত হন এবং অনতিকাল মধ্যে এস্থানের বন কাটাইয়া উক্ত দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। গঙ্গার এই স্থান এখনও নৌকা গমনাগমনের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতার নাম ধাম আমরা এখনও প্রাপ্ত হই নাই। এখানকার বৈদ্যবংশীয় রায় পরিবার বহু পুরাতন। গাজীপুর ষ্টাড ও ওপিয়ম ডিপার্টমেণ্টে অনেক বাঙ্গালী বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে চাকরী করিতেছেন। এখানকার মিত্র পরিবারও বহু প্রাচীন। পূর্ব্বোক্ত সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশসম্ভূত বাবু নীলমাধব রায় কানপুরের বর্ত্তমান সেসন জজ। ইঁহার নিকটাত্মীয় স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ সেনের নাম গাজীপুরের অনেকের নিকট সুপরিচিত। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেনের নাম সুপরিচিত। ইঁহার ফুলবালা, ঊর্ম্মিলাকাব্য অশোকগুচ্ছ অপূর্ব্ব ব্রজাঙ্গনা এবং সাহিত্য ভারতী, প্রদীপ প্রবাসী প্রভৃতিতে লিখিত রাশি রাশি কবিতা বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারের রত্নরাজীর মধ্যে পরিগণিত। এই প্রবাসী কবির প্রতিভায় প্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরব শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল। বঙ্গসাহিত্য যেমন ইঁহার নিকট ঋণী, জনসাধারণ তদ্রূপ অন্য বিষয়ে তাঁহার পিতার নিকট ঋণী। যে সময়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড হয় নাই, যখন রেলগাড়ী কেহ জানিতেন না, সে সময় পদব্রজে অথবা নৌকাপথে গমনাগমন কিরূপ বিপদসঙ্কুল ছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ সেন সেই সময় যাত্রিগণের গমনাগমনের সুবিধা করিয়া দেন। ইঁহার তুলা ও চিনির বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। উপযুক্ত যানের অভাবে আমদানী রপ্তানীর বড়ই অসুবিধা হইত। ব্যবসায়ের সুবিধা এবং সাধারণের যাতায়াতের পথ নিরাপদ হইবে বলিয়া ইনি একখানি ষ্টীমার চালাইবার বন্দোবস্ত করেন। এই ষ্টীমার গাজীপুর ও জঙ্গিয়ার মধ্যে গমনাগমন করিত এবং শত শত যাত্রীকে গন্তব্যস্থানে নিরাপদে এবং সুলভে পৌঁছাইয়া দিত। প্রবাসীর যে কীর্ত্তি এখন লুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে এরূপ ষ্টীমার ছিল বা তাহা বাঙ্গালীর সম্পত্তি ছিল, তাহাও লোকে বিস্মৃত হইয়াছে।

গাজীপুরের পর মিরজাপুরের নাম করা যাইতে পারে। মিরজাপুর যখন এদেশে বাণিজ্যের প্রধান বন্দর ছিল, কাণপুর তখন একটী ক্ষুদ্র গ্রামের মত ছিল। গভর্মেণ্টের বড় বড় আপিস গুলি তখন এখানে ছিল। সে মিউটিনির বহু পূর্ব্বে। সে সময় এখানে দুই শত ঘর বাঙ্গালীর বাস ছিল। কিন্তু সেই স্থানে এক্ষণে ২৫।৩০ ঘরের উদ্ধ বাঙ্গালী নাই। গভর্মেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার বাবু রামরূপ ঘোষ বাড়ী ঘর করিয়া এখানের স্থায়ী প্রবাসী হইয়াছেন। ইঁহার ঊর্দ্ধতন দুই তিন পুরুষ এতদঞ্চলে কাটাইয়া গিয়াছেন। মির্জ্জাপুরে ইঁহার সম্ভ্রম প্রতিপত্তি বিলক্ষণ। মিউটিনির পর কাণপুর ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান স্থান হইলে এবং বড় বড় আপিস গুলি

মির্জাপুর হইতে স্থানান্তরিত হইলে, এই পুরাতন বর্দ্ধিষ্ণু সহরটি শ্রীভ্রষ্ট হয়। কার্পেট ফ্যাক্টরী, লাক্ষার কারখানা, এবং প্রস্তরের ব্যবসা এখনও মির্জাপুরের পূর্ব্ব গৌরবের নিদর্শন রক্ষা করিতেছে। এখানে অনেক পরিত্যক্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা কত ঐশ্বর্য্যের আগার ছিল। এক্ষণে তথায় সন্ধ্যার প্রদীপ জালিবার একজনও নাই! মির্জাপুর যেন পরিত্যক্ত পল্লীস্বরূপ অবস্থান করিতেছে!

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত বুন্দেলখণ্ডেও বহুকাল হইতে বাঙ্গালীর আগমন আরম্ভ হইয়াছে। বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে বীরপ্রসবিনী ঝান্সীই প্রধান স্থান। এখানে গভর্মেণ্টও রেলের চাকুরী লইয়া বাঙ্গালী প্রবাসী হইয়াছেন। মিউ-টিনীর বহু পূর্ব্বে স্বর্গীয় ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায় কমি-সেরিয়টের গমস্তা হইয়া নান। স্থান পর্য্যটন করত অবশেষে ঝান্সীতে স্থায়ী হন। এখানে ইঁহার প্রভূত ক্ষমতা ও সম্মান ছিল। ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়প্রমুখ বাঙ্গালীগণের শিক্ষা সভ্যতা তখন স্থানীয় অধিবাসিগণের আদর্শস্বরূপ ছিল। স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সামাজিক ব্যাপারেও তাঁহাদের ক্ষমতা বড় অল্প ছিলনা; ঝান্সীবাসিগণ গৃহবিবাদ উপস্থিত হইলে কথায় কথায় আদালতে না গিয়া প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীর মধ্যস্থতা প্রার্থনা করিত, এবং সেই চরিত্রবান ও বুদ্ধিমান প্রবাসিগণের মীমাংসা শিরোধার্য্য করিয়া সকল বিবাদের শান্তি করিত। ইঁহাদের আদি বাস বারাসতের নিকট নলকুড়া গ্রামে। প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন ঝান্সীপ্রবাসিগণের মধ্যে ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার বাবু যদুনাথ চৌধুরী এবং বাবু প্রসন্নচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এক্ষণে বর্ত্তমান। যদুনাথ বাবু স্বজাতিবৎসল, পরোপকারী এবং বিদ্যানুরাগী। ইনি অনেকগুলি সদনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তক। তন্মধ্যে গোয়ালিয়র সন্নিহিত মোরার আংলো ভারনাকুলারস্কুল", গাজীপুর হাই স্কুল, ঝান্সী ম্যাক্‌ডনেল হাই স্কুলের নূতন বাটী এবং অনাথালয় উল্লেখযোগ্য। অনাথালয়ের কার্য্য সাধারণের অর্থসাহায্যে কয়েক বৎসর সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছিল, কিন্তু তাহার অভাবে প্রবাসীর এই কীর্ত্তি এক্ষণে লোপ পাইতে বসিয়াছে। প্রসন্ন বাবু দুর্ভিক্ষকমিশনার হইয়া গভর্মেণ্টের বিশেষ সাহায্য করায় রাজসরকার হইতে প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। দুই একটী আপিষ উঠিয়া যাওয়ায় এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালীগণ যেমন বিচার এবং সৈনিক ও রসদ বিভাগে প্রথম প্রবেশ করেন, শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হইলে বাঙ্গালীই প্রথমে দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ পদগুলি অধিকার করেন। তাহার প্রধান কারণ এই যে তখন বাঙ্গালী ব্যতীত অপর কাহাকেও গভমেণ্ট কোন কর্ম্ম দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। কার্য্যদক্ষতাই বাঙ্গালীর বিশেষত্ব। ১৭৯৯ সালে বারাণসী কলেজ স্থাপিত হয়। তখন হইতে এখানে কোন কোন বাঙ্গালী কর্ম্ম করিতেছেন। কিন্তু তত পুরাতন কাগজপত্র হস্তগত না হওয়ায় বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইল না। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী এই কলেজে অধ্যাপনা করিতেছিলেন। সেই সময়ে বাবু চণ্ডীচরণ বিশ্বাস কলেজ দপ্তরের কর্ম্মচারী হন। ১৭৯২সালে দিল্লী ওরিএণ্টাল কলেজ স্থাপিত হয়। এখানে বাবু বংশীধর বসু ইংরাজীনবীশ কেরাণী ছিলেন। ১৮২৮ সালে এখানে ইংরাজী কলেজ খুলা হয়। এই কলেজে ইংরাজী হস্তাক্ষর শিখাইবার জন্য বাবু তারকনাথ বসু নিযুক্ত হন। মীরাট স্কুল ১৮৫৫ সালে স্থাপিত। এই বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টার ছিলেন বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বারণসী কলেজ কমিটির দুই জন বাঙ্গালী সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম— বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিত্র (পরে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন) এবং রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল। এই কলেজের ইংরাজী নবীশ কর্ম্মচারী ও ছিলেন দুই জন বাঙ্গালী—বাবু প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ এবং এবং বাবু রামগোপাল মল্লিক। ইহা শিক্ষা-বিভাগের প্রথমাবস্থার কথা।* কিন্তু আজি কালিকার দিনে শিক্ষা, বিচার ও চিকিৎসা বিভাগে অনেক বঙ্গবাসী প্রবেশ করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

বিহারে বাঙ্গালী।

১। গয়া আমার জন্মস্থান। সেই খানে আমার শৈশবের পূর্ব্বভাগ অতিবাহিত হয়। পিতৃদেবের নিকট গল্প শুনি, সহরঘাটীতে (একটী সব্‌ডিভিজান, -গয়ার নিকট) যখন প্রথম বাঙ্গালীর আসিবার কথা হয় তখন হুলস্থূল

* Bengal and Agra Annual Guide, page 310, pa[rt] III, Vol I, page 1

শুনা গেল—"বাঙ্গালী আওআ হৈ।" যখন শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দকুমার রায় সহরঘাটার পথে হাটিয়া চলিলেন, একটী বৃদ্ধা তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "ই তো আদমি এ হৈ" (এ তো মানুষই)। বৃদ্ধা বাঙ্গালীকে কোনও অদ্ভুত জীব মনে করিয়াছিল। বার তের বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি। গয়াতে তখন আমরা কয়েক ঘর মাত্র বাঙ্গালী। সেই জন্য অমাদের পরস্পরে খুব আত্মীয়তা ছিল। এরূপ অবস্থায় তাহা হইয়াই থাকে। বিদেশে প্রবাসে একজন স্বদেশী পাওয়া যে কত সুখের তাহা বলিবার নহে। আমরা যে কয়জন বাঙ্গালীর ছেলে ছিলাম, কেহ মাইনার স্কুলে বাঙ্গালী পরিচালিত) কেহ জিলা স্কুলে পড়িতাম। সন্ধ্যায় একত্র বেড়াইতে যাইতাম। তখন ফুট বল ক্রিকেট ছিল না। ফল্গু নদীতে বর্ষাকালে দুই একবার ভিন্ন আর কোনও সময়েই জল থাকে না। তবে, পাহাড়িয়া নদীর যেরূপ রীতি, একটু বালি খুঁড়িলেই জল বাহির হয়। আমরা বালির উপর খেলা করিতাম ও উনুই প্রস্তুত করিতাম। কিম্বা পাহাড়ে গিয়া একটু সমতল স্থান বাছিয়া লইয়া মার্বল খেলিতাম, নয় গহ্বরে গহ্বরে লুকাচুরি খেলিতাম। গয়া সহরের চারিদিকেই পাহাড়, বেশী দূরও নয়।

প্রতি বৎসর দোলের সময় আমাদের মধ্যে কয়েকটি পরিবার 'ব্রহ্মযোনি' পাহাড়ের উপত্যকায় তাবু ফেলিয়া কয়েক দিন কাটাইতেন। আমরা ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা কেহ লাল চেলি, কেহ হলদে কাপড় পরিয়া সূর্য্যের কিরণে নাচিয়া বেড়াইতাম, ছুটিয়া ছুটিয়া পাহাড়ে উঠিতাম আর নামিতাম। কেহ কেহ বাঁধান সিঁড়ি ছাড়িয়া শিলাবন্ধুর পথে উঠিয়া বাহাদুরী লইতাম। প্রাচীনগণ আম্রকুঞ্জে বসিয়া গল্প করিতেন। যুবকগণ পাহাড়ে উঠিয়া 'ওনে-এ-এক' দূরে বেড়াইতে যাইতেন, তাঁহাদিগকে 'ছোট্টো' দেখাইত। গৃহিণীগণের নড়িতে চড়িতে কষ্ট হইত; তাই খুব অল্পই বেড়াইতেন। যুবতীগণ এক গাছতলা হইতে আর এক গাছতলায় কখনও স্ফটিক-নির্ম্মল ঝরণার নিকট বেড়াইতেন আর চুলের কাটা কলম ইত্যাদি করিবার জন্য সাজারুর কাটা কুড়াইতেন। প্রাতে হরিসঙ্কীর্ত্তনের পর সকলে ডিম্বাকারে খাইতে বসিতাম। কখনও কখনও বুদ্ধগয়ায় গিয়াও এইরূপে কয়েক দিবস কাটাইতাম।

গয়াতে একটি বড় সুন্দর প্রথা অছে। শ্রাবণ মাসে পুরুষ স্ত্রীলোক সকলেই খুব দোল খায়। পুরুষরা কোনও বাগানে গিয়া দোলনা খাটায়। মেয়েরা বাড়ীর ভিতরে দোলনা করে। আমাদের বাড়ীতে একটি দোলনা ছিল। পাড়ার মেয়েরা (সকলেই বিহারী; কারণ বাঙ্গালীরা এক পাড়ায় ছিলেন না) আসিয়া খুটিতেন, সারি দিয়া এক পা ঝুলাইয়া দোলনায় বসিতেন। দুই প্রান্তে দাঁড়াইয়া দুইজন চাকরাণী দোল দিত, দোলের তালে তালে গান হইত।

বাঙ্গালীরা অল্পসংখ্যক হইলেও একটি সখের থিয়েটারের দল ছিল। এখন আর সে গয়া নাই। এখন বাঙ্গালী অনেক। গান বাজনা ফুটবল ক্রিকেট বেশ চলিতেছে।

যখন ভগলপুরে আসিলাম তখন মনে হইল এ কোন বনে আসিতেছি। সহরের ভিতর এত মাঠ, এত গাছ, এত আম লিচু কাঁঠালের বাগান কোথাও দেখি নাই। গয়া বাঁকীপুরের মত ঘেঁসাঘেঁসি বাড়ী এখানে দেখি নাই। সভ্যতায় ও সহর হিসাবে ভগলপুর, পাটনা গয়া অপেক্ষা নীচে। তাহার কারণও আছে। পাটনা বিহারের কেন্দ্র, রাজধানী। গয়া বড় তীর্থ বলিয়া। পাণ্ডাগণ ও গয়ওআলগণ এক একটি কুবের। অবশ্য ভাগলপুরও পুরাতন সহর। পাটলিপুত্র যেমন পুরাতন, চম্পকবতী (ভাগলপুরের পশ্চিম প্রান্ত বা চম্পানগর হোয়েন স্যাং দেখিয়া গিয়াছেন বোধ হয়) তেমনি পুরাতন, অবশ্য তেমন প্রসিদ্ধ নহে। এখন ইহা একটি পাড়াগেঁয়ে সহর। কিন্তু তাই বলিয়া ইহার আয়তন বড় কম নহে। বড় ছড়ান সহর; খুব ঘন বসতি কোথাও নাই; তাই লোক সংখ্যা বড় অল্প। সহরটি প্রায় তিন মাইল চওড়া, আট দশ মাইল লম্বা। বাঙ্গালী অনেক; আবার বাঙ্গালীদের একটি স্বতন্ত্র 'টোলা' আছে। এখানকার বাঙ্গালী ছেলেরাও পাড়াগেঁয়ে, কোমরে কাপড় বাঁধিয়া, কেহ চটি জুতা পরিয়া, কেহ শুধু পায়ে পথে পথে বেড়ায়, গাছে দোল খায়, সিদ্ধি খাইয়া দুষ্টামি করে—এ সকল দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমার ধারণা ছিল বাঙ্গালীরা বাবু; ভদ্রভাবে না সাজিয়া পথে বাহির হয় না।

বিহারেই লালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত; সুতরাং আমরাও বিহারী হইয়া পড়িয়াছিলাম। বাঙ্গালার চেয়ে হিন্দীই

সহজে বলিতে পারিতাম; বাঙ্গালা অশুদ্ধ হইত। বাঙ্গালী ছেলের মুখে শুনা যাইত "কুকুর ভুক্‌চে" (ডাকচে); "ধ্বসনা (নদীর) গিরচে" (পড়চে)। যখন ভাগলপুর জিলা স্কুলে ভর্ত্তি হই তখন বাঙ্গালা পড়াইবার পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন না। পণ্ডিতজীর নিকট হিন্দী (Second language) পড়িতে হইত। ইংরাজীর 'মানে' হিন্দীতে বলিতে হইত। আমার তাহাতে সুবিধা বই অসুবিধা ছিল না। 'পণ্ডিতজী' আমায় বড়ই ভাল বাসিতেন। আমার 'দোহা' 'চৌপাই' আবৃত্তি তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। স্কুলে কেহ তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলে আমায় ডাকিতেন 'ইধর আও'। আমি কাছে যাইতাম, তিনি বলিতেন "বোলো", আর আমি দুলিয়া দুলিয়া আওড়াইতাম "সুত বিত নারী ভওয়ন পরিবারা, হোহিঁ জান জগ বারহিবারা।" (জগতে বারবার হইয়া যাইতেছে) ইত্যাদি। পরীক্ষায় হিন্দীতে প্রথম হইয়াছিলাম। তাহার পরের বৎসরেই স্কুলে একটি বাঙ্গালা পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। আমি বাঙ্গালা ধরিলাম, ক্লাসে অনেক নীচে পড়িয়া থাকিতাম। কিন্তু অন্য বাঙ্গালীর ছেলে হিন্দীতে তেমন নম্বর পাইত না। আমি হিন্দী শিখিয়াছিলাম গয়াতে। ভাগলপুরের হিন্দী অতি 'ছাই'। ভালরকম লেখা পড়া জানা লোক ভিন্ন ভাল হিন্দী কি উর্দ্দু কেহই বলিতে পারে না।

তখন বাঙ্গালাদের কুস্তিলড়া প্রধান ব্যায়াম ছিল। সকলে ব্যায়াম করিতেন না। যাহারা করিতেন তাহারা কুস্তিই লড়িতেন। তখন বাঙ্গালী ছেলের মুখে 'ধোবিয়া পাট', 'সওয়ারী', 'চৌকী', 'উখেড়', 'জোড়ালাতী' এই সব কথাই প্রায় শুনা যাইত। কয়েকটি বাঙ্গালী ছেলে একত্র হইলেই খ্যাতনামা 'কুস্তি বাজ'গণের কুস্তির ভিন্ন ভিন্ন প্যাঁচের সমালোচনা হইত। ধূলায় হাত ঘসিয়া পাঞ্জা কসা আরম্ভ হইত। যখন প্যারালেল্ ও হরাইজণ্টাল্ বার, ট্রাপিজ প্রভৃতি আসিল তখন জিম্‌ন্যাষ্টিক্ খুব চলিতে লাগিল। ভাগলপুরের বাঙ্গালীটোলা জিম্‌ন্যাষ্টিক্ ক্লবে অনেক খেলা এমন হইত যাহা সার্কাসের খেলার চেয়ে কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। আমিও আমাদের পাড়ার জিম্‌ন্যাষ্টিক পার্টিতে ভর্ত্তি হইলাম। এক একদিন বড় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া সুন্দর পোষাক পরিয়া ক্রীড়া দেখাইতাম। ইহাই আমাদের প্রধান আমোদের ব্যাপার ছিল। আমি 'গ্রাউণ্ড্ এক্‌সরসাইজ' হইতে 'বার্ প্লে'তে প্রমোশন পাইবার পূর্ব্বেই ক্রিকেট্ আসিয়া সব জিম্‌ন্যাষ্টিক্ পার্টি ভাঙ্গিয়া দিল। তখন চারিদিকে ক্রিকেট্ ক্লব গঠিত হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে ফুট্‌বল্ আসিয়া ক্রিকেট্ উঠাইয়া দিল। এখন আবার টেনিস্ হইয়াছে। এখন ক্রিকেট্ ফুটবল্ টেনিস্ তিনটিই চলিতেছে। তবে ফুটবলই বেশী।

১। কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিলাম। এখন অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গয়াতে অনেক বাঙ্গালা। ভাগলপুর ত বাঙ্গালাতে ছাইয়া গিয়াছে। বাঁকীপুরে বাঙ্গালার সংখ্যা খুব বেশী। বাঁকীপুর একটি প্রকাণ্ড সহর। পাটনাকে তিন ভাগ করা হইয়াছে। ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট—দানাপুর; বাজার, রাজা নবাব জমীদারদিগের আড্ডা—পাটনা সিটি; কাছারী—বাঁকীপুর। সুতরাং বাঁকীপুরেই বাঙ্গালী অধিক। পাটনা সিটিতেও বাঙ্গালার সংখ্যা মন্দ নয়। দানাপুর একটি ছোট গোরাদের সহর; দুইএকজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী ব্যতীত বাঙ্গালী নাই। জামালপুরের ওয়ার্কশপ্, শুনিতে পাই, এই জাতীয় কারখানার মধ্যে পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড়। কর্ম্মচারী বাঙ্গালী এখানে অনেক। বাঙ্গালীদের পাড়াটি প্রকাণ্ড। 'মেস্' অনেক। মুঙ্গের একটি ছোট সাজান সহর। বড় সুন্দর স্থান। সহরের তুলনায় এখানে বাঙ্গালী কম নহে। গাজীপুর অতি শান্ত, ছোট সহর। অনেক বাঙ্গালী কিছুদিনের জন্য এখানে আসিয়া বেড়াইয়া যান। কেহ কেহ বাড়ী ঘর করিয়াছেন। মজঃফরপুরে বাঙ্গালী অনেক। মোতিহারী, দ্বারভাঙ্গা, সমস্তিপুর, আরা, কোথাও বাঙ্গালীর সংখ্যা মন্দ নহে। বাঙ্গালী বিহার ছাইয়া ফেলিয়াছে। বঙ্গের বাহিরে বিহারেই বাঙ্গালীর সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। এত বাঙ্গালী আর কোথাও নাই। এখন সর্ব্বত্র রেলপথ হইয়াছে। বিহার বঙ্গ হইতে দূর নহে। বিহারই বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী স্থান। বিহারী বাঙ্গালীর প্রতিবাসী। তাহার বিহার অতি চমৎকার স্থান। জল বায়ু খুব ভাল। আগে ম্যালেরিয়া কি পদার্থ তাহা এদেশের লোক জানিত না। এখন লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে এ সব স্থান ক্রমে খারাপ হইয়া উঠিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনেক বাঙ্গালী ভাগলপুর

মুঙ্গেরে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিতেন। এখন সকলে মধুপুর পাচম্বা ওয়াল্টেয়ারে যান।

বিহারে বাঙ্গালীর সংখ্যা দিন দিন খুব বাড়িতেছে। কলিকাতা যাওয়া কি দেশে যাওয়া অতি সহজ ব্যাপার। সুতরাং দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ আর ছিন্ন হইতে পায় না। তাহার, এবং বাঙ্গালীর আমদানি বৃদ্ধির ফল এই হইতেছে যে বাঙ্গালীরা আর 'খোট্টা' হইয়া পড়েন না। বাঙ্গালী প্রকৃত বাঙ্গালীই থাকেন। মধ্যভারতে উত্তর-পশ্চিমে ও পঞ্জাবে থাকিতে থাকিতে বাঙ্গালীগণ হিন্দুস্থানী হইয়া পড়েন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিহারেও বাঙ্গালী বিহারী হইয়া পড়িতেন। এখন ততটা হয় না। কয়েক বৎসর এখানে থাকিয়াও অনেকে ভাল হিন্দী বলিতে শিখেন না। ভদ্রলোক হিন্দুস্থানীর সহিত ইংরাজীতে কথা চলে, চাকর ছোটলোকদের সঙ্গে বাঙ্গালায় সারেন। চাকররাও বেশ বাঙ্গালা বুঝে। কোথাও বাঙ্গালীকে আর একা থাকিতে হয় না। সঙ্গী যুটিয়া যায়ই। নিতান্ত পাড়াগাঁ ভিন্ন আর কোথাও হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে তেমন মিশিবার প্রয়োজন হয় না; মিশাও হয় না।

এখন আর মুঙ্গেরের কেল্লার (মীর কাসিমের প্রান্তে গঙ্গাতীরে, কষ্টহারিণী ঘাটের নিকট বেঞ্চে বসিয়া বাঙ্গালী ছেলে 'পিয়া বিনু কৈসে কাটুঙ্গি রয়না' (কাটাব রজনী) গাহে না। ভাগলপুরের পথে বাঙ্গালীছেলে 'ও পিয়া রে কেঁও করো দাগাদারী' গাহে না। এখন 'কালোবরণ রাধা হেরিব না বলেছে', 'নধর অধর আধ সুধাধারা' এই সব গানই শুনা যায়।

কলিকাতা হইতে বাঙ্গালীর খুব আমদানী বাড়িতেছে; বেশীভাগ চাকরী উপলক্ষেই। অনেকে আসেন বেড়াইতে। এখানে আত্মীয় বা পরিচিত কেহ থাকিলেই তাঁহাদিগের নিকট আসিয়া কিছুদিন কাটাইয়া যান। ভাগলপুরে যিনি একবার কিছুদিন থাকেন, তিনিই একটি বাড়ী করিয়া ফেলেন। ঠাকুর পরিবারের কেহ কেহ মাঝে মাঝে বিহারে আসিয়া কিছুদিন কাটাইয়া যান। ভাগলপুরের 'টিলাকুঠি' (ক্লীভল্যাণ্ড্ হাউস) একখণ্ড উচ্চভূমির উপর একটি প্রকাণ্ড মনোহর অট্টালিকা—শ্রীকালীকৃষ্ণ ঠাকুরের। মুঙ্গেরে পীরপাহাড়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একটি চমৎকার অট্টালিকা আছে। গাজীপুরে কবিবর শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যাকে দেখিয়া কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকদিন হইল ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। মুঙ্গেরে কেল্লার ভিতর কাশিমবাজারের রাজা শ্রীআশুতোষ রায়ের অতি সুন্দর দুইটী হর্ম্ম্য আছে। একটি তাঁহার আবাস—অপরটি তাঁহার প্রমোদভবন। রাজা বৎসরের বেশীভাগ সময় মুঙ্গেরে অতিবাহিত করেন।

কলিকাতার বাঙ্গালীরা সর্ব্বদাই আসিতেছেন। এখানকার বাঙ্গালীরাও সর্ব্বদাই কলিকাতায় যাতায়াত করিতেছেন। সুতরাং কলিকাতায় নূতন কিছু উঠিবামাত্র এখানে তাহার শুভাগমন হয়। কলিকাতায় যখন যে 'ফ্যাশান' 'ষ্টাইল' উত্থিত হয়, এখানে তৎক্ষণাৎ তাহার আমদানি হয়। এখন তরুণবয়স্ক বাঙ্গালী 'বাবু'গণ 'ইংরাজী ও বাঙ্গলায় খিচুড়ী বানিয়ে' গল্প করিতে করিতে দলে দলে বেড়াইয়া বেড়ান। মস্তকে গভীর টেড়ী গিরি উপত্যকায় নির্ঝরিণী শোভা পাইতেছে; শুভ্র সূক্ষ্ম উত্তরীয়ের অঞ্চল চঞ্চলপবনে সঞ্চালিত; কাল 'ষ্টকিং'এর উপর সাদা 'ক্যানভাস'এর কিম্বা 'শ্যামোয় লেদার'এর গোড়ালীশূন্য জুতা; এহেন ভূষণে ভূষিত 'উদার পদপল্লবে'র উপর পরিষ্কার কোঁচাখানি কাঁদিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে; 'সেলিউলার টুইলে'র শার্টের বুকের পকেট হইতে 'ফুলনান' মাখান রুমালখানি উঁকি মারিতেছে; এ দৃশ্য দেখিবার জন্য আর খোট্টা পথিক থমকিয়া হাঁ করিয়া দাঁড়ায় না। চুরুটের কথা কি বলিতে হইবে? পথে বাহির হইলেই দেখিতে পাওয়া যায়, অর্দ্ধেক বাঙ্গালীর ছেলের মুখে 'আগুন' (ধূমপায়িগণ গোস্তাকী মাফ করিবেন); অন্ধকারে দোদুল্যমান অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জোনাকীর মত দেখায়। পথে ডাক শুনা যায় 'সিগ্রেট বাবু সিগ্রেট্'। 'লেমনেড্' 'সোডা' বাড়ীতে বিক্রয় করিতে আসে; বরফ সর্ব্বদাই পাওয়া যায়, মাঝে মাঝে কুলপিও আসে। বিহারী হিন্দু এসব স্পর্শ করে না।

'তাজ্জব ব্যাপারে'র সেই 'মাইরি বলচি ভাই, আমার ভাগলপুরের গাই' আর তেমন নাই। গাই তবু আছে। যাঁহাদের বাড়ীতে গরু আছে তাঁহারা বেশ দুধ পান। কেনা দুধ প্রায় কলিকাতার মতই হইয়া উঠিয়াছে। মাছ পূর্ব্বে

অতি সস্তা ছিল। এখন বেশীভাগ কলিকাতায় চলিয়া যায়। পূর্ব্বে এখানে খাওয়ার বড় সুখ ছিল। এখন সব মহার্ঘ্য হইয়া উঠিয়াছে। এসব বাঙ্গালীদের অনুগ্রহে। পাটনার তরকারী প্রসিদ্ধ; মজঃফরপুরের লিচু বিখ্যাত; ভাগলপুরের আম খুব ভাল। সব কলিকাতায় চলিয়া যায়। বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় এসব দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিতেছে।

এখানকার বাঙ্গালীর অবস্থা বঙ্গের অবস্থা হইতে বেশী ভিন্ন নহে। কীর্ত্তন যাত্রা সর্ব্বদাই হইতেছে। গোঁপ কামান সর্ব্বাঙ্গে শিরা বাহির করা যশোদা দেবী ভাঙ্গা গলায় "কেস্‌টোরে একবার একলা এসে দেখা দিয়ে যা" বলিয়া কাঁদিতেছেন; নারিকেল ছোবড়া নির্ম্মিত 'অয়েলক্লথ' জড়ান "লৌহ" গদা হস্তে দষ্টাধর ভীমকে কাষ্ঠনির্ম্মিত সুবর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠির 'ভাম্‌রে' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। পার্শ্বে, যুদ্ধ করিয়া করিয়া করাতের মত হইয়া গিয়াছে এরূপ অসি হস্তে নকুল দাঁড়াইয়া; কিম্বা রাধা ও—তার চেয়ে মাথায় ছোট কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া দশকমুখ হইতে "হরি হরি বল" বাহির হইতেছে। অস্থিশিরাময় কণ্ঠে তুলসীর মালা কীর্ত্তনকারীগণের "পাখী শাখী সখী শিখী কেঁদে আকুল হ'লরে" শুনিয়া, ততোধিক তাহাদের কাঁদ কাঁদ মুখ দেখিয়া সকলে "ওহো" করিয়া উঠিতেছেন। কিম্বা কোনও কীর্ত্তনওয়ালা আসিয়া মুখের কাছে হাত নাড়িয়া "ত্বংহি মম ভবজলধিরত্নং, আমার সাগর ছেঁচা মাণিক তুমি" গাহিবামাত্র বাবুদের পকেট হইতে টাকা ঝরিতেছে। এ সকল দৃশ্য আর নূতন নহে। মেয়েযাত্রা, ক.ব. চণ্ডী কিছুই বাদ যায় না। হিন্দুস্থানী বাইনাচের মত এসব নিতান্ত সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে। বৎসর বৎসর বারোয়ারী পূজা হইতেছে।

তরুণবয়স্কদিগের নিকট এসব তত ভাল লাগে না। তাহাদের সবচেয়ে প্রিয় সামগ্রী থিয়েটার। তাহাদের একটি প্রধান প্রসঙ্গ কলিকাতার থিয়েটার। গিরীশ ঘোষ, অমৃত বোস, অমর দত্ত, দানী, কাশী, নেপা বোস, নরি, তারা ইত্যাদি নাম তাহাদের মুখে লাগিয়াই আছে। কলিকাতা হইতে প্রায়ই থিয়েটার আনান হয়। আর তাহারা নিজেরাও সর্ব্বদাই থিয়েটার করিতেছেন। কলেজে ইংরাজী নাটক—'টেম্পেষ্ট', 'জুলিয়স সিজার'—অভিনীত হয় তাহাতে দুই এক জন বিহারীও থাকেন। সখের দল অনেক। শুধু ভাগলপুরেই পাঁচ ছয়টি। মুঙ্গেরের থিয়েটারের প্যাভিলিয়ান হইয়াছে। গয়াতে আগে যেমন একটি মাত্র থিয়েটারে 'প্রহ্লাদচরিত্র'ই অভিনীত হইত, এখন তাহা নহে। কলিকাতায় বা এখানে যখন যে নাটকের অভিনয় হয়, কিছুদিন ধরিয়া তাহারই আলোচনা তাহারই গান বাঙ্গালী ছেলেদের মুখে চারিদিকে শুনা যায়। অশ্রুমতী হইলে 'প্রেমের কথা আর বোলো না' বিমাদ হইলে 'চার রকমের চার বিরহিনী', মলিনা-বিকাশ হইলে 'পাখী তোর পেলে মধুস্বর'; এইরূপে জনা, বিল্বমঙ্গল, মৃণালিনী, সরলা, নসারাম, ঋষ্যশৃঙ্গ, বিবাহবিভ্রাট রাজা বাহাদুর, তাজ্জব ব্যাপার, কিছুই বাদ যায় না। এখন আবু হোসেন ও আলিবাবা খুব চলিতেছে। ষ্টারে চন্দ্রশেখর অভিনয় হইবামাত্র এখানে কোথাও জোট বাঁধিলেই প্রতাপের অ্যাক্ট চলিতে আরম্ভ করিল। 'রাজা বাহাদুর' অভিনয় হইবামাত্র "রাজা অইম্‌", "রাজা তো রাজা নবাব কাঙ্গাকা অইব্যান" শুনা যাইতে লাগিল। বিষবৃক্ষ অভিনীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকেই দেখি কুন্দনন্দিনী বলিতেছে "ন নগ—নগ—নগেন্দ্র, আমার নগেন্দ্র" ইত্যাদি। আলিবাবা অভিনয় সকল বাঙ্গালী ছেলেকেই 'চিচিংফাঁক' শিখাইয়াছে। থিয়েটারের আড্ডায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান বাজনা চলিতে থাকে। দুপুর রাত্রেও শুনা যায় হার্ম্মোনিয়ম বেহালা তবলা আর ঘুঙুরের সঙ্গে খুব জোরে গান হইতেছে। কেহ কেহ মাঠে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বাঁশী (ক্লারিওনেট) বাজান। অনেকেই ভাগলপুরে আসিয়া বলিয়াছেন, এখানে বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে গান বাজনার চর্চ্চা অন্যান্য স্থানের চেয়ে বেশী। এখন হার্ম্মোনিয়ম ত ঘরে ঘরে।

যাহাদের খেলার দিকে ঝোঁক তাহাদের মুখে 'শোভাবাজার', 'মোহন বাগান', 'টাউন স্পোর্টিং', 'ড্যালহাউসী' 'ক্যালক্যাটা' 'শিবপুর' সর্ব্বদাই ফুটিতেছে। খেলিবার 'ক্লব' এখানে অনেক। সন্ধ্যাবেলা দেখা যায় দলে দলে বাঙ্গালী ছেলে হাতের আস্তিন গুটাইয়া মালকোঁচা মারিয়া চীৎকার করিয়া গল্প করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেছে। ভাগলপুরের বাঙ্গালী ছেলেরা জামালপুর সাহেবগঞ্জের সাহেবদের সঙ্গে 'ম্যাচ' খেলেন। বাঁকীপুরের বাঙ্গালীরা

দানাপুরের সাহেবদিগকে অনেকবার পরাজিত করিয়াছেন। পাটনা কলেজের প্রফেসার জেম্স সাহেবের উৎসাহে কলেজের ছাত্রদের একটি দল অনেক দিন হইল গঠিত হইয়াছে—ইহার নাম জেম্স্ ক্লব। বিহারে এইটী সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন দল। ভাগলপুর 'আদমপুর ক্লবে'র বয়সও প্রায় তের বৎসর হইয়াছে। বিহারীরা খেলার দিকে বড় কম ঘেসে। বাঁকীপুরে তবু কয়েকজন খেলিতেছেন। অন্য স্থানে তাহাও নহে। বিহারী মুসলমানগণ অনেকে ফুটবল খেলিতেছেন, ক্রিকেট অল্প, টেনিস মোটেই না। যে সকল 'টুর্ণামেণ্ট' হয়, তাহাতে বেশীভাগ বাঙ্গালা ছেলেরাই জিতে, বাকী মুসলমান। হিন্দু বিহারীগণ এখনও অনেক দূরে পড়িয়া আছেন। এখন ক্রমে ক্রমে তাঁহারাও আরম্ভ করিতেছেন। দুই একজন বড়লোকের বাড়ী বিলিয়ার্ড আছে। আর বাবুরা মিলিয়া স্থানে স্থানে এক একটি ক্লবও খুলিয়াছেন। ক্লবে বিলিয়ার্ড টেবিল ও একটা লাইব্রেরী থাকে; মাসিক পত্রিকাদিও আসে। কোথাও কোথাও টেনিসও খেলা হয়। সন্ধ্যা হইলেই ফিটান কিংবা টমটমে করিয়া বাবুরা আসিয়া জুটেন। বাঙ্গালীদিগকে দেখিয়া বিহারীরাও এখন বাইসিকেল ধরিয়াছেন। বাঁকীপুর ও ভাগলপুরের বাঙ্গালী ছেলেদের 'বোটিং' একটা খুব আমোদের খেলা। কাহারও কাহারও নিজের বোট আছে। আর সকলে ভাড়া করিয়া লন। সন্ধ্যার সময় কিম্বা জ্যোৎস্না রাতে শুনা যায় নদীতে দাঁড়ের ছপ্ ছপ্ শব্দের সঙ্গে গান চলিতেছে "অনন্ত সাগর (!) মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া", "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে", "দেখরে চেয়ে যাচ্ছি বেয়ে সোণার তরণী।"

৩। কয়েকজন উত্তররাঢ়ী বড়লোক বহুদিন হইল অনেক লোকজন সঙ্গে লইয়া স্বদেশ ছাড়িয়া এদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছেন। তাঁহাদের বংশধরেরা বিহার ছাড়িয়া ফেলিয়াছেন। শুধু সহরেই কুলাইল না। গ্রামে গ্রামে ইহাঁদের বসতি হইয়াছে। বিহারই এখন তাঁহাদের দেশ। মেয়েরাত একেবারে বিহারী হইয়া পড়িয়াছেন। পুরুষদের মধ্যেও যাঁহাদের তেমন সহরে আসা হয় না, তাঁহাদিগকে এখানকার মূল অধিবাসী হইতে সহজে পৃথক করা যায় না। এদের মধ্যে যাঁরা একটু বড়লোক তাঁরা বাড়ীর মেয়েদের বাঙ্গালা পড়িতে শিখান। ছেলেদের সহরে পড়িতে পাঠাইয়া দেন। আজ মাঝে মাঝে বঙ্গদেশে পুত্রকন্যার বিবাহ * দেন। ইহাতে একটু বাঙ্গলা শিক্ষা ও বাঙ্গলা আচার ব্যবহারের প্রচলন হয়। তাহাতে ইহারা এক প্রকার অদ্ভুত খিচুড়ি হইয়া পড়িয়াছেন। নিজেদের মধ্যে কথা বার্ত্তা হিন্দীতে হয়। পত্রাদি কায়থী * হিন্দীতে চলে। বাঙ্গালীদের সঙ্গে কথা কহিতে হইলে সাধামত বাঙ্গলা বলেন। একজন নিক্তি লইয়া চলিয়াছেন; জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় যাচ্ছেন?" উত্তর হইল "সোণা আছে তিরাজু আছে, নাপাতে (—ওজন করাইতে) যাচ্ছি।" আকাশে চাঁদ উঠিলে বলেন "ঐ দেখ ভাই চান উগেছে"। স্কুলে মাষ্টার মহাশয় ছেলেদের নাম ডাকেন, ঘোষ, দত্ত, সিংহ। রাজপুতদিগের মধ্যে যে সিংহ প্রচলিত তাহার উচ্চারণ 'সিং'। ইহা শুনিয়া বাঙ্গালায় কথা কহিতে গিয়া এরূপ ভাষাতে উত্তর অনেকবার পাইয়াছি।

৪। বিহারে বাঙ্গালাদের সকলেরই প্রায় চাকরী উপলক্ষে আগমন। জীবনধারণের ভাবনা ভাবিয়া তাঁহাদের অবকাশ থাকে না, তাই সাহিত্যানুশীলনও হয় না। এরূপ অবস্থার লোকের যাহা সম্ভব—সাময়িক পত্রাদি পাঠ—তাহাই হয়। যাহা কিছু সাহিত্যচর্চ্চা আছে তাহা তরুণ বয়স্কদিগের মধ্যেই। সাময়িক পত্রাদি পাঠ ত আছেই। শুধু ভাগলপুরে এতগুলি পত্রিকা আসে যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। বাঙ্গালা উপন্যাস নাটকাদি বিহারের বাঙ্গালী ছেলেদের সুপরিচিত। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস হইতে কোনও কোনও স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতে না পারে এরূপ বাঙ্গালী খুব কম; মাইকেল দত্ত, নবীন সেন, হেমচন্দ্রের কবিতার অনেক অংশই অনেকের কণ্ঠস্থ। আজকাল বঙ্গে যেমন রবিবাবুর কবিতাই ফ্যাশান হইয়াছে এখানেও তেমনই। বিহারে ভাল বাঙ্গালা লাইব্রেরী নাই। বিহারে কেন—কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও খুব ভাল লাইব্রেরী নাই। এদেশের লোক এখনও লাইব্রেরী করিতে তেমন শিখে নাই। আমরা লাইব্রেরীর কাজ এখানে—ঠিক বঙ্গদেশের মত—বই চাহিয়া, কখনও কখনও কিনিয়াই সারি।

* এই বৎসরের আশ্বিনের ভারতীতে 'বেহারে বাঙ্গালিনী' দ্রষ্টব্য।

* হিন্দীতে দুই প্রকার অক্ষর প্রচলিত, 'দেবনাগর'—যাহাতে সংস্কৃত ভাষা লিখিত হয়, এবং কায়থী হিন্দী—এদেশে শুধু হিন্দি বলে—যাহা আদালতে প্রচলিত।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কি ভারতের অন্য কোনও স্থানে বাঙ্গালী ছেলে প্রায়ই হিন্দুস্থানী হইয়া পড়ে। তাই সে সব স্থলে বাঙ্গালীর ছেলেকে বাঙ্গলা শিক্ষা দিবার জন্য—প্রকৃত বাঙ্গালী করিবার জন্য সমিতি লাইব্রেরী ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন হয় *। বিহারে ততটা হয় না। এখানে এণ্ট্রান্স স্কুলে নিয়মিতরূপ বাঙ্গালা পড়াইবার জন্য স্বতন্ত্র বাঙ্গালী পণ্ডিতমহাশয় নিযুক্ত আছেন। নিম্নশ্রেণীগুলিতে বাঙ্গালী ছেলেকে ইংরাজীর অর্থ হিন্দীতে বলিতে হয় না। ভাগলপুরে রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বালকদিগের জন্য একটী, বালিকাদিগের জন্য আর একটী বাঙ্গালা স্কুল আছে। বাঙ্গালী বালকবালিকাগণ প্রতি বৎসর অপর প্রাইমারী পরীক্ষা দিতেছে। বাঁকীপুরে একটী 'নর্ম্মাল' স্কুল আছে। ইহাকে কিন্তু সাহিত্যানুশীলন বলে না। এদিকে খুব অল্প লোকেরই টান আছে। বেশীভাগ বাঙ্গালী ছেলেরই প্রায় ছাত্রজীবন। যাঁহার সাহিত্য অনুশীলনে বিশেষ আগ্রহ তিনি কোনওরূপে সময় করিয়া লন। তাঁহারা নবপ্রকাশিত কোনও পুস্তকই পড়িতে বাকী রাখেন না। কণিকা, কথা, কাহিনী, কল্পনা, পদ্মা, অশোক-গুচ্ছ, মানঞ্চ, ইত্যাদির আলোচনা তাঁহাদের সর্ব্বদাই হইতেছে। ভারতী, সাহিত্য, প্রদীপ, পুণ্য, উৎসাহ, বঙ্গদর্শন, প্রবাসী নিয়মিতরূপে পাঠ করেন। ভাগলপুরে আমার এইরূপ কয়েকটি বন্ধু মিলিয়া একটি ক্ষুদ্র সাহিত্য-সভা করিয়াছেন। ইঁহারা রীতিমত সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া থাকেন। একটি হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা বাহির করেন—তাহার নাম 'ছায়া'। কলিকাতা ভবানীপুরের এইরূপ একটা সমিতির এইরূপ একটি মাসিক পত্রিকা 'তরণী'র সহিত ইহার বিনিময় হয়। ইহাদের যত্ন প্রশংসার্হ।

ভাগলপুরের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্রলাল রায় নূতন মাসিক পত্রিকা 'নবপ্রভা'র একজন † সম্পাদক। যাঁহাদের একটু অবসর আছে এরূপ শিক্ষিতা মহিলাদিগের পুস্তকপাঠ মন্দ হয় না। কেহ কেহ প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। কুন্তলীন পুরস্কারের 'পূজার চিঠি'তে জামালপুরের একজন মহিলার রচনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছিল। সমস্তিপুরের শ্রীসরমা দেবী ও ভাগলপুরের শ্রীকুলদা দেবীর নামও কুন্তলীন পুরস্কারে অনেকেই দেখিয়াছেন। যুবকদিগের মধ্যেও অনেকে সাময়িক পত্রাদিতে লিখিয়া থাকেন কেহ কেহ পুরস্কারও পাইয়াছেন। মাঝে মাঝে মাথায় বড় বড় চুল, শূন্য ঊর্দ্ধ দৃষ্টি, ক্ষয়প্রাপ্ত, শীর্ণ ধীরগতি নিরুৎসাহ এক একটি বালক কবিও দেখিতে পাওয়া যায়। (বালক না বলিয়া কি বলিব? একটু বড় হইলেই সব অকালপক্বতা চলিয়া যায়)। কৈশোরে পদার্পণ করিবামাত্র ইঁহাদের প্রাণ 'কে জানে কাহার জন্য' কাঁদিয়া আকুল হয়; জীবনের অতি সামান্য দেখিয়াই বলিতে আরম্ভ করেন "হ'লনা কিছুই হ'লনা"। জীবন 'ড্রামা'র প্রথম 'সীনে'ই ইঁহারা 'ট্রাজেডি' অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন। ভাগলপুরে একটী বড় অদ্ভুত কথার প্রচলন আছে। রবি-ঠাকুরের 'গোঁড়া'দিগকে রৈবিক বলা হয়। ইঁহাদিগকে আক্রমণ ও পদে পদে বিদ্রূপ করিবার জন্য 'অ্যান্টিরৈবিকেরা'-ও আছেন। রবিবাবুর কবিতা ও গানই ভদ্রসমাজে বিশেষ আদৃত। 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে', 'আজ তোমারে দেখতে এলাম' এখন পুরাতন হইয়াছে। এখন 'নিশিদিন তোমায় ভালবাসি', 'বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে', 'তুমি যেওনা এখনি,' 'এখনো তারে চোখে দেখিনি,' 'কেন করুণ স্বরে বীণা বাজিল,' 'আমার পরাণ যাহা চায়,' 'নিশি নিশি কত রচিব শয়ন,' 'ভুবনমনমোহিনী,'এই সব গানই ভদ্রসমাজে বেশী হয়। এখন 'তুমি সন্ধ্যার মেঘলা'র খুব আদর।

৫। উত্তররাঢ়ীদিগের মধ্যে কয়েকঘর খুব বড়লোক আছেন। এতদিন বিহারে থাকিয়াও তাঁহাদের আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তার পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাঁহাদেরই পূর্ব্ব-পুরুষগণ রাঢ়দেশ হইতে অনেক লোক সঙ্গে লইয়া আসিয়া এখানে বসবাস করিয়াছেন। চম্পানগরের 'মহাশয়জী' খুব বড়মানুষ। ইঁহারা বংশপরম্পরায় 'মহাশয়' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহারা অতি মহৎ লোক। দান সৎকার্য্য পূজা অর্চ্চনাতেই জীবন অতিবাহিত করেন। অসংখ্য লোক ইঁহাদের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে। ইঁহাদের সদাব্রত চিরদিন। প্রতিদিন অনেক গরীব দুঃখী এখানে আসিয়া যথেষ্ট আহার করিতেছে। তাহাদের আশীর্ব্বাদ

* প্রবাসীতে 'বঙ্গের বাহিরে বঙ্গসাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

† নবপ্রভা'র সম্পাদক দুইজন।

ইহাঁদের উপর সর্ব্বদাই বর্ষিত হইতেছে। দুর্ভিক্ষের সময় কত স্থান হইতে কতলোক আসিয়া এখানে অন্ন পাইয়াছে তাহা বলা যায় না। ইহাঁরা গ্রীষ্মের সময় অনেক জলসত্র স্থাপন করিয়া পথিকদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হন। নিজে সামান্য অবস্থায় থাকেন। বিলাসিতার লেশমাত্র নাই। বর্ত্তমান মহাশয়জীর নাম শ্রীতারকনাথ ঘোষ। অতি চমৎকার লোক। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ পরলোকগত উকীল রায় সূর্য্যনারায়ণ সিংহ বাহাদুর খুব ধনী লোক ছিলেন। ইহাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা দেশবিখ্যাত। ইহাঁর অট্টালিকাটি অতি প্রকাণ্ড ও মনোহর। ইনি মৃত্যুকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একলক্ষ টাকা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। বাঁকীপুরের ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকান্ত সিংহ আর একজন উত্তররাঢ়ী কায়স্থ। চিকিৎসায় ইহাঁর পারদর্শিতা অত্যন্ত প্রশংসিত ও বিখ্যাত। বাঁকীপুরের পরলোকগত প্রসিদ্ধ উকীল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের মেম্বর অনারেবল্ শ্রীগুরুপ্রসাদ সেন একজন খুব মহৎ লোক ছিলেন। অনেক অনাথ অসহায় বালক বালিকাকে ইনি প্রতিপালন করিয়াছেন। বিহারী রাজা নবাব জমীদারদিগের মধ্যে ইহাঁর খুব প্রতিপত্তি ও সম্মান ছিল। সামান্য অবস্থা হইতে নিজ অদম্য চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে কিরূপে বড় হওয়া যায় ভাগলপুরের রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার একটী জলন্ত জীবন্ত দৃষ্টান্ত। বাল্যকাল হইতে ইনি নিজ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। ওকালতিতে ইহাঁর খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। তখন 'রায় বাহাদুর' হন। এখন রাজা উপাধি পাইয়াছেন। ইনি একজন খুব স্বাধীন প্রকৃতির লোক। ইনি এখানে দুইটি বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। বালকদিগের স্কুলটির পিতার নামে ও বালিকাদিগের স্কুলটির মাতার নামে নাম দিয়াছেন।

৬। প্রবাসীদিগের মধ্যে সামাজিক দৃঢ়তা ততটা থাকে না। কিন্তু ভাগলপুরের হিন্দু সমাজে দলাদলি লাগিয়াই আছে। কোনও উপলক্ষে ভাগলপুরের বাঙ্গালীদের ভোজ দিতে গিয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হয়। এখন আবার ব্রাহ্মণকায়স্থে বিবাদ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা যে অবনতির সূচনা তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার

৭। পাপের প্রলোভন কলিকাতায় যত ততটা এখানে কেন, বঙ্গের অন্যান্য স্থানেও নাই;—আর হওয়া সম্ভবও নহে। প্রায়ই দেখা যায় যে স্থান যত বড় সেখানে পাপটাও তেমনিই বেশী। তাহার পর এখানে বাঙ্গালীরা সকলেই প্রায় চাকরী করেন। ছেলেরা সকলেই প্রায় ছাত্র। নিষ্কর্ম্মা হইয়া খুব অল্প বাঙ্গালীই বসিয়া থাকে। আলস্য, কোনও কাজ না থাকাই সকল দোষের মূল। এরূপ অবস্থায় নৈতিক অবস্থা যেরূপ হয় এখানে তেমন। তবে যত বাঙ্গালী বাড়িতেছে, যত কলিকাতার সঙ্গে সম্বন্ধ বাড়িতেছে, ততই ক্রমে ক্রমে পাপও আসিয়া জুটিতেছে। ধূমপান ত বাঙ্গালী ছেলেদের মধ্যে ততটা গর্হিত কার্য্য মনে করা হয়ই না। বাবুদের মধ্যে মদ ঢুকিয়াছে। দুই একটি করিয়া বাঙ্গালী বারাঙ্গনারও আমদানি হইতেছে। তার পর ছেলেদের মধ্যে আজ কাল অনেকেই 'বকিয়া' যাইতেছে। অল্প বয়সে পড়া শুনা ছাড়িয়া দিতেছে। কেহ হয়ত আট দশ টাকা মাহিনার একটি চাকরী সংগ্রহ করিয়া লইতেছে, কেহ তাহাও নহে। সিদ্ধি ত আছেই, কেহ কেহ গাঁজা মদও ধরিতেছে। লক্ষ্মীছাড়া 'কোকেন'ও আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।

৮। আর্থিক অবস্থা এখানকার বাঙ্গালীদিগের মন্দ নহে। প্রথম প্রথম যাঁহারা এদেশে আসিয়াছিলেন, সকলেই বড় বড় চাকরী লইয়া। তাঁহারা সকলেই বেশ অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। তখন এদেশে বাঙ্গালী বাবুর খুব সম্মান ছিল। এখন ততটা নাই। এখন বাঙ্গালীর ছড়াছড়ি। ডাক্তাররা বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিয়াছেন। বিহারী এখন পর্য্যন্ত কেহ ডাক্তার হয় নাই। আর বড় বড় উকীল সকলেই বাঙ্গালী। বাঁকীপুরে রাধাকৃষ্ণবাবু, পূর্ণেন্দুবাবু, ভাগলপুরে চন্দ্রশেখরবাবু, মুঙ্গেরে শ্যামলবাবু, ইহাঁরা প্রচুর উপার্জ্জন করিয়াছেন। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ সবই প্রায় বাঙ্গালী।

৯। বাঙ্গালীর ছেলেদের সকলের প্রায় ছাত্রজীবন। সকলের যে পিতা মাতা এখানে তাহা নহে। বঙ্গদেশের অনেক স্থান হইতে বাঙ্গালী ছেলে এখানে পড়িতে আসে। ভাগলপুর কলেজ তেমন ভাল নহে। পাটনা গভর্ণমেণ্ট কলেজও কলিকাতার মত নহে। বাঙ্গালী ছাত্রের সংখ্যা খুব বেশী। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম,

বর্দ্ধমান, হুগলী, নদীয়া, বাঁকুড়া, রংপুর, কোচবিহার, বগুড়া, যশোহর, ঢাকা, এসব স্থান হইতে বাঙ্গালী ছাত্র আসেই; কুমিল্লা হইতেও এখানে পড়িতে আসে। কলিকাতার কলেজ ছাড়িয়াও যে ছাত্রগণ এখানে পড়িতে আসেন, সেটা কেবল স্বাস্থ্যোন্নতি, বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য। এখন এখানে রুগ্ন, পড়িয়া পড়িয়া রক্তহীন শরীর, চস্‌মাচ্ছন্ন চক্ষু, পিঙ্গলবর্ণ, ডিসপেপসিয়ায় বা অম্লরোগে আক্রান্ত সোডা ওয়াটারের পিপা আদর্শ বাঙ্গালী ছাত্রের অভাব নাই। ভাগলপুরে একটি পুলিশ ট্রেণিং স্কুল হইয়াছে। সেখানে পাশ করিয়া সবইনস্পেক্টার হওয়া যায়। ইহাতে বাঙ্গালীর আমদানী খুব বাড়িয়াছে। বিশেষ পূর্ব্ব-বঙ্গ হইতে। বাঁকিপুরে একটি 'বিহার স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং' আছে। সেখানে পাশ করিয়া সব্ ওভারশিয়ার হওয়া যায়। অনেক বাঙ্গালী ছেলে তাহাতে পড়িতে আসে। পড়ায় বিহারীরা অনেক বাঙ্গালীর পাতে পড়িয়া আছে। বাকীপুরে তবু বিহারীরা পাশ করিতেছে, অন্যান্য স্থলে খুব কম। বিহারী হিন্দুগণ বিহারী মুসলমান অপেক্ষাও পশ্চাৎপদ। ভাগলপুর কলেজ হইতে কয়েকজন বিহারী মুসলমান পার্সীতে ও এক জন বিহারী হিন্দু সংস্কৃততে ভিন্ন আর কেহ কোন বিষয়ে 'অনার'এর সহিত পাশ করিয়াছে শুনি নাই। বৃত্তি এবং ক্লাসের উচ্চস্থান বাঙ্গালীরই নিকট বাঁধা। শিক্ষার অবস্থা মন্দ নহে। ভাগলপুরে একটি কলেজ। বাঁকীপুরে একটা গভর্ণমেণ্ট আর একটা প্রাইভেট কলেজ। মুঙ্গেরে ডায়মণ্ড জুবিলি কলেজ হইয়াছে, তাহাতে এফ্ এ পর্য্যন্ত পড়ান হয়। মজঃফরপুরে ভুঁইহারবাভনগণ একটা কলেজ করিয়াছেন। তাহাতে বি এ, এ কোর্স পর্য্যন্ত পড়ান হয়। এণ্ট্রান্স স্কুল শুধু ভাগলপুরেই সাতটি; বাঁকীপুরেও ছয় সাতটা। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে এখানে শিক্ষার অবস্থা কিরূপ।

বিহারের কয়েকটা বাঙ্গালী ছাত্র এখন বেশ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র মল্লিকের পুত্র শ্রীবসন্তকুমার মল্লিক, ও শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সিভিল সার্ভিস পাস করিয়া আসিয়া এখন ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছেন। বি কে. মল্লিকের ভ্রাতা শ্রীশরৎকুমার মল্লিক যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাহা সকলেই জানেন। ইঁহারা তিনজনেই ব[াল্য]কালে ভাগলপুরে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। বাঁকীপুরে—এ গয়ার—ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র রা[য়ের] পুত্র শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় কেম্ব্রিজ 'ল ট্রাইপস' পাস ক[রিয়া] আসিয়াছেন। আরও কয়েকজন বাঙ্গালী যুবক ব্যারিষ্ট[ার] হইয়া আসিয়াছেন।

১০। চাকরী উপলক্ষেই প্রধানতঃ বাঙ্গালীর আগমন। রাজকর্ম্মচারীদিগের উচ্চপদগুলি সবই বাঙ্গালা দ্বারা অধিকৃ[ত]। এখন নিম্নপদগুলিতেও বাঙ্গালী অনেক। কেরাণী হইতে আরম্ভ করিয়া অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিসনার- কখনও কখন ম্যাজিষ্ট্রেট (বি কে মল্লিক কিছুদিন ভাগলপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; এ সি চাটার্জ্জি গাজীপুরে) পর্য্যন্ত বাঙ্গালী। বাঙ্গালী উকীলে এখন বিহার পরিপূর্ণ বাঁকীপুর ও ভাগলপুরে বাঙ্গালী উকীলের সংখ্যা অত্য[ন্ত] অধিক। এখন সবডিভিজনগুলিতেও অনেক বাঙ্গালী উকীল যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ডাক্তার, কবিরাজ হোমিওপ্যাথিক প্র্যাক্টিশনারদের সাইনবোর্ড এখন পথে পথে। রেলওয়েতে বাঙ্গালীই প্রায় সব। পোষ্টাফিসে বাঙ্গালী অনেক। কলেজের প্রফেসারেরাও সবই বাঙ্গালী বাঁকীপুরের গভর্ণমেণ্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও দুই একজন প্রফেসার ইংরাজ। আর সবই বাঙ্গালী। অন্যান্য কলেজেও প্রিন্সিপাল প্রফেশার সবই বাঙ্গালী। এণ্ট্রান্স স্কুলের হেড্ মাষ্টার তো প্রায় সবই বাঙ্গালী, অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যেও বাঙ্গালী অনেক। বিদ্বান লোক সবই বাঙ্গালী। কর্ম্ম উপলক্ষে কতদিন হইতে বাঙ্গালী এখানে আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। স্বর্গীয় রাজর্ষি রামমোহন রায় প্রায় এক শতাব্দী হইল ভাগলপুরের কলেক্টর আফিসে চাকরী করিয়াছিলেন।

১১। বিহারীরা বড় প্রেমিক; খুব আদর ভালবাসা জানেন। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর খুব মান সম্ভ্রম খাতির আদর ছিল। বাঙ্গালীরা নিজের দোষে তাহা হারাইতেছেন। একটু মিশিতে দিলেই ইঁহারা খুব আত্মীয় করিয়া লন। পূর্ব্বে নূতন কেহ বাঙ্গালী আসিলেই আলাপ করিবার চেষ্টা করিতেন। নিমন্ত্রণ করিতেন, বাড়ীতে সর্ব্বদাই খাবার পাঠাইয়া দিতেন। বাঙ্গালীর মধ্যে যদি কেহ নিন্দুক থাকিতেন তাহা হইলে [illegible]

আদর সর্ব্বত্রই হইত। আমরা গয়াতে কত খাবার, কত টাকা, বস্ত্র পাইয়াছি তাহা বলা যায় না। কয়েকটি ঘর আমাদের নিতান্ত আপনার হইয়া পড়িয়াছিল। কাহাকেও চাচা, কাহাকেও মামু, কাহাকেও ফুফা, পিসা বলিতাম। মেয়েরা যেন ভালবাসা মমতার মূর্ত্তিস্বরূপিনী। চাচি খাবার দিতেন, ভৌজি (বৌদিদি) খেলনা দিতেন। সকলের কোলে উঠিতাম। ইঁহারা কখনও কোন কষ্ট অনুভব করিতে দেন নাই। বিদেশকে ইঁহারাই স্বদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। গয়া ছাড়িয়া কখনও কোথাও চির দিনের জন্য যাইতে পারিব ভাবি নাই।

এখন কিন্তু সেদিন নাই। এখন বাঙ্গালি অনেক। বিহারীর সঙ্গে মিশিবার তত প্রয়োজন হয় না, মিশাও হয় না। এখন কলিকাতায় শিক্ষিত ও কলিকাতা হইতে আগত বাঙ্গালীদের দেখিয়া সকলে 'ছাতু'দিগকে বিলক্ষণ ঘৃণা করিতে শিখিয়াছেন। কেহ কেহ ভাষা শুদ্ধ করিয়া বলেন 'বরচুণ'। 'মেড়ো'দের ও কথাটির উৎপত্তি 'ছাতু'র অনুরূপ। 'মড়ুয়া' খান বলিয়া বিহারীরা 'মেড়ো'। সঙ্গে কথা কহিতে, একসঙ্গে বসিতে ঘৃণা বোধ হয়। বিহারী-বিদ্বেষ ছেলেদের মধ্যে খুব বেশী। বিহারী কেহ নিকটে আসিলে দারুণ তাচ্ছিল্যে তাঁহাকে দূর করিয়া দেয়। বিহারীদের সঙ্গে আমি খুব মিশি; তাহাদের মধ্যে আমার খুব আদর। ইহা দেখিয়া আমার কোনও কোনও বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট বলিয়াছেন "ওগুলোর সঙ্গে আলাপ কত্তে তোমার কেমন ক'রে প্রবৃত্তি হয় আমি ভেবে পাই নে।" বিহারীর মধ্যে আমার শৈশব অতিবাহিত। বাঙ্গালীকে ভালরূপে পরে জানিয়াছি। আমার কোনও বিদ্বেষই বোধ হয় না। বাঙ্গালীর সঙ্কীর্ণতা ও বৃথা গর্ব্ব বড়ই নিন্দার্হ।

এখন বিহারীরাও ক্রমে বাঙ্গালীর নিকট হইতে দূরে যাইতেছে। আদর করিয়া ভালবাসিয়া মিশিতে আসিয়া বার বার ব্যথিত হইয়া ফিরিয়া গিয়া তাহারাও শিখিয়াছে। তাহারাও এখন বাঙ্গালীকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঙ্গালীরা এখন তাহাদের বিশ্বাস হারাইয়াছে।

বিহারী ও বাঙ্গালীর মধ্যে এই বিদ্বেষ যে নিতান্ত পরিতাপের বিষয় তাহা বিবেচনাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিহারীরা বড় প্রেমিক। তাহাদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা ও বর্দ্ধন করা অতি সহজ। বাঙ্গালীর সঙ্কীর্ণতা দূর করিলেই হইল। বিহারীদিগকে একটু মিশিতে দিলেই তাহারা দেখাইয়া দিবে বিদেশীকে কিরূপে ভালবাসিতে হয়। যাঁহারা এখানে অনেক দিন হইল আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত বিহারীদের বেশ সদ্ভাব আছে।

১২। যদি বলি হিন্দীভাষা বড়ই মধুর, বাঙ্গালার চেয়ে বড় কম নহে, তাহা হইলে বাঙ্গালীরা মারিতে আসিবেন। বঙ্গে বিহারী দারোয়ান, কুলি, পেয়াদা, চাকর দেখিয়া বাঙ্গালীরা বিহারীর সঙ্গে যত কিছু অসভ্যতা মূর্খতার ভাব জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। "খোট্টার আবার ভাষা, তাহার অবার মাধুর্য্য—এও কি সম্ভব? হিন্দী ভাষা ত কেবল গালি দিবার জন্যই গঠিত হইয়াছে। ছাতুগঠিত মস্তিষ্ক হইতে মধুর ভাষা কিরূপে নিঃসৃত হইবে?" অবশ্য অধুনা হিন্দীভাষার অবস্থা শোচনীয়। এখনকার বাঙ্গালা ভাষার পাশে দাঁড়াইতে পারে না। উর্দ্দু ভাষা প্রবেশ করিয়া হিন্দীভাষার লালিত্য অনেকটা দূর করিয়া দিয়াছে। খাঁটী উর্দ্দু ভাষা বেশ সুন্দর, কিন্তু একটু তীব্র। উর্দ্দু ভাষার প্রচলন হিন্দীভাষা চর্চ্চার মূলে কুঠারাঘাত করিল। সেই অবধি হিন্দী গ্রন্থ অতি অল্পই রচিত হইয়াছে। আধুনিক হিন্দী ভাষায় রচিত খুব ভাল গ্রন্থ একটিও নাই। তবে আমি বলিতেছি হিন্দীভাষা অতি মনোরম সে কিছু পূর্ব্বের হিন্দী কথা,—সুরদাস তুলসীদাসের হিন্দীর কথা,—যখন বঙ্গভাষা জন্মও হয় নাই—যখন বঙ্গে ব্রজবুলি প্রচলিত, তখনকার হিন্দীর কথা। ইহার কোমলতা কমনীয়তা লালিত্য কত প্রকাশ করা যায় না। তবে হিন্দী সাহিত্য বড় অপ্রশস্ত। কয়েকটি মাত্র ভাল গ্রন্থ আছে। তুলসী অমৃতের সরোবর। তুলসীকৃত রামায়ণ বিহারীদের 'গ্রেট্ এপিক,' হিন্দীর মহাকাব্য। বাঙ্গালী বাবুরা হয়ত ভাবিবেন 'গাড়োয়ানদের আড্ডায় মুদির দোকানে ছোটলোকগুলা চেঁচাইয়া সুর করিয়া করিয়া যে তুলসীর রামায়ণ পড়ে, তাহা কখনও ভদ্রলোকদের জন্য প্রণীত হয় নাই'। ভাষার মাধুর্য্য, পদের লালিত্য, বর্ণনার সরসতা, চমৎকারিতা, ভাবের সুরুচি পবিত্রতা, এসকলের একাধারে এমন সমাবেশ খুব অল্প গ্রন্থে আছে। ইহা যে জাতীয় গ্রন্থ সে জাতীয় বাঙ্গালা কোন

...াপমার ছড়াছড়ি ;
...ন্তরন্যাস, ইত্যাদি
...পদে। উদাহরণ

...আসিয়া নিজ নিজ
...ছন। এমন সময়

...র' বালপতঙ্গ।
...লাচন ভৃঙ্গ ॥'
...সরোজবন বিক-
...মঞ্চ উদয়গিরি ;
...বন ; তাঁহাদের

...নি উদিত হইয়া

...সঙ্কুচিত হইতে
...আরম্ভ করিল।
...চলেরই ইচ্ছা রাম
...তাজননী সখীকে
...য়া বল
...প করি দাপা ॥
...কি মন্দর লেহী ॥'
...নু স্পর্শ করিতে
...হারিল। সেই
...ছে ; বাল মরাল

...নুষ সুনু রানী।'

...ভুবন তমভাগা।'

...হইয়াছে। শ খুব
...কার জন্য। আবার
...র্জন হয়। তাহার
দৃষ্টান্তও পাওয়া যাইবে।

রবিমণ্ডল দেখিতে ক্ষুদ্র ; তাহার উদয়ে ত্রিভুবনের অন্ধকার পলায়ন করে।

'মন্ত্র পরম লঘু জাসু বস বিধি হরি হর সুর সর্ব।
মহা মত্ত গজরাজ কহঁ বস করু অঙ্কুস খর্ব ॥'

মন্ত্র অতি সামান্য পদার্থ, কিন্তু বিধি হরি হর সুর সকলে তাহার বশ। অঙ্কুশ মহামত্ত গজরাজের গর্ব্ব খর্ব্ব করে।

'কাম কুসুম ধনু সায়ক লীন্হে।
সকল ভুবন অপনে বস কীন্হে ॥'

কামের ধনুর্ব্বাণ কোমল কুসুম নির্ম্মিত। সকল ভুবন সেই ধনুকের বশ।

এদিকে সীতা মনে মনে আকুল হইয়া বলিতেছেন, "'হোহু প্রসন্ন মহেশ ভবানি'

'করি হিত হরহু চাপ গরুতাই।'

হিত করিয়া ধনুর গুরুতা হরণ কর।

'করিহ মোহি রঘুপতিকী দাসী।'

আমায় রঘুপতির দাসী করিও।

'অহহ তাত দারুণ হঠ ঠানী।'

পিতা দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

'সিরিস সুমণ কিমি বেধিহি হীরা।'

শিরীষ কুসুম কিরূপে হীরা বিদ্ধ করিবে ?"

কিন্তু 'গিরা অলিনি মুখ পঙ্কজ রোকী।
প্রগটন লাজ নিসা অবলোকী ॥'

বাকা ভ্রমরকে মুখপঙ্কজ রুদ্ধ করিল। লজ্জা নিশাকে দেখিয়া প্রকট হইল না। রাত্রিকালে ভ্রমর পদ্মের ভিতর থাকে ; পদ্ম তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহেনা, রুদ্ধ করিয়া রাখে, যতক্ষণ প্রভাত না হয় ভ্রমরও ততক্ষণ বাহির হয় না ; বারে বারে বাহির হইবার চেষ্টা করে, কিন্তু তখনও রজনী আছে দেখিয়া ফিরিয়া যায়।

সীতা আকুল হইয়া মনের কথা বলিয়া ফেলিতে চাহিতেছেন। কিন্তু রমণীর ভূষণ লজ্জা যে সর্ব্বদা সঙ্গে ফিরে। তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল।

ধনুর্ভঙ্গের পর সীতা রামকে জয়মালা পরাইতেছেন।

'সুনত যুগল কর মাল উঠাই।
প্রেমবিবস পহিরাই ন যাই ॥

সোহত জনু যুগ জলজ সনালা।
সসিহি সভীত দেত জয়মালা॥

প্রেমে বিবশা মৈথিলী মালা পরাইতে পারিতেছেন না। তাঁহার হাত দুখানি সনাল পদ্ম; রামচন্দ্র শশী; শশীকে দেখিয়া কমল তো সঙ্কুচিত (সভীত) হইবেই।

মাত্র দেড় পৃষ্ঠার ভিতর এতগুলি রূপক ও দৃষ্টান্ত। তাহা ছাড়া দুই একটি নিদর্শনাও রহিয়াছে।

কেহ কেহ হয়ত বলিলেন তুলসীর বাহাদুরী কি? এসব ত সংস্কৃততেই প্রচুর। তুলসী সংস্কৃত হইতেই সব লইয়াছেন।

আমাদের ভারতচন্দ্রের ভাষা বর্ণনা এমন কি ভাব পর্য্যন্ত সবই সংস্কৃতের অনুরূপ নয় কি? ভারতচন্দ্রে এমন কিছুই নাই যাহা সংস্কৃতে প্রচুর ছিল না। যদি কিছু থাকে তাহা নিতান্ত সামান্য। তাহার জন্য ভারতচন্দ্রের খ্যাতি নহে।

তুলসীদাসের পদবিন্যাস অতি মনোহর, অতি চমৎকার। জয়দেবের 'মনিময় মকর মনোহর কুণ্ডলমণ্ডিত গণ্ডমুদারম'এর মত অতিললিত পদবিন্যাস - যাহা বেশীক্ষণ উপভোগ করা যায় না - যাহা উজ্জ্বল লাল বা সবুজ রঙ্গের মত—কেয়া ফুলের গন্ধের মত—পঞ্চম সুরের মত—মধুর মত একটু উপভোগ করিয়া মন প্রাণ অবশ হইয়া পড়ে* — এরূপ পদবিন্যাস তুলসীতে কোথাও নাই। গোলাপী বা খুব কচি ঘাসের রঙ্গের মত জুঁইফুলের গন্ধের মত মধ্যম † সুরের মত—লেবুর সরবতের মত পদবিন্যাস তুলসীতে প্রচুর।

জনক রাজার উদ্যানে 'বরণ বরণ বর বেলি বিতানা।'
'মধ্য বাগ সর সোহ সুহাবা।' বাগানের মধ্যস্থলে সরসী।
'বিমল সলিল সরসিজ বহুরঙ্গা।' জলখগ কূজত গুঞ্জত ভৃঙ্গা॥'

তুলসীদাসের 'বিনয়পত্রিকা'র গানগুলির পদবিন্যাসও বড় সুন্দর। ছেলেবেলায় দাদা গাহিতেন

তু দয়াল দীন হোঁ (হম, আমি) তু দানী হোঁ ভিখারী। ‡
হোঁ প্রসিদ্ধ পাতকী, তু পাপপুঞ্জহারী॥

* নব পর্য্যায়ের বঙ্গদর্শনে কেকারব দ্রষ্টব্য।

† উদ্‌ভ্রান্তপ্রেম প্রণেতা শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় গান্ধার সুর ভাল বাসেন।

তু ব্রহ্ম হোঁ জীব; তু ঠাকুর হোঁ চেরো,
তাত মত গুরু সখা তু সববিধ হিত মেরো।

এত গেল অলঙ্কার ও পদলালিত্যের কথা। [illegible] জন্যই তুলসীদাসের খ্যাতি বেশী। বিনয়প[illegible] গুলি অতি উচ্চদরের। রামচন্দ্রকে লইয়া [illegible] গুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রত্যেকটি এক [illegible] বড়ই দুঃখের বিষয় যে এমন রত্ন বাঙ্গালীয় [illegible] রিচিত ইহার রসাস্বাদনে বাঙ্গালা বঞ্চিত [illegible]

অধুনা বাঙ্গালীর সংস্কৃত কাব্যের প্রতি [illegible] পড়িয়াছে। যাঁহারা সংস্কৃত বুঝেন তাঁহাদের [illegible] বুঝা বড়ই সহজ।

পূর্ব্বে কাব্যামৃতরসাস্বাদ করিতে হইলেই [illegible] আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। সংস্কৃত কাব্য অধ[illegible] সকলে সংস্কৃত ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে[illegible]। [illegible] স্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তাই তুলসীর [illegible] ভাবাপন্ন। কবীর সুরদাসের কবিতা তাহা ন[illegible] দাস একজন নিরক্ষর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ক[illegible] দেশ দিয়া বেড়াইতেন। এই উপদেশগুলি এ[illegible] গিয়া প্রবেশ করে, এত গভীর জ্ঞানপূর্ণ [illegible] তুলসীর চেয়ে কবীরকে অনেক বড় বলেন।

'কহনেকা যো কবীরা কহা বাকী কহা সো [illegible]
[illegible]র বটোরকে (উঞ্ছ সংগ্রহ করিয়া) তুলসী [illegible]
রহে সো কুর' ('রাবিশ')॥'

রমৈনী নামক গ্রন্থে তাঁহার বচনগুলি সংগৃ[illegible] সুরদাসের ভজনগুলি (রাধাকৃষ্ণবিষয়ক) অ[illegible] তাঁহার গ্রন্থের নাম 'সুরসাগর'। রাণী মীরাব[illegible] কে না জানে? তাঁহার সঙ্গীতগুলিতে প্রেম[illegible] পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় এরূ[illegible] সঙ্গীত আছে যাহা তাহাদের সম[illegible] হইতে পারে [illegible] 'মীরা বিরহিনী নাথকি বিনা দাম বি কানী।' বি[illegible] সঙ্গীতটি শুনিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই চক্ষে জল [illegible] তাঁহার 'মেরো গিরিধর গোপাল দুসরা ন [illegible]' সঙ্গীতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ভক্তমাল গ্রন্থ[illegible] হিন্দী হইতেই বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়াছে) ই[illegible] বিস্তৃত [illegible]র লেখা আছে। গিরিধর দাসের [illegible]